বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব

১৮০০—১৯১৪

BANGLA NATAKE SWADESHIKATAR PROBHAB
(1800—1914. A. D.)

The Influence of Nationalism on Bengali Drama

by

DR. PRABHAT KUMAR BHATTACHARYYA

First Published : March 13, 1979

বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব

১৮০০ – ১৯১৪

ডঃ প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য



৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা ১৩৮৫

প্রকাশক :

শ্রীতপনকুমার ঘোষ

সাহিত্যশ্রী

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

মুদ্রাকর :

শ্রীএককড়ি ভড়

নিউ শক্তি প্রেস

১০ রাজেন্দ্র সেন লেন

কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

স্বাধিকার আন্দোলনে
যাঁরা অভিনয়কে হাতিয়ার করেছিলেন
তাঁদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে-

বিষয়সূচী

ভূমিকা — নয়

নিবেদন — তের

প্রথম ভাগ : প্রত্যুষপর্ব

১৮০০—১৮৬০ খ্রীঃ অঃ

এক : কথারম্ভ — ১

দুই : বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার উন্মেষ — ১০

তিন : দীনবন্ধু মিত্র — ৫০

দ্বিতীয় ভাগ : বয়ঃসন্ধিপর্ব

৮৬১—১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ

চার : প্রাক্ কথন — ১৪৩

পাঁচ : বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার বিস্তার — ১৪৮

ছয় : মধুসূদন দত্ত — ২০৪

সাত : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর — ২২২

আট : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমকালীন গৌণ নাট্যকারগণ — ২৭৩

নয় : অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন — ৩২৮

তৃতীয় ভাগ : যৌবনমুক্তিপর্ব

১৮৮৫—১৯১৪ খ্রীঃ অঃ

দশ : পূর্ব কথা — ৩৬১

এগার : বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার মুক্তি — ৩৬৮

বার : গিরিশচন্দ্র ঘোষ — ৪০০

তের : অমৃতলাল বসু — ৪৮৩

চোদ্দ : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ — ৫৩০

পনের : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় — ৫৮৪

ষোল : জাতীয়তাবাদী গৌণ নাট্যকারগণ — ৬৪৪

সতের : উপসংহার — ৬৫৬

আঠার : পরিশিষ্ট — ৬৫৮

নির্দেশিকা — ৬৭৬

ভূমিকা

ডঃ শ্রীমান প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য আমার কাছে গবেষণা করে 'বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেছেন। এটি এখন মুদ্রিত হয়ে পাঠকসমাজে প্রচারিত হল। আমার কাছে যাঁরা গবেষণা করে উপাধি লাভ করেন এবং গবেষণাটি মুদ্রিত করেন তাঁদের আমি অন্তর থেকে সাধুবাদ দিই। তাঁদের প্রভূত পরিশ্রম ও চিন্তার ফল মাত্র তিন জন পরীক্ষক ছাড়া আর কেউ জানতে পারবেন না, এটা গবেষক ও গবেষক-নির্দেশক, উভয়ের কাছেই অশান্তির কারণ। শ্রীমান প্রভাতকুমারের এই বিশাল গ্রন্থ একটু উল্টে গেলেই পাঠক বুঝতে পারবেন, তাঁর মানসিক সামর্থ্য কতটা গভীর। সেইজন্য এই গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশে আমি সবচেয়ে খুশি হয়েছি। আশা করব, যাঁরা নাটক সম্বন্ধে কৌতূহলী ও উৎসাহী, তাঁরাও এ গ্রন্থ থেকে প্রচুর জ্ঞাতব্য বিষয় আহরণ করতে পারবেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নাটক একটি প্রধান শাখা। এ শাখা উপন্যাস ও কাব্যের মতো সৃষ্টিশীল কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু নাটকই যে সর্বপ্রথম বাঙালীর সমাজচিন্তা, স্বাদেশিকতা ও রাষ্ট্রবোধকে জাগ্রত ও উদ্দীপিত করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না, কারণ তা ঐতিহাসিক সত্য। সার্বজনীন সাহিত্য বলতে নাটককেই প্রধানভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে। কথাসাহিত্য ও কাব্য-কবিতা একক পাঠের ব্যাপার। নাটক 'বহুজন সুখায় চ', এইজন্য ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সকলেই একসঙ্গে বসে যৌথভাবে এর রস উপলব্ধি করতে পারেন। তাই গণসাহিত্য বলতে নাটককেই নির্দেশ করা যেতে পারে। ফলে নাটকের দ্বারা যতটা দ্রুতবেগে 'সামাজিকে'র মন আকর্ষণ করা যায়, সামাজিক আন্দোলনে তরঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব, সাহিত্যের অন্যান্য শাখাপ্রশাখার দ্বারা ততটা সম্ভব নয়। সেইজন্য সমাজের নানাবিধ আন্দোলন, সংস্কার, প্রতিসংস্কারের সঙ্গে নাটকের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। সেকথা অতি স্পষ্ট হবে বাংলা নাটক আলোচনা করলে।

এই আলোচনার প্রথম অধ্যায়টি ('কথারম্ভ') বিশেষ মূল্যবান। উনিশ শতকের নব্য বাঙালীর সমাজ, শিক্ষা, সংস্কার ও সাহিত্যের নব জাগরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে সব দিককে স্পর্শ করে এই অধ্যায়ে অত্যন্ত নিপুণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই পটভূমিকাটুকু না জানলে আলোচনার গতিপথ ঠিক ঠিক অনুসরণ করা যাবে না। এই অধ্যায়ে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর নবচেতনার স্বরূপ ও তার উৎস নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচ্য কাল-সীমার বাইরে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে থেকেই প্রধানতঃ বাংলাদেশ এবং গৌণতঃ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রশাসন ও মানসিক সংস্কারে পরিবর্তনের সূচনা হয়, সেই পরিবর্তনকে কেন্দ্র করেই বাঙালীব সাহিত্যগত ঐতিহ্যের নতুন দৃশ্যের উন্মোচন হয়, নাটকে তার স্পষ্ট প্রভাব সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। এই প্রভাবের মধ্যে স্বদেশচেতনাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তার মূলে শুধু স্বদেশভাবনাই ছিল না। ছিল সমাজ ও নৈতিক জীবনের নব নব প্রেরণা।

উনিশ শতকের স্বদেশচিন্তা ও আন্দোলন অনেক সময়ে শাসক শক্তির প্রতিকূলতার জন্য ছদ্মবেশ নিতে বাধ্য হত ; কখনো মুঘল-পাঠান, কখনো রাজপুত জাতি, কখনো মারাঠা, কখনো বা শিখজাতিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছিল, তার কিছু সত্যমূলক, কিছু-বা কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু সে কল্পনা সর্বথা ইতিহাসাশ্রয়ী না হলেও জাতীয় ভাবোদ্দীপক ছিল বলে, নাট্যসাহিত্যের ও জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে তার একটি প্রাসঙ্গিক মূল্য আছে তা স্বীকার করতে হবে। ইতিহাসের কোন গুরুতর তথ্যভ্রান্তি সাহিত্যরসের উদ্দীপনে কিছু বাধা ঘটায় তাতেও সন্দেহ নেই। একদা নাটকে ঐতিহাসিক ভ্রান্তি বা বিকৃতিকে ব্যঙ্গ করে অমৃতলাল বসু 'তিল তর্পণ' লিখেছিলেন। সে যাই হোক এই গবেষণাগ্রন্থের লেখক ডঃ শ্রীমান প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য প্রচুর তথ্য ও নানা হিসাব-নিকাশসহ বাংলা নাটকে স্বদেশচেতনার প্রভাব এবং তার স্বরূপ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তাঁর সংগৃহীত অনেক তথ্য চমকপ্রদ, এতদিন এ-সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু সংবাদ রাখতাম না। তাঁর এই পরিশ্রম বাংলা নিবন্ধ সাহিত্যে একটি সফল সংযোজনা করল এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা কিছু স্পষ্টভাবে বলা দরকার। গ্রন্থটি তত্ত্বমূলক

ও তথ্যকেন্দ্রিক নিবন্ধ বা গবেষণা ; সুতরাং অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখক সমস্ত বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন, এবং সেই আদর্শেই এ গ্রন্থ বিচার্য। আজকাল কোনো কোনো সমালোচক অ্যাকাডেমিক রচনা ও রম্যরচনার পার্থক্যটা প্রায়ই বিস্মৃত হন। তাঁরা তথ্যগ্রন্থ থেকে রম্যরস আশা করেন। একথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত যে, তথ্যগ্রন্থও এলোমেলোভাবে রচিত হওয়া ঠিক নয়। তারও একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে, তা হচ্ছে যৌক্তিক পারম্পর্যে-বিধৃত বৈজ্ঞানিক মানসিকতা। তা যেমন গবেষকের হাতিয়ার, তেমনি পাঠক ও সমালোচকেরও সে-দৃষ্টি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ থাকা প্রয়োজন। তা নইলে গবেষণাগ্রন্থকে নীরস তথ্যস্তূপ বলে মনে হবে। শ্রীমান প্রভাতকুমারের এই গ্রন্থ তথ্যে সমৃদ্ধ হলেও কোথাও নীরস ঘটনার কংকাল-সাক্ষী হয় নি, একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই। উদাহরণস্বরূপ, আমরা এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়টি ('অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন', ১৮৭৬) উল্লেখ করতে পারি। লেখক এই অধ্যায়ে উক্ত ব্যাপারের অনুপুংখ আলোচনা করেছেন বলেই এটি মূল্যবান নয়। এ-সম্বন্ধে তিনি তথ্য উদ্ধার করে সেই তথ্যগুলির পটভূমিকা এবং সমকালীন দেশ ও সমাজের যে লিপিচিত্র এঁকেছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য গ্রন্থটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। ঐ আইনটি অন্যান্য আলোচকও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার এমন নিপুণ বিশ্লেষণ আমি অন্যত্র বড়ো একটা দেখি নি। 'বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব'—লেখকের মূল গবেষণা এই বিষয়ে। সাহিত্য-গুণাগুণ বিচার তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তবু তিনি প্রয়োজনানুসারে কিছু কিছু নাট্যগুণও বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে গ্রন্থটি শুধু তথ্যসর্বস্ব হয় নি, এটি সুখপাঠ্য নিবন্ধগ্রন্থে পরিণত হয়েছে। 'নীলদর্পণে'র প্রকৃত অনুবাদক কে, এ বিষয়ে তাঁর সংগৃহীত তথ্য চমকপ্রদ। এ নিয়ে যে মতান্তর সৃষ্টি হয়েছে, মনে হয়, এবার তার একটা সুমীমাংসা হবে। 'নীল-দর্পণ'-এর বিচার-সংক্রান্ত তাঁর পরিবেশিত তথ্য ও নথিপত্র ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে অতিশয় মূল্যবান।

স্বাদেশিক ভাবাবেগ উনিশ শতকের ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তার মধ্যে নাটক ও নাটকের অভিনয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। সেই রক্তাক্ত ইতিহাসকেই লেখক পুনরুজ্জীবিত করলেন। এ জন্য তিনি সমালোচক, ঐতিহাসিক ও নাট্যরসিকের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করবেন। তিনি

যখন আমার কাছে গবেষণা করেছিলেন তখন তাঁর চিন্তায় ও কর্মে যে মৌলিকতা লক্ষ্য করেছিলাম, পাঠকেরা এই গ্রন্থে তার স্পষ্ট পরিচয় পাবেন। এ জন্য অন্তর থেকে তাঁকে সাধুবাদ দিই।

বাংলা বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৯ ॥ ১৩৮৫

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলবার দায়িত্ব আবশ্যিকভাবে লেখকের উপর এসে পড়ে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বক্ষ্যমান আলোচনা সম্পর্কে স্বল্প কথাতে কিছু নিবেদন করতে চাই।

ইংলণ্ডীয় দ্বৈপায়ন সংস্কৃতি ও প্রতীচ্য শিক্ষার সংস্পর্শে বাঙ্গালী আধুনিক রাষ্ট্রবিচিন্তায় দীক্ষা লাভ করে। স্বাদেশিকতা এই চিন্তারই পরিণত রূপ।

বিদেশী শাসক প্রভুদের সঙ্গে বিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর মুক্তিপিপাসা জেগে উঠে। স্বার্থপুষ্ট ইংরেজ সরকারের চণ্ড-শোষণ ও সরকারী নিয়ম-নীতির সঙ্গে বঙ্গবাসীর বিরোধ শুরু হয়ে যায়। জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের নানা অন্তরায় ও অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় লক্ষ্য ক'রে, শিক্ষিত বাঙ্গালী বিদেশী শাসনের গ্লানি ও পরাভব থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলন চালায়। আত্মশক্তি অর্জন, স্বাবলম্বন অভ্যাস, ধর্মীয়বিভেদ দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িক ঐক্যপ্রচার ও গণচেতনাকে চিরঞ্জীব করে তোলবার জন্যই জাতীয় নেতারা সভা-সমিতি স্থাপন, সাংগঠনিক আন্দোলন ও সংবাদপত্র পরিচালনা করেছিলেন। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেও দেশবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে।

জাতি জাগরণের এই উষ্ণ পটভূমি বাঙ্গলা নাটককে কতখানি প্রভাবান্বিত করেছে ও নাট্যকারেরা জাতির গণ আন্দোলনকে কিরূপ গতি দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে পূর্ণ তথ্য গ্রহণ করাই বর্তমান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাঙ্গলা নাটকের বহুল আলোচনা থাকলেও রাজনৈতিক আবহাওয়া বাঙ্গলা নাটক ও নাট্যশালাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দেখতে পাই না। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাটকের যে আলোচনা, তা প্রধানতঃ রসতত্ত্বের বা তত্ত্ব-মীমাংসার। যুগের উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে নাট্যকারেরা স্বাদেশিকতার যে তর্পণ শুরু করেছিলেন, তার বিস্তৃত আলোচনা সেখানে স্বভাবতঃই অনুপস্থিত। অথচ, নাট্যকারেরা জাতীয়তা প্রচারে আত্মনিয়োগ না করলে গণজাগরণ ও স্বাদেশিক আন্দোলন ক্ষিপ্র গতিবেগ লাভ করত না।

এই আলোচনা গ্রন্থে, নাট্যকারদের মহান্ অবদানের কথা স্মরণ করা

হয়েছে। যুগধর্মের প্রভাবে নাট্যকারেরা কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নাটক রচনা করেছিলেন, দেশপ্রীতির স্বার্থে কারাবরণ করেছিলেন, সখকে সাধনায় পরিণত করে দেশে দেশে জাতীয়তার প্রচার চালিয়েছিলেন, তাকেও বর্তমান আলোচনাতে বাণীবদ্ধ করা হয়েছে।

বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যে স্বাদেশিকতার প্রভাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে, নাট্যকারদের চিত্তসঙ্কট, নাটকের মধ্যে জাতীয়তা প্রচারের স্বরূপ অনুসন্ধানের এক বিস্তৃত প্রচেষ্টা আছে। নাট্যকারেরা যুগের সঙ্কট-শৈলতটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বলেই, আপনকালের স্বজাতির মানস প্রক্রিয়াকে নাটকে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে ধরে রেখেছেন। তাঁরা কেবল বাঙ্গালীর স্বাদেশিক বাসনাকে প্রচার করেন নি, জাতীয়তার ক্ষেত্রে দেশবাসীর মত ও পথ কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কেও বহুল নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নাট্যকারেরা ছিলেন দেশনেতা ও দেশসেবক। তাঁদের কবিকল্পনা ছিল উদ্দেশ্যমূলক। জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করে, রোমান্টিক জগতে নির্বিকল্প স্বপ্নপ্রয়াণ তাঁরা কখনই করতে চান নি। দেশ যেখানে বিপদগ্রস্ত, দেশবাসী যেখানে মুমূর্ষু, সেখানে তাঁরা কবিকল্পনার মধ্যে কোন পলায়নী মনোবৃত্তি গ্রহণ করেন নি। সঙ্কটাপন্ন দারিদ্র্যক্লিষ্ট অশ্রুস্নাত জীবনকে তাঁরা অধিক পরিমাণে ভালবেসেছিলেন। নাট্যকারেরা প্রত্যেকে ছিলেন অধীত বিদ্যায় পারদর্শী। প্রতীচ্যের জীবনমুখী দর্শনচিন্তা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধীনতা স্পৃহা, তাঁদের চিত্তে স্বদেশ সম্পর্কে এক গভীর প্রীতি ও মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। জাতীয়তা বিষয়ে প্রতীতি লাভ করেন বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পাঠ করে; আর, এরই ফলে তাঁদের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এক সমন্বয়বোধ জন্মে। যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদার ধর্মনীতির পরিপোষকতা করে তাঁরা স্বদেশপ্রেমের গরিমা প্রচার করেন; যুক্তি ও নৈতিকতায় স্বাদেশিক চিন্তাকে জনচিত্তে গেঁথে দিতে ব্রতী হন। কেউ কেউ দেশপ্রীতির আদর্শ প্রচারের মধ্যে বিশ্বজনীনতার সুরও তোলেন।

সেজন্য নাট্যকারেরা কোন সঙ্কীর্ণ আদর্শ প্রচার করতেন না। বিরোধ ও বিসংবাদের চেয়ে জাতিগঠনমূলক ঐক্য-ভাবনাকে তাঁরা সর্বাগ্রে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে চান। তাঁরা যে নতুন মতাদর্শ প্রচার করেন, তার সার কথা হচ্ছে, কেবল বন্ধন মুক্তিই বিপ্লব নয়, পরবশতার শৃঙ্খল ছিন্ন করাই স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, বিদেশী শাসনের অচলায়তন যেমন ভাঙতে হবে,

তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গড়ার শক্তিও করতে হবে অর্জন। দাসত্বের বন্ধন ডোর যেমন ছিঁড়তে হবে, তেমনি গড়তে হবে স্বদেশকে। জাতির সমস্ত শক্তি যদি অন্তর্মুখী হয় তবেই দেশ গঠন সম্ভব। দেশবাসীর মানসিক পরিবর্তনের দিকে তাঁরা বেশি জোর দেন। এরই জন্য তাঁরা ছিলেন প্রত্যেকে **Constructive Nationalist.**

কেবলমাত্র সংগঠন চেতনার সঙ্গে অন্বয় সাধন নয়, নাট্যকারেরা সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সর্বব্যাপী সহানুভূতির তুলিতে, বিদেশী শাসনে নির্যাতীত মানবাত্মার ক্রন্দন ও ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাস নাটকের মধ্যে প্রাণস্পর্শী করে তুলেছিলেন বলেই গ্রাম ও নগর জীবন এক সাংস্কৃতিক বন্ধনে বাঁধা পড়ে। উচ্চ-নীচ পার্থক্য ঘুচিয়ে দেশবাসীর সকল স্তরে মানসিক ঐক্য গঠন, নাট্যকারদের এক বৃহৎ অবদান। তাঁদের 'নেশন'তত্ত্বের এটাই বড় পরিচয়। আর এরই ফলে নাটক ও নাট্যশালা হয়ে উঠে 'ন্যাশনাল'।

নাট্যকারেরা নাটকে স্বদেশচিন্তা যে তুফান তুলেছিলেন, তাতে ইংরেজ সরকার প্রমাদ গোনেন। ইতিহাসের গতি সম্পর্কে অতিসচেতন ইংরেজ বুঝতে পারেন যে, নাট্যকারেরা যখন দেশহিতব্রতে ব্রতী হয়ে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, নাটকে স্বদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন কল্যাণকামী চিন্তা প্রচার করছেন—তখন দেশবাসীর স্বাধিকার অর্জনের তীব্র আন্দোলন শুরু হতে খুব বেশি দেরী নেই। 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' প্রচারের মধ্যে ইংরেজ সরকারের সেই আতঙ্কের ছাপ সুস্পষ্ট।

নাট্যকারেরা ছিলেন বাস্তববাদী। জীবন ও মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণ তাঁদের নাটকে ধরা না পড়লেও, উদ্দেশ্যমূলক রচনার অন্তরালে জীবন-সত্যের শাশ্বত মহিমার দিকটি উদ্ঘাটিত হ'ত বলেই নাটকগুলির আত্মপ্রকাশ ও অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালা জনচাপে ভেঙ্গে পড়ত। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সহায়তা করবার বলিষ্ঠ তাগিদ নাট্যকারেরা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, নাটকের আঙ্গিক দুর্বলতা তাঁদের রচনার গতিবেগকে খর্ব করতে পারেনি; বরং বাঙ্গলা নাটকের আনন্দ-বাজার শুরু হয়েছিল এই সময়ে।

আলোচনার কালসীমা সম্পর্কে দু'একটি কথা নিবেদন করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভকাল (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত বক্ষ্যমান আলোচনার সীমারেখা নির্দিষ্ট। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে

ও স্বাদেশিক চেতনা বিস্তারে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালী একক নেতৃত্ব দিয়েছিল। এর পর থেকে দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর আগমন ও প্রাধান্য শুরু হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন এঁদের পুরোধা। যদিও পরবর্তীকালে দেশনেতাদের কর্মসূচীতে নানা উল্লেখযোগ্য মত ও পথ বিশ্বরাজনীতির পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিমার্জিত ও সংযোজিত হয়েছিল, তবুও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথমার্ধে বাঙ্গালী স্বাদেশিক আদর্শ প্রচারে যে নিয়ম ও নির্দেশ নির্দিষ্ট করেছিল, তার ব্যত্যয় এবং পরিবর্জন কখনও হয় নি।

রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালী নাট্যকারেরা আরও বেশি পরিমাণে ছিলেন জেদী ও প্রত্যয়নিষ্ঠ। দীনবন্ধু মিত্র থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পর্যন্ত নাট্যকারেরা তাঁদের কাছে দিগ্‌দর্শনীর কাজ করেছিলেন। এই সময়ে নাট্যমঞ্চের আবেদন জনচিত্তে আরও ব্যাপক হয় ও ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এ আলোচনা পরের। শুধু বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর একক প্রয়াসের সার্থক কর্মসূচীর কালসীমা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ সে সময়ে অন্যান্য প্রদেশের অবদান ছিল বিশেষভাবে গৌণ।

পরিশেষে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। স্বাদেশিক চেতনা বিস্তার ও স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমিতে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ। 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' (১৮৭৬—১৯৪৭) বিধিবদ্ধ হওয়ার পরেও বাঙ্গালী নাট্যকারেরা ইংরেজ সরকারকে আক্রমণ করে প্রচুর নাটক রচনা করেন। এই নাটকগুলির মধ্যে অনেক নাটক বাজেয়াপ্ত অথবা তৎকালীন শাসক সম্প্রদায় কর্তৃক সংশোধিত হয়। মুখ্য নাট্যকারদের সঙ্গে গৌণ নাট্যকারগণও এ বিষয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই বাজেয়াপ্ত অথবা পরিমার্জিত নাটক নিয়ে একটি স্বতন্ত্র আলোচনা গ্রন্থ রচিত হতে পারে। অচিরে প্রকাশিতব্য আমার 'The British Imperialism and Bengali Stage' গ্রন্থটি, এ বিষয়ের পরবর্তী সংযোজন। ইংরেজিতে লেখা আলোচনাটি, তৎকালের বাঙ্গালীমানস-বিচার ও ইংরেজ সরকারের নাট্য নিয়ন্ত্রণ নীতির তথ্যপূর্ণ সমাবেশ।

স্বাদেশিকতার যৌবনমুক্তি পর্বে, গৌণ নাট্যকারদের আলোচনা অধ্যায়ে নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বাদ পড়েছেন। তাঁর বাজেয়াপ্ত নাটকগুলির

তথ্য সম্প্রতি সংগৃহীত হওয়ায় তাঁকে বর্তমান আলোচনাতে গ্রহণ করা যায় নি। অপর নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী গৌণ নাট্যকার হিসাবে চিহ্নিত হলেও, তিনি প্রকৃতপক্ষে তৎকালের মুখ্য নাট্যকারদের মধ্যে একজন। এই দেশহিতব্রতী নাট্যকারদ্বয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবার বাসনা রইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে অসংখ্য প্রণাম জানাই। তিনি আমাকে এই দুরূহ কার্যে ব্রতী করেছেন এবং দুর্গম পথের দিশারী হয়েছেন। তিনি এই গবেষণা গ্রন্থের নির্দেশক ছিলেন। অতিশয় কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি স্নেহবশতঃ একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থটির মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর নিবন্ধটি এই পুস্তকের অমূল্য সম্পদ।

শ্রদ্ধেয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, ইংরেজি নীলদর্পণ নাটকের সম্পাদক শ্রীসুধী প্রধান আমাকে অনেক মূল্যবান তথ্যের অনুসন্ধান দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে র'ল আমার বিনম্র চিত্তের কৃতজ্ঞতা।

আমার স্ত্রী শ্রীমতী উমা ভট্টাচার্য, এম. এ. আলোচনার জটিলত্ব মোচনে সাহায্য করেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্দেশিকা অংশটি তাঁরই রচনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণপুরুষ শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় সাহায্য না পেলে, স্বদেশী যুগের কয়েকটি বাজেয়াপ্ত নাটকের দর্শন কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। তাঁর উদ্দেশ্যে রইল আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈতন্য লাইব্রেরী, ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। অমৃত বাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ আমাকে প্রাচীন সংবাদপত্র দেখতে দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের জন্য রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

এ ছাড়া অনেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের নিজস্ব সংগ্রহশালা থেকে পুঁথি দিয়ে সাহায্য করেছেন। আসানসোলের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এঁদের অন্যতম। শ্রীসাধন কর, শ্রীনূপুরবিজয় বিশ্বাস, শ্রীতারক চট্টরাজ, শ্রীসুভাষ সেনগুপ্ত, শ্রীসুনালেন্দুপ্রকাশ রায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন পাণ্ডা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মদীয় অনুজ শ্রীমান প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য গ্রন্থটির সূচনাকাল থেকে

সংযুক্ত। অগ্রজের প্রতি অনুরাগ ও সহযোগিতা, তার ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে সাহিত্যপ্রীতির একনিষ্ঠ উদাহরণ। তার উদ্দেশ্যে রইল আমার অক্ষয় আশীর্বাদ।

প্রকাশনার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত তপনকুমার ঘোষ আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। যে রকম দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে গ্রন্থটিকে শোভন ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন তা সত্যই অভাবনীয়। শ্রীমান শ্যামলকুমার ঘোষের অনুরাগী চিত্তের কর্তব্যনিষ্ঠা সত্যই প্রশংসনীয়।

প্রুফ দেখার ব্যাপারে সতর্কদৃষ্টি নিবদ্ধ করা সত্ত্বেও কয়েকটি ক্ষেত্রে মুদ্রণ-প্রমাদ রয়ে গেল। ১০৯ পৃষ্ঠার শিরোনামে 'দীল দর্পণ' স্থানে 'নীলদর্পণ' হবে; ২১৪ পৃষ্ঠায় 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা'র পরিবর্তে হবে 'অরুণ-বরণ-কিরণমালা', এবং ৪৯৪ পৃষ্ঠাতে 'আদর্শবন্ধু' নাটকের প্রকাশকাল ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরিবর্তে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ১২২ এবং ১২৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় পরিশিষ্ট (ক-৫) ও পরিশিষ্ট (ক-৬) এর পরিবর্তে যথাক্রমে (ক-৪) ও (ক-৫) হবে। অন্যান্য মুদ্রণ-ত্রুটিগুলি মারাত্মক নয় বলে স্বতন্ত্র শুদ্ধিপত্রের আশ্রয় নেওয়া হল না। সহৃদয় পাঠক মণ্ডলী সেগুলিকে ক্ষমাসুন্দর চিত্তে মার্জনা করবেন বলে আশা করি।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট তৈরী করেছেন সুশিল্পী, সাহিত্যিক ও চিত্র-পরিচালক শ্রী পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী।

দোলপূর্ণিমা
২৮শে ফাল্গুন, ১৩৮৫

শ্রীপ্রভাতকুমার ভট্টাচার্য

প্রথম ভাগ

প্রত্যুষপর্ব (১৮০০– ১৮৬০ খ্রীঃ অঃ)

এক

কথারম্ভ

নাটক জাতির জীবনচিন্তার ব্যারোমিটার। সমস্ত দেশে, সমস্ত কালে, মানুষের সামাজিক আবেগের প্রতিচ্ছবি নাটকের মধ্যে সর্বপ্রথম হয়েছে রূপায়িত। আর নাটক প্রধানতঃ 'দৃশ্য কাব্য' হওয়াতে মানুষের মনের সঙ্গে ঘটেছে তার আত্মিক সংযোগ। নাটক সবদেশেই জাতির সংস্কৃতিকে দ্বারে দ্বারে বহন করে জাতীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাঙ্গলা নাটকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ জীবনসত্যের পরিচয়টুকু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হতে দেখি। বাঙ্গলা নাটকের ভাব ও অর্থগৌরব এই স্তরেই নিহিত আছে।

উনিশ শতকের সূচনায় বাঙ্গালীর জীবনচেতনাতে এক পরিবর্তনের পালা শুরু হয়। অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালীর রাজনৈতিকচিন্তাতে ক্ষয়রোগ দেখা দিয়েছিল। আর এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল স্বদেশচিন্তার শূন্য যুগের। দেশ ও জাতির মঙ্গল সম্পর্কে যে অনবহিতা, তাই প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি করেছিল বিভেদ, শাঠ্য ও ষড়যন্ত্রের গভীর কৃষ্ণময় পরিবেশ। আর এই দুর্বলতার বিস্তীর্ণ পথ দিয়েই ইংরেজদের বিজয়রথ দুর্দম গতিতে প্রবেশ করে। কিন্তু উনিশ শতকের পশ্চিমের যুক্তিবাদী জ্ঞান, বিজ্ঞান, নানারকম প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার এবং ইতিহাসাশ্রিত মানবহিতবাদী বিভিন্ন জ্ঞানালোচনা দেশবাসীর স্থবির চিন্তাতে যে আলোড়ন আনে, তারই বিমিশ্র ফলশ্রুতি হিসেবে জাতির স্বদেশচিন্তার জয়যাত্রা শুরু হয়।

বাঙ্গালীর এই নব্যমানসিকতার কর্ণধার ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এঁদেরই চিন্তায় ও কর্মানুভাবনাতে রাষ্ট্রিকচিন্তা, স্বজাতিপ্রীতি ও সাজাত্যাভিমান প্রথম হয়েছিল সুপরিস্ফুট। এঁরা একদিকে যেমন শিক্ষাসংস্কারমূলক প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রীয় আলোচনা, সংবাদপত্র পরিচালনা, সমাজ ও ধর্মচিন্তার সংস্কার সাধন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে সর্ব বিষয়ে

আত্মসচেতন ও মুক্তিকামী করে তুলেছিলেন, তেমনি অপরদিকে জাতি-হিতৈষণা বৃত্তির ব্যাপ্তিতেই প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন নাট্যশালার এবং বাঙ্গলা নাটকের।

"এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই।...সুতরাং ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত 'শেয়ার' গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে একজন কর্ম্মাধ্যক্ষের অধীনে বেতনভোগী যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া এতদর্থে বিরচিত গীতি ও কাব্যের মাসে একবার নূতন অভিনয় করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দ বৃদ্ধি হইবে।"[১]

সমকালে বাঙ্গলাদেশের কলকাতা অঞ্চলে যে ক'টি নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল, তারা যে শুধু কেবলমাত্র নিছক 'আনন্দবৃদ্ধি' করেই আপন কর্তব্য কর্ম শেষ করেছিল তা নয়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবার যে অনুভাবনা সমকালের যুগমনীষীরা চিন্তা করেছিলেন, বিশেষভাবে রামমোহনের 'ব্রহ্মসভার' মধ্যে তত্ত্বিয় আকারে যা রূপায়িত হয়েছিল বাঙ্গালীর উদ্যোগে বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় কালে তারই ফলিত প্রকাশ দেখা যায়।

"অভিনয়কালে...এক হাজারের উপর হিন্দু, মুসলমান, কয়েকজন ইউরোপীয় ও অন্যান্য নানাজাতীয় দর্শকের ভিড় হইয়াছিল। ইহাদের সকলেই অভিনয় দেখিয়া সমভাবে আনন্দিত হইয়াছেন।"[২]

প্রতীচ্য জ্ঞান ও জীবনমুখী চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে বাঙ্গালীর সুপ্ত ইতিহাস-চিন্তা ও রাষ্ট্রচেতনা জেগে উঠে। আর এই দুই ভাবধারা একত্রিত হয়েই তার স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়হিতবাদী চিন্তার বিকাশ ঘটায়। ইতিহাস-

১ সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২৬), দ্রঃ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৭-৮

২ হিন্দু পাইয়োনিয়ার ২২শে অক্টোবর, ১৮৩৫
দ্রঃ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৩

চেতনার জাগরণমুখী ক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে একজন পাশ্চাত্য সমালোচক বলেছেন,

"There is one mind common to all individual men. Every man is an inlet to the same and to all of the same. He that is once admitted to the right of reason is made a freeman of the whole estate.···Man is explicable by nothing less than all his history. Without hurry, without rest, the human spirit goes forth from the beginning to embody every faculty, every thought, every emotion which belongs to it, in appropriate events. But the thought is always prior to the fact; all the facts of history preexist in the mind as laws. Each law in turn is made by circumstances predominant, and the limits of nature give power to but one at a time. A man is the whole encyclopaedia of facts. ··There is a relation between the hours of our life and the centuries of time. ·the hours should be instructed by the ages, and the ages explained by the hours. Of the universal mind each individual man is one more incarnation. All its properties consist in him. Each new fact in his private experience flashes a light on what great bodies of men have done, and the crises of his life refer to national crises. Every revolution was first a thought in one man's mind, and when the same thought occurs to another man, it is the key to that era. Every reform was once a private opinion, and when it shall be a private opinion again it will solve the problem of the age.···

It is the universal nature which gives worth to particular men and things. Human life, as containing this, is mysterious and inviolable, and we hedge it round with penalties and laws. All laws derive hence their ultimate

reason; all express more or less distinctly some command of this supreme, illimitable essence. Property also holds of the soul, covers great spiritual facts, and instinctively we at first hold to it with swords and laws and wide and complex combinations. The obscure consciousness of this fact is the light of all our day, the claim of claims; the plea for education, for justice, for charity; the foundation of friendship and love and of the heroism and grandeur which belong to acts of self-reliance."[৩]

ইতিহাসবোধের উৎসভূমিতে যে মানবিক অনুভূতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে উদার সমন্বয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিপুষ্ট হয়, তার বিস্তৃততর ব্যাখ্যা সমালোচক এখানে করেছেন। ইতিহাসচেতনার এই মূল সূত্রটি ধরে আমরা আমাদের নবজাগরণের বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে পারি। জাতির চিত্তে ইতিহাসবোধের অভাব যখন ঘটে, তখনই দেশের অধঃপতন হয় শুরু। অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালীর তামসিক মানসিকতার পশ্চাতে এই মনোভাবই কার্যকরী হয়েছে। তাই দেখা যায় বাঙ্গলাদেশ যখন নব্যপ্রাণপ্রতীতির ভৈরব সংগীতে মেতে উঠেছিল, তখনই রামমোহন ও হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা ইতিহাসচিন্তাকে পুনরুদ্ধার করে নতুনভাবে দেশবাসীর চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য যে সমস্ত স্বাদেশিক নেতারা স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়হিতবাদীতার শঙ্খধ্বনি করেছিলেন, তাঁরা কেউ ইতিহাসচেতনাকে অস্বীকার করতে পারেননি; বরং নানা কাজে ও চিন্তায় একে করেছিলেন প্রাণবন্ত। স্বাদেশিকতার ঋত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ্যভাবেই লিখেছিলেন,

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই।...নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না... বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।"[৪]

বাঙ্গলাদেশের নাট্যকারেরা নাটক রচনা কালে ইতিহাসচেতনার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছিলেন। নাট্যকারদের প্রত্যেকেই নতুন জীবনবোধে

৩ Essays: Ralph Waldo Emerson (first series) p. 3-5

৪ বিবিধ প্রবন্ধ (২য় খণ্ড): বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা:

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছিলেন দীক্ষিত। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অধীতবিদ্যায় পারদর্শী। প্রতীচ্যের জীবনমুখী উন্নত দর্শনচিন্তা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাআন্দোলন তাঁদের চিত্তে আপন দেশ সম্পর্কে এক গভীর প্রীতি ও মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। স্বদেশবাসীর প্রতি এক মহান দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁরা ভারতের ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার ও পুনরুশীলন করেন। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তা সম্পর্কে প্রতীতি লাভ করেন বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পাঠ করে। আর এরই ফলে, তাঁদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক সমন্বয় বোধ সৃষ্টি হয়েছিল। নাট্যকারেরা বুঝেছিলেন, স্বাদেশিকতার প্রতি নিস্পৃহ ও চেতনাবিরহিত মনোভাব পরিণামে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ সকলের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। স্বাদেশিকতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও চেতনার সাহায্যেই স্বাধীনতার প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মে। এইজন্য নাট্যকারেরা ইতিহাসচেতনাকে আশ্রয় করে যুক্তি ও নৈতিকতায় জাতীয় অনুভাবনাকে দেশবাসীর চিত্তে গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন—নাটক ও নাট্যশালার মাধ্যমে। যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদার ধর্মনীতির পরিপোষকতা করে তাঁরা স্বাদেশিকতার মহিমা প্রচার করেন। কেউ কেউ এর মধ্যে বিশ্বজনীনতার স্বরও তুলেছিলেন। বাঙ্গালী নাট্যকারেরা ইতিহাস পাঠের আশ্রয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হন। এর জন্যই তাঁরা কোন সংকীর্ণ মতবাদ প্রচার করতেন না। বিরোধ ও বিসংবাদের চেয়ে জাতিগঠনমূলক ঐক্যভাবনাকে তাঁরা প্রচার করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন তার সার কথাই হচ্ছে, কেবল বন্ধনমুক্তিই বিপ্লব নয়, পরবশতার শৃঙ্খল ছিন্ন করাই স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, বিদেশী শোষণের অচলায়তন যেমন ভাঙতে হবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গড়বার শক্তিও অর্জন করতে হবে। দাসত্বের লৌহবলয় যেমন ভাঙতে হবে, তেমনি পালন করতে হবে স্বরাজ গঠনের মহান দায়িত্ব। জাতির সমস্ত শক্তি যদি অন্তর্মুখী হয়, তবেই দেশ গঠন সম্ভব। তাই দেশবাসীর মানসিক পরিবর্তনের দিকে তাঁরা বেশি জোর দিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা জানতেন, বিপ্লবের ফলে মানুষের চিত্তে যে রূপান্তর ঘটে তাকে স্থায়ী করতে হলে দরকার নবসংগঠন। এই জন্যই নাট্যকারেরা 'Constructive Nationalist'-এর ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বাঙ্গালী নাট্যকারেরা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করবার পূর্বেই

উপলব্ধি করেছিলেন বাঙ্গলাভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষাচর্চার আবশ্যিকতা। এর পূর্বেই বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন মনীষীরা মাতৃভাষাচর্চার জন্য আন্দোলন চালিয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দুপেট্রিয়টে' বারবার স্বদেশী ভাষায় ও জাতীয়হিতাদর্শে নাটক রচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন শিক্ষিত বাঙ্গালীকে।[৫] নাটুকে রামনারায়ণ তর্করত্ন হিন্দু মেট্রোপোলিটন বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভাষণ প্রদান প্রসঙ্গে বাঙ্গালীকে মাতৃভাষাচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। বাঙ্গালী নাট্যকারের স্বাদেশিক মানস উপলব্ধির প্রয়োজনে বক্তৃতাটি উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে।

"তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না, বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন ২ দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে।...

এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বিবিধ প্রকার পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, দণ্ডনীতি, ও চিকিৎসাবিষয়ক উত্তমোত্তম প্রবন্ধ সকল দৃষ্ট হইতেছে যদি তোমরা স্বদেশীয় ভাষার স্বরূপ যোগ্য হও তাহা হইলে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট ২ গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিতে পারিবে তাহাতে দেশীয় ব্যক্তিদিগের যে কত উপকার হইবে তাহা কথনাতীত।......

এই সুকুমার দেশীয় ভাষা ইহা শিক্ষা করিতে তোমাদিগকে নিতান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, যেহেতু ইহা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা। ...... যদি তোমাদিগের বিবেক নয়ন থাকে তবে কদাচ এই অযত্নলভ্য স্বদেশীয় বিদ্যারত্নকে অশ্রদ্ধা করো না।...

অতএব হে ছাত্রগণ তোমরা বাঙ্গলা সাধুভাষা প্রতি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ

৫ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ২১

কর, ঐ ভাষা এতদ্দেশের দেশীয় ভাষা, যতদিন পর্যন্ত এতৎপ্রদেশে উহার শ্রীবৃদ্ধি না হইবে, ততদিন নানা ইংরাজী গ্রন্থ প্রচার হউক, উত্তমোত্তম শিক্ষক থাকুন, কিছুতেই এতদ্দেশীয় সাধারণের জ্ঞান রসাস্বাদন হইবে না।"৬

উদ্ধৃতির মধ্যে নাটকে রামনারায়ণের স্বদেশী ভাষা শিক্ষার প্রতি যে অনুরাগ ব্যঞ্জিত হয়েছে, তাতে সমকালীন যুগচিন্তারই প্রতিফলন ঘটেছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের বিশ্বাস ছিল যে বাঙ্গালীর মাতৃভাষা-চর্চা তার সকল উৎকর্ষ বিধান করবে। বাঙ্গালীর নব্যচিন্তাধারা দেশবাসীর সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে গেলে প্রয়োজন সর্বাগ্রে মাতৃভাষার অনুশীলন। তাঁর সময়ে যে সমস্ত ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজিগ্রন্থ পাঠ করে, বিদেশী রঙ্গালয়ে আমোদ-প্রমোদে নিশিযাপন করে নিজেদের উগ্র ফিরিঙ্গীয়ানার পরিচয় রাখতেন, তাঁদেরই তিনি চেষ্টা করেছিলেন সংহত ও সংযত করতে। অবশ্য ইউরোপীয় সংস্কৃতির সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে বহু ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজি নাটকের তুলনায় আমাদের বাঙ্গলা নাটকের নিম্নমানের মাত্রা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং বাঙ্গলা নাটককে উন্নত ও জাতীয় হিতাদর্শের উপযোগী করতে সচেষ্টও হয়েছিলেন।*

প্রসন্নকুমার ঠাকুর যখন রিফর্মার (Reformer) পত্রিকা পরিচালনা করে বাঙ্গলা দেশে রাজনৈতিক দাবীদাওয়ার কথা তুলে ধরে সমর্থন ও প্রতিবাদে বাঙ্গালীর বুদ্ধিকে জাগ্রত ও শাণিত করছিলেন, তখন স্বজাতির জাতীয় ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য স্থাপন করেছিলেন 'হিন্দু থিয়েটার' (১৮৩১)। পাশ্চাত্য দেশের ভাব, জ্ঞান ও রস সমৃদ্ধ নাটকাভিনয় দেখিয়ে তিনি দেশবাসীর জ্ঞান ও চিন্তাকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ভারতের অতীত গৌরব, জাতীয়গরিমা এবং ঋদ্ধি সম্পর্কে বাঙ্গালী যাতে পরিপূর্ণভাবে আত্মসচেতন হতে পারে; সেজন্য তিনি একই সঙ্গে ইংরেজি নাটকের পাশে সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। মনে হয় বাঙ্গলা গদ্যের তৎকালীন রূপ সংস্কৃত নাটকের

৬ সাহিত্যসাধক চরিতমালা, (১ম খণ্ড) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৮-২৩

* "সে-যুগের সকল বাঙালীই·········কলিকাতার ইংরেজদের নাট্যশালায় ইংরেজী অভিনয় দেখিতে যাইতেন এবং সকলেই ইংরেজী ধরণে বাংলা নাটক অভিনয় করাইবার জন্য উৎসাহী ছিলেন।"—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ. ৮

নাটকীয়তা সৃষ্টি ও নাট্যরস প রবেশনে যথোপযুক্ত ছিল না, এমন কি বাঙ্গলা ভাষায় মৌলিক নাট্যরচনার পরিকল্পনাও ছিল সুদূরে।

অবশ্য উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গালীর নাট্যচিন্তাতে রাজনৈতিক চেতনা অথবা ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোন পরিচয় নেই। কারণ বাঙ্গালীর স্বাদেশিক অনুভাবনা এই সময়ে ধর্ম ও সমাজসংস্কারের পথে ধাবিত হয়েছিল। জাতির অখণ্ড জীবনচেতনা সে সময়ে সমাজের কুরীতি প্রদর্শন ও বিভিন্ন সামাজিক জঞ্জাল পরিষ্কার করার চেষ্টার মধ্যে রূপায়িত হয়েছিল বলেই বাঙ্গালীর নাটক রচনার প্রথম আত্মপ্রকাশ সামাজিক নাটকের মাধ্যমে ঘটেছিল। অবশ্য এই সময়ে অনেক সংস্কৃত পৌরাণিক নাটকের অভিনয় বাঙ্গলাতে হয়। বাঙ্গলাদেশের লৌকিক উপাখ্যান নিয়েও কিছু নাটকাভিনয় হয়েছিল। এই সকল নাটকের রচনা ও অভিনয়ের উদ্দেশ্য ছিল, বাঙ্গালীর কাছে জাতীয়মাহাত্ম্য প্রচার করা। ইউরোপীয় মিশনারীদের উগ্র খৃষ্ট-ধর্মাদর্শ প্রচার ও ধর্মান্তীকরণের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী-নাট্যকারেরা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবেই মিশনারীদের প্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছিল। অবশ্য মূল সমস্যা সমাধানের জন্য রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও রাধাকান্ত দেব বাহাদুর-এর নাম অবনত মস্তকে স্বীকার করতে হবে।

বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব পড়তে শুরু করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ শোষণ ও নির্মম অত্যাচারে বাঙ্গালীর জীবনে যে কৃষ্ণারজনী নেমে এসেছিল, তার প্রতিবাদে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা কাল থেকেই ফিরিঙ্গী বণিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বিত্তহীন কৃষকদের এই প্রতিবাদ প্রথমদিকে আমাদের নাটককে অথবা সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেনি। ইংরেজ রাজত্বকে স্বাগত জানিয়েই ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালী বিভিন্ন সংস্কার ও রাজনৈতিক আলোচনায় আপন দাবী-দাওয়া তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাঙ্গালীকে উচ্চ-নীচ শ্রেণী নির্বিশেষে ইংরেজ রাজত্বের প্রত্যক্ষ সমালোচনা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনায় নামতে হয়। বিদেশী বণিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের প্রথম চিত্রটি সর্বাগ্রে দীনবন্ধুর আন্তরিকতা ও অভিজ্ঞতার স্পর্শে 'নীলদর্পণ' নাটকেই হয়েছিল রূপায়িত। 'নীলদর্পণ' নাটকে বাঙ্গালীর স্বাধিকার বোধ

প্রতিষ্ঠার সর্ব প্রথম বিকাশ ঘটেছে। উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা যা নানা প্রতিবাদ ও সমর্থনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, তারই সঙ্ঘবদ্ধরূপ 'নীল বিদ্রোহ'। একদিকে সাধারণ কৃষক ও অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী যুগ্মভাবে এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। বাঙ্গালীর ইতিহাসচিন্তা, রাজনৈতিকচেতনা ও স্বদেশপ্রেম সমস্ত কিছু একত্রযোগে এই বিদ্রোহকে ক্ষিপ্রগতিবেগ দিয়েছিল। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক বাঙ্গালীর নবজাগ্রত সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক সচেতনতার দৃশ্যভাষ্য। এখন ইংরেজ রাজত্বের সূচনাকাল থেকে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের রচনাকাল পর্যন্ত বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয়-চেতনার পরিচয়টুকু নেওয়া যাক্।

দুই

বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার উন্মেষ

সূচনা

১

পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) বাঙ্গালীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ জাতির স্বদেশচিন্তার অভাব। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে নবাবী আমলের প্রদোষ অন্ধকারে বাঙ্গলাদেশে 'মাৎস্যন্যায়' শুরু হয়েছিল। রাষ্ট্রীয়-শাসনের দুর্বলতার জন্য হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সেমীয় শাসকদের অত্যাচারে হিন্দুপ্রজাদের সহ্যের সীমা গিয়েছিল অতিক্রম করে। দুর্বিনীত শাসনব্যবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য হিন্দুরাজন্যবর্গ ষড়যন্ত্র ও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিদেশী বণিকদের। অন্ধধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ গৃহ-যুদ্ধের সূচনা করে স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশপ্রেমের মহানআদর্শকে করেছিল ধূলিসাৎ। কেবলমাত্র রাজনৈতিক চত্বরের বিভীষিকা নয়; সমাজের সাধারণস্তরের ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবন ও প্রথাবদ্ধ আচারবিদ্ধ ধর্মের অনুশাসনে নিপীড়িত হয়ে তিক্ত এবং কষায় হয়ে উঠেছিল। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, সতীদাহ, গঙ্গাবক্ষে সন্তান বিসর্জন, জাতিভেদ, শাস্ত্র সম্পর্কে মূল্যহীন পণ্ডিতাভিমান সমস্ত কিছু একত্রযোগে লৌকিক জীবনকে করে তুলেছিল কর্কশ।* উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গলাদেশের সংবাদ

* "………the vast sub-continent of India………was disarmed divided in language and religion and devoid of any feeling of political unity. Communication was slow, tedious and uncertain. Transport of goods from one region to another presented a formidable problem. The saddest feature in the life of the people was an ignorance of the glorious achievements of the past. The Vedas and the Upanisads were little studied. ……Liberal education and especially the knowledge of science were conspicuous by their absence. Women were considered unfit for scholarly pursuits. They were kept secluded in the Zenana over the greater part of India. Nearly one-sixth of the total population of the country was regarded as out-castes. They were denied even the elementry rights of civic life and were condemned to endure a wretched existance—shabby, ignorant and groaning under the grinding poverty."—History of Indian Social and Political Ideas: By Biman Behari Mazumdar. p. I.

পত্রেও দেশবাসীর এই গলিত জীবনের অনেক করুণ কাহিনী বিবৃতি হিসেবে স্থান পেয়েছে।[১] দারিদ্র্য ও রিক্ততার মধ্যে দেশবাসীর চৈতন্য প্রভাব হয়েছিল অস্তমিত। আত্মরক্ষার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, হৃদয়বলের জন্য ধর্মের ও কর্মের যে সমন্বয় দরকার; সেরকম কোন ঐক্যভাবনা বাঙ্গালীর চিন্তাক্ষেত্রে উদয় হয়নি। সুতরাং যেখানে জাতির মনোলোকে চিন্তার মহানদী শুকিয়ে গেছে সেখানে স্বদেশপ্রীতির স্বাক্ষর অনুসন্ধান করা বৃথা। কারণ আপন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর আনুগত্য ও মমত্ববোধ থেকেই স্বদেশ হিতবাদী মনোবাসনা জন্মলাভ করে। এবং এরসঙ্গে এক উন্নততর স্বাভিমান ও দৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ সংযুক্ত হলেই স্বাদেশিকচেতনার অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু যেখানে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে অবক্ষয়ের পূর্ণগ্রাস শুরু হয়েছে, জাতির চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জীবনচিন্তা ও অনুভাবনাতে বিনাশের মারীবীজ প্রবেশ করে জীবনের ভিত্তিকে করেছে শিথিল, সেখানে দেশপ্রেমের মহান আদর্শের অবলুপ্তি ঘটেছে স্বাভাবিকভাবে। এই ঐতিহাসিক সত্যের প্রমাণ রয়েছে, 'শ্বেত সেনাপতি' রবার্ট ক্লাইভের একটি পত্রলিপিতে। পলাশী যুদ্ধে জয়লাভ করে মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গী সৈন্য যখন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেছে, তখন পথের দু'ধারে সমবেত লোকদের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন,

"That the inhabitants who were spectators on that occasion, must have been amounted to some hundred thousands and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they might have done it, with stones and sticks."[২]

কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। দেশবাসীর আত্মবিস্মৃতি এতদূর ঘটেছিল যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন তাদের চিত্তে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। ভারতবর্ষে সুপ্রিম কোর্ট ও ১৭৭২ সালে লর্ড 'ওয়ারেন হেষ্টিংস' ভারতে বড়লাট নিযুক্ত হ'লে বাঙ্গালী বুঝতে পারল যে, জাতির জীবনে পালা বদলের দিন শুরু হয়েছে। বাঙ্গালীর দেশ সম্পর্কে এই যে চেতনার অসাড়তা তা কেবল বাঙ্গলাদেশের ছবি নয়, সমকালীন সমগ্র ভারতের চিন্তাধারা এতে

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৮৭শক অগ্রহায়ণ মাস

২ "Clive's evidence before Parliamentary Committee": "The Rise of the Christan Power in India. —B. D. Basu, p.—96

স্থান পেয়েছে। এই সমীক্ষা বিচারে পলাশীর যুদ্ধ ভারতবাসীর অবক্ষয় রাষ্ট্রচিন্তার এক বিষাদময় পরিণতি—কোন আকস্মিক বিপর্যয় নয়।[৩]

কিন্তু স্বদেশপ্রীতির শূন্যযুগেও বাঙ্গালীর স্বাধিকারবোধ ও স্বদেশপ্রেম একেবারে অস্ফুট ছিল না। তবে বর্তমানকালে যে সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক সচেতনতার কথা বলি তার কোন প্রকাশ সে যুগে দেখা দেয়নি ; এবং তা সম্ভবও ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙ্গালীর জীবনে যে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তার প্রমাণ সমকালীন অর্থনৈতিক ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে লিপিবদ্ধ করা আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়াদের রক্তচক্ষু ও স্বার্থপরতা, শাসনের নামে চণ্ডশোষণ নীতি, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, দেশীয় বাণিজ্যের দ্রুত অবলুপ্তি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভারতীয় কৃষকদের স্থায়ী দুদশা এবং দুর্গতি ও অন্যদিকে শিক্ষা সংস্কৃতিহীন নতুন জমিদারদের রিরংসামুখর জীবনযাত্রা এবং অর্থের প্রয়োজনে নির্মম পাশবিক অত্যাচার সমস্ত কিছু একত্রযোগে নিম্ন সম্প্রদায়কে করে তুলেছিল বিদ্রোহী। জীবনের সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত হয়ে স্থানে স্থানে তারা শুরু করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সিপাহী বিদ্রোহ' ও ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'নীল বিদ্রোহে'র আগে বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড আকারে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১) তাঁতি ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম। (১৭৯৪)

২) বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের প্রজা বিদ্রোহ। (১৭৮৫)

৩) চোয়ার বিদ্রোহ। (১৭৯৯)

৪) সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। (১৭৬০-১৮০০)

৫) গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা। (১৮৩২)

৬) তিতুমীরের বিদ্রোহ। (১৮৩১)

৭) সাঁওতাল বিদ্রোহ। (১৮৫৫)

এই সমস্ত বিদ্রোহে সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিকচেতনা না থাকলেও স্বাধিকার-বোধের অকৃত্রিম অনুরাগ থেকেই নিম্ন সম্প্রদায় যে স্বাধীনতাসংগ্রাম পরিচালনা করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিম্ন সম্প্রদায় কোনদিনই ফিরিঙ্গী বণিকদের প্রীতির চোখে দেখেনি। ইংরেজ বণিকদের

History of the Freedom Movement in India (vol. I),
—By Dr. R. C, Mazumdar, p. 48

নির্লজ্জশোষণরূপ এদের চোখেই প্রথম ধরা পড়েছিল। তবে সমকালীন ইংরেজি-শিক্ষিত উচ্চ সম্প্রদায় এই বিক্ষোভগুলিকে কোন সমর্থন জানাননি। এমন কি 'সিপাহী বিদ্রোহে'র কালেও বাঙ্গালীর ইংরেজপ্রীতি ছিল অক্ষুণ্ণ। কিন্তু তবুও অনেকে ফিরিঙ্গী বণিকদের নগ্ন স্বার্থপর রূপটি প্রত্যক্ষ করে অন্তরে অন্তরে কম্পিত হয়েছিলেন। তাঁরা স্পষ্টই উপলব্ধি করেন যে ইংলণ্ডীয় শিল্প-সম্ভার ও ফিরিঙ্গীদের বাণিজ্যনীতি দেশকে অধোগতির মুখে ঠেলে দেবে। সমকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রে বাঙ্গালীর এই আশঙ্কার কথা প্রকাশিত হয়েছে।[৪] তবে বাঙ্গালীর উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের আগে পর্যন্ত ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্য সমালোচনা শোনা যায়নি। রামমোহনের বিলাত গমনের পর থেকেই বাঙ্গালী আপন দাবী-দাওয়ার কথা ব্যক্ত করতে থাকে।

যখন অর্থনৈতিক শোষণে পর্যুদস্ত হয়ে নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী সম্প্রদায় প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল, তখন এদেশে ইংরেজিশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে ইউরোপীয় বিভিন্ন যুক্তিবাদী জ্ঞান ও দর্শন এবং ফরাসী বিপ্লবের মানবহিতবাদী স্বাধিকারচেতনা এক শ্রেণীর বাঙ্গালীর চিত্তভটকে প্লাবিত করে। বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের আবেগ বহুকাল ধরে বাঙ্গালীর জাতীয়চেতনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। এরই ফলে তারা সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনাকে জাতির সমষ্টিগত কল্যাণচিন্তা ও ভারতচেতনার পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে পরিশীলিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল এই নব্য মানসিকতার ধারক ও বাহক।

মধ্যবিত্তের ভূমিকা

২

লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের সনাতন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক জমিদারগোষ্ঠী নষ্ট হয়ে যায় এবং একদল অর্থগৃধ্নু জমিদার

৪ সংবাদপত্রের সেকালের কথা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৭৭, ১৮২

শ্রেণী গড়ে উঠে।* এই নব্যসৃষ্ট জমিদার-শ্রেণী রুচিতে অত্যন্ত স্থূল ছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে একদল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য, বেনিয়ানী কিংবা সওদাগিরি করে অনেক অর্থ উপার্জন করেন। ইংরেজিশিক্ষার মধ্যে বিশ্বজনীনতার স্বাদ পেয়ে তাঁরা স্বাভাবিক-ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁরা স্পষ্টই অনুভব করেন যে, ইউরোপীয় শিক্ষার প্রসার ঘটলে দেশবাসীর বন্ধনমুক্তি অচিরে ঘটবে। ফরাসী-বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে মানুষের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক নিপীড়নের অবসান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার অভ্রংলিহ মহিমা দেখে তাঁরা গভীরভাবে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবধারায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেন। জাতি জাগরণের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের ভূমিকাকে অভিনন্দিত করে 'বেঙ্গল হেরল্ড' উল্লেখ করেছিল,

"A class of society has sprung up in existence, that were before unknown, they are placed between aristocracy and the poor, and are daily forming a most influencial class···. It is a dawn of a new era. Wherever such an order of men have been created, freedom has followed their train. ·····These middle class of inhabitants of Bengal offered the most cheering indication of any that exists at the present moment."[৫]

* "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রীতি অনুসারে অনেক জমিদার বর্দ্ধিত হারে রাজস্ব দিতে না পারায় তাহাদের ভূসম্পত্তি নিলাম হইয়া যায় এবং কলিকাতার ধনশালী ব্যক্তিরা এই সমুদয় ক্রয় করায় এক নূতন জমিদার শ্রেণী গঠিত হয়। ইহারা জমিদারীর এলাকায় বাস করিতেন না, কলিকাতায় বাস করিয়াঃ কর্মচারী, দ্বারা কাজ চালাইতেন। অবশ্য প্রাচীন অনেক জমিদার বংশ টিকিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও অনেকে ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় বাড়ী নির্মাণ করিয়া বৎসরের বেশীভাগ কলিকাতাতেই থাকিতেন, মাঝে মাঝে জমিদারী দর্শনে যাইতেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারের আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক প্রতিপত্তি যথেষ্ট বাড়িল এবং বাঙ্গলাদেশে এক নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। কিন্তু প্রজাদের······অনেক কষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত।"—বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ): রমেশচন্দ্র মজুমদার। পৃ. ৩৯২-৩৯৩

৫ Bengal Herald—June 13, 1829.

অষ্টাদশ শতকের বিশ্বপরিবর্তনের ইতিহাস পাঠ করে এবং ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের রূপ দেখে তাঁরা এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও 'কলোনাইজেশনের' সমর্থন জানিয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর অর্থনৈতিকমান উন্নয়ন ও আত্মমর্যাদার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। ইউরোপীয় 'এনসাইক্লোপিডিষ্ট'দের যে বিজ্ঞান সাধনা, যুক্তিবিচারের দ্বারা শাস্ত্র ও নিয়ম রীতির পুনর্মূল্যায়ণ ও পরিপূর্ণ মানবহিতসাধন, তারই আদর্শে এঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন আপন ধর্ম ও সংস্কৃতির নবমূল্যায়ণ করতে। ভারতবর্ষের যা কিছু কল্যাণময় ও বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য, তাকে জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা আবিষ্কার করে তাঁরা কর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক ভাবধারা অনুশীলনে তাঁরা আশা করেন যে, ভারতবর্ষ জ্ঞানে ও সভ্যতায় উন্নত হয়ে ইউরোপের স্বাধীন রাষ্ট্রের গৌরবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এর জন্য প্রয়োজন ভারতবর্ষের সঙ্গে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের আত্মীয়তা স্থাপন। ইংরেজিভাষা অনুশীলনের মাধ্যমে এক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে এই মনোভাবনাতেই তাঁরা ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

"Among other objects, in our solemn devotion, we frequently offer up our humble thanks to God, for the blessings of British Rule in India and sincerely pray, that it may continue in its beneficial operation for centuries to come".[৬]

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রথম জাগ্রত পুরুষ রামমোহনের এই উক্তিতে একটি দূরদর্শী মনোভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। বাঙ্গালীর ধী-শক্তিকে শাণিত করে আপন স্বদেশ, স্বজাতি এবং স্বধর্ম সম্পর্কে এক নতুন মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যেই তিনি ইংরেজ শাসনব্যবস্থাকে কামনা করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষ অচিরেই স্বাধিকারঅর্জনের আত্মশক্তি সঞ্চয় করবে। তিনি তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা ও দেবদুর্লভ প্রজ্ঞাবলে দেশবাসীর চিত্তে একটি ভাব-সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই আদর্শের মধ্যে দেশবাসী তাদের যথার্থ পথ ও রাজনৈতিক মত প্রতিষ্ঠা করবে এ দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর ছিল।

৬ English Works of Rammohon Roy : Edited by J. C. Ghose (vol. p. 230

৩

রামমোহনের হাতেই বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচেতনা ও স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা হয়েছিল। তাঁর স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত-চেতনার শ্রীবৃদ্ধি, যুক্তি ও বিজ্ঞান-মনস্কতায় দেশীয় শাস্ত্রের নবমূল্যায়ণ ও হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার, মানবহিতবাদের প্রসার এবং ঐতিহাসিক জ্ঞান-ভাবনায় স্বাধিকার বাসনার উদ্বোধন। সেমেটিক মর্ত্যপ্রেম ও যুক্তিবাদ এবং নব্যইউরোপের মানবহিতবাদীচিন্তার বিস্তার এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা রামমোহনের স্বদেশপ্রেমকে তীব্রপ্রখর ক'রে তোলে। তাঁর স্বদেশপ্রেম ও সংস্কার-চিন্তাতে কোন সংকীর্ণতার ঠাঁই ছিল না। রামমোহনের চিন্তাতে 'Cosmic Consciousness' ও 'Social Consciousness'-এর এক স্বাভাবিক সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি জ্ঞান এবং কর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করে দেশের সঙ্কট মোচনে অগ্রণী হন। 'জন ডিগ্‌বী'র কাছ থেকে ইংরেজি পাঠ নেবার সময় তিনি ইউরোপের জাতীয়তাবাদীচিন্তার সংস্পর্শে আসেন।[৭] ইউরোপের বৃহৎ কর্মযজ্ঞের উত্তাপ তাঁকে স্বাধীনতাকামী ও স্বাধিকার বোধে উদ্দীপিত করে। কারণ এই সময়ে ইংরেজি সংবাদপত্রে পাশ্চাত্য দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে যে বিভিন্ন তত্ত্ব, চিন্তা ও সংবাদ প্রকাশিত হ'ত, তার মূল কথা ছিল মানুষের সকল স্তরে মুক্তিসাধনা। রামমোহনের বেদান্তধর্মী মোক্ষবাদীমন এই মুক্তি সংগ্রামকে স্বাভাবিকভাবেই অভিনন্দিত করে। রামমোহনের রাজনৈতিক অধিকারদাবী এবং সমাজ-সংস্কার-চেতনা বহুলাংশে পাশ্চাত্য দার্শনিক মন্তেস্কু ও বেন্থামের আদর্শ রীতি অনুসরণ করেছিল।* তিনি বিশ্বের সমস্ত

৭ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃ. ৩২

* "The Western political philosophers who seem to have influenced the mind of Raja were not Rousseau and Thomas Paine, but Montesquieu, Blackstone and Bentham. From Montesquieu's famous treatise on the "Spirit of the Law" (1748) he derived the ideas of the seperation of powers and of the Rule of Law both of which he emphasises again and again in all his writings. Bentham's "Fragment on Government" (1776) and the "Introduction to Morals and Legislation" (1789) had a real hold on the mind of the Raja. .... .The influence of Bentham probably led him to insist on the codification of civil and criminal law and to enunciate the principles of such codification. ......In the realm of social reform he was clearly influenced by the utilitarian theory."—['The Political thought of Raja Rammohan Roy'—By B. B. Mazumdar. p. 27]

মানুষের সহজাত অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। তাই উনিশ শতকের প্রথমদিকে ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, গ্রীস ও আমেরিকায় যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাকে তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্থন জানিয়েছিলেন। পশ্চিমী দেশগুলির গণতান্ত্রিক মুক্তিআন্দোলন একদিন ভারতবাসীকেও প্রভাবিত করবে এ নিশ্চিত বিশ্বাস তিনি মনে পোষণ করতেন। নেপলস্‌বাসীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পরাজয়বার্তা শ্রবণ করে তিনি মনঃকষ্টে মুহ্যমান হন। আপন মনোদুঃখের কথা ব্যক্ত করে তিনি 'বক্‌ল্যাণ্ড' সাহেবকে লিখেছিলেন যে, নেপলস্‌বাসীদের পরাজয় সাময়িক, কারণ, "Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately successful."[৮] স্বাধীনতাকামী গণআন্দোলনের পটভূমিতে রামমোহনের এই উক্তির গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যমণ্ডিত। এ ছাড়া তিনি ইংলণ্ডের 'রিফর্ম বিল' আন্দোলনের প্রতিও দ্বিধাহীন সমর্থন জানান।

রামমোহনের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে রাষ্ট্রচেতনাতে দীক্ষিত করা। এই মর্মে তিনি লেখেন,

"I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-divisions among them, has entirely deprived them of patriotic feelings, and the multitude of religious rites and ceremonies, and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise.... It is, I think, necessary that some change should take place, in their religion, at the least for the sake of their political advantage and social comfort."[৯]

রামমোহন প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ও সমাজ মুক্তিআন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক মুক্তিআন্দোলনের কোন পার্থক্য দেখতে পাননি। এবিষয়ে তাঁর চিন্তাদর্শ

৮ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত : নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃ. ৪১৮

৯ English works of Rammohan Roy (Panini Edition) p. 929-930.

ইতালী যোদ্ধা 'De Sanctis'-এর অনুরূপ ছিল।[১০] রামমোহন স্থির উপলব্ধি করেন প্রকৃত ধর্মচেতনা ভারতবাসীর জীবনানুভূতির সর্বস্তরে বিস্তৃত হয়ে আছে। তাই ধর্মসংস্কার এবং সমাজ পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়েই জাতির রাজনৈতিক ভাবনা ও স্বদেশপ্রেমের মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সেজন্য বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকেই তিনি ধর্মকে চেয়েছিলেন জীবনানুগ করতে। সমস্ত দেশবাসীকে বেদান্তের মোক্ষ বা মুক্তি আদর্শে দীক্ষিত না করলে তাদের রাজনৈতিক চেতনার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না, এই নিশ্চল বিশ্বাস নিয়েই তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকে লোকশিক্ষার্থে সুগম করে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বাদেশিকতার জন্য প্রয়োজন 'চিত্তশুদ্ধি'—আর ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মধ্যেই আছে জাতির সকল উন্নতির সুউচ্চ সোপান—একথা তিনি বহুবার বহুভাবে লেখনীতে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর 'ব্রহ্মসভা' ও 'আত্মীয়সভা' স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যও ছিল তাই। জাতিভেদ ও ধর্ম বিভেদ দূর করে কেবল প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতায় সকল সম্প্রদায়ের লোককে ঐক্যবদ্ধ করবার প্রয়াস এই সভাদ্বয়ের মধ্যে হয়েছিল। নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারেরা জাতীয় ঐক্যের যে শঙ্খনিনাদ করেছিলেন, তার প্রেরণাগত আদর্শটি প্রথম উৎসারিত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠানের 'ট্রাষ্টডীডের' মধ্যে।*

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ রামমোহনের দূরদর্শী চিন্তার অন্যতম ফলশ্রুতি। তিনি দেশবাসীর ভবিষ্যৎ পথ সম্পর্কে আর্ষোচিত ইঙ্গিত করেন। ইংরেজের শাসন ও ইংরেজি সভ্যতার প্রভাব যে আমাদের জাতীয় জীবনের মহাপরিবর্তন ঘটাবে, এ সত্য সর্বপ্রথমে রামমোহনের চোখে ধরা পড়ে। রামমোহন এই মহাসত্য আবিষ্কার করেন যে,

১০ Life of David Hare : Peary Chand Mitra, p. 129.

* "......that no sermon, preaching, discourse, prayer or hymns, be delivered, made, or used in such worship, but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue and strengthening of the bonds of union between men of all religious persuations, and creeds."

[মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত: আত্মীয় সভা ও ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা: নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৫১১]

এই নবসভ্যতার সাহায্যে ভারতবাসী শুধু আত্মরক্ষা নয়, স্বজাতির আত্মোন্নতি করতে পারবে। ইউরোপের মহামন্ত্র যে আমাদের যথার্থ সঞ্জীবনী মন্ত্র হবে এই বিশ্বাসই ছিল তাঁর সকল কথা, সকল ব্যবহারের অটল ভিত্তি।[১১] এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য ছিল,

"From personal experience, I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs..."[১২]

ইতিহাস ও বিজ্ঞানচেতনার সমৃদ্ধ চিন্তা ও মনন জাতির তামসিক চিত্তের সমস্ত অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলোয় চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে দিক, এই ছিল তাঁর মনের প্রকৃত বাসনা। রাজনৈতিকবোধ ও চেতনার বিকাশ এবং উন্মেষের জন্য প্রয়োজন জনশিক্ষা বিস্তার। আর সে শিক্ষাকে করতে হবে জীবন ও সমাজের পক্ষে একান্তভাবে কল্যাণকর। হিন্দুকলেজ স্থাপনের জন্য যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে আর বিদেশী 'ইউনিটেরিয়ান'দের কাছে তাঁর আবেদনের মূল কথা ছিল এটাই।[১৩]

স্বাদেশিকতার নান্দিক রামমোহনের পরিচয় তাঁর গণতান্ত্রিকচেতনার মধ্যেই নিহিত আছে। দেশবাসীর রাষ্ট্রিক অধিকার কায়েম করবার জন্য তিনি যে সমস্ত দাবী জানিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(ক) উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন প্রবর্তন এবং নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার দান।

(খ) বিচার বিভাগীয় সংস্কার ও জুরী ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(গ) রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ।

(ঘ) রাজকার্যে ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের সমান অধিকার দান।

(ঙ) ব্যবস্থা প্রণয়ন, রাজ্যশাসন ও বিচার বিভাগীয় স্বতন্ত্রকরণ।

(চ) শ্রমজীবী কৃষকদের ভূমির উপরে চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রদান এবং বহু সংখ্যক স্থায়ী সৈন্যের অনাবশ্যকতা।

(ছ) মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষা।

১১ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত : নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃ. ৩৮৫-৩৮৬

১২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত : নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃ. ৪১৯

১৩ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত : নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃ. ২০৫

মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রামমোহনের আন্দোলন বিশ্ববন্দিত। তিনি জনগণের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার জন্য দু'টি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন—বাঙ্গলা ভাষায় লেখা 'সম্বাদ কৌমুদী' ও ফারসী ভাষায় লেখা "মীরাৎউল-আখবার"। এই পত্রিকা দু'টির মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতির চরিত্র গঠন। দেশবাসী যাতে দেশী ও বিদেশী সংবাদপত্র পাঠ করে আপন দায়িত্ব ও অধিকারবোধে সচেতন হয়, তারই প্রয়াস চালিয়েছিলেন রামমোহন। উনিশ শতকের প্রথম দিকেই বাঙ্গলা সংবাদপত্র গণজাগরণের প্রধান ধারক ও বাহক হয়ে উঠে। ইংরেজ রাজপুরুষদের কাজের সমালোচনা প্রকাশ্যভাবে শুরু হয়ে যায়। ভারতীয়দের এই কাজকে শ্বেতাঙ্গ সমাজ খুব প্রীতির চোখে দেখেননি। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা জার্ণাল' অত্যন্ত উগ্রভাবে ইংরেজ আক্রমণ শুরু করলে অস্থায়ী গভর্ণর 'অ্যাডাম' সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করেন। সংবাদপত্র প্রকাশ ও পরিচালনাতে প্রশাসনিক শৃঙ্খল পরানো হয়েছিল।* রামমোহন এরূপ আইন মেনে নিতে চাননি। দেশবাসীর আত্মমর্যাদাবোধের উপর এই নিদারুণ অপমান তাঁর লেখনীকে করে তুলল ক্ষুরধার। তিনি গভর্ণর অ্যাডামের "প্রেস অর্ডিনান্স"-এর সমালোচনা করে প্রতিকারের জন্য বিলাতে 'প্রিভি কাউন্সিলে' আপীল করেন। এই আর্জিতে দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও চন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিরা স্বাক্ষর করেন। এই আবেদন লিপিকে অনেকে 'অ্যারিওপ্যাজিটিকা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকেই বাঙ্গলাদেশে যে সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়চেতনা গড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ হচ্ছে এই প্রতিবাদ পত্র। রামমোহনের এই প্রচেষ্টা বিলাতের 'House of Commons' সভায় অভিনন্দিত হয়। সংসদ সদস্য 'হিউম' প্রকাশ্যভাবে বলেন,

"The natives of India were hourly becoming more

---

* "আইনে এই নিয়ম হ'ল যে, কাগজ বের করার পূর্ব্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হ'তে লাইসেন্স বা অনুমতি নিতে হবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হলফ্ ক'রে সেই হলফ্‌নামা গভর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারীর নিকট পাঠালে তবে লাইসেন্স মিলবে। কোন কোন্ বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ তার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব্ব হ'তেই সম্পাদককে দিয়ে রাখা হ'ত। এ সব সত্ত্বেও আইন বিরুদ্ধ বিষয়ের আলোচনা থাকলে, কাগজ বন্ধ ক'রে দেওয়ারও ব্যবস্থা হ'ল।"
—মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ১৫

intelligent. As a proof of the fact, he wished gentlemen would read the address of Rammohan Roy, a learned native, in favour of free press."[১৪] কিন্তু রামমোহনের আবেদন যখন গৃহীত হল না, তখন তিনি এর প্রতিবাদে 'মীরাৎ উল আখবার' পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন এই বলে, "যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, কোন অনুগ্রহের আশায় তাকে দ্বারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।"[১৪(ক)]

রামমোহন দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তিকামনা করেছিলেন। ভারতবাসীর চিত্তঅসাড়তার মূলে যে অবিদ্যা আছে, তাকে তিনি যুক্তিবাদী-জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ইতিহাসচেতনার প্রসার ঘটিয়ে দূর করবার মহান ব্রত গ্রহণ করেন। কারণ তিনি পরিষ্কার জানতেন বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর মানসিক অপমৃত্যু ঘটেছে। বাঙ্গলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে সেমীয় শাসকদের আনুগত্যে দেশবাসীর দুর্বল, ভয়ার্ত ও দীনাবস্থা তাঁকে মনেপ্রাণে পীড়িত করেছিল। বিশেষভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে দেশের মধ্যে যে অরাজকতা, অবাধ লুন্ঠন, অপরিমেয় অত্যাচার এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতি দেখা দিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কারণ ইংরেজ রাজত্বের সূচনা, শাসনের নিয়মনীতিতে নিষ্ঠা, বাঙ্গালীর ছিন্নমূল জীবনে কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়ে আনে।* ইংরেজ

---

১৪ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া : প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পৃ. ২০

১৪(ক) সাহিত্য সাধক চরিতমালা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃ. ৫২

* The greater part of Hindustan having been for several centuries subject o Muhammadan Rule, the civil and religious rights of its original inhabiants were constantly trampled upon, and from the habitual oppression of he conquerors, a great body of their subjects in the southern Peninsula Dukhin), afterwords called Marattahs, and another body in the western arts now styled Sikhs, were at last driven to revolt; and when the Mussalnan power became feeble, they ultimately succeeded in establishing their ndependence; but the Natives of Bengal wanting vigour of body, and dverse to active exertion, remained during the whole period of the Iuhammadan conquest, faithful to the existing Government, although their roperty was often plundered, their religion insulted, and their blood wanonly shed. Divine Providence at last, in its abundant mercy; stirred ip the English nation to break the yoke of those tyrants, and to receive the ppressed Natives of Bengal under its protection." :

English Works of Rammohon Roy—p. 445-46

শাসনের প্রতি রামমোহনের যে অনুরাগ তাতে তাঁর জাগ্রত ইতিহাস-চেতনা ও প্রজ্ঞাবোধ একসঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে। তিনি কোনদিন শাসকবর্গের অন্ধ স্তাবকতা করেননি। জাতির আত্মমর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিগত স্বাভিমানকে তিনি কোনদিনই খর্ব করেননি। রামমোহন স্বদেশবাসীর চিত্তে স্বাদেশিকতার যে বীজ বপন করেছিলেন, তার সোনার ফসল ফলতে বেশী দেরী হয়নি। হিন্দুকলেজের ছাত্ররা একই সময়ে ইউরোপের ইতিহাস ও দর্শন পাঠ করে বাঙ্গলাদেশে প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করেছিলেন। এর মধ্যে রামমোহনের কর্মচিন্তাই তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছিল। রামমোহন জ্ঞান ও যুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে দেশবাসীর মুক্তির যে স্বপ্ন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, হিন্দুকলেজের বিপ্লববাদী ছাত্রদের চিন্তায় দেখা যায় তারই পূর্ণ প্রকাশ।

৪

হিন্দুকলেজ ও বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচেতনার উন্মেষ

রামমোহনের সমকালে হিন্দু কলেজের ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালীরা ইউরোপের যুক্তিবাদ ও ফরাসী বিপ্লবের স্বাধিকার বাসনার অগ্নিবাণীতে দীক্ষিত হয়ে উঠেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলাদেশে ফরাসী বিপ্লবের অনুকরণে এক জাতীয় অভ্যুত্থানের কল্পনা করেছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের 'হরকরা' পত্রিকায় এই মর্মে অনেকগুলি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। 'বেন্থামে'র জ্ঞানাত্মিকা রাজনৈতিক মতবাদ, 'আডামস্মিথে'র অর্থনৈতিক অনুভাবনা এবং 'টমাস পেইনের' যুক্তিবাদ তাঁদের রাজনৈতিক মতকে পুষ্ট করে তোলে। হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষক 'হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও'র সত্যনিষ্ঠ * ও

* "He used to impress upon them the sacred duty of thinking for themselves—to be in no way influenced by any of the idols mentioned by Bacon—to live and die for truth—to cultivate all the virtues shunning vice in every shape. He often read examples from ancient history of the love of justice, patriotism, philanthropy and self abnegation, and the way in which he set-forth the points stirred up the minds of his pupils. Some were impressed with the excellence of justice, some, with the paramount importance of truth, some, with patriotism, some, with philanthropy".—(from :—Life of David Hare : Peary Chand Mitra)

আপোষহীন যুক্তিবাদী স্বাধীন মতবাদ এবং ইতিহাসচেতনা তাঁদের মানস-বিপ্লবের পিছনে ইন্ধন জোগায়। সমকালীন খ্রীষ্টান মিশনারীরা বাঙ্গালীর এই নবচেতনার জলধিতরঙ্গকে প্রীতির চোখে দেখেননি। 'আলেকজাণ্ডার ডাফ,' প্রকাশ্যভাবে 'টমাস পেইনের', "Rights of Man" এবং "Age of Reason" পুস্তক দু'টিকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন,

"It was some wretched book-sellers in the United States of America—who basely taking advantage of the infidel learning of a new race of men in the East—despatched to Calcutta a cargo of that most malignant anti-christian publications. From one ship a thousand copies were landed and at first sold at a cheap rate of one rupee per copy ; but such was the demand, that the price soon rose, and after a few months it was actually Quintupled."[১৫]

আলেকজাণ্ডার ডাফের উষ্মাজনিত সমালোচনার মধ্যে বাঙ্গালীর চিত্ত-জাগৃতির পরিচয়টুকু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমরা দেখতে বা উপলব্ধি করতে পারি। সমকালে বাঙ্গালীর মধ্যে কেউ পেইনের, "Age of Reason" বঙ্গানুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন, এমন সংবাদও পাওয়া যায়। এই বঙ্গানুবাদ সম্ভবতঃ 'সমাচারদর্পণে' প্রকাশিত হয়েছিল।

ইয়ংবেঙ্গল যুবকেরা 'ডিরোজিও'র 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন্' থেকে রাজনৈতিক চিন্তার শিক্ষানবিশী শুরু করেছিলেন।* 'র‍্যাডিক্যাল'-দের রাজনৈতিক মতবাদ এবং ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'

---

১৫ India and Indian Mission : Dr. Alexander Duff, p. 105-106.

* অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন্ সম্বন্ধে বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল :

"About this time the lamented Henry Derozio by his talents and enthusiasm, by his unwearied exertions in and out of the Hindu College, by his course of lectures at Mr. Hare's School, by his regular attendance and exhortions at the weekly meetings of the Academic Institutions (Foot note :—A debating club over which H. L. V. Derozio presided for several years) and above all by his animating, enlightening and cheerful conversation had wrought a change in the mind of the native youth, which is felt to this day, and which will ever be remembered by those who have benefited by it."

(Quoted from :—History of Indian Social and Political Ideas : by B. B. Majumder, p. 51)

আদর্শের প্রতি এই তরুণ শিক্ষকের ছিল গভীর মানসসংযোগ ও আন্তরিক সহানুভূতি। জাতিতে ফিরিঙ্গী হয়েও ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি হিসেবে তিনিই প্রথম বন্দনা করেছিলেন,[১৬] এবং শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদানের সুযোগে বাঙ্গালীর চিত্তে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার বীজও রোপণ করেন। তাঁর সত্যাশ্রয়ী জীবন সাধনার সংস্পর্শে এসে হিন্দুকলেজের ছাত্ররা প্রত্যয়নিষ্ঠ, সত্যান্বেষী ও সত্যকাম হয়ে উঠেছিল।[১৭] ডিরোজিওর শিক্ষানিকেতনে ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় নানাবিষয়ক আলোচনার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনাও মর্যাদার সঙ্গে স্থান পেত।[১৮] ডিরোজিওর সুগভীর দেশাত্মবোধ এবং রাজনৈতিক মনোবাসনা সমকালীন ইউরোপের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনকে সমর্থন করে প্রকাশ্য বক্তৃতায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর অন্তরালে তিনি আপন স্বদেশবাসীকে অনুরূপ জাতীয় অভ্যুত্থানের অনুরাগী হতে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন।* হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ফরাসী আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় বহন করে। হিন্দুকলেজের ছাত্ররা ইতিহাসবোধে অনুপ্রাণিত হয়েই সুগভীর মননশক্তির অধিকারী হন। তাঁরা প্রত্যেকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনতত্ত্ব গড়ে তোলার দিকে স্ব-স্ব শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন বলে সুতীব্র বিরোধ জেগে উঠে হিন্দুসমাজ ও রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সঙ্গে। নব্যবঙ্গীয় যুবকেরা দৃঢ়ভাবে হিন্দুধর্মের প্রচলিত

১৬ 'Faquir of Jangira'—By Henry Vivian Derozio, p—113.

১৭ "The conduct of the students out of the college was most exemplary and gained them the applause of the outside world, not only in a literary or scientific point of view, but what was of still greater importance, they were all considered men of truth. Indeed, the college boy was a synonym for truth, and it was a general belief and saying amongst our countrymen, which those that remember the time must acknowledge that 'such a boy is incapable of falsehood because he is a college boy"—হরমোহন চট্টোপাধ্যায়।—নবযুগের বাংলা: বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ ৫৯-৬০

১৮ History of the Freedom Movement in India : (vol I)—R. C. Majumdar p. 288

* "The practical effect of the political teachings of Derozio may be illustrated by two incidents. On 10 December, 1830, 200 persons attended the July Revolution celebration in the Town Hall. On Christmas day of the same year the tricolour flag of the French Revolution was hoisted on the Ochterlony Monument, and it is not difficult to guess, by whom." —History of the Freedom Movement in India : (Vol. I), By R. C. Majumdar, p. 288-89

আচার-অনুষ্ঠান, জাতিবিচার ও প্রথানুগত শাস্ত্র নিয়মনীতিকে অস্বীকার করেছিলেন; আর তার পরিবর্তে কামনা করেছিলেন সর্বভূতে সাম্য, মৈত্রী-ভাবনা, ঐক্যবোধ এবং শোষণহীন, উৎপীড়নহীন সমাজব্যবস্থা। তাঁরা ধর্মকে বিচার ও বিশ্লেষণে মানবায়িত করেন। ইতিহাসের অনুক্রমকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তাঁরা ধর্ম ও সমাজতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা' সভার আলোচিত বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস আলোচনার প্রাধান্যই এই বিষয়ের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।[১৯] নব্যবঙ্গীয় যুবকেরা ইতিহাসানুরাগ, বিশুদ্ধযুক্তিবাদ ও পর্যবেক্ষণ রীতিতে সমাজের পরিবর্তন, মানুষের নৈতিকসংস্কারসাধন এবং স্বাধিকারচেতনা বিস্তারে উদ্যোগী হ'য়ে উঠেন। ইতিহাসবিচিন্তা ও বিচারের বিস্তার ঘটিয়েই তাঁরা বাঙ্গালীর স্বাদেশিকতার শ্রীবৃদ্ধি চান। তাঁদের প্রকাশিত পত্রিকা, 'পার্থেনন', 'এনকোয়ারার' এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতির মধ্যে রাজনৈতিক চর্চার যে ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তাতে ইতিহাস সাধনার পূর্ণাঙ্গ বিকাশই পরিস্ফুট হতে দেখি। নব্যবঙ্গীয় যুবকেরা ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা সমরের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্সের 'জুলাই বিপ্লব' ও ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের 'ফরাসী বিপ্লবের' মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক অনুভূতি বিস্তার লাভ করেছিল তার সম্পর্কেও বিশেষ কৌতূহলী হ'য়ে উঠেন। এ ছাড়াও গ্রীস, ইতালী ও আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামও তাঁদের চিত্তকে মাতিয়ে তোলে। ইউরোপে উনিশ শতকের প্রথমদিকে যে সমস্ত জাতীয়তা-বাদী সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তার মূল কথা ছিল—গণতান্ত্রিকচেতনার বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সমতা রক্ষা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই এই সকল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিশ্বের জাতীয় হিতবাদী বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবেই তাঁরা বাঙ্গলাদেশে অনুরূপ অভ্যুত্থান কামনা করেছিলেন। তাই স্বাভাবিক কারণে ইয়ংবেঙ্গল দলের অনেকেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন নীতিকে সমর্থন না করে তীব্র সমালোচনায় আক্রমণ করেছিলেন। আর এরই ফলে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে' আবার নতুন করে সনন্দ দেওয়া হল, তখন তাঁরা ঔপনিবেশিক শোষণবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন কলকাতার টাউন হলে। ইয়ংবেঙ্গল

১৯ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী পৃ. ১১৬

দলের রাজনৈতিক মনোবাসনার প্রকাশ এই সনন্দ সমালোচনার মধ্যে স্থান পেয়েছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য নীতি লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বিলেতী পণ্যদ্রব্যে দেশীয় বাজার ভরে উঠল আর ব্যবসায়ের জন্য কোম্পানীর সমস্ত ঋণ চাপান হল ভারতবর্ষের উপর। এর আগে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা হরণ করে জাতির যে ব্যক্তিস্বাধীনতা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তার প্রত্যাহারের কোন উল্লেখই ছিল না এই নতুন সনন্দে। ভারতবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে কোন সুস্থির পরিকল্পনা এতে গ্রহণ করা হয়নি। রসিককৃষ্ণ মল্লিক এই সনন্দের অগণতান্ত্রিক ধারাগুলির কঠোর সমালোচনা করেন। জাতীয়হিতবাদী বাঙ্গালীর সঙ্গে সঙ্গে অনেক ইউরোপীয় এই সনন্দ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন 'থিওডোর ডিকেন্স' নামে একজন বিশিষ্ট ইংরেজ। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার সম্পর্কে বাঙ্গালীর মতামত রসিককৃষ্ণের সমালোচনার মুখেই প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনার স্বার্থে তাঁর বক্তব্যের বিশেষ বিশেষ অংশ নেওয়া হ'ল:

"···আমি খুব যত্ন সহকারে এ আইন পাঠ করেছি।······এর ধারাগুলি দ্বারা মোটেই ···উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।······এ আইনের মূলগত উদ্দেশ্যই হচ্ছে—'স্বার্থ'। এ আইন ভারতবর্ষের উপকারের জন্য বিধিবদ্ধ হয়নি।······কোটি কোটি ভারতবাসীর মঙ্গলের কথা মোটেই আইন-কর্তাদের মনে স্থান পায়নি। ···আমরা একেই অত্যধিক ঋণভারে প্রপীড়িত, এর উপর পার্লামেণ্ট আবার এই অতিরিক্ত ব্যবসাগত ঋণের বোঝা আমাদের স্কন্ধে চাপিয়েছেন।··· ··যদি আমাদের শুভই বিবেচনা করা হ'ত তা হ'লে লবণ ও আফিমের ব্যবসায়ে কোম্পানীর একচ্ছত্র অধিকার বিলুপ্ত হ'ল না কেন? ···শিক্ষা সম্বন্ধে একটি কথাও সংযোজিত হয়নি। সামরিক ও বে-সামরিক কর্ম্মচারীদের জন্য দু'টি বিশপের পদ সৃষ্টি করা হ'ল, কিন্তু ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হল না! এ অবস্থায় আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই?···"[২০]

নব্যবঙ্গীয় যুবকেরা ধূলিধূসর প্রাচীন শাস্ত্রকে যেমন যুক্তিবাদের সাহায্যে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছিলেন, তেমনি বিশুদ্ধ হেতুবাদের সাহায্যে জাতির বস্তুগত প্রয়োজনের দিকটাও করেছিলেন বিচার। আধুনিক রাষ্ট্রচেতনার মূল

২০ মুক্তির সন্ধানে ভারত (৩য় সংস্করণ): যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ৩৪-৩৭

লক্ষ্য দেশ ও কাল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অর্থ নৈতিক সমতা বিধান, বিভিন্ন মতবাদে শ্রদ্ধা, স্থির বিচার বুদ্ধি এবং বাস্তবচেতনালব্ধ সমাজ হিতৈষণা—এই সমস্ত গুণগুলি একত্রযোগে তাঁদের জীবনানুভাবনাকে একান্তভাবে করে তুলেছিল স্বাদেশিক। তাই এ তথ্য বিচারে রসিককৃষ্ণের বক্তৃতা নব্যবঙ্গীয় যুবকদের স্বদেশপ্রীতির অন্যতম নিদর্শন।

রামমোহনের বিলাত যাবার পর থেকে বাঙ্গালীর স্বাধিকার বোধ বিকশিত হতে শুরু করলেও, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' (Reformer) পত্রিকা (১৮৩১)-এর আগেই অনেক রাজনৈতিক অধিকারদাবীমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে জাতির মুক্তিপিপাসাকে জাগিয়ে তুলছিল। 'রিফর্মার' সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল,

"This paper assumed a tone of opposition to the Government, published articles on the abstract rights of the people of India as members of a great polity and proposed a constitution combining Indian oligarchy with republicanism as a panacea for all its ill."[২১]

'রিফর্মার' পত্রিকার রাষ্ট্র সংগঠন পরিকল্পনাকে ইংরেজ পাদ্রী "আলেকজাণ্ডার ডাফ" সহ্য করতে পারেননি। তিনি বাঙ্গালীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিকচেতনাকে আক্রমণ করে লেখেন,

"In politics the Reformer at first assumed a tone of rancorous and undiscriminating violence towards the British Government,—outdoing the wildest flights to which ultra-radicalism has ever soared in this land. A nondescript species of native oligarchy and republicanism combined, was the panacea proposed for remedying all the ills of India. It was thus unskillful and injudicious enough to attempt the erection of towers and palaces out of the surrounding rubbish by beginning at the top of the intended edifice—forcing a poor blinded ignorant, priest-ridden race, to listen to weekly orations on their abstract

২১ Modern India and the West—L. S. S. O.: Malley (Edited) p. 88

rights and privileges, as a member of a great social polity before they were capacitated to comprehend one jot or title of their individual rights as man."[২২]

কিশোরীচাঁদ মিত্রের "Hindu Theophilanthropic Society" (১৮৪১)-তে বিভিন্ন সমাজসংস্কারমূলক আলোচনার মধ্যেও রাজনৈতিক পর্যালোচনা বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে স্থান পেত। তাঁদের রাষ্ট্রচিন্তার মূল কথা ছিল :

"One of the best means of regenerating and elevating India is to give her political justice—to free her from political disabilities under which she labours—to render the path of political distinction accessible to her children—to give them a share in the administration of this country, by levelling that distinction of covenanted and uncovenanted service, which a blind self interest has up reared, by annihilating the aristocracy of skin and recognizing merit and not complexion as worthy of reward."[২৩]

স্বদেশপ্রীতি ও রাজনৈতিকচেতনার বিস্তারে ইয়ংবেঙ্গল যুবকদের প্রয়াস ছিল নিরলস। ইংরেজি শিক্ষার যুক্তিবাদী আলোকে তাঁদের চিত্তের অমানিশার অন্ধকার কেটে যায়। রাষ্ট্রনৈতিক দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা ইংরেজ বিরোধিতার কোন পরিচয় না দিলেও, জাতীয় হিতাদর্শের প্রতি তাদের নিষ্ঠা ছিল অত্যন্ত গভীর। এর ফলে বণিক সরকারের প্রতিটি কর্মকে তাঁরা সমালোচনা অথবা আলোচনা করতে কোন ক্ষেত্রেই সংশয় বোধ করেননি। ইংরেজ রাজত্বকে তাঁরা কোনদিনই প্রীতির চোখে দেখেননি। নব্যবঙ্গীয় যুবকদের লেখাতে যেটুকু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তা-ভাবনা ফুটে উঠেছিল তাতেই ফিরিঙ্গী সমাজ আতঙ্কিত হয়েছিল। তাঁদের আতঙ্কিত মনের পরিচয় আমরা উদ্ধৃতিহিসেবে বহুবার গ্রহণ করেছি।

ইংরেজ বণিকদের নিয়মিত নির্দয় শোষণ, বিচার ব্যবস্থাতে বর্ণবৈষম্য ও জীবনের নিরাপত্তাতে যখন অনিশ্চয়তা দেখা দিল ; তখন থেকেই ব্রিটিশ

২২ Calcutta Review, 1845—Rev T. Smith

২৩ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া : প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পৃ. ২৫-২৬

রাজত্বের প্রতি বাঙ্গালীর মোহভঙ্গ হতে শুরু করল। শাসকের সঙ্গে শাসিতের প্রকাশ্যভাবে বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল। শিক্ষিত বাঙ্গালী রাজনৈতিক চেতনা বিস্তার ও স্বাধিকারবাসনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্র পরিচালনা করতে লাগলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রিক সভাসমিতি স্থাপন করে তাঁরা সকলে অধিকার ও মর্যাদা কায়েম করার ব্রত নিলেন। বাঙ্গলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্র প্রকাশ হতে শুরু করল। 'রামমোহনের' আশা, 'ডিরোজিওর' স্বপ্ন এবং 'ডেভিড হেয়ারের' কর্ম এতদিনে বাস্তবে রূপায়িত হতে শুরু করল।

বাঙ্গলা সংবাদপত্রে রাজনৈতিক আন্দোলন

রামমোহন সংবাদপত্র পরিচালনা করে বাঙ্গালীকে প্রথম উদ্বোধিত করেছিলেন রাজনৈতিক চেতনায়। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের স্বদেশপ্রীতি যে অনেকাংশে সাংবাদিক লক্ষণাক্রান্ত ছিল, তা আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে উপলব্ধি করতে পারি। রামমোহনের সময়ে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী 'The Quill' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করে গভর্ণমেণ্টের রাজকার্যের দোষগুণ বিচার করতেন।[২৪] মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা (১৮৩৫) ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলাদেশে সংবাদপত্র জগতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর কথায়,

"নূতন নূতন সংবাদপত্রসকল দেখা দিতে লাগিল; নবপ্রাপ্ত স্বাধীনতার ভাব সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের মনে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা ও কার্য্যে এক নূতন তেজস্বিতা প্রবিষ্ট করিল; এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকর কার্য্যের উৎসাহ যেন দশগুণ বাড়িয়া গেল। সেই নব উৎসাহ ও নব উত্তেজনাতে ডিরোজিওর শিষ্যদল নানা বিভাগে নানাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।"[২৫]

রামগোপাল ঘোষ, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস পাল, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট স্বদেশপ্রেমিক সাংবাদিকগণ বাঙ্গলা সংবাদপত্র পরিচালনা করে দেশবাসীকে রাষ্ট্রিক সচেতন করতে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম

২৪ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া: প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৩০

২৫ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ১৪৯

করেছিলেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' (১৮৩৯), 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (১৮৪২), 'সমাচার সুধাবর্ষণ' (১২৬২ বঙ্গাব্দ), 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) প্রভৃতি সাময়িকীতে ইংরেজ শাসনে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং সরকারী কাজ-কর্মে ভারতীয়দের উপেক্ষা এবং সর্বপ্রকার অসহযোগিতা জাতির চিত্তে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক মত-বাদ প্রকাশিত হত। অবশ্য এই সময়ে কোন পত্রিকাতে উগ্র ইংরেজবিদ্বেষ মনোভাব প্রকাশ পায়নি। সমকালে শিক্ষিত লোকেদের রাজনৈতিক চেতনা প্রধানতঃ বিভিন্ন দাবীদাওয়া আদায় ও জাতিসংগঠন পথেই অগ্রসর হয়েছিল। দেশবাসী যাতে স্বদেশের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে আপন অধিকার ও মতবাদকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সেই মর্মেই সংবাদপত্রাদিতে রাজনৈতিক আলোচনা চালান হত। বিভিন্ন সাংবাদিকেরা বণিক সরকারের কাছে আবেদননিবেদনে যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তদের অর্থনৈতিক দুর্দশা মোচন, (২) দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার (৩) ব্রিটিশ উপনিবেশে কুলি পাঠানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন (৪) রাজকার্যে ভারতীয়দের সমান অধিকার প্রদান।[২৬]

তবে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার স্বর ছিল খুব কড়া। এই পত্রিকাতে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার ও শোষণ নীতির বিরুদ্ধে তীব্র মতবাদ প্রকাশিত হত। সম্পাদক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য সহনশীল রাজানুগত্য প্রকাশ করতেন বটে, তবে ফিরিঙ্গী বণিকদের অত্যাচার ও অনাচারকে কোন দিন প্রশ্রয় দেননি। তিনি 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ও 'সিপাহী বিদ্রোহকে' সমর্থন না করলেও, বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে দেশের জনজীবনে যে বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল তার কারণ হিসেবে ইংরেজ সরকারকে দায়ী করেন। একবার তিনি অত্যন্ত শ্লেষের সঙ্গে লেখেন :

"এ দেশীয় লোকেরা আর ব্রিটিশ প্রতারণায় ভ্রান্তি যুক্ত হইবেন না, পূর্ব্বে যে সকল মহামহিমেরা শ্বেতজাতিকে কৃতজ্ঞ বলিয়া বিপদ সময়ে নানা মতে সাহায্য করিয়াছিলেন গৌরাঙ্গেরা তাঁহাদিগের সেই উপকারের প্রত্যুপকার

---

২৬ বেঙ্গল স্পেক্টেটর—মে, ১৮৪২

স্বরূপে সেই ২ সরলাত্মাদিগকে অশেষ প্রকারে নির্য্যাতন করিবায় অন্যান্য লোকেরা সতর্ক হইয়াছেন, এইক্ষণে রাজপুরুষেরা সাহায্য প্রাপ্তে আর্তনাদ করিলে কি হইবে, তবে ক্রোধ শোধ নিমিত্ত প্রজাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিবেন কিন্তু তাহাতেও যে তাঁহারা ফল পাইবেন এমত বোধ হয় না, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টই বা প্রজাদিগের উপর নির্দ্দয়তা করণের কি বাকি রাখিয়াছেন? প্রতারণা পূর্ব্বক দিন ২ ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া প্রজার ধন অপহরণ করিতেছেন, ভারতবর্ষজাত উত্তমাধম সকল বস্তুই স্বদেশে লইয়া যাইতেছেন, এদেশীয় প্রজারা যে খাদ্যাভাবে কত কষ্ট সহ্য করিতেছেন রাজপুরুষেরা তাহা দেখিয়াও অন্ধের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন, এতকাল উচ্চ সুদি কাগজ দ্বারা অসংখ্য ধনী মনুষ্যকে দরিদ্রতার অধীন করিয়াছেন, প্রজাদলন যাহাকে বলে আমাদিগের রাজ্যেশ্বরেরা তাহা করিতে কোন প্রকারেই ত্রুটি করিতেছেন না, ইহা অপেক্ষা প্রজাদলন আর কাহাকে বলা যায়? রাজা প্রজাদিগের নিকটে শঠতাপূর্ব্বক ধনাপহরণ কার্য্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যেরূপ সুনিপুণ হইয়াছেন পৃথিবীর কোন অংশে এতদ্রূপ সুদক্ষ রাজা আছেন কিনা আমরা বলিতে পারি না, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যদিও ডাকাইতদিগের ন্যায় দলবল সহিত প্রজাদিগের গৃহে যাইয়া অর্থ লুণ্ঠন করেন না, তথাচ তাঁহারা গৃহে বসিয়া প্রতারণা দ্বারা যেরূপ অর্থ হরণে পটু হইয়াছেন তাহাতে তস্করেরাও তাঁহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে, গৌরাঙ্গদিগের অপার লীলা বর্ণন করিতে হইলে আমাদিগের কাষ্ঠ লেখনীও পরাজয় স্বীকার করিয়া বর্ণপ্রসবে অক্ষম হইবেক, অতএব আমরা অদ্য বর্ণপ্রসবিণীকে বিশ্রাম দিলাম…”[২৭]

ইংরেজ বিদ্বেষের অপর এক চিত্র দেখতে পাই—‘সমাচার সুধাবর্ষণে।’ ফিরিঙ্গী শোষণনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অর্জনের মনোবাসনার সুস্পষ্ট চিহ্ন এই পত্রিকার একটি কবিতার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির কিয়দংশ উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হ’ল ঃ

“উঠ হিন্দু বীরগণ।২
রাক্ষস হইতে দেশ করহ রক্ষণ॥
যায় রাক্ষসে লইয়া।২
ইউরোপে যাত্রা করে সাগর বাহিয়া॥

২৭ সম্বাদ ভাস্কর—সম্পাদকীয় : ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭

কেন দ্রব্য মহামূল্য ।২
হিন্দুস্থানে যথাভূমি ফসলা অতুল্য ॥
অনাহারে প্রাণ যায় ।২
ঘটিয়াছে দেশে বুঝি মন্বন্তর দায় ॥
যার বহুধন আয় ।২
সুখেতে আছয়ে যারা কি দুঃখ বা পায় ॥
কিন্তু দেখ চক্ষু তুলি ।২
স্বর্ণ বঙ্গদেশে দেখি হইয়াছে ধূলি ॥
দেখ জাহাজ সম্বাদ ।২
তবে তো জানিবে কত ঘটেছে প্রমাদ ॥
ভাগ্যে ভীত হিন্দুগণ ।২
তাহাতেই রাক্ষসের এত আয়োজন ॥
এসো যতেক পাণ্ডব ।২
ভারতের শত্রুদের কর সবে শব ॥
যদি থাকিত সাহস ।২
তবে কি এমন দুঃখে হৈত কেহ বশ ॥
অন্য কি কহিব আর ।২
লহ স্বদেশীয়গণ দুঃখিদের ভার ॥"[২৮]

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতেও দেশবাসীর নানা দুর্দশার কথা প্রকাশিত হয়েছিল। বিশেষভাবে নীলকরদের অত্যাচারের নানা করুণ কাহিনী তাঁরা ভয়হীন চিত্তে প্রকাশ করতেন। "বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা"—প্রবন্ধে ইংরেজ রাজত্বে দেশের সাধারণ ব্যক্তি ও কৃষকদের কি রকম দুর্দশা ঘটেছিল, তারও ছবি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজ রাজত্বে নানাবিধ স্থূল উন্নতির সঙ্গে দেশের যে চরম সর্বনাশ ঘটেছিল তারই এক প্রকৃষ্ট ছবি তাঁরা এঁকেছিলেন। আমাদের আলোচনার প্রয়োজনার্থে প্রবন্ধটির বিশেষ বিশেষ অংশ উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করব। প্রবন্ধটির প্রকাশ কাল শ্রাবণ ১৭৭৮ শক।

"...বহু প্রকার বাহ্যশোভা ও বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আপাততঃ অনেকেরই মনে হইতে পারে যে অধুনা বঙ্গভূমি বিশেষ

২৮ সমাচার সুধাবর্ষণ—১৭ই পৌষ, ১২৬২ বঙ্গাব্দ

সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছে।...জরাগ্রস্ত জীর্ণ শরীরকে উৎকৃষ্ট ভূষণে সুসজ্জিত করিলে তাহার যাদৃশ শোভা প্রকাশ পায়, বর্ত্তমান বাহ্য শোভা দ্বারা বঙ্গদেশেরও তাদৃশ অবস্থা হইয়াছে।...বর্ত্তমান বঙ্গবাসী লোকের দুঃখরাশি বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। যথার্থরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে কি বৈষয়িক সুখ, কি মানসিক শান্তি, কি শারীরিক স্বচ্ছন্দতা বর্ত্তমান বঙ্গবাসী লোক ইহার কোন সুখেই প্রকৃতরূপে সুখী নহে।... যদি চিরাধীনত্বকে সম্পদ বলিয়া গণনা করা সঙ্গত হয়, যদি অনসনাবস্থায় দিন যাপন করাকে উন্নতির লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হয়, এবং যদি মুমূর্ষু অবস্থাকে সম্পদের সময় বলিয়া মনে করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান বঙ্গবাসী লোককেও সুখী ও সম্পদশালী বলিয়াও মনে করিতে পারা যায়।"[২৯]

নিজেদের দাবী-দাওয়া ও প্রয়োজন তুলে ধরার ব্যাপারে বাঙ্গলা-দেশের সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এদেশের পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব ও মতামতের মূল্যবোধ সম্পর্কে বণিক সরকারকে সচেতন করে দিয়ে পাদ্রী লঙ ইণ্ডিগো কমিশনের সামনে এক ঐতিহাসিক বিবৃতি দিয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার রাজ্য শাসন ব্যাপারে যেন এদেশীয়দের মত ও মন্তব্যকে উপেক্ষা না করে, সে বিষয়ে সচেতন করাই তাঁর বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলেন,

"Madras and Bombay, like Calcutta have newspapers in English conducted by natives, advocating the views of natives. The influence is radiating downwords. The substance of those papers and pamphlets in English are being communicated orally or by means of translations to the masses of people.

The Vernacular press is rising into great importance as a genuine exponent of native opinion and it is to be regretted that the European community pay so little regard to its admonitions and warnings."[৩০]

২৯ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাঃ পৃ. ১৮০-১৮১।

৩০ **Indigo Commission Report : June 12, 1860.**

স্বাধিকার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার খুবই প্রশংসাযোগ্য। যদিও এই সহনশীল মনোভাবের অন্তরালে পাদ্রী লঙের আতঙ্ক অবিমিশ্র আছে। জাতীয়চেতনা ও স্বদেশ-প্রেম বিস্তারে ভারতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা স্বীকার করে 'জন ক্রুস নর্টন' যা মন্তব্য করেছিলেন তাও এ বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লেখেন,

"As a whole, the Press in India is conducted with singular ability ; and it is astonishing to mark the giant strides with which it has advanced within last few years."[৩১]

বাঙ্গালীর স্বাদেশিকচেতনা ক্রমশঃ সংবাদপত্রাশ্রয়ী হয়ে উঠেছিল ; পরবর্তী আলোচনা থেকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

রাষ্ট্রীয় সভার উৎপত্তি ও বিকাশ

৬

দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা যখন আপন অধিকার ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন, তখন তাঁরা ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বাদেশিকভাবনা ও অখণ্ড জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে স্থাপন করলেন নানা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রীয় সভা। দেশবাসীর অর্থনৈতিক দুর্দশা দূরীকরণ ও রাজকার্যে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের স্বপক্ষে প্রধানতঃ আন্দোলন চালিয়েছিলেন এই রাজনৈতিক সমিতিগুলি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙ্গলাদেশে যে কয়েকটি রাজনৈতিক সমিতি গড়ে উঠে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

(ক) বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা। (১৮৩৬)

(খ) ভূম্যধিকারী বা জমিদার সভা। (১৮৩৮)

(গ) বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। (১৮৪৩)

(ঘ) ন্যাশন্যাল অ্যাসোসিয়েসন বা দেশহিতৈষিণী সভা। (১৮৫১)

(ঙ) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন বা ভারতবর্ষীয় সভা। (১৮৫১, ২৯শে অক্টোবর।)

৩১ The Rebellion in India : John Bruce Norton, p. 197

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা :—

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী. দ্বারকানাথ ঠাকুর, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামলোচন ঘোষ প্রভৃতি রামমোহনের মানস শিষ্যেরা 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর প্রধান খ্যাতি।[৩২] রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই এই সভার কাজকর্ম পরিচালিত হ'ত। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করবার আয়োজন দ্রুত শুরু হলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে, 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিলেন। স্বভাবকবি ঈশ্বর গুপ্ত এবং 'সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়' পত্রিকার সম্পাদক—হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন। তবে এর আয়ুষ্কাল ছিল অত্যন্ত সীমিত। 'ব্রহ্মসভা' ও 'ধর্মসভা'র পরস্পর বিবাদের জন্য 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'র পরিসমাপ্তি অচিরেই ঘটেছিল।

ভূম্যধিকারী বা জমিদার সভা :—

'ভূম্যধিকারী বা জমিদার সভা' প্রকৃত জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়েছিল। থিয়োডোর ডিকেন্স, জর্জ প্রিন্সেপ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজনারায়ণ রায়, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, আশুতোষ দেব, রামরত্ন রায়, রামকমল সেন, মুন্সী আমীর, সত্যচরণ ঘোষাল ও রাধাকান্ত দেববাহাদুর প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কেবল ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষা নয়, রায়তদের দাবী যাতে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে বিবেচিত হয়, তারও প্রয়াস এই সভা চালিয়েছিল। জাতি-বর্ণ-দেশ নির্বিশেষে সকলকে গ্রহণ করবার পরিকল্পনাও ছিল এতে। রাজনৈতিক-চেতনা বিস্তার ও বিভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য অনেক জেলাতেও এই প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপন করা হয়েছিল। দেশের মাটির সঙ্গে সংযোগ রেখে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা ও দুর্দশা দূর করার প্রয়াসের মধ্যেই আছে 'ভূম্যধিকারী সভা'র প্রকৃত পরিচয়।* এই সভার অন্যতম সমর্থক উইলিয়াম অ্যাডাম বিলাতে ভারতীয়-

৩২ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া : প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ২৬-২৭।

* "It may be regarded as the pioneer of freedom in this country. It gave to the hope the first lesson in the art of fighting constitutionally

দের কল্যাণ ও রাজনৈতিক সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৩৯) স্থাপন করেছিলেন। একই উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাডভোকেট' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। এই মর্মে তাঁর বিশেষ সহযোগী ছিলেন বিখ্যাত বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষ। তিনি অ্যাডামের কাজের সুবিধার জন্য যে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করেছিলেন, তাদের মধ্যে, **'Real state of the Police and the means of improving it'** এবং **'Akbari system—its uses and abuses'** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।†৩৩

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি :—

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাতে যান, তখন সেখানে অ্যাডামের মধ্যস্থতায় জর্জ টমসনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। নিগ্রোদের মুক্তিসংগ্রামে টমসন আন্দোলন চালিয়ে মানবহিতৈষী রূপে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ভারতবর্ষে নিয়ে এলে দেশবাসীর মুক্তিবাসনা ও স্বাধিকার সংগ্রাম আরও ক্ষিপ্র হয়ে উঠবে, এই মনোভাবেই দ্বারকানাথ তাঁকে সঙ্গে করে এদেশে নিয়ে আসেন।

o assert their claims, and give expression to their opinions. Ostensibly, it advocated the rights of the Zaminders, but as their rights are intimately bound up with those of the ryots, the one cannot be separated from the other." :—Raja Rajendralal Mitra's speeches : Edited by, Jogeshwar Mitra, p. 28.

† "The plans which I have been lately maturing in conjunction with Mr. Adam or rather his direction and advice......I had several interviews with him previous to his departure, and his earnest proposal was that we might set about collecting information which should guide the public and public measures. Our Government being so apathetic here, the best plan would be to transit these informations to Mr. Adam in England, which would bring them prominently forward in London press and arouse the attention of English public to Indian subjects......Mr. Adam will not lay the information before the English public as his own but he will distinctly tell how and in what manner it comes to his hand."—"A Project for Political Agitation in England with the Assistance of Mr. Adam"—Vide, R. G. Sannyal's—Bengal Celebrities. P. 174.

৩৩ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া : প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ২৮।

রাজনৈতিক-চেতনা বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে টমসনের আগমন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হিন্দুকলেজের ছাত্ররা তাঁকে নিয়ে ভাবাতিশয্যে মেতে উঠলেন। যদিও নব্যবঙ্গীয যুবকেরা বাঙ্গলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, বিভিন্ন সভা-সমিতি স্থাপন ও পত্র-পত্রিকা পরিচালনা করে শুরু করেছিলেন ; কিন্তু তাতে প্রত্যয়ের কঠোরতা ও অভিজ্ঞতার গভীরতা ছিল না। টমসন এই অভাবটি মোচন করেছিলেন। তাঁর আগমনে বাঙ্গালীর মধ্যে কেমন রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিচয় আছে শিবনাথ শাস্ত্রীর বর্ণনাতে। তিনি বলেছেন,

"জর্জ টমসন্ এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। যেমন চুম্বকে লোহা লাগিয়া যায় ; তেমনি রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি জর্জ টমসনের সহিত মিশিয়া গেলেন। নানাস্থানে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা হইয়া অবশেষে কলিকাতার ফৌজদারী বালাখানা নামক স্থানে একটি ভবনে টমসনের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। এরূপ বাগ্মিতা এদেশে কেহ কখনও শুনে নাই। সেই সময়ে বালাহিসারে ইংরাজদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীরামপুরস্থ মিশনারি সম্পাদিত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক একবার লিখিলেন—"এখন দুই দিকে ঘন ঘন কামানের ধ্বনি হইতেছে। পশ্চিমে বালাহিসারে ও পূর্ব্বে ফৌজদারী বালাখানাতে।" বাস্তবিক জর্জ টমসনের বক্তৃতা সামরিক তোপধ্বনির ন্যায় উন্মাদকারিণী ছিল।"[৩৪]

টমসনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে স্বাধিকার অর্জনের দাবি সুস্পষ্ট হয়ে না উঠলেও, একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা তিনি এ দেশে প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রিক ভাবনার প্রধান কথা ছিল,

"Fulfil your duty to your country, sympathise with the victims of oppression, send in your representation in their behalf. Knock at the door for justice. Knock again and again, harder and harder."[৩৫]

৩৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ১৫৩।

৩৫ Speeches by George Thomson : Edited by Jogeshwar Mitra, (1895) pp. 1-2.

টমসনের বক্তৃতার উন্মাদিনী রূপ প্রত্যক্ষ করে ফিরিঙ্গিগণ বিশেষ বিচলিত হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার ফলশ্রুতিতে রুষ্ট হয়ে লর্ড এলেন বুরো দ্বিধাহীন-ভাবে বলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা এদেশবাসীকে প্রকাশ্যভাবে করে তুলেছে 'Copyists and mob-orators'।[৩৬] ইয়ংবেঙ্গল যুবসম্প্রদায় রাজনৈতিক-চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইংলণ্ডের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির' অনুকরণে কলকাতাতে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন করেন। রামমোহন রায়ের মানসশিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী এই সংগঠনের প্রধান কর্তা ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলটি 'চক্রবর্ত্তী ফ্যাকসন' (Chakraborty Faction) নামে অভিহিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী আদালত ও পুলিশ আচরণ সম্পর্কে সমালোচনা করলে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। 'ইংলিশ ম্যান' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার বিরূপ ও বিদ্বেষপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। স্বদেশ কল্যাণের ইচ্ছা এইভাবে নানা বাধা ও বিরোধের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছিল। জমিদার সভার মধ্যে উচ্চবিত্তশালী ব্যক্তিদের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু ইয়ং বেঙ্গল দলের রাষ্ট্রিক সমিতিতে মর্যাদা পেয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নবলব্ধ যুক্তিবাদ, মানবপ্রেম ও তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি। ঠিক এই সময়ে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন সাহেব মফঃস্বলবাসী ও ইউরোপীয়দের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারসাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে খসড়া প্রণয়ন করেছিলেন, তাকে কেন্দ্র করে দেশে রাজনৈতিক ঝটিকা প্রবাহিত হয়। ইংরেজরা এই আইনকে 'কালা আইন' (Black Act) বলে অভিহিত করে তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। সরকার পক্ষের অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে বাঙ্গালীর নবজাগ্রত রাজনৈতিক অনুভাবনা আহত হয় এবং অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠে। রামগোপাল ঘোষ, 'A few Remarks on Certain Draft Acts, Commonly called Black Acts' নামে পুস্তিকাখানি যখন প্রকাশ করলেন, তখন ইউরোপীয় সমাজ তাঁর এই স্বাধীন চিন্তাকে সমর্থন করতে পারেনি। তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে 'Agri-Horticultural Society' এর সহকারী সভাপতির পদ থেকে বিচ্যুত

৩৬ বেঙ্গল স্পেক্টেটর : ১লা নভেম্বর, ১৮৪৩।

করেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত ভারতবাসী ও ইংরেজদের মধ্যে একটি বিশেষ স্তরে যে ক্ষীণ সৌহার্দ্যপ্রীতির সম্পর্ক ছিল, তাতে ফাটলের সৃষ্টি হ'ল।

ন্যাশন্যাল অ্যাসোসিয়েসন বা দেশহিতৈষিণী সভা :—

দেশবাসীর রাজনৈতিক অনুভাবনা এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে, এইকালে অপর একটি রাষ্ট্রিক সভা জাতির প্রয়োজনের স্বার্থে গড়ে উঠে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ 'দেশহিতৈষিণী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। জাতির সর্ববিধ কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার মূলকথা ছিল,

"It is resolved that a society be formed under the designation of the 'National Association' for the purpose of adopting measure which may contribute to the welfare of the country. ··· That by the help of this association we may be able to assert our legal rights by legitimate means, it is resolved to apply for any amendments or reform, as the case may be, either to the Local Government or to the authorities in England."[৩৭]

সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে, এই রাষ্ট্রিক সভার নামকরণে সর্বপ্রথম 'ন্যাশনাল' কথাটি যোগ করা হয়েছিল। তবে এর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ ছিল না। তবুও জাগ্রত মৈত্রীভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ঐক্য ও দেশপ্রেমের রাখী এই সমিতি সকলের হাতে বেঁধে দিয়েছিল।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন বা ভারতবর্ষীয় সভা :—

'দেশ হিতৈষিণী সভা'র অব্যবহিত কাল পরেই বাঙ্গলাদেশে 'ভারতবর্ষীয় সভা' বা 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন' নামে অপর একটি রাজনৈতিক সমিতি গঠিত হয়। ভূস্বামী সম্প্রদায়ের 'জমিদার সভা' এবং ইয়ং বেঙ্গল দলের 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' মিশে গিয়ে এই রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে। হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল নেতা রাধাকান্ত দেববাহাদুর আর বেদান্ত

---

৩৭ দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী : পৃ. ১০৭।

প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হলে, সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মধ্যে 'ধর্মসভা' ও 'ব্রহ্মসভার' বিরোধিতা দূর হয়ে যায় এবং বাঙ্গালীর স্বাদেশিক হিতবাসনা এক যৌথ প্রচেষ্টার মধ্যে অগ্রসর হতে থাকে। এর ফলে 'ভারতবর্ষীয় সভা'র রাজনৈতিক চিন্তাধারা একটি বিশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গে বিকাশমুখী হয়। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত মনীষিগণ সংযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, আশুতোষ দেব ও রামগোপাল ঘোষ। এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল,

"The great aim and object of this Association shall be to promote the improvement and efficiency of the British Indian Government by every legitimate means in its power, and thereby to advance the common interests of Great-Britain and India, and ameliorate the condition of the native inhabitants of the subject territory."[৩৮]

'ভারতবর্ষীয় সভা' ছিল ভারতের সংগঠনপন্থী রাজনৈতিক-চেতনা বিস্তারের সূতিকাগার। পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক আন্দোলন বিশালাকৃতি ধারণ করে চতুর্দিকে বিস্তারিত হয়েছিল, তার কোরকটি বিকশিত হয়েছিল 'ভারতবর্ষীয় সভা'র মধ্যে। 'ব্লাক-অ্যাকট' সমর্থনের ভিতর দিয়ে ভারতবাসীর সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক দাবি জেগে উঠে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই চিন্তার উদ্যোক্তা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দেশবাসীর সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে 'ভারতবর্ষীয় সভা'র শাখা স্থাপন করেন। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এরূপ একটি রাজনৈতিক সংস্থা 'কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠানের পঁয়ত্রিশ বছর আগেই শাসনক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনের দাবি তুলেছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন সনন্দ পাবার আগে এই সভা ভারতের নানা স্থানে শাখা স্থাপন করে দেশ শাসনে সুব্যবস্থা ও দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য একটি প্রস্তাব পার্লামেন্টে পেশ করেছিল। এই আবেদনপত্রে

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ৫৮-৬০।

লেখা হয়, "They cannot but feel that they have not profited by this connection with Great Britain to the extent which they had a right to look for."[৩৯]

বাঙ্গালীর এই মোহভঙ্গ থেকেই স্বাদেশিক চিন্তা পূর্ণ প্রতিশ্রুতিতে পরবর্তীকালে অগ্রসর হতে থাকে। ইংরেজরা প্রথম থেকেই এদেশে নিরঙ্কুশ শোষণ ও নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছিল। ফলে কোম্পানী রাজত্বের প্রতি যে অনুরাগ কয়েকজন বাঙ্গালী নেতা দেখিয়েছিলেন, তা ধীরে ধীরে শূন্যে বিলীন হয়ে যায়*। এইরকম এক বিষাদ চেতনা থেকে 'ভারতবর্ষীয় সভা'র সভ্যরা অবিচারের প্রতিকার প্রার্থনা করেছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ বিশবছর থেকে হ্রাস করে দশবছরে আনা, বিলাতে 'ট্রেড অব কণ্ট্রোলে'র বিলোপ, কোম্পানীর 'ডিরেক্টর সভা'র সম্প্রসারণ, বাঙ্গলাদেশকে প্রত্যক্ষভাবে 'বড়লাটে'র অধীনে না রেখে 'ছোট লাটের' শাসনাধীনে রাখা, শাসন ও বিচার বিভাগকে পৃথগীকরণ, রাজস্বের গুরুভার লোপ, ইংরেজ বণিকসম্প্রদায়ের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে প্রজাদের প্রাণ ও ধনসম্পদের রক্ষার ব্যবস্থা, কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য বিলোপ ও দেশীয় শিল্পরক্ষা এবং উন্নতি ও সম্প্রসারণ, শিক্ষাসংস্কার, সিবিল সার্ভিস পরীক্ষাতে ভারতীয়দের অধিকতর সুযোগ দান প্রভৃতি নানা দাবি জানান হয়েছিল তাঁদের 'পিটিশন' পত্রে। কালক্রমে, 'ভারতবর্ষীয় সভা' নতুন সনন্দ অনুযায়ী বে-সরকারীভাবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দায়িত্বশীল বিরোধী দলরূপে কর্মভার

৩৯ পত্রটি Proceedings of the Madras Branch of the British Indian Association and of Deccan Association (London, Mitchel Printing (1852) এ সম্পূর্ণ মুদ্রিত আছে এবং 'The Rise and Growth of the Congress in India' Andrews and Mukherjee থেকে উদ্ধৃত। পৃ. ১০৫-১০৬।

* প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিম্নলিখিত দুইটি উক্তি, সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মানসিক রূপান্তরের কথাচিত্র হিসাবে নেওয়া চলে :—

(ক) "If we were to be asked, what Government we would prefer, English or any other, we would one and all reply, English by all means, ay, even in preference to a Hindu Government."

(খ) "They have taken all which the Natives possessed; their lives, liberty, property and all were held at the mercy of Government."—India Gazette, vide : History of Political Thought in India, by B. B. Mazumdar, p. 186-87 & 193.

গ্রহণ করেছিল। আইন পরিষদে গৃহীত বিল সম্পর্কে তাঁরা নিঃসংশয় চিত্তে মতামত দিতেন। আইনগুলির মধ্যে যে গুলিতে জাতির স্বার্থ রক্ষিত, তাকে তাঁরা যেমন সমর্থন করতেন, তেমনি অন্যদিকে দেশবাসীর স্বার্থপরিপন্থী বিষয়গুলির বিপক্ষেও তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাতেন। 'ভারতবর্ষীয় সভা' নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই সময়ে ইংরেজগণ বে-সরকারীভাবে মফঃস্বলে নীলচাষ ও অন্যান্য শিল্পের জন্য অন্যায় পথে জমি ক্রয় করতেন। শ্বেতাঙ্গদের বিচারের ভার ফৌজদারি আদালতে না থাকায় ইংরেজ বণিকদের অত্যাচার সাধারণ মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। রায়তেরা অত্যাচার ও উৎপীড়নে ক্লান্ত হয়ে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। এতদিন পর্যন্ত নীলকরদের অত্যাচার বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও সর্বশ্রেণীর মানুষের সমর্থন পায়নি। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সর্বপ্রথম ফিরিঙ্গী নীলকরদের অত্যাচারের কথা জনসম্মুখে তুলে ধরে। কালক্রমে, 'সংবাদ-প্রভাকর' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেও এই অত্যাচার কাহিনী পরিবেশিত হয়েছিল। নীলকরদের অত্যাচারের সংবাদ পাঠ করে শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি 'পীকক্' মফঃস্বলের দেওয়ানী আদালতগুলির মত ফৌজদারী বিচারালয়গুলিতেও ইংরেজদের বিচার করবার ক্ষমতা প্রদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আইনের খসড়াটি পরিষদে উপস্থাপিত হলে ইউরোপীয় সমাজ প্রতিবাদে চঞ্চল হয়ে উঠেন, এবং কলকাতার 'টাউন হলে' সমবেত হয়ে বিষোদ্গার করেছিলেন। যে সমস্ত সমিতি এ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কলকাতার 'চেম্বারস্ অব কমার্স', 'ট্রেডস্ অ্যাসোসিয়েসন' ও 'ইণ্ডিগো প্লাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েসন' উল্লেখযোগ্য। এদেশ-বাসীও ইংরেজদের সম্মানহানিকর আচরণকে মেনে নিতে রাজি হননি। নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রায় ১৮০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র বিলাতের 'কোর্ট অব ডিরেক্টারস' সমীপে পেশ করা হয়। বাঙ্গালীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা ফলবতী না হলেও এর মধ্যে যে এক গণতান্ত্রিক চেতনা দানা বেঁধে উঠেছিল তা অনস্বীকার্য। 'ভারতবর্ষীয় সভা'র সভাপতি রাধাকান্ত দেববাহাদুর বিচারপতি 'পীকক্' সাহেবের খসড়াটিকে 'শুভ্র আইন' বলে অভিহিত করে যথাযথ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

অবশ্য রাজনৈতিক-চেতনা বিস্তারে 'ভারতবর্ষীয় সভা' আনুগত্য নীতিকেই গ্রহণ করেছিল। পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা তাঁরা তোলেননি। জাতীয়তাবোধকে সর্বপ্রকার সামাজিক হিতকর্মে নিয়োজিত করতে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন বেশি। এরই জন্যে তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করতে পারেননি। মনেহয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের জীবনের অনিশ্চয়তা ও যন্ত্রণার কথা তাঁরা বিস্মৃত হতে পারেননি। কয়েকটি সমাজসংস্কার আন্দোলনের সাফল্য, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে স্থির-সুনিশ্চিত নিরাপত্তা, তাঁদের পরিপূর্ণভাবে বিদ্রোহী করে তোলেনি। তা ছাড়া সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁদের ধারণাও খুব সুস্পষ্ট ছিল না ; অনেকে সেমীয় অত্যাচারের পুনরুত্থানের আশঙ্কাও করেছিলেন।

ইংরেজ সরকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইতিহাসচেতনা সমৃদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামকে অত্যন্ত কঠিন প্রচেষ্টা এবং কৌশলের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেননি। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে তঁারা অনেক অপপ্রচার চালিয়েছিলেন। আতঙ্কগ্রস্ত ইংবেজগণ জানতেন, যদি শিক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষুরধার মসীর সঙ্গে সিপাহীদের অসির সংযুক্তি ঘটে, তবে ভারতে তাঁদের আয়ুষ্কাল অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়বে। ইংরেজদের এই আতঙ্কের কথা ধ্বনিত হয়েছিল 'ইণ্ডিগো কমিশনে'র সামনে সাক্ষ্যদান কালে পাদ্রী লঙের মুখে। যা হোক, 'ভারতবর্ষীয সভা' সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন না করলেও ইংরেজ এই রাজনৈতিক সমিতিকে খুব প্রীতির নজরে দেখেননি। উপরন্তু 'ভারতবর্ষীয় সভা' দেশে যে জাতীয় ঐক্য ও গণসংহতি প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাকে তাঁরা বিশেষভাবে ত্রাসের চোখেই দেখেন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বাঙ্গালীর স্বাদেশিক ভাবনা

৭

বিভিন্ন রাজনৈতিক সভার স্বাদেশিক আন্দোলনের সমকালেই বাঙ্গলা-দেশে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়েছিল। দুই বিপরীত সংস্কৃতির সংঘাতই বাঙ্গালীর মানস বিপ্লবের অন্যতম কারণ। পাশ্চাত্যদেশের বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদীজ্ঞান আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বাঙ্গালীকে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে। রামমোহন ছিলেন এই মনোভাবনার প্রথম

পুরুষ। অপর পক্ষে বাঙ্গলাদেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায় দেশের প্রাচীন নিয়ম-নীতির স্বাভাবিক অনুবর্তন চেয়েছিলেন। একদিকে প্রগতিশীল দলের 'ব্রহ্মসভা' ও অপর দিকে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের 'ধর্মসভা', এই দুইটিকে কেন্দ্র করে ধর্মনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তাতে বাঙ্গালী প্রথমদিকে সংশয়ের নাগরদোলার ঘূর্ণিপাকে আন্দোলিত হয় অত্যন্ত গভীরভাবে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হলে দেশ-বাসীর সমস্ত সংশয়ের সমাধান হয় এবং জাতির সাংস্কৃতিক অনুভাবনা প্রত্যয়ের রশ্মিজালে বিভাসিত হয়ে উঠে। তিনি প্রতীচ্যের বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মিকা মতবাদ অপেক্ষা প্রাচ্যের ভক্তিবাদকে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাদর্শে যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদ এক স্বাভাবিক সমন্বয়সূত্রে বাঁধা পড়েছিল। 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয় তত্ত্বে' দেবেন্দ্রনাথ আপন স্বাদেশিক চিন্তাকে সংহত করেন। ইয়ংবেঙ্গল যুবকদের উন্মার্গগামী মতবাদ, স্বার্থান্বেষী মিশনারীদের বলপূর্বক ধর্মান্তীকরণের প্রচেষ্টা, হিন্দুদের মধ্যে পরস্পর ধর্মবিবাদ, যখন দেশবাসীকে সংশয়ান্বিত করে তুলেছিল, তখন দেবেন্দ্রনাথ মুক্তবুদ্ধিতে হিন্দুধর্মকে মানব প্রকৃতির আচরণগত বিচারাসনে স্থাপন করে দেশবাসীকে সংকট থেকে ত্রাণ করেছিলেন। তিনি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্মকে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ শুদ্ধা ভক্তিবাদে প্রকাশ করে সমগ্র ভারতে ঐক্য বিস্তার ও স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন।* দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তিবাদের সঙ্গে প্রাচীন বৈদান্তিক চিন্তার সমন্বয় ঘটেছিল বলে বাঙ্গালী শিক্ষানীতি, সমাজ ও ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে এক কল্যাণময় সত্যপথের ইঙ্গিত পেয়েছিল। এতে ভক্তিবাদী ও যুক্তিবাদী উভয় সম্প্রদায়ই আত্মস্থ হয়ে আপন ধর্মের মূল্যবোধ উপলব্ধি করে ও জীবনের উপর দৃঢ় আস্থা ফিরে পায়। আর তাতেই দেশবাসীর চিত্ত স্বদেশাভিমুখী হয়। দেবেন্দ্রনাথের শুচিশুভ্র ভক্তিতত্ত্ব বাঙ্গালীর চিত্তে মানবিকতার কূলভাঙ্গা স্রোত প্রবাহিত করেছিল বলে স্বদেশপ্রেমিক স্বভাব কবি ঈশ্বরগুপ্ত, বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত, মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর, রাজনীতিক ও বাগ্মীপ্রবর

* "যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্ব্বেকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে।"—

আত্মজীবনী : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১০৬।

রামগোপাল ঘোষ, নিষ্ঠাবান হিন্দু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং স্বদেশহিতৈষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সকলেই তত্ত্ববোধিনী সভার ঘাটে তাঁদের জীবনচিন্তার সোনার তরীখানি নোঙর করেছিলেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) এই সমস্ত স্বাদেশিক মনীষীদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়েছিল। দেশবাসীর মধ্যে স্বাদেশিকচেতনা কি ভাবে উদ্বোধিত করা যায়, সে সম্পর্কে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হত। দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিবাদী জ্ঞানাত্মিকা রচনা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহাভারতের অনুবাদ এবং বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ সম্পর্কীয় নানা সামাজিক নিবন্ধ, অক্ষয়কুমার দত্তের গাণিতিক চিন্তা সমৃদ্ধ বস্তুসচেতন রচনা ও মানব-হিতবাদী আস্তিক্য মতবাদ, যা বাঙ্গালীকে আপন সংস্কৃতি সম্পর্কে একনিষ্ঠ করেছিল, তার পাশে জাতীয় ভাবোদ্দীপক রচনাগুলির মূল্য ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনার স্বার্থে একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ গ্রহণ করা হল।

"...স্বদেশানুরাগ না থাকিলে স্বদেশের হিত সাধন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আনন্দের বিষয় এই যে এক্ষণে আমাদিগের দেশীয় লোকের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। এই স্বদেশানুরাগ যতই বৃদ্ধি হইবে ততই তাহাদিগের দ্বারা স্বদেশের উপকার সাধন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ভারতের উদ্ধার কেবল এই স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে। এই স্বদেশানুরাগ দ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকদিগের যতই ঐক্য সূত্রে বদ্ধ করা যাইবে ততই ভারতের উন্নতি সাধন হইবে।"[৪০]

'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' বাঙ্গালীর তনু-মন-চরিত্র গঠন করে। ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর অনুশীলন, বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ক বিভিন্ন ধর্মালোচনা, জ্ঞানতত্ত্ব সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রের প্রগতিমূলক আলোচনা দেশবাসীকে স্বদেশের প্রাণসত্তার সঙ্গে একাত্ম করেছিল। এর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত হয়েছিল মাতৃভাষার সচেতন অনুশীলন ও প্রসার পরিকল্পনা। দেবেন্দ্রনাথের এই সমস্ত প্রয়াস বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে বিজাতীয় প্রভাব থেকে রক্ষা করেছিল। এমনকি সে সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সভার মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী আপন জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যে সচেতন হয়ে উঠছিল, তারও উৎসভূমি ছিল দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। যতদিন না 'তত্ত্ববোধিনী সভা'

৪০ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : স্বদেশানুরাগ—আশ্বিন, ১৭৯৮ শক, ৩৯৮ সংখ্যা।

তার ত্রি-মুখী (জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম) সাধনায় জাতির সাংস্কৃতিক চেতনাকে সংহত করে 'যুগমন' সংগঠনে সক্ষম হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত বাঙ্গালীর রাজনৈতিক বাসনাও ক্ষিপ্রতা অর্জন করেনি।[৪১]

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমর্থন করতে না পারলেও এই সেনা বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই তাঁদের ইংরেজ রাজত্বের প্রতি স্বপ্নভঙ্গ শুরু হল। ইংরেজদের ক্রমাগত অত্যাচারের নারকীয় উল্লাস বাঙ্গালীকে যুগপৎ হতভম্ব ও বিস্মিত করেছিল। ইংরেজি শিক্ষা জাতির চিৎ-বৃত্তিকে শাণিত করলেও, জীবনের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন ভরসা দিতে পারেনি। শাসকের নিদারুণ শোষণ নীতিতে যে অর্থ নৈতিক দুর্দশা ইংরেজ রাজত্বের সূচনাকাল থেকে নিম্ন সম্প্রদায়কে রিক্ত করেছিল, তাও পরিশেষে উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীকে করল আচ্ছন্ন। উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোবেদনার কথা রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন :

"বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে রাজ্যবিষয়ক অবস্থা সন্তোষজনক নহে।···সেকালের বাঙ্গালীরা তাহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন—তাঁহারা ত ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিতেন না। তাঁহারা রাজ্যতত্ত্ব তত সূক্ষ্মরূপে বুঝিতেন না।······এই সকল কারণে তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে নানা কারণে চতুর্দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না। আমরা গভর্ণমেণ্টের দোষ সকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদের হাত-পা বাঁধা, সে সকল দোষ সংশোধন বিষয়ে আমাদের কোন কথাই চলে না।"[৮২]

অক্ষয়কুমার দত্ত ইংরেজদের প্রজাদলন নীতিকে সমালোচনা করে লেখেন :

"ইংরেজেরা অধর্ম সহকারে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, এবং অধর্ম সহকারে শাসন করিয়া আসিতেছেন।······তাঁহারা ভারতভূমি অধিকার করিয়া প্রজাদিগের সহিত ন্যায় বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছেন।"[৪৩]

এই মোহভঙ্গের ফলেই উচ্চ ও নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তাগত

৪১ বাঙ্গালার ইতিহাস : ভূদেব মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় অধ্যায়।

৪২ সেকাল ও একাল : রাজনারায়ণ বসু, পৃ. ১৪০।

৪৩ ধর্ম-নীতি : অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃ. ৩০-৩১।

পার্থক্য দূর হয়ে যায়। নিম্ন সম্প্রদায় কোনদিনই বিদেশী শাসকবর্গকে প্রীতির চোখে দেখেনি। ফিরিঙ্গী রাজত্বের সূচনাকাল থেকেই তারা বিশেষভাবে নির্যাতীত হয়েছিল। এখন উচ্চ সম্প্রদায় উপলব্ধি করতে পারলেন ইংরেজের মূল নীতিকে আর এর ফলে জাতীয় আন্দোলন এক-মুখীনতা লাভ করল। সিপাহী বিদ্রোহোত্তর পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা হল এটাই। এই জাতীয় ঐক্যের জন্যই নীলচাষকে কেন্দ্র করে বাঙ্গলাদেশে সর্বস্তরে এক সম্মিলিত প্রতিবাদ হয়েছিল সোচ্চারিত। অবশ্য এর সঙ্গে সমকালে ইউরোপে বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কাহিনী বাঙ্গালীকে স্বদেশ সম্পর্কে অধিকতর-সচেতন করে।

বাঙ্গালীর চিত্তে স্বদেশপ্রেমের ভাব-ভাবনা, বাঙ্গলা কবিতাতেই প্রথম দেখা দিয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকরে' স্বাদেশিকতার সাংবাদিকতা করেছিলেন। তাঁর পত্রিকা ছিল স্বদেশী শিক্ষার একটি বড় পাঠশালা। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নাট্যকার মনোমোহন বসু তাঁর হাতেই স্বদেশ-প্রেমের 'হাতে খড়ি' নিয়েছিলেন। তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' শিখদের স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা করে লিখেছিলেন,

"শীক দিগকে বিদ্রোহী শব্দে বাচ্য করা কর্তব্য নহে, যাহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষণার্থ অস্ত্রধারণ করে, তাহাদিগের সাধুবাদ দেওয়া উচিত, তাহারা পুত্তলিকাবৎ রাজা দলিপ সিংহের রাজ্য রক্ষণার্থ যত্নযুক্ত নহে, কিন্তু পরাধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করণার্থ উপযুক্ত প্রযত্ন এবং প্রয়াস প্রকাশ করিয়াছে।"৪৪

ঈশ্বর গুপ্তের চারটি স্বদেশ হিতবাদী কবিতা 'মাতৃভাষা', 'স্বদেশ', 'ভারতের অবস্থা', 'ভারতের ভাগ্যবিপ্লব' বাঙ্গলাদেশে প্রথম উদ্বোধনী স্বাদেশিক সংগীত।* তাঁর স্বদেশপ্রেমকে মর্যাদা দিয়ে পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র এক স্মরণীয়-মন্তব্য করেছেন:

"মহাত্মা রামমোহনের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র

৪৪ সংবাদ প্রভাকর: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ৬ই এপ্রিল, ১৮৪৯।

* "প্রকৃতির পূজা ধর পুলকে প্রণাম কর
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষত নিজ দেশে প্রীতি রাখ সবিশেষে
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে॥

মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালাদেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী।"[৪৫]

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধ ছিল ইতিহাস চেতনাশ্রয়ী। তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বাঙ্গলাসাহিত্যের দেশাত্মবোধের উদ্দীপনায় লিখিত প্রথম পূর্ণ কাব্য গ্রন্থ।* 'শূর সুন্দরী' ও 'কাঞ্চী কাবেরী' কাব্য গ্রন্থদ্বয়ে ভারতের নরনারীর বীরত্ব, সতীত্ব ও সংগ্রামকৌশলের অন্তরালে দেশপ্রেমের বাণী এবং আদর্শকেই জাতির চিত্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐতিহাসিক নাটক রচনাতে পরাধীনতার বেদনাকে

ইন্দ্রের অমরাবতী ভোগেতে না হয় মতি
স্বর্গভোগ উপসর্গ যার।
শিবের কৈলাসধাম শিবপূর্ণ বটে নাম
শিবধাম স্বদেশ তোমার॥" —(স্বদেশ)

অথবা,

"জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্ম্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানাহত
মিছে কেন মর ভার বয়ে?"

—(ভারতের ভাগ্যবিপ্লব)

৪৫ ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী ও আলোচনা: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বসুমতী সংস্করণ।

* "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়। ...
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার॥"

—(পদ্মিনী উপাখ্যান)

আরও বাস্তববায়িত করেছেন। রঙ্গলালের স্বাদেশিক আদর্শের কথা বিচার করে বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছিলেন :

"আমার বোধহয় পদ্মিনী উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্ব প্রথমে জাতীয় স্বাধীনতার বাণী উদ্গীরিত করিয়াছিলেন। রাজপুত ও মুসলমানদিগের যুদ্ধের একটি ঘটনা লইয়া এই কাব্য রচিত হয়। রাজপুত দেশপ্রেমের উহা একটি গৌরব স্তম্ভ-স্বরূপ। ...গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে নব্য বাঙ্গালা রঙ্গলালের উদ্দীপনাময় কাব্য হইতে জাতীয় স্বাধীনতার নূতন মন্ত্র গ্রহণ করিল।"[৪৬]

এই সমস্ত কাব্য কবিতাতে স্বদেশের প্রতি মমতা ও পরাধীনতার জন্য আত্মগ্লানি প্রকাশিত হলেও জাতির অর্থনৈতিক দুর্দশার আর্তি কোথাও প্রকাশ পায়নি। এর আবেদন সমাজের নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যের নাট্যশাখাতেই বাঙ্গালীর জীবন-যন্ত্রণা সর্বপ্রথম বাণীরূপ পেয়েছিল। বিদেশী শাসকশ্রেণীর অত্যাচারে জীবনের মাধুর্য কিভাবে নষ্ট হয়ে যায়, পরাধীনতার আত্মগ্লানিতে প্রতিবাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে জীবনকে করাল কৃষ্ণ করে দেয়, এবং সেই নিদারুণ জীবন-যন্ত্রণার মধ্যে একটি জাতীয় সংহতি অমিত প্রত্যয়ে নিটোল হয়ে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে ; জাতীয়তাবাদের এই পরিচয়টি প্রথম 'নীলদর্পণ' নাটকে রূপায়িত হয়। বাঙ্গালীর পরাধীনতার বেদনা ও প্রতিবাদ বাস্তবরূপে দীনবন্ধুর চিন্তাতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। স্বাদেশিক ভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে 'নীলদর্পণ' নাটক এক অনন্য গৌরবের অধিকারী।

৪৬ সাহিত্য ও সাধনা : বিপিনচন্দ্র পাল।

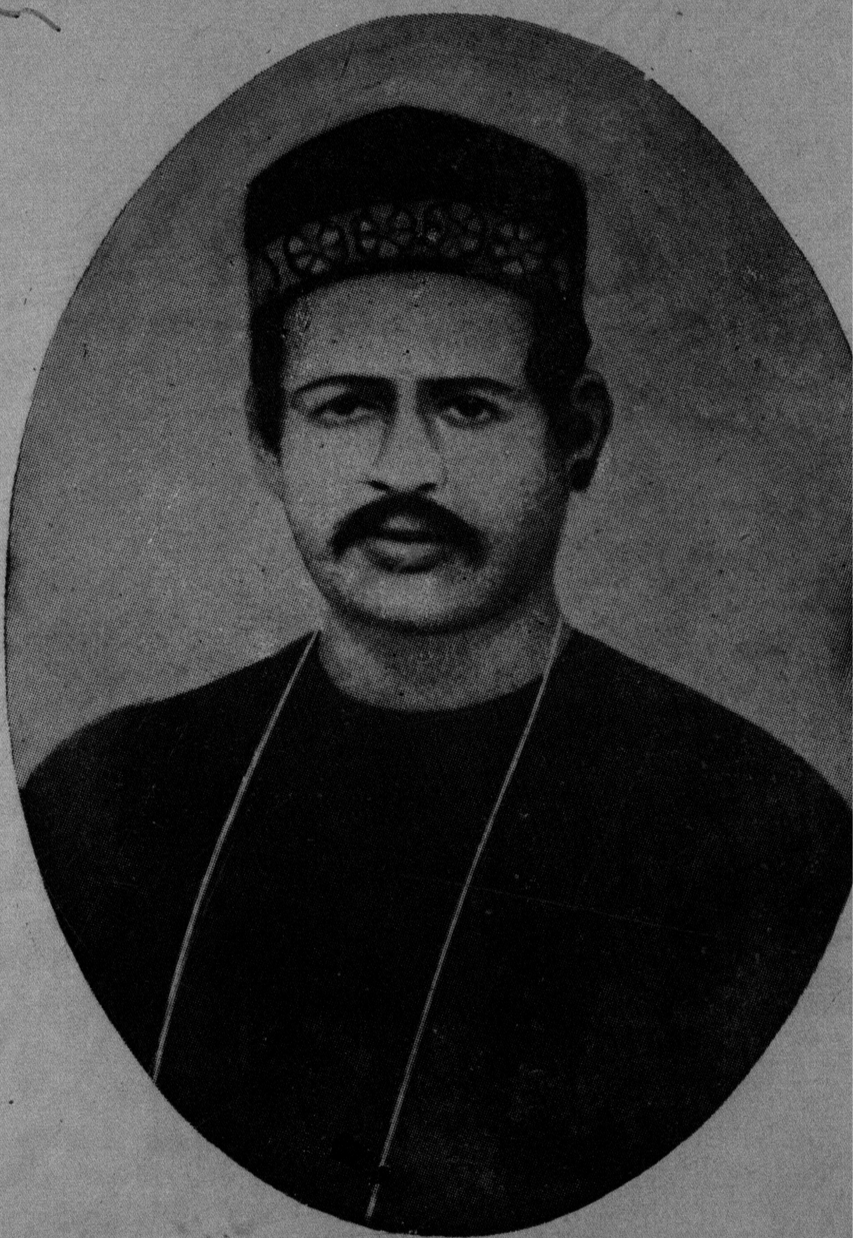
তিন

দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক

ভূমিকা

১

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, সিপাহী বিদ্রোহ বাঙ্গালী মানসে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করলেও বঙ্গভূমিতে রাজনৈতিক আন্দোলন ও চিন্তা ক্ষিপ্রগতিতেই অগ্রসর হ'তে থাকে। নীলচাষকে কেন্দ্র করে বাঙ্গলাদেশে যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, তা কালক্রমে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইংরেজ শাসন ও পরিচালনার ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এটাই হচ্ছে প্রথম গণজাগরণ। আর 'নীলদর্পণ' নাটক হচ্ছে এই গণজাগরণের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। 'নীলদর্পণ' নাটকের আগে বাঙ্গালীর সাহিত্য-বিচিন্তাতে রাষ্ট্রচেতনা পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেনি। কয়েকজন কবির কাব্যে দেশপ্রেম ও পরাধীনতার মর্মজ্বালা বিচ্ছিন্ন আকারে রূপলাভ করেছিল মাত্র। এর প্রধান কারণ, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর রাজনৈতিক চেতনা একটি বিশেষ গোষ্ঠীতে আবদ্ধ ছিল। আবেদন, পত্র-পত্রিকায় লিখিত প্রতিবাদ এবং সভাসমিতিতে আলোচনা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে রাজনৈতিক, চিন্তাধারা রূপলাভ করেনি। উনিশ শতকের সূচনাপর্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আমাদের ধর্মচিন্তা ও চিরাচরিত সংস্কার আহত হয়েছিল। সমাজজীবনের বন্ধনগ্রন্থীতে ও শাশ্বত ধর্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত লাগবার জন্য বাঙ্গালীর চেতনা ও অনুভূতি হয়েছিল উৎক্ষিপ্ত। একদিকে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকদের জ্ঞান ও প্রেম সমন্বিত কর্মচিন্তা, অন্যদিকে ইতিহাস-সচেতন ইংরেজিশিক্ষিত নব্য যুবকদের বন্ধনমোচনের দুর্বার ব্যাকুলতা এবং দুইয়ের মাঝখানে সংরক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাব; সমস্ত কিছু একত্রযোগে দেশের আকাশে-বাতাসে এমন একটা উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল যে, ঐ যুগের নাট্যানুভাবনা অনিবার্যভাবে প্রাণাবেগে চঞ্চল মানবচিত্তের ঘাতপ্রতিঘাতে তরঙ্গিত হয়ে সামাজিক নাটকরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।



দীনবন্ধু মিত্র

সমকালে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' ও 'নব নাটক', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটক, এবং মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি নাটকগুলি বিশেষ ভূমিকা লাভ করে। এছাড়াও বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, মদ্যপানজনিত জীবনের অপচয় ও পারিবারিক যন্ত্রণা—এই সমস্ত সামাজিক সমস্যাও নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। তবে উল্লিখিত নাটকগুলির মধ্যে মধুসূদনের প্রহসন দু'টি ছাড়া অন্যান্যগুলি বিদ্রূপপ্রধান নকসা-জাতীয় রচনা। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক দুর্দশার অস্পষ্ট ছায়াপাত ঘটেছে। তবে সেখানে কৌলীন্যপ্রথার অন্তরালে জীবন যন্ত্রণার কথা বিচারই নাট্যকারের প্রধান চিন্তা। অন্যান্য সামাজিক নাটকে দেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক চেতনার কথা প্রকাশ পায়নি।

'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যে দেশবাসীর চরম দুদশা ও ফিরিঙ্গীশাসকদের অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হয়েছিল, একথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। সমকালীন নিম্নরায়ত সম্প্রদায়ের জীবনে নীলচাষের জন্য যে নিদারুণ সংকট ও মর্মভেদী হাহাকার নেমে এসেছিল, তার প্রত্যেকটি কারণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নাট্যকার দীনবন্ধু অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য উচ্চ-নিম্নশ্রেণী নির্বিশেষে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

কিন্তু 'নীলদর্পণে'র আগে বাঙ্গালীর স্বাদেশিক ভাবনা নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত না হলেও, বাঙ্গলাদেশে সংস্কারচেতনার মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম সংগঠিত হচ্ছিল, তাকে ইংরেজ সরকার ও শ্বেতাঙ্গ জনগণ প্রীতির চোখে দেখেনি। সমাজসংস্কারমূলক নাটকে বাঙ্গালী কেবল সাংস্কৃতিক সংগ্রামের অবতারণা করেনি, তদানীন্তন ইংরেজ সরকার বাঙ্গালীকে নকল সাহেব তৈরী করবার, শিক্ষিতসমাজকে মদ্যপানে আসক্ত করবার এবং শোষণযন্ত্রের কেরাণী প্রস্তুত করবার যে প্রয়াস চালিয়েছিল, তারও বিরুদ্ধে এই নাটকগুলি বিরূপ সমালোচনা করে। রামমোহনের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলন ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বহুবিবাহপ্রথা রোধ প্রভৃতি নানা প্রগতিমুখী সংস্কারচিন্তার মধ্যে বাঙ্গালীর চিত্তভাবনা ক্রমশঃ উন্নত হতে থাকে এবং এই ক্রমবর্ধমান মানসিকতার মধ্যেই ইচ্ছা লাভ করে নাট্যশালা

স্থাপন পরিকল্পনা এবং নাটক রচনা। বাঙ্গালীর এই মানসবিপ্লব, তাদের নাটক রচনার প্রয়াস এবং রঙ্গমঞ্চে শ্রেণীসচেতন নাটক উপস্থাপনা, ইংরেজগণ বরদাস্ত করতে পারেনি। কারণ তারা জানত, সর্বদেশে, সবকালে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানবজাতির অনুভূতিকে উদ্দীপিত করতে নাটকের ন্যায় শক্তিশালী উত্তেজক আর কিছুই নেই। তাই বাঙ্গালীর উদ্যোগে বাঙ্গলা নাটকের প্রথম অভিনয় সাফল্য ফিরিঙ্গীদের চিন্তিত করে তোলে। শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় 'বিদ্যাসুন্দর' নাট্যাকারে অভিনীত হলে ইংরেজদের সংবাদপত্র 'ইংলিশম্যান অ্যাণ্ড মিলিটারি ক্রনিকল' লেখে :

"এই সকল নাট্যাভিনয়ে হিন্দুদিগের মানসিক বা নৈতিক কোন প্রকার উন্নতি তো হয়ই না, বরং লোকহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই এই সকল অভিনয়ের বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত।...ভবিষ্যতে এক নিন্দা ভিন্ন এই সকল অভিনয়ের কোন উল্লেখ হিন্দু পাইয়োনিয়ারে দেখিতে পাইব না, ইহা আমরা আশা করি।"[১]

প্রকৃতপক্ষে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকাভিনয়কে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীদের মধ্যে এক আলোড়ন আসে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা, বাঙ্গলাদেশে বিভিন্নস্থানে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন ও নাটক রচনার আবশ্যকতা, তদানীন্তন অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী এই অভিনয়ের সাফল্য থেকে উপলব্ধি করে। এইরকম একটি জাতীয় প্রয়োজন সকলের মনের মধ্যে যাতে বিশেষভাবে অনুবিদ্ধ হয়, তারই প্রচার চালিয়েছিলেন 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার'। এই প্রচার ইংরেজদের আতঙ্কিত করেছিল। 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' লিখেছিল,

"দেশব্যাপী অজ্ঞানের মধ্যে এরূপ অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার ঘটিতে পারিয়াছে, তাহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এই সকল বালিকাদের দেখিয়া কি দেশীয় দর্শকেরা তাঁহাদের স্ত্রী ও কন্যাদের শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন না? হিন্দু-হিসাবে আমি এই কথাটা আমার দেশবাসীদের জিজ্ঞাসা করিতে চাই,— এই যে বালিকা, যে নাট্যশালায় এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, সে যদি মাতৃভাষায় শিক্ষিতা হইত, তবে কি তাহার প্রতিভার আরও স্ফূর্তি হইত না? এই বালিকাটি শুধু কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি

১ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৬।

করিয়া গিয়াছে মাত্র। পুরুষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা প্রকৃতিদেবীকে দোষী সাব্যস্ত করেন, তাঁহাদের কাছে এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই কি প্রতীয়মান হইবে না যে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরাও তাহাদের স্বামীদের ন্যায় শিক্ষালাভের উপযুক্ত? এই অভিনয়ের দ্বারাই কি হিন্দু দর্শকদের নিকট প্রমাণিত হইবে না যে, যতদিন পর্যন্ত নারী শিক্ষাহীন থাকিবে, ততদিন তাহারা সমাজে অবর্ত্তমান বলিলেই চলে? আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকদের মানসিক শক্তির এই মহান্ ও নূতন দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি লোকে স্ত্রীশিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহাদের হৃদয় কঠিন ও চিত্ত আবেগহীন বলিতে হইবে।

দেশীয় রঙ্গমঞ্চ এবং তাহার পরিচালন-পদ্ধতি এইরূপ। এই সকল প্রশংসনীয় কিন্তু ভ্রমে পতিত স্ত্রীলোকদের চারিত্রিক উন্নতি করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু নবীনচন্দ্র বসু ধন্যবাদের পাত্র। ...একজন ধনী দেশীয় ভদ্রলোক যে এইরূপে আমাদের দেশের উন্নতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। ধনী-সম্প্রদায় কি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন না? আমরা যেন একটা বড় নৈতিক বিপ্লব দেখিতে পাই—যাহা দ্বারা কালে ভারতবর্ষের প্রাপ্য খ্যাতি লাভ ঘটিবে।

...বর্ত্তমানে হিন্দু স্ত্রীলোকের অবনতির কারণস্বরূপ যে-সকল কুপ্রথা আছে, সে-সকল দূর করিবার জন্য যেন তিনি উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করেন, এবং সর্ব্বোপরি 'হিন্দু থিয়েটার' এর ন্যায় এই নাট্যশালা যাহাতে প্রথম অবস্থাতেই লোপ না পাইয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহার চেষ্টা যেন করেন। ইহা দ্বারাই তিনি সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া যশস্বী হইতে পারিবেন। এই সকল কার্য্যের কোন প্রশংসার আবশ্যক নাই! এগুলি সকল দিক্ হইতে গৌরব আহরণ করে—ইহাদের দ্বারা সজ্জনেরা অনন্ত যশ অর্জ্জন করেন।"[২]

নাটকাভিনয় দর্শন করে বাঙ্গালী যাতে সমাজসচেতন হয়ে উঠে, তারই আয়োজন শুরু করতে এই পত্রিকা ধনী স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। একটি জাতিসংগঠন মানসিকতা ও জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি করার প্রয়াস এই বক্তব্যের সর্বাঙ্গে মিশে আছে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক দুর্দশার কাহিনী যা নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ

২ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ. ১৪-১৫।

হয়ে প্রহসনাকারে অথবা রঙ্গব্যঙ্গের মধ্যে অভিনীত হত, তাই ভবিষ্যতে সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এই সময়ে অভিনীত নাটকগুলিতে নাট্যরস শীর্ণাকারে প্রবাহিত হলেও, বিভিন্ন নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংগঠনের প্রচেষ্টা দিকে দিকে আরম্ভ হচ্ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর বাঙ্গালীর স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী আমরা পটভূমি বিশ্লেষণে লক্ষ্য করেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনচেতনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের সংগ্রামমুখর মানসিকতার এক স্বাভাবিক সমন্বয় ঘটেছিল বলেই 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য আপন দাবির অনুকূলে নিজেদের মতকে সুদৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। নীলকরদের অত্যাচারে বাঙ্গালীর স্বাভিমান ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যয়ের সঙ্গে মুখর হয়ে উঠে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক বাঙ্গালীর সংগ্রামশীল মানসিকতার প্রতিবিম্ব। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে যা স্ফুটনোন্মুখ ছিল, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সর্বব্যাপী সহানুভূতির' তুলিতে তা হয়েছিল প্রাণবন্ত। দেশবাসীর সকলশ্রেণীর মানুষের বেদনা সেদিন এই নাটককে আশ্রয় করে দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছিল। নাট্যশালা, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এর গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। 'নীলদর্পণ' নাটক জাতির সীমাহীন যন্ত্রণাকে ভাষায় রূপ দিয়ে মানবপ্রেমের সুউচ্চ বেদীতে স্থাপন করে জাতীয়তাবোধ বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধানস্থান অধিকার করেছিল। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' যা কাকলি আকারে ছিল, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' তাই ভৈরব টংকার ধ্বনিতে নিনাদিত। স্বাদেশিক-চেতনা বিস্তার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গলা নাটকের অগ্রগতি, নীলবিদ্রোহের রক্তকেতন উড়িয়েই শুরু হয়েছিল, আর তাতে যে নাম লেখা ছিল, তাহ'চ্ছে—দীনন্ধু মিত্র।

পটভূমি বিচার

২

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক বাঙ্গলার নীলচাষীদের দীর্ঘকালের নির্যাতনের এক করুণ কথাচিত্র। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের সূচনাকাল থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নীলচাষকে কেন্দ্র করে বাঙ্গলার নীলচাষীদের

উপর যে অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন শুরু হয়ে জীবনকে কষায় ও অসহনীয় করে তুলেছিল, তাই 'নীলদর্পণ' নাটকের পটভূমি রচনা করেছে। দীনবন্ধু যেন রায়তদের রুধিরস্নাত জীবনের করুণ কাহিনীগুলি একসঙ্গে গ্রথিত করে নাটকাকারে দৃশ্যচিত্রে আবদ্ধ করেছেন। তাই বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব বিশ্লেষণে নীলচাষের লাভজনক কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তার সঙ্গে নীলচাষীদের অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা ও নীলকরদের অর্থগৃধ্নু মনোভাবের পরিচিতি গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নীলবিদ্রোহ বাঙ্গলাদেশে বিপুল আলোড়ন তুললেও, এই আন্দোলন কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। বহুদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা ও অত্যাচারের নির্মম গ্লানি, প্রতিকার ও মুক্তি বাসনাতেই বিপ্লবরূপাকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রপ্তানী কারবারের অন্যতম দ্রব্য ছিল নীল। পরে এ দেশে অবাধ বাণিজ্যনীতির প্রসার হলে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নীল-কারবারে আত্মনিয়োগ করেন। ইউরোপের বাজারে নীলের চাহিদা থাকার জন্য নীলকরেরা এদেশে নীলচাষ করে উৎপন্ন নীল ইংলণ্ডের পুঁজিপতিদের কাছে উচ্চ কমিশনে সরবরাহ করত, আর এ ব্যাপারে মুনাফার পরিমাণও ছিল প্রচুর।

কিন্তু নীলচাষে নীলকরদের আর্থিক উন্নতি ঘটলেও এদেশীয় কৃষিজীবীদের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। নীলচাষের শুরু থেকেই নীলকরেরা সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছিল। অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার বিখ্যাত 'ডন' পত্রিকায় লিখেছিলেন,

"Every form of oppression that unrestrained tyranny could devise or the inventive imagination of repacity could contrive was put into practice by the Indigo Planters. The criminal records of Bengal, from that Indigo Cultivation was introduced into the province down to its final banishment, prove clearly and undeniably that murder, homicide, riot arson, dacoity, plunder and kidnapping, were some of the means by which the ryot was forced to take up the cultivation of indigo."[৩]

৩ Fifty years Ago (Dawn Magazine) : Haran Chandra Chakladar ; July 1905

এইসব অত্যাচারী নীলকরদের স্বভাবের ও মানস প্রকৃতির বর্ণনা একজন ইংরেজ লেখকও দিয়েছেন।

"নীলকর একজন ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী দুর্বৃত্ত। তার প্রথম কাজ একটা স্থান খুঁজে বের করা যেখানে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তার পন্থা হচ্ছে ৫০ থেকে ১০০ বিঘা কিংবা আরও বেশি আয়তনের একটা জমি কেনা, এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি গামলা ও যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি সংগ্রহ করে একটা ফ্যাক্টির স্থাপন করা। · বস্তুত ফ্যাক্টরির জমি এমনকি ফ্যাক্টরিটি পর্যন্ত থাকত বেনামীতে। ···অসংখ্য ভয়াবহ দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা আমরা জানি। মাত্র দু-একটি নয়, এমন শতশত মুখোমুখি লড়াইয়ের উদাহরণ আমরা দিতে পারি যেখানে দুইজন, তিনজন এমনকি ছয়জনও নিহত হয়েছে এবং সেই অনুপাতে আরও অনেকে আহত হয়েছে ; অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধে পশ্চিমা ব্রজভাষাভাষী ভাড়াটে সৈন্যরা এমন দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করেছে যে, তা যে কোন যুদ্ধে কোম্পানীর সৈন্যদের পক্ষে গৌরবজনক হ'ত, বহুক্ষেত্রে নীলকর সাহেব কৃষক লাঠিয়ালদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, তার তেজীয়ান ঘোড়ার পিঠে চেপে অতি দক্ষতার সঙ্গে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকেরা সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা নীলকুঠিগুলিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে ; অনেকস্থানে একপক্ষ বাজার লুট করেছে, তার পরক্ষণেই অপরপক্ষ এসে তার প্রতিশোধ নিয়েছে।"[৪] (অনূদিত)

বাঙ্গলার নিরক্ষর কৃষকেরা বিনাসংগ্রামে আত্মসমর্পণ করেনি। তারা নিজেদের সাধ্যমত রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। নীলচাষীদের অসহায়তার কথা, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মানস গোচর করবার জন্য 'সমাচার দর্পণ' লিখেছিল,

"মফস্বলে কোন ২ নীলকারকেরা প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ এই। যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠিতে আনিবা। তাহারা ঐ চেষ্টাতে নীলের জমির নিকট থাকে কিন্তু যখন গরু নীলের নিকট আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনি সে গরু ধরিয়া কুঠিতে চালান করে, সে গরু এমত কয়েদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজালোক

৪ Calcutta Review, 1848

নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠিতে যায়। প্রথম তাহারদিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় ততই প্রজার দুঃখ হয় ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি করিয়া সরকার লোককে কিছু ঘুস দিয়া ও নীলের দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণ পর্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিসাব রফা হয় না, প্রতিসনেই দাদন সময়ে বাকীদার কহিয়া ধরিয়া কয়েদ রাখে। তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হাল বকেয়া বাকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্য শস্য আবাদ করিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না।"[৫]

নীলকরদের এই অন্যায় আচরণ ও অমানুষিক অত্যাচারের পিছনে তদানীন্তন ইংরেজ বণিক সরকারের সমর্থন ও আইনগত সহযোগিতা ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের 'অষ্টম আইনে' (Regulation VIII of 1819) তাঁরা দেশীয় জমিদারের কাছ থেকে জমির পত্তনি লাভের অধিকার পেয়েছিলেন। পরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ আইনের দ্বারা (Regulation VI of 1823) নীলকরেরা যে-সব চাষীদের টাকা বা নীলবীজ দাদন দিয়েছে, তাদের জমির উপর একটা বিশেষ সত্ব বা অধিকার পায়। এ ছাড়াও ইংরেজ নীলকরদের বিচার বিভাগীয় নানা সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের 'পঞ্চম আইনে' (Regulation V of 1830) যা ঘোষণা করা হয়েছিল তার হঠকারিতার তুলনা বোধহয় বিশ্বে আর কোথাও নেই। এই আইনেই বলা হয় যে, দাদন গ্রহণকারী কৃষকদের নীলচাষ না করাটা হবে সম্পূর্ণভাবে বে-আইনী। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তি রায়তদের ভোগ করতে হবে। এই আইন পাশ হলে চাষীদের অবস্থা কেমন শোচনীয় হয়ে উঠেছিল, তার বর্ণনা পাই 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় জনৈক মফস্বল নিবাসীর লেখায়। তিনি লেখেন,

"Some months ago a new law was promulgated respecting the cultivation of Indigo, in which various enactments were made regarding the cultivators of the soil. The injustice which was resulted therefrom has not indeed been made

৫ সমাচার দর্পণ : ১৮ই মে, ১৮২২।

public by them, for although the agriculturists suffer a variety of oppressions from the planters, they have entered into no disputes on the subject. To dispute with the planters involves, first, the risk of life, and secondly, a most heavy expense ; and they are so poor as to be unable to provide even for their own exigencies ! Hence they are necessarily indisposed to contention· · ·When the cultivator has once received and advance, neither he nor any of his posterity can obtain deliverence from the engagment, for the accounts are so dexterously obscure, that he always appears in arrears ; that is not to say, he can never expect to be emancipated from his bondage…under a thousand similar acts of oppression the community groans ;· · ·every man trembles at the clubs of the planters and is, therefore, detered from complaining. The planters have now firmly rooted in the mofussil, because many of the smaller proprietors of land are drawn by avarice to seek their service. Knowing this their wishes are first consulted in the bestowment of places ; and finally the rope is artificially fixed to their hooks and they are induced to give lease of their lands, upon the strength of which oppressions are multiplied· ·"[৬]

সমকালে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বাঙ্গালী সাংবাদিকগণ নীলকরদের উৎপীড়নের যে সমস্ত সংবাদ পরিবেশন করতেন, তা ছিল জাতির স্বদেশচেতনা সমৃদ্ধ রাজনৈতিক চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। বাঙ্গালীর ক্রমবর্ধমান সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ ক্রমে ভারতবর্ষের আকাশসীমা অতিক্রম করে অবশেষে ইংলণ্ডে প্রবেশ করে। সেখানকার 'ডিরেক্টররা' নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে আর উদাসীন থাকতে পারলেন না। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের 'ডিরেক্টর' গণ

৬ বঙ্গদূত : ১৮৩০ ;· চিঠির ইংরেজি অনুবাদ ১৮৩১ সালে, লণ্ডন এশিয়াটিক জার্নালে প্রকাশিত হয়।

তাঁদের মতামত ব্যক্ত করে যে চিঠি ভারতের গভর্ণর জেনারেলকে দিয়েছিলেন, তাতে রায়তদের উপর নীলকরদের অত্যাচার প্রমাণিত তথ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে, এইরূপ এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই পত্রে 'ডিরেক্টররা' নদীয়া জেলার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট টার্ণবুলের অভিমতকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। টার্ণবুল তাঁর রিপোর্টে নিরপেক্ষভাবে নীলকরদের অত্যাচারের যে কথাচিত্র এঁকেছিলেন, তাতে তিনি নীলকরদের অত্যাচার ও নীলচাষীদের দুরবস্থার সঙ্গে দেখিয়েছেন, কিভাবে ছল-বল-কৌশলে নীলকরেরা অশিক্ষিত চাষীদের চুক্তিবদ্ধ করে রাখে, কিভাবে দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তারা লুণ্ঠনদ্রব্যের মধ্যে ভাগ বসায়। যে সমস্ত লোক সশস্ত্র হয়ে ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে নীলকরদের স্বপক্ষে চাষীদের উপর অত্যাচার চালাত, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল দাগী, সামাজিক দুর্বৃত্ত অথবা ফেরারী আসামী। এরা অত্যন্ত নিরাপদে নীলকরদের কুঠিতে আশ্রয় পেত। এদের অত্যাচারের কিনারা করা পুলিশের সাধ্য ছিল না। এমন কি অনেক সময় ম্যাজিষ্ট্রেটরাও ভয়ে নীরব থাকতেন।৭

কিন্তু বাঙ্গলাদেশে নীলচাষীদের দুর্ভাগ্যের বোঝা ক্রমশঃ দ্রুত গতিতে বেড়ে চলল। কুখ্যাত 'ষষ্ঠ আইন' ও 'পঞ্চম আইন' তাদের অত্যাচারকে অধিকতর পুষ্ট করেছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেকলে নীলকরদের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে 'মিনিটে' লিখেছিলেন,

"That great evils exist, that great injustice is frequently committed, that many ryots have been brought, partly by the operation of the law and partly by acts committed in defence of the law, into a state not very far removed from that of predial slavery is, I fear, too certain. ...But it is said, these contracts are not freely made. Force and deception are employed. The peasant assents to disadvantageous terms from fear of bludgeon-men, or is tricked into signing some paper which he does not understand. I answer that in all such cases there ought to be a remedy. The law, I apprehend, would even now reach these oppressive and

Indigo Commission Report ; Appendix No 16

fradulent practices. If not, the law ought to be altered. In any case of coercion or deception, the contract should be set aside, and the tyrannical or dishonest capitalist should be punished with exemplary severity."[৮]

এই সমস্ত আলোচনা ও লেখালিখির জন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের কুখ্যাত 'পঞ্চম আইন' বাতিল হল বটে, তবে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের 'অবাধ বাণিজ্য' চুক্তিতে নীলকরদের বাঙ্গলাদেশে জমিদার হয়ে বসবার অধিকার দেওয়া হল। এর ফলে নীলকরদের অত্যাচার কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি নিয়ে বজ্রপাতের মত নিক্ষিপ্ত হল অসহায় রায়তদের মাথায়। ঐ সময় শিক্ষিত বাঙ্গালীরা 'অবাধ বাণিজ্য' চুক্তিকে সমর্থন জানাননি। তাঁদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয়নি সত্যকথা, কিন্তু সে সময়ে রাজনৈতিক অধিকার লাভের যে চেষ্টা বাঙ্গালীর মনে আশা সঞ্চার করেছিল তাই পরবর্তীকালে প্রত্যয়ের সঙ্গে ফলবতী হয়েছিল। 'ইণ্ডিগো কমিশন' গঠনে ইংরেজকে বাধ্য করা বাঙ্গালীর জাগ্রতবুদ্ধি ও রাজনৈতিক চেতনার অন্যতম ফলশ্রুতি।

বাঙ্গলাদেশে নীলবিদ্রোহের কারণ ছিল মূলতঃ অর্থনৈতিক।* ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা জমিদার হবার অধিকার পেলে ইংরেজ বণিক ও নীলকর-দের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান এদেশে, বিশেষকরে কলকাতায় গড়ে উঠেছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, 'বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স'; ও ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 'নীলকর সমিতি' স্থাপিত হয়। এর কিছুদিন পরে গড়ে উঠে 'The Land holders and Commercial Association of British India.' এই বণিক সংস্থাগুলি পরস্পর বিবাদ বিস্মৃত হয়ে দেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠনে একাগ্রচিত্ত হয়েছিল। নীলচাষের প্রবর্তনে কৃষকদের অর্থনৈতিক দুর্দশা কতখানি ক্ষতিকর হয়েছিল তা ওয়াটস্ 'নীলকমিশন' সাক্ষ্যে নীলকরদের লভ্যাংশের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে বিচার করেছিলেন।[৯] তিনি নীলচাষ হিসাবের খতিয়ান দেখিয়ে বলেন,

"১,৫০০ একর নীলচাষ হয়, বিহারের এই রকম একটা কুঠি যে হিসাব

৮ Minute : Lord Macauley, 17th September 1835.

* "The root of the Trouble was Economic" : Dr. J. N. Sarker, Foreward. Peasant Revolution in Bengal ; By Jogesh Chandra Bagal.

৯ Indigo Commission Report ; p. 10.

দিয়েছে তাতে দেখা যায় যে জমিদারকে খাজনা দিতে হয়েছে ৬৯,০০০ টাকা, কিন্তু কোম্পানি যে খাজনা আদায় করেছে চাষীদের কাছ থেকে তা হচ্ছে ৭০,০০০ টাকা, সুতরাং খাজনা বাবদ যে টাকা খরচ হয়, গ্রামের লোকরাই তার চাইতে অনেক বেশী দিয়েছে। তিন জন ইউরোপীয়ান ম্যানেজারের বেতন, আর সকলের বেতন ও অন্যান্য সবরকমের খরচ ধরে এই কোম্পানির মোট ব্যয় হয়েছে ১,২০,০০০ টাকা। যে পরিমাণ নীল প্রস্তুত হয়েছিল তা হ'ল ১,১৫০ মণ, যা মন প্রতি ২০০ টাকা দরে বিক্রি হ'ল, ২,৩০,০০০ টাকায়; এর থেকে যদি শতকরা ১০ টাকা মূলধনের উপর সুদ ও শতকরা আরও ১০ টাকা রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্য রাখা হয়, তাহলেও দেখা যায় যে এই কুঠি শতকরা প্রায় ১০০ টাকা লাভ দিয়েছে। এই তথ্যগুলি থেকে প্রমাণিত হল নীলব্যবসা কি অসম্ভব রকমের লাভজনক।"[১০] (অনূদিত।)

অপরদিকে নীলচাষীদের দুর্দশার চিত্র দেখি নীলচাষী সবির বিশ্বাসের জবান বন্দীতে। সে নীলকমিশনের সামনে বলেছিল,

"নীলকরের মাপ অনুসারে আমাকে ৭ বিঘায় নীলচাষ করতে হয়, আসলে সেটা হচ্ছে ১১ বিঘা। কোন কোন বছরে তারা আমাকে এক টাকা, কি দুই টাকা দাদন দেয়, কিন্তু কুঠির আমলারাই তার সব নিয়ে নেয়। কুঠি থেকে আমার ফসলের জন্য কোনদিন আমি একটি পয়সা পাইনি। গত বছর আমি ২৫ নৌকা ভর্ত্তি নীলগাছ দিয়েছিলাম, তারা বলে এক নৌকায় ৩।৪ বাণ্ডিল গাছ ধরে, আমি বলি এক নৌকায় ১২।১৩ বাণ্ডিল গাছ ধরে।"[১১] (অনূদিত।)

আর একজন চাষী, মীরজান মণ্ডল বলেছিল,

"নীলকর হচ্ছে একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন। মহাজনদের কাছে বাজার দর হচ্ছে টাকায় ১৪ থেকে ১৬ কাঠা ধান, কিন্তু নীলকর সেখানে দেয় ৮ কাঠা এবং আমরা নীলকর ছাড়া অন্য কোন মহাজনের কাছ থেকে ধার করতে পারি না। আমার আর একটা অভিযোগ হচ্ছে যে গত কার্তিক মাসে নীলকর আমার ১০০ বাঁশ কেটে নিয়ে গিয়েছে। তারজন্য

১০ Dictionary of Economic Products of India, 1890 : Watts, pp. 429-30

১১ Indigo Commission Report : Evidence, p. 232

সে এখনও কিছুই দেয়নি। যদিও বা দেয় তাহলে দেবে ১০০ বাঁশের জন্য মাত্র ৪ আনা।”[১২] (অনূদিত।)

এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদির মধ্যে বিশ্লেষণী আলোক নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, বাঙ্গলাদেশ ইংরেজ বণিকদের একটি সম্পূর্ণ উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। তাদের অনুশীলিত নীতির মূলকথা ছিল, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের মহান ঐতিহ্যময় পটভূমির সঙ্গে এর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। যদিও বাঙ্গলাদেশে শিল্পবিপ্লব ঘটবে, এই আশায় রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এদেশে নীলচাষের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁদের আশা পূর্ণ হয়নি। বরং শ্রেণীনির্বিশেষে নীলকরেরা অত্যাচারের খড়্গকৃপাণে এদেশবাসীকে ক্ষত-বিক্ষত করে রক্তের হোলি খেলেছিলেন। নীলচাষের অর্থনীতি সম্পর্কে একজন মিশনারী মন্তব্য করেন,

“নীলকরদের রাতারাতি বড়লোক হবার লোভটাই হচ্ছে নীলচাষের অপকারিতার কারণ। আমাদের ধর্মগ্রন্থে আছে যে মানুষের টাকার লোভটাই অনেক অনিষ্টের কারণ। বাংলাদেশের নীল ব্যবসায়ে এর কুফল ভাল করেই ফলেছে। যদি নীলকররা একটা অনতিরিক্ত লাভ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নীলচাষে এত অন্যায়-অবিচার হ'ত না। রায়তের উপর কোন অত্যাচার বা অবিচার না করেও নীলকর অনায়াসে শতকরা ২৫ টাকা লাভ করতে পারে কিন্তু যেহেতু সে আরও অনেক বেশি মুনাফা চায়, তারই জন্য এত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়।”[১৩] (অনূদিত)

নীলচাষ রায়তদের পক্ষে যে এক সর্বনাশের কারণ ছিল, ‘ইণ্ডিগো কমিসনারদের রিপোর্টে’ তা সমর্থন লাভ করেছে। তাঁরা লিখেছেন,—

“৬০ দফা। এই বিষয়ে যে সকল জবানবন্দী উভয়পক্ষ হইতে লওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে একথা এই স্থান অবধি শরণ করিয়া রাখিতে হইবে যে যে প্রণালীতে এইক্ষণে নীলচাষ চলিতেছে তাহাতে প্রজার কিছুমাত্র লাভ হয় না—গবরণর সাহেবকে আমরা জানাইতেছি যে স্বদ্ধ প্রজাদিগের সাক্ষ্যে বাক্যে অথবা তাহাদের পক্ষে লোকের জবানবন্দীতে প্রকাশ হইয়াছে এমত

১২ Indigo Commission Report : Evidence, p. 233

১৩ Calcutta Review, June 1860

নহে নীলকরদিগেরা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, নীলের চাসে প্রজার লাভ হয় না।"১৪

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে নীলচাষীদের আরও একটি গভীর অভিযোগ ছিল। জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির জন্য একজন কৃষক অন্য ফসলে বেশি দাম পাচ্ছিল, কিন্তু নীলের দাম আগের মতই থেকে যায়। তার উপর তারা উচ্চমানের জমিগুলিতে নীলচাষ করতে বাধ্য হত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে, ছোটলাট 'পিটার গ্রান্ট' এক মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল,

"নীল-সংকট চরমে ওঠার সব থেকে বড় কারণ হ'ল সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি। এটা জানা কথা যে সব কৃষিজাত দ্রব্যেরই মূল্য গত তিন বছরে দ্বিগুণ কিংবা প্রায় তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে। দিন মজুরের মজুরি ও গরু-বলদ পোষার খরচও একই রকমে বেড়ে গিয়েছে। ···যেহেতু এই একটি মাত্র দ্রব্যের কোন প্রকার মূল্যবৃদ্ধি হয়নি, এইটেই হচ্ছে সব থেকে বড় কারণ যা রায়তের কাছে নীলচাষের অপকারিতাগুলিকে দ্বিগুণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। চাষীর টাকার ক্ষতিটা দ্বিগুণ হল ও অন্যান্য ক্ষতিগুলোও বেড়ে গেল একই হারে। ··চাষীরা একেবারে খোলাখুলি বিদ্রোহ না করা পর্যন্ত নীলকরেরা নীলগাছের মূল্যবৃদ্ধির কথা একবারও চিন্তা করেনি।"১৫ (অনূদিত।)

পাদ্রীলঙ্‌ও অনুরূপ মন্তব্য করে নীলবিদ্রোহের কারণ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

"To my knowledge the ryots have for many years complained of this factory system, but it is the last straw that breaks the Camel's back. The rise in prices, the increased value of labour, the ferment of mind produced by recent political events in India, together with the sympathy which is increasing between the educated natives and the masses have led to the late movement."১৬

একথা সত্যি যে সিপাহী বিদ্রোহ নীলচাষীদের উপর অসামান্য প্রভাব

১৪ ইণ্ডিগো কমিসনারদের রিপোর্ট : পৃ. ২৮।

১৫ Bengal under Lientenant Governors (vol. 1) : Buckland ; p. 245.

১৬ History of Indigo Disturbance in Bengal with a full Report of Neel Darpan Case : L. C. Mitra ; p. 23-24

বিস্তার করে। নীল বিদ্রোহী কৃষকেরা তাদের নেতাদের 'নানাসাহেব' ও 'তাঁতিয়া টোপী' নামে অভিহিত করতেন।*

নীলকরদের অত্যাচারে কোনকিছুই বাদ পড়ত না। লুঠতরাজ, গৃহদাহ, নারীনির্যাতন, পারিবারিক সম্ভ্রমহানি, নরহত্যা সমস্ত কিছুই অত্যাচারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁরা 'Act XI of 1860' আইনের বলে যে কোন রায়তকে ধরে আনতেন। বিচারালয়ে আবেদন করা ছিল একেবারেই অর্থহীন। শ্বেতাঙ্গ বিচারকেরা অধিকাংশই কোন না কোন সম্বন্ধসূত্রে নীলকরদের সঙ্গে আবদ্ধ থাকতেন। এমনকি অনেক সময় জমিদারগণও তাঁদের ক্রোধানল থেকে রেহাই পেতেন না। বিচারক, পুলিশ, আইন, আদালত সবকিছুই তাঁদের করায়ত্ত ছিল। নীলকরেরা আইনকে কি ভাবে উপহাস করতেন, তার বর্ণনা পাই সমকালীন একটি উদ্ধৃতির মধ্যে।

"Those planters who have Zamindary, & C, will laugh at any law (of tenant protection) that may aim at a reform of the present system. .(because) the law can never be brought to bear upon them, for this simple reason that no ryot of theirs will dare to put himself under its protection, while his 'jama' and, in fact, all he possesses in this world, were in the hands of the planters."[১৭]

বাঙ্গলাদেশের ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডের শাসনকাল নীলকরদের অত্যাচারে নতুন ইন্ধন জুগিয়েছিল। তিনি নীলকরদের বন্ধু ছিলেন, এবং রায়তদের প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁর সময়ে নরঘাতক নীলকরেরা অবৈতনিক বিচারকের আসন গ্রহণ করে আরও বহু অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন। 'ইণ্ডিগো কমিশনে'র সাক্ষ্যেও, কমিশনারদের রিপোর্টে এবং সংবাদপত্রে এই মর্মে বিশেষ আলোচনা হয়।

নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরে বাঙ্গলাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ

* "সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানাসাহেব ও তাঁতিয়াটোপী র নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, নীলবিদ্রোহী কৃষকরাও তাহাদিগের নেতাদিগকে এইসব নামে অভিহিত করিত।"
"যশোহর খুলনার ইতিহাস."--সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃ. ৭৮১।

১৭ Selections from Bengal Government Records, No xxxiii ; Indigo Cultivation Part I. 238-239

রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা ও সর্বস্তরে জাতীয়চেতনা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ। যশোহর, নদীয়া, পাবনা, রাজশাহী ও রংপুরে নীলকরেরা যে অত্যাচার চালাত ও অপর দিকে নীলচাষীরা যে প্রতিরোধের অবতারণা করত, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত; তারই কাহিনী সুবিস্তৃতাকারে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। অবশ্য এর আগে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা এবং 'সোম প্রকাশে'ও নীলকরদের দৌরাত্ম্যের কথা প্রকাশিত হয়। শিশিরকুমার ঘোষ নানা বিপদ মাথায় নিয়ে বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করে যে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করতেন তা তিনি হরিশচন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রেরণ করতেন এবং M. L. L. ছদ্মনামে তা প্রকাশিত হত। নীলকরদের স্বৈরাচারী মনোভাব, বিচারে অব্যবস্থা এবং উৎপীড়নের বহু সংবাদ তিনি পরপর অনেকগুলি চিঠিতে বলিষ্ঠ কলমে লিখেছিলেন।* সর্বব্যাপী এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয়চেতনা ও রাজনৈতিক বিপ্লব গড়ে তোলার মনোবাসনাতেই তিনি যাবতীয় ক্লেশ সহ্য করে ক্লান্তিহীন লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। নীলকরদের অত্যাচারের বর্ণনা প্রসঙ্গে এদেশবাসীর অসহায়তা ও পরাধীনতার মর্মবেদনা তিনি অশ্রুসিক্ত চিত্তে প্রকাশ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর উদাসীন মানসিকতাকে আক্রমণ করেছেন দ্বিধাহীন কণ্ঠে,

"...We must suffer till Almighty sends us redress, we are born to suffer-to serve and flatter our conquerors to labour and die like a beast.

It is that we are weak, wretched and poor—that we are their subjects, that we have no to other resource than to suffer patiently whatever punishment our masters will please to inflict upon us, that they thus trample upon us, disregarding justice and the tenets of the Bible ? ...Woe to the Bengalees that they are sleeping in indolence. When their wretched countrymen are thus

* Peasant Revolution in Bengal : Jogesh Chandra Bagal, পুস্তকটিতে সমস্ত চিঠিপত্র সংকলিত আছে।

sacrificing their lives for their emancipation from Indigo slavery, they are passing away their time in idle luxary"...[১৮]

নীলকরের অত্যাচারের কথা আমরা বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট 'এসলী ইডেনের' সাক্ষ্যেও পাই। তিনি সরকারী নথিপত্র থেকে ১৮৩০ থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত খুন, ডাকাতি, দাঙ্গা, লুট, আগুন লাগান, লোকহরণ, নারী-লুণ্ঠন প্রভৃতি ৪৯টি অত্যন্ত গুরুতর ঘটনার একটা তালিকা কমিশনের কাছে পেশ করেছিলেন।[১৯] 'দেলাতুর' ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুরে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি নীল কমিশনের সামনে সাক্ষ্যদানকালে বলেন,

"এমন একটা বাক্স নীল ইংলণ্ডে পৌঁছয় না যেটা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়—এই উক্তির জন্য মিশনারিদের দোষ দেওয়া হয়েছে। এই উক্তি আমারও উক্তি। ফরিদপুর জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা থেকে আমি জোর দিয়েই বলতে চাই যে কথাটা সম্পূর্ণভাবে সত্য। আমি কয়েকজন রায়তকে দেখেছি যাদের দেহ বল্লম দিয়ে এপিঠ-ওপিঠ ভেদ করে দেওয়া হয়েছিল। কয়েকজন রায়তকে আমার সামনে আনা হয়েছিল যাদের নীলকর ফোর্ড গুলি করে মেরেছিল। আমি আরও কয়েকজন রায়তের কথা জানি যাদের সড়কি দিয়ে জখম করে হরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।"[২০] (অনূদিত)

কুঠির ভিতরে রায়তদের যে অত্যাচার করা হত, তার বর্ণনা করে 'পাদ্রী লঙ্,' 'হরকরা' কাগজে লেখেন,

"The daily press here being all on the side of the Indigo planting interest, announce that peace and order are prevailing now in the indigo districts, with few exceptions. I have information of a different kind, however, from trustworthy sources. It is a peace procured by the dungeons and the stock—by the Magistrates pondering to the interest of the planters. The Magistrate gets good cheer in the planter's house, of course he is not ungrateful enough to give

১৮ Hindu Patriot : April 14, 1860.

১৯ Indigo Commission's Report—Evidence, pp. 3-4.

২০ Indigo Commission's Report : p—18.

a decision in favour of the ryot, which besides, would bring on him the abuse of the Calcutta Press. The unjust deeds of certain Magistrates are noted and in due time will come to light. A 'reign of terror' exists in certain districts factory go-downs had they ears, could tell sad accounts of the sufferings of ryots. Yes Sir, certain planters can make use of "Black holes", as well, as Serajdowalla did ; while the violation of their orders will teach ryots, how they complain of the Indigo Saheb. A ryot's life will soon not be safe, who bears testimony against the planter."[২১]

এ রকম অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে নীলকরদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা ও কাহিনী তুলে ধরা যেতে পারে। দেশীয় আমীন ও গোমস্তারা ছিলেন নীলকরদের অত্যাচারের প্রধান সহায়। দেশীয় গোমস্তা ও আমীনরা যে অত্যন্ত অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ, নীলকরেরাও তা অস্বীকার করেননি। তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, আমলা ও গোমস্তারা কেবল রায়তদের উপর অত্যাচার করে না, নীলকরদেরও ঠকিয়ে অর্থবান হবার চেষ্টা করে। 'ইণ্ডিগো কমিশনারদের রিপোর্টে' এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।[২২] তদানীন্তন পুলিশ ও শাসকদের কার্য প্রণালীর সমালোচনা ক'রে 'ইণ্ডিগো কমিশনারদের রিপোর্টে' লেখা হয়েছিল,

"১০১ দফা। আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে আইন অনুসারে নালিশ ও কর্ম্ম করিতে হইলে অনেক বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয়, দেশের পুলিশের কর্ম্মচারীরা দুষ্কর্ম্মশালী এবং আদালতের বাঙ্গালী আমলারা অশত ও ঘুশখোর এই সকল কারণের জন্য সাহেবেরা আইনের ক্ষমতা আপন হস্তে লএণ অর্থাৎ বে-আইনী কর্ম্ম করেন, কিন্তু যে অপরাধে সাহেবরা তাহাদের প্রজাদিগকে কয়েদ করিয়া শাস্তি দিয়া থাকেন সে অপরাধে এমন কোন দেশের আইন নাই যদ্বারা বিচার হইলে সেই সকল ব্যক্তি ঐ শাস্তি পাইত, অর্থাৎ কয়েদ হইত।"

২১ History of Indigo Disturbance in Bengal with a full Report of the Neel Darpan Case : L. C. Mitra ; p. 38.

২২ ইণ্ডিগো কমিশনারদিগের রিপোর্ট : ১৬ দফা ; পৃ.

* * * *

"১১২ দফা। অধিকাংশ পুলিশ আমলারা যে ঘুশ লয় এবং অশত তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না, এবং ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে উত্তম পুলিশের অভাবে সকল ব্যবসা এবং চাস কর্ম্মের অনেক ব্যাঘাত হয়—নীলকর এবং প্রজার সাধারণ কর্ম্মের প্রতি পুলিশের হস্তক্ষেপন করিবার কোন ক্ষমতা নাই এবং তাহা করেও না—নীলকরেরা যখন প্রজাদিগকে দাদন দেয় অথবা তাহার জমি তদারক করিতে যায় তাহাদিগকে পুলিশ আমলারা কোন বাধা দেয় না কেবল বলপূর্ব্বক কোন এক জমি দখল ও বুনানি করিতে গেলে পুলিশের সহায়তা আবশ্যক করে এমতস্থলে কোন পক্ষকে পুলিশ আমলারা অধিক শহায়তা দেয় তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন—নীলকরেরা প্রকাশ করিতে গোপন করেন নাই যে তাহাদের বিরুদ্ধে মন্দ ও মিথ্যা এতলা না করে এবং যথার্থ কর্ম্ম হয় এজন্য তাহারা পুলিশ আমলাকে ঘুস দিয়া থাকেন এমন অবস্থায় যখন অন্যান্য বাজারের দ্রব্যের ন্যায় পুলিশের সহায়তা ক্রয় করা যায় তখন যে ব্যক্তিরা অধিক টাকা ব্যয় করিতে পারে সেই ব্যক্তি পুলিশের সহায়তা লাভ করিতে পারে এবং নীলকরেরা ইহা অস্বীকার করেন না যে তাহাদের সহিত প্রজার বিবাদ হইলে পুলিশ কর্ত্তৃক তাহারা কোন ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।"২৩

নীলকরদের অত্যাচারে জমিদাররাও রেহাই পেতেন না। জমির পত্তনি নিয়েই নীলকরদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধত। অনেক জমিদার যেমন উচ্চ টাকার লোভে নীলকরদের জমি বিক্রি করেছিলেন, তেমনি অনেকে আবার জমি বিক্রি বা পত্তনি দিতে চাইতেন না। পত্তনি দিতে না চাইলে এদের নিস্তার ছিল না। 'ইণ্ডিগো কমিশনারদের রিপোর্টে', এই মর্মে এক সাক্ষ্যের সমালোচনায় পাই,

"৪৩ দফা। ...একদল জমিদার কহিয়াছেন যে নীলকর তাহার নিকট ইজারা লইবে এই মানসে তাহার সহিত বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার কারবারে বাধা দিয়াছিলেন—বাবু শ্রীগোপাল পালচৌধুরী, হরনাথ রায়, প্রাণকৃষ্ণ পাল এবং অন্যান্য জমিদারেরা প্রকাশ করিয়াছেন যে যদ্যপি ইজারা অথবা পত্তনি দিতে তাহাদের মানস ছিল না, তথাপি হাকিম তাহাদিগকে নারাজ করিবার ভয়ে ও অন্যান্যরূপে অপমান হওয়ার আশঙ্কায়

২৩ ইণ্ডিগো কমিশনারদিগের রিপোর্ট; পৃ. ৪৪-৫০।

নাচার হইয়া ইজারা পত্তনি দিয়াছেন জমিদার মুন্সী লতাফত হোসেন বিলক্ষণরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে তাঁহার সহিত একজন নীলকুঠির মালিকের সর্ব্বদা বিবাদ হওয়াতে ম্যাজেস্ট্রেট সাহেব ১৮৫১ সালে তাঁহার প্রতি এক হুকুমনামা জাহির করেন, তদ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে জমিদারকে নীল করের সহিত আপস নিষ্পত্তি করিতে তিনি ভয় দর্শাইয়া পরামর্শ দিয়াছিলেন।"[২৪]

জমিদার ও নীলকরদের বিবাদে, জমিদাররা নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত নীলকরদের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হতেন। নীলকরেরা জমিদারের কাছ থেকে পত্তনি নিয়ে বলপ্রয়োগে তার মালিক হয়ে বসতেন। আইন-আদালতের সাহায্য ভিক্ষা ছিল অরণ্যে রোদন মাত্র।

"নীলকরের বিরুদ্ধে বিচারের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে কুঠিয়াল সাহেব বিচারকের পাশের চেয়ারে বসিতেন, দেশীয় জমিদার বা প্রজা কাঠগড়ায় থাকিতেন। বিচারক অফিসান্তে কুঠিতে কুঠিতে নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়াইতেন। নীলকুঠি চাষী ও জমিদারের ঘাড়ের উপর অবস্থিত, আর আদালত অনেক দূর, অর্থ ও সময়ের শ্রাদ্ধ করিয়া সেখানে পৌঁছাইতে পারিলেও বিচারের ফলাফল এইসব ক্ষেত্রে জানাই ছিল। জমিদার নিজের তালুক মুলুক নীলকরকে ইজারা পত্তনি দিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন, রায়তেরা লোকসান জানিয়াও নীলের দাদন লইতেন।"[২৫]

জমির পত্তনি নিয়ে দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে নীলকরদের সংঘাত ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল। অনেক ক্ষেত্রে জমিদারেরা নীরবে অত্যাচার সহ্য করেছেন, আবার অনেকেই সশস্ত্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রতিবাদী জমিদারগণের মধ্যে যশোহর জেলার নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়, ঝাউদিয়ার জমিদার করম আলি চৌধুরী, নদীয়া জেলার বীরনগরের জমিদার শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, দিগম্বরপুরের জমিদার কৈলাশচন্দ্র রায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ভূ-স্বামীরা কৃষকদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করেছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই

২৪ ইণ্ডিগো কমিশনারদিগের রিপোর্ট ; পৃ. ১৯—২৩।

২৫ যশোহর খুলনার ইতিহাস (২য় খণ্ড) সতীশচন্দ্র মিত্র; পৃ. ৭২০

নীলবিদ্রোহ ছিল, দেশের মেহনতী মানুষের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। কালক্রমে উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনগণের সমর্থন পেয়ে এই বিদ্রোহ বাঙ্গলাদেশে সর্বজনীন রূপ পেয়েছিল।

বক্ষ্যমান আলোচনার ক্রমানুপাতিক রূপটি অনুভব করলে দেখা যাবে যে, নীলবিদ্রোহ ছিল নীলকরদের অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া থাকে। গতিতত্ত্বের এইটাই সাধারণ নিয়ম। আর সেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সমর্থিত পথেই নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হয়েছিল বাঙ্গলাদেশে। 'নীল কমিসনারদের রিপোর্টে' এই বিশ্বসত্যটি স্বীকৃত হয়েছিল। তাঁরা লেখেন,

"১৩১ দফা। নীল আবাদের প্রতি প্রজাদিগের আন্তরিক ঘৃণা জন্মিয়াছে যে ব্যক্তি তাহাদের সহিত কথোপকথন করে নাই এবং তাহাদের ভাব ভক্তি দৃষ্ট করে নাই প্রজাদিগের মনে নীল আবাদের পক্ষে যে কতদূর অনিচ্ছা তাহা তাহারা বুঝিতে পারেন না—ভিন্ন ২ স্থানের প্রজারা আমাদের জানাইয়াছে যে সাঁপগ্রস্থ হইলে মনুষ্যের যে প্রকার কষ্ট পাইতে হয় সেই প্রকার জীবনাবধি নীলকর্ম্ম তাহাদের পক্ষে তাহারা জ্ঞান করিয়াছে, এবং এই সকল কথা তাহারা এমন প্রকারে প্রকাশ করিয়াছে যে চাষি ব্যক্তির নিকট তাহা শুনিবার কোন সম্ভাবনা নাই—কিন্তু নীলের অত্যাচার ভিন্ন তাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অথবা সাধারণ ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে কোন বিষয়ে নালিশ জানায় নাই—অতএব আমরা বিলক্ষণরূপে বিবেচনা করিতেছি যে এই ১৮৬০ সালে নীলের বিরুদ্ধে যে গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে তাহা কখনও না কখন অবশ্যই ঘটিত।"[২৬]

সুতরাং যে গণ-অভ্যুত্থান অব্যর্থ ছিল, তার গতিবেগ ও প্রখরতা যে তীব্র হবে তা অনস্বীকার্য। কৃষকদের মনের বারুদের উত্তাপ, সমকালীন বড়লাট 'লর্ড ক্যানিং'-এর লেখনীতে ধরা পড়েছে। তিনি বিলাতের 'Secretary of State'-কে লেখেন,

"I assure you, that for about a week, it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi. And from that day I felt that a shot fired in anger or

২৬ ইণ্ডিগো কমিসনারদিগের রিপোর্ট: পৃ. ৫৭-৫৮

fear by any one foolish planter might put every factory in Lower Bengal in flames".[২৭]

সমসাময়িক পত্রিকাতে এই সময়কার যে বর্ণনা পাই তা হচ্ছে,

"বাংলার গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা আকস্মিক ও অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে। এক মুহূর্তে তারা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে। যে রায়তদের আমরা ক্রীতদাসের মত বা রুশদেশের ভূমিদাসের মত চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিলাম, জমিদার ও নীলকরদের নির্বিরোধ যন্ত্ররূপে যাদের আমরা জানতাম, অবশেষে তারা জেগে উঠেছে, কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে তাদের আর শিকল পরিয়ে রাখা চলবে না। বর্তমানে গ্রামের লোকেরা যে রকমের আশ্চর্য্য অনুভূতির দ্বারা নীলচাষকে গণ্য করেছে ও যার ফলে তারা অনেক স্থানে ফেটে পড়েছে তা সব থেকে দূরদর্শী ব্যক্তিরাও কল্পনা করতে পারেন নি। ১৮৫৭ সালের ঠিক পরেই এইসব ঘটনা বাংলার ভবিষ্যতের উপর যে খুব প্রভাব বিস্তার করবে তাতে সন্দেহ নেই।"[২৮] (অনূদিত)

এই উক্তির শেষাংশটুকু স্মরণ করবার মত। বাস্তবিক সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই বাঙ্গলাদেশে জন্ম হয়েছিল সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙ্গালী, সমাজ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আপনদেশ, জাতি-ধর্ম ও জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক প্রত্যয়-গ্রাহ্য ধারণার সৃষ্টি করে। নীল আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাঙ্গালীর স্বাধিকারবোধ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমাগত নিপীড়িত হতে হতে বাঙ্গালী বুঝতে পারে যে, প্রতিবাদই আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। অন্যায় ও অবিচারকে প্রতিরোধ করতে না পারলে জাতীয় উন্নতি কোন প্রকারেই বিকাশমুখী হয়ে উঠতে পারে না। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, স্বাদেশিক আদর্শের এই মহান সত্যটি বাঙ্গলার চাষীরাই প্রথম বুঝেছিল। জীবনপণ করে নীল রায়তরা জানিয়েছিল যে প্রাণান্তেও তারা নীলচাষ করবে না। 'নীল কমিশনের' সামনে সাক্ষ্যে তারা বলেছিল,

২৭ Vide : History of Indigo Disturbance in Bengal with a full Report of the Neel Darpan Case ; L. C. Mitra ; p. 39

২৮ Calcutta Review : June. 1860—p. 355

(১) দিনু মণ্ডল—"আমার গলা কেটে ফেললেও আমি নীল বুনব না—বরং মৃত্যু স্বীকার করব তবু নীল বুনব না।" (উত্তর নং ১১৫০)

(২) জামির মণ্ডল—"আমি এমন দেশে চলে যাব যেখানকার লোক নীল কখনও চোখে দেখে না বা নীল বোনে না" (উত্তর নং—১১৮০)

(৩) হাজি মোল্লা—"বরং বাড়িঘর ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাব, ভিক্ষা করে খাব, তবু নীল বুনব না।" (উত্তর নং ১২১৬)

(৪) পাঞ্জু মোল্লা—"আমাকে গুলি করে মেরে ফেলুন, তবু আমি নীল বুনব না।" (উত্তর নং ১২৪৯)

যশোহর, নদীয়া, পাবনা, বারাসত, রাজসাহী, ফরিদপুর অঞ্চলে নীলচাষীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেছিল। তবে প্রথম থেকেই তারা ইংরেজ সরকারের শাসননীতির বিরুদ্ধাচরণ করেনি। সমষ্টিগত আবেদন বর্তমান যুগের আন্দোলনের যা প্রাথমিক নীতি, তাকে অনুসরণ করেছিল একান্ত অনুগতভাবেই। ছোটলাট 'গ্রাণ্ট' সাহেব সাক্ষ্য প্রদান কালে বলেছিলেন যে, 'কুমার' ও 'কালীগঙ্গা' নদী দিয়ে যশোহর ও নদীয়া সফরের সময় সহস্র সহস্র নরনারী ও শিশু এই নদীর দুই ধারে দাঁড়িয়ে অত্যাচার দমনের জন্য আইন জারি করে নীলচাষ বন্ধের দাবি জানায়। তিনি এ-বিষয়ে 'মিনিটে' মন্তব্য করে লেখেন,

"I do not know whether it ever fell to the lot of an Indian Officer to steam for fourteen hours through a continuous double street of suppliants for justice; all were most respectable and orderly but also were plainly in earnest. It would be folly to suppose, that such a display on the part of ten thousands of people, men, women and children has no deep meaning. The Organisation and capacity for combined and simultaneous action in the case, which this remarkable demonstration over so large, an extent of country, proved are subjects of worthy consideration."[২৯]

[২৯] Vide: History of Indigo Disturbance in Bengal with a full report of the Neel Darpan case; L. C. Mitra, p. 39.

কিন্তু চাষীরা যে সমাধান, সহানুভূতিতে চেয়েছিল তা ফলপ্রসূ হয়নি। তাই পরে মরিয়া হয়ে তারা দলে দলে নীল কুঠির উপর আক্রমণ শুরু করেছিল। নীল সংগ্রাম কত তাড়াতাড়ি বৈপ্লবিক আকার ধারণ করেছিল তার পরিচয় পাই কৃষ্ণনগরের জার্মান পাদ্রী 'বম্‌ভাইটস'-এর লেখা এক বর্ণনাতে।

তিনি লেখেন,

"বল্লভপুরের নীলচাষীরা নীল বুনতে অসম্মত হ'লে নীলকরেরা লাঠিয়াল দিয়ে তাদের গ্রাম আক্রমণ করবে বলে শাসায়। এই খবর পেয়ে গ্রামের লোকেরা লড়াইয়ের জন্য জড় হয়। নীলকরদের পরিকল্পিত আক্রমণ কার্যরূপে পরিণত হয়নি। তার কারণ, নীলকরের লাঠিয়ালরা লড়াইয়ের জন্য প্রজাদের দৃঢ়সংকল্প দেখে ভীত হয়ে পড়েছে। কৃষকরা ৬টা বিভিন্ন কোম্পানীতে নিজেদের ভাগ করে নিয়েছিল। একটি কোম্পানী হয়েছিল শুধু তীর-ধনুক নিয়ে। প্রাচীনকালের 'ডেভিডের' মত ফিঙাদ্বারা নিক্ষেপকারীদের নিয়ে আর একটা কোম্পানী। ইটওয়ালাদের নিয়ে আর একটা কোম্পানী, যারা আমার উঠোন থেকেও ইটপাটকেল কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। আর এক কোম্পানী হল বেলওয়ালাদের। তাদের কাজ হল শক্ত কাঁচা বেলগুলি নীলকরদের লাঠিয়ালদের মাথা লক্ষ্য করে মারা। থালাওয়ালাদের নিয়ে আর একটা কোম্পানী, তারা তাদের ভাত খাবার পিতলের থালাগুলি অনুভূমিকভাবে শত্রুকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে, তাতে শত্রু নিধন ভালো করেই হয়। আর একটা কোম্পানী হল রোলাওয়ালাদের নিয়ে। যারা খুব ভালো করে পোড়ানো ভাঙা কিংবা আস্ত মাটির বাসন-কোসন নিয়ে শত্রুদের অভ্যর্থনা জানায়। বিশেষ করে বাঙ্গালী মেয়েরা এই অস্ত্র প্রয়োজনমত ভালোভাবেই ব্যবহার করতে জানে। এদিন নীলকরের লাঠিয়ালরা যখন দেখতে পেল যে মেয়েরা এইসব অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের দিকে ছুটে আসছে, তখন তারা ঘাবড়ে গিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল। এসব ছাড়া আরও একটি বাহিনী গঠিত হয়েছে, যারা লাঠি চালাতে পারে তাদের নিয়ে। তারপর তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনী হল 'যুধিষ্ঠির কোম্পানী' অর্থাৎ সড়কিওয়ালারা। এই কোম্পানীতে মাত্র ১২ জন লোক আছে, কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার একজন সড়কিওয়ালাই ১০০ জন লাঠিয়ালকে হটিয়ে দিতে পারে। এরা সংখ্যায় কম হলেও, এরা দুর্ধর্ষ, এবং এদেরই

ভয়ে নীলকরের লাঠিয়ালরা এমন ভীত হয়ে পড়েছে যে এখন পর্যন্ত তারা এগোতে সাহস করেনি।"[৩০] (অনূদিত)।

সমকালে নীল বিদ্রোহের প্রধান সমর্থক ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রায়তদের বিদ্রোহের অনেক ঘটনা তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া শিশিরকুমার ঘোষের অপূর্ব কর্মতৎপরতার কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পূর্বেই স্মরণ করেছি। নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যাঁরা অনমনীয় মনোবল নিয়ে সমস্ত কিছু প্রতিকার করবার বাসনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, নদীয়ার চৌগাছা গ্রামের বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়—'বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস' ও 'দিগম্বর বিশ্বাস', মালদহের 'রফিক মণ্ডল' ও পাবনা অঞ্চলের 'মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'। 'বিষ্ণুচরণ' ও 'দিগম্বর'—এই বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের বীরত্বের কথা সেযুগে উপকথার মত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহাত্মা 'শিশিরকুমার ঘোষ', কোন এক বন্ধুর অনুরোধে ১৮৮০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর, 'A Story of Patriotism in Bengal' শিরোনামে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের বীরত্বের কথা 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' লিখেছিলেন। 'বঙ্কিম জীবনীকার 'শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন,

"বাঙ্গালী মার খাইয়া অবশেষে মারিবার জন্য বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইল। একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের (চৌ-গাছার) দুইজন সামান্য প্রজা।...এই দুই সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ বাঙ্গালার নিঃস্ব, সহায়শূন্য প্রজাদের একপ্রাণে বাঁধিল; সিপাহী বিদ্রোহের সদ্য নির্ব্বাপিত আগুনের ভস্মরাশি লইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইতে লাগিল।"[৩১]

নীল আন্দোলনে 'রফিক মণ্ডলের' কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

"Foremost in the Indigo dispute and spending both time and money in opposition to the planters fighting every battle to the bitter end even in the High Court and before the Sudder Revenue Board of Calcutta, and never yielding a foot of ground while he was able to maintain it."[৩২]

৩০ Indian Field : February, p. 4, 18;0.

৩১ বঙ্কিম জীবনী : শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পৃ. ৮৭-৮৮।

৩২ English Rule and Native Opinion : Ratleige ; p. 70.

পাবনা অঞ্চলের নীল আন্দোলনের নেতা মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে লেখা হয়েছিল,

"Ryots of the most of the concerns in Pubna have expressed their determination not to sow any more Indigo. ...the magistrate of the district reports that there is a very strong combination amongst Ryots to break off their connection with Indigo, and that one Mohesh Chundar Bandopadhya, an inhabitant of Nuddea District, is the prime mover in it. The Ryots are much excited, and although perhaps not intentionally seeking to break peace, a breach of it may, I concur with the magistrate in thinking, be brought about at any moment by an accidental collision ...measures have been taken to bind Mohesh Chunder Bandopadhya, who, there seems strong grounds to suppose, will invite a rapture."[৩৩]

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই জাতীয়-বিপ্লবে যোগদান করেছিল। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তা, এই আন্দোলনের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে সোচ্চারিত না হলেও, ভবিষ্যতে স্বাধিকার অর্জনের যে স্পৃহা বাঙ্গালীর চিত্তে জাগরুক হয়েছিল, তার বীজটি নিহিত হয়েছিল নীল-আন্দোলনের মধ্যে। অত্যাচার ও শোষণের প্রতিবাদ করতে হবে, জাতি নির্বিশেষে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজের অধিকার ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং ভীরুতাকে জয় করে দুর্নিবার হয়ে উঠতে হবে; স্বাদেশিকতার প্রধান চিন্তাধারা এই বিদ্রোহরূপ থেকেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। নীল বিদ্রোহের আগ্নেয় আলোকে দেশবাসীর আত্মদর্শন হয়েছিল। তাই নীলবিদ্রোহ নিঃসন্দেহে, 'a land mark in the history of Nationalism.'।[৩৪] হরিশ মুখোপাধ্যায়, 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নীল আন্দোলনকে সমর্থন করে লেখেন,

"Bengal might well be proud of its peasantry. In no other country in the world is to be found in the tillers of

৩৩ Commissioners Report : Mr. Reed p. 46.

৩৪ 'Nationalism' : Royal Institute of International Affairs ; p. 154.

the soil the virtues which the ryots of Bengal have so prominently displayed ever since the Indigo agitation has begun. Wanting power, wealth, political knowledge and even leadership, the peasantry of Bengal have brought about a revolution inferior in magnitude and importance to none that has happend in the social history of any other country. They have battled with adversaries possessing some of the most formidable elements of power. With the Government against them, the law against them, the tribunals against them, the Press against them, they have achieved a success ot which the benefits will reach all orders and the most distant generations of our countrymen. And all this they have done by sheer force of virtue, by patience, perseverance and fortitude, without committing a single crime-almost a single act of violence, ...The revolution has caused the ryot community a vast mass of suffering. They have been beaten, insulted, bound, starved, imprisoned, ousted from home, deprived of their property, subjected to every form of oppression one can imagine. Villages have been burnt, men carried off, women violated, stores of grain destroyed, and every means of coercion has been used. Yet the ryots have not yielded, they have not ceased to aspire after the freedom which they feel to be their birth right and which they have been told the law assures them. Let them but suffer on a few weeks more, and they will gain their darling object. A revolution will have been effected in their social condition, the beneficial effects of which will reach all the country's institutions. The defects of our law, the vices of our courts, the inefficiency of the police, the oppression systematically

practised by some classes, and the general prevalence of anarchy will have been exposed in a manner never hither to made-in a manner which will make reform inevitable."[৩৫]

গণবিপ্লবের পশ্চাতে লিখিত থাকে জাতির সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক বিপর্যয়। নীলবিদ্রোহের পশ্চাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক বিপর্যয় যে কারণ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। জাতীয় ঐক্য, নিবিড় সহানুভূতি, অনমনীয় দৃঢ় সংকল্প ও লৌহকঠোর প্রতিরোধ, এই বিদ্রোহকে কালক্রমে জাতীয় আন্দোলনের রূপ দান করে। শিশির-কুমার ঘোষের মতে, নীলবিদ্রোহ ছিল একটি পূর্ণ রাজনৈতিক অভ্যুত্থান। তিনি পরবর্তীকালে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় মন্তব্য করেছিলেন,

"It was the Indigo disturbance which first taught the natives the value of combination and political agitation. Indeed, it was the first revolution in Bengal after the advent of the English. If there be a second revolution it will be to free the nation from the death grips of the all-powerful police and District Magistrates. Nothing like oppression: It was the oppression which brought about the glorious revolution in England and it was the oppression of half a century by Indigo planters which at last roused the half-dead Bengalee and infused spark in his cold frame."[৩৬]

বাঙ্গালী তার শীর্ণ ধমনী ও হিম-শীতল জীবন-চিত্তে, জাতীয়তার স্পন্দন ও উষ্ণ রক্তোচ্ছ্বাস প্রথম অনুভব করেছিল নীলবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। স্বাধিকার অর্জনের এটাই ছিল প্রথম সামরিক শঙ্খ নিনাদ। আর সিপাহী বিদ্রোহের ফলশ্রুতিই ছিল উক্ত গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে কালব্যাপ্তি, তা হচ্ছে বঙ্গ সমাজের পক্ষে এক মাহেন্দ্রক্ষণ।[৩৭] কেবল সমাজ বিপ্লব নয়, বৃহত্তর জাতীয় বিপ্লব এই পর্বে

৩৫ Hindu Patriot: May 19, 1860,

৩৬ Amrita Bazar Patrika: May 22, 1874

৩৭ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী; পৃ. ২০২

ঘটে। বাঙ্গালীর জীবনে সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন,

"সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল, এক নব শক্তির সূচনা হইল এক নব শক্তির আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।"[৩৮]

দীনবন্ধুর, 'নীলদর্পণ' নাটক বাঙ্গালীর এই জাগ্রত জীবনচেতনার শ্রেষ্ঠরূপ ও রূপায়ণ। কোন গণ-বিপ্লব যখন প্রকৃত দেশপ্রীতির মর্যাদা পায়, জাতির জীবনে কর্মমুখর প্রভাব বিস্তার ও আলোড়ন সৃষ্টি করে তখনই তার সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে। জীবনের অনুভূতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেই বিপ্লবচেতনা সাহিত্যের বাহন হয়। দেশের সংস্কৃতির মধ্যেই জাতীয়তার প্রতিচ্ছবি নিহিত থাকে। নীল আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অনুরূপটি ঘটেছিল। সংগীতে,* লোকাভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়েও বাঙ্গালীর লাঞ্ছিত জীবনবোধের প্রকাশ দিকে দিকে ঘটতে লাগল। তবে এর মধ্যে কোন করুণ সুর ছিল না, ছিল প্রতিবাদের ভৈরব টংকার। বাংলা নাট্যসাহিত্য পিনাক ধ্বনিতে দেশবাসীকে সজাগ করবার দায়িত্ব একাকী গ্রহণ করেছিল, আর এর নান্দী পাঠক ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। 'নীলদর্পণ' নাটক এই জাতীয় গৌরবের প্রথম

৩৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃ. ১৯৬

* বাঙ্গালীর জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব সম্পর্কে রেভারেণ্ড পাদ্রী লঙ, নীল কমিশনের সামনে বলেছিলেন, "Songs have a powerful effect among the Bengalees and are used for religions and other purposes with great success, justifying the remarks of Burke, "Give me the making of the ballads of a nation, I will give you the making of the laws." I beg to submit a pamphlet published in Bengali and widely circulated called, "The oppression of the Indigo planters." It contains song which have been sung far and wide, among the natives and set to music. ...

I can assure the Commissioners that in no language can depict the the burning indignation with which Indigo planting is and has been regarded by the native population. It alarms me seriously for the future peace of India, unless, an equatable adjustment of the question is made."

—History of Indigo Disturbance in Bengal with a full Report of the Neel-Darpan Case, By Lalit Chandra Mitra, page 21.

অধিকারী। বাঙ্গালীর প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ জাগ্রত জাতীয় চেতনাই এর বিস্তৃততর পটভূমি। বাঙ্গালীর খরতপ্ত হৃদয় বেদনাকে তিনি এই নাটকে বাণীবদ্ধ করেছেন। 'নীলদর্পণ' নাটককে কেন্দ্র করে দেশে স্বাদেশিকতার যে উন্মাদনা এসেছিল, তা স্মরণ করে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,

"১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গ সমাজে তুমুল আলোড়ন তুলিয়াছিল। কোন গ্রন্থ বিশেষে যে সমাজকে এত দূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। নীলদর্পণ কে লিখিল তাহা জানিতে পারা গেল না। কিন্তু বাসাতে বাসাতে, "ময়রাণী লো সই,—নীল গেজেছ কই!" ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল।...হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল। এ নাটক কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল কিছুই জানা গেল না। এ নাটক প্রাচীন নাটকের চিরাবলম্বিত রীতি রক্ষা করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল না, ঘটনা সকল সত্য কি না—অনুসন্ধান করিবার সময় পাওয়া গেল না, নীলদর্পণ আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল, তোরাপ আমাদের ভালবাসা কাড়িয়া লইল, ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল, মনে হইতে লাগিল রোগ সাহেবকে যদি পাই অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি।"[৩৯]

আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'নীলদর্পণ' নাটক বাঙ্গালীর চিত্ত প্রদেশে যে স্বাধিকার অর্জনের স্পৃহা এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে নিবিড় ঐক্যবোধ এবং সমবেদনা সৃষ্টি করেছিল, শিবনাথ শাস্ত্রী তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। ভারতবর্ষে, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয়তাবোধ বিস্তারে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক একটি উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। দীনবন্ধু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রখর আত্মমর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েই বাঙ্গালীর হাতে 'নীলদর্পণ' নাটক তুলে দেন। নাট্যকারের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও গভীর সহানুভূতির জন্যই নিষ্পেষিত মানবাত্মা বাণীর স্পর্শ পায়। জাতির স্বাভিমান ও আত্মমর্যাদাবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাঁর স্বাদেশিক চিত্তের প্রধান লক্ষণ ছিল বলেই, তিনি বাঙ্গালীর জীবন-ক্রন্দন ও মুক্তিপিপাসাকে নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

দীনবন্ধু কোন রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি করবার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে

---

৩৯ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃ. ২০১ ও ২২১

এই নাটক লেখেননি, তবে কালক্রমে 'নীলদর্পণ' রাজনৈতিক নাটকের মর্যাদা লাভ করেছিল। সমকালীন মানুষের জীবনানুভাবনায় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ও ভাবানুরঞ্জনের মোহময় কল্পনা বিনষ্ট হয়ে একটি অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ দানা বেঁধে উঠেছিল ; দেশের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে রাজনৈতিক চিন্তা পুষ্টিলাভ করছিল, তাতে সঙ্ঘবদ্ধ গণতান্ত্রিকচেতনা থাকলেও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের কোন কথা তাঁদের উক্তিতে স্থান পায়নি। কেবলমাত্র স্বদেশ ও স্বজাতিকে সকল রকম দুর্গতি থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা শিক্ষিত দেশবাসীর কর্মচিন্তার মধ্যে রূপায়িত হচ্ছিল। প্রকাশ্যভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে বৈরী ভাবের অবতারণা না করে দেশবাসীকে আত্মসচেতন করার চেষ্টা ছিল সমকালের রাষ্ট্রচেতনার মূলতত্ত্ব। ইংরেজ বণিকদের অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে দেশের সমস্ত সম্পদ ও অর্থ কি ভাবে এদেশবাসীর উন্নতির স্বার্থে বিনিয়োগ করে প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি করা যায়, সেটাই ছিল নীল-বিদ্রোহের মূলকথা। নীলচাষী ও কতিপয় জমিদারগণ, যাঁরা নীলকরদের বিরুদ্ধে খড়্গপানি হয়েছিলেন, তাদেরও উদ্দেশ্য ছিল এটাই। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে এই ভাবটির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। দীনবন্ধু ইংরেজদের অর্থশোষণের বিরুদ্ধে তরঙ্গ সংকেত করেন। নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ ও জাতির মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা, তাঁর জীবন ও কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বলেই, তিনি ব্যক্তি মনের মর্মবেদনাটি প্রকাশ করেন, "নীলকর বিষধর দংশন কাতর প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্" অভিজ্ঞানের মধ্যে।

সর্বজনীন মর্মবেদনার সঙ্গে নাট্যকারের ব্যক্তিমনের অনুভূতি স্বাভাবিক-ভাবে আদ্র হয়েছিল বলেই তিনি আপন স্বাদেশিক চিত্তের অনুভাবনাটিকে সেবাধর্মের নির্মোকে প্রকাশ করেছেন।

দীনবন্ধু মিত্রের স্বাদেশিকতার ভিত্তিভূমি হল, 'সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সর্বব্যাপী সহানুভূতি'। এই দু'য়ের বিচিত্র সংমিশ্রণের ফলে তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটক কালজয়ী হয়েছে। নাট্যকারের একান্ত বাস্তব সচেতন জীবনানুভাবনা জাতীয়তার সুরে এবং বিশিষ্ট যুগের ও জীবনের পরিবেষ্টনীতে রূপায়িত হলেও, একটি শাশ্বত জীবনসত্য অবক্ষয় জীবনযন্ত্রণার মধ্যে রসসিক্ত হয়েছে বলেই তাঁর নাটক সমসাময়িক কালের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। 'নীলদর্পণ' নাটক সেকালে আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি ও খ্যাতি লাভ করে।* বঙ্কিমচন্দ্র এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন,

"নীলদর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গালার আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই।"[৪০]

দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতার পিছনে আছে ঈশ্বর গুপ্তের অসামান্য প্রভাব। তাঁর স্বাদেশিকতার হাতেখড়ি 'সংবাদ প্রভাকরে'র পাতায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে হয়েছিল। দীনবন্ধু তাঁর সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তের কাছে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের গণসংযোগ সম্বন্ধে লিখেছেন,

"তিনি যেখানে যাইতেন সেইখানেই সমাদর ও সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিত না তাঁহারাও তাঁহার মিষ্টভাষীতায়

* ইংলিশম্যান কাগজ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'Literary Bengal' কলমে পূর্বের বিরোধিতা (১৮৬১) ভুলে গিয়ে লেখেন, "On the Bengalee dramatists the only one well-known to European Readers is Dinobandhu Mitra. But in his case again the popularity was scarcely literary. He wrote 'Nil Darpan' regarding the political effects of which Mr. Buckland gives so interesting narrative in his book about the Lieutenant Governor of Bengal. ...Yet there are passages in Nil Darpan which Bengali students say one matchless for grace and purity of style."

—Englishman, April 4, 1901.

৪০ দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও সমালোচনা: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বসুমতী সংস্করণ)।

মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণসূত্রে সকল প্রান্তের লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল।...ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত স্থানে নৌকা লাগিলে তীরে উঠিয়া পথে যে সমস্ত বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগের বাটিতে যাইতেন .....বালকদিগের অভিভাবকগণ শেষে ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যথাসাধ্য সমাদর করিতে ত্রুটি করিতেন না।"[৪১] দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কেও তাঁর অনুরূপ মন্তব্য আমরা দেখতে পাই,

"এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে? কাহার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও সৌহার্দ্য ছিল না? ...এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে কে বিশেষ না জানে? দার্জিলিং হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত, কাছাড় হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে কয় জন ভদ্রলোক দীনবন্ধুর বন্ধুমধ্যে গণ্য নহেন? কয় জন তাঁহার স্বভাবের পরিচয় না জানেন? কাহার নিকট পরিচয় দিতে হইবে? দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন, বাঙ্গালায় এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছেন। যে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিত, সেই তাঁহার সহিত আলাপের জন্য উৎসুক হইত। যে আলাপ করিত, সেই তাঁহার বন্ধু হইত।"[৪২]

এমনিভাবে, গুরু-শিষ্য উভয়েই বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালীর বিশাল প্রাণের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাই একজন খাঁটি বাঙ্গালী কবি, আর একজন খাঁটি বাঙ্গালী নাট্যকার। উভয়ের মধ্যেই বাঙ্গালীর শাশ্বত জীবন স্পন্দন ধরা পড়েছে। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতার অন্যতম ফসল হচ্ছে,— 'নীলদর্পণ' নাটক। নাটকের পরিবেশ রচনা ও ঘটনাবৈচিত্র্যে নাট্যকারের সুগভীর অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বিদ্যমান। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি সামাজিক অভিজ্ঞতার জীবন মন্থনজাত লৌকিকচেতনার অভিব্যক্তি। বাস্তবচেতনায় পুষ্ট হয়ে, মানবিকতার আদর্শে তিনি আপনকালের সুবিস্তৃত গণজীবনের যন্ত্রণার ও বিপর্যয়ের চিত্রগুলি নাটকাকারে রূপায়িত করেছেন। এইখানেই তাঁর স্বাদেশিকতার ভিত্তিভূমি। মধুসূদন দত্তের মত তিনি মহাকাব্যোচিত বিশালতার অধিকারী হননি। ব্যক্তিগত জীবনের অশান্ত ঘূর্ণিপাকের ভিতরে যে মহাসমর সংগঠিত হয়ে জীবনের সমস্ত মাধুর্যকে নষ্ট করে দেয়,

---

৪১ ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাসংগ্রহ : ভূমিকা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বসুমতী সংস্করণ)।

৪২ দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বসুমতী সংস্করণ)।

তারও কোন চিহ্ন তাঁর রচনাতে নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক দুর্দশায় ও বিচারের প্রহসনে সামাজিক জীবনে মানুষের অমূল্য প্রাণ কি রকম নিষ্করুণভাবে ঝরে যায়, নীলকরদের অমানবিক অত্যাচারে সাধারণ নিরন্ন গ্রামবাসীদের অশ্রু-জল ও দীর্ঘশ্বাস কিভাবে মনের আকাশকে খান্‌খান্ করে দেয়, অত্যাচারীদের কুটিরের অভ্যন্তরে শ্যামচাঁদের প্রহারে রুধিরাপ্লুত শরীরের চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন ও প্রতিশোধ গ্রহণের অক্ষম প্রয়াস এবং সর্বোপরি গৃহাঙ্গনার সুখ-স্বপ্ন ও সতীত্ব, ব্যভিচারী ও পরপুরুষের কামাগ্নিতে আহুতিদান করে কিভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়, সব কিছুই তিনি চোখের সামনে ঘটতে দেখেছিলেন।* তিনি কর্মসূত্রে নদীয়া, যশোহর ও অন্যান্য জেলার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। 'তাই কল্পনার অনুমানে ধরিত্রীর মহাএকতান,' কোনদিন তাঁকে ভাব-বিলাসী করে তোলেনি। দেশের প্রতি আবশ্যিক দায়িত্ব ও জনগণের কাছে কর্তব্যবোধ পালন করার মহান তাগিদ থেকেই তিনি 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেছিলেন।

দীনবন্ধুর এই মানস প্রবণতার পশ্চাতে বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ, সংস্কারমুক্ত মন ও

* "The author of Nil Darpan was born in an Indigo district himself, and had ample opportunity of studying the doings of the planters and their dependents. Not far from the home of his infancy in the district of Nadia (Chaubaria) stood an Indigo factory and the evils attendent on the manufacture of the blue dye the abuses and the oppressions committed by the European Planters, their system of forcing the ryots into unprofitable contracts which once begun was bequeathed from groaning sire to bleeding son—were some of the facts that had impressed themselves, indelibly on his mind from youth upwards. His heart bled to see the miseries of the defenceless poor and at last he published this book—his first dramatic work anonymously bringing together the facts and incidents which had come under his personal observation and weaving them into the main plot with the skill of a true artist. The success of the book was as great as it was quick. It did immense service in awakening the minds of all classes of the native population to the gross misery of the people of the Indigo district, and it helped the cause of the abolition of the Indigo slavery in Bengal."

—Haran Chandra Chakladar, 'Fifty Years Ago', Dawn Magazine, July 1905.

মানবচেতনা কাজ করেছিল। তিনি নিজে হিন্দুকলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের প্রত্যয়-নিষ্ঠ বলিষ্ঠ যুক্তিবাদ, বস্তুসচেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতা, সত্যভাষণ ও সত্যানুসন্ধিৎসা এবং মানবহিতার্থে নির্ভীকভাবে সমস্ত কিছুকে পুনর্মূল্যায়ন ও প্রতিষ্ঠা, তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বলেই তিনি সম্মুখজগৎ থেকে কোন পলায়নী মনোবৃত্তি গ্রহণ করেননি। রায়ত-জীবনের করুণ ঘটনাবলীকে দেশবাসীর সকল স্তরে প্রচার ও সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারকে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজনকেই তিনি জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। তাঁর নাট্যকল্পনা লাঞ্ছিত মানুষের অশ্রু-রক্ত-দীর্ঘশ্বাস থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছিল। এই জন্য তাঁর নাট্যচরিত্রগুলি যেমন বাস্তবের গুরুভারে মন্থর, তেমনি জীবন যন্ত্রণায় অশ্রুমথিত। সমাজের সমস্ত অসংগতি, অত্যাচার, নিপীড়ন তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। দীনবন্ধুর সহানুভূতির কথা বলতে গিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন,

"কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় ও বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। ...তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরীব-দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্বব্যাপী। ..তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনী-মুখে নিঃসৃত করিতে হইল।"[৪৩]

দীনবন্ধুর এই সহানুভূতির কথা উল্লেখ করে তাঁর পুত্র মন্তব্য করেছেন পরবর্তীকালে,

"দীনবন্ধুর এই সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতা কেবল ব্যক্তি বিশেষের জন্য দৃষ্ট হইত, তাহা নহে। ইহা দেশের ও দশের জন্য সর্বদাই জাগ্রত ছিল। দেশের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল—সেই ক্রন্দনের ফল—'নীলদর্পণ'। ...দেশের নিরক্ষর প্রজামণ্ডলীর দুঃখে কাতর হইয়া, সেই দুঃখ বিমোচনের জন্য পিতৃদেব নীলদর্পণ রচনা করিয়াছিলেন।"[৪৪]

৪৩ দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনাঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী (বসুমতী সংস্করণ)।

৪৪ দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী ঃ ললিতচন্দ্র মিত্র (বসুমতী সংস্করণ)।

দীনবন্ধুর এই বিশিষ্টতা পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত মনীষীর সমগোত্রীয়। জাতীয় সাহিত্য জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করে, জাতিকে কর্মপথের নির্দেশ দেয়। 'ভল্টেয়ার', 'রুশো', 'লয়েড গ্যারীসন্' ও 'থিয়োডর পার্কারের' সাহিত্য কেবল ফরাসী ও আমেরিকার সাহিত্যের মান উন্নত করেনি, সেদেশের জাতীয় বিপ্লবে দিগ্‌দর্শিনীর কাজ করেছিল। একটি বিশেষ পুস্তক, দেশের মধ্যে প্রবল উন্মাদনা জাগিয়ে তুলে যে এক নতুন ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম, তার প্রমাণ আমরা পাই আমেরিকার মহিলা ঔপন্যাসিক, হেরিয়েট বীচার ষ্টৌ-এর 'Uncle Tom's Cabin' পুস্তক রচনাতে। আমেরিকার নিগ্রো-দাসদের নির্মম অত্যাচারের করুণ দৃষ্টান্ত তিনি যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর সুনিপুণ লেখনী প্রবল সহানুভূতিতে তাকে তেমনি প্রাণবন্ত করেছিল। তাই এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আলোড়নের সাড়া পড়ে যায় ও নিগ্রোদাসদের বন্ধন-মুক্তি ঘটে। দেশবাসীর উন্মাদনা সমালোচকের ভাষায় বাণীরূপ পেয়েছে, "It is sensational and the plot structure is especially open to criticism. It is, however, a sympathetic presentation of life by an alert, kindly and intensely human woman...It has some amount of literary greatness if not artistic skill."[৪৫]

অনুরূপভাবে, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকও তাঁর পর-দুঃখকাতর চিত্তের সহানুভূতি বিমিশ্র একবিন্দু অশ্রুজল। তথ্যসত্য ও জীবন-সত্যের অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটেছিল বলেই, এই নাটক প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতিজাগরণের এক তাণ্ডব হাওয়া চতুর্দিক থেকে বইতে শুরু করেছিল। জনগণের মধ্যে উৎথিত হয়েছিল প্রতিবাদের সুউচ্চ কণ্ঠ নিনাদ। এ ছাড়াও দীনবন্ধু বাঙ্গলা-সাহিত্যে একটি নতুন সুরের আলাপন তুলেছিলেন। তিনি গণসাহিত্য সৃষ্টির অগ্রদূত। উনিশ শতকের বাঙ্গলাসাহিত্যে দেব বি-নির্ভরতা দেখা দিলেও, দীনবন্ধু মিত্রের পূর্বে কেউ গণচেতনাকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তোলেননি।

'নীলদর্পণ' নাটক উদ্দেশ্যমূলক রচনা। নিপীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন এতে ভাষা পেয়েছে। রূঢ়, স্থূল ও নিরাভরণ বাস্তব জগতই এই নাটকের বিস্তৃততর

৪৫ History of American Literature—W. B. Carrns; New York. 1912, p 351.

পটভূমি। নাট্যকার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তেমনি লক্ষ্য করেন প্রগতিমূলক চিন্তাপথকে রোধ করবার জন্য প্রশাসকের স্বৈরাচার। তাই যারা ধ্বংসের পথে দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে, জীবনের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, তাদের রক্ষা করাই ছিল তাঁর প্রধান দায়িত্ব। শাসন ও শোষণ সে সময়ে বাঙ্গলাদেশে যে মধ্যযুগীয় নারকীয় পরিবেশ গড়ে তুলেছিল, তার অবসান ঘটানই ছিল তাঁর একমাত্র কামনা। আর সে জন্যই 'নীলদর্পণ' নাটকের মূলসুর—অতিবাস্তববাদ, মহামুমুক্ষা, ক্ষুধা ও যন্ত্রণার আর্তি। আর দীনবন্ধু মিত্রের স্বাদেশিকচিত্তের বৈশিষ্ট্য এখানে। তিনি চেয়েছিলেন, বঙ্গবাসী—শিক্ষিত ও নিরক্ষর শ্রেণী ও ধর্ম নির্বিশেষে, নীলচাষীদের উপর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠুক। সে জন্যেই তিনি 'নীলদর্পণে' নীলকরদের অত্যাচার দ্বিধাহীনচিত্তে তুলে ধরেছেন। দীনবন্ধু তাঁর নাটকে দেখিয়েছেন যে, জাতির বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন জাতীয় অভ্যুত্থান। জাতীয় সংহতি না থাকলে রাজনৈতিক শিক্ষা ও চিন্তার পুষ্টিসাধন হয় না, আর মুক্তি আন্দোলনও পিছিয়ে পড়ে। তিনি দেশবাসীকে গণসংহতির কথাই 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশ করে সর্বাগ্রে বোঝাতে চেয়েছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন বলে মনে করলে কিছু অস্বাভাবিক হবে না। তাই উনিশ শতকের শেষার্ধে অথবা বিংশ শতকের প্রথমার্ধে, ভারতবাসীর জীবন-ভাবনা স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে যখন সঙ্ঘবদ্ধ হল, তখনই আবার 'নীলদর্পণ' নাটক পুনরুজ্জীবিত হয়ে দিকে দিকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের আবশ্যকতাকে দৃঢ়ভাবে প্রচার করতে লাগল। নাটক রচনা কালে দীনবন্ধু দেশবাসীকে কোন ক্ষণিক উত্তেজনায় উত্তেজিত করতে চাননি। কারণ জাতি-গঠন না হলে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সত্য হয়ে উঠে না। দীনবন্ধু সমাজ-কল্যাণমূলক আদর্শে তাঁর সমস্ত চিন্তা ও নীতিকে প্রয়োগ করেন। তিনি স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে সংগঠন আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ ও 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মনীষিগণ যে সংগঠন চিন্তাকে বরণ করে নিয়েছিলেন, দীনবন্ধুর মানসিকতাও ঐ মার্গকে অনুসরণ করেছিল। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন হিন্দুকলেজের ছাত্র। এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ইতিহাসচেতনায় দীক্ষিত ছিলেন। গণবিদ্রোহ সৃষ্টির পূর্বে প্রয়োজন জাতীয় সংহতি। জ্ঞান,

প্রেম ও কর্ম এই ত্রিতত্ত্বে তাঁরা জাতির সর্বাঙ্গীণ ঐক্য স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন সর্বাগ্রে। দীনবন্ধুও ইতিহাসের অনুক্রমকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই বিদ্রোহ অথবা গণ অভ্যুত্থানকে স্বাধিকার অর্জনের পরিণত রূপ হিসাবে স্বীকার করলেও তিনি দেশবাসীর চিত্তে মনুষ্যত্বের বীজ বপন ও আত্মমর্যাদার স্ফুরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন ঐক্যচেতনার মধ্য দিয়ে। তিনি সমস্ত জীবন ধরে দেশবাসীর শুভবুদ্ধির উদবোধন ঘটাতে ব্রতী হয়েছিলেন, আর এর জন্যে অনুসন্ধান করেছেন মনুষ্যত্বের উপাদান—তাঁর স্বাদেশিকতার স্বরূপ এখানেই নিহিত আছে। 'নীলদর্পণ' নাটকে জাতীয়তার যে আবেগ, তার পরিচয় হচ্ছে, 'Constructive Nationalism' প্রচার করা। দীনবন্ধু মিত্র হচ্ছেন, 'Constructive Nationalist.' সেজন্যে তিনি প্রথমেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কোন তরঙ্গ সংকেত করেন নি ;* কেবল আবেদন করে নীলকরদের অত্যাচারের অবসান ঘটানই কাম্যবস্তু বলে প্রচার করেছেন। নাট্যকারের অনুরূপ মনোবাসনার পরিচয়টি পাই নাটকের ভূমিকাতে।

"নীলকরনিকরকরে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ ২ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা হয়। হে নীলকরগণ! তোমাদিগের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিড্‌নি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অলঙ্কৃত ইংরাজ কুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। ...এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থলাভ করিতেছ তাহা পরিহার কর......। তোমরা এক্ষণে দশমুদ্রা ব্যয়ে শতমুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ

* ইংরেজেরা অবশ্য প্রথম থেকেই 'নীলদর্পণ'কে রাজনৈতিক চিন্তা প্রসূত রচনা হিসাবেই গ্রহণ করেছিল।

' Sir, W. W. Hunter, in his celebrated history 'The Indian Empire', alludes to the dramatic revival in India, and observes that some have a political significance, and makes mention of Nil Darpan".—History of Indigo Disturbance in Bengal with a full report of Neel Darpan Case. L. C. Mitra. p. 84.

হইতেছে, তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ……। তোমরা কহিয়া থাক যে তোমাদের মধ্যে কেহ ২ বিদ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে ঔষধ দেন এ কথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী ধেনুবধে পাদুকাদানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধ বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীর ব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ আঘাত উপরে কিঞ্চিৎ তাপিন তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সারী করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুটিতে ঔষধালয় আছে বলিতে হইবে।* দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে,† তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না, যেহেতু তোমরা

---

* "৬০ দফা ……নীলকরেরা যে কহিয়া থাকেন যে তাহারা প্রজার অন্যান্যরূপে অনেক উপকার করিয়া থাকেন তাহা জমিদার ও নীলকরের ব্যবহার মিলাইয়া দেখিলে এইমাত্র প্রকাশ হইবে যে, নীলকরেরা কিঞ্চিৎ মাধুর্য্যরূপে জরিপ জমাবন্দী করেন ও কখনো দুই এক প্রজাকে বিনাসুদে টাকা কর্জ দেন। এবং আবশ্যক হইলে কাহাকেও বা ঔষধ প্রভৃতি দান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করেন —আমরা নীলকরদিগের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু প্রজারা চিরকাল পর্য্যন্ত কুঠির দ্বারে বদ্ধ থাকিয়া এবং তাহার কর্ম্মচারিদিগের অপমান ও অত্যাচার সহ্য করিয়া এবং চাষ আবাদে লোকশান দিয়া তাহারা যে প্রকার বিরক্ত ও জ্বালাতন হয় তাহা উল্লিখিত কিঞ্চিৎ উপকারের পরিশোধ ও ক্ষমা হয় না- আমাদের সহকারী পাদরী মেসেল সাহেব কহেন যে ভয় দশাইয়া বা উপকারের লোভ দেখাইয়া যে কর্ম্ম সমাধা হয় কোন দেশের লোক সে প্রণালীকে ভাল কহিবে না।"
— নীলকমিসনারদিগের রিপোর্ট পৃ. ৩১-৩২।

† ইংলিশম্যান ছিল নীলকরদের স্বার্থ পরিপুষ্ট পত্রিকা। এই পত্রিকা সম্বন্ধে জানা যায়,

"The landowners and the Commercial Association backed the Indigo planters and Mr. Walter Brett then Editor of the Englishman who was all along with the Editor of the Hurkara described in preface to the drama of having sold themselves for Rs 1000/- like Judas Iscariot who betrayed Jesus to the Roman Pontius Pilate for a few pieces of silver coins."—History of Indigo Disturbance in Bengal with a full report of Neel Darpan Case. L. C. Mitra. p. 82.

এই ঘটনার নাট্যরূপ :—

"গোপীনাথ। আপনাদের কাগজের কাছে উঁহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডাজলের কুঁজো। কিন্তু সংবাদপত্রটি হস্তগত করিতে হুজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে।"

[নীলকর উডের প্রতি উক্তি, নীলদর্পণ, ৩য়। ১ম গর্ভাঙ্ক]

তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তি! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস, খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যীজস্‌কে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদকযুগল সহস্র মুদ্রালোভ পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ," প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ...সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদারচরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভরনর জেনারেল হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পর গ্রাণ্ট মহামতি লেফ্‌টেনেণ্ট গভরনর হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, ইডেন, হার্সেল প্রভৃতি রাজকার্য-পরিচালকগণ শতদল-স্বরূপে সিবিল্ সারভিস্ সরোবরে বিকশিত হইতেছেন। অতএব ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থ উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।" কস্যচিৎ পথিকস্য।

ইংরেজদের শুভবুদ্ধির কাছে দীনবন্ধুর এই আবেদন ব্যর্থ হয়নি। তবে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলচাষীদের অভাব অভিযোগকে সংগঠিত করে প্রতিকারের উদ্দেশ্যে যে অগ্নিগর্ভ লেখনী পরিচালনা করেছিলেন, তাই কালক্রমে ইংরেজকে 'ইণ্ডিগো কমিশন' গঠন করতে বাধ্য করেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর কথায়, 'নীলকর-অত্যাচার-নিবারণ হরিশের এক অক্ষয় কীর্তি।'[৪৬] তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার গৌরবময় কাহিনীর কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে লিখেছেন অপর একজন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক, "ইংরেজের স্বৈরাচারের কথা হিন্দু পেট্রিয়টে যেরূপ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল এমনটি তখনকার কোন পত্রিকায়ই বাহির হইত কিনা সন্দেহ। যশোহরের শিশিরকুমার ঘোষ, কৃষ্ণনগরের মনোমোহন ঘোষ, কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ও মথুরানাথ মৈত্রেয়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতিদ্বারা প্রেরিত নীলকরদের অত্যাচারের কথা হরিশচন্দ্র যথারীতি পেট্রিয়টে প্রকাশ করিতেন এবং তাহার উপর টিপ্পনী ও মন্তব্যাদি লিখিতেন। এ কারণে কলিকাতার ইংরেজ ব্যবসায়ী মহল ও ইংরেজ চালিত পত্রিকাসমূহ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইল।' কিন্তু ১৮৬০ সালে নিরীহ নীল চাষীরা যখন নীলকরদের

৪৬ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী; পৃ. ১৯৯

বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে জীবন যায় তাও স্বীকার তবু তাহারা নীল বুনিবে না এবং কলিকাতার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া ইহার ন্যায্যতা সম্পর্কে মত প্রকাশ করিলেন তখন তাহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। ইহার ফল হরিশচন্দ্রের নিজের পক্ষে···বিষময় হইয়াছিল।··· নীল হাঙ্গামার সময় হরিশচন্দ্রের গৃহ অতিথিশালায় পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে পেট্রিয়ট এর নিয়মিত খরচ চালাইয়া তাঁহার বেতনের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত তৎসমুদয়ই নীলচাষীদের সেবায় ব্যয়িত হইত।"[৪৭]

নীলচাষকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তাঁর ছিল সংবাদপত্র সম্পাদকের যুক্তিসঙ্গত ন্যায়-নিষ্ঠা। একদিকে অত্যাচার আর একদিকে লেখনী। একদিকে ক্রোধ আর একদিকে যুক্তি। তাঁর সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে দেশবাসীর মধ্যে যে একটি জাতীয় জাগরণ প্রজ্বলন্ত বহ্নিশিখার ন্যায় দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, ইংরেজগণ তাতে ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেন। কারণ, হরিশচন্দ্র বাঙ্গলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তা সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর থেকেই বাঙ্গলাদেশের সংবাদপত্র খরদীপ্তিতে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনা ও ক্ষেত্র বিশেষে তীক্ষ্ণ সমালোচনা সুরু করেছিল। হরিশচন্দ্রের অকালমৃত্যু বাঙ্গালীকে অশ্রুস্নাত করেছিল। জাতির মর্মবিদারী ক্রন্দন লোক-গাথায় অমর হয়ে আছে,

"নীল বাঁদরে সোনার বাঙলা করলে ছারখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হ'ল কারাগার,
প্রজার এবার প্রাণ বাঁচান দায়।"

প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের নীল-অত্যাচার দমনের সংবাদও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। নীলকরেরা তাঁর মাথার জন্য ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

হরিশচন্দ্র, 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ঘটনা ও বিবরণের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ করেছেন, তাকেই দীনবন্ধু তুলে ধরেছেন আপন নাটকে চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে। 'নীলদর্পণ' নাটক আত্মপ্রকাশ কালে (১৮৬০) নাট্যকার নিজের নাম গোপন রেখেছিলেন। আশ্রয় করেছিলেন, ছদ্মনামের। অবশ্য এর মধ্যে কোন মানসিক দুর্বলতা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র এ-বিষয়ে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন,

৪৭ ভারতের মুক্তিসন্ধানী : যোগেশচন্দ্র বাগল ; পৃ. ৭৯—৮১

"নীলদর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীলদর্পণ প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।"*[৪৮]

আপন নাম গোপনীয়তা দীনবন্ধুকে সর্বদাই বিবেক-দংশন-কাতর করেছিল। পাদ্রী লঙের বিচারের সময় তিনি আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

"The Nil Darpan bade fair for the moment to wreck the authors prospects : and is to his honour that he was willing for them to be wrecked, if by giving up his name as author, he could have saved Mr long···he was present in court and ready to exchange places with Mr. Long if that had been possible,"[৪৯]

নীলদর্পণ নাটককে কেন্দ্র করে ইংরেজ বণিকদের রোষবহ্নি যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল, তার কারণ নাট্যকারের এই নাটকে তথ্যসত্যের ভিত্তিতে কোন কল্পনা ছিল না। পুঁজিবাদী অত্যাচারী নীলকরদের লোলুপতায় কৃষকশ্রেণীর জীবনের অবক্ষয় কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার করুণ কথাচিত্র তিনি

* দীনবন্ধুর আত্মগোপন সম্পর্কে লেখা হয়েছিল ব্যঙ্গ করে—"At any rate you are acquainted with the name of this *'friend of the poor and needy'*, keep an eye upon the appointments and promotions in connection with the Post Office, and you may be edified some morning"—Hurkara (Dacca Correspondent) June 29, 1861.

"The words in italics seem to be a pun upon the name of the author Dinobandhu (friend of the poor) and evidently imply that his name was not unknown to the parties libelled, prior to the prosecution of the Rev. James Long."

—History of Indigo Disturbance in Bengal with a full report of Neel Darpan Case : L. C. Mitra. pp. 84-85.

৪৮ দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী (বসুমতী সংস্করণ)।

৪৯ English Rule and Natives Opinion in India : James Routledge, p. 85.

এঁকেছেন নাটকের প্রতি পাতায়। 'নীলকমিশনের' সামনে ও বিভিন্ন সূত্রে যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ও প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তাঁদের উক্তির সঙ্গে নাট্যচিত্রের বর্ণনাগুলির এক গভীর সাদৃশ্য আছে।

নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা 'নীলদর্পণ' উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি।[৫০] পত্তনি দিতে জমিদারেরা বাধ্য থাকতেন, আর পত্তনি নিলে গ্রামের কি অবস্থা হত তার বর্ণনা পাই নীচের নাট্যচিত্রে, রায়ত সাধুচরণ ও জমিদার গোলকচন্দ্রের পরস্পর কথোপকথনের মধ্যে।

"সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। ...তিন বৎসর হয়নি সাহেব পত্তনি লয়েছে, এর মধে গাঁখান ছারক্ষার করে্যা তুলেছে। দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না, আহা! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দু বেলায় ৬০ খান পাত পড়তো, ১০ খান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও ৪০।৫০টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, আহা! যখন আসধানের পালা সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন, গোয়াল সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁযে নীল করেনি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল; উহাদের খালাস করে্যা আন্তে কত কষ্ট, হাল গোরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁ ছাড়া হয়। ...তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব তবু ও গাঁয় আর বসত্ করবো না। ...সেদিনে সাহেব বল্লে, "যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।" তাহাতে বড়বাবু কহিলেন, "আমার গতসনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার।" (১মা:১ম. গ.)

নবীনমাধবের খেদোক্তিতেও অনুরূপ চিত্র পাই—(৩।২য় গ.),

"নবীন। ...আমার এমন সংসার এমন হইল! আমি কি ছিলাম কি হলাম! আমার ৭ শত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫

---

৫০ ভারতসংস্কারক পত্রিকা।

গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২০ খান লাঙ্গল, ৫০ জন মাইন্দার, পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালীকে অন্ন বিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি। আহা ! এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী ভাদ্রবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা !"

'নীলদর্পণ' নাটক বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর শুকিয়ে যাওয়া জীবনের করুণ কথাচিত্র। বাঙ্গলাদেশের অতীতরূপ ও বর্তমান চিত্র দীনবন্ধু নিপুণতুলিতে সাধুচরণ ও নবীনমাধবের জবানবন্দীতে এঁকেছেন।

নীলকরেরা বাঙ্গলাদেশে কৃষকদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল, তার বর্ণনা পটভূমি বিচার পর্যাযে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রহণ করেছি। এখন নাটকের মধ্যে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করব। দীনবন্ধু অত্যন্ত নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ চিত্তে, বাহুল্য বর্জন করে, সংযত কলমে এ সমস্ত বর্ণনা করেছেন।

নীলকমিশনের সামনে সাক্ষ্যদানের সময় একজন মিসনারী বলেছিলেন, 'এমন একটা বাক্স নীল ইংলণ্ডে পৌঁছয় না যেটা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়।'[৫১] এই জবানবন্দীতে বাঙ্গলার রায়তদের দুর্দশা চিত্রিত হয়েছে। নীল-চাষীদের জীবন অত্যাচারের দাবদাহে যেন তাম্রতপ্ত হয়ে উঠেছিল। বাঙ্গলার ইতিহাসে মধ্যযুগে একমাত্র সেমীয় শাসকদের অত্যাচারে এর উদাহরণ পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের ইতিহাসে আমেরিকার নিগ্রোদের উপর অত্যাচার ছাড়া, আর অন্য কোথাও অনুরূপ উদাহরণ নেই। একদিকে ঘরে কালান্তক আমীন ও দেওয়ানদের অত্যাচার ও অপরদিকে নীলকুঠিতে নীলকরদের শ্যামচাঁদের হৃদয়হীন প্রহার, সাঁড়াশির চাপের মতো কৃষকদের কণ্ঠ অবরুদ্ধ করেছিল। বিশেষভাবে আমীন ও দেওয়ানদের স্বার্থলোলুপ মনোবাসনা ও নিষ্ঠুরতার কথা নীলকরদের মুখে 'নীল কমিশনের' সামনেই স্বীকৃত হয়েছিল। 'নীলদর্পণ' নাটক থেকে আমরা কয়েকটি নাট্যচিত্র উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করব।

(ক) **আমীনদের অত্যাচার।**

"রাইচরণ। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমিন সুমুন্দি য্যান বাগ্, যে রোক্ করে মোর দিকি আস্‌চিলো, বাবা রে ! মুই বলি মোরে বুঝি খালে। শালা

৫১ Indigo Commission Report, Question No. 1918, p. 18.

কোন মতেই শোন্‌লে না। জোর করিই দাগ মার্‌লে। সাঁপোলতলায় ৫ কুড়ো ভূঁই যদি নীল গ্যাল তবে মাগ ছ্যালেরে খাওয়াব কি। কাঁদাকাটি করো দ্যাক্‌বো যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাযিই দ্যাশ্‌ ছাড়ে যাব। …দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা জমি তো না, য্যান সোনার চাঁপা। …না খাতি পেয়ে মরবো, আরে পোড়া কপাল, গোডার নীলি কল্লে কি ?…

সাধুচরণ। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে কর্‌বো কি। …তুই কাঁদিস্‌নে, কাল হাল গরু বেচে গাঁর মুখে ঝ্যাঁটা মেরে বসন্তবাবুর জমিদারিতে পাল্‌য়ে যাব।…

* * * *

আমিন। বাঁদ, রেয়ে শালাকে বাঁদ্‌। …(সাধুর প্রতি) …তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। চ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখা পড়া জানিস, তোকে খাতায় দস্তখৎ করো দিয়ে আসতে হবে। …(ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বগত) এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে—আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারী পেলাম, তা এরে দিয়ে পাবো—তবে মালটা ভাল, দেখা যাক্‌।…

* * * *

রেবতী। ওরে এটটু জলখ্যাতি চেয়েলো, ও আমিন মশাই তোমার কি মাগ ছেলে নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মাবপিট।…না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, সে যে অনেক দূর। …কি কর্‌বো, কি পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম…। (১ম/২য় গ.)

(খ) **নীলকরদের অত্যাচার।**

উড। এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন ?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত, কিন্তু নবীন বসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই,…করিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি নীল করিছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। …আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ ২০

বিঘা, তার মধ্যে যদি ৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে তবে কাজেই চট্‌তে হয়। তা আমার চটায় আমিই মরবো, হুজুরের কি !

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমারদের বড়বাবুর গুদামে কয়েদ করো রাখ।

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্থ কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো, প্রবল প্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ্, চাষার মুখে ভাল শুনায় না, গায় যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন "প্রতাপশালী"—

গোপী। ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদর নায়েব।—ধর্ম্মাবতার! পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাসালোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।···

আমিন। বেটা মোকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যে লোকসান জমা পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান্! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। (প্রকাশে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্য চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চারগুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদিও ৯ বিঘা আমার চাস দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই পড়ে থাক্‌বে, তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আমি, শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতা প্রহার) শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাৎ হোনেসে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা। (দেয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কালকরা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপদে, ঝা হ্যাকে নিতি চাচ্চে হ্যাকে দে, ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সারা দিন্‌ডে গ্যাল, নাতিও পালাম না খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী কর্‌লি নে! (কান মলন)

রাই। (হাঁপাইতে ২) মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার, মারো বাঞ্চৎ কো। (শ্যামচাঁদাঘাত)···

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়া ভাল ২ চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে কয়খান ভাল জমি ছিল তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি বিনা দাদনে নীল কর্য়ে দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে, হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান (শ্যামচাঁদ প্রহার)···গোলাম কি গোলাম; দেওয়ান, দপ্তর খানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও।" (১ম/৩য় গ.)

কেবল নীল চাষের জন্য নয়, আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্যে নীলকরেরা রায়তদের কুঠিতে ধরে রাখতেন। সরাসরি তারা আদালতে সাক্ষ্য দিতে রাজী না হলে অত্যাচারের সীমা থাকত না তাদের উপর। নিম্ন উদ্ধৃত নাট্যচিত্রটি তারই বাস্তব প্রমাণ,

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে। এই নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা, বলে নেমকহারামি করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবারে! যে নাদ্‌না, অ্যাকন তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা কর্‌বো। (প্রকাশে) দোই সাহেবের, মুইও সোদা হইছি।

রোগ। চপরাও, শূয়ার কি বাচ্চা! রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে। (রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতা)

তোরাপ। আল্লা! মা গো গ্যালাম, পরাণে চাচা, এট্টু জল দে, মুই পানি তিসেয় মলাম, বাবা, বাবা, বাবা—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না? (জুতার গুঁতা)···আজ রাত্রে সব চালান দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হোলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে—

গোপী। কেমন তোরাপ প্যাঁজ-পয়জার দু-ই তো হ'লো।
তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই, মোরে এট্টু পানি দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাম।
গোপী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার ঘর, ঘামও ছোটে জলও খাওয়ায়···।" (২।১ গ.)

নীলকরদের অত্যাচারের কথা যাতে বাইরে প্রকাশ না হয়ে যায় সেজন্য বন্দী রায়তদের কোন নির্দিষ্ট কুঠিতে বেশিদিন রাখা হত না। এ সম্পর্কে যে বিবরণ আমরা পাই তা এই,

"Poor raiyats, substantial farmers and even respectable men were seized and sent about from one factory to another to escape discovery and in some cases they were not heard of again."[৫২]

নবীনমাধবের উক্তিতেও এর সমর্থন আছে,

নবীনমাধব। "···উপায় আর কিছু দেখিনে, পাঁচজনের একজনও হস্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে···।" (২।৩ গ.)

আবার, "হা নীল! তুমি আমাদিগের সর্ব্বনাশের জন্যেই এদেশে এসেছিলে—আহা? এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কান্সারনের আর কত কুট আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ১৪ কুটির জল-খেলেম এখন কোন্ কুটিতে আছি তাও তো জানিতে পারিলাম না, জানিবই বা কেমন করে, রাত্রিযোগে চক্ষুবন্ধন করিয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়" ··(২।১ গ.)

নীলকরদের হৃদয়হীন অত্যাচারের দোসর ছিল দেশীয় দেওয়ান ও আমিনরা। এদের স্বার্থপরতা ও অর্থগৃধ্নুতার কথা নীলকমিসনের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল।

একজন ঐতিহাসিক এদের সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন,

"নীলকরদের অধীনে কয়েকজন দেশী কর্মচারী থাকিতেন, তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন নায়েব বা দেওয়ান। উহার বেতন ৫০ টাকা। সে আমলে উহাই উচ্চহার। নায়েবের অধীনে থাকিতেন গোমস্তা। রাইয়তদের হিসাব পত্রের সহিত উহাদেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এজন্য তাহারা প্রকাশ্য

৫২ Fifty Years Ago: Dawn Magazine, July, 1905; Haran Chandra Chakladar.

বা অপ্রকাশ্যভাবে দস্তুরী বা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বেশ দু' পয়সা আয় করিতেন। সাহেবদিগের অবোধ্য অশ্লীল গালাগালি এবং সময়মত বুটের আঘাত উহারা বেশ হজম করিতে জানিতেন, এবং কোন প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা চক্রান্তের পশ্চাদপদ না হইয়া ইহারাই অনেকস্থলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ ও মর্মান্তিক যাতনার হেতু হইয়া দাঁড়াইতেন।"[৫৩]

সমসাময়িককালের এক পত্রিকাতেও লেখা হয়েছিল,

"The factory servants, who receive little or no pay are generally the most wealthy man in the district."[৫৪]

দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' নাটকে এইসব উপনিবেশ স্থাপনকারীদের সেবাদাস ও নীলকরদের অন্যায় কাজের সমর্থক, দেশদ্রোহী-আমিন ও দেওয়ানদের অত্যাচারের নগ্নরূপটি সোজাসুজি চিত্ররূপে পরিণত করেছেন। কেবলমাত্র স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধ প্রদর্শন করলেই জাতীয় হিতবাদী ব্যক্তি হওয়া যায় না। যা কিছু জাতির পক্ষে অকল্যাণকর, দেশোন্নতির পরিপন্থী, তাকে প্রকাশ্যভাবে অসঙ্কোচে সমালোচনা করাও স্বাদেশিক বাসনার অন্যতম ধর্ম। দীনবন্ধু নীলকরদের নির্যাতনকে যেমন নিরাভরণভাবে তুলে ধরেছেন, তেমনি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করেছেন আমিন ও দেওয়ানদের হৃদয়বিদারী অত্যাচার। দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর দায়িত্ব ছিল নৈতিক, তাই দেশ ও জাতির গলিত ক্ষতের উপর অস্ত্রোপচারের সময় তাঁর হাত কাঁপেনি। কঠোর সত্যভাষণ দীনবন্ধুর স্বাদেশিক চিত্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই তিনি নীলকরদের অত্যাচারের পাশে দেশীয় ব্যক্তিদের নিপীড়নকে সমান মাত্রায় এঁকেছেন। আগের কয়েকটি নাট্যচিত্রের সঙ্গে এই উদ্ধৃতিগুলিও আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করব—

(ক) পদী। "আমিন আঁটকুড়ির বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি২ মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি? ...মাগো কি ঘৃণা, টাকার জন্যে জাত জন্ম গেল, বুনোর বিছানা ছুঁতে হলো...যাই আমিন কালামুখরে বলিগে, আমারে দিয়ে হবে না...।" (২।৩ গ.)

৫৩ যশোহর খুলনার ইতিহাস: সতীশচন্দ্র মিত্র: পৃ. ৭৬২

৫৪ Indian Field: August 21, 1858

(খ) গোপীনাথ। "(নীলকর উড সাহেবকে) ধর্ম্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলক বসের সাতপুরুষের লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কাজ করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি চামারেও পারে না, তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই। ...হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি, গো-হত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা, স্ত্রী হত্যা, ঘর জ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।" (১।৩ গ.)

নীলদর্পণে যে চিত্রটি বিশেষভাবে বাঙ্গালীকে চঞ্চল করেছিল, তার মূল ঘটনা সমকালের এক বিবরণীতে প্রকাশিত হয়।† 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে সংবাদটি প্রথম ধরা পড়ে। 'নীলকমিশন কমিটির' কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট 'হার্সেল' এই ঘটনাটিকে অস্বীকার করতে পারেন নি।৫৫ দীনবন্ধু, 'হরমণি' ও আর্চিবল্ড হিলের' ঘটনাটি গ্রহণ করে 'নীলদর্পণ' নাটকে 'ক্ষেত্রমণি' ও 'রোগ সাহেব' এর রূপকে চিত্রিত করেছেন। একদিকে বঙ্গললনার স্বভাবসুলভ ধর্মবোধ এবং সংস্কারচেতনা অপরদিকে উন্মত্ত জৈব তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করবার দুর্নিবার প্রয়াস, উভয়ই দীনবন্ধুর মানবিক তুলিতে অনবদ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়কালে এই দৃশ্য দেশবাসীকে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে উত্তেজিত করত।*

† "Indeed, Khetramani of the drama was none but Haramani, a peasant girl of Nadia in flesh and blood known as one of the beauties of Krishnanagar who was carried off to the Kulchikatta factory in charge of Archibold Hills, the Chota Saheb, where the girl kept in his bedroom till late hours of the night..." Indian Stage (vol. II) H. N. Das Gupta. P. 92

৫৫ Indigo Commission Report ; Appendix No 12

* কথিত আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই দৃশ্যটির অভিনয় দেখতে দেখতে আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজের পায়ের চটি অভিনেতাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেছিলেন। অভিনেতা ছিলেন নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। অর্দ্ধেন্দুশেখর চটি জুতোকে মাথায় নিয়ে বলেন, 'এটাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার'। বিদ্যাসাগরের এই আচরণ বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অবশ্য এ ঘটনাটির লিখিত কোন প্রমাণ নেই। —লেখক।

নীলকরদের অন্যায় জোর জুলুম নীতিকে সমর্থন করে ইংরেজ সরকার ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ Act XI of 1860 নামে এক আইন পাশ করেন। এই আইনের বলে নীল কুঠিয়ালরা রায়তদের নামে মিথ্যা চুক্তিভঙ্গের অপরাধ রুজু করতেন ও নির্যাতন চালাতেন। কেবল রায়তরা নয়, জমিদারগণও এই আইনের কবল থেকে মুক্তি পেতেন না। এক দিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারের নিয়ম-নীতিতে পক্ষপাতিত্ব ও অপরদিকে এই আইনের প্রচলন নীলকরদের পক্ষে সোনায় সোহাগা হয়েছিল। দীনবন্ধু নীলকর উডের মুখে সেই আনন্দাতিশয্যের পরিচয়টুকু দিয়েছেন। উড সাহেব, দেওয়ান গোপীনাথকে বলেছেন,

উড। "মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ ম্যাজিষ্ট্রেট বড ভাল লোক আছে। দেওয়ানী কর্‌লে পাঁচ বচোরে মোকদ্দমা শেষ হোবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ তোমার সাক্ষী মাটোব্বর করো নতুন আইনে চার বজ্জাতকে ফাটক দিয়াছে; এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।" (৩।১ গ.)

অপর দিকে বাঙ্গালীর হতাশাক্লিষ্ট রূপটি দেখি নবীনমাধবের উক্তিতে,—"কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। ··এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে—তাহাদের স্ত্রী পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয—উনানের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে—ক্ষেত্রের চাস সম্পূর্ণ হল না, সকল ক্ষেত্রে বীজ বপন হল না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্ম্মূল হল না, বৎসরের উপায় কি—কোথা নাথ, কোথা তাত শব্দে ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে।" (৩।২ গ.)

'নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে'—এই ছিল নীলচাষী ও গ্রামীণ জমিদারদের প্রকৃত অবস্থা। দেশে আইন ও নিয়ম নীতির কোন বালাই ছিল না। যে আইন, মানুষের প্রখর নীতিবোধ ও জাগ্রত মানবতাবাদ থেকে জন্মলাভ করে, তার কোন মূল্য ছিল না। ধর্মাধিকরণ ছিল স্বেচ্ছাচারিতার আড্ডাখানা। নীলকরদের অত্যাচারের কোন সুবিচার এ দেশীয় লোকেরা শ্বেতাঙ্গ বিচারকদের কাছ থেকে পেতেন না। নীলকর ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের স্বার্থ ছিল পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ফলে সমর্থন ছিল প্রকাশ্য ও অসঙ্কুচিত। পরস্পরের স্বার্থপুষ্ট হৃদ্যতাকে আক্রমণ করে

সমকালে বহু পত্রিকায় বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশিত হত।† দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে তারই চিত্ররূপ এঁকেছেন।

দারোগা। "ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?

জমাদার। আজ্ঞে না, তাঁর আর চারদিন দেরী হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন্ পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমারদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখান চিটিতে এ গোরীবকে জেলের জমাদ্দার করিয়া দিয়াছেন।"* (৪।৩ গ.)

ইংরেজদের শাসননীতি সম্পর্কে একশ্রেণী উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশের বৃহত্তম জনসাধারণ দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষমতাসম্পন্ন শাসককুলের কাছে লাঞ্ছিত হতো। দীনবন্ধু অত্যন্ত নিরাসক্ত মনোভাবে এই ঘটনার নাট্যরূপ দিয়েছেন,

সাবিত্রী। "মগের মুল্লুক আর কি!—ইংরেজের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেবতী। মা, চাসার ঘরে সব পারে। মেয়েনোক ধরে মরদদের কায়দা করে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজোরে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, জান না, নয়দারা রাজি নামা দিতি চাইনি বল্যে ওদের মেজ বউরি ঘর ভেঙ্গে ধর্যে নিয়ে গিয়েলো।

সাবিত্রী। ...তবে যে বলে সাহেবরা বড় সুবিচার করে..." (১।৪ গ.)

বিচারের প্রহসন সম্পর্কে সরকারী নথিপত্রে যে বর্ণনা পাওয়া যায়,

"The Hakims surrounded by the planters sit along with them while deciding cases and court is crowded with Amlas and the Mokters of the planters."[৫৬]

† "Are these Magistrates fitmen to govern millions, when they cannot resist the temptation of dining with the planters, and talking with their wives and dancing with them." Hindu Patriot, April 4, 1860.

* এই অংশটি 'নীলদর্পণ' নাটক মামলায় বিশেষ গুরুত্ব পায়। Land Holders and Commercial Association of British India এই অংশটির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেন। বিচারক Mordant Wells এই অংশটিকে foul and disgusting libel বলে মন্তব্য করেন। —লেখক।

৫৬ নীলদর্পণ: শশাঙ্কশেখর বাগচী সম্পাদীত; পৃ. ১২৩

অনেক সময় আসামী পক্ষের অনুপস্থিতিতেই নীলকর সাহেবের সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও জবানবন্দী গ্রহণ করা হতো। প্রতিবাদী মোক্তার আপত্তি জানালে তা গ্রাহ্য হতো না। বিচারক, আসামী ও ফরিয়াদী উভয়ের বক্তব্য শুনে যথার্থ সত্য উদ্‌ঘাটনের কোন চেষ্টা করতেন না। মানুষের সভ্য সমাজের নিদারুণ কলঙ্কের কথা দীনবন্ধু প্রচার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি বিশ্ববাসীর কাছে। তাঁর স্বাদেশিকচেতনা ছিল সোনার মত খাঁটি ও ইস্পাতের মত কঠিন। ইংরেজদের বিচারের নামে প্রহসন সৃষ্টির চিত্রটি সমস্ত বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ ইংরেজদের চরিত্র কি রকম কলুষ ও কালিমালিপ্ত হয়েছিল, তারই চিত্রটি দীনবন্ধু নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন। আলোচনার স্বার্থে চিত্রটি উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা হলো।

সেরেস্তা। "আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা, ফরিয়াদীর সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার হাজির আনা হয়।

বাদীমোক্তার। ···ধর্ম্মাবতার মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা। কিন্তু নীলকরের মোক্তারদিগের দ্বারা কোনরূপে প্রতারণা হইতে পারে না। নীলকর সাহেবেরা খ্রীষ্টিয়ান—খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, পরদ্রব্য অপহরণ, পর নারীগমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অসৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক, মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়। করুণা, মার্জ্জনা, বিনয়, পরোপকার খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন সত্য সনাতন ধর্ম্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্ত্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। ···সত্যপরায়ণ সাহেবেরা সূচাগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি দান করেন। ···কুটির আমীন মজুকুর······রাইয়তের দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন এবং গোরিব ছাঁপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়া প্রহারও করিয়াছেন। ···আইনকারকেরা বলিয়াছেন, "বিচার কর্ত্তা আসামীর অ্যাডভোকেট স্বরূপ,"···আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে, অতএব সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিলে

আসামীর কিছুমাত্র উপকার দর্শাইবার সম্ভাবনা নাই…চাসারদিগের একদিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্বনাশ উপস্থিত হয়, এ সময়ে এত দূরস্থ জেলার রাইয়তদের তলব দিয়া আনিলে তাহারদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়…।

ম্যাজিষ্ট্রেট। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্রতিবাদী মোক্তার। হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না, আমিন খালাসীর সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব, অথবা তাঁহার দেওয়ান, ঘোড়া চড়িয়া ময়দানে গমন পূর্ব্বক উত্তম ২ জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন, পরে জমিয়াতের মালিকান রাইয়তদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন, দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতে ২ বাড়ী যায়, যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে সে দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে।… একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাত পুরুষ ক্লেশ পায়।…রাইয়তেরা পাঁচজন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ ২ দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে, তাহারদিগের সলাপরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, এমন রাইয়তে সাক্ষী দিয়া গেল যে তাহারদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল কেবল আমার মক্কেল তাহারদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহাদের নীলের চাষ রহিত করিয়াছে, এ অতি আশ্চর্য্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। …ধর্ম্মাবতার যে ৪ জন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার একজন টিকিরি, তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়ালঘর নাই, সারেজমিনে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার, ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই, সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই এই কারণে আমি তাহারদের পুনর্ব্বার কোর্টে আননের প্রার্থনা করি…

বা. মোক্তার। হুজুর, এসময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা এদেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতে-

ছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন...।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাসি! ..(উডের সহিত পরামর্শ) বিবি উড্কা পাস্ দেও—খানসামাকো বোলো বাহারকা সাহেবলোক আজ জাগা নেই।

সেরেস্তা। হুজুর, কি হুকুম লেখা যায়।

মাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে। (ম্যাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ) ধর্ম্মাবতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখৎ হয় নাই—

মাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে ২০০ শত টাকা তাইনে ২ জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।" (মাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ) (৪।১গ.)

এই বিচারপ্রহসন চিত্রটি রীতিমত নাট্যিক উপাদানে ভরপূর। দীনবন্ধুর বস্তুধর্মী নাট্যচিন্তা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ফোয়ারা সৃষ্টি করে, বিচারের নামে প্রহসন সৃষ্টি করার যে অসংগতি, তাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করেছেন। নাট্যচিত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর যে ইংরেজ গুণগান তা প্রকারান্তরে ব্যাজস্তুতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। দীনবন্ধুর satire চিন্তা ছিল, "a means whereby irony, ridicule, and sarcasm are used to expose tyranny, vice, folly and stupidity ; and thereby satire becomes a shortcut to reality"[৫৭] আর এই বিচার দৃশ্যটি এই অনুভাবনাতেই অঙ্কিত।

অতএব আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি স্বাদেশিকচেতনা বিস্তারে দীনবন্ধু কি রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সযত্নে এঁটে রাখা মুখোশ তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বাণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছিল বলেই, 'ইংরেজি নীলদর্পণ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ সমাজ একসঙ্গে সোচ্চারে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে। অকপট সত্যভাষণকে তাঁরা সহ্য করতে পারেননি।

নীলবিদ্রোহের সাফল্যের মূলে রয়েছে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের আন্তরিক সমর্থন। প্রসঙ্গক্রমে, আমরা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার

৫৭ Literature and Reality : Howard Fast ; p. 4

ঘোষের কর্মতৎপরতার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি। স্বদেশের প্রতি গভীর আনুগত্য ও মমত্ববোধ প্রথমে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী চিত্তে জেগে উঠেছিল; তাও পটভূমি বিচারে আলোচনা করেছি। সুতরাং ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন যে ভারতীয় মধ্যবিত্তেরা পরিচালনা করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। এটা ঐতিহাসিক সত্য। রামমোহন রায় স্বপ্ন দেখেছিলেন, ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাঙ্গালীর মানস বিপ্লব ঘটবে; আর সে বিপ্লবই হবে জাতীয়তার প্রথম পদক্ষেপ। তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়েছিল, ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায়। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী জ্ঞানে যুক্তিতে বলিয়ান হয়ে বিদেশীদের অত্যাচার ও শোষণ পরিকল্পনাকে বহুলাংশে ব্যাহত করেছিলেন। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠাই যে জাতির উন্নতির একমাত্র কারণ তা প্রমাণ করেছিলেন বাঙ্গালী মধ্যবিত্তেরা। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁদের একমাত্র হাতিয়ার ছিল লেখনী। বাঙ্গলা নাটক রচনা ও বাঙ্গলা সংবাদপত্র (বৃহৎ অর্থে ভারতীয় ভাষায় লিখিত প্রাদেশিক সংবাদপত্র) পরিচালনা ছিল, স্বদেশহিতবাদী মানসচিন্তা প্রকাশের প্রকৃত পটভূমি। ইংরেজেরা বাঙ্গালীর নাটকরচনার প্রয়াসকে কি রকম সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন, প্রথম থেকেই বাধাদানে সচেষ্ট হয়ে নানা নিন্দা ও সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাব যে, বাঙ্গলা নাটক স্বাদেশিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কি রকম ভৈরব মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিল ও ইংরেজ সরকার মনে-প্রাণে প্রমাদ গুনেছিলেন এবং বাঙ্গলা নাটকের আত্মপ্রকাশ ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে তার কণ্ঠরোধ করেছিলেন। এমন কি বাঙ্গালীর সংবাদপত্র পরিচালনাকেও ইংরেজরা সহ্য করতে পারেননি। বিশেষভাবে স্বাদেশিকতার প্রত্যুষপর্বে বাঙ্গালীর সাংগঠনিক-চেতনা সংবাদপত্রকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয়। তাই সংবাদপত্রগুলির ক্রমানুপাতিক আত্মপ্রকাশ তাঁদের পক্ষে ভীতি ও আতঙ্কের কারণ হয়েছিল। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সংবাদপত্রাশ্রয়ী মনোভাব যে কত গুরুত্বপূর্ণ পাদ্রী লঙ, নীলকমিশনের সামনে তা তুলে ধরেছিলেন। পাদ্রী লঙ, কালতরঙ্গ গণনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তিনি প্রথম ভবিষ্যতবাণী করেন যে, ইংরেজদের পায়ের তলায় আগ্নেয়গিরি গড়ে উঠেছে, এবং অচিরেই তা বিস্ফুরিত হয়ে ভারতের আকাশকে কৃষ্ণধূমে আচ্ছন্ন করবে। তিনি বলেছিলেন, "I,

for years, have not been able to shut my eyes to what many able men see looming in distance. It may be distant or it may be near ; but Russia and Russian influence are rapidly approaching to the frontiers of India."[৫৮]

বাঙ্গলাদেশ তথা ভারতবর্ষে সংবাদপত্র কিরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে দিকে দিকে গণচেতনাকে সমৃদ্ধ করছে এবং সিপাহী বিদ্রোহের ফলশ্রুতি এদেশীয়দের মনে কোন্ প্রভাব বিস্তার করেছে, উভয় সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। আলোচনার স্বার্থে আমরা তাঁর মন্তব্যটি উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করব। বাঙ্গালীর স্বাদেশিক চিন্তাধারার পরিণত রূপ ও গতিবেগ উভয়ই এতে ধরা পড়েছে।

"গত ১৬ বছর ধরে আমি দেশী ভাষার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলির নিয়মিত পাঠক। এইসব পত্রে নীলচাষ সম্বন্ধে নিয়ত যে আলোচনা চলেছিল, সেগুলো থেকেও আমি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। ·· সিপাহী বিদ্রোহে নেটিভদের সুপ্তমন জেগে উঠেছে। ···জনসাধারণের মনে যে স্বাধীনতাবোধ জেগেছে তার দু'টো কারণ আমার নজরে পড়েছে। ··· প্রথম ইংরেজি শিক্ষা। সুখের কথা, নেটিভদের মধ্যে এই শিক্ষা প্রসার হচ্ছে। এতে স্বাধীনতার বোধ তাদের হচ্ছে. ন্যায়-সুবিচার সম্বন্ধে তাদের মন সজাগ হচ্ছে, আর তাদের মনে অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংরেজি ধাঁচের ঘৃণাবোধ জন্মাচ্ছে। এই শিক্ষা বিভিন্ন প্রেসিডেন্সীর নেটিভদের একদেশভক্তি গোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। ভারতীয় ব্যাপারে তাদের সমবেত বুদ্ধি এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ···কলকাতার বোম্বাইএ নেটিভরা ইংরেজিতে সংবাদপত্র পরিচালনা করে। এইসব সংবাদপত্রে শিক্ষিত নেটিভদের মতামত অভিব্যক্ত। ···দুঃখের বিষয় এসব পত্রিকার ধমক ও খবরদারী ইউরোপীয় সম্প্রদায় একটুও গ্রাহ্য করছে না। ···রাজনীতিক বিষয়ে যেসব বই প্রকাশিত হচ্ছে তার ক্রয় আগ্রহ থেকে বেশ বুঝা যায়, এইসব দেশীয় সংবাদপত্রের প্রভাব কেমন। ···এইভাবে ইউরোপ ও

৫৮ Trial of the Rev. James Long : Of the Church Missionary Society for Libel : Long's Statement before the trial. p. 65

ভারতের সব রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নেটিভমনের বেশ পরিচয় হয়েছে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় সাধারণতঃ যা মনে করেন তার চাইতেও। বাংলা সংবাদপত্রে সাধারণতঃ কি দেওয়া হয়, নমুনা স্বরূপ গত বৃহস্পতিবার 'ভাস্করের' কথা উল্লেখ করেছি। এতে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—আয়কর সম্বন্ধে। এই প্রবন্ধে লর্ড অকল্যাণ্ড, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড ডালহৌসী এবং রণজিৎ সিং-এর নীতির আলোচনা করা হয়েছে। তারপর লর্ড ক্লাইভের ভারতত্যাগ সম্পর্কে সম্পাদকীয়। এর পর সার চার্লস ট্রেভেলিয়ান ও বর্ধমানের রাজার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ। তারপর চীনের সংবাদ, নীল-কমিশনের সংবাদ .....। .. এইসব পত্রিকার নিত্য সমালোচনার বিষয় হল আদালতের আমলাদের কথা, পুলিশের অবস্থা আর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রকৃতি। মনে পড়ে ১৬ বছর আগে পড়েছি, 'ভাস্করে' আদালতের দুর্নীতি অতি তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করে কতকগুলো শক্তিশালী প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। একথা আমি ভালোকরেই জানি যে, গেল ১৬ বছর ধরে, নেটিভদের এসব সংবাদপত্রে নীলচাষ অবিরাম আক্রমণের বিষয় হয়ে আসছে। এসব সংবাদ-পত্রের মতামত জনসাধারণের মধ্যে নেমে এসেছে। এমন সব পথে নেটিভদের মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যার খবর ইউরোপীয়রা সামান্যই রাখে। এইভাবে সিপাহী বিদ্রোহের সময় প্রায়ই, গভর্ণমেণ্ট কোন সংবাদ জানার আগে বাজারে সে কথা প্রচারিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি ১৮৬০, ২১শে মে তারিখে 'সোমপ্রকাশ' থেকে 'নীলকরদের ধর্মবুদ্ধি' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধের অনুবাদ দাখিল করছি। ..এখানে আমি বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত একখানি পুস্তিকা দাখিল করছি। এর প্রচার খুব ব্যাপক। পুস্তিকার নাম, 'নীলকরদের অত্যাচার'। এতে এমনসব গান আছে যা নেটিভদের মধ্যে ব্যাপকভাবে গীত হয়। এইসব গানের কতকগুলোর মর্ম এই —নীলকরের দাদনের সুদ তিন পুরুষ ধরে জমে, পাট্টা বিক্রি করলে তা আর গঙ্গা পেরোয় না, অর্থাৎ নীলকরদের হাত থেকে রেহাই পায় না, নীলকরেরা রায়তদের কাছে প্রথমে ভিখারীর মত এসে নীলচাষ করবার খোসামুদি করে, কিন্তু তারপর রায়তদের হাড়ে দুর্বা গজিয়ে দেয়, নীলকরেরা সুঁই হয়ে সেঁদোয় আর ফাল হয়ে বেরোয়। তারা পঙ্গপালের মত বাঙ্গলা ছারখার করছে, প্রজা ডুবে যাচ্ছে আর ওরা চেয়ে চেয়ে দেখছে, সব গেল সব গেল, সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে ছাড়া আর কাকে বলব, রাতে চোখ বুজলে

দেখি সাদামুখগুলো চোখের সামনে, আর ভয়ে আমাদের প্রাণ খাঁচা ছাড়া হয়, বেদনার জলন্ত আগুনে আমাদের মন প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে। (অনুবাদ ও মূল দাখিল করা হল।) ··একথা আমি কমিশনারদের নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে নীলচাষ সম্বন্ধে, নেটিভ নরনারীদের মনে যে ক্রোধের আগুন জ্বলছে তা প্রকাশ করবার ভাষা নেই। এ সমস্যার একটা ন্যায্য ব্যবস্থা হওয়া দরকার, নৈলে ভারতের ভবিষ্যত শান্তির কথা ভেবে আমি সত্যি সত্যি শঙ্কিত। কোন না কোন মফস্বল জেলায় এই ভাবই জাগছে যে সরকার আর সরকারী কর্মচারীরা নীলকরদের পীড়ন দেখেও দেখে না। নেটিভরা বলছে, মুসলমান আমলেও এমন নির্মম অত্যাচার হয়নি। এই ভাব দেশময় ছড়িয়ে পড়ছে। ··সম্প্রতি নেটিভরা বলছে, অন্য বিদেশী শাসনে এর চাইতে আর কি খারাপ হবে?···

নীলকরদের বিরুদ্ধে এইভাব যে মাত্র বাঙ্গলার নেটিভদের বা নীচুস্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়। অনেক শিক্ষিত নেটিভ জানে, যে ফরাসী সংবাদ-পত্রগুলি নীলচাষের ব্যবস্থাকে ইংরেজ শাসনের কলঙ্ক বলে বলেছে।"[৫৯]

নীলকরেরা কিন্তু পাদ্রীদের সময়শাসনকে প্রীতির চোখে দেখেননি। তাঁরা মিশনারীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী এবং নীল-চাষীদের সমর্থক বলে অভিযোগ আনেন। পাদ্রীদের কার্য-কলাপের নিন্দা করে, নীলকরদের মুখ্য পত্র-পুস্তিকা 'Brahmins and Pariahs'-তে লেখা হয়েছিল,

"How long would the missionaries remain in India, if they were not backed and protected by British bayonets? The planters, being now deserted by those who hold bayonets at their command, are, as a matter of course thrown into the power of a hostile race who hate civilian, missionary and planter in equal degree, or perhaps the missionary the most and the planter the least. The muting gives conclusive evidence of the hatred borne by natives to all Europeans or indeed Christians surely it is a very sucidal policy for

৫৯ মাসিক বসুমতী : ৩২ শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৬০

one set of Englishmen to ruin another in a foreign country, and even the thinking portion of the natives must laugh at the house divided against itself and be full of hope that their time is commanding to gain ascendancy, when they see Mr. Grant at his work."৬০

ইংরেজ মিশনারীরা নীল অত্যাচারের বিরোধিতা করে নীলকমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধও লিখেছিলেন।* তবে তাঁরা নীল অত্যাচারকে সমর্থন না করলেও, ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা যাতে ভারতবর্ষে দৃঢ়ভাবে কায়েম হয়, সে বিষয়ে তাঁরা আন্তরিক সমর্থন ও প্রচেষ্টা চালাতেন। পাদ্রী লঙ্ 'নীলকমিশন'-এর সামনে সাক্ষ্য দান কালে বলেছিলেন,

"গভর্ণমেণ্টের প্রতি নেটিভদের আকর্ষণ জন্মিয়ে দিয়ে ইংরেজের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে আর খ্রীষ্টানী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সাধারণকে শিক্ষিত করতে ও একদল বুদ্ধিমান কৃষক সৃষ্টি করতে আমি চাই। এরই জন্য এ বিষয়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি।"৬১

নীলকমিশনারদের রিপোর্টে মিশনারীদের কাজকর্মকে সমর্থন করা হয়েছিল। এতে লেখা হয়,

"১২০ দফা। ...শান্তি, সাধনা ও সুনিয়ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত যে মিশনারী সাহেবানদিগকে দেশে দেশে পাঠান গিয়াছে, সেই মিশনারী সাহেবদিগকে গোলমালের সূত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের প্রতি নীলকর সাহেবেরা অত্যন্ত রাগ প্রকাশ করিয়াছেন। কোন অত্যাচারের বিষয় শুনিবার মাত্র তাহা অনাদর করাতে এবং নিরাশ্রিতদিগকে আশ্রয় দেওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হওয়াতে যত্তপি কোন দেশের গোলমালের কারণ অথবা সূত্র হইয়া থাকে তবে আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতেছি যে চার্চ মিশনারী সাহেবানেরা এইরূপ করিয়াছেন। কিন্তু

৬০ Brahmin and Pariah : pp. 69-70

* জার্মান পাদ্রী সি বমভাইটস—হিন্দুপেট্রিয়ট (২৮শে এপ্রিল, ১৮৬০) : 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'—(৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬০) কাপাস ডাঙ্গার পাদ্রী : ফ্রেডারিক সুড—ইণ্ডিগো কমিশন রিপোর্ট, পৃ. ৬৩ ৬৪।

৬১ মাসিক বসুমতী : ৩২ শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৬০

তাহাদের নিজের কোন উপকারার্থে কিম্বা অন্যকোন ফলভোগ করিবার নিমিত্ত যে তাঁহারা এইরূপ আচরণ করিয়াছেন তাহা নয়, কেবল চাষ সম্পর্কীয় লোকের অর্থাৎ প্রজাদের সুখ ও সুনিয়মের নিমিত্ত করা হইয়াছিল।

১২১ দফা। এই সকল ভদ্রলোক হইতে আশ্রয় এবং পরামর্শ গ্রহণ করা যে প্রজাদের প্রতি অত্যাবশ্যক তাহা আমাদিগের বিবেচনা অনুসারে যথার্থ এবং স্বভাবসিদ্ধ বোধ হয় কারণ মিশনারী সাহেবানেরা প্রজাদিগের ভাষা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন তাঁহারা লোক সমাজে সহজে মিশিতে পারেন তাঁহারা মনুষ্যের আবশ্যকীয় প্রধান ২ বিষয়ে তাহাদিগের সহিত কথোপকথন ইত্যাদি করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা অন্যান্য ইউরোপীয়ান সাহেবদের ন্যায় কোন বিশেষ কর্মে অথবা বাণিজ্য বিষয়ে ব্যস্ত আছেন বলিয়া লোকদিগকে সৎ পরামর্শ ইত্যাদি আবশ্যক মতে দিতে বিরক্ত প্রকাশ করেন না। মাষ্টার ব্লুমহার্ট এবং তাঁহার সঙ্গী অন্যান্য মিশনারীগণ যদ্যপি প্রজাদের নালিশের প্রতি অমনোযোগ করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা অত্যন্ত নির্দয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন। বিশেষতঃ যখন ঐ সকল নালিশ ইত্যাদি তাঁহাদের মিশনারী সম্পর্কীয় কর্মের ব্যাঘাত স্বরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন।

১২২ দফা। আর এই পাদ্রি সাহেবগণ সুস্পষ্টরূপে অস্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা কোন কথার দ্বারা কিম্বা কোন কর্ম্মের দ্বারা এই উৎসাহ প্রজ্বলিত করেন নাই, বরং তাঁহারা রাইয়তদিগকে আইনের অনুবর্তী হইতে ও আইনের বিপরিতাচরণ না করিতে আর ঐ বৎসর নীল রোপন করিতে এবং যদ্যপি উপদ্রবিত হয় তবে উচ্চ আদালতে আপীল করিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং সহজে অন্য ধারণা করা যায় না যে খৃষ্টানীয় কিম্বা সৎপথালম্বী কোন ব্যক্তি আর কিরূপে কর্ম্ম করিতে পারিতেন, বস্তুত পাদ্রী সাহেবদের উপদেশে যে রাইয়তগণ নীল বুনিতে অস্বীকার করিয়াছে, এ মত যে কথিত আছে তাহার সত্যতার বিষয় সম্পূর্ণ অমূলক।...

১৩০ দফা। পাদ্রী সাহেবেরা......প্রজাদিগের এই মাত্র কহিয়াছিলেন যে প্রজারা স্বাধীন ব্যক্তি এবং কাহারো গোলাম নহে, এই কথা কহাতে নীল আবাদের প্রতি যে হানিকর হইয়াছে তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, নীল আবাদের বর্ত্তমান প্রথার প্রতি প্রজাদিগের মনে, বহুকালাবধি

বৈরক্তা জন্মিয়াছে এবং এই ক্ষণে তাহারা ইচ্ছা করিলে নীল বুনিবে এবং ইচ্ছা না হইলে বুনিতে হইবে না জানিতে পারিয়া এককালে নীল করিব না প্রতিজ্ঞা করিলেক, অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে প্রজাদিগের মনের বিরক্ত এই গোলমালের প্রধান কারণ এবং তাহারা যে স্বাধীন ব্যক্তি তাহা জ্ঞাত হওয়া কেবল উপলক্ষ্যমাত্র হইয়াছে।"[৬২]

কিন্তু বাঙ্গালী রায়তরা পাদ্রীদের প্রীতির চোখে দেখেনি। শ্বেতাঙ্গ ভীতিই এর একমাত্র কারণ। ইংরেজদের অত্যাচার দেখতে দেখতে তারা এমন দিশাহারা হয়েছিল যে শ্বেতচর্ম বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেখলেই 'নীল মামদো' বলে চারদিকে ছুটে পালাত। এই আতঙ্ক ছিল অনেকটা ভূত দেখার মত। রায়তদের আতঙ্কের ছবিটি নীলদর্পণের পাতায় আঁকা আছে।

ডাক্তার। "পাদরি সাহেবদের মুখে আমি প্লান্‌টার্ সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গ নগরের কুটি হইতে আসিল, একটি গ্রামে বসিয়াছে, আমার পাল্কী নিকট দিয়া দুইজন রাইয়ত বাজারে যাইল, একজনের হস্তে দুগ্‌দো আছে. আমি দুগ্‌দো কিনিতে চাহিল, এক রাইয়ত এক রাইয়তকে কিক্বিং করে বলিল "নীলমামদো, নীলমামদো" দুগ্‌দো রাখিয়া দৌড দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কহিল রাইয়ত দুইজন দাদনের ভয়ে পলাইয়াছে। আমি দাদন লইয়াছি আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে। আমি বুঝিলাম আমাকে প্লান্‌টার লইয়াছে। রাইযতদের হস্তে দুগ্‌দো দিয়া আমি গমন করিল।

ডেপুটি। ভ্যালি সাহেবের কান্সারণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি সাহেব যাইতেছিলেন রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া "নীলভূত বেরিয়েছে, নীলভূত বেরিয়েছে" বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল।" (৪।৩ গ.)

রায়তদের নীলচাষ ভীতির সঙ্গে পাদ্রীভীতিও ছিল প্রচণ্ড। পাদ্রীরা সকলেই উদার মনোভাবের পরিচয় সব জায়গাতে দিতেন না। বিশেষভাবে প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও ক্ষেত্রবিশেষে লোভ অথবা জোর করে ধর্মান্তরিতকরণের চেষ্টা সাধারণ রায়তদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি

৬২ নীলকমিসনারদিগের রিপোর্ট: পৃ. ৫৩-৫৭

করেছিল। সমকালের একটি পল্লীগাথায় গ্রাম্য বাঙ্গালীর মনোভাব বাঁধা পড়েছে,

"জাত মাল্লে পাদ্রী ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥
ব্যারাল চোকো হাঁদা হেমদো
নীলকুটির নীল মেমদো॥"

তবে, নাট্যকার দীনবন্ধু পাদ্রীদের মানবিক ও উদারনৈতিক কার্য-কলাপের সংবাদ সম্পর্কে যে অবহিত ছিলেন, তার পরিচয় তিনি নাটকে রেখেছেন। দুই শ্রেণীর খ্রীষ্টীয় ধর্ম-যাজকদের চরিত্র সমান নিরাসক্তিতেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা দেখেছি পাদ্রীদের কাজে নীলকর ও তাঁদের অনুগামীরা একেবারে খুশি ছিলেন না। 'নীলদর্পণে' দেখি দেওয়ান গোপীনাথ নবীনমাধবের জনসেবাকে ব্যঙ্গ করে বলেছে,

"...বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে।" (১।৩ গ.)

অন্যদিকে মিশনারিদের জনহিতবাদী কাজ যে অনেক রায়তকে সন্তুষ্টি প্রদান করেছিল, তারও প্রমাণ নাট্যচিত্রে পাই,

ডেপুটি। "... কিন্তু ক্রমশঃ পাদরি সাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর-পীড়নাতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরি সাহেব যত আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহারা তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণ রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে, "এক ঝাড়ের বাঁশ বটে—কোনখানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।" (৪।৩ গ.)

নাট্যকারের এই বক্তব্যের সঙ্গে নীলকমিসনারদের রিপোর্টে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা জানি 'নীলদর্পণ' নাটকের পিছনে দীনবন্ধুর কর্তব্য মনের তাগিদ কাজ করেছে। নীলকরদের নির্যাতন, ফিরিঙ্গীতোষক দেওয়ান ও আমিনদের অত্যাচার এবং অর্থলিপ্সা, ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার প্রহসন ও সঙ্গে সঙ্গে মিশনারীদের মানবহিতবাদী কর্মতৎপরতা, সমস্ত কিছু জাতির স্বার্থে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ও নিরপেক্ষ মনোবাসনায় তুলে ধরেছেন। দীনবন্ধু মানুষের বিবেকের কাছে, শুভকল্যাণ চিন্তার কাছে আবেদন করেছেন, নীল অত্যাচারকে প্রতিরোধ করে বিশ্বমঙ্গলকে স্থাপন করবার জন্য। তিনিই

সর্বপ্রথম বাঙ্গলা নাটকে যথার্থ স্বাদেশিকতার নান্দী পাঠক। জাতীয়তার ক্ষেত্রে, স্বাধিকার অর্জন করবার পূর্বে দেশবাসীকে শ্রেণীবিভেদ ও বর্ণবৈষম্য ভুলতে বা দূর করতে হবে, একথা দীনবন্ধু দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেন। এরই ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমিতিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের গতিবেগ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। 'ভারতবর্ষীয় সভা'র সভ্যগণ যখন দেশবাসীকে রাষ্ট্রচেতনায় দীক্ষিত করছিলেন, তখন দীনবন্ধু তাঁর নাট্যচিত্রে প্রকাশ করলেন স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে জাতির সর্বাধিক প্রয়োজনীয় তথ্যটি—আত্মমর্যাদার সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনার কথা। কেবল হতাশা বা আর্তনাদের চিত্রচিত্রণ নয়, পৌরুষ চৈতন্যকে আশ্রয় করে ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে রুখে দাঁড়াবার বলিষ্ঠ জীবনাদর্শটি তিনিই বাঙ্গালীকে বললেন সকলের আগে। 'নীলদর্পণ' নাটকে কোথাও প্রকাশ্যভাবে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তুর্যনিনাদ নেই, তবুও এই রচনাটিকে ইংরেজরা রাজনৈতিক নাটক হিসাবে গ্রহণ করেন। এই নাটক বাঙ্গালীর মোহমুক্তি ঘটিয়েছিল এবং এই সময় থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে তাদের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। তাই পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলন সৃষ্টির প্রথম সূতিকাগার দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'।

পরবর্তীকালে একমাত্র বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ছাড়া আর কোন সাহিত্য বাঙ্গালীকে এমনভাবে জাতীয়তাবাদে উদ্দীপিত করেনি। কিন্তু রচনার প্রসাদগুণ বিচারে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' বঙ্কিমের 'আনন্দমঠের' তুলনায় শিথিল হলেও এই নাটক নিয়ে বাঙ্গলাদেশে স্বাদেশিকতার যে প্লাবন এসেছিল, 'আনন্দমঠ' নিয়ে ঠিক অতখানি হয়নি। গ্রামের সাধারণ সম্প্রদায় থেকে শুরু করে শহরের শিক্ষিত জনগণ, এমন কি বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকাদিতে আলোচনায় সমালোচকগণ যে রকম উত্তাল মুখর হয়েছিলেন, 'আনন্দমঠ' প্রকাশের সময় সেরকম বিক্ষোভ তরঙ্গায়িত হয়নি। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও ইংরেজ সরকার 'বন্দেমাতরম্' গান ছাড়া 'আনন্দমঠ' উপন্যাসকে নিয়ে কোন বিব্রত বোধ করেননি। কিন্তু 'নীলদর্পণ' নাটকটিতে তাঁরা বিশেষভাবে বিব্রত হয়েছিলেন। সেজন্য দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' বাঙ্গালীর স্বাদেশিক সাহিত্যসাধনায় অনন্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ ও বাঙ্গালীর সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়চেতনা

'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ ও প্রকাশনার সমস্ত দায়িত্ব একাকী বহন করেছিলেন মানবপ্রেমিক পাদ্রী লঙ্। অনুবাদক হিসাবে মহাকবি মধুসূদন দত্ত বিশেষভাবে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি 'নীলদর্পণ' নাটকের অনুবাদক ছিলেন না। অনুবাদকে আশ্রয় করে কোন সাহিত্যের প্রাণলোকে সহজে অনুপ্রবেশ করা সম্ভব কিনা, অথবা মৌলিক সাহিত্যের প্রাণধর্ম অনুবাদে কতখানি বজায় রাখা সম্ভব, এ নিয়ে অনেক তর্ক ও বিবাদ করা যেতে পারে। তবে, মৌলিক ও তর্জমার সমতা ও সাযুজ্যের বিবাদ না তুলে আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি যে, মননশীল পাঠকের সজাগ কল্পনা ও সুতীক্ষ্ণ বিচারবোধ অনূদিত সাহিত্যের অন্তরালে প্রবহমান অনুভূতিটুকুকে সহজে উপলব্ধি করে নেয়। আর এইটুকু সম্ভব হলেই অনুবাদকের কৃতিত্ব ধরা পড়ে। 'নীলদর্পণ' নাটকের সার্থকতা এই খানেই। তর্জমার দুর্বলতার মধ্যেও অনুবাদক মূল নাটকের প্রাণধর্ম বজায় রাখতে পেরেছিলেন বলেই 'ইংরেজি নীলদর্পণ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে ও বিদেশে সমর্থন ও প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। অবশ্য প্রচারের সমস্ত দায়িত্ব যিনি বহন করেছিলেন, সেই পাদ্রী লঙের মহান কর্মের কথা আমাদের প্রসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে।

'ইংরেজি নীলদর্পণ' সম্পর্কে লেখা হয়েছিল,

"We hear with some little surprise of the extraordinary sensation created in Bengal and more especially in Calcutta by the Nil Durpan. Inspite of all the disadvantages of a translation it is evidently written with talent. In the original it must have created a powerful interest in the native community."[৬৩]

অনুবাদ কতখানি সার্থক হয়েছিল তার পরিচয় এই উদ্ধৃতির মধ্যে

৬৩ "Friend of India" : Marshman : Lalit Chandra Mitra, "History Indigo Disturbance in Bengal, with a full report of Neel Darpan Case," p. 87.

চিহ্নিত হয়ে আছে। ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের সময়ে নাট্যকার ও অনুবাদকের নাম প্রচার করা হয়নি। কেবল লেখা হয়েছিল,

"Nil Durpan or The Indigo Planting mirror, a drama translated from the Bengalee by a native."

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে অনুবাদকের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর পর্যটন লিপিতে লিখেছেন,

"In 1899 when I was in Ispahan in Persia (Iran) Rev. Edward Stewart, then much advanced in years, was the Bishop of Ispahan. ·····he used to tell me how he and Rev. James Long suffered for the peasants in the great Indigo Planters' case. He told me that every incident in Dinabandhu's Nil Darpan was true and correct ;......

One of his advanced students, named Ramchandra, translated the 'Nil-Darpan' into English and he himself revised the language."৬৪

'ইংরেজি নীলদর্পণ' নাটক প্রচারে নীল কমিশনের সভাপতি, ডবলিউ. এস. সিটন্‌কার বিশেষ সাহায্য করেন। বাঙ্গলা নাটক ইংরেজিতে অনুবাদিত হ'লে পাদ্রী লঙ্‌ ইংলণ্ডে নীলকরদের অত্যাচারকে তুলে ধরবার জন্য অনেক 'কপি' (Copy) সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে প্রেরণ করেন।* এতে বাঙ্গলাদেশে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেন। নীলকমিশনের

৬৪ Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra ; Mohendra Nath Dutta, pp. 33-35.

* The following, are the names of the persons in the list put in the Court as exhibits C & C I.

No. 1. Mr. Long's distribution list :—Secretaries of Aborigines Protection Society ; Secretary Peace Society ; New Broad Street ; Earl of Albemarle ; Rev. W. Arthur (Wesleyen Mission House) ; E. B. Underhill ; Secretary Baptist Missionary Society ; J. Bright, Esq., M. P , R. Cobdon, Esq, M. P. ; Marquis of Clauricarde ; R. H. B. D' Israeli ; D. Forbes, Professor, K. C ; W. Gladstone ; Hon. A. Kinnaird, 35, Hyde Park ; Respective Members Council in India ; J. C. Marshman ; Hon & Rev. Baptist Noel ; D.

সামনে সাক্ষ্যদান কালে অনেক ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রশাসক সম্প্রদায়ভুক্ত।

নীলকুঠিয়ালদের এই সমালোচনা সহ্য করা ছিল একেবারেই অসম্ভব। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের আক্রমণ করে তাঁরা লিখেছিলেন,

"In the early days of Indian Empire our civilian went out of England—a mere boy—and he found himself at once a member of a dominent and priviledged class. The millions of Hindusthan all bowed themselves to the dust before him. He was taught and how soon is such a lesson is learnt to consider himself a supreme being to those around him. As the common phase in India runs he was

Masson, 16, Regent Villas, Avenue Road, Digby Seymour, M. P ; Secretary Social Service, Pall Mall, Earl of Shaftesbury, A. Dunlop, M. P, Lord Blandford ; C. Buxton, J. Muir, Esq, 16. Regent Terrace, Edinburgh, Rev. H. Penn, 11, Highbury Cresent, Secretary Branch Education Society J. Dickenson, Secretary of Indian Reform Association . Lord Stanley, M. P, J. Horsman, M. P, J. Layard, M. P. Sir, S. M. Peto, M. P. Church Mission Society, Rev. John, Sale, Rev. A. Schurr.

No. 2. Bengal Office List :- Secretary of the State. 20, copies, Earl of Ellenborough, Earl de Grey and Ripon ; Viscount Raynham, Hon. J. Waldgrave, Roundell Palmer Col. Sykes, Sir. Culling Eardy, C. Newdegate, Sir, James Colvile . J. W. Dalrymple, H. Ricketts, Hodgson Pratt, J. W. Kaye, J. F. Hawkings, J. Dickenson, Jt. Secretary, to the Indian Reform Society, M. Tounsend, Sir, Erskine Perry ; D. Vansittart, Esq, J. G. Craig, Esq . Lord Auckland, Sir, C. Trevelyan ; J. C. Phillimore, M. P, H. D. Seymour, Esq. M P, R. W. Crawford, M. P, Lord Cranworth, Dr. Lashington, Sir, J. Herschel, S. Walpen ; Sir, J. Packington, Sir, A. Buller, H. M. Parker, Sir, S. Fergusson, Sir, Lawarence Peel.

English Editors :—Daily News, Economists, Saturday Review.

Indian Editors :- Bombay Times, Lahore Chronicle, Madras Spectator, Moffussilite.

Vide—The History of the Nil Durpan with the State Trial of the Rev, J. Long, Christian Missionary Society.

one of the heaven-born. After a few days of subordinate office with a salary greater than that of the grey headed barrister in judicial position at home, he became in some far-away province, the proconsul of great sovereign company. He had no knowledge of law, either in its principle or its practice, yet he set in judgement on the millions of mankind. and the Indian Princes were his suitors. He knew little, if anything, of the principle of finance, yet he administered the finances as well as the judicial functions of the province. He was ignorant of the habits, and customs of the people, and he had a bare smattering of their language, yet his fiat was practically without appeal in all cases, from a contest between two farmers to the confiscation of the possession of an ancient line of princes. He was irresponsible. No crime, however, great, could ever be proved against him. In the history of the Company, there is scarcely an instance of a 'Senior merchant' or a 'Collector' having been publicly or privately dismissed from service."[৬৫]

'ইংরেজি নীলদর্পণ' নাটক তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকারের সেক্রেটারীর স্বাক্ষর ও সীল-মোহরে প্রকাশিত হলে স্বার্থান্বেষী শ্বেতাঙ্গ সমাজ ধৈর্যহারা হয়ে উঠে। নীলকমিশনের সভাপতি ডবলিউ. এস. সিটন্‌কার এই সময়ে প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারী ছিলেন। ইংরেজদের কু-কাজের অন্ধ সমর্থক 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা ও ব্রিটিশ ভারতের জমিদার ও ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী 'মিঃ ফারগুসন্' বঙ্গীয় সরকারের কার্যকলাপের নিন্দা ক'রে ঘটনার জবাবদিহি করতে বলেন। তাঁদের পত্রে আক্রমণের ভাষা ছিল অত্যন্ত রূঢ় ও কর্কশ।

৬৫ Brahmin and Pariahs :
Nil Darpan—Edited by Sudhir Pradan, p-13 (Introduction).

The Land holders and Commercial Association.

To

E. H. LUSHINGTON ESQ.

Secretary to the Government of Bengal.

Sir,

I am directed by the General Committee of the Association to beg that you will inform them if it was with the sanction and authority of the Government of Bengal, that a publication entitled 'Nil Durpan' has been circulated through means of the Post Office under the official frank and seal of the Bengal Secretariate.

I myself have seen an envelope containing that publication so frankedand circulated, and therefore, there can be no doubt of fact.

If it has been done without the sanction or knowledge of the Government of Bengal, the Committee will expect a formal and official disavowal of the proceeding and that the names of the parties who have thus made use of the name and means of the Government to circulate a foul and malicious libel on Indigo Planters, tending to excite sedition and breaches of the peace, be given to us in order that they may be prosecuted with the utmost rigour of the law.

Calcutta, I have the honour to be
the 25th May, 1861. Sir,

Your most obedient servant

Sd./ W. F. FERGUSSON

Secretary, Landholders & Commercial Association of British India.

এই চিঠির পর তাঁরা বাঙ্গলা সরকারকে আরও একখানি পত্র লেখেন।*

* পরিশিষ্ট—(ক-১) দ্রষ্টব্য।

কিন্তু. বাঙ্গলা সরকারের তরফ থেকে যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল তা বণিক সমিতির মনঃপূত হয়নি।† তাঁরা নাট্যকার ও অনুবাদকের নাম না জানতে পেরে মুদ্রক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মানহানী মামলা দায়ের করেন। প্রকাশক সি. এইচ্. ম্যানুয়েল (C. H. Manuel) বিচারে অপরাধী প্রমাণিত না হ'লেও তাঁর দশটাকা জরিমানা হয়। অবশ্য শোনা যায় তিনি পাদ্রী লঙের অনুমতিক্রমেই তাঁর নাম প্রকাশ করেছিলেন। পাদ্রী লঙের নাম জানতে পেরে নীলকরদের চিত্ত হর্ষে পূর্ণ হয়। এ প্রসঙ্গে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছিল,

"It was a matter of rejoicing with them that after all, they had an opportunity of wreaking vengence upon a member of a class which had been chiefly instrumental in opening the ryot's eyes to the monstrous deception by which, though in all respects a freeman, he had been chained to the soil as a serf."[৬৬]

সিভিলিয়ান ডবলিউ. এস. সিটনকারকেও (W. S. Seton Karr) অভিযুক্ত ক'রে নীলকরদের তাবেদার পত্রিকা 'বেঙ্গল হরকরা' লিখেছিল,

"We understand that Mr. Seton Karr avows that it was by his order, the pamphlet was circulated and we trust that no technicalities will prevent his being prosecuted in the Supreme Court and that no false tenderness or Court favour may keep him from being dismissed that service which he has so foully disgraced.'[৬৭]

কিন্তু প্রকাশনা ও অনুবাদের দায়িত্ব পাদ্রী লঙ্ একা গ্রহণ করলে তাঁদের সমস্ত আস্ফালন বৃথা হয়ে যায়। নীলকরেরা ও ইংরেজি পত্রিকা 'ইংলিশম্যান' পাদ্রী লঙের বিরুদ্ধে মানহানির* যে সমস্ত অভিযোগ এনেছিলেন, তা ছিল

† পরিশিষ্ট (ক-২) দ্রষ্টব্য।

৬৬ History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full report of Neel Darpan Case, L. C. Mitra, p-96.

৬৭ History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full report of Neel Darpan Case, L. C. Mitra, p. 96.

* পরিশিষ্ট (ক-৩) দ্রষ্টব্য।

সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষপ্রসূত। ফরিয়াদী পক্ষের 'প্রসিকিউটার' পাদ্রী লঙ্‌কে অভিযুক্ত করে বলেন,

" It was unnecessary for him to tell them that the case was one of the great importance, not alone to the particular individual whom he represented but as affecting the whole Christian community at large ··This pamphlet was not written with a view of setting wrong right or of mending the existing state of morals; it was written with a view of setting race against race the European against the Native."[৬৮]

তাছাড়া, তাঁরা 'নীলদর্পণ' নাটকের ভূমিকার নির্দিষ্ট অংশটুকু † তুলে ধরে সমালোচনা করে বলেন,

"Having in view the publisher and his calling, could there be anything more offensive from a teacher of Christianity to a Christian mind than the comparison with Judas Iscariot the betrayer of our Saviour? And leaving the Christian element out of view, could anything be more offensive to all honourable feeling than the comparison of the scale of political freedom with the scale by the traitor for those thirty pieces of silver? Could anything be, to

৬৮ Trial of the Rev. James Long of the Church Missionary Society for libel, pp. 4-5.

† "The Editors of two daily newspapers are filling their columns with your praises and what ever other people may think, you never enjoy pleasure from it, since you know fully the reason of their so doing. What a surprising power of attraction silver has: The detestable Judas gave the great Preacher of the Christian religion, Jesus, into the hands of odious Pilate for the sake of thirty rupees; what wonder then, if the proprietors of two newspapers, becoming enslaved by the hope of gaining one thousand rupees, throw poor helpless people of this land in the terrible grasp of your mouths......"

--Introduction: Nil Durpan or The Indigo Planting Mirror, Edited by Sudhir Pradan.

men of high feeling and sensitive honour, more likely to lead to parties taking the law into their own hands, when they are thus maligned as selling for so paltry a bribe, the cause of the weak, and singing the praises of those Indigo Planters, who, if this preface were anything but a libel, had cast an ever lasting stain on the English name."[৬৯]

১৮৬১ সালের ১৯, ২০ এবং ২৪শে জুলাই কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে এই মামলা চলে। বিচারের সময় শিক্ষিত ও খ্যাতনামা বাঙ্গালীদের সঙ্গে সরকারী, বে-সরকারী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ ব্যক্তি সকলেই একসঙ্গে আদালতে উপস্থিত থাকতেন। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রও বিচারের সময় উপস্থিত ছিলেন। ২৪ জন বিশেষ জুরীর মধ্য থেকে ১৭ জনকে এই বিচারের সময় ডাকা হয়েছিল; আর এর মধ্যে কেবল একজন মাত্র ভারতীয় ছিলেন। তাঁর নাম মানিকজি রুস্তমজি। নীলকরদের 'প্রসিকিউটার' ছিলেন, পেটারসন্ ও কাউই, এবং পাদ্রী লঙের পক্ষে ছিলেন এগলিংটন ও নিউমার্চ। জেরার সময় 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ব্রেট স্বীকার করেন যে, তিনি প্রতি বৎসর একহাজার টাকার বেশি নীলকরদের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন।[৭০] এই মামলার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রতিবাদী পক্ষের আইনবিদ্ এগলিংটন মন্তব্য করেন,

"If this was a libel, the finest literature of ancient and modern times must be shut out. Look at Moliere's works: they are but a series of venomous caricatures of the clergy and medical profession .....'Oliver Twist', for example, which was written with the sole intent and purpose of doing away with the work house system as formerly carried out; it had been successful. Another work by the same author 'Nicholas Nickleby' was intended to expose and crash

৬৯ Trial of the Rev. James Long of the Church Missionary Society for libel, p. 5

৭০ History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full report of Neel Darpan Case, L. C. Mira, p. 130.

the abuses in Yorksire Schools. Were any legal proceedings instituted against Mr. Dickens ?"[৭১]

বিচারের রায়ে বিচারপতি স্যার মরডান্ট ওয়েলস্‌-এর উক্তি ছিল নীলকরদের প্রতি পক্ষপাত পুষ্ট।* বিচারের নামে প্রহসন স্বদেশে ও বিদেশে এক আলোড়ন তুলেছিল। তিনি আসামী পাদ্রী লঙের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে বলেন,

"The Jury, the civilians, the soldiers and merchants in this country alike had their common origin from that of middle class whose daughter's are here so shamefully maligned. These ladies came to this country to share a life of toil and hardship with their husbands."[৭২]

পাদ্রী লঙ এ-বিষয়ে প্রতিবাদ করে বলেন,

"......I am charged with slandering English women in the Nil Durpan. Now waiving the point that is only planter's wives the Native author refers to, I myself believe planter's wives are as chaste as any other females of English Society in India, and it was my impression that the author only referred to some exceptional cases, not giving them as specimens of a class of females. The view that I and others, who know oriental life, have taken of this part relating to females is it gives the Eastern nation of the high indelicacy of any woman who exposes her face in public or rides out in company with a gentleman. I have heard such remarks made of my own wife, but I treated them as a specimen of village ignorance."[৭৩]

৭১ History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full report of Neel Darpan Case , L. C. Mitra, p. 144.

* পরিশিষ্ট (ক ৫) দ্রষ্টব্য।

৭২ Life of Alexander Duff II , George Smith, p. 155,

৭৩ Address of Rev. Long to the Court : Nil Darpan ; Edited by Sudhir Pradan.

কিন্তু জুরীরা লঙ্‌কে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাঁর এক হাজার টাকা জরিমানা ও একবছরের জন্য জেল হয়। তাঁকে সাধারণ জেলে রাখা হয়েছিল। বিচারকের রায় প্রকাশ হবার পর পাদ্রী লঙ্‌ নির্ভীকভাবে বলেছিলেন, "what I have done now, I willdo again."[৭৪] জরিমানার টাকা সুসাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহ সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেন। রাজা প্রতাপ-চন্দ্র সিংহ উকিল খরচের দায়িত্ব বহন করেন। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রও মামলার সমস্ত ব্যয় বহন করতে রাজী হয়েছিলেন।

পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে 'নীলদর্পণ' বিচার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একটি নাটককে কেন্দ্র করে আলোড়নের এমন উদাহরণ বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি নেই। 'নীলদর্পণের' রাজনৈতিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে লেখা হয়েছিল,

"This literary weapon being of a terrible nature was seized and welded against British settlers.·····

It may be said that such books as the Nil Darpan act as an antidote to vice by exhibiting it in its most repulsive form, and thus give to the morals of society a healthy tone."[৭৫]

ইংলণ্ডে, স্যার মরডাণ্ট ওয়েলস-এর বিচারের নিন্দা করে যে সমস্ত পত্রিকা সোচ্চার হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'Daily News', 'Spectator', 'Saturday Review', 'London Review' ও 'Home News'। আলোচনার স্বার্থে আমরা দু'টি পত্রিকার মন্তব্য গ্রহণ করলাম।

(১) Daily News (London)

"It was in truth as if the French had prosecuted Moliere or the Yorkshire School masters, the author of Nicholas Nickleby or the Southern Planters, the author of Uncle Tom's Cabin. And this extreme view of the character of the work was adopted by the presiding judge Sir M.

৭৪ History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full report of Neel Darpan case, L. C. Mitra, p. 130.

৭৫ Calcutta Review ; June 1861, p. 366.

Wells. This prosecution is a piece of childish revenge. The Indigo Planters have failed in their attempts to mislead the Home public or shake the firmness of the Home Government, so they seek and find in the passions of non-official community of Calcutta the means of striking one of a body of men who have been mainly instrumental in enlightening the British nation respecting their relation with the ryot. It is much to be regretted that they are successful.

If all Calcutta were empanelled as a Jury, the verdict would not persuade the English public that a genlteman bent on slandering and vilifying a wealthy and powerful class of his countrymen would send a foul and filthy libel to the Rev. Baptist Noel and the Earl of Shaftesbury or palm a caricature of the Indian Rural life as veridical on Sir Charles Trevelyan, Lord Stanley and the Earl of Ellenbrough. The mere enumeration of the persons selected as recipients of the translated drama, shows that copies were sent in good faith to acquaint those who in the country pay most attention to Indian subjects, with a particular tendency and working of the Native mind. We believe that they will discover before the Parliament meets that in instituting the trial they have a serious mistake."[১৬]

(২) London Review :—

"Unless a very different colour be given to the cause it is plain that justice will not be satisfied by a reversal of the decision without the dismissal of Judge whose charge to the Jury and whose sentence on the defendant shows a

---

১৬ Nil Darpan : Ed. Sudhir Pradan, Appendix Section.

spirit of partizanship which is never witnessed on the Bench in England and cannot be tolerated in their dependencies."[৭৭]

তবে বাঙ্গালী কাগজ 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রতিবাদের সুর ছিল খুব কড়া ও আপোষহীন। ইংরেজ সরকারের নীতিহীন বিচারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে এক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করা হয়েছিল। বাঙ্গালীর সদাজাগ্রত জাতীয় চেতনার স্বাক্ষর এর সর্বাঙ্গে মুদ্রিত হয়ে আছে। সংবাদপত্রের সাহায্য ব্যতীত স্বাদেশিকতার প্রচার ও স্বায়ত্তশাসন অর্জন অসম্ভব, নির্ভীকতার প্রতিমূর্তি হরিশচন্দ্র অত্যন্ত ন্যায়-নিষ্ঠার সঙ্গে একথা প্রচার করেছিলেন। তাই ইংরেজ রাজত্বের অন্যায় নীতির সমালোচনা করতে তিনি দ্বিধান্বিত হননি।* তিনি লেখেন,

"From the whole proceedings of the 'Nil Darpan' trial, we have come to the conclusion that Sir Mordunt Wells rather acted as an advocate of the Indigo cause, than as a judge to dispense impartial justice.···Whole India stood astonished to see a Missionary of high reputation who rendered the most eminent services to the country, condemned through the malevolence and rancour of faction by a Judge who to support and advocate the Indigo cause, was hurried beyond the bounds of Justice, Law and Common sense.···

···One of the most memorable events which has thrown a dark spot into the annals of British India, is the trial and condemnation of Rev. J. Long.· No reasonable man will deny that the trial was by far the most unjust that ever disgraced any tribunal of the nineteenth century. In the history of the civilized world there are few examples with which it can bear a true analogy ; and to speak more

৭৭ Nil Darpan : Ed. Sudhir Pradan , Appendix Section.

* বিস্তৃততর আলোচনা, পরিশিষ্ট (ক—৬) দ্রষ্টব্য।

emphatically, it was a disgrace to Christianity to truth and to Justice, a disgrace to Reason and to Conscience.

This unjust trial reminds us of the trial and execution of Nand Coomar. Sir Mordunt may deservedly be called the Impay of the nineteenth century. In fact, he was a true incarnation of that arrogant, haughty and Bengali hating Englishman, who at one time, on the same chair and within the walls of the very same Hall, unjustly condemned the unfortunate Nand Coomar. But if we take a survey of the transactions of the Supreme Court, we shall find, that excepting the trials of Nand Coomar and the Rev. James long, which are of the blackest dye, and which will be for ever observed with detestation and abhorrence, they are truely deserving of praise. Thus by drawing a disfigured, but an exact picture of the interlopers of Christian Europe—we have set before our readers examples of the most barbarous, horrible and detestable course of action. I know not whether I shall have the fortune of getting a Brett to prosecute and a Wells to condemn or not."[৭৮]

বিভিন্ন রাজনৈতিক সভাসমিতিতে বাঙ্গালীর সঙ্ঘবদ্ধ স্বাদেশিক চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। পাদ্রী লঙ্ ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার ও দাবীর মূল তথ্যগুলি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছিলেন বলেই সমকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এক স্মারকপত্রে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর এবং তেতাল্লিশ জন শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্মিলিত হয়ে লেখেন,

"We are persuaded, Sir, that the part you have taken in carrying through the press the translation of the 'Nil Darpan' has been in perfect accordance with your cherished

৭৮ History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full report of Neel Darpan Case, L. C. Mitra, p. 97.

conviction as to the importance of enlightening the European mind here on the contents of the Vernacular Press.···

That the 'Nil Darpan' is a genuine expression of native feeling on the subject of Indigo planting, we can with confidence certify. We are aware that there are passages in the original, put in the mouth of the females and others which may grate on the ears of men of civilised taste, but such passages only expresses the thoughts and ideas current in the order of society painted in the work. If, however, an occasional indelicacy of expression should be a reason for the suppression of a work of fiction, we fear the most ancient and best classics of our land, which are so justly valued all the world over would remain sealed from public view ; and judged by the same standard there are not a few of the master pieces of European genious both ancient and modern which would not suffer from ordeal.···

We have deemed it due to put you in possession of this expression of our opinion on this important question in the belief that it may be the means of correcting the wrong impression which we have been sorry to find entertained viz that the Native Community do not consider the 'Nil Darpan' as an embodiment of popular feeling, and that they do not appreciate the motives which actuated you to bring its contents to the knowledge of the European public. Nothing could be more mistaken than this, and we do sincerely trust and hope that this letter will remove the misapprehension, so much to be lamented." (July 12, 1861)[৭৯]

---

৭৯ History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full report of Neel Darpan Case ; L. C. Mitra, p. 98

পাদ্রী লঙের বিচার কালে বিচারপতি মরডান্ট ওয়েলস্, ভারতবাসী বিশেষভাবে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে যে অন্যায় মন্তব্য করেছিলেন, তাতে জাতির আত্মমর্যাদা আহত হয়েছিল। ফলে, সেই সময়কার শিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত বঙ্গবাসী একত্রিত হয়ে বিচারপতির পদত্যাগ দাবী করে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের সভাপতিত্বে 'নাট্যমন্দিরে' এক বিরাট জনসমাবেশ হয়েছিল। সর্বস্তরের ব্যক্তিদের সঙ্গে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা কালীকৃষ্ণ, বাবু রামগোপাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি যশস্বী ব্যক্তিগণও উপস্থিত ছিলেন। এই জনসভায় প্রায় দু হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। গৃহীত প্রস্তাবের মূল কথা ছিল,

"That this Meeting desires to record not without a feeling of regret that its confidence in the Hon'ble Sir M. Wells, Kt, as a judge of the Highest Court of judicature in Bengal, has been impaired in consequence of his frequent —and indiscriminate attacks on the characters of the natives of this country with an intemperance inconsistent with the calm dignity of the Bench as well as from his repeated and indiscreet exhibition of strong political bias and race prejudices which are not compatible with the impartial administration of Justice."[৮০]

সভাপতি তাঁর ভাষণে জাতির আবশ্যিক কর্তব্যের উপর জোর দিয়ে বলেন,

"Our task is certainly unpleasant but, it is duty, and we feel bound to discharge it by shrinking from it we should shew our want of self respect, humiliate ourselves as a nation and ignore the real interest of the country.'[৮১]

৮০ History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full report of Neel Darpan Case, L. C. Mitra, pp. 105-106

৮১ Ibid

বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয় ঐক্যচেতনার প্রশংসা করে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছিল,

"লঙ্‌ সাহেবের বিচারকালে স্যার মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ যাবতীয় বাঙ্গালীকে গালি দিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশী সমুদয় প্রধানলোক একত্র হইয়া শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্তদেবের বাটীতে এক সভা করিয়া স্যার মর্ডাণ্ট ওয়েলসের দুঃস্বভাবের বিষয় ষ্টেট্ সেক্রেটারীর গোচর করিলেন। প্রায় ২০০০ লোক ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই আবেদনপত্র গোপনে মুদ্রিত হইয়া স্বাক্ষরার্থে প্রায় একমাস চতুর্দিকে প্রেরিত হয়, 'ইংলিশ ম্যান' ও 'হরকরা' সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। এরূপ একতা হইয়াছিল যে তথাপি কেহ একখণ্ড দেন নাই। স্যার চার্লস উড্ আবেদনের উত্তর দান কালে মর্ডাণ্ট ওয়েলস্‌কে সাবধান করিয়া দিলেন।"[৮২]

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সংবাদ থেকে সেকালের বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার প্রকৃত রূপটি উপলব্ধি করা যায়। ন্যায় ও নীতির সমর্থনে বাঙ্গালীর জাতীয় ঐক্যবোধ, যা পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করেছিল; তার সূচনা দেখি এই সময়ে। বিশেষভাবে 'নীলবিদ্রোহ' ও 'নীলদর্পণ' নাটকের মামলা ভারতবাসীর রাজনৈতিক জাগরণের প্রত্যুষকাল। উত্তরকালে, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ 'এক ভারত' গড়বার যে আন্দোলন সমস্ত ভারতবাসীর চিত্তে জাগিয়ে তুলেছিলেন, বাঙ্গালীর এই গণ-জাগরণই তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

কিন্তু পাদ্রী লঙের মানবহিতবাদী কার্যকলাপ যতই এদেশে জনসমর্থন লাভ করুক না কেন, তাঁর ও অন্যান্য ইংরেজদের বক্তব্যের মধ্যে বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা কেউই ভারতপ্রেমিক ছিলেন না। তাঁদের কাজের উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। পাদ্রী লঙ্‌ ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষেরা চেয়েছিলেন ভারতে ইংরেজ রাজত্ব চিরস্থায়ী হোক্—তবে তা মানবিক বেদীতে। নিষ্ঠুর শোষণ ও নিরঙ্কুশ অত্যাচার কোন জাতিকে চির পদানত করে রাখতে পারে না। ক্রমাগত আঘাত মনের মাটিকে শক্ত করে দেয় এবং পরে তার উপর আরও আঘাত করলে প্রতিবাদের

৮২ সোমপ্রকাশ: ১৪ই এপ্রিল, ১৮৬২।

অগ্নিকণা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে; এবং বিদ্রোহ ও স্বাধিকার অর্জনের মনোবাসনা আন্দোলনের রূপ নিয়ে রক্তকেতন উড়িয়ে চতুর্দিকে দেখা দিতে থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন গণ-জাগরণ থেকে তাঁরা এই শিক্ষা লাভ করেন। বাঙ্গালীর ক্রমবর্ধমান জাতীয়চেতনার উন্মেষ, ঐক্যবোধ ও আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম এই শ্বেতাঙ্গ শ্রেণীকে বিশেষভাবে চিন্তিত করে। বাঙ্গালীকে রাজনৈতিক ও শাসনকার্যে যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে নিয়োগ করে এদেশে ইংরেজ শাসনকে বিপদমুক্ত করাই ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষকে ইংরেজদের করতলে রাখতে হলে এদেশের অধিবাসীদের মন ও চিন্তার গতিবিধি সম্পর্কে সরকারকে একান্তভাবে অবহিত হতে হবে। শাসিতের মনন-চিন্তন, অভাব-অভিযোগ এবং প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীনতা ও অনবহিতা ইংরেজ শাসকের শাসন ব্যবস্থায় ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হয়েছে। তাঁদের রাজনৈতিক অনুভাবনার মূল তথ্যটি প্রকাশ পেয়েছে 'নীল কমিশন'-এর সভাপতি মিঃ. ডবলিউ. এস. সিটন্‌কারের বক্তব্যে। 'নীলদর্পণ' নাটকের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন,

"About the month of October and November last the Rev. Mr. Long brought my notice the existance of this drama in the original Bengali. I felt quite satisfied that the drama was the genuine production of a native resident in the Moffusil. Remembering how little is known to the authorities and to Europeans generally of the under currents of the native society, how constantly men of the greatest Indian experience, the widest benevolence, and the largest sympathy, had lamented their utter inability to penetrate the recess of native thought and feeling; how repeatedly Government itself had been blamed, during and before the mutiny for paying no heed to cheap publications emanating from the native press and indicative of popular feeling. I thought the work was one to which attention ought to be called. And to this opinion, I must still adhere, how-

ever, erroneous the mode of calling attention to the drama may have been."[৮৩]

পাদ্রী লং, 'ইংরেজি নীলদর্পণ' নাটকের ভূমিকায় নীলকরদের অত্যাচার ও নীল চাষীদের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন,

"...If the Bengal Ryot is to be treated as a serf or a mere squatter a day labourer, the missionary, the school master, even the developer of the resources of India, will find their work like that of Sisyphus—vain and useless. Statistics have proved that in France, Switzerland, Holland, Belgium, Swedeen Denmark, Saxony, the education of the peasant along with the security of tenure, he enjoys on his small firms, has encouraged industrious, temperate, virtuous and cleanly habits fostered a respect for property, increased social comforts, cherished a spirit of healthy and active independence improved the cultivation of the land, lessened pauparism and has rendered the people, averse to revolution and friends of order. Even Russia is carrying out a good scheme of serf emancipation in this spirit. It is the earnest wish of the writer of these lives that harmoney may be speedily established between the plantor and ryot, that mutual interests may bind the two classes, together, and that the European may be in the mofussil the protecting Ægis of the peasant who may be able, "to set each man under his mango and tamarind tree, none daring to make him afraid."

পাদ্রী লঙ্‌, পরিষ্কারভাবে চেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশের স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত হোক। তবে, পূর্বেকার চণ্ড শোষণনীতি পরিহার করে এদেশে সহনশীল শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য,

৮৩ History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full report of Neel Darpan case. ; L. C. Mitra, p. 86

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিদারুণ উপেক্ষা এবং ক্রমাগত উৎপীড়ন ভারতীয়দের মনে-প্রাণে বিদ্রোহী করে তুলেছে। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতবাসী বিশ্বমুখী হয়ে ক্রমশঃ আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। আর সেজন্মেই দাবী জানাচ্ছে স্বাধিকার ও স্বায়ত্ত শাসনের। তিনি 'নীলকমিশনে'র সামনে ও 'নীলদর্পণ' নাটক মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় নানাভাবে একই কথা বারবার বলেছিলেন। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, ভারতবাসীর চিন্তা ও বক্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান ও ইংরেজ রাজকর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে ভারতবাসীর শাসন কার্যে নিয়োগ, এদেশে ইংরেজদের স্থায়িত্বকে বহুলাংশে নিরাপদ করবে। সঙ্গীণ উঁচিয়ে ও ভয় দেখিয়ে ভারতবাসীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না।

বাঙ্গালীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ, দূরদর্শী ইংরেজদের কতখানি চিন্তিত করেছিল তা লঙের উক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতবাসীর স্বাদেশিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাষণগুলির গুরুত্ব অত্যন্ত মূল্যবান। আমরা তাঁর বিভিন্ন ভাষণের অংশবিশেষ আলোচনার স্বার্থে গ্রহণ করব।

(১) ···I myself believe throughly in the truth of Lord W. Bentinck's maxima, "India must be managed at present by Native agency, under European Superintendence." But in order to maintain the European superiority and on the principle 'fasest ab hosts doceri' I believe it would be most useful for Europeans of all classes to see themselves now and then in the mirror of the Native Press. Lord W. Bentinck thought so when he allowed its criticisms on him self and his administration, 'considering it was an index and safety valve for the public mind.' So did the Marquis of Hastings when 1818, he patronised the 'Serampur Darpan' by allowing it to circulate for one fourth the ordinary postage. That paper was under Missionary management and often contained extracts from Native papers freely criticising Europeans and Government.· ·The late Rev. W. Morton, a Missionary, frequently made translations from the

Native newspapers, giving extracts hostile to Missionaries and others. I was requested three years ago by the Missionary conference of Calcutta, to compile a tract giving the opinions of the Native Press for and against Christianity, in order that Missionaries might know the real state of the Native mind.

That this regard to native opinion is not inconsistent with a zealous support of British interests, may be proved by a reference to the Hon, F. Shores' most valuable "Notes on Indian affairs." No one more boldly advocated the settlement of Europeans in India thirty years ago than he did and no one more ably pleaded for their services being used by the State as Justices of the Peace, yet few men ever dwell more faithfully on the effects produced on the Native mind by the misconduct of his countrymen. ··

Well, would it have been for India had the mutterings of the Native Press been earlier attended to before the Mutiny. They were neglected and men slept quietly over the brink of a volcano. Had translations been made from the Native Press of the Agra Presidency indicating the state of feeling towards Government a year before the Mutiny and had these been communicated to official and influencial persons it is possible that Europeans might not have been taken so unawares with all their arsenals in 'Sepoy' hands."[৮৪]

(২) "I will now state the grounds why as a clergyman opposed to war, I published the Nil Darpan. My Lord, four years only have elapsed since Calcutta was waiting in

৮৪ Friend of India : June 27, 1861.

trembling anxiety for the result of the mutiny. Few could look with calmness on the future, while watch and ward were kept all might by the citizens. Many felt then, as I had felt long before, how unsafe it was for the English to reside in India in ignorance of an indifference to the current of the native feeling. The mutiny in common with the Afghan war has shown that the English in India were generally unacquainted with it ; so a short time previous to the mutiny, the Santhal war burst out unexpectedly to the public. For a long period Thugge and Torlure prevailed in India without the English knowing anything of them. Had I, as a missionary, previous to the mutiny, been able to submit to men of influence a native drama which would have thrown light on the views of the Sepoys and Native chiefs, how valuable might the circulation of such a drama have proved, all though it might have ensured severely the treatment of Natives by Europeans ; the indifference of Sepoy officers generally towards their men ; and the policy of Government to Native States. · My Lord, the mutiny has passed away : who knows what is in the future. As a clergyman and a friend of the peaceable residence of my countrymen in India, I beg to state the following as a motive for my editing such a work as the Nil Darpan. I, for years, have not been able to shut my eyes to what many able men see looming in the distance. It may be distant or it may be near ; but Russia and Russian influence are rapidly approaching the frontiers of India. Her influence so manifest in Cabul 20 years ago, as shown in a recent Parliamentary Blue Book, was beginning to be felt in India during the last mutiny.

…I now speak merely my own honest convictions on this point and I ask if this conviction has any foundation in reality, as also if there be any ground for another as deeply rooted in my mind that mere armies can no more secure the English in India than they established the Austrians in Italy. Was it not my duty as a clergyman to help the good cause of peace, by showing that the great work of peace in India could be best secured by the contentment of the Native population, obtainable by listening to their complaints as made known by the Native Press and by other channels. I wish, to see the attention of my countrymen directed to this important subject." (Address of the Rev. J. Long to the Court – Before the Sentence was passed.)

পাদ্রী লঙের বক্তব্যের সর্বাঙ্গে আতঙ্কের ছাপ গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। তিনি অনাগত কালের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন বলে সময়মত শাসকবর্গকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করে বলেন,

"…a volcano may be forming beneath their feet, and dark clouds may be gathering on the horizon of India. Is the watchman then who gives warning to be counted an enemy? If a clergyman knows of a state of Native feeling that may end in blood shed, is he to give no information of it? It is admitted that in the Indigo districts there was and is a state of feeling of this short. How it to be brought to the notice of officials and men of influence to put them on their guard? Surely the Native Press well indicates what is going on beneath the surface, and is one of the safest guides to genuine Native opinion, I solemnly declare that I know nothing more important for the future security of Europeans in India and the welfare of the country, than that all classes of Europeans

should watch the barometer of the native mind. I feel strongly that peace founded on the contentment of the Native population is essential to the welfare of India, and that is folly to shut our eyes to the warnings of the Native Press may give."[৮৫]

পাদ্রী লঙের অনুমান সত্য হয়েছিল। তাঁর পুনঃপুনঃ সাবধানবাণী ও সকাতর অনুরোধ ইংরেজ শাসক শোনেনি। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও জনমতের মর্যাদাদানের যে কথা বহুভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, তার কোন গুরুত্বই দেয়নি সে সময়কার শ্বেতাঙ্গ সরকার। 'প্রেস আইন' (১৮৭৮) বিধিবদ্ধ করে দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। এই সময়ে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক চিন্তার অন্যতম বাহন নাটক, যাত্রা ও লোকাভিনয় প্রভৃতির উপর ফিরিঙ্গী শাসকদের উদ্যত খড়্গ নেমে আসে। অবশ্য এ ইতিহাস পরবর্তীকালের। জীবনবিকাশ ও মননচিন্তার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় বাঙ্গালীর স্বাদেশিক জাগরণ কালবৈশাখীর ভৈরব নৃত্যে মেতে উঠেছিল। এবং এই আন্দোলনের প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ।

সমকালে, নাটকই প্রধানতঃ জনচিত্তের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করেছিল। নাটক প্রধানতঃ 'দৃশ্যকাব্য' হওয়ার জন্য স্বাদেশিকতার বিভিন্ন মতবাদ ক্ষিপ্র গতিবেগে দেশবাসীর মনে অনুবিদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর জাতীয় হিতকামী চিন্তা 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যে যেমন সহানুভূতির তুলিতে তুলে ধরেছিলেন, তেমনি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ক্রমাগত সাফল্যে নাটকের তাৎপর্য হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে' (১৮৭২) 'নীলদর্পণে'র জাতীয়তাবাদী ভূমিকার কথা বিপিনচন্দ্র পাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বলেছেন,

"ইংরাজ-বিদ্বেষ সে যুগের দেশ-ধর্মের বা পেট্রিয়টিজ্‌মের মূল প্রেরণা ছিল। বাংলার নূতন নাট্যকলায় এবং রঙ্গমঞ্চে এই বিদ্বেষ ভাবটা খুব ফুটিয়া উঠে। ইহা প্রথম প্রকাশ পায় দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'।

...'নীলদর্পণ'ই সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ কুঠিয়ালদের অত্যাচার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ রাজপুরুষদের পক্ষপাতিত্বের ছবি ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু

৮৫ Friend of India, June 27, 1861.

নীলকরের অত্যাচারে দেশে যে তুমুল আন্দোলন জাগিয়াছিল, তাহা একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা। ...সাধারণভাবে ইংরাজ-রাজের বা ইংরাজ-রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে 'নীলদর্পণে' স্পষ্টভাবে কোনও কথা বলা হয় নাই। তবে নীলকরদিগের অত্যাচারের ছবিতে কেবল নীলকরদের বিরুদ্ধেই যে লোকের মনে একটা বিদ্বেষ জাগাইয়াছিল, তাহা নহে; সাধারণভাবে সকল বিদেশীয়ের এবং বিদেশী প্রভুশক্তির প্রতিকূলেও একটা বিরূপ ভাব জাগাইয়াছিল।"৮৬

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ছিল বাঙ্গালীর স্বাদেশিকচেতনার স্বর্ণযুগ। একদিকে 'হিন্দুমেলা'র সংগঠন ও সমন্বয়ধর্মী জাতীয়চেতনা, হেমচন্দ্রের 'ভারত সংগীত', সত্যেন্দ্রনাথের 'গাও ভারতের জয়', গোবিন্দচন্দ্রের 'কতকাল পরে ভারতরে' কিংবা 'নির্মল সলিলে' প্রভৃতি দেশাত্মবোধক কবিতা ও সংগীত এবং অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথের 'ভারতসভা' ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সমিতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যাবলী সমস্ত কিছু একত্রযোগে বাঙ্গালীচিত্তে রৌদ্ররসের সঞ্চার করে। পরাধীনতার তীব্র আত্মগ্লানি বাঙ্গালী নিদাঘের দাবদাহের মত অনুভব করে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে বাঙ্গালীর সঙ্গে ইংরেজের প্রকাশ্য সংঘাত শুরু হয়ে যায়। ফলে 'নীলদর্পণ' নাটক বাঙ্গালীর কাছে 'militant nationalism'-এর উপহার হিসাবে গৃহীত হয়। যুগের পট পরিবর্তনের জন্যই এই ঘটনা ঘটে। 'নীলদর্পণে'র তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কের দৃশ্য দেশবাসীকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করত; আর অপরদিকে এই দৃশ্য ছিল ইংরেজদের কাছে একেবারে অসহনীয়। নটী বিনোদিনীর, 'আমার অভিনেত্রী জীবন' আত্মলিপিতে এই দুই মানসিকতার বাণীচিত্র আছে। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ভারতবাসীর সকলস্তরে জাতীয়তার অগ্নিবাণী ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে 'নীলদর্পণ' নাটক নিয়ে পশ্চিমভারতে নাট্য পর্যটনে বেরিয়ে ছিল। লক্ষ্ণৌতে থিয়েটার প্রদর্শনের সময়ে শাসক শাসিতের মধ্যে চিরন্তন বিদ্বেষ ভাবটি উগ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।*

৮৬ নবযুগের বাংলা: বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ. ২৫৪—২৫৭।

* "পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নেমন্তন্ন করে আসা হল। যত সব বড় বড় সাহেব মেম ও ওখানকার যত সব বড়লোক, সবাই সে-দিন থিয়েটার দেখতে আসবেন। তাই স্থির করা হ'ল, 'নীলদর্পণ' অভিনয় করতে হবে। তখন এই নাটকখানির অভিনয় সবচেয়ে সুন্দর হত, সবচেয়ে জমত। সে নাটকখানি অভিনয় করবার সময় সকলের কি আগ্রহ, কি উত্তেজনা!...

'নীলদর্পণ' নাটক প্রথম সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল ঢাকায়।* কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণে'র অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হলে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ এই জাতীয়তাবাদী নাটককে অভিনন্দন জানায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা 'নীলদর্পণ' নাট্যাভিনয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করে। তবে অমৃতবাজার পত্রিকার উষ্ণ অভিনন্দন উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে।

"নীলদর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজবদ্ধ হইয়া এই অভিনয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। আর এরূপ অভিনয়সমাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটি মহৎ ফল ফলিবে।...

নীলদর্পণ নাটক দেশপ্রসিদ্ধ।...শ্বেতাঙ্গগণের পক্ষপাতিত্ব ও অত্যাচার অনেকেই মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন, কিন্তু তথাপি সেই সকল কার্য্য রঙ্গভূমিতে অভিনীত দেখিলে একরূপ অপরূপ মনোভাব মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে থাকে।...নূতন ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ফলাফল বিচার অনেকেই করিয়া মনে মনে ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু রঙ্গস্থলে যখন নবীনমাধব বলিলেন যে, 'আবার যে নূতন আইন চলিবে শুনিতেছি, তাহা হইলেই সর্বনাশ' বাক্য কয়েকটি উচ্চারিত হইবামাত্রেই দর্শকমণ্ডলী মধ্যে যে কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না।...নীলদর্পণ একবার

সেদিন বাড়ী একেবারে লোকে ভরে গিয়েছিল। বড় বড় সাহেব মেম অনেক এসেছিলেন, তাঁদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী, সামনে তাকালেই খালি লালমুখ। মুসলমান অনেক ছিলেন, তবে বাঙ্গালী খুব কম।...ক্রমে সেই দৃশ্যটা এল, রোগসাহেব ক্ষেত্রমণিকে ধরে পীড়ন করছে, আর ক্ষেত্রমণি নিজের ধর্মরক্ষার জন্যে কাতর প্রাণে চীৎকার করে বলছে, 'ও সাহেব, তুমি আমার বাবা, মুই তোর মেয়ে, ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে'। তারপর তোরাব এসে রোগ সাহেবের গলা টিপে ধরে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে কিল মারতে আরম্ভ হয়েছে, অমনই সাহেব-দর্শকদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। সব সাহেবেরা উঠে দাঁড়াল, পেছন থেকে সব লোক ছুটে এসে ফুটলাইটের কাছে জমা হতে লাগল সে একটা কি কাণ্ড! কতকগুলো লালমুখো গোরা তরওয়াল না খুলে ষ্টেজের ওপর লাফিয়ে পড়তে এল। আর পাঁচজনে তাদের ধরে রাখতে পারে না। সে কি হুড়োহুড়ি, কি ছুটোছুটি! ড্রপ তো তখনই ফেলে দেওয়া হল,...ম্যাজিষ্ট্রেট তখনই কেল্লায় লোক পাঠিয়ে একদল সৈন্য নিয়ে এলেন...ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ব'লে দিলেন, 'এখানে আর অভিনয় করে কাজ নেই,... সাহেবেরা ভারি উত্তেজিত হয়েছে, এখানে আপনাদের থেকেই কাজ নেই।"

—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ১৬৩—১৬৭।

* "Our native friends entertain themselves with occasional theatrical performances and the 'Nil Darpan' was acted on one of these occasions.".

Harkura : Dacca Correspondence, June 12 1861

কৃষ্ণনগরে, যশোহর বা বহরমপুরে অভিনীত হইলে ভাল হয়। আমরা ঐ সকল জেলার ধনবান্ জমিদারগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই অভিনেতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া একবার অভিনয় করাউন। আমরা চরিতার্থ হইব। নীলকর নিষ্পীড়ন আর নাই মনে করিয়া উপেক্ষা করিবেন না। মফঃস্বলে কি হইতেছে তাহা আর কি বলিব।...এটি একটি সামান্য কথা নহে। দেশের একটি প্রকৃতির স্ফূর্তি পাইতে চলিল। এমন সকল কার্য্যের আমরা নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। অভিনয়সমাজ চিরস্থায়ী হউক এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকুক।"[৮৭]

নবগোপাল মিত্র তাঁর ন্যাশনাল পেপারে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের প্রশংসা করেন। তিনি এই নাটকাভিনয়কে 'The event is of national importance' বলে অভিহিত করেছিলেন।[৮৮] কিন্তু ইংরেজ বণিকেরা বাঙ্গালীর এই উদ্দীপনাকে প্রীতির চোখে দেখেননি। 'নীলদর্পণ' নাটকের ক্রমাগত অভিনয়সাফল্য তাঁদের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠে। ফিরিঙ্গীদের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান' সম্পাদকীয় স্তম্ভে উল্লেখ করে যে, এই নাটকাভিনয় ইংরেজ শাসকবর্গের কাছে অত্যন্ত মানহানিকর, অতএব নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন।[৮৯] কিন্তু ইংরেজদের রাজরোষকে উপেক্ষা করে 'নীলদর্পণে'র অভিনয়খ্যাতি ক্রমাগত বেড়েই চলে।

উত্তরকালে বাঙ্গালী নাট্যকারদের উপর দীনবন্ধুর প্রভাব ছিল অসামান্য। তিনি যুগস্রষ্টা না হলেও যুগচিন্তাকে নাটকে যে ভাবে চিত্র ও চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে ধরে রেখেছিলেন, তাই পরবর্তীকালে নাটক রচনার উপকরণ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম বাঙ্গলা নাটকে সঙ্ঘবদ্ধ স্বাদেশিকতার জনক (Father of Constructive Nationalism)। জাতির অভাব-অভিযোগ তুলে ধরে শাসকবর্গকে সচেতন করা ও প্রতিকারের উপায় প্রার্থনা করা তাঁর নাট্যচিন্তার একমাত্র বিষয় ছিল না; দেশবাসী যাতে আত্মসচেতন হয়ে ঐক্যচেতনায় স্বনির্ভর হতে পারে তার প্রয়াসই তিনি নাটক রচনাতে করেছিলেন। দীনবন্ধু প্রথম জাতীয়তাবাদের স্বর্ণ দেউলের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ দাস ও

৮৭ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ. ৮৮-৮৯

৮৮ ঐ পৃ. ৮৯

৮৯ ঐ পৃ. ৯৩

আরও পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যাঁরা সর্ববিষয়ে জাতির প্রয়োজনটিকে তুলে ধরে প্রেম, ত্যাগ ও কর্মে স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্র প্রচার করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জাতীয় সাধনার সমিধ্ সংগ্রহ করেন 'রঙ্গালয় স্রষ্টা' দীনবন্ধু মিত্রের কাছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অনুকরণে উপেন্দ্রনাথ দাস 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক রচনা করেন। তবে দুই নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে মূলগত পার্থক্য আছে। দীনবন্ধুর নাট্যরচনার মননে কোন বৈরিতা ছিল না। নীলকরদের অত্যাচারে পর্যুদস্ত বাঙ্গালী কৃষকদের রক্তাক্ত জীবনকাহিনী, তাদের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের বিভিন্ন ঘটনাকে নাট্যরূপ দিয়ে প্রতিবিধানের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তদানীন্তন ইংরেজ শাসকবর্গের কাছে। কিন্তু, পরবর্তীকালে বাঙ্গলাদেশে নীলকরদের অত্যাচার বহুলাংশে স্তিমিত হলেও শাসকদের শোষণ ও নিপীড়ন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, এবং বাঙ্গালী প্রতিরোধ ও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে। এই পটভূমিকায় 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যে শাসকবর্গের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত-দৃশ্যগুলি বাঙ্গালীকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। এবং এরই ফলে 'নীলদর্পণ' নাটকের অর্থান্তর ঘটে। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' এই চিন্তারই স্পষ্টরূপ। উপেন্দ্রনাথ দাস 'নীলদর্পণ' নাটকের কাঠামোকে গ্রহণ করেছিলেন, কেবলমাত্র আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনার্থে। কারণ, যুগের চিন্তাস্রোত অতীত ভূখণ্ড পরিত্যাগ করে তখন নতুন চত্বরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের সময়ে 'নীলদর্পণে'র দুর্নিবার প্রভাব ইংরেজদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়েছিল। ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সরকার 'নীলদর্পণ' নাট্যাভিনয় 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' (১৮৭৬) বিধিবলে বন্ধ করে দেন। আধুনিককাল পর্যন্ত এই নাটকের আবেদন বাঙ্গালীর কাছে সমানভাবে বর্তমান। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বাদেশিকতার বিশাল চিন্তাভূমিতে 'নীলদর্পণ' নাটক অক্ষয়বটের মহিমা নিয়ে স্বগৌরবে বিরাজ করছে।

দ্বিতীয় ভাগ

বয়ঃসন্ধি পর্ব (১৮৬১—১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ)

চার

প্রাক্ কথন

'নীলদর্পণ' নাটকেই বাঙ্গালীর আত্মজাগরণ, প্রতিরোধ স্পৃহা এবং ইংরেজ বিদ্বেষ প্রথম শোনা গিয়েছিল। অবশ্য সমকালে বিভিন্ন লোকাভিনয়েও ইংরেজ বিরূপতা দেখা দিতে শুরু করে। পাদ্রী লঙ্, 'নীলকমিশনে'র কাছে সাক্ষ্যদানের সময় বলেছিলেন,

"নেটিভ জনমত নির্ণয়ের আর এক সূত্র ওদের সভাসমিতি। হিন্দুরা অভিনয় অর্থাৎ যাত্রা খুব ভালবাসে। যাত্রায় সঙের রসিকতা খুব। এসব যাত্রায় কুলীনদের বহু বিবাহকে নিন্দা করা হয়। ইউরোপীয়দের শোষণও ওদের এড়ায় না। প্রায় দু'বছর আগে আমার এক বন্ধু এক যাত্রায় উপস্থিত হয়ে শুনেছিলেন, ইউরোপীয়দের বিদ্রূপ করা হচ্ছে, ইউরোপীয়দের ছোটলোকিভাষা 'কার্সড্, নিগার' আর 'ষ্টুপিড্, এ্যাস্' পর্যন্ত উচ্চারিত হয়েছিল।"[১] (অনুবাদিত)

'এদেশ আমার, স্বজাতির কল্যাণেই স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ'; বয়ঃসন্ধি পর্বে বাঙ্গালীর এই আত্মসমীক্ষার মূলে আছে প্রধানতঃ বাঙ্গলার নাটক ও নাট্যশালার প্রভাব।

ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বাঙ্গালীর মোহভঙ্গের ইতিহাসই স্বাদেশিকতার বয়ঃসন্ধি পর্বের প্রকৃত কাহিনী। এই সময়ে বাঙ্গালী, বিদেশী শাসকদের স্বার্থপুষ্ট, অর্থগৃধ্নু রূপটি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করে। শাসকদের ক্রমাগত পীড়ন ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গ বাঙ্গালীকে স্বাধিকারবোধে প্রত্যয়নিষ্ঠ করে তোলে। বৈতসীবৃত্তি গ্রহণ না করে কিভাবে সমস্ত স্বদেশবাসীকে সুদৃঢ়, প্রতিরোধে শক্তিশালী এবং সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করা যায়, শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এই মর্মে সর্ববিধ প্রয়াস চালিয়েছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের দাবি এ'সময়ে সক্রিয় না হলেও রাষ্ট্রিক অধিকারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য বিভিন্ন আন্দোলন, নিয়মনীতি নির্মাণ ও সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে বাঙ্গলাদেশের

Indigo Commissions Report : Rev. Long's Statement, June 12, 1860.

বহু অংশে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাঙ্গালী রাষ্ট্রচিন্তার যৌবনদীপ্ত রক্তরাগের যে আল্পনা এঁকেছিল, তার প্রস্তুতি ঘটে এই পর্বে। যৌবনে শারীরিক শক্তির যে খরদীপ্তি প্রকাশ পায়, কৈশোরে হয় তার আয়োজন; এবং বয়ঃসন্ধি পর্বে ঘটে পূর্ণ প্রস্তুতি। বয়ঃসন্ধি পর্বের সার্থকতাও এখানে। রাষ্ট্রনৈতিক বিচিন্তাতে বাঙ্গালী পরবর্তীকালের রাষ্ট্রিক স্বাধিকার অর্জনের সমস্ত আয়োজন এই সময়ে শেষ করে অখণ্ড সংগঠন চেতনায় দৃপ্ত হয়েছিল। ইংলণ্ডীয় দ্বৈপায়ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙ্গালীর আহৃত বিশ্বমুখীনতা এই অধ্যায়ে জাতীয়তাবোধের স্বার্থে অনুশীলিত হয়েছিল অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। বাঙ্গলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে বঙ্গবাসীর রাষ্ট্রনৈতিকচেতনা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রসারিত হয়েছিল। এ কথা গর্বের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, ভারতবাসীকে হাতে কলমে রাষ্ট্রনীতিতে দীক্ষা বাঙ্গালীই দিয়েছিল সর্বপ্রথম। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের, 'এক ধর্ম, এক সমাজ, এক সত্যনীতি' প্রচার, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কোমতীয়' বিচারাদর্শে হিন্দুশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং মৃন্ময়ী দেশমাতৃকার চিন্ময়ী রূপবন্দনা, রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা ব্যাখ্যা', রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'যত মত তত পথ' মতবাদ, স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বেদান্ত শাস্ত্রের সরল এবং হৃদয়-গ্রাহ্য ব্যাখ্যা ও বিশ্বময় প্রচার, যেমন নানাদিক থেকে বাঙ্গালীকে দেশধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আস্থা ও গৌরবজনক স্বাভিমানে জাগিয়ে তুলেছিল, তেমনি রাজনৈতিক নেতারা শাসনকার্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারবাসনার দাবিটি উচ্চগ্রামে তুলে দেশবাসীকে অধিক পরিমাণে ঐক্যচেতনায় সক্রিয় হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন বিভিন্ন কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমে। স্বাদেশিক সংগঠনচিন্তা ও পরিকল্পনা এই সময়ে বাঙ্গালীর ধর্ম, সমাজ এবং রাষ্ট্রচিন্তায় একই সঙ্গে ত্রি-ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। নবগোপাল মিত্র, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁদের উপযুক্ত সহযোগীরা দেশবাসীর মুক্তিকামনার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে এক ঐক্যবোধ গড়ে তুলেছিলেন। দেশবাসীর চিন্তা ও কর্মভাবনাকে সুশৃঙ্খলিত করবার উদ্দেশ্যে প্রচার করেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী, মুক্তিনেতাদের নিরলস সংগ্রাম ইতিহাস ও তৎকালীন দেশবাসীর সক্রিয় সহযোগিতার রোমাঞ্চকর বিবরণ। এই মর্মে সুরেন্দ্রনাথ ইতালীর ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডীর প্রজ্জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ও উচ্চ জীবন

চিন্তাকে ভারতবাসীর মধ্যে প্রচার করেন। এর ফলে সমস্ত জাতির জীবনচেতনা অখণ্ড ঐক্যবোধে ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠে।

বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার উত্তাল তরঙ্গ বাঙ্গলা নাটক ও নাট্যশালার বুকে আঘাত হানে অত্যন্ত তীব্র ভাবে। বাঙ্গালী নাট্যকারেরা অনুকূল আবহাওয়ায় জাতীয় গরিমাসমৃদ্ধ নাটক রচনা করে দেশবাসীর স্বাধিকার বাসনাকে আরও ক্ষিপ্র করে তুললেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের গৌরব কাহিনী সমকালীন বাঙ্গালী কবি ও নাট্যকারদের গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। নাট্যকারেরা ভারতের পুরাণ ও ইতিহাসের ঐতিহ্যময় ভাণ্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর চোখের সামনে তুলে ধরলেন অতীতের শৌর্য-কাহিনী এবং আত্মত্যাগের অক্ষয় গৌরব। পরাধীন জাতির মানসিক সংবিত্তি কখনও সুস্থ থাকে না, নাট্যকারেরা এই মহাসত্যটি আন্তরিকতার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই জাতির পরাধীনতার দিনে, তাঁরা স্মরণ করেছেন অতীত ভারতের মহান আদর্শকে, স্বাদেশিক বীরদের আত্মত্যাগের কাহিনীকে, এবং প্রচার করেছেন আত্মগরিমার স্পর্ধা ও পরাধীনতার জীবনযন্ত্রণাকে। নাট্যকারেরা স্থির উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতের ইতিহাসের মধ্যে এমন অনেক কথা-কাহিনী আছে, যা কালান্তরের ব্যাপ্তিতেও রূপান্তরিত অথবা প্রত্যাখ্যাত হয় না। সেখানকার আদর্শ বিচিন্তায় এমন কিছু ধ্রুবত্ব আছে যা বিশ্বজনীন ও সমকালের যুগ-ভাবনার পটভূমিতে সমানভাবে ক্রিয়াশ্রয়ী। জাতি সংগঠনের দিনে পুনঃপ্রয়োজন হয় এইসব কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণের। তাই জাতীয়তাবোধের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য নাট্যকারেরা জাতীয় বীরের অনুসন্ধান করেছিলেন ভারতবর্ষের পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্যে। যাঁদের দেশবাসীর চিত্ত-সিংহাসনে স্থাপন করা হয়েছিল, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন স্বাদেশিকতার বিমূর্ত বিগ্রহ। দেশবাসীকে দেশপ্রেমে অভিষিক্ত করবার সচেতন প্রয়াস নিয়েই নাট্যকারেরা ইতিহাসের ধূলি-ধূসর পাণ্ডুলিপি ঘেঁটেছিলেন। দেশকে নাট্যকারেরা মনে প্রাণে ভালবেসেছিলেন বলেই তাঁদের কবি-কল্পনা অনেকাংশে ঐতিহাসিক তথ্য-সত্যকে অস্বীকার করেছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে রাষ্ট্রচিন্তার মূলকথা ছিল—উচ্চ-নীচ বৈষম্য দূরীকরণ, বিভিন্ন ধর্মমতে শ্রদ্ধা, আর্থিক বৈষম্য হ্রাস ও কর্মযোগের সম্প্রসারণের মাধ্যমে আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং জীবনগঠন। নাট্যকারেরা মনেপ্রাণে স্বাদেশিক ছিলেন

বলেই নাটক রচনার সময়ে এই আদর্শকে তাঁরা সামনে রেখেছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেছিলেন। কেবলমাত্র নাটক রচনা করেই নয়, তাঁরা 'সাধারণ নাট্যশালা' (১৮৭২) স্থাপন করে স্বাদেশিকতার আদর্শকে জাতির মনোভূমিতে সুদৃঢ় করতে প্রয়াসী হন। এবং এই কারণেই বিভিন্ন বঙ্গীয় নাট্যশালায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকগুলির অভিনয় ভারতের হিন্দু, মুসলমান এবং অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা একসঙ্গে পাশাপাশি বসে দেখতেন ও স্বদেশপ্রেমের চিন্তাদর্শে অভিষিক্ত হতেন। বাঙ্গলার নাট্যকারেরা পরাধীনতার মর্মজ্বালা অত্যন্ত সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছিলেন বলেই রাজনৈতিক নেতারা সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলন অচিরে গড়ে তুলতে সফলকাম হয়েছিলেন। এছাড়াও জাতীয় হিতবাদী নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে শহর ও পল্লীর সাংস্কৃতিক ঐক্য ও মানসিক সংযোগ হয়েছিল অত্যন্ত গভীরভাবে। নাট্যকারেরা প্রকাশ্য বক্তৃতা দিয়ে নয়, নাটক ও নাট্যশালার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের বৃহৎ কর্মটি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে সম্পন্ন করে গেছেন। এর ফলে কেবল জাতির 'নেশন' তত্ত্বই গড়ে উঠেনি, নাটক ও নাট্যশালাও বাঙ্গালীর চিন্তাদর্শে হয়ে উঠেছিল প্রকৃত 'ন্যাশনাল'। দুই রাজনৈতিক নেতা, আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রীয়কর্মে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তার পশ্চাতে ছিল বাঙ্গলা নাটক ও নাট্যশালার বৃহত্তর অবদান। এই মহাসত্যটি স্বাদেশিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পালের ইংরেজি আত্মজীবনীতে স্বীকৃতি পেয়েছে।

"..the Bengalee stage helped very materially to prepare the ground for Surendra Nath's political propaganda. In the early years of the seventies of the last century before Surendra Nath and Ananda Mohan had organised their new platform, it was the Bengalee stage which had found expression to the new spirit of patriotism among our rising generation of educated intellectuals.···When Surendra Nath and Ananda Mohan returned from England in 1875-76, their political propaganda found the ground ready, owing to the new renaissance in Bengalee literature, the Bengalee stage and the birth of the new hymnology of our patriotism.···they

contributed as much as the "Bangadarshan" and the new Bengalee stage to the birth and early development of our new nationalism."[২]

নাট্যকারেরা জাতির জীবনভূমিকে কর্ষণ করে স্বাদেশিকতার উপযোগী করে তুলেছিলেন বলেই সহজ হয়েছিল রাজনৈতিক নেতাদের কর্মসাফল্য। বাঙ্গলা নাটক ও নাট্যশালা সাংস্কৃতিক ঐক্য সৃষ্টিতে একক গৌরবের অধিকারী। এখন আমাদের দেশবাসীর স্বাদেশিক ভাবনা কিভাবে প্রতিরোধ, প্রতিবাদ ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে আপন লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল, তার সম্যক পরিচয়টুকু গ্রহণ করতে হবে।

২ Memories of My Life and Times in the days of My Youth (1857—1884) : Bipin Chandra Pal : pp. 251—258.

পাঁচ

বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার বিস্তার

সূচনা

১

'সিপাহী বিদ্রোহ' ও 'নীল বিদ্রোহে'র পর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মনোবেদনার কথা ধরা পড়েছে রাজনারায়ণ বসুর জীবনস্মৃতির পাতায়।

তিনি লিখেছেন,

"বস্তুত জগৎশুদ্ধ লোক কি কখনও কেরাণী বা স্কুল মাষ্টার হইতে পারে? ......শিল্পবাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগের জন্য দিন দিন আমরা দীন হইয়া পড়িতেছি। ইংলণ্ডের উপর আমাদের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড় না আনিলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি, কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আইলে আমরা ব্যবহার করিতে পাই না। এমন কি বিলাত হইতে লবণ না আইলে আমরা আহার করিতে পাই না। দেশলাইটি পর্য্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা আগুন জ্বালিতে পাই না। দেশ হইতে কিছু হইতেছে না।"[১]

অবাধ বাণিজ্যের অভিশাপ কিভাবে বাঙ্গলাদেশকে অন্তঃসারশূন্য করে তুলেছিল তার চিত্রটি লেখকের বক্তব্যের মধ্যে ধরা পড়েছে। আত্মনির্ভরতার অভাববোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ্য স্থানাভাব ক্রমশঃ বাঙ্গালীকে আত্মসচেতন করেছিল। অনুরূপ সময়ে 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল ও 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নানা মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে জাতির কর্তব্য-পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এছাড়াও সমকালের ইউরোপের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তিকে শাণিত করেছিল। প্রথম যুগে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা যেমন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে মানবতার উচ্চ আদর্শে বিশ্বাসী হয়েছিলেন, এযুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীরাও

১ সেকাল ও একাল: রাজনারায়ণ বসু, পৃ. ১৪০।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের সমর ও সাম্রাজ্যলিপ্সার তাণ্ডবনৃত্য প্রত্যক্ষ করে মানুষের স্বাধিকার রক্ষা ও অর্জনের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন। সমকালীন ইউরোপীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে, বর্তমান কালের একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন,

"In particular, the liberation from foreign yoke of Greece and Italy, two ancient centres of culture like India, and the fight for freedom by the Irish, subject to survitude under a common master, deeply stirred the Indians, and evoked feelings of nationalism of the same type. The visit of Indians to Europe in increasing numbers contributed to the same end by making them familiar with the working of free political institutions of Europe."[২]

আন্তর্জাতিক পটভূমিতে বাঙ্গালীর স্বাদেশিক মনোভাব দৃঢ় ও প্রত্যয়-নিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল, তা ক্রমে ক্রমে স্থির হয়ে আসে। জাতির প্রচলিত সংস্কার মাত্রই যে কু-সংস্কার নয়, দেশবাসীর নিজস্ব সংস্কৃতির যে বিশেষ মূল্য আছে এবং সমাজের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে তার স্থায়িত্ব দরকার, এই রকম এক বিশ্বাস শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে জেগে উঠে। আর তার ফলেই তাঁরা ভারত-সংস্কৃতির এক নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিভিন্ন কর্মচিন্তাতে এবং জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে সত্যের অনুসন্ধান করেছিলেন দেশের প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে। দেশবাসীর অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন, আপন সংস্কৃতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলবার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত করেছিল 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭)। স্বদেশবাসীর সকলস্তরে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকল্পে 'হিন্দু মেলা', 'সিপাহী বিদ্রোহে'র দশ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই দশ বৎসরের ইতিহাস বাঙ্গালীর মানস পরিবর্তনের ইতিহাস, আর এর গতিমুখ ছিল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে।

২ History of the Freedom Movement in India, Vol. I: Dr R. C. Mazumdar; p. 328.

২

জাতীয় গৌরব প্রচারে বাঙ্গলা নাটকের অনন্য ভূমিকার পশ্চাতে 'হিন্দু মেলা'র অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাঙ্গালী নাট্যকারেরা জাতি জাগরণের চিন্তাসমিধ, 'হিন্দু মেলা'র অঙ্গনতল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও শাস্ত্র ঐতিহ্যে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, শ্রেণী-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিবিড় ঐক্য-স্থাপন, অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের জন্য স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার ও মমত্ববোধ সৃষ্টি, বিদেশী শিল্পসামগ্রীর প্রতি অনীহা এবং আত্মনির্ভরতার আদর্শ; যা নাট্যকারেরা প্রচার করেছিলেন অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে—তার মহামন্ত্রটি 'হিন্দু মেলা'র মহান যজ্ঞশালায় উচ্চারিত হয়েছিল। বাঙ্গালী নাট্যকারেরা দীক্ষিতের মত অভিষিক্ত হয়েছিলেন বলেই তাঁদের কর্মচেতনা দেশবাসীর চিত্তে বিদ্যুৎসঞ্চারী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

'হিন্দু মেলা'র আদর্শগত চিন্তা ঋষি রাজনারায়ণ বসুর মনোলোকে প্রথম জন্মলাভ করে। স্বদেশবাসীর উন্মার্গগামী চিত্তকে স্থিতধী করবার উদ্দেশ্যে তিনি, 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'Prospects of a Society for the promotion of National feeling among the educated Natives of Bengal', নামে ইংরেজি ভাষায় একটি পুস্তিকা রচনা করেন। পুস্তিকাটির অনুষ্ঠান পত্রের ভাষণ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা ছিল,

"অধুনা ইউরোপীয় জ্ঞানালোক বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এতদ্দেশীয় জনগণের মনকে চিরনিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছে। বঙ্গীয় সমাজে অবিশ্রান্ত আন্দোলন চলিয়াছে। পরিবর্তন ও উন্নতির স্পৃহা সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। নব্যসম্প্রদায় প্রাচীন রীতি-পদ্ধতিতে বীতরাগ হইয়া সমাজ সংস্কারার্থ একান্ত উৎসুক হইতেছেন। ...আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে যে সকল সুরীতি ও সুনীতি লাভ করিয়াছি তাহাও পাছে এই পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যায় আশঙ্কা হইতেছে।...যাহাতে শিক্ষিত দলের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গল নিবারিত হয় এবং সমাজের সংস্কার সকল জাতীয় আকার ধারণ করে তন্নিমিত্ত এতদ্দেশীয় প্রভাবশালী মহোদয়গণ একটি সভা

স্থাপন করুন।…জাতীয় গৌরবেচ্ছার উন্মেষ ব্যতীত কোন জাতি মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না।"৩

রাজনারায়ণ বসু এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির সমস্ত কিছুকেই পরিশুদ্ধাকারে পুনঃপ্রবর্তন, সংরক্ষণ ও পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। অনুষ্ঠান পত্রটি হচ্ছে ভারতের জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিক চিন্তা সম্পর্কে এক মূল্যবান দলিল। একে স্বদেশপ্রেমের 'চার্টার' বা সনন্দ বলে অভিহিত করা যায়। জাতির সাহিত্য, ভাষা, শিক্ষা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, কায়িক পরিচর্যা এবং তার সঙ্গে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, পরিবর্ধন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশবাসীকে আত্মনির্ভর ও নিয়মনিষ্ঠ হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন এই জ্ঞানতপস্বী। বাঙ্গালীর কাছে তাঁর আবেদন সার্থক হয়েছিল। কারণ, বঙ্গবাসী রাজনৈতিক নিপীড়নের ভিতরে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিল। বেশভূষা, সাহিত্য-চিন্তা, সৌজন্য বিনিময় সমস্ত কিছুই জাতির জীবনানুগ করবার পরিকল্পনাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যকার মনোমোহন বসু ও নবগোপাল মিত্র তাঁর এই চিন্তাধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নবগোপাল মিত্র, 'ন্যাশনাল পেপারে'র মাধ্যমে জাতির স্বাদেশিক আদর্শকে সকল শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি 'National Gathering' প্রবন্ধে লেখেন,

"The interest of our country, however, demand …that we should ··try to see each and every one of our countrymen in that spirit of brotherly love…unless we try to do so, all our attempts to move in a natural cause or carry any natural cause into a successful issue must prove abortive.…We think we can not find a better opportunity a better occasion to fulfil this great want, than on the 'Choit Shankerantee' coming… If things could be so arranged…all classes of community might hail it as the best occasion to see each other and reciprocate towards each other feelings of friendly love …though it may appear insignificant in the beginning bids

৩ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র, ১৭৮৭ শক।

fair···to unite in one tie of brotherly love union, the various races and tribes of the people, who though living in one common soil, having one common interest, feel themselves so many different nations···a movement which is national—a movement which eschews all sectarian jealousy and bigotry —a movement noble and holy."[৪]

'হিন্দু মেলা' এই চিন্তারই অভিব্যক্ত রূপ। বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যের মহানদীতে স্বাদেশিকতার যে জোয়ার এসেছিল, তাতে প্রাদেশিকতা বা সংকীর্ণতার কোন ঠাঁই ছিল না। 'হিন্দু' শব্দের নির্মোকে সমস্ত জাতির মঙ্গল চিন্তাই বাঁধা পড়েছিল।* 'হিন্দু মেলা'র প্রথম বছরে যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল তাতে লেখা ছিল, (চৈত্র সংক্রান্তি, শনিবার, ১৭৮৯ শক)

"···দেশীয় লোক মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন এবং দেশীয় লোক দ্বারা স্বদেশীয় সৎকার্য্য সাধন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।···কিন্তু যদি এই জাতীয় মেলার উৎসাহ কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত হয় এবং অস্মদ্দেশীয় দিগের মধ্যে সকলশ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের এই বিষয়ে একটি অটল উৎসাহ ও যত্ন স্থাপনের উপায় না করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইবার ব্যতিক্রম ঘটিবে। এই অভিপ্রায়ে আমাদিগের দেশীয় কতিপয় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্‌যোগী হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।···ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব নির্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিয়া সাধারণ কার্য্যের প্রতি যত্ন করিবেন। যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। এই শ্রেণীভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে, তাহারা সমুদায় হিন্দুজাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্য সকল সংসাধন জন্য অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্য্যে নিয়োগ করত এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

২। প্রত্যেক বৎসরে আমাদের হিন্দুসমাজে কতদূর উন্নতি হইল, এই

৪ National Paper : Naba Gopal Mitra ; March 20, 1868.

* "We despise race distinctions. It should be our object to raise up a vast nationality in India, composed of Christian, Hindoo, Parsee and Mahomedan governed by one interest and one faith—faith in the supremacy of human love and charity". National Paper : Naba Gopal Mitra ; April 1, 1868.

বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ জন্য চৈত্র সংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।

৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদিগকে উৎসাহ বৰ্দ্ধন করা যাইবে।

৪। প্রতি জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

৫। প্রতি জেলার স্বদেশীয় সংগীত নিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বৰ্দ্ধন করা হইবে।

৬। যাঁহারা মল্লবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক ও সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোক মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।"[৫]

'হিন্দু মেলা'র প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় জীবনের সংস্কার, সংগঠন এবং শ্রীবৃদ্ধি। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেছিলেন,

"এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা। ···আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। ···আমাদের এই মিলন সাধারণ ধৰ্ম্মকৰ্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।

ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর, ··আপনার চেষ্টায় মহৎ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কৰ্ম্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মনুষ্য নহি?···অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।"[৬]

৫ হিন্দুমেলা: যোগেশচন্দ্র বাগল; মাসিক বসুমতী, ৩১শ বর্ষ, চৈত্র ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

৬ মুক্তির সন্ধানে ভারত: যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ৮৪—৮৫।

সমকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই 'হিন্দু মেলা'র আদর্শ প্রচার ও কার্য পরিচালনাতে সংযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাস পাল, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, সালিকরাম, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাদাস কর, গোপাললাল মিত্র, অম্বিকাচরণ গুহ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'হিন্দু মেলা'র প্রতিষ্ঠাকালে পরাধীনতার কু-ফল ধীরে ধীরে প্রত্যেককেই সচেতন করেছিল। বিদেশী পণ্য দ্রব্যের প্রতি বাঙ্গালীর অনিচ্ছা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে আত্মনির্ভরতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সেকালের বাঙ্গালী সাংবাদিক ভোলানাথ বসু, বিদেশী পণ্য দ্রব্য বর্জনের আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন,

"দৈহিক বল প্রয়োগ না করিয়া, রাজশক্তির বিরোধিতা না করিয়া (বিদেশী রাজার) আইনের সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া ভারতের প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের দ্বারা সম্ভব। আমরা ইংলণ্ডের পণ্য ব্যবহার করিব না, এই সংকল্প করিতে পারি, 'Let us make use of this potent weapon (moral hostility) by resolving to non-consume the goods of England.'"[৭]

অবাধ বাণিজ্যনীতি দেশের অর্থনৈতিক জীবনে যে ঘুণ ধরিয়েছিল, নাট্যকার মনোমোহন বসু বিরচিত একটি গীতিতে তা প্রকাশ্যভাবে ধরা পড়েছে। 'হিন্দু মেলা'য় এই সঙ্গীতটি পরিবেশিত হয়েছিল। গানটির কিয়দংশ এইরকম (১২৮০ সালে বারুইপুর 'হিন্দু মেলা'য় গীত):—

"তাই বলি, বল ভাই, হিন্দু মেলার জয় জয়!
দেশের দুর্গতি দেখ চেয়ে, যত সব পুরুষ মেয়ে, একি হ'লো হায়,
ক্রমে বিলাতির গোঁড়া হ'লো সমুদয়!
জুতো কাপড় ছাতি, সকল বিলাতি, অনেক ঘুচেছে খাওয়া বসার সাবেক রীতি!
আমরা সভ্যতার গ্যাদায় চোটে, হায় মরি কদম ফুটে, একি হ'লো হায়!
তবু আপনাদের নিজের বস্তু কিছুই নয়!

৭ মাসিক বসুমতী: ৩১শ বর্ষ, চৈত্র ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

তাঁতি কামার সবার, অন্ন মেলা ভার, করে হাহাকার,
এ দুখে আর কে করে পার ?

* * * *

ঘরে প্রদীপটী জ্বালতে হ'লে, বিলিতি বাক্‌স খুলে, জ্বালতে হয় গো হয় !
আবার বিলিতি ছুঁচ সুতো বৈ সেলাই নয় !
গেল সকল মজে, হিন্দুসমাজে, পেয়ে আদেখ্‌লে ভুলিয়ে খেলে ইংরেজ রাজে !
দেখে দুখে তাই মেলার ঠাটে, ভাই বন্ধু সবাই জুটে, এস এস হে,
খুলি সুখের হাট, দিশী ঠাট যায় বজায় রয় !"[৮]

বিদেশী পণ্যদ্রব্যকে অবজ্ঞা করে দেশবাসীকে আত্মনির্ভর করার মহান ব্রত নিয়েছিলেন 'হিন্দু মেলা'র কর্মকর্তাগণ। তাঁরা সমস্ত স্তরে দেশী শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার চেয়েছিলেন। দেশের সকল শ্রেণীর কর্মীকে আহ্বান জানিয়ে নাট্যকার মনোমোহন বসু বলেছিলেন,

"......হে স্বদেশস্থ ভ্রাতৃগণ! আসুন আমাদের পরম হিতের জন্য, জননী জন্মভূমির জন্য,...শিল্প-বিজ্ঞান জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, আসুন আমরা সকলে একত্র মিলিত হই ! · যখন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, জয়পুর লক্ষ্ণৌয়ের ভাস্করগণ, চণ্ডালগড় ও কুমারটুলির কুমারগণ, পাটনার কৃষকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের, পূর্ব ও পশ্চিমের সমব্যবসায়ী, সমশিল্পী, এবং সমবিদ্য গুণিগণ এই চৈত্রমেলার রঙ্গভূমিতে আপনা হইতে আসিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে...মেলাকে স্বজাতীয় গৌরবভূমি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখনই জানিবেন এই নব-রোপিত বৃক্ষের ফল লাভ হইল। সেই শুভ ফল না আসা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইবেক —ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবেক।"[৯]

কেবলমাত্র জাতীয় ঐক্য ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নয়, দেশবাসীর পৌরুষ-চৈতন্যকে জাগরিত করার উদ্দেশ্যে 'হিন্দু মেলা'য় দেহচর্চা ও ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্ষুদ্র এক দ্বীপের অধিবাসীর কাছে পরাজয় স্বীকার বাঙ্গালীকে মনে-প্রাণে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। বাহুবল হীনতার দীনতা

৮ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০—১৯০৫), দ্বিতীয় খণ্ড, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র রচনা সংকলন, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, পৃ. ৬৩৩—৬৩৪

৯ মুক্তির সন্ধানে ভারত: যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ৯০

নবগোপাল মিত্রকে একান্তভাবে শক্তিকামী করে তোলে। 'হিন্দু মেলা'য় 'আখড়া' স্থাপন করে ছাত্রদের লাঠিখেলা, তরোয়াল খেলা, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে শিকার, ভ্রমণ ও আগ্নেয় অস্ত্রচর্চায় যে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তার মূলে ছিল 'হিন্দু মেলা' ও নবগোপাল মিত্রের প্রকাশ্য প্রভাব। নবগোপাল মিত্রের স্বাদেশিক অনুধ্যানের কথা বলতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছেন,

"নবগোপাল-বাবু ঘোরতর ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিলেন, এবং কি উপায়ে ভারতবর্ষ অনতিবিলম্বে ব্রিটিশের শৃঙ্খল-মুক্ত হয়, অহর্নিশ তাহার ধ্যান করিতেন। ভারতবর্ষ বাহুবলে ইংরাজের নিকট হটিয়া গিয়াছে, তাঁহার এই ধারণা ছিল। সুতরাং ইংরাজ তাড়াইতে হইলে বাহুবলেরই ভজনা করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্র ছিল।"[১০]

'হিন্দু মেলা'র অধিকর্তারা চেয়েছিলেন, 'স্বদেশী সমাজ' গঠন করতে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। নাট্যকার মনোমোহন বসু পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন,

"......সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতিগৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত-ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে স্বাধীনতা নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে।···

এই চৈত্র মেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নামগন্ধমাত্র নাই,···স্বজাতীর উন্নতিসাধন, ঐক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।"[১১]

দেশবন্দনা 'হিন্দু মেলা'র অপর এক বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গলাদেশে স্বাদেশিকতার জোয়ারে অনেক জাতীয়-সঙ্গীত রচিত হয়েছিল। বিদেশীদের কবল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা, স্বদেশগরিমা এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার অভ্রংলিহ

---

১০ নবযুগের বাংলা: বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ. ১৪৮

১১ মুক্তির সন্ধানে ভারত: যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ৮৯

মহিমা গানের 'ফ্রেমে' বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক বক্তৃতার চেয়ে সংগীত ও কবিতা যে অনেক প্রাণস্পর্শী এবং নাটক-রূপ দৃশ্যকাব্যের মধ্যে জাতীয় উপাখ্যানের গৌরবময় কাহিনী রূপায়িত করলে গণচেতনা ক্ষিপ্র-গতি লাভ করে; 'হিন্দু মেলা'র কর্ণধারেরা সহজে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, তাঁরা ভারতের অতীত গৌরব-গাথা ও আদর্শ—সংগীত, কাব্য এবং নাটকের মধ্যে প্রচার করেন। স্বাদেশিকতার বয়ঃসন্ধিপর্বে বাঙ্গলাদেশের নাট্যকারেরা প্রত্যেকেই 'হিন্দু মেলা'র চিন্তাদর্শে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁদের নাটকের মধ্যে 'চৈত্র মেলা'র ভাবরূপ আবশ্যিক কর্তব্য-কর্ম হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাসে 'হিন্দু মেলা'য় গীত সঙ্গীতগুলি অক্ষয় মর্যাদার অধিকারী হয়ে আছে। গানগুলির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমার', গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে', এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, 'মিলে সব ভারত সন্তান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।* তৎকালে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক চিন্তায় দৃঢ়তার চেয়ে পল্লবগ্রাহিতাই অধিক ছিল। ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন স্তব-স্তুতি বালক রবীন্দ্রনাথও সহ্য করতে পারেননি। 'হিন্দু মেলা'র একাদশ অধিবেশনে (১৮৭৭) 'দিল্লীর দরবার' কবিতায় তিনি অভিমানাহত কণ্ঠে ভারতবাসীর মনোভাবের নিন্দা করে লিখেছিলেন,

"ব্রিটিশ জয় করিয়া ঘোষণা
যে গায় গাক আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে কজন আছি,
আমরা ধরিব আর এক তান।"

'হিন্দু মেলা'র অন্যান্য অধিবেশনে যাঁরা দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিবনাথ শাস্ত্রী।

. 'হিন্দু মেলা'র আয়ুষ্কাল দীর্ঘ ছিল না। পরবর্তীকালে ভারতের রাজনৈতিক

* "এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরী-তটে বৃক্ষে২ মর্ম্মরিত হউক। পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!"
বঙ্গদর্শন: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চৈত্র, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, (১৮৭২ ইং)।

জীবনে এই সভার প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। 'হিন্দু মেলা'র বিভিন্ন অধিবেশনে সংস্কার ও সংগঠনের যে সব প্রয়াস চলেছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন। ভারতবাসীর স্বাদেশিক চিন্তায় 'হিন্দু মেলা'র সবচেয়ে বড় অবদান, 'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধি।'[১২] বাঙ্গালীর রাষ্ট্রিক চিন্তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরূপতা যখন দানা বেঁধে উঠেছে, সেই পুণ্য লগ্নেই 'হিন্দু মেলা'র আবির্ভাব ও আয়োজন। 'সিপাহী বিদ্রোহে'র ব্যর্থ পরিণতি, নীলকরদের অমানবিক অত্যাচার এবং 'নীল বিদ্রোহে'র মধ্যে বাঙ্গালীর অখণ্ড জাতি গঠনের বাসনা, সমস্ত কিছু একত্রযোগে বাঙ্গালীকে আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বী হবার যে প্রেরণায় ক্রমশঃ উদ্বুদ্ধ করেছিল, তারই পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল 'হিন্দু মেলা'য় গৃহীত আদর্শ ও সঙ্কল্পাবলীর মধ্যে। রাজনৈতিক আলোচনাও 'চৈত্র মেলা'র সভাতে স্থান পেয়েছিল। নাট্যকার মনোমোহন বসু ইংরেজ সরকারের বিচার ব্যবস্থার স্থায়ী সংস্কার কামনা করে এক বক্তব্য এই মেলাতে রেখেছিলেন। বিচার ও শাসন বিভাগকে স্বতন্ত্র করবার দাবিও তিনি তোলেন। সে সময়ে 'ভারতবর্ষীয় সভা' ছিল জাতির রাজনৈতিক চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই সমিতিতে সাধারণের অভাব-অভিযোগ খুব কমই আলোচনা হত। সাধারণ ব্যক্তিরা রাজনৈতিক আলোচনায় প্রবেশাধিকার পেতেন না। মনোমোহন বসু উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ দূর করে সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। 'হিন্দু মেলা'র পক্ষ থেকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন,

"আয় রে সৌভাগ্যশালী প্রিয় পুত্রগণ! আয় রে আমার ধন-কুবের প্রধান সন্তানগণ! আয় রে রাজ্যাধিকারি-ভূম্যধিকারি কৃতজ্ঞ কৃতি পুত্রগণ! যদি ভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সৌভ্রাত্র বন্ধনের আর একতারূপ অতুল্য একাবলিহার ধারণের সুযোগ পাইয়াছ, তবে বৎসগণ! বৃথা অভিমান, অনর্থ গর্ব্ব, সর্ব্বনাশক ইন্দ্রিয়াশক্তির বশীভূত আর থেকো না! স্বদেশানুরাগকে তোমাদের পথ-প্রদর্শক কর; তোমাদের প্রতিই তোমাদের অভাগ্যবতী জননীর অধিক আশাভরসা—মধ্যাবস্থ তোমাদের কনীয়ান্ ভ্রাতারা যেরূপ মাতৃভক্তি-পরায়ণ আর বাসনা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যেরূপ সুযোগ্য, তাহাদের যদি

১২ জীবনস্মৃতি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; পৃ. ৭৮

সেরূপ সম্পত্তি, সম্ভ্রমবল, প্রভুত্ববল থাকিত, তবে বৎস ! কোন চিন্তার বিষয়ই হইত না। তোমরা সহায় না হইলে তাহারা কি করিতে পারে ? তোমরা অনুবল হইলে তাহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে।"[১৩]

পরবর্তীকালে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইলবার্ট বিল'কে কেন্দ্র করে ভারতীয়দের ইংরেজ বিদ্বেষ এত সুউচ্চ হয়েছিল যে, রাজপ্রীতি সম্পর্কের শেষ তন্ত্রীটুকু অবশেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবং তার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে সৃষ্টি হয় জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫)। কংগ্রেসের কার্যসূচী ও কর্মভাবনা বহুলাংশে 'হিন্দু মেলা'র আদর্শের উপর তৈরী হয়েছিল। 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের সময়ে লালা লাজপত রায় বলেছিলেন, 'বাঙ্গলা ভারতে যুগান্তর প্রবর্তিত করিয়াছে, তাহার গৌরব বাঙ্গালীর প্রাপ্য।'[১৪] গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলেছিলেন, 'বাঙ্গলা তুষ্ট না হইলে ভারতে শান্তি স্থাপন অসম্ভব'।[১৫] বাঙ্গলাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের প্রথম প্রস্তুতি 'হিন্দু মেলা'য় ঘটেছিল বলেই স্বদেশী আন্দোলন এমন রক্তরাঙ্গা হয়ে উঠে। তাই 'হিন্দু মেলা'কে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান বলে অভিহিত করা যেতে পারে। স্বাদেশিকতার সুউচ্চ গৌরব বাঙ্গালী নাট্যকার মনোমোহন বসু দেশবাসীর প্রাণে একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর এই মহৎপ্রাণ নাট্যকারের জীবন-সার্থকতা এইখানেই।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে মুক্তি আন্দোলন

৩

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ছিল বাঙ্গালীর স্বাদেশিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে জাতির রাষ্ট্রীয় চিন্তায় এক পট-পরিবর্তনের পালা শুরু হয়েছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে আদর্শগত বিরোধের ফলে শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যান। কেশবচন্দ্র সেনের 'সর্বধর্ম সমন্বয়' আদর্শ গ্রহণের মধ্য

১৩ মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ৯২-৯৩

১৪ মাসিক বসুমতী : ৩১শ বর্ষ ; চৈত্র, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

১৫ ঐ ঐ

দিয়ে যে ঐক্য-সাধনা নব্য যুবকদের কাছে এক 'নেশন' তত্ত্ব গঠনের সহায়ক হয়েছিল, তা ক্রমশঃ ম্লান হয়ে পড়তে থাকে। এক 'বিশ্বধর্ম' স্থাপনের জন্য কেশবচন্দ্র 'নববিধান' ও 'নবসংহিতা' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রাচীন গুরুবাদী ঐতিহ্যানুসরণ, ব্যক্তিপূজার প্রচলন ও আদেশবদ্ধ নিয়ম-নীতির প্রবর্তন এবং সর্ববিষয়ে একনায়কত্ব অথবা একাধিপত্য, স্বাধীন-চেতা ও সংস্কারমুক্ত ব্রাহ্ম যুবকদের অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহী করে। তাঁরা নিজেদের মতামত পরিস্ফুট ক'রে তোলবার উদ্দেশ্যে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, 'Brahmo Public Opinion' ও 'তত্ত্বকৌমুদী' নামে দু'টি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই বিদ্রোহী ব্রাহ্ম যুবকদের প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'। 'Brahmo Public Opinion' পত্রিকার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তাঁরা লেখেন,

"Brahmoism elevates people not only spiritually but socially, intellectually, physically and politicaly. Boldly and fearlessly we hope to teach and practise reforms."[১৬] পরবর্তী একটি সংখ্যায় আরও পরিষ্কার করে লেখা হয়,

"It may now be said with affection or pride that the Sadharan Brahmo Samaj is the first instance in this country of a republican form of Government of a community. It is a movement to harmonise the equal development of the Spiritual, the Moral, the Social and the Intellectual powers of the nation."[১৭]

'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র যুবকেরা গণতন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাঁরা দেশবাসীর নৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নতির মূলে যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনি রাজনৈতিক সাধনাতেও অনুরাগী হয়েছিলেন গণতান্ত্রিক বিধি ও পদ্ধতি রচনাতে। এই মর্মে 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকাতে লেখা হয়,

"(ব্রাহ্মসমাজ) অন্যায়ের উপর ন্যায়, অসাম্যের উপর সাম্য, রাজার উপর

১৬ Brahmo Public Opinion : March 21, 1878

১৭ Ibid : September 26. 1878

প্রজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া পৃথিবীব্যাপী একটি মহাসাধারণতন্ত্রের আয়োজন করিতেছেন।"[১৮]

'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র অপর একটি বড় অবদান, সামাজিক উপাসনা সঙ্গীতে স্বদেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠা।

"তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্য্যদের প্রিয় ভূমি সাধের ভারত ভূমি
অবসন্ন আছে অচেতন হে;
একবার দয়া করি, তোল কর ধরি,
দুর্দ্দশা-আঁধার তার করহ মোচন।
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি
অন্তর্যামী জানিছ সে সব হে;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে
অসাড় শরীরে পুন দাও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন অচেতন পরাধীন
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে;
সেই কৃপাগুণে দেখি শুভক্ষণে
সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন।"[১৯]

'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র যুবকদের দেশ ও জাতির চেয়ে বড় আর কিছু ছিল না। ভারতে রাজনৈতিক উত্থান তাঁদের একমাত্র কাম্য ছিল। গণসংগ্রামের চত্বরে পুরুষের সঙ্গে সমান অংশীদার হ'তে তাঁরা নারীসমাজকেও আহ্বান জানিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন,

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

শিবনাথ শাস্ত্রীও অনুরূপভাবে লেখেন,

"ওরে! পতিব্রতা বিধবা হইয়ে
যে রূপেতে থাকে শুদ্ধাচার লয়ে,
আয় সে প্রকার থাকি শুদ্ধাচারে
মৃত স্বাধীনতা ধনে উদ্দেশিয়ে।"

১৮ তত্ত্বকৌমুদী : ১৬ই ফাল্গুন, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

১৯ নবযুগের বাংলা : বিপিনচন্দ্র পাল; পৃ. ১২২-২৩।

রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে 'Brahmo Public Opinion' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল,

"If our educated countrymen want to politically regenerate the country, they must impart elementary knowledge of the current political topics of the day to the masses."[২০]

শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রমিক ও কৃষকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আহ্বান জানিয়ে বলেন,

"উঠ জাগ শ্রমজীবী ভাই
উপস্থিত যুগান্তর—
চলাচল নারীনর—
ঘুমাবার আর বেলা নেই
উঠ জাগো ডাকিতেছি তাই।
... ...
ওই দেখ চলেছে সকলে
মধ্যবিত্ত ভদ্র যারা
সর্ব্বাগ্রেতে ধায় তারা
পায় পায় ধনীরাও চলে
ছোট বড় ধায় কুতূহলে।
... ...
ওই দেখ সাগরের পারে
শ্রমজীবী শত শত
কেমন সংগ্রামে রত
এই ব্রত রবে না আঁধারে
আয় তোরা দেখি যে সবারে।"[২১]

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে শ্রমিক অভ্যুত্থান ও তাদের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সম্পর্কে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র যুবকগণ বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। দেশের স্বাদেশিক চিন্তা আন্তর্জাতিক পটভূমিতে স্থাপন ও বিচার করতে তাঁরা ছিলেন উৎসাহী। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ 'রায়ত সভা'

২০ Brahmo Public Opinion : June, 1882.

২১ ভারত শ্রমজীবী পত্রিকা : শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৮৭৪।

স্থাপন করে জমিদার ও শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তার পূর্ব সূচনা এই 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে' হয়েছিল। 'ভারত সভা'র দেশের বহু অংশে Rent Union ও Ryot Union স্থাপনের প্রশংসা করে Brahmo Public Opinion পত্রিকা লিখেছিল,

"We are glad to hear that the Indian Association have been able to form some Rent-Unions in the mofussil. The importance of having such Unions all over the country is very great. These Unions, if properly formed and organised, will be a power in the land. The field for work is very extensive, but alas! the workers are so few. We congratulate the Indian Association on having taken up the subject in right earnest."[২২]

'রায়ত সভা' প্রতিষ্ঠা ও 'কুলি আন্দোলন' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাতে আসামের কুলিদের দুর্দশা এবং অকথ্য নির্যাতনের কাহিনী দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করতেন। একটি সামগ্রিক জনমত গড়ে তোলাই তাঁর সকল কাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একমাত্র তাঁরই প্রচেষ্টায় 'কুলি আন্দোলন' জাতীয় সমস্যা হিসাবে গৃহীত হয় এবং জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে এই সমস্যাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এইভাবে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র মনীষিগণ ভারতবর্ষে ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন। অপর যে ক'জন বাঙ্গালী দেশচর্যায় দীক্ষিত হয়ে পূর্ণ স্বাধীন ভারত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, কালীশঙ্কর সুকুল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, তারাকিশোর চৌধুরী, কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র, গগনচন্দ্র হোম ও উমাপদ রায়। এই স্বাদেশিক তাপসগণ সমবেত হয়ে একটি প্রতিজ্ঞা পত্র রচনা ও স্বাক্ষর করেন। প্রতিজ্ঞা পত্রের সংকল্প ছিল,

(১) "স্বায়ত্ব-শাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।···দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা

২২ Brahmo Public Opinion : January 12, 1882.

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের আইন-কানুন মানিয়া চলিব—কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দ্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।"

(২) "আমরা জাতিভেদ মানিব না; পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসরের পূর্ব্বে এবং রমণীর পক্ষে ষোল বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব না এবং বিবাহে সাহায্য করিব না।"

(৩) "লোকশিক্ষা প্রচারে প্রাণপণ যত্ন করিব।"

(৪) "অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতি নিজেরা অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।"

(৫) "আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জ্জন বা রক্ষা করিব না, যে যাহা অর্জ্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, এবং সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিব।"[২৩]

দীক্ষিতদের মনোভাবনার পরিচয় দিতে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন,

"সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা কালে তাহার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার সময়ে আমরা কেবল ব্রাহ্ম সমাজের কথা ভাবি নাই কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের ছবিটাই আমাদের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল।··· ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফরাসীদের রাষ্ট্রীয় শাসন-তন্ত্র পরীক্ষা করিয়া তাহারই ছাঁচে আমাদের অবস্থার উপযোগী করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিধি-প্রণালী গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা কেবল একটা সঙ্কীর্ণ ধর্মসমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহি নাই।···স্বাধীনতা এবং মানবতার সাধকরূপে ব্রাহ্ম সমাজ যেমন একটা আদর্শ-পরিবার ও আদর্শ-সমাজের প্রতিচ্ছবি গড়িয়া তুলিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা আদর্শ রাষ্ট্রযন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্রও গড়িয়া তুলিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল। এই ভাবের প্রেরণাতেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিধি-প্রণয়নের মধ্যে আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের কনষ্টিটিউসনের একটা ছোটখাট নমুনা দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।"[২৪]

'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র যুবকেরা মানবতা ও স্বাধীনতা—দুই আদর্শকে

২৩ নবযুগের বাংলা: বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ. ১২৬-১২৭

২৪ নবযুগের বাংলা: বিপিনচন্দ্র পাল পৃ. ১২৩-১২৪।

এক বেণীবন্ধনে আবদ্ধ করে প্রকৃত রাষ্ট্রতন্ত্র কামনা করেছিলেন। ধর্মচিন্তা ও সামাজিক জীবনে যেমন কোন স্বৈরাচার তাঁরা সহ্য করেননি, তেমনি রাজনৈতিক জীবনেও চেয়েছিলেন সত্য-ন্যায়-নীতিতে গণতান্ত্রিক চেতনাকে অভিষিক্ত করতে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরা আদর্শকে বড় করে দেখেছিলেন বলেই জাতির মুক্তি-সংগ্রাম যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে কেউ সরকারী কর্ম গ্রহণ করেননি। আদর্শ ও বাস্তবকে সমন্বিত করে এক অখণ্ড স্বাদেশিক চিন্তা তাঁরা বিপুল গৌরবে প্রচার করেন।

'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' যখন গণতান্ত্রিক চেতনাতে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে তৎপর, তখন বাঙ্গালী নাট্যকারগণ দেশবাসীর চিত্তে স্বাদেশিক চিন্তাকে অনুবিদ্ধ করতে অগ্রণী হয়েছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। দীনবন্ধু মিত্র, উপেন্দ্রনাথ দাস ও মনোমোহন বসুর নাটকে এবং কলকাতার 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ও 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র অভিনয়ে স্বদেশপ্রেমের প্রবল বন্যা দেশবাসীর চিত্তটকে প্লাবিত করেছিল। এছাড়াও, 'অমৃতবাজার', 'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী', 'বঙ্গদর্শন' ও 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকাগুলির মধ্যেও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশিত হয়েছিল। 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' যে স্বাধীনতার আদর্শকে ধর্ম, সমাজ ও পারিবারিক আদর্শের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রণী হয়েছিলেন ; বাঙ্গলাদেশের পত্রিকাকুল ও বাঙ্গালী নাট্যকারেরা তাকে রাষ্ট্রীয় জীবনে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রয়াসী হন।

গণসমিতির জন্ম ও বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তার বিস্তার

৪

উনিশ শতকের সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা ক্ষিপ্র গতিতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। 'হিন্দু মেলা'র উদাত্ত আহ্বান ও 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে'র গণ আন্দোলন যেমন একদিকে দেশবাসীর ধমনীতে বিদ্যুৎসঞ্চারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তেমনি ইউরোপের জাতীয় আন্দোলনের সংবাদও বাঙ্গালীর স্বাদেশিক ভাবনাকে পুষ্টিদান করতে থাকে। সুয়েজখাল (১৮৬৯) উন্মোচনের পর ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মানস-সংযোগ সহজ ও নিবিড় হয়ে উঠে। এরই পরোক্ষ ফল হিসাবে নানা জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও গণতান্ত্রিক চেতনা বাঙ্গালীকে আরও কর্মমুখর রাষ্ট্রিক কর্মে করে দীক্ষিত।

দেশের অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালী স্বদেশের পণ্যজাত দ্রব্য-সামগ্রীর পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণে মনোনিবেশ করে। 'হিন্দু মেলা'র বিভিন্ন অধিবেশনে ভারতবাসীর অর্থ নৈতিক পরাধীনতা সম্পর্কে জাতীয় চেতনা উন্মেষের গভীর আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করেছি। পরবর্তীকালে বাঙ্গালী আরও নিষ্ঠার সঙ্গে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে উঠে। ভোলানাথ চন্দ্র স্বদেশী শিল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে লেখেন,

"এখন আমাদের বিলাতি দ্রব্য বর্জ্জনের প্রয়োজন রয়েছে।...... আমাদের কর্ত্তৃত্বে জাতীয় স্কুল, কলেজ, জাতীয় সংবাদপত্র, জাতীয় ব্যাঙ্ক, জাতীয় 'চেম্বার্স অব কমার্স', জাতীয় মিল ও ফ্যাক্টরী, জাতীয় বাজার, ফার্ম, ডক প্রভৃতি তৈরী করতে হবে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবাসীরই সাধ্য।"[২৫]

এই সময়ে আরও একটি প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর মনে সাহস ও ঐক্যের বর্তিকা জ্বালিয়েছিল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বিদেশী সরকারের কোন সাহায্য গ্রহণ না করে 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা' (১৮৭৬), প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশবাসীকে স্ব-নির্ভর করে তোলাই ছিল তাঁর কর্ম প্রচেষ্টার মূলমন্ত্র। তিনি বলেছিলেন,

"আমি চাই এটি হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠান, সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান।"[২৬] (অনুবাদিত)

বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান সাধনার প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল বিজ্ঞান সম্পর্কে অনবহিতাই বাঙ্গালীর সর্ববিষয়ে পশ্চাদ্‌পসরণের অন্যতম কারণ। 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠাতে তিনি লিখেছিলেন,

"বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু।·····বিজ্ঞান মহা শকট বাহনে, তড়িৎ তার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, অয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রসূ ভারতভূমি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রমশঃই নির্জীব করিতেছে। যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে

২৫ মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন: (১৮৭৪)
২৬ The Life of Digambar Mitra : Bholanath Chandra ; 98-99

আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন দিন নিরুপায় হইতেছি।"[২৭]

আত্মসমালোচনা আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। দেশবাসীর স্বাদেশিক চিন্তা যখন বিজ্ঞান সাধনাকে গ্রহণ করে দেশ ও জাতির স্বনির্ভরতার মঙ্গলবোধন শুরু করেছিল, তখন ফিরিঙ্গী শাসনচক্র আরও কঠিন ও নির্মমভাবে ক্রমবর্ধমান জাগরণী চিন্তাকে রোধ করতে তৎপর হয়। বিশেষভাবে বাঙ্গালী যুবকেরা I. C. S. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে শাসনকার্যে যোগদান করতে শুরু করলে, ইউরোপীয সমাজ মান ও মর্যাদা হারাবার ভয়ে ক্রমশঃ রূঢ় ও বিবেকহীন হয়ে উঠে। বাঙ্গালীকে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশে তদানীন্তন ছোটলাট ক্যামবেল উচ্চশিক্ষাতে ব্যয় বরাদ্দের হার যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দেন। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে বাঙ্গলাদেশে সমালোচনার ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠে। ব্রিটিশ সরকারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' জিজ্ঞাসা করে,

"…. Why did you not tell this before? Why did you not tell us before that more we learn, the less shall be liked by you? ….Was that a hoax? Must we forever remain enchained, crushed, trodden, ignorant, superstitious, to satisfy your love of power? And you emancipated millions of slaves and you boast of your civilisation and Christianity?

No, we are not disposed to be satirical, at least not to day, we write from the bottom of our soul and if every native were to unbosom his heart, you would see their 'distrust' and 'desperation', stamped with indelible character."[২৮]

সমস্ত বিরোধিতাকে নস্যাৎ করে উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচন আইন বিধিবদ্ধ হয়ে গেলে, বাঙ্গালীর তীক্ষ্ণ কঠোর সমালোচনা দেশবাসীর রাষ্ট্রচিন্তা এবং স্বাধিকারবোধ অর্জনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে আছে। বাঙ্গালী ক্ষুরধার কলমে লিখেছিল,

২৭ বঙ্গদর্শন : ভাদ্রসংখ্যা, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।

২৮ **Amrita Bazar Patrika : February 24, 1870.**

"……We write with sorrow, deep sorrow.……The fright of the intended blow has appalled and stunned us. To take the Government of a foreign country by force into one's hand is cruel and inhuman, to deprive again, the inhabitants of all political power and then to incapacitate them for any further progress is diabolical. What is whole massacre to such a policy ?

To our countrymen, we have few words to say……It was never known that the God of Evil ever in a long run triumphed over the God of Good. …. We must remain prepare for great things and great sacrifices. Money, health, labour, even life is nothing in comparison to the value we have at stake. We must give our lives, if needs be in such a cause as this. Bengal can spend and ought to spend a million or if necessary ten times the amount to preserve her from such a dreadful calamity. …The Nation must unite, everyone must subscribe something before we can take any definite step in the matter. In the mean time we beseech our countrymen to discuss the matter amongst ourselves and communicate their opinions to the Press."[২৯]

দেশবাসী বিষাদ চেতনায় বিমূঢ় না হয়ে সর্ব প্রকার ত্যাগ, দুঃখ সহ্য এবং আত্মোৎসর্গের মধ্যে দেশ ও জাতিকে গঠন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। ঠিক এই সময়ে দেশে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর 'মেট্রোপলিটন কলেজ' স্থাপন করেন।

ইংরেজ শাসকদের দমন-নীতির বিরুদ্ধে কেবল বাঙ্গালী সোচ্চার হয়ে উঠেনি, মুসলমানগণও শ্বেতাঙ্গ সমাজের বিপক্ষে যায়। 'সিপাহী বিদ্রোহে'র পর থেকে মুসলমান সম্প্রদায় বিনা কারণে নিগৃহীত হতে থাকে।

২৯ Amrita Bazar Patrika : May 26, 1870.

সমকালে 'ওয়াহবি আন্দোলন' দেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ধর্মের খোলসে এই রাজনৈতিক বিপ্লব বাঙ্গলাদেশের আকাশকে বেশ কিছুদিন উত্তপ্ত রাখে। 'ওয়াহবি আন্দোলনে'র প্রভাব সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছেন,

"The Wahabi trial, however helped to strengthen our infant patriotic sentiment by a new sense of wrong against our British masters."[৩০]

সমকালে বরোদার গাইকোয়াড়-এর পদচ্যুতি নিয়েও বাঙ্গলাদেশে ইংরেজ বিরোধিতার ঝটিকা প্রবাহিত হয়। ব্রিটিশ প্রতিনিধি কর্নেল ফিয়ার সাহেবের হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। কেবল বাঙ্গলাদেশে নয়, ভারতের অন্যান্য স্থানেও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে মিত্ররাজাদের স্বাধীন বলে গ্রহণ করবার নির্দেশ ছিল। গাইকোয়াড়ের পদচ্যুতি 'মহারাণীর ঘোষণার' বিরোধিতা করে। তাছাড়া সমস্ত ঘটনাই ছিল অভিসন্ধিমূলক। 'ওয়াহবি আন্দোলন' ও 'বরোদার গাইকোয়াড়'-এর পদচ্যুতি দেশের রাজনৈতিক চেতনাকে সঙ্কল্প ও দৃঢ়তার সঙ্গে পুষ্ট করে। রাজনৈতিক চিন্তাবিদের ভাষায়,

"Lord Mayo's brief Viceroyalty, marked by the Wahabi trial, and Lord Northbrook's by the trial and deposition of the Gaikwad, gave birth to a new political consciousness among the rising intelligentsia of the country. In Bengal this consciousness was perhaps the strongest. This consciousness, particularly the Anti-British feeling of it, possessed the rising generation of Bengalee students, which was fed by our new Bengalee literature and the new Bengalee press, particularly the 'Amrita Bazar Patrika' and the new Bengalee stage. Lord Lytton's Viceroyalty brought fresh fuel to this new patriotic passion among us by bringing home to the Indian subjects of Her Majesty the impossibility

৩০ Memories of My Life and Times : B. C. Pal ; p. 270.

of realising their dreams of a new and free India under British rule, and with the help of their new political masters"[৩১]

জাতীয় চিন্তা যখন এইভাবে স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠেছে, তখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সরকারী কর্ম থেকে অপসারণ বাঙ্গালীকে আরও ইংরেজ বিরোধী করেছিল। ক্রমাগত আঘাত ও মর্যাদাহানির মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী উপলব্ধি করল গণসংহতির আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা; এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠল কতকগুলি রাজনৈতিক সমিতি। এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিলেন, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ।

ইণ্ডিয়ান লীগ: (১৮৭৫)

'নীল আন্দোলনে'র পটভূমি বিচারে, শিশিরকুমার ঘোষের ভূমিকা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তিনি স্বদেশের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী ছিলেন। সাধারণ শ্রেণীর রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ এবং প্রয়োজনের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অভিপ্রায়ে তিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তৎপর হন। শিশিরকুমার লক্ষ্য করেছিলেন, যে দেশে পার্লামেন্টিয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে, রাজনৈতিক সমিতির আধিক্যও সে দেশে তত বেশি। সে সময়ে বাঙ্গালীকে প্রতিনিধিমূলক শাসনের উপযোগী করে তোলবার কোন কেন্দ্র বাঙ্গলাদেশে ছিল না। 'ভারতবর্ষীয় সভা' সাধারণভাবে রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করলেও ভূম্যধিকারীদের স্বার্থ ও প্রয়োজনই বড় করে দেখা হত। তাই স্বাভাবিক কারণে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ 'ভারতবর্ষীয় সভা'র প্রতি কোন আস্থা পোষণ করতেন না। শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁর অগ্রজ হেমন্তকুমার ঘোষ এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটিকে গণতান্ত্রিক মর্যাদায় উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। দেশের সাধারণ শ্রেণীকে সভ্য করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সভার চাঁদা বার্ষিক পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে পাঁচ টাকা করতে চান। কিন্তু 'ভারতবর্ষীয় সভা'র অন্যান্য সদস্যগণ বিরোধিতা করায় দুই ভাই দেশবাসীর স্বার্থে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে এক গণ সমিতি স্থাপন করেন। তাঁরা ভাবেন, ভারতবর্ষে বে-সরকারী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে, দেশবাসী সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্বদেশের মঙ্গলের

৩১ Memories of My Life and Times : B. C. Pal ; pp. 271-272.

জন্য আগ্রহী হবে। ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কথা ব্যক্ত করা ছাড়াও, 'ইণ্ডিয়ান লীগ' এদেশে বিলাতের আদর্শে পার্লামেণ্টারী বা প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার চিন্তা প্রথম করেছিল। ১৮৭০ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় 'Parliamentary Government in India' নামে তিনটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা ব্যতিরেকে ভারতের উন্নতি অসম্ভব এবং বিদেশী সরকারের উপর নির্ভরশীল হলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ কখনও ঘটবে না. এই মর্মে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিল। ১৮৭৫ সালের মধ্যে বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে, 'পিপলস্ অ্যাসোসিয়েসন' নামে গণ-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। শিশিরকুমার ঘোষ ও হেমন্তকুমার ঘোষের সঙ্গে যাঁরা সংযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন— কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, নাট্যকার মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিরোজিওর শিষ্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পলিটিক্যাল পাদ্রী) ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজনৈতিক কাজে বিশেষ সাহায্য করেন। আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনৈতিক মতান্তরের ফলে 'ইণ্ডিয়ান লীগে'র আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়নি। পরবর্তীকালে 'ভারত সভা'র কার্যাবলীতে এই রাজনৈতিক সভার প্রভাব পড়েছিল। গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশবাসীর অভাব-অভিযোগ সার্থকতার সঙ্গে তুলে ধরার প্রচেষ্টার মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান লীগে'র সাফল্য নিহিত রয়েছে।

ছাত্রসভা বা স্টুডেণ্টস্ অ্যাসোসিয়েসন : (১৮৭৫-৭৬)

আনন্দমোহন বসু ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'Calcutta Student's Association' নামে একটি ছাত্রসভা স্থাপন করেন। অবশ্য ইতিপূর্বে বোম্বাই অঞ্চলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দেশবাসীর মনে নতুন চেতনা ও শক্তি জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে 'Student Movement' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বোম্বাইতে থাকার সময় আনন্দমোহন বসু এই ছাত্র সংগঠনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কলকাতাতে যে 'ছাত্রসভা' তৈরী হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন, আনন্দমোহন বসু ও সহ-সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দুই রাজনৈতিক নেতা ছাত্র সংসদকে আশ্রয় করে তাঁদের স্বাদেশিক চিন্তা বিস্তার করতে অগ্রণী হয়ে-

ছিলেন। নন্দকিশোর বসু নামে এক কৃতী ছাত্র ছিলেন 'ছাত্রসভা'র সম্পাদক। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক কর্মচিন্তা 'ছাত্রসভা'র মধ্যে প্রথম সাফল্যের সঙ্গে সম্প্রসারিত করেন। এখানে তাঁর প্রথম বক্তৃতা ছিল, 'শিখ শক্তির অভ্যুদয়' (Rise of the Sikh Power in India)। এই বক্তৃতায় সুরেন্দ্রনাথ স্বাদেশিক চিন্তাকে ইতিহাস চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতা ছিল, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাধনার অন্তরালে মানবিকতা ও স্বাধীনতার যে উচ্চ আদর্শ অন্তঃসলিলাকারে প্রবাহিত হয়েছে, তার দিকে তিনি আলোকপাত করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব 'সাম্য-শান্তি-মৈত্রী' ভাবনার উপাসক ছিলেন। তাঁর প্রেমধর্মের মধ্যে মানুষের সনাতন স্বাধীনতার আদর্শই প্রচারিত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়সংবেদ্য মননশীল বক্তৃতা বাঙ্গালীকে যুগপৎ কল্পনা-প্রধান দেশপ্রেম ও বিদেশী ভাবাদর্শের মোহ থেকে মুক্ত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব, এক যুগের অবসান ও অন্য যুগের সূচনা করে। কল্পনা ও ভাববিলাস থেকে মনন-চত্বরে উত্তরণই তাঁর আবির্ভাবের প্রধান ফলশ্রুতি। আত্মনির্ভরতার মূলমন্ত্র 'হিন্দু মেলা' প্রচার করলেও, তার আদর্শচেতনা ও চিন্তা অনেকাংশে আবেগমুখর, কল্পনাশ্রয়ী ও পৌরাণিক তথ্যনির্ভর ছিল। মহাভারতের উপাখ্যানের মধ্যে যে অলোকসামান্য ক্ষাত্রবীর্যের কীর্তিগাথা আছে, তারই আদর্শে বাঙ্গালীর স্বদেশাভিমান জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। আধুনিক ঐতিহাসিক চিন্তা ও প্রমাণসম্মত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের স্বদেশপ্রীতির সৌধ নির্মিত হয়নি। যদিও 'হিন্দু মেলা'র উদ্যোক্তাগণ ভারতচেতনা ও ইতিহাসচেতনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। ইতালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম, আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ আন্দোলন, ম্যাৎসিনী, গ্যারিবল্ডী ও কাভুরের স্বদেশপ্রীতির পথ ও মত তাঁদের অজানা ছিল না। তবুও তাঁদের বক্তৃতায় ও সঙ্গীতে সমকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাস চিন্তা ও অনুধাবনতার কোন ছাপ নেই। সুরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি ও চেতনাবোধের ভিত্তিতে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তাকে পরিচালিত করেন। এর ফলে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্ষিপ্র গতিবেগ অর্জন করে। তবে, 'প্রদীপ জ্বালানোর পূর্বে সল্তে পাকানোর' একটি পর্ব থাকে। সুরেন্দ্রনাথের কর্মশক্তি যে দৃপ্ত পৌরুষ-মর্যাদা লাভ করেছিল, তার মূলে ছিল 'হিন্দু মেলা'র একনিষ্ঠ সাধনা এবং সংগঠনী প্রস্তাব

সমূহের কার্যকরী বিশ্লেষণ ও কর্মতৎপরতা। তাঁর 'ভারত সভা' ও পরবর্তীকালে 'কংগ্রেস'—'হিন্দু মেলার'ই সার্থক পরিণত রূপ।

সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য ছিল, বাঙ্গালীকে বিশ্বমুখী করা। তাঁর কথায় ও কর্মে ইতিহাসের বিচার ও বিশ্লেষণ একমাত্র আলোচ্য হিসাবে স্থান পেয়েছে। তিনি ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমির সঙ্গে স্বদেশের আন্দোলনের এক সরাসরি মানস-সংযোগ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তার জন্য তিনি ইতালীর মুক্তি-সংগ্রামের বিভিন্ন তথ্য ও দেশপ্রীতির বিচিত্র কাহিনী পরিবেশন করেন পরম আগ্রহে। তাঁর 'ম্যাৎসিনী ও যুবক ইতালী' (Mazzini and Young Italy) সম্পর্কীয় বক্তৃতা তৎকালীন বাঙ্গালী যুবকদের বিশেষভাবে আলোড়িত করে। তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ম্যাৎসিনী জীবনচরিত পাঠ করতে শুরু করেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, গ্যারিবল্ডী ও ম্যাৎসিনীর জীবনী বঙ্গানুবাদ করেন। বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে যাঁরা সুরেন্দ্রনাথের চিত্ত-জাগরণী বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত হন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ), ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিনচন্দ্র পাল এ বিষয়ে তাঁর ইংরেজি আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

"We saw or imagined a great similitude between the position of the Italians under Austrian domination and our own position under British rule.···these things working upon our youthful imagination created a profound sympathy in us with the struggle for national freedom in Italy led by Mazzini when the story was presented to us by Surendra Nath. We commenced to read the writings of Mazzini and the history of the Young Italy movement"[৩২]

যে পথে হাঙ্গেরী, ইতালি, আয়ারল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিল, বাঙ্গালী যুবকেরা সেই সমস্ত দেশের দৃষ্টান্ত অনুকরণ ও অনুসরণ করেছিলেন অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে। ম্যাৎসিনীর 'কার্বোনারী সভা'র অনুকরণে বাঙ্গলাদেশে কিছু কিছু গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ীতে রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মনায়কত্বে

৩২ Memories of My Life and Times : B. C. Pal ; p. 246.

দেশোদ্ধারের নিয়ম-নীতি অনুশীলনের উদ্দেশ্যে 'সঞ্জীবনী সভা' বা 'হাঞ্চু পামু হাফ' স্থাপিত হয়েছিল। তবে কোন অহেতুক রক্তপাত অথবা প্রাণনাশের পরিকল্পনা এতে স্থান পায়নি।

সুরেন্দ্রনাথ সমস্ত কর্মকে নিয়ন্ত্রিত ও সুচারুভাবে পরিচালনার প্রয়োজনে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও জাষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র 'বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েসন্' নামে এক রাজনৈতিক সভা স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। সুরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল. স্বায়ত্ত শাসনের মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবাসীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। তিনি যুগের আবহাওয়ার গতিবেগ লক্ষ্য করে নামকরণ করলেন, 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন্' বা 'ভারত সভা'। সমস্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করাই ছিল এই সংসদের প্রধান উদ্দেশ্য। 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র মুক্তি উপাসকেরা 'ভারত সভা'তে যোগদান করলেন। এইভাবে ধর্ম-সমাজ-রাজনীতির এক বেণীবন্ধন হল।

ভারত সভা বা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন্ (১৮৭৬):

শিবনাথ শাস্ত্রী 'ভারত সভা' স্থাপনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে স্বীয় আত্মচরিতে লিখেছেন,

"যখন ব্রাহ্ম সমাজে ··আন্দোলন চলিতেছে (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্ব্বে) তখন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি আর এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহন বাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতেই আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোন রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষের কর্ম্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। ··যখন একটি সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল তখন একদিন আনন্দমোহন বাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল।"৩৩

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে 'অ্যালবার্ট হলে' এক বিরাট জনসমাবেশে

৩৩ আত্মচরিত; শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ২০৫।

'ভারত সভা' স্থাপিত হয়। 'সমিতি'র কর্মসূচীতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রধান ছিল :

(ক) বলিষ্ঠ জনমত গঠন।

(খ) সাধারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় চেতনার উদ্ধার ও উপস্থাপন।

(গ) বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে গণ-সংযোগ স্থাপন।

দেশের সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিক বিচিন্তাতে দীক্ষিত করার গুরু কর্তব্য বহন করেছিল 'ভারত সভা'। সমকালে বাঙ্গলাদেশে যে সব 'রায়ত সমিতি' গড়ে উঠেছিল, 'ভারত সভা' প্রত্যেকটির পরিচালন দায়িত্ব গ্রহণ করে। আসামের কুলীদের দুঃখ-দুর্দশাকে কেন্দ্র করে 'ভারত সভা' গণ-আন্দোলন সুরু করে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারী, তদানীন্তন ভারতসচিব সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স ২১ বৎসর থেকে কমিয়ে ১৯ বৎসর করলেন। 'ভারত সভা' এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সুরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষব্যাপী এক সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে উত্তর ভারত পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রমণ করলেন দক্ষিণভারত। এই রাজনৈতিক যাত্রার ফলে ভারতের এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ জাতীয়-চেতনা গড়ে উঠেছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ভারত পর্যটনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লিখেছিলেন,

"The true aim and purpose of the Civil Service agitation was the awakening of a spirit of unity and solidarity among the people of India."[৩৪]

সর্বভারতীয় রাষ্ট্রিকচেতনা বিস্তারে সুরেন্দ্রনাথের ভারত ভ্রমণ এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। ভারতবর্ষে যুগে যুগে অনেক ধর্মপ্রাণ মনীষী প্রেম ও মৈত্রী আদর্শ প্রচারের জন্য 'ধর্মযাত্রা' করেছিলেন; কিন্তু কেউ সুরেন্দ্রনাথের পূর্বে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে, দেশবাসীর চিত্তে ঐক্যভাবনা জাগিয়ে তোলবার জন্য ভ্রমণ করেননি। সুরেন্দ্রনাথই ভারতবর্ষে

৩৪ A Nation in Making : S. N. Banerjee ; p. 94.

সর্বপ্রথম 'পলিটিক্যাল' যাত্রার প্রবর্তক। মুখ্যতঃ তাঁর চেষ্টাতেই অখণ্ড ভারতচেতনা ও সর্বভারতীয় ঐক্যবন্ধনের অনুভূতি জেগে উঠে। কালক্রমে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর কলকাতার 'অ্যালবার্ট হলে' 'ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স' বসেছিল। প্রথমদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন রামতনু লাহিড়ী এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে, কালীমোহন দাস ও অন্নদাচরণ খাস্তগীর। ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে নানা প্রতিনিধি এই তিন দিনের অধিবেশনে যোগ দেন। সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা-পরিষদ গঠন, সাধারণ কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, সিভিল সার্ভিস বা অন্যান্য রাজপদে অধিক পরিমাণে ভারতীয় নিয়োগ, অস্ত্র আইন রহিতকরণ ও জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন। এই সভায় আনন্দমোহন বসু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন,

"It was the first stage towards a National Parliament "[৩৫]

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় ভারত পর্যটন করেন। ভারতবর্ষব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবার উদ্দেশ্যে 'জাতীয় ধনভাণ্ডার' স্থাপনের উপর তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁর এই সমস্ত স্বাদেশিক হিতবাদী কর্মের জন্য ভারতে যে ঐক্যবদ্ধ স্বদেশচিন্তার জোয়ার এসেছিল, তার উল্লেখ করে, তদানীন্তন সিভিলিয়ান, হেন্‌রী কটন, 'নিউ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছিলেন,

"The educated classes are the voice and brain of the country. The Bengalee Baboo now role public opinion from Peshwar to Chittagong · A quarter of a century ago there was no trace of this : the idea of any Bengalee influence in the Punjab would have been a conception incredible to Lord Lawrence, to a Montgomery, or a Macleod ; yet it is the case that during the past year, the tour of a Bengali lecturer, lecturing in English in Upper India, assumed the character of a triumphant progress ; and at the present moment the name of Surendra Nath Banerjee excites as much

৩৫ Memories of My Life and Times : B. C. Pal; p. 436.

enthusiasm among the rising generation of Multan as in Dacca."৩৬

সুরেন্দ্র-প্রশস্তির সঙ্গে, ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার দাবির সাধনার যে বোধন সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয়েছিল, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রেখে উদ্ধৃতিটির মূল্য বিচার করতে হবে। ইংরেজ সরকার জনগণের কোন দাবিকে মেনে নিতে চাইলেন না। শুরু হল নির্য্যাতন। অস্ত্র আইন, প্রেস আইন বিধিবদ্ধ করে জাতির ঊর্মিমুখর চিন্তাকে স্তব্ধ করে দিতে চাইলেন তাঁরা। কিন্তু বাঙ্গালীও বৈতসীবৃত্তি গ্রহণ করল না; সংবাদপত্রকে আশ্রয় করে হয়ে উঠল দুর্বার ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ও গণআন্দোলন

৫

১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় জাগরণ বিশেষ স্মরণীয় হয়ে উঠল। ১৮৭৮ সালে ইংরেজ সরকার আফগানিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন; আর তাই নিয়ে ভারতে দেখা দিল ভীষণ আলোড়ন। এর আগে ১৮৭৭ সালে দক্ষিণ ভারতে, ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রায় ৫২ লক্ষ লোকের জীবননাশ ঘটে। দেশবাসীর এই মহাসঙ্কটে ইংরেজ সরকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তদানীন্তন সরকারের ত্রাণ তহবিলে রাখা টাকা আফগানিস্থানে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যয় করা হয়। বিদেশী সরকারের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে সমালোচনা শুরু করে দেয়। বাঙ্গলা দেশের সংবাদপত্রগুলি ছিল এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী*। সংবাদপত্রে বিদেশী সরকারের শাসননীতি ও কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা শুরু হলে শাসক সম্প্রদায় ক্রোধে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। ভারতবাসীর ক্রমবর্দ্ধমান সংহতি ইংরেজদের রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছিল;

৩৬ New India: Henry Cotton, p. 51.

* "One of the most interesting by paths in the history of British India is the study of the evolution of the press, and particularly that portion of which is Indian owned.……From 1860 downwards there is a steadily growing interest in politics. During the late 1870's this development

তাই তাঁরা অত্যন্ত হীনভাবে দেশবাসীর সকল কর্মতৎপরতার মূলে আঘাত হানলেন। কুখ্যাত Arms Act বা 'অস্ত্র আইন' এবং Vernacular Press Act বা 'দেশীয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন' বিধিবদ্ধ করে তাঁরা ভারতবাসীর কণ্ঠরোধ করলেন। জন-অহিতকারী আইনদ্বয় শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আরও ইংরেজ বিদ্বেষী করে তুলল। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াল অসহনীয়। বিপিনচন্দ্র পাল এ বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেন,

"The Vernacular Press Act was not the only retrograde and unpopular measure of Lord Lytton's Government. Next year, 1878, the Arms Act was passed aiming at the wholesale emasculation of the Indian subjects of the British Queen. Like the Vernacular Press Act, the Arms Act was also a discriminating measure. Not only the British subjects in India but the subjects of every foreign State temporarily or permanently residing in India were exempted from the operation of this Act. The Hottentot and the Zulu could carry arms while walking along the streets of Calcutta or Bombay, but the native Indian subject of the British Government could not do so. Even more than the Vernacular Press Act this Arms Act wounded our national self-respect. And the feeling of resentment against it was, though not so vocal, much wider than that aroused by the Vernacular Press Act. By these measures Lord Lytton

---

flared up suddenly into an anti-government propaganda of strangely modern type. The Second Afgan war, for example, was the occasion of a very outspoken criticism of the British Government, particularly in Bengal, and this in itself marked the end of the period when the Indian acquisced without question into the doings of their omnipotent rulers. (Vide : Lord Irwin's article on 'Evolution of Political life in India 1832-1932' in 'Political India' : edited by John Cummings, Oxford 1932.)

instead of reconciling the new political consciousness in the country to British rule, which was certainly not difficult at that early stage, helped to create and strengthen a new anti-British feeling among our people."[৩৭]

সরকারী সমালোচনায় যে সমস্ত পত্রিকা মুখর হয়ে উঠেছিল তাদের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, 'সমাজ দর্পণ,' 'সাধারণী,' 'হিন্দু হিতৈষী', 'সুলভ সমাচার', 'প্রতিকার', 'বিশ্বদূত', 'ঢাকা প্রকাশ', 'ভারত মিহির', 'নব বিভাকর' ও 'সোমপ্রকাশ'। 'অমৃত-বাজার' রাতারাতি ইংরেজি হয়ে যায়। 'অস্ত্র আইন' পাশ বাঙ্গালীকে পরাধীনতার নিষ্করুণ আত্মগ্লানিতে কি রকম ধিকৃত করেছিল, আত্মজীবনীর পাতায় স্বাধীনতার মুক্তি সেনানী বিপিনচন্দ্র পালের নিঃসঙ্কোচ স্বীকৃতির মধ্যে তা ধরা পড়েছে। 'ভারত সভা' ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে জনমত গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে কলকাতার 'টাউন হলে' এক বিরাট জনসভার আয়োজন করেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিশাল জনসমাবেশের সামনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বক্তৃতা দেন ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কে. এম. ম্যাকডোণ্ডাল্ড, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাসবিহারী ঘোষ। ইংলণ্ডে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে প্রবাসী বাঙ্গালীরা 'সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ' ও 'অস্ত্র আইন' প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। 'ভারত সভা'র প্রতিবাদকে সমস্ত ভারতবর্ষ সমর্থন জানায়। কাণপুর, এলাহাবাদ, নাগপুরের 'ভারত সভা'র শাখাগুলি এবং বরিশাল, বগুড়া, মৈমন সিংহ, কাঁথি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সমর্থনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে। 'ভারত সভা' বৃটিশ পার্লামেণ্টেও আইন ত্রুটির বিরুদ্ধে আপীল করে। অবশ্য তাঁরা এই আবেদনকে কোন গুরুত্ব দেননি। সোমপ্রকাশ 'ভারতের দুঃখ সংগীত' নামে প্রকাশিত একটি গীতে বাঙ্গালীর মনের অবস্থা ও কাতরতার কথা ব্যক্ত করে লেখে,

৩৭ Memories of My Life and Times : B. C. Pal ; p. 294.

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা

(আস্থায়ী)

"কোথা হে বিধাতা জগতের পিতা
মনোদুখ আজ জানাব তোমায়।
তোমা বিনে আর কে আছে আমার
মনোব্যথা আর দেখাব কাহায় ?

(অন্তরা)

হৃদি চিরে আজ দেখাব সকল,
অন্তরেতে তার জ্বলে যে অনল,
দহিতেছে পিতা হৃদি অধস্তন,
দয়া করে কবে নিবাবে গো তায় ?
কাঙ্গালিনী আমি অতি অভাগিনী
তনয়া তোমার চির পরাধিনী,
দুখ বই আর সুখ নাহি জানি,
কেন বা বিধাতঃ ! সৃজিলে আমায়।
মনে মনে কত পুষি আশা পাখী,
হৃদয় পিঞ্জরে সমাদরে রাখি
শেষে সেই পাখী দিয়ে মোরে ফাঁকি
গহন কাননে উড়িয়ে পলায়।"[৩৮]

বাঙ্গালীর মনোবেদনার অন্তরালে এক সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়চেতনা ও স্বাদেশিক বোধ ঘন হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ সরকার এ সকল প্রতিবাদকে প্রকাশ্য রাজবিদ্রোহ বলে চিহ্নিত করলেও, বাঙ্গালী যে প্রকৃত স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠেছিল, ব্রিটিশ রাজনৈতিক সমালোচক স্বায়োএন ব্লান্ট, তা অস্বীকার করতে পারেননি।

"The condition of Indian things at the time of Lord Ripon's Viceroyalty was in truth the awakening hour of the new India, the dawn of that day of unrest which is the necessary prelude to full self-assertion in every subject land."[৩৯]

৩৮ সোমপ্রকাশ : ১৮ই ভাদ্র, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।

৩৯ দ্রঃ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া : প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ. ৯২।

ভারতবাসীর স্বাদেশিক জাগরণের ইতিবৃত্ত লর্ড রিপণের বিবরণীতেও অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে। বিলাতে ভারত সচিবের কাছে পাঠানো এক স্মারকলিপিতে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

"None, who watched the signs of the times in this country with even moderate care, can doubt that we have entered a period of change; the spread of education, the existing and increasing influence of free press, the substitution of legal for discretionary administration, the progress of railways, the telegraphs etc, and the more ready influx of European ideas are beginning to produce a marked effect on the people, new ideas are springing up, new aspirations are called forth, the power of public opinion is growing and strengthening from day to day, and a movement has begun which will advance with greater rapidity and force every year."[৪০]

বাঙ্গালী-মানস যে সম্পূর্ণভাবে স্বাধিকারকামী হয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে তাদের কোন উপায়ে ক্ষান্ত করা যাবে না, এই দিকেই লর্ড রিপণ অঙ্গুলি নির্দেশ করে সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ করেছিলেন।

ইলবার্ট বিল (১৮৮৩-৮৪)

৬

লর্ড রিপণের শাসনকালে 'ইলবার্ট বিল'কে কেন্দ্র করে বাঙ্গলা দেশে পুনরায় এক রাজনৈতিক ঝটিকা প্রবাহিত হয়। তাঁর আইন সচিব স্যার কোর্টনে ইলবার্ট বিচার বিভাগে বর্ণ বৈষম্য দূর করতে তৎপর হন। তখন দেশীয় বিচারকেরা শ্বেতাঙ্গ আসামীদের বিচার করতে পারতেন না। এই অমানবিক নিয়মের অবসানের জন্য তিনি 'Jurisdiction Bill' রচনা করে

৪০ The Life of the First Marquess of Ripon : Lucien Wolf ; p. 92.

আইনে পরিণত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদে পেশ করেন। সমস্ত ইঙ্গ সমাজ বিষয়টিকে তাঁদের জাতীয় অপমান হিসাবে গ্রহণ করে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য 'Defence Association' নামে একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন। ইংরেজদের সকল কু-ক্রিয়ার সমর্থক 'Englishman' পত্রিকা অত্যন্ত বিদ্বেষভরে লেখেন,

"The only people who have any right to India are the British. Privileges the so-called Indians have, we do not grudge them and for which they ought to be grateful, instead of clamouring for more and abusing the British, if they do not get what they clamour for."[৪১]

'ইলবার্ট বিলে'র বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ বিচারকদের সমর্থন ছিল। পরিশেষে 'Jurisdiction Bill' যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করল, তাতে শিক্ষিত বাঙ্গালী আশাহত বেদনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধিকার আন্দোলনকে দ্রুতগামী করবার প্রয়োজনটুকু অধিকতর ভাবে উপলব্ধি করলেন। সুরেন্দ্রনাথের কথায়,

"The Ilbert Bill controversy helped to intensify the growing feeling of unity among the Indian people. The educated community all over India watched the struggle with interest. There was the Ilbert Bill agitation with all its developments taking place before their eyes. They could not remain insensible to the lesson that it taught of combination and organisation; a lesson· · which in this case was enforced amid conditions that left a rankling sense of humiliation in the mind of educated India. It was, however, fruitful of results. It strengthened the forces that were speeding up the birth of the Congress movement; and as I have observed, before the year was out, the first National Conference was held in Calcutta.·· ···It was the

৪১ Englishman : February, 1882.

reply of educated India to the Ilbert Bill agitation, a resonant blast on their golden triumph."[৪২]

'ইলবার্ট বিল'কে কেন্দ্র করে ভারতবাসীর স্বাদেশিক আদর্শধারার গৌরবময় পরিচিতিটুকু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অক্ষয় লেখনীতে তুলে ধরেছেন। 'ইলবার্ট বিলে'র বিরুদ্ধে, বাঙ্গালীর প্রতিবাদ প্রধানত সংবাদপত্রাশ্রয়ী ছিল। 'ভারত মিহির', 'প্রতিকার', 'সঞ্জীবনী', 'দৈনিক বার্তা', 'ভারত সংস্কারক,' 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাগুলিতে প্রতিবাদের সুর ছিল খুব কড়া। ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ গুপ্তবার্তা বিভাগে (Intelligence Branch) এই পত্রিকাগুলির মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।* বাঙ্গালীর আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষিত অভিমতগুলি সাধ্যমত উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক স্তম্ভের মতামত উদ্ধৃত করে রাখবার সময় তাঁরা নিজেরাই লিখে রেখেছেন যে,

"The editorial extracts of native papers of 1884 very pointedly show how seriously Lord Ripon offended the natives by surrendering to the European Defence Association over the issue of the Ilbert Bill."

'ভারত মিহির' পত্রিকার বক্তব্য যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা হচ্ছে:

"The natives asked for the extension of the system of trial by jury. Englishman can not object to it on any ground. With the fall of the Ilbert Bill, Lord Ripon too has fallen. He has no longer the courage to undertake reforms. Nor can anybody say how far he will succeed if he induces any new measures now. He has shown his weakness to both the natives and Englishmen. He has shown his moral deterioration by refusing to release the prisoners.⋯

৪২ A Nation in Making : S. N. Banerjee ; pp. 85-87.

* Vide: State Committee for compilation of History of Freedom Movement in India. Bengal Region; Report on Native Papers 1884, (Paper No. 43).

Lord Ripon has yet made no effort for the repel of the Arms Act ; for the abolition of the license tax and for the appointment of the natives to high offices. Men hoped that the Ilbert Bill and the Self-Government Bill would make his administration famous, but he has performed the funeral rites of the Ilbert Bill." (April 8, 1884.)

'দৈনিক বার্তা' পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে লেখা আছে,

"Pleading for justice the 'Dainik Varta' of December 24, 1883 commented, 'If the Jury system is to be introduced, introduce it for all alike, until native offenders are granted the privilege of being tried by native jurors the people will not stop. The Europeans have become victorious—their works ends here.'

The people did not stop there. It launched a campaign to make it a popular issue. The paper asked the 250 millions of natives 'to raise a cry.' Because 'experience teaches him that victory is to be gained by out-cry, by bluster, by threats and by showing a rebellious spirit. The people are to act as they are taught. They must be up and doing ; indifference will ruin them."

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রতিবাদ বিচিন্তার রূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"Exposing the indecent character of the Anglo Indian campaign against the Ilbert Bill, the 'Sambad Prabhakar' of December 26, 1883 commented, 'The Anglo Indians attacked the Viceroy, insulted him, abused him, threatened the Government with rebellion and used the worst language to the natives and the Queen's Government grants them privileges much beyond their expectations. Is thus Mr. Gladstone checking the ascendency of the Anglo Indians in India ?"

'সঞ্জীবনী' পত্রিকার বক্তব্য ছিল আরও পরিষ্কার। তাদের সোজাসুজি প্রশ্নের ধরণ ও উত্তর আদায়ের যে রূপটি লিপিবদ্ধ করা আছে, তা হচ্ছে :

"The plea of the rulers that they had abolished race distinction was a myth. Pricking this bubble the 'Sanjivani' of December 29, 1883 commented ; 'No doubt, race distinction amongst judges is removed from Statute Book. But there is no way of throwing dust into the eyes of the people. The native judges and magistrates are given the same powers as the European judges and magistrates. But the native Joint-Magistrates and the native Assistant-Magistrates will remain as inferior to European Joint Magistrates and Assistant Magistrates as before. How beautifully is the race distinction removed ! The hypocrisy of the English is disgraceful. By hook or by crook the natives has been debarred from entering the Civil Service. The chances of the few old native civilians of becoming judges and magistrates are very few indeed. In order to give these two or three men equal powers with the Europeans, 250 millions of natives who are already low in the Imperial eye of the English law, are degraded lower still. If they only had been lowered they would never have complained. But the country will suffer from the oppressive conduct of the English. It would be difficult for the natives to protect their lives from the oppressive conduct of the English. India is the play ground of the English. They satisfy all their whims here. The rights which they do not enjoy in England are given to them in India.'

The editor of the said paper appealed to his countrymen, 'to declare in one voice that they do not want Ilbert Bill in its present form. They should form associations in every

village, and say that they can give their consent to the Bill, only if the natives are granted the right of demanding trial by a jury, the majority of whom will be natives."

কেবল সংবাদপত্রকে আশ্রয় করে নয়, বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যেও 'ইলবার্ট বিলে'র বিক্ষুব্ধ জলধিতরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'নেভার নেভার' নামে কবিতাতে ইংরেজদের উদ্ধত মানসিকতার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই,

"গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান্,
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌শন্ কেশুয়িক মিলার্—
'নেটিভের কাছে খাড়া, নেভার—নেভার!'
'নেভার'—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের 'জানানা'?
বিবিজান্! দেহে প্রাণ কখনো তা হবে না॥
হিপ্, হিপ্, হিপ্, হুরে হ্যাট্ কোট্ বুট্ পরে
সবা ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে?—'নেভার—নেভার'!!"

ইংরেজদের প্রতিরোধস্পৃহা যত দৃঢ় হয়েছিল, বাঙ্গালীর মনোভাব ততই হয়েছিল অনমনীয়। সমগ্র ভারতবর্ষের কঙ্কালসার কাঠামোতে নবজীবনের স্পন্দন 'ইলবার্ট বিল'কে কেন্দ্র করে অনুভূত হয়েছিল। আর এই জাগৃতির প্রাণ-পুরুষ ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ।

সুরেন্দ্রনাথ ও জাতীয় ধনভাণ্ডার

৭

সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকা ছিল 'ভারত সভা'র অন্যতম প্রচার পত্র। সুরেন্দ্রনাথের নিজের কথায়, 'That represented the temper of the Bengalee mind'।[৪৩] রাজনৈতিক মত ও পথকে প্রশস্ত করে এক বাস্তব-বাদী জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলাই 'বেঙ্গলী' পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল।

৪৩ A Nation in Making: S. N. Banerjee; p. 70.

সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আলোচনা কিভাবে দেশবাসীর চিত্তে পরাধীনতার বিরুদ্ধে দাবদাহ ও স্বাধিকার অর্জনের প্রত্যয়নিষ্ঠ বাসনা সৃষ্টি করেছিল, তার পরিচয় আমরা রাজনৈতিক ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে আরও গভীর ও বিশদভাবে জানতে পারি। সুরেন্দ্রনাথ ভারতবাসীর মন ও চিন্তাকে স্বাদেশিকতার অনুরাগে অভিষিক্ত করেছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই সমস্ত ভারতবাসীর স্বাধিকার অর্জনের বাসনা রূপায়িত হয়েছিল। তাই ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ আদালত অবমাননার দায়ে দু'মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে সমস্ত ভারতবর্ষে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। বিশেষভাবে ছাত্র সমাজ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। পরবর্তীকালের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই ছাত্র আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় এক বিরাট জনসভা হয়েছিল। প্রতিবাদ হিসাবে সমস্ত শহরে একদিন হরতাল পালন করা হয়। এই প্রতিবাদ বাঙ্গলাদেশের আকাশসীমা অতিক্রম করে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। অমৃতশহর, ফৈজাবাদ, আগ্রা, লাহোর, ডেরাডুন, মুসৌরী ও পেশোয়ারে প্রতিবাদ-সভা ডাকা হয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা কি রকম নিবিড় ঐক্যবোধ সৃষ্টি করেছিল, সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়। আনন্দমোহন বসু এই বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন,

"It has now been demonstrated by the universal out burst of grief and indignation which the event called forth, that the people of the different Indian provinces have learnt to feel for one another, and that a common bond of unity and fellow-feeling is rapidly being established among them."[88]

কারামুক্তির পর সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে উঠেন। এর কারণ হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন,

"The main object, therefore, is to bring the Government of the country into harmony with national aspirations and in harmony with the declared wishes of the Crown and English people. We want local self-government in

88 Memories of My Life and Times : B. C. Pal ; pp. 435-436

perfection. We are anxious to have provincial self-government. We desire Parliamentary Institution. We desire, in short, to be placed on the same footing as the colonial possessions of the Crown."[8৫]

প্রতি মহকুমাতে জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপনের জন্য তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে চাষী, মজুর, কৃষক প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু 'ভারতবর্ষীয় সভা'র সভ্যগণ সুরেন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দেননি। চারিদিকে স্বাতন্ত্র্যের বেড়া দিয়ে তাঁরা কৌলীন্য রক্ষা করেছিলেন। তাঁদের মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সঙ্গে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার তীব্র বাদানুবাদ হয়েছিল এই সময়ে।

অবশ্য ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যাশনাল কনফারেন্সে'র দ্বিতীয় অধিবেশনে বিভিন্ন গণসমিতির মধ্যে বিবাদ দূর হয়ে যায়। এই জাতীয় সম্মেলনে, 'ভারতবর্ষীয় সভা', 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন', 'সেণ্ট্রাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েসন্' সকলেই যোগদান করে। ভারতবর্ষে 'জাতীয় কংগ্রেসে'র জন্ম প্রকৃতপক্ষে 'ন্যাশনাল-কনফারেন্সে'র আলোচনা-ভূমিতেই হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বলেন,

"The moral transformation which was to usher in the Congress movement had thus already its birth in the bosom of the Indian National Conference which met in Calcutta and to which representatives from all parts of India were invited."[8৬]

বোম্বাই প্রদেশে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'কংগ্রেসে'র প্রথম অধিবেশনে (১৮৮৫) 'ন্যাশনাল কনফারেন্সে'র কর্মসূচী অনুসরণ করা হয়েছিল। নতুন কোন ভাবোদ্দীপক উন্মাদনা এই রাজনৈতিক অধিবেশনে প্রকাশ পায়নি। দীর্ঘকালের রাজনৈতিক সাধনা বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধকে যে পরিমাণে উদ্বেল করেছিল; সেই তুলনায় ভারতের অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের স্বদেশচিন্তা ও জাগরণ ছিল বহুলাংশে অস্পষ্ট ও শিথিল। এই সত্যটুকু তদানীন্তন কালের জাতীয়-হিতবাদী নেতারা মনে-প্রাণে উপলব্ধি

8৫ A Nation in Making : S. N. Banerjee ; p. 88.

8৬ Ibid ; p. 98.

করেছিলেন। সেজন্য 'জাতীয় কংগ্রেসে'র দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল কলকাতায়। দাদাভাই নৌরজী এতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেই সময়কার বাঙ্গলা দেশের জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিচয়টুকু 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাতে বাণীবদ্ধ হয়ে আছে।

"জাতীয় সভার সৃষ্টি দিবসে বোম্বাই নগরে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল বটে, কিন্তু জাতীয় সভার দ্বিতীয় বৎসরে কলিকাতা মহানগরীতে যে অপূর্ব দৃশ্য ভারতবাসীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বোম্বাই সভা স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। ভারতবাসী যা স্বপ্ন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, গত ২৬ শে ডিসেম্বর রাত্রি প্রভাত হইলে, চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন সে স্বপ্ন নহে প্রকৃত ঘটনা। কলিকাতার রাজপথ ভারতবর্ষের সমগ্র জাতিতে পরিপূর্ণ, ঘোর কলরবে দিগ্‌দিগন্তর প্রকম্পিত, লক্ষ লক্ষ ধনী-মানী, দীন-দরিদ্র, রাজা-প্রজায় রাজপথ অবরুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন, শকটে শকটে কলিকাতার বক্ষ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আশায় উৎসাহে উৎফুল্ল নেত্রে উর্দ্ধমুখে প্রাণের আবেগে ভারতবাসী লক্ষ লক্ষ প্রজা কোন্ ঐশী বলে বলীয়ান হইয়া একযোগে একপন্থার পথিক হইয়া যেন কোন্ অপূর্ব জগতে গমন করিতেছেন। পশ্চাতে কেহ ফিরিয়া দেখেন না, সম্মুখে কেহ কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করেন না, এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রী, পার্শী, পাঞ্জাবী সকল জাতির প্রতিনিধিগণ বাঙ্গালীর সহিত মিলিত হইয়া জাতীয় সভায় গমন করিতেছেন।"[৪৭]

জাতীয় জাগৃতির যে কল্লোলোচ্ছ্বাস সেদিন বাঙ্গলা দেশে নব প্রভাতের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গিয়েছিল, তার পশ্চাতে ছিল সুচির শর্বরীর একনিষ্ঠ তপস্যা। রামমোহন 'ব্রহ্মসভা'র মধ্য দিয়ে ভারতবাসীকে সর্বপ্রথম বন্ধনমুক্তির বাসনায় অভিষিক্ত করেন। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর স্বাধিকার চিন্তার প্রসার ঘটে। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক কর্মচেতনার ভিত্তিভূমি ছিল তার সংস্কার সাধনা। 'হিন্দু মেলার' ধর্ম-সমাজ ও রাজনীতির বিশ্লেষণী পর্যালোচনা ও দেশবাসীকে সর্ব বিষয়ে স্বাবলম্বী করার প্রয়াসের মধ্যে বাঙ্গালীর স্বাদেশিক সাধনার প্রথম সাফল্য রূপ দেখা যায়। এই জাতীয় মেলাতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছিল বলেই, পরবর্তীকালে

৪৭ সোমপ্রকাশ: ২০শে পৌষ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।

'ভারত সভা' ও 'জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর স্বাদেশিকতা ও স্বাধিকার অর্জনের রাজপথ প্রশস্ত হয়েছিল। আর এই সরণী নির্মাণ করেন শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়। একথা ঐতিহাসিক সত্য—বাঙ্গালীর নিছক আত্মশ্লাঘা নয়।

বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে স্বদেশচিন্তার প্রসার।

৮

রাজনীতি স্বাদেশিকতার প্রধান মত ও পথ হলেও, স্বাদেশিকতার অর্থ কেবল রাজনীতির অনুশীলন নয়। যখন কোন ভাব ও চিন্তা জাতির ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চত্বরে এসে উপস্থিত হয়, তখনই হয় স্বাদেশিকতার জাগৃতি ও বিকাশ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার প্রধান কথা ছিল জাতিভেদ ও সামাজিক বৈষম্য দূর করে সম্পূর্ণ মানবিক বেদীতে মনুষ্যত্বের নবমূল্যায়ন। জ্ঞান ও কর্মের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা সে যুগে কেবল রাজনৈতিক চত্বরে নয়; বাঙ্গালীর জীবনচিন্তার বিস্তীর্ণ পথ ধরে সর্বক্ষেত্রে এর বোধন শুরু হয়েছিল। তাই ধর্মসংস্কারে, শিক্ষাপ্রসারে, সাংবাদিকতায় ও সাহিত্য বিচিন্তাতে সেই একই কর্মানুভাবনার বিভিন্ন রূপ দেখি। বাঙ্গলার শিক্ষিত-সমাজে স্বাধীনতা অর্জনের যে আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সক্রিয় হয়েছিল; 'ব্রাহ্ম সমাজ' জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকে সার্থকরূপে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হন। তাঁদের মানবিক চেতনার উদ্বোধন, বুদ্ধির পুনরুজ্জীবন ও বাস্তব জীবন প্রতীতি এবং স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম; এ পর্যায়ে এক স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে আত্মবিস্মৃতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করলেও, তিনি সামাজিক বিভেদ অক্ষুণ্ণ রেখে রাজনৈতিক চিন্তা-বৈষম্য দূর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের, 'এক ধর্ম—এক সত্য—এক সমাজনীতি' দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাদর্শকে সমর্থন করেনি। তাঁর কর্ম-চিন্তার মূলকথা ছিল, সনাতন মানবতার আদর্শ প্রচার, ভারতচেতনার শুভ উদ্বোধন এবং জাতির জীবনের সকল স্তরে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রসার। এই গণতান্ত্রিক চেতনার উদ্বোধনই কেশবচন্দ্রের স্বাদেশিকতার বেদীমূলে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। কেশবচন্দ্র

সকল ধর্মের মানুষকে মনুষ্যত্বের আদর্শে গ্রহণ করেন ; বিশেষ কোন ধর্মের প্রতীক হিসাবে নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সংস্কারমুক্ত একটি মানবসমাজ সংগঠন। তিনি মানবজাতিকে ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে বরণ করেছিলেন। সমস্ত ধর্মের সারসত্য গ্রহণ করে যে বিশ্বধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা কেশবচন্দ্র করেছিলেন, তাই দেশবাসীর 'নেশন' তত্ত্ব গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল, শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করতে হলে সর্বাগ্রে মানবের বর্ণ ও ধর্মগত বৈষম্য দূর করতে হবে। ফলে, ব্রহ্মানন্দের সাম্য ও স্বাধীনতার মূলমন্ত্র মানুষের সর্বক্ষেত্রে মুক্তি-সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চারিত হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' প্রচারের সারসত্য এই স্তরেই নিহিত আছে। এমন কি পরবর্তীকালের 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র সদস্যরা যে সাংবিধানিক উপায়ে ধর্ম ও সমাজের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁরাও কেশবচন্দ্রের জ্ঞানময় জীবনের যুক্তিবাদ্ ও কর্মময় জীবনের মানবহিতবাদকে অস্বীকার করতে পারেননি। এরই জন্য তাঁদের রাষ্ট্রনীতির সর্বস্তরে সাম্য ও মৈত্রীভাবনা অনুসৃত হয়েছিল। 'ভারত সভা'র সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'ভুক্ত। তাঁরা ভক্তিবাদ, বিবেকবাণী, সহজবুদ্ধি ও বিজ্ঞানচিন্তাকে সমন্বিত করে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা ও স্বাদেশিক ভাবধারা প্রচার করেছিলেন। তাঁদের গণতান্ত্রিক সংস্কার-চিন্তার মধ্যে জাতির আত্মশক্তি ও আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারের যে সাধনা চলেছিল, রাষ্ট্রগঠনাদর্শে তাকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এইভাবে দেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবধারার এক স্বাভাবিক সমন্বয় ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা, ধর্ম-জ্ঞান-ভক্তি ত্রয়ী আদর্শের সঙ্গে গীতার নিষ্কাম কর্মচিন্তার সমন্বয় ঘটিয়ে বাঙ্গালীর স্বাদেশিকতাবোধে এক নতুন জোয়ার আনে। তিনি সমস্ত জীবন ধরে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ অনুসন্ধান করেছেন। মনুষ্যত্ব সাধনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বজাতির দেশপ্রীতির শুভ উদ্বোধন চেয়েছিলেন। তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' 'গীতার ব্যাখ্যা', ও 'ধর্মতত্ত্ব' সমস্ত কিছুর মধ্যে মানবধর্মকে ব্যাখ্যা করে স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর সাহিত্য সাধনার বৈশিষ্ট্য—স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা। দেশবাসীর স্বার্থে তিনি জাতির অতীত ইতিহাস ও গৌরবগাথাকে উদ্ধার করে যুক্তি ও মননে উপস্থাপিত করেন। বাঙ্গালীকে সর্ব বিষয়ে

স্বদেশানুরাগী করবার ব্রত নিয়েছিল, তাঁর 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা। এই পত্রিকা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছিলেন,

"The generation of Bengalee youths to which I belonged came, however, in more direct contact with the 'Bangadarshan' than with the 'Tattabodhini' School. The 'Tattabodhini' was a bit too serious and learned for our youthful minds; while the 'Bangadarshan', with its fictions and poetry and satire as well as historical and social essays, appealed more powerfully to us."[৪৮]

দেশবাসীর প্রকৃত মঙ্গল ও উন্নতি সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল,

"বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্, এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই।...

সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"[৪৯]

৪৮ Memories of My Life and Times: B. C. Pal; p 227.

৪৯ বঙ্গদর্শন: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ১০ই কার্ত্তিক, ১৮৮০।

বঙ্কিমচন্দ্র 'সাধারণী' পত্রিকাতে 'জাতিবৈর' প্রবন্ধে শাসক শাসিতের সম্পর্ক নির্ণয় করে লেখেন,

"মানুষের স্বভাবই এমন নহে যে বিজিত হইয়া জেতার প্রতি ভক্তিমান হয়, অথবা তাহাদিগকে হিতাভিলাষী নিস্পৃহ মনে করে এবং জেতাও কখনই বল প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতে পারে না। কেননা আমরা প্রাচীন জাতি, অদ্যাপিও মহাভারত, রামায়ণ পড়ি, মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতে অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যতদিন এ সব বিস্মৃত হইতে না পারিব, ততদিন বিনীত হইতে পারিব না, মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতিবৈর আমাদের প্রকৃত অবস্থার ফল—যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, যতদিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ব গৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতিবৈরের শমতার সম্ভাবনা নাই। এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরাজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই থাকে।"[৫০]

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে দেশমাতৃকার চিন্ময়ী রূপটি প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। দেশমাতৃকা 'কি ছিলেন, কি হইয়াছেন' রূপ বর্ণনা করে তিনি লেখেন,

"চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু-বিমর্দ্দিত বীরজন কেশরী শত্রু-নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব ··আমি সেই কালস্রোতমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা! ··এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভূজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি।" ('আমার দুর্গোৎসব,' কমলাকান্তের দপ্তর)।

বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপের উগ্র জাতীয়তাবাদকে কখনও সমর্থন জানাননি। তবে পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক মতবাদ, আস্তিক্যবাদী চিন্তা ও মানব হিতাদর্শের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল সুগভীর। 'লক্', 'হিউম' 'কোঁত'-এর নব্যদর্শনকে তিনি গ্রহণ করেন তত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে। 'রুশো'

৫০ সাধারণী: ১১ই কার্তিক, ১৮৮০

ও 'মিল'-এর মতাদর্শে তাঁর সাম্যচিন্তা গড়ে উঠেছিল। সাম্যবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

"সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য্য এই যে, সামাজিক বৈষম্য, নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর। যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থাগুলির সংশোধন না হইলে, মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি নাই।...তুমি যে উচ্চ কুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে; অন্য যে নীচ কুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার।" (সাম্য)

সাধারণ মানুষের শ্রীবৃদ্ধিতেই বঙ্কিমচন্দ্র দেশের প্রকৃত মঙ্গল ও উন্নতি উপলব্ধি করেছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। তিনি বলেন,

"এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয়গান করিব না।" (বঙ্গদেশের কৃষক)

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্য সম্পর্কে তিনি লেখেন,

"বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত হৃদ্যতা শূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব্ব থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু—ফারসী চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল—ভাষার একতা।"[৫১]

বাঙ্গালীর সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সমাজে সাম্য এবং বিভেদহীন ঐক্য-নীতি প্রচার করে দেশ সংগঠনের মহান্ কর্তব্য পালন করেছিলেন। ধর্ম বৈষম্যের ফলে ভারতে যে সামাজিক বৈষম্য এবং অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে যে একদেশদর্শিতা, তা কিভাবে দেশবাসীর মঙ্গলের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে, সে বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠাতে লিখেছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বাঙ্গালীর মনে এক গণতান্ত্রিক

৫১ বঙ্গদর্শন: ভাদ্র, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।

চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও দেশাত্মবোধক উপন্যাসগুলি যেন স্বাদেশিকতার স্বর্ণ-ভাণ্ডার। স্বদেশপ্রেমের মহান্ তাগিদেই তিনি এই উপন্যাসগুলি রচনা করেছিলেন। ত্যাগ, প্রেম ও কর্মের সমন্বয়ে স্বদেশ উদ্ধারের পথ তিনি উপন্যাসগুলিতে দেখিয়েছেন। বিশেষভাবে তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ছিল স্বদেশপ্রেমের সংহিতা। রাষ্ট্রিক সাধনাতে দেশবাসীকে রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে অধ্যাত্ম-তপস্যাতেও সফল হতে হবে, এই উচ্চাদর্শ তিনি 'আনন্দমঠে'র মধ্যে প্রচার করেছিলেন। তাঁর 'বন্দেমাতরম্' ছিল স্বদেশপ্রেমিক দেশবাসীর জীবন-সঙ্গীত। ভারতের সনাতন নীতি ও সত্য সাধনাকে আধুনিক যুগচিন্তার মননালোকে বিচার করে তিনি আপন স্বাদেশিকতার মতাদর্শ বিভিন্ন ধরনের লেখার মধ্যে প্রচার করেছিলেন। দেশোদ্ধারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মত ও পথ 'স্বদেশী আন্দোলন' ও পরবর্তী-কালে রাষ্ট্রীয় চিন্তাদর্শে গভীর ভাবাবেগ ও আলোড়নের সৃষ্টি করে। ইংরেজ সরকার 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের উপর আইনগত নিষেধাজ্ঞা জারি করে সঙ্গীতটির প্রাণশক্তি হরণের এক ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপন্যাস ও আখ্যায়িকার মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধ প্রচার করেন। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' তিনি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ধর্ম ও সমাজনীতি, অর্থনৈতিক বণ্টনে সমতা' বিধান প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে এক মননগর্ভ আলোচনা করেন। হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের সকলেই এক দেশমাতৃকার সন্তান, সঙ্ঘবদ্ধতাই জাতির একমাত্র সংবিধান, এই মতাদর্শই ছিল ভূদেবের উদারনৈতিক চিন্তার বিশেষ রূপ। জাতীয় ঐক্যের কথাপ্রসঙ্গে তিনি লেখেন,

"হিন্দু মুসলমান দুই ভাই, উভয়ে যখন একদেশবাসী, একই মাতৃস্তন্যে উভয়ে পুষ্ট, ফলত উহারা দুধ ভাই।"৫২

ইংরেজদের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়ম-নীতিকে ব্যঙ্গ করে লেখেন,

"বিড়াল পাতের নিকটে থাকুক, মেও মেও করুক, মাছের কাঁটা খাক—কিন্তু সিভিল সার্ভিসের দিকে হাত বাড়ালেই চপেটাঘাত।"৫৩

ভূদেবের স্বদেশচিন্তা প্রচারের অন্যতম সহায়ক ছিল, 'এডুকেশন গেজেট'। বাঙ্গালীর মনে দেশপ্রেমের দীপকরাগ উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে

৫২ ভূদেব চরিত (১ম ভাগ): কুমারদেব মুখোপাধ্যায়; পৃ. ১৪৪

৫৩ ঐ পৃ. ৩০৮

তিনি এই পত্রিকায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত সংগীত' কবিতাটি মুদ্রিত করেছিলেন। এই কবিতাটিকে কেন্দ্র করে দেশে আত্মজাগরণের উষ্ণস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। ভূদেবকে এই কাজের জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীতে'র প্রভাবের কথা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছেন,

"চীন, ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।"

কেবল আমরাই এতবড় একটা প্রাচীন সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী হইয়াও পরাধীন ও হেয় হইয়া রহিয়াছি। জগতের স্বাধীন দেশের তুলনায় নিজেদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আমাদের অন্তরে এক অভিনব বেদনা জাগাইয়া তোলে। এই বেদনার ভিতর দিয়া আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম হয়।"[৫৪]

ভূদেবের স্বদেশচিন্তা ছিল সমাজকেন্দ্রিক। তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধে' রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূয়োদর্শিতা ও মননশীলতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সঙ্কীর্ণ পরিমণ্ডলে আবদ্ধ জাতীয়তাবাদকে সব সময় নিন্দা করেছেন। বিশ্বাত্মবোধ ও বিশ্বানুরাগের আরাধ্য রূপ এবং সর্বভূতে মৈত্রীকামনাকে ভূদেব দেশবাসীর হিতের জন্য প্রচার করেছিলেন। বাঙ্গালীর পারিবারিক চত্বরে তিনি ভারতের গার্হস্থ্য ধর্মের অনুবর্তন কামনা করেন। তবু ভূদেব প্রয়োজনবোধে শাসকশ্রেণীর কাজের সমালোচনা করতে দ্বিধাচিত্ত হতেন না। তাঁর সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠীর ধারণা ছিল,

"Bhudev with his C. I. E. and Rs. 1500 is still anti British."[৫৫]

তবে, বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সাধনা ও বাণীতে বাঙ্গালীর স্বাদেশিকতার যৌবনমুক্তি ঘটেছিল। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্গালী স্বাধিকার অর্জনের কুলিশ, কঠোর প্রত্যয়ে ভারতের আকাশকে যে রক্তরাঙা করেছিল, তার চিন্তাসমিধ্‌ স্বামী বিবেকানন্দের আত্মজাগরণী বাণী ও কর্মচিন্তা থেকে সংগৃহীত হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো শহরে আন্তর্জাতিক

৫৪ নবযুগের বাংলা : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ. ২৭০

৫৫ ভূদেব চরিত (১ম ভাগ) : কুমারদেব মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩০৩-৩০৪

ধর্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্মের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে যে বক্তৃতা তিনি দেন; তাতে ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় ধর্ম ও ভারতবাসীর মান-মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিবেকানন্দের এই বিশ্ববিজয় বাঙ্গালীর ধমনীতে নতুন রক্ততরঙ্গবেগ প্রবাহিত করে। হিন্দুধর্মের শাশ্বত বোধি-চেতনার অন্তরালে (বেদান্তধর্ম) যে জাতিপ্রেম, সর্বভূতে মৈত্রীভাবনা ও মানবতাবাদের মহান্ তথ্য নিহিত আছে, তাকেই তিনি স্বদেশবাসীর স্বার্থে পুনরুদ্ধার করে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিবেকানন্দ 'যত্র জীব, তত্র শিব' মহাজ্ঞান লাভ করেন গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের 'যত মত তত পথ' সমন্বয়ী সাধনার পঞ্চবটী থেকে। রামকৃষ্ণদেব ছিলেন পুরোপুরি অধ্যাত্মবাদী। তাঁর ধর্মচিন্তা ছিল মূলতঃ বেদান্ত-শাখাশ্রয়ী। তিনি হিন্দু ধর্মমতের বিভিন্ন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা ছাড়াও, অ-হিন্দু মতাদর্শের অনেক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব সাধনার ক্ষেত্রে যে অন্তর্মুখীনতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, বিবেকানন্দের সাধনায় তা হয়ে ওঠে বিশ্বমুখী ও বিশ্বপ্রসারী। সকল ধর্মের মধ্যে মানবিক অনুভূতি যে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত, সাধন-সিদ্ধির বিভূতি আলোকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই জাতিভেদের কঠোরতা ও বর্ণাশ্রমের নিয়ম-নীতিতে তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না। রামকৃষ্ণদেবের সাধনাতে আধুনিকতার (সবভূতে মৈত্রী-ভাবনা ও মানবহিতবাদ) চরম মূল্যায়ন হয়েছিল বলেই 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে'র কেশবচন্দ্র সেন ও 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের' শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই জাতীয় হিতবাদী মনীষিগণ ধর্মের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ঐহিকতার সঙ্গে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের এক সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁরা রামকৃষ্ণদেবের মাতৃসাধনাতে অনুরূপ আদর্শের পূর্ণ অনুসন্ধান পেয়েছিলেন বলেই অনেকেই তাঁর মতাদর্শের অনুগামী হন।

বাঙ্গালীর জাতীয়তার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান, 'সোহম্' মন্ত্রের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ মনুষ্যত্বের পূর্ণ জাগরণ। সাম্প্রদায়িকতা জাতিভেদ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পর্যুদস্ত ভারতবাসীকে তিনি উদ্ধার ও পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করে চেয়েছিলেন আত্মবিশ্বাসের মহামন্ত্রে। সেইজন্য তিনি ধর্মকে কেবল তত্ত্ব ব্যাখ্যার মধ্যে আবদ্ধ না করে মানবায়িত করেছিলেন। দেশবাসীর মনোবল ও আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশকেই তিনি ধর্মের প্রকৃত অনুশীলন রূপ বলে প্রচার করেন। কেবলমাত্র রাজনৈতিক আলোচনা ও

অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণের অভিলাষ রাষ্ট্রিক আন্দোলনকে গতিশীল করতে পারে না, ধর্মসাধনা ও চৈতন্য বিকাশের মধ্য দিয়ে অখণ্ড জীবনানুভূতি যখন বাস্তব জীবনের সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করে প্রত্যয়নিষ্ঠ হয়—তখনই ঘটে দেশবাসীর পূর্ণ জাগরণ। বিবেকানন্দের চিন্তা ও সাধনাতে এই তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। তিনি স্বাদেশিক নেতাদের আহ্বান জানিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন,

"Before flooding India with socialistic and political ideas, first deluge the land with spiritual ideas. The first work that demands our attention is that the most wonderful truths confined in our Upanisads, in our scriptures, in our Puranas, must be brought out from the books, brought out from the monasteries, brought out from the forests, brought out from the possession of selected bodies of people, and scattered broadcast all over the land, so that these truths may run like fire all over the country from north to south and east to west, from the Himalayas to Comorin, from Sindh to the Brahmaputra."[৫৬]

ভারতবাসী দীর্ঘদিনের তামসিক নিদ্রা ও জাড্যচেতনা থেকে মুক্তিলাভ করে আত্মোন্মেষের পথে যে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছিল, তাকে তিনি স্বাগত জানিয়ে বলেন,

"অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না, কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবেন না; কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।"[৫৭]

স্বাধীন ভারত, স্বতন্ত্র ভারত, জ্ঞানে-প্রেমে, শৌর্যে-বীর্যে মহীয়ান্ ভারত, দারিদ্র্যমুক্ত ভারত ও সাধারণ জনগণের ভারত গঠনের জন্য বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে ব্রতী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বেদান্তের জীবব্রহ্মতত্ত্বই

৫৬ The Complete Works of Swami Vivekananda: Vol. III; p. 221.

৫৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, পৃ. ২৯৮

তাঁকে 'সোস্যালিজমে'র দ্বারদেশে উপনীত করেছিল। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর মানস সংযোগ ছিল নিবিড়। ইতিহাসচেতনার মননালোকে তিনি উপলব্ধি করেন যে, বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পালা অচিরেই শুরু হবে। এ-বিষয়ে তাঁর মন্তব্য ছিল যে, কোনও না কোনও ধরণের 'সোস্যালিজম্' আসছে এবং তিনি 'সোস্যালিষ্ট'। সমাজতন্ত্রের আদর্শ সম্পর্কে বিবেকানন্দের ধারণা ছিল,

"এমন সময় আসিবে, যখন…শূদ্রের প্রাধান্য হইবে…শূদ্রধর্ম্মকর্ম্ম-সহিত সর্ব্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।…সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।" (বর্তমান ভারত)

বিবেকানন্দ সবদিক থেকে চেয়েছিলেন সামাজিক সাম্য। ভারতের অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য তিনি বিত্তবানদের দায়ী করেন। নিরন্ন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি এলেই দেশের জন্য জন্মাবে প্রকৃত মমত্ববোধ ও প্রীতি। সেজন্য তিনি স্বদেশের যুবকদের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন,

"কোনো অন্যায় সুবিধা চেয়ো না, সকলের জন্য সমান সুযোগ চাই। যুবকবৃন্দ, তোমরা সামাজিক উন্নয়নের বাণী ছড়িয়ে দাও, সাম্যের বাণী প্রচার কর।"[৫৮]

স্বামিজী শোষিত দীন-দরিদ্র ভারতবাসীর জীবনকে নতুন মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল, ভারতের একমাত্র আশার স্থলই ভারতীয় জনসাধারণ—কেননা এরাই অগ্রগতির ধ্বজা বাহক। সেজন্য তিনি কংগ্রেসের প্রথমদিকের গণস্বার্থবিমুখ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। 'যত্র জীব তত্র শিব' এই তত্ত্বকে তিনি ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। ঔপনিষদিক চেতনায় দীক্ষিত হলেই দেশবাসীর প্রকৃত মহত্ত্ব ও বীর্য প্রকাশিত হবে, এই বিশ্বাসে তিনি বলেন,

"তোমাদের উপনিষদ্—সেই বলপ্রদ, আলোকপ্রদ, দিব্য দর্শনশাস্ত্র আবার অবলম্বন কর,……তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে। ঐ সত্য সকল অবলম্বন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত কর—তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে।" (আমার সমরনীতি)

৫৮ বিশ্ববিবেক : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত ; পৃ. ২৮৪

আর, ভারত উদ্ধারের জন্য তিনি ডাক দেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ও শ্রমজীবিদের। দেশগঠনে তাদের আহ্বান জানিয়ে বিবেকানন্দ বলেন,

"তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন।" (পরিব্রাজক)

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করেছিলেন, দেশমাতৃকাকেই শ্রেষ্ঠ দেবীরূপে গ্রহণ করে আত্মত্যাগের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশবাসীদের*; বিবেকানন্দও অনুরূপভাবে বলেন,

"আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন।" (ভারতের ভবিষ্যৎ)

বিবেকানন্দ ভারতবাসীর আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি কামনা করেছিলেন। কোন পরানুবাদ বা পরানুকরণ জাতিকে উন্নতির গৌরবময় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। তাই তিনি সকলকে স্বদেশনিষ্ঠ, স্বাবলম্বী ও উদার ভ্রাতৃত্ববোধে দীক্ষিত হ'তে আহ্বান জানিয়ে বলেন,

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?...ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না

* "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা—" (আনন্দমঠ)

—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" (বর্তমান ভারত)

এমনি করে অধ্যাত্মচেতনা ও রাজনৈতিক ভাবধারা একই সংগে সমন্বিত হয়েছিল তাঁর আরও বহু বক্তৃতার মধ্যে। বিবেকানন্দের বক্তৃতা দেশবাসীকে স্বদেশবোধে তড়িৎস্পৃষ্ট করে। এরই ফলে সমগ্র বাঙ্গালী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাদেশিকতার বিভিন্ন কর্ম-কাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেছিল। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে 'অগ্নিযুগে'র বিপ্লব আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল দুর্নিবার। তাঁর প্রভাবের কথা তদানীন্তন কালের একজন দেশমুক্তিসংগ্রামী সৈনিকের মুখে সশ্রদ্ধভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

"বিপ্লব-আন্দোলনে স্বামিজীর প্রভাব? ...তাঁর বাণীর উদ্দীপনা ছাড়া বিপ্লব-আন্দোলন ঐভাবে হ'ত কিনা সন্দেহ।.....এমন বিপ্লবী ছিল না যার বাড়ীতে স্বামীজীর কোনো না কোনো বই ছিল না।...বিবেকানন্দের কথাগুলো জ্বলছিল আগুনের মত। আমরা তাঁর কথা জপ করতুম আর কাজ করতুম। আমরা...বলতুম স্বামীজীর কথা—'বলি চাই'।"[৫৯]

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে দেশমাতৃকার চিন্ময়ীরূপ বন্দনাতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, আর বিবেকানন্দ দেশবাসীকে ডাক দিয়েছিলেন স্বদেশের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গের। বঙ্কিমচন্দ্রে যার সূচনা, বিবেকানন্দে তার পরিণতি, এবং স্বাদেশিকতার যৌবনমুক্তি পর্যায়ে এর পূর্ণ বিকাশ। এ আলোচনা অবশ্য পরের।

৫৯ বিপ্লব-আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব: হরিকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৪৬।

৯

উপসংহার

স্বাদেশিকতার 'মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর' নাট্যকারদের চিত্ততটে আঘাত করেছিল ভীমবেগে। বাইরের সংঘর্ষে আর ভেতরের তাগিদে বাঙ্গলা সাহিত্যে এল স্বাদেশিক নাটকের জন্মলগ্ন। দেশপ্রেমের এই ভাবোন্মেষিত সময়ে বিশেষভাবে সৃষ্টি হল—ঐতিহাসিক নাটকের। ইতিহাসোক্ত অতীত গৌরব কাহিনীর আবরণের মধ্যে নাট্যকারেরা জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশ গৌরবের মহান্ আদর্শ প্রচার করেছিলেন। দেশের সাধারণ মানুষের মন-প্রাণ স্বদেশাভিমুখী ছিল বলে এই নাটকগুলির প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। কেবল নাট্য সাহিত্যে নয়; বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও স্বাদেশিকতার রৌদ্ররস প্রবাহিত হয়েছিল। রঙ্গলালের পর হেমচন্দ্র বাঙ্গলা কাব্যধারাতে স্বদেশপ্রেমের তুফান ছুটিয়েছিলেন। তাঁর 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' কবিতাটি ছিল স্বদেশপ্রেমের ও মুক্তি কামনার প্রভাতী সঙ্গীত। নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে জাতির ইতিহাস চিন্তাকে নতুন করে বিশ্লেষিত করে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করলেন। ব্রিটিশ সরকার কাব্যগ্রন্থটির উচ্চ সমাদর ও জাতিজাগরণী প্রভাব লক্ষ্য করে এর সর্বাঙ্গে অস্ত্রোপচারের দ্বারা গতিবেগ মন্থর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'জাতীয় নাট্যশালা' স্থাপিত হলে, নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকাকারে জনসমক্ষে অভিনীত হয়েছিল। সমকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিরও নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছিল। বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ বিদেশী সরকারের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়েছিল। তাঁরা বহুবার 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনে'র সাহায্য বলে নাটকগুলিকে বিবাসিত করেন। সাধারণ রঙ্গশালায় পূর্বসূরীদের রচনার অভিনয় সাফল্য দেখে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় উৎসাহ বোধ করেছিলেন একালের নাট্যকারেরা। অবশ্য অনেক আগে মধুসূদন দত্ত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করে নাট্যকারদের স্বদেশপ্রেম প্রচারে আগ্রহী হ'তে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর এই নাটকের মূল লক্ষ্য সেক্সপীয়রের আদর্শে ট্র্যাজেডি রচনা হলেও জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের লক্ষণগুলি অর্থাৎ জাতির ইতিহাস

চেতনা, অতীত গৌরবময় কীর্তির উত্তরাধিকারের আকাঙ্ক্ষা এবং পরাধীনতার মর্মজ্বালা—সমস্ত কিছুই 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে। সে হিসাবে মধুসূদনের ঐতিহাসিক নাটকের একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। স্বাদেশিকতার বয়ঃসন্ধিপর্বে যে সমস্ত স্বাদেশিক নাটক রচিত হয়েছিল, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,

(১) দেশের অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় দেশপ্রেমের উপলব্ধি।

(২) স্বাধীনতা বিরহিত জনসাধারণের মধ্যে পরাধীনতার মর্মজ্বালা প্রচার।

(৩) বৃহত্তর ভারতচেতনার উন্মেষ ও প্রসার চিন্তা।

অবশ্য এই পর্বে উপেন্দ্রনাথ দাস একটি স্বতন্ত্র সুরের উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন। বাঙ্গলা নাট্যজগতে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। শাসকবর্গের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পরাধীন প্রজার সক্রিয় প্রতিরোধ ও প্রয়োজনবোধে অস্ত্র ধারণ মনোভাবনা প্রচারই তাঁর নাট্যচিন্তার বক্তব্য ছিল। অন্যান্য নাট্যকারেরা সংগঠনমূলক আদর্শে ব্রতী হয়ে নাটক রচনা ও স্বাদেশিকতার প্রচার চালিয়েছিলেন। মধুসূদন ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন বসু ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বদেশপ্রেমের আহ্বান মধুসূদনের লেখনীতে অঙ্কুরাকারে পরিস্ফুট হলেও, স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচারের মহান্ দায়িত্ব বহন করেন, ঠাকুর বাড়ীর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এখন আমাদের এই পর্বের নাটকগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিচয় গ্রহণ করতে হবে।

ছয়

মধুসূদনের নাটকে স্বাদেশিকতা

কবিমানস

১

মধুসূদনের কবিমানসে নিগূঢ় সাহিত্য পিপাসা ও ইতিহাস চেতনা একই সঙ্গে বিমিশ্র হয়ে যে মানবহিতবাদ এবং মর্ত্যপ্রীতির সুউচ্চ মহিমা ঘোষণা করেছিল, তাই বিস্তৃতাকারে স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশ মহিমার প্রতি গভীর মমত্ববোধ সৃষ্টি করে। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কবির সচেতন ট্র্যাজেডি সৃষ্টির মনোকল্পনার অভ্যন্তরে পরাধীনতার মর্মবেদনা ও রাষ্ট্রিক সচেতনতা আত্মপ্রকাশ করেছে।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি, 'সিপাহী বিদ্রোহে'র পর থেকেই বিদেশী অধীনতার প্রতি বাঙ্গালী ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। বাঙ্গলা সাহিত্যের কাব্যশাখাতে বাঙ্গালীর পরাধীনতার মনোবেদনা ও মর্মবিদারী জ্বালা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। রাজপুত জাতির পরাজয় কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে কবি স্বদেশপ্রীতি, স্বাধীনতার আদর্শ ও দাসত্বের আত্মগ্লানির কথাই প্রকাশ করেছেন। কবির কাব্য চিন্তাতে সমকালীন বাঙ্গালীর পরাভূত মনঃকষ্টের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। রাজপুত জাতির পরাজয়কে তিনি বৃহত্তর অর্থে ভারতবাসীর ক্ষাত্রশক্তির পরাভব হিসাবেই বর্ণনা করেছেন।

পরাধীনতার জীবনযন্ত্রণা থেকেই জাতির চিত্ত ইতিহাসমুখী হয়। বাঙ্গালীর মনে মুক্তি পিপাসা তীব্র হয়েছিল বলেই; ইতিহাসের মধ্যে যেখানে বাহুবলের ভজনা আছে, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য জীবনোৎসর্গের মহিমময় বিবরণ আছে, অধীনতার বিরুদ্ধে অভিযান ও রণবাদ্যের ধ্বনি-নিনাদ আছে, সে সব কাহিনী অথবা উপাখ্যানের প্রতি দেশবাসীর আকর্ষণ গভীরভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমস্ত বাঙ্গলাদেশ যেন জাতীয় বীরের অনুসন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। তাই মধুসূদন যখন 'আলটমাসে'র (ইলতুৎমিস) কন্যা সুলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে নাটক রচনার

পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন বেলগাছিয়া নাট্যশালার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশব গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে লেখেন,

"By the by, a thought strikes me. Can't we call out a subject from the history of Rajputs? I believe the field is pretty extensive and may yield enumerable hints for the imagination of a writer like yourself." ১

নট কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের এই চিঠি পেয়ে মধুসূদন তাঁর নাটক রচনার বিষয়-পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছিলেন। সে সময়ে যাঁরা রাজস্থানের কাহিনীর প্রতি অনুরাগী হয়েছিলেন; জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতার আদর্শ উদ্বোধনই তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। মধুসূদনের স্পর্শগ্রাহী কবিচিত্ত দেশবাসীর এই অনুভাবনাটি সহজেই উপলব্ধি করে। নাটক রচনায় রাজপুতদের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীর প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকৃতপক্ষে সেকালের জাতীয় ভাবনার প্রভাবজনিত ফলশ্রুতি।

মধুসূদন দেশনেতাদের স্বদেশহিতৈষী মনোবাসনার সঙ্গে যে একাত্ম হয়েছিলেন, তার পরিচয় অন্য এক স্থানে পাওয়া যায়। তিনি যখন মহাকাব্য রচনার জন্য বিষয়বস্তুর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন স্বদেশ চিন্তায় সিদ্ধকাম পুরুষ রাজনারায়ণ বসু তাঁকে 'সিংহল বিজয়' কাহিনী মহাকাব্যের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, এই কাহিনীতে বাঙ্গালীর দেশপ্রেম ও বাহুবলের যে সার্থক মহিমার কথা লিপিবদ্ধ আছে, তা দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করবে।* আর মধুসূদনও 'সিংহল বিজয়' কাহিনী সম্পর্কে

১ মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত : যোগীন্দ্রনাথ বসু (পরিশিষ্ট)

* "The conquest of Ceylon by the Bengali prince Vijaya and his companions, is, I think, a nice subject for an Epic poem to be called the Sinhalavijaya Kavya....The poet may institute in it a comparison between the present and former state of Bengal and while doing so he may allude to the Bengali king Bhagodatta, pompously styled in the Mahabharata as 'the sovereign of the south and east,' who, as the ally of the Rajah of Magadha, accompanied him to the war of the Kurus and the Pandus,—to the merchants Chand, Dhanapati and Srimanta, the best two of whom performed voyages to Ceylon—to the kings of the Pal dynasty, who, according to Ayeen Akbari and

উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন।† একজন প্রকৃত স্বদেশহিতবাদী নেতার সঙ্গে মধুসূদনের এই মানসিক একাত্মতা অবশ্যই তাঁর স্বদেশপ্রীতির স্বাক্ষর বহন করে। তবে মধুসূদনের স্বদেশপ্রীতিতে কোনো বৈরীভাবনা প্রকাশিত হয়নি। তাঁর দেশাত্মবোধের কথা বলতে গিয়ে একালের একজন বিদগ্ধ সমালোচক যথার্থ মন্তব্য করেছেন,

"ডিরোজিওর কাব্যে যে দেশাত্মবোধ দেখতে পাই, মধুসূদনের কাব্যের দেশাত্মবোধ তা থেকে ভিন্ন নয় ··· ··ডিরোজিও ও মাইকেলের দেশাত্মবোধে জাতিবৈরের স্থান নাই। দেশের প্রাচীন গৌরবে গর্ববোধ আছে, কিন্তু ইংরেজ শাসন বা ইংরেজ শাসক বা ইংরেজ জাত সম্বন্ধে জাতিবৈরের ভাব নাই।···

certain inscriptions, conquered the whole of India,—to Dheesena the son of Adisoor who according to the said work took possession of Delhi which from his time for centuries continued to form a portion of the Bengali dominions, and to Protapaditya of recent times who with his 52000 shieldsmen, coped with the generals of Jehangir. If there be no strong proof of one or two of the above facts, still there is no harm in availing one's self of them in poetry. The aforesaid comparison and the contrast between the beauty and fertility of Bengal called by an Emperor of Delhi. 'The Paradise of Regions' and the timidity and servility of its present inhabitants, unworthy of such a beautiful country, would give much scope for pathetic lamentation, as that of Derozio at the commencement of the Fakeer of Jangheera with ref. to India,...and for passionate exhortation about our supine and unenergetic:countrymen.......

An epic poem like the one suggested above is much required to infuse patriotic zeal and a warlike spirit into the breasts of our degenerate countrymen. It is sure that a hundred far more, powerful agencies are required to bring about that mighty change, but the poet-also must lend his aid to the good work."

(মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত; যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ৩১৩—৩১৫)

† "Give me the সিংহল old boy. I like a subject with oceanic and mountain scenery, with sea-voyages, battles and love-adventures. It gives a fellow's invention such a wide scope." (মধুসূদনের পত্রাবলী; পত্রসংখ্যা ৮৬)

মধুসূদন ইংরেজের ধর্ম, আচরণ, পরিচ্ছদ ও লোক ব্যবহার গ্রহণ করেছিলেন।...তিনি কাব্য লিখলেন ইংরেজিতে, ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখতে হবে এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা।...তবে তাই বলে মধুসূদনের দেশাত্মবোধ ছিল না, বা তার গভীরতা কম ছিল এমন মনে করা উচিত হবে না। মধুসূদনের দেশাত্মবোধ অকৃত্রিম ও গভীর। দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য, পৌরাণিক মাহাত্ম্য, ঐতিহাসিক গৌরব এবং সর্বোপরি দেশের মহাকবিগণ সম্বন্ধে একটি সচেতন অভিমান।...মধুসূদনের কাব্যে সাময়িক উত্তেজনা নেই,...কিন্তু এ বদলে যা আছে, বিশেষভাবে তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তা অকৃত্রিম দেশাত্মবোধজনিত। এদেশের প্রাচীন কবি ও কাব্য, নৈসর্গিক ও মনুষ্য রচিত সৌন্দর্য, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার মাহাত্ম্য, এদেশের পালা পার্ব্বণ, এদেশের দেবদেবী (মনে রাখতে হবে ধর্ম্মে তিনি খৃষ্টান ছিলেন, সামাজিক আচরণে ইংরেজ) সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তি প্রভৃতি তাঁর দেশাত্মবোধের ভিত্তি। এ ভিত্তি উদার ও অটল। উদার বলেই এর মধ্যে একাধারে ভারত ও বঙ্গের স্থান আছে—'জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ-ভারত রতনে'! আর অটল বলেই একাধারে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের সঙ্গে ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি অর্ব্বাচীন কবিগণের স্থান হয়েছে। মধুসূদনের দেশাত্মবোধ শূলের মতো সঙ্কীর্ণ বা স্তম্ভের মত উত্তুঙ্গ নয়—ভূতলের মত সমতল ও নিরাভরণ। আর রাজপুত্র অশোকের মত সেখানে উপবিষ্ট বলেই সম্রাটজনোচিত তার ভবিষ্যত।"[২]

স্বদেশ, স্ব-সংস্কৃতি ও স্বজাতির অতীত মাহাত্ম্য তিনি যে মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন, তাতে তাঁর যুগের প্রবৃত্তি ও বাসনা সজ্ঞান এবং সক্রিয়ভাবে কার্যকরী হয়েছে। এর মূলে ছিল, 'হিন্দু কলেজে'র অসামান্য প্রভাব। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, দেশের সর্বাঙ্গীণ শুভ চিকীর্ষায় 'হিন্দু কলেজে'র ছাত্রেরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জ্ঞান-যুক্তি-কর্মে মানবতার উচ্চ মহিমা প্রতিষ্ঠা করে দেশবাসীর অন্ধ সংস্কার এবং জাড্যচিন্তার অবসান ঘটিয়ে আত্মমহিমার প্রচার ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী করে তোলাই তাঁদের সকল কর্মের একমাত্র ব্রত ছিল। সংবাদপত্র ও সভাসমিতি ছিল তাঁদের সংগ্রামের হাতিয়ার। নব্যবঙ্গীয় যুবকেরা প্রতীচ্যের ভাবধারা ও ইতিহাস-

২ মধুসূদন ও দেশাত্মবোধ : প্রমথনাথ বিশী ; দেশ (সাহিত্যসংখ্যা), ১৩৭০।

চেতনার প্রসার ঘটিয়ে দেশবাসীকে সর্ববিষয়ে আত্মনিভর করতে চেয়েছিলেন। দেশবাসীর মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা স্ফুরণের জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব তাঁরা সৃষ্টি করেন। 'হিন্দু কলেজে'র ছাত্রদের ছিল প্রচণ্ড জীবনীশক্তি এবং এই শক্তি দেশবাসীর মন ও সমাজের পঙ্কিলতা দূরীকরণের ক্ষেত্রেই নিয়োজিত হয়েছিল। নির্মোহ যুক্তিবাদের অনুশীলনে তাঁরা উপলব্ধি করেন দেশের তমোময় স্থবিরাবস্থা আর প্রয়োজন অনুভব করেন অসত্যের অচলায়তন ভেঙ্গে অবরুদ্ধ জীবন-স্রোতকে মুক্তি দিয়ে নব ভাববন্যার প্লাবনে সকলকে উজ্জীবিত করতে। এজন্য ধর্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কারকে দেশবাসীর ভবিষ্যৎ মুক্তির জন্য 'হিন্দু কলেজে'র ছাত্রেরা সর্বাগ্রে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রনীতি আলোচনা, স্বদেশবন্দনা ও শাসক প্রভুদের সমালোচনা—সমস্ত কিছুর মূলে ছিল জাতিহিতৈষণা। পরিবর্তন বিমুখ, নিয়ম-শাসিত নির্জীব জরাগ্রস্ত প্রাণকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও গতিশীল করে তোলার সকল দায়িত্ব পালন করেছিলেন 'হিন্দু কলেজে'র ছাত্রেরা।

মধুসূদনের চিত্ততলদেশে 'হিন্দু কলেজে'র প্রভাব ছিল দুর্নিবার। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই যুক্তিবাদী আদর্শে অনুরাগী হন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও আচরণের নিয়ম-নীতিতে তাঁর পৌরুষ, আত্মসম্মানবোধ ও সত্যনিষ্ঠা জাগ্রত ছিল। 'ইয়ংবেঙ্গল' যুবকদের ইতিহাসচেতনাশ্রয়ী সাংবাদিক মনোভাব, সংস্কার বাসনা ও স্বদেশপ্রীতি তাঁকে বাল্যকাল থেকে আচ্ছন্ন করেছিল। তিনি 'হিন্দু কলেজে' ছাত্রজীবনে ক্যাপ্টেন রিচার্ড্সনের ছাত্র ছিলেন। রাজনৈতিক মতবাদে 'টোরী' সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও, তিনি ছাত্রদের মনে সঞ্চার করেছিলেন তীব্র মর্ত্যপ্রেম, সৌন্দর্যচেতনা ও কাব্যের প্রতি গভীর অনুরাগ। মধুসূদনের কবিকল্পনা বিকাশের মূলে রিচার্ড্সনের প্রভাব ছিল অসামান্য। কিন্তু তাহ'লেও ডিরোজিও 'হিন্দু কলেজে'র ছাত্রদের মধ্যে বিচার-সঙ্গতি-সমন্বয় এবং দেশপ্রেমের যে বর্তিকা জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার প্রভাব মধুসূদনের কাল পর্যন্ত ছিল অম্লান। তাই মধুসূদন 'হিন্দু কলেজে' প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হন।* ১৮৪৩ সালে শেলী, বায়রণ,

* "If you will think over the matter, you will remember that when we were in the Fifth class, Senior Department, Modoo started up a weekly newspaper in handwriting conjointly with you and myself. This paper was carried on for 3 or 4 months I believe, or up to the time when we had

স্কট পড়বার সময়ে, রাজা পুরুর দেশাত্মগৌরব কাহিনী লিখে তিনি স্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

"But where, oh! Where is Porus now?
And where the noble heart that bled
For Freedom—with the heroic glow
In patriot bosoms nourish'd—
—Hearts, eagle-like that recked not Death,
But shrank before foul Thraldom's breath?
And where art thou—fair Freedom!—thou—
Once goddess of Ind's sunny clime!
When glory's halo 'round her brow
Shone radiant, and she rose sublime,
... ...
That glory hath now flit·ed by!
The crown that once had deck'd thy brow
Is trampled down—and thou sunk low:
Thy pearl, thy diamond, and thy mine
Of glistening gold no more is thine!
Also each conquering tyrant's lust
Has robb'd thee of thy very dust!—
Thou standest like a lofty tree
Shorn of fruits—blossoms—leaves and all—
Of every gale the sport to be—
Despised and scorned e'en in thy fall!"[৩]

মধুসূদনের এই বিষাদচেতনার সঙ্গে ডিরোজিওর স্বদেশপ্রীতির আদর্শ স্বাভাবিকভাবে মিশে আছে। তবে কেবল মধুসূদনেরই নয়, 'হিন্দু কলেজে'র

---

a leap to the Second Class. Captain Richardson read this paper every week, which was no doubt to encourage the Editor."—A letter to G. D. Bysac by Buncoo Bihary Datta: March and April, 1888.

৩ মধুস্মৃতি: নগেন্দ্রনাথ সোম, পৃ. ৫০৫

অন্যান্য ছাত্রদের স্বদেশহিতবাদীতার বৈশিষ্ট্য ছিল একই রকম।* মধুসূদন স্বদেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করেন; এবং তারই জন্য উনিশ শতকের বাঙ্গলাদেশে যাবতীয় সমাজ সংস্কারকর্ম চিন্তার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল আন্তরিক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবা-বিবাহ' আন্দোলন পরিচালনাকে তিনি মনেপ্রাণে স্বাগত জানান। পরবর্তীকালে আপন শ্রদ্ধাবনত চিত্তের উদাহরণ হিসাবে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' তিনি 'বঙ্গকুলচূড়া' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উৎসর্গ করেন। বঙ্গনারীদের ঊষর মরুজীবনের করুণ যন্ত্রণা, সামাজিক শাসনের নামে দুঃশাসন বৃত্তি ও চণ্ডনীতি, সমস্ত কিছুর প্রতি তাঁর প্রতিবাদ ছিল ছাত্রজীবনের সূচনা কাল থেকে। 'হিন্দু কলেজে'র ছাত্রাবস্থায় তিনি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

"The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete.···In India, I may say in all the Oriental countries women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex, because it not only makes them appear as of inferior mental endowments, but no better than a sort of speaking brutes. The people of this country do not know the pleasure of domestic life, and indeed they cannot know, until civilization shows them the way to attain to it."[৪]

প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখতে হবে, এই উদার ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করতে

* "Like many young students of the Hindu College Madhusudan began to write English verse,......love and misanthropy were the favourite themes in those times when Byron's poetry still held the world in thrall, but some patriotic poems, like that on king Porus indicate, that Madhusudan felt for his country like the other young men of his day."—Literature of Bengal: R. C. Datta ; p. 196.

৪ মধুসূদন রচনাবলী : পৃ. ২৬৬।

চেয়েছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার অন্যতম প্রবর্তক বেথুন সাহেবকে তিনি তাঁর 'Captive-Ladie' কাব্যগ্রন্থ উপহার দেন এই বলে, "as a humble token of the author's gratitude for your philanthropic endeavours in the service of this country."[৫]

মধুসূদন কোনদিন প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হননি। তবে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ছিলেন না। রাজনৈতিক পরাধীনতার খেদ ও আত্মগ্লানি, তাঁর রচনার বহুক্ষেত্রে গভীর বেদনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কর্মজীবনে তিনি অনেকবার সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং দক্ষতার সঙ্গে সংবাদপত্র পরিচালনা করেছিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সচেতন অনুধ্যান না থাকলে সাংবাদিক হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং মধুসূদন সাংবাদিক হিসাবে দক্ষতা অর্জন করবার সময়ে, ভারতের রাষ্ট্রবিচিন্তাতে যে গভীর পারঙ্গমত্ব অর্জন করেছিলেন তা সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর চিঠিপত্রে এই বিষয়ে নির্দশন পাওয়া যায়। তিনি 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন মানসিকতার একনিষ্ঠ পূজারী হিসাবে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানান। হরিশচন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদ তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তাঁর আরোগ্য কামনা করে তিনি লেখেন,

"They say poor Harish of the Patriot is dying. This is very painful. Of all men now living he has exercised the greatest amount of influence over the educated classes of own countrymen. I hope he will recover. His death would be great loss, not to our literature, for he writes, feringishly, but to the progress of independence of mind and thought."[৬]

পরে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ তাঁকে ব্যথিত করেছিল। জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ পূজারীর স্মৃতিকে অমর করে রাখবার জন্য তিনি লিখেছিলেন,

"Harish is dead. They are kicking up a row on the subject

৫ কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী : ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত; পত্রসংখ্যা ৪১, পৃ. ১১০।

৬ ঐ : পত্রসংখ্যা ৬৭, পৃ. ১৪৯

and propose to establish a 'scholarship', Fie; why not a statue? However I shall subscribe. I loved and valued the man-"[৭]

এরপর তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বিদ্যাসাগরের অনুরোধে কলকাতায় 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদনাও করেন। পরাধীনতার মর্মবেদনার কথা তিনি চিঠিপত্রে বহু জায়গায় প্রকাশ করেছেন। সুদূর ফ্রান্স থেকে তিনি গৌরদাস বসাককে লেখেন,

"Come Here and you will soon forget that you spring from a degraded and subject race. Here you are the master of your masters.…

"Everyone, whether high or low, will treat you as a man not a 'd-d nigger'. But this is Europe, my Boy, and not India."[৮]

মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতা করেননি সত্য, কিন্তু পরাধীনতার অন্তরালে আত্মমর্যাদার সম্পূর্ণ বিনষ্টি তাঁকে ব্যথাতুর করেছিল। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, ভারতবর্ষীয়দের 'সিভিল সার্ভিস', পরীক্ষাতে ক্রমশঃ যোগদান, ও সাফল্য ফিরিঙ্গীদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল। রাষ্ট্র-সচেতন মধুসূদনের দৃষ্টিভঙ্গীও এদিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। ভারতের প্রথম আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাফল্যে আনন্দিত হয়ে তিনি লেখেন,

"শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে
(স্নেহাসার!) যবে রঙ্গে বায়ু-রূপ ধরি
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্ত্তি-বার্ত্তা।……" (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্কীর্ণ মনোভাবের সমালোচনাও করেন একটি চিঠিতে,

---

৭ কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী : ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত, পত্রসংখ্যা ৭০, পৃ. ১৫৩-১৫৪

৮ সাহিত্য সাধকচরিতমালা : পৃ. ৭৩

"Satyendra's success has aroused the authorities here to make the examination more difficult than before."[৯]

সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজদের পদতলে পিষ্ট ভারতবর্ষের শ্রীহীন অবস্থা ও গৌরবহানি মধুসূদনকে ব্যথিত করে। তাঁর মনোবেদনার কথাচিত্র 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে বিশেষভাবে প্রতিফলিত। মধুসূদনের 'ভারতভূমি' ও 'আমরা' কবিতাদ্বয়ে পরাধীনতার ক্ষোভ ধ্বনিত হযেছে।

"হায় লো ভারতভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ নয়নি,
বিধাতা ? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়াভাল তোর লো যতনি !
... ...
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনী,
চন্দন হইল বিষ ; সুধা ি‌তে অতি ? (ভারতভূমি)

আবার,

আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?
রে কাল, পুরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃত-কল্পে ? পুনঃ কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?" (আমরা)

মধুসূদনের কাব্যকল্পনা ও ব্যক্তিসত্তাতে উনিশ শতকের বাঙ্গালীর নবপ্রবুদ্ধ চেতনা একটি বিশিষ্ট গৌরবে ও মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিল। ফলে ঐ শতকের সূচনাকাল থেকে বাঙ্গালীর নব্যমানসিকতা, যা ধর্ম-সমাজ ও

৯ কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী : ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত. পত্রসংখ্যা ১০১, পৃ. ২১৮

রাষ্ট্রবিচিন্তাতে অরুণ বরুণ কিরণমালায় উদ্ভাসিত হয়ে চতুর্দিকে একটি প্রত্যয়গ্রাহ্য জীবনের মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছিল তার সঙ্গে মধুসূদন স্বাভাবিকভাবে একাত্ম হয়েছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের সুউচ্চ ভেরীনিনাদ তাঁর রচনাতে আত্মপ্রকাশ না করলেও পরাধীনতার আত্মগ্লানি যে কিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার পরিচয় আমরা ইতিমধ্যে উদ্ধার করেছি।

মধুসূদন মুখ্যতঃ কবি। তাঁর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' উনিশ শতকের নতুন চিন্তায় উদ্ভাসিত এবং বাঙ্গালীর হৃদয় বিস্ফোরণের আগ্নেয়গিরি। তিনি জাতির প্রাণগত উৎকণ্ঠাকে রসরূপে আত্মসাৎ করে কাব্যে যে নব্য আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তাতে বাঙ্গালীর জনজীবনের কেবল জাড্য মোচন যে হয়েছিল তা নয়; দেশবাসী সংস্কৃতি চিন্তাতে মুক্তিপথের অনুসন্ধান পেয়েছিল। কালক্রমে এই মুক্তিবাসনা পরাধীনতার বেদনাতে মর্মপীড়িত হয়েছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাবণের খেদোক্তিতে, বাঙ্গালীর গতিহীন স্থাবর জীবনের করুণ চিত্র মধুসূদন এঁকেছেন।

"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? … … …" (প্রথম সর্গ)

আবার

'মেঘনাদ ও বিভীষণে'র কথোপকথনের মধ্যে মধুসূদন স্বজাতি বিরোধ ও আত্মকলহের নিন্দা করেছেন। স্বর্ণলঙ্কাপুরে রামচন্দ্র ও বানর সেনার অনুপ্রবেশকে তিনি স্বদেশে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ বলে মনে করেছেন। মেঘনাদের খেদোক্তি প্রকারান্তরে কবি মধুসূদনের মনোগত দুঃখ-বেদনার বহিঃপ্রকাশ;

"তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,— … … …"

. … …

…কোন্-ধর্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্, যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!" (ষষ্ঠ সর্গ)

অন্যত্র 'রাবণে'র বিভিন্ন উক্তিতে মধুসূদন স্বাদেশিকতার নিদর্শন রেখেছেন। 'বীরবাহুর' মৃত্যুতে চিত্রাঙ্গদার সম্মুখে রাবণের খেদোক্তি ও সান্ত্বনার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের মহান আদর্শ তিনি বিপুল গৌরবে প্রচার করেছেন।

"……সাবাসি দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? … .. … …

* * * * *

…রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে।" (প্রথম সর্গ)

আবার,

"দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে :… … … …"

(প্রথম সর্গ)

মধুসূদনের স্বাদেশিকতার অপর এক বৈশিষ্ট্য—তাঁর বাঙ্গালীয়ানা। তিনি বাঙ্গালী ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালীর পূজা-পার্বণ, বাঙ্গলার দেব-দেবী, বাঙ্গালীর প্রাচীন ও অর্বাচীন কবিদের স্তুতিবন্দনা, সমস্ত কিছুতে ছিল, 'শ্যামাজন্মদে'র প্রকাশ। কবির স্বদেশপ্রেমের অঙ্কুর তাঁর মাতৃভাষা বন্দনা ও উন্নতি করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়ে আছে।

"…to give our national poetry a good lift.……I would

sooner reform the poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russians."[১০]

'রেখো মা দাসেরে মনে' কবিতাটিতে কবি দেশকে মাতৃজ্ঞানে প্রণাম করেছেন। জীবনের শেষ দিকে ঢাকাতে এক সম্বর্ধনা সভায় আপন হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার অর্গলমুক্ত করে বাঙ্গালীয়ানার যে পরিচয় তিনি রেখেছেন, তাতেই আছে তাঁর দেশ ও দেশবাসীর প্রতি আনুগত্য ও সকলকে স্বদেশের প্রতি আন্তরিক হবার স্থির নির্দেশ।

"বন্ধুগণ! আমার বৈদেশিক পরিচ্ছদের জন্য আপনাদিগকে দুঃখিত হইতে হইবে না, আমার কোর্টবুট যদি কোনদিন, সাহেব হইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাসটুকু জন্মাইয়া দেয়, তবে একখানি দর্পণের দিকে চাহিলেই, আমার সে ভ্রম দূর হইবে, আমার বর্ণই আমার জাতি স্মরণ করাইয়া দিবে।"[১১]

মধুসূদন দেশকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবেসেছিলেন। স্বদেশের আত্মার সঙ্গে তাঁর সংযোগ গভীর ছিল বলেই দেশের সকল গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তিনি অত্যন্ত সমাদরে বরণ করেছিলেন। এ কারণেই স্বাদেশিকতার ঋত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে যথার্থভাবেই 'জাতীয় কবির' মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।*

১০ কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী : ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, পত্রসংখ্যা ৫৬, পৃ. ১২৯-১৩০।

১১ মধুস্মৃতি : নগেন্দ্রনাথ সোম, পৃ. ৫০৫।

* 'এই প্রাচীন বঙ্গদেশে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল, নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন। ...স্মরণীয় বাঙালীর অভাব নাই। কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্ন প্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন-নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কাল প্রসন্ন, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও।...তাহাতে নাম লেখ, "শ্রীমধুসূদন।" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণকুমারী নাটকে স্বাদেশিকতা

২

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে মধুসূদন প্রকাশ্যভাবে ঐতিহাসিক পটভূমিতে, আপন চিত্তের পরাধীনতার মর্মবেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন। যদিও বাঙ্গলা নাটকে সার্থক 'ট্র্যাজেডি' রচনা করবার ব্রত নিয়েই তিনি এই নাটকে হাত দেন। তাঁর 'ট্র্যাজেডি' রচনার মূল তথ্য ও বিষয় কল্যাণময় দেশহিতব্রত ও মহৎ আত্মোৎসর্গের বেদীমূলে নিহিত আছে। দেশের শত-সহস্র অধিবাসীর জীবনকে বিপদমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, আত্মমর্যাদা ও বংশগৌরব রক্ষার্থে একটি নিষ্পাপ বালিকা কিভাবে স্বেচ্ছায় জীবনকে উৎসর্গ করেছিল, সেই বিষয়কে নাট্যকার মধুসূদন স্বদেশানুভূতির আবেগমথিত চিত্তে বর্ণনা করেছেন। আত্মঘাতি সংগ্রামে, গৃহযুদ্ধে, ক্ষাত্রশক্তির অপব্যবহারে জাতি কি ভাবে হীন-বীর্য হয়ে পড়ে তার চিত্রও তিনি নাটকের কুশীলবের আচরণগত ঘটনার মাধ্যমে এঁকেছেন। সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা দেশের স্বাস্থ্যের পক্ষে কি রকম মর্মান্তিক ক্ষতিকর হতে পারে মধুসূদন নাট্যচরিত্র উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের মুখে প্রকাশ করেছেন। তিনি তপস্বিনীকে দুঃখ করে বলেছেন,

"ভগবতি, আপনি চিরতপস্বিনী, সুতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র বিশেষরূপে জানেন না। এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে?" (৩য়।২গ)

মধুসূদন আপন দেশবাসীর অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন বলেই, তাঁর গ্রীক আদর্শে রচিত 'কৃষ্ণকুমারী' শিল্পাদর্শে সার্থক। তিনি এই নাটকে পদ্মিনীর স্বপ্নাবির্ভাবের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে শিল্প-সৌন্দর্যগত সৌকর্যের সঙ্গে রাজপুত জাতির আত্মত্যাগের মহান আদর্শ যেন ওতপ্রোত-ভাবে মিশে গেছে। মধুসূদন পদ্মিনীর আত্মত্যাগের কাহিনী বিপুল গৌরবে বর্ণনা করেছেন। স্বপ্নদর্শনে বিহ্বলা কৃষ্ণা, তপস্বিনীকে আবেগমথিত কণ্ঠে বলেছেন,

"বোধ হলো, যেন আমি কোন সুবর্ণমন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে রয়েছি, এমন সময়ে একটি পরমসুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন,—বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম

কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই।...তারপর তিনি বললেন,—দেখ বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা নাই! আমি এই কুলেরই বধূ ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ম্ম কর, তা হলে আমারই মতন যশস্বিনী হবে।" (৩য়। ২য়)

এরপর থেকেই কৃষ্ণকুমারী চরিত্রের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। পদ্মিনীর আত্মত্যাগ আদর্শে দীক্ষিতা হয়ে তিনি দেশের মর্যাদা ও কুলের সম্মান রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর। আত্মত্যাগের মহানব্রতে অভিষিক্ত হয়ে তিনি বলেছেন,

"আমি রাজপুত্রী! রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীর কেশরী। আপনার ভাইঝি, আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি। (৫। ৩গ)
আবার দেখতে পাই, কৃষ্ণা পিতা ভীমসিংহকে বলেছেন,

"পিতঃ, আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ কচ্যেন কেন? জীব মাত্রেই শমনের অধীন। তা এতে দুঃখ কল্যে আর কি হবে? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার জন্যে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম্ম আছে? (আকাশে কোমল বাদ্য) ঐ শুনুন! রাজসতী পদ্মিনী আমাকে ডাকছেন! উনি এর আগে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যে 'কুলমান রক্ষার জন্যে যে যুবতী আপন প্রাণ দান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নেই।" (৫।৩গ)

খুল্লতাত বলেন্দ্রসিংহের কাছে কৃষ্ণা আত্মত্যাগের মহিমার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,

"কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লেখেন নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে; কিন্তু আবার কোন কোন তরুর কাষ্ঠে দেবপ্রতিমা নির্মাণ হয়। কুলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের জন্যে যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয়।" (৫।৩গ)

কৃষ্ণকুমারীর আত্মবিসর্জনের মহান রূপ ও বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি, টডের 'রাজস্থান কাহিনীর' বর্ণনাকে আশ্রয় করেই নাট্যরূপ লাভ করেছে। সেখানেও কৃষ্ণকুমারীর অটল সঙ্কল্পের কথা বর্ণিত আছে।

"Why afflict yourself, my mother, at this shortening of the sorrows of life? I fear not to die! Am I not your

daughter? Why should I fear death? We are marked out for sacrifice from our birth;···let me thank my father that I have lived so long!"[১২]

স্বদেশ হিতবাদী নাট্যকার মধুসূদন কোন সময়েই ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করেননি। ইতিহাসের ঘটনাবলী, রাজপুরুষ অথবা রাজবালাদের চরিত্র মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখলেই দেশাত্মবোধের আদর্শ জনগণের মধ্যে প্রকৃষ্টভাবে প্রচার করা সম্ভব, এইরূপ গভীর ইতিহাসচেতনার অধিকারী তিনি ছিলেন। মধুসূদন জানতেন অনেক সময় স্বাদেশিকতার আবেগ ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দেশাত্মবোধের প্রকৃত রূপ ভাবাতিশয্যের আস্ফালনে আত্মগোপন করে, কৃত্রিম উন্মাদনার যে উতরোল দেশবাসীর ধমনীতে সঞ্চারিত করে থাকে, তাতে লেখকের প্রকৃত স্বদেশহিতবাদী মানসিকতার পরিচয় থাকে না; ক্ষণিকের চপল তরঙ্গলীলা সৃষ্টি করে স্থির হয়ে যায়। মধুসূদন ব্যক্তিজীবনে যেমন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, সাহিত্য রচনাতেও তেমনি অভাব ছিল না বিশুদ্ধতার। পরাধীনতার মর্মবেদনা তাঁর স্বদেশ-প্রীতির অন্যতম রূপ ছিল বলে 'কৃষ্ণকুমারী' ট্র্যাজেডি রচনার সময়ে দেশপ্রেম ও দেশবাসীর করুণ দুর্দশার কথা অতীত কাহিনীর পটভূমিতে কনকবিদ্যুল্লতার মত বারে বারে চম্‌কে চম্‌কে উঠেছে। ভীমসিংহের গভীর খেদব্যঞ্জক উক্তিতে উনিশ শতকের কঙ্কালরূপ বাঙ্গলাদেশের অবস্থাই যেন প্রকাশিত হয়েছে।

"···এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই ত এ বিশ্বাস হয় না!··· হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বু তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ কর‍্যে তার সুস্বাদ নষ্ট কর‍্যে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে।" (২।১গ)

আবার,

"···আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো! হায়! হায়! (২।১গ)

কিন্তু মধুসূদন নৈরাশ্যের মধ্যে তাঁর আক্ষেপের পরিসমাপ্তি' ঘোষণা করেননি। দেশ ও জাতির সকল অমানিশা যে অচিরেই দূর হবে, তার

১২ রাজস্থান কাহিনী (প্রথম খণ্ড): টড: পৃ. ৪৩৩-৪৩৪

আস্থার কথাও তিনি প্রচার করেছেন, 'তপস্বিনী' চরিত্রের মাধ্যমে। ভীমসিংহকে সান্ত্বনা দিয়ে তপস্বিনী বলেছেন,

"মহারাজ, ভারতভূমির এ অবস্থা কিন্তু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না বসুধাকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পুণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন? অদ্যাবধি চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হচ্যে, এখনও এক পাদ ধর্ম্ম আছে।" (২।১গ)

পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাসে আস্থাশীলা তপস্বিনীর মুখে ধর্মের জয় ও শক্তি মাহাত্ম্য ঘোষণাতে মধুসূদনের আপন পিতৃ-পুরুষের ধর্মবিশ্বাস এবং আস্থার প্রতি গভীর অনুরাগই মমত্ববোধে ব্যক্ত হয়েছে।

দেশবাসীর কৃষ্ণারজনীতে মধুসূদনের কর্তব্য ও আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনায়।

"শুন গো ভারতভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি—
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যাজ ঘুম ঘোর,
হইল হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।"

স্বদেশবোধ ছাড়া সমকালের অপর এক যুগচিন্তাও মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে স্মারকচিহ্ন হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে। উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় নারীজাতির বন্ধন মুক্তির জন্য বিভিন্ন সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আমরা দেখেছি যে, মধুসূদনও ছিলেন ঐ পথের দিশারী। তাঁর বিভিন্ন কাব্যে নারী চরিত্রগুলি প্রায় প্রত্যেকেই আপন স্বাতন্ত্র্য মহিমার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। 'কৃষ্ণকুমারী'তে অনুরূপ ছায়াপাত ঘটেছে। কৃষ্ণকুমারীর তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ তদানীন্তন দর্শকদের অভিভূত করেছিল। সেই যুগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ, নারীদের স্বদেশহিতসাধনার পুণ্যাঙ্গনে যে ডাক দিয়েছিলেন এবং মধুসূদন তাকে কিভাবে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার পরিচয়টুকু আমরা গ্রহণ করেছি; তাঁর কবিমানস বিচারের ক্ষেত্রে।

এই ভাবে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ট্র্যাজেডি রচনার মুখ্য চিন্তার পাশ দিয়ে স্বদেশপ্রেমের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। তবে পরাধীনতার মর্মবেদনা ও

জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি মমত্ববোধ ব্যতিরেকে অন্য কোন জাতিবৈরাদর্শের স্বাক্ষর এতে মুদ্রিত নেই। অবশ্য এই পর্বে, প্রকাশ্যে ইংরেজ শাসকদের সমালোচনা করে নাটক রচনা করা সম্ভব ছিল না। কারণ, ইংরেজ রাজত্বের প্রতি বাঙ্গালীর মোহভঙ্গ সবেমাত্র শুরু হয়েছিল সেই সময়ে। জাতীয় রঙ্গমঞ্চ না থাকার জন্য অনেক সময় স্বাদেশিক ভাবাপন্ন নাটক লেখা নাট্যকারের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। 'ন্যাশানাল থিয়েটারে'র প্রয়োজনীয়তা মধুসূদন অনেক আগেই অবশ্য উপলব্ধি করেছিলেন। ইংরেজ সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় অনেকেই দেশাত্মবোধক নাটক মঞ্চস্থ করতে সাহসী হতেন না। এমন কি মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়নি। জাতীয় হিতবাদী নাটকের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে। 'জাতীয় রঙ্গমঞ্চ' স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী নাট্যকারদের চিন্তাস্রোত স্বদেশহিতবাদী নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করার দিকে ক্ষিপ্র গতিবেগে ছুটে চলে। অবশ্য ইতোমধ্যে বাঙ্গালীর স্বাদেশিক অনুভাবনা 'হিন্দুমেলা' সংবাদপত্র পরিচালনা, ইংরেজ শাসকদের দমন-মূলক নীতির প্রতিবাদ, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও বিশ্বময় প্রচার এবং বহু সংগঠনমূলক আলোচনাতে পুষ্টিলাভ করেছিল। বাঙ্গলা নাটক এই সমস্ত জাগরণী চিন্তায় প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই পর্বের নেতা ও নায়ক। তাঁর ন্যায়াদর্শে ও স্বদেশহিতবাদী চেতনায় বাঙ্গলা নাটক স্বাদেশিকতার গৌরবে হিরণ্ময় শোভা লাভ করে। পরবর্তী আলোচনাতে এ তথ্য আরও সুপরিস্ফুট হবে।

সাত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বাঙ্গলা নাটক

নাট্যকারের স্বদেশচিন্তা

১

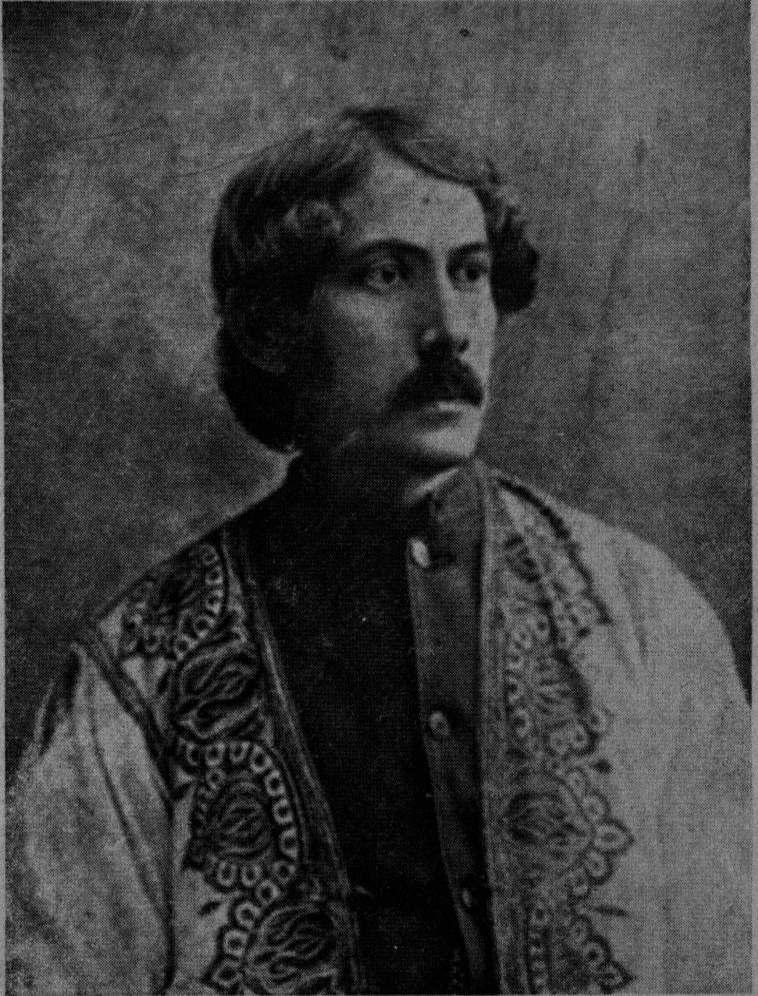
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীর দেশানুরাগ ও জাতীয় ঐক্যের পরিচয় আমরা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে উপলব্ধি করতে পারি। এই সময়ে দেশবাসীর স্বদেশবোধ ও স্বজাতিপ্রীতি মুখ্যতঃ ছিল ইতিহাস-চেতনাশ্রয়ী। সমাজ ও রাষ্ট্রবিচিন্তাতে বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ পরাধীনতার মর্মবেদনা ও স্বদেশপ্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন ইতিহাসের শঙ্খনিনাদ করে। বাঙ্গলা সাহিত্যের নাট্যশাখাতে এই একই চিন্তা প্রবাহিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকগুলির বিষয়বস্তুতে জাতির ইতিহাসচেতনার স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়ে আছে। অবশ্য এই সময়ে প্রাচীন ভারত সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার এক আন্তরিক তাগিদ বাঙ্গালী মনে প্রাণে অনুভব করেছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ রামদাস সেন দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালীকে ইতিহাস-সচেতন করে আক্ষেপে বলেন,

"সাহেবরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।· · ·ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই-এক জন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃ-পিতামহের নাম জানে না এবং দুই-এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে ; সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।···

এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্য্যে ক্ষমতাবান্ বাঙ্গালী অতি অল্প।······রাজকৃষ্ণ বাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন,······"[১]

এই রকম নানা প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর চিত্তে কর্মচাঞ্চল্যের জোয়ার এল। উপন্যাস, কাব্য ও নাটক—সাহিত্যের ত্রি-ধারাতে জাতীয় ভাব-ভাবনা

১ 'বাঙ্গালার ইতিহাস'; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশিত হতে লাগল। বাঙ্গালীর এই অভূতপূর্ব কর্মপ্রেরণা সম্পর্কে পরবর্তী-কালে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন।

"আজ বঙ্গভূমির আনন্দ উৎসব ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে শোনা যাইতেছে। আজ ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে যে নবজাতির জন্মসঙ্গীত শোনা যাইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিমঘাট গিরি সীমান্ত দেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি।"[২]

বঙ্গবাসীর এই স্বাদেশিক চিন্তা কেবল ঐতিহাসিক নাটকে নয় পৌরাণিক ও সামাজিক নাটককে আশ্রয় করে প্রচারিত হয়েছিল। বঙ্গভূমির চিন্তারাজ্যে সর্বত্রই 'শিকল্ ভাঙার গান' শুরু হয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের প্রাণরস এই আবহাওয়া থেকেই গৃহীত ও সঞ্চারিত। সমকালীন যুগের জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিক ভাবধারা তাঁর নাটকে অতীত ইতিহাসের নির্মোকে প্রকাশিত হয়েছে। পটভূমি বিচার প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই পর্বে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ও স্বাদেশিক ভাবধারা ইতিহাসচেতনাকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুরূপভাবে তাঁর নাট্য বিচিন্তাতে আপন ও যুগের ইতিহাস সচেতনতা ও রাজনৈতিক-স্বাধীনতা ঈপ্সার এক সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতার স্বরূপ বুঝতে হলে তাঁর স্বদেশ-হিতবাদী মানস সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আমরা জানি, মনের কাঠামো যদি স্বাদেশিক ভাবাদর্শে পুষ্ট না নয়, তবে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কোন অনুরাগ সৃষ্টি হ'তে পারে না। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায়, যে তাঁর চিত্তে কৈশোর পর্ব থেকেই স্বাদেশিকতার প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসিক আকাশ উনিশ শতকের স্বাদেশিক আদর্শের পরিমণ্ডলে গড়ে উঠে। শৈশবে ও বাল্যকালে ঠাকুর বাড়ীর প্রভাব তাঁর উপর বিশেষ কার্যকরী হয়। ঠাকুর বাড়ীর সকলেই জাতীয় ভাবের অনুগামী ছিলেন। আপন দেশ ও জাতিকে তাঁরা সকলের উর্দ্ধে ভালোবেসেছিলেন। তাই মাতৃভাষার অনুশীলন, জাতীয় শিল্প ও সংগীতের প্রতি অনুরাগ, সমস্ত কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সমন্বয় সাধন এবং দেশের ধর্ম-সংস্কৃতির

'বালক' পত্রিকা: পৌষ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।

প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ছিল ঠাকুর পরিবারের বৈশিষ্ট্য। ঠাকুর বাড়ীর স্বাদেশিক আদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন,

"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার প্রচলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে ঠাকুর বাড়ীর অভ্যন্তরে বঙ্গবাসীর স্বদেশানুরাগের আগমনী সর্বপ্রথম শোনা গিয়েছিল। আর এর নান্দী পাঠক ছিলেন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভের জন্য 'আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্মে'র প্রচার চেয়েছিলেন। বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমিতির সঙ্গে তাঁর সংযুক্তি ও জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানা কর্মপন্থা গ্রহণ সম্পর্কে তাঁর যে গৌরবজনক ভূমিকা, তার পরিচয় আমরা পূর্বেই গ্রহণ করেছি। দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী' সভা পত্রিকা বিদ্যালয় ছিল সকল স্বাদেশিক হিতাদর্শের প্রচারকেন্দ্র। ব্রাহ্মসমাজ, 'সন্দেহে—বিচার সঙ্গতি—সমন্বয়' চতুর্বর্গাদর্শে বাঙ্গালীর জীবন ও চরিত্রে স্বাধীনতার প্রেরণা এনেছিল। জাতীয় ভাব সম্পর্কে স্থির নির্দেশ, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, মনুষ্যত্ববোধের পূর্ণ অনুশীলন, সুতীক্ষ্ণ বিচারবোধের উপর দেশবাসীর সফল কর্তব্যের নির্দেশ, আত্মনির্ভরতার প্রসার ও পরানুকরণ মোহবৃত্তি পরিহার, জ্ঞান ও যুক্তির বিমিশ্রণে মঙ্গলবোধ ও মৈত্রীভাবনার বিকাশ প্রভৃতি নানা কার্যকরী আদর্শে বাঙ্গালীকে আত্মসচেতন ও স্বদেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলবার দায়িত্ব পালন করেছিলেন—ব্রাহ্ম সমাজ। জাতির যাবতীয় সমস্যা জাতীয়ভাবে সমাধান করা উচিত—ব্রাহ্ম সমাজের স্বদেশানুরাগের এটাই ছিল সার কথা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর এই সব আদর্শের প্রভাব প্রখরভাবে কার্যকরী হয়েছিল। তাঁর স্বদেশচিন্তা

৩ জীবনস্মৃতি (স্বাদেশিকতা): রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; পৃ. ৭৭

ঠাকুরবাড়ী ও ব্রাহ্ম সমাজের স্বাদেশিক হিতাদর্শ উভয়কে একনিষ্ঠভাবে বরণ করেছিল।

এছাড়াও সমকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবও ছিল তাঁর উপর গভীর। তিনি বাঙ্গালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মনোভাবনার তপ্তভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন (১৮৪৯)। এই বৎসর বাঙ্গালী 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' বা 'কালা আইনের' প্রতিবাদ করে আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার স্থাপনের বাসনা প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনে এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'The National Association' বা 'দেশহিতৈষিণী সভা' এবং 'The British India Association' বা 'ভারতবর্ষীয় সভার' সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। 'ভারতবর্ষীয় সভা' দেশবাসীর রাষ্ট্রিক অধিকার ও দাবিদাওয়া প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করত, তাতে দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল বিশেষ মর্যাদার। মুখ্যত: তাঁরই প্রচেষ্টায় 'কালা আইন'কে কেন্দ্র করে এক সর্বভারতীয় গণ-আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিস্তৃত সংবাদ আমরা পূর্বেই গ্রহণ করেছি। পুনরাবৃত্তি করার উদ্দেশ্য এই যে, দেবেন্দ্রনাথের বিভিন্ন দেশাত্মবোধক কার্যকলাপ কি ভাবে পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেশাত্ম-বোধে অনুপ্রাণিত করে মনের কাঠামোটিকে গড়ে তুলেছিল, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পৃথিবীতে চোখ মেলে অনুভূতির প্রথম আলোকে দেখেছিলেন, কি ভাবে ধীরে ধীরে বাঙ্গালী আত্মমর্যাদা ও আত্মশক্তিতে সচেতন হয়ে উঠছে; আর ব্রিটিশ সরকারের উপর মোহ কেটে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। এ ছাড়াও 'সিপাহী বিদ্রোহ' ও 'নীল আন্দোলনে' ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সচেতনতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তিনি লক্ষ্য করেছেন অত্যন্ত সচেতনভাবে। এই সমস্ত রাজনৈতিক বিদ্রোহ তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। এর সঙ্গে সমকালের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মর্মবেদনা যা সাহিত্য ও সংবাদপত্রাশ্রয়ী হয়েছিল তার সঙ্গেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যোগ ছিল নিবিড়। এ কথায় উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত বাঙ্গালীর জাতীয় ভাবনা ও স্বাদেশিক ভাবাদর্শ যে সমন্বয়ী মত ও পথ আবিষ্কার করবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিয়োজিত ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাতে একাত্ম অনুভব করেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে 'হিন্দুমেলার' আদর্শে গভীর অনুরাগ ও অনুক্রমণ, ম্যাটসিনীর আদর্শে 'সঞ্জীবনী সভা' স্থাপন, 'ভারতী' পত্রিকা

প্রকাশনা, দেশীয় শিল্প বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা, স্বদেশী স্টীমার পরিচালনা সমস্ত কিছু একত্রযোগে তাঁর বালকমনের উদ্দীপন বিভাবের ফলশ্রুতি।

জীবকুল যেমন বায়ুমণ্ডলের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারে না, তেমনি নাট্যকারেরাও পারে না যুগের প্রভাবকে এড়িয়ে থাকতে। আবার নাট্যকার যদি স্বাদেশিক ভাবাদর্শে অনুরাগী হন, তখন তিনি নাটক রচনা করেই ক্ষান্ত হন না; আপন যুগের প্রতিটি স্বদেশহিতবাদী কর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে জাতির সংগঠন ও স্বাধিকার আন্দোলনকে বেগবতী করে তোলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন এই সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি দেশবাসীর জাতি সংগঠন কাজে যোগদান করেন ও নেতৃত্ব দেন। তাঁর নাটক রচনাও স্বদেশহিতাদর্শের অন্যতম ফলশ্রুতি। স্বদেশপ্রেমের গাঢ় উপলব্ধি তাঁর কর্ম ও সাহিত্য রচনার সর্বত্র প্রবাহিত।

সমসাময়িক সমাজ, কাল ও ঠাকুরবাড়ীর জাতীয়তাবাদী আদর্শ তাঁর স্বদেশবোধকে গড়ে তুললেও, তাঁর চিত্তে স্বদেশহিতবাদীতার যে ক্ষিপ্র গতিবেগ তা প্রত্যক্ষভাবে 'হিন্দুমেলার'ই অবদান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদার সর্বসমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী, আত্মনির্ভরতার আদর্শ প্রচার, পৌরুষচেতনার উদ্বোধনে জাতীয় মর্যাদার প্রতিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের মহনীয়তায় জীবনের সত্যকার মূল্যবোধ স্থাপন—সমস্ত কিছু একত্রযোগে তাঁর চিত্তের স্বাদেশিক আদর্শকে গড়ে তোলে। অবশ্য এর পশ্চাতে 'হিন্দুমেলার' প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল। তিনি যে সর্ব বিষয়ে জাতিকে স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিলেন তার পিছনে 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'হিন্দুমেলা'র জন্ম জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যৌবন কালের সূচনায় হয়। স্বাদেশিকতার আদর্শ সম্পর্কে তাঁর ধারণা হয়েছে ততদিনে পরিষ্কার। এই সময়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, বিজাতীয়ভাব ও পুঁথিগত 'প্যাট্রিয়টিজম্' কোন সময়ে জাতীয়তার প্রকৃত মত ও পথ হতে পারে না। স্বাদেশিকতাকে স্বদেশের মাটিতে তার স্বকীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে ঐক্যবোধে একত্রিত হয়ে অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতিতে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করলে দেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি করা সম্ভব। তিনি এই মহাজ্ঞান হিন্দুমেলার বিভিন্ন অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব থেকে গ্রহণ করেছিলেন। নবগোপাল মিত্র ছিলেন তাঁর এ বিষয়ে দীক্ষাগুরু। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনীকারের কথায়,

"নবগোপালবাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এ সময়ে কবিতা লিখিতেন না, বা ইহার পূর্বে কখন লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ হওয়ায় তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি রচিত হইবার মাত্র, নবগোপালবাবু গণেন্দ্রবাবুকে দেখাইতে লইয়া গেলেন। জ্যোতিবাবু সেখানে গিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলে গণেন্দ্রবাবু, 'বেশ হয়েছে, এটা এবার মেলায় পড়তে হবে,' বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেবার কার মেলায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে শাস্ত্রী—সম্প্রতি পরলোকগত), শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও জ্যোতিবাবু এই তিনজনের কবিতা পঠিত হয়। জ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ, অত ভীড়ের মধ্যে ঠিক শোনা যাইবে না বলিয়া হেঁমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে পাঠ করিয়াছিলেন··"[৪]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে কবিতাটি পাঠ করা হয়েছিল তার অংশবিশেষ আলোচনার স্বার্থে গ্রহণ করা হল। কবিতাটি 'উদ্বোধন' শিরোনামে পঠিত হয়।

"জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান,
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্ব্বকীর্ত্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন?
দেখ দেখি জননীর দশা একবার,
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থিচর্ম্ম সার,
অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষসদুর্জয়—
শুষিছে শোণিত তাঁর বিদরী হৃদয়,
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড,
সর্বাঙ্গ সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড!
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে?
যে জননী পয়ঃসুধা শত নদী ধারে—
পিয়াইছে নিরবধি আমা সবাকারে,

৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃ. ১২৮।

যে জননী মৃদু হাসি সব দুঃখ ভুলি,
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি,
এমন মায়েরে ভোলে যে কোন সন্তান
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ সমান।"[৫]

সমকালীন যুগপ্রভাব এই কবিতাটিতে চিহ্নিত হয়ে আছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীর স্বদেশবোধের নবজাগ্রত চেতনা এবং অতীত ইতিহাসপ্রীতি একই সঙ্গে পাশাপাশি কবিতাটিতে ঠাঁই পেয়েছে। এমন কি পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে কোন্ মার্গ অবলম্বন করবেন তারও সঙ্কেত এই কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। পরাধীনতার নাগপাশে ম্রিয়মান বাঙ্গালীকে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত করতে হলে অতীতকালের গৌরবগাথা স্মরণ করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এ বিশ্বাস তাঁর মনের গভীরে ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের অতীতগৌরব কাহিনী পাঠ ও বিশ্লেষণ করে তাঁর এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ভারতের বিগত কালের জাতীয় শূরবৃন্দের মহান স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ বর্তমান ভারতবাসীর চিত্তে অনুবিদ্ধ করাই তাঁর একমাত্র কর্মপন্থা ছিল। আত্মত্যাগ ও আত্মনির্ভরতাই ছিল তাঁর স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্র। পরাধীনতার মর্মগ্লানি তাঁকে জর্জরিত করেছিল বলেই, তিনি ব্যক্তিজীবনে সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করেও স্বদেশ সেবাতে পিছুপা হননি। তাঁর স্বদেশানুরাগে ভাবাতিশয্য ছিল সত্য, কিন্তু তার প্রাকৃতিক ধর্ম ছিল সোনার মত পবিত্র ও বর্ণোজ্জ্বল।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ যখন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেন, তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যুবক। তিনি তখন মনেপ্রাণে স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ফলে অনুকূল বাতাসে তিনি স্থাপন করলেন 'সঞ্জীবনী সভা'। এর সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'হাঞ্চু-পামু-হাফ্'। ম্যাটসিনীর 'কার্বোনারী' গুপ্তসভার প্রভাব এতে পড়েছিল। "জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্য্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।"[৬]

৫ ভারতী : পৌষ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ ১৬৬।

শৈশবকালে তিনি অবশ্য ঠাকুরবাড়ীতে 'ম্যাসনিক' (Masonic) সভা* প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার পরবর্তী সংস্কৃত রূপ 'সঞ্জীবনী সভা'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে 'সঞ্জীবনীসভা'র আভ্যন্তরীণ ইতিহাস পাওয়া যায়।†

---

* "আর একদিন আমাদের বারান্দার আড্ডায় কথা উঠিল—আমাদের মধ্যে 'ফ্রী ম্যাসন' (Free-mason)-এর মত একটা কিছু করিলে হয় না? এ কল্পনাটা গুণদাদার খুব ভাল লাগিল। এ প্রস্তাবটি তিনি আন্তরিক অনুমোদন করিলেন। আমি বলিলাম এখনি ইহার উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাউক। দেশী 'ম্যাসনিক' (Masonic) দলের কিরূপ পরিচ্ছদ হইবে, প্রথমে ইহাই হইল আমাদের প্রধান সমস্যা। যাহা হউক অনেক প্রকার যুক্তি-তর্ক বাদ-প্রতিবাদ করিয়া একটা পোষাক স্থির হইল।

* * * *

ও বাড়ীর সংলগ্ন একটা ছোট বাড়ী আমাদের নূতন কেনা হইয়াছিল, সেই বাড়ীতে 'ফ্রী ম্যাসন' (Free mason)-এর আড্ডা বসিল। 'ফ্রী ম্যাসন' সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা কিছুই ছিল না। এ সভায় আমাদের যে কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাও কিছু স্থির হয় নাই। এইমাত্র জানিতাম যে, আমাদের যাহা কিছু করিতে হইবে, সমস্তই গোপনে করিতে হইবে। একটা প্রতিজ্ঞাপত্র লিপিবদ্ধ হইল। তাহার মর্ম কতকটা এইরূপ, "এখানে আমরা যাহা শুনিব, যাহা দেখিব বা যাহা করিব তাহার কিছুমাত্র বাহিরে প্রকাশ করিব না—প্রাণান্তেও না।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ; পৃ. ৭২-৭৩।

† "ঠনঠনের একটা পোড়ো বাড়ীতে এই সভা বসিত।…সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথও এই সভার সভ্য ছিলেন। পরে নবগোপালবাবুকেও সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল……

যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি ; অর্থাৎ সভায় যাহা কথিত হইবে, এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুইপাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত-ভারতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারে ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—'সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্'। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্য (অর্থাৎ কিনা গল্পগুজব) আরম্ভ হইত। কার্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্তভাষায় 'সঞ্জীবনীসভা'কে 'হাঞ্চু পামু হাফ্' বলা হইত। ইহার দীক্ষা অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ গাম্ভীর্য ছিল। দীক্ষাকালে নব দীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ; পৃ. ১৬৬-১৬৭।

রবীন্দ্রনাথ এই সভার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন,

"জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়ীতে তার অধিবেশন, 'ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।"[৭]

জীবনস্মৃতির পাতাতেও রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গুপ্ত সভার কথা উল্লেখ না করে পারেন নি।

"জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ-রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিক সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ঙ্কর ছিল। .....দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋকৃমন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না।"[৮]

রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতিদ্বয়ের প্রথমটিতে, 'ভারত উদ্ধারের দীক্ষা' ও দ্বিতীয়টিতে, 'ইহা স্বাদেশিক সভা' কথাগুলিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার পরিচয়টি সুচিহ্নিত হয়ে আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের অপরিমিত হৃদয়োচ্ছ্বাস তাঁর অনেকগুলি কর্মের মধ্যে নিহিত আছে। জাতীয় পোশাক-পরিকল্পনা, দেশলাই কারখানা স্থাপন, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার—বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। অপরিসীম মনোবল ও আত্মশক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি এই সমস্ত কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। দেশের মঙ্গল ও জাতির উন্নতি তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু ছিল বলেই তিনি কোন স্বার্থচিন্তাতে মগ্ন হন নি। জাতীয় পোশাক পরিধানে তাঁর অসীম মনোবলের কথা প্রশংসা করে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"দেশের জন্য অবাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে

৭ সপ্ততিতম জয়ন্তী উপলক্ষে (ইং ১৯৩১) প্রতিভাষণ, দ্র 'অবতরণিকা' রচনাবলী ১।

৮ জীবনস্মৃতি (স্বাদেশিকতা): রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৭৮।

পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।"[৯]

বাস্তবতার দিক দিয়ে বিচার করলে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাপড়ের কল স্থাপন, দেশলাই কারখানা নির্মাণ, বিদেশী স্টীমার কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভরাডুবি, সমস্ত কিছু অপরিণামদর্শিতার অব্যর্থ পরিণতি হিসাবে পরিগণিত হবে, কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি কর্মের মধ্যে প্রজ্বলন্ত স্বদেশানুরাগ যে ব্যঞ্জিত হয়েছিল তাতে বোধহয় কেউ সন্দেহ করতে পারবেন না। তাঁর আপাত ব্যর্থতার মধ্যেই জাতির ভবিষ্যৎ সাফল্য-সৌধ নির্মিত হয়েছিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই মন্তব্য করেছেন,

"এই-সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন ; সে-বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায় কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে-পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—"[১০]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আত্মাভিমানী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই অভিমান ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না—ছিল দেশ ও জাতিকেন্দ্রিক। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে তাঁর গর্বের মধ্যে স্বজাতির গর্ব মিশে আছে। তাই বারবার মনে পড়ে স্বদেশী স্টীমার পরিচালনার ব্যাপারে জাহাজের খোল ক্রয়ের সময়ে তাঁর স্বীকারোক্তি,

"......আমি পুনর্বিক্রয়ে স্বীকৃত হইলাম না। অস্বীকৃত হওয়ার প্রধান কারণ এই হইল যে, বাঙ্গালায় বাঙ্গালী কর্তৃক আমিই সর্বপ্রথম জাহাজ চালান প্রবর্তন করিব, এই গর্ব।"[১১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে পৌরুষসাধনার উপাসক ছিলেন। তিনি গুরু নবগোপাল মিত্রের মত মনে করতেন, দুর্বলতাই বাঙ্গালীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ। তাঁর শিকার যাত্রা পরিকল্পনা, আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষা সমস্ত কিছুই ছিল বাহুবলের সাধনা। এ বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন,

৯ জীবনস্মৃতি (স্বাদেশিকতা) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃ. ১৯।

১০ জীবনস্মৃতি (জাহাজের খোল) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১৪১।

১১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ; পৃ. ১৯২।

"শারীরিক দুর্বলতা ও ভীরুতাই বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক।...অতএব এই অভাবটি যতদিন না মোচন হইবে, ততদিন বাঙ্গালী জাতির কোন আশাই নাই। এই অভাব মোচন না হইলে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞানচর্চাই হউক, বাণিজ্য-শিল্পের অনুশীলন হউক বা রাজনৈতিক উৎসাহ উদ্যমের পরিচয় দিয়া সভায় বক্তৃতারই ধূমধাম হউক, বাঙ্গালীর প্রকৃত অভাব কিছুতেই ঘুচিবে না, তাহারা কখনই প্রবল জাতিদিগের মধ্যে গণ্য হইবে না, তাহারা কখনই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবে না।"১২

স্বাদেশিকতার আদর্শ ও জাতীয় হিতবাদী চিন্তাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দেশবাসীর আত্মশক্তির উদ্বোধন চেয়েছিলেন। তিনি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির আবেদন-নিবেদন নীতিকে কখনও সমর্থন করেন নি। তিনি এ বিষয়ে 'ভারতী' পত্রিকায় লেখেন,

"কিন্তু বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ইহা ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন আর কি? যখনই ইংরাজেরা আমাদের দেশ জয় করিলেন এবং যখনই আমরা পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদানত হইলাম, তখন হইতেই আমরা বাধ্য হইয়া আমাদের সমস্ত ন্যায্য অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন আমরা যাহা কিছু তাঁহাদের নিকট পাইতেছি, সে কেবল তাঁহাদিগের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এখন অধিকার সমর্থনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে বলের অকাট্য যোগ। যেখানে বল নাই সেখানে অধিকার কোথায়? দুর্বলের প্রতি দেবতারা বিমুখ।.....ইংরাজের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ উহা পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ নহে। উহা বিজয়ী বিজিতের সম্বন্ধ, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ, উহাতে হৃদয়ের তিলমাত্র সংস্রব নাই।...আসল কথা যতটুকু স্বকীয় স্বার্থের অনুকূল, ততটুকুই ইংরাজ আমাদের জন্য করিয়াছেন এবং এখনও করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার অধিক নহে।"১৩

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিক আদর্শের অনুগামী হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন দেশপ্রীতি ও সর্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যে স্বাদেশিকতার শুভ উদ্বোধন চেয়েছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও অনুরূপভাবে জোর দিয়েছিলেন জাতিপ্রীতি ও ধর্মপ্রীতির

১২ প্রবন্ধমঞ্জরী (ভারতীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা): জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; পৃ. ৬৬।

১৩ ভারতী (আবেদন না আত্মচেষ্টা): আশ্বিন ১৩১১, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপরে। উগ্র জাতীয়তাবাদকে তিনি কোনদিন সমর্থন জানাননি। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল,

"দেশানুরাগ অতিরিক্ত হইলে অন্য জাতির প্রতি অত্যাচার এবং অসার জাতীয় অহংকার উৎপন্ন হয়।"[১৪]

আবার, যাঁরা স্বদেশানুরাগে অভিষিক্ত নন, তাঁদের সম্পর্কে তিনি বলেন,

"দেশানুরাগের ন্যূনতা হইলে জাতির অধিকার সকল সেরূপ উপযুক্তরূপে সমর্থিত হয় না, সুতরাং অন্যজাতির অনধিকার প্রবেশের প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং জাতীয় শক্তি ও জাতীয় অনুষ্ঠানের অমর্যাদা করিলে উন্নতি উদ্যম নিরুৎসাহিত হয়।"[১৫]

স্বাদেশিকতার আদর্শ বিস্তারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক ঐক্য চেয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সব রকম বিরোধ মিটিয়ে জাতীয় একতা স্থাপনে তাঁর চিত্ত সর্বদাই ছিল উদগ্রীব। এ সম্পর্কে তিনি লেখেন,

"আজকার ভারতবর্ষে মুসলমান সমস্যাই প্রধান সমস্যা। জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ লোক কংগ্রেসের প্রতিকূল কেন, তাহার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে। মুসলমানেরা এখনও হিন্দুদিগকে বিজিত প্রজার জাতি বলিয়া মনে করে, মুসলমানেরা দেখিতেছে যে হিন্দুরা অন্যপ্রকার যুদ্ধক্ষেত্রে—অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ...সরকারী চাকরীতে জয়লাভ করিয়া তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে। ...এই বিপদ নিবারণের একটি মাত্র উপায় মুসলমানদের অপরিসীম অজ্ঞতাকে একেবারে ধ্বংস করা।"[১৬]

শেষের দিকে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কংগ্রেস দলের চরমপন্থীদের অনুরাগী হন। এঁদের ন্যায়-নিষ্ঠা, আপোষহীন স্বদেশপ্রেম, পূর্ণ-স্বাধীনতা কামনা, গণসংযোগ এবং দেশবাসীর সকল স্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পুনরুজ্জীবিত করবার প্রয়াস, তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। এ ছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সমকালে সুরাট কংগ্রেসে, জাতীয় নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তা ও প্রয়োগ নীতিতে পার্থক্য দেখা দিলে, তিনি চরমপন্থীদের সমর্থন করে 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখেছিলেন,

১৪ প্রবন্ধমঞ্জরী : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃ. ৮০।

১৫ ঐ

১৬ প্রবাসী (ভারতে রাষ্ট্রীয় মহাসভা) : আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩১৫ ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"অনেক মধ্যপন্থী মনে করেন যে তাঁহারা ইংরাজকে খুশী করিয়া কিছু রাজনৈতিক অধিকার বকসিস্ পাইবেন। এইজন্য তাঁহারা নিজেদের চরমপন্থী ভাইদের ত্যাজ্য ভাই করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া মাথা মুড়াইতেও প্রস্তুত।.....

আমরা এ পর্যন্ত আইন মানিয়া চলিয়াছি, ভবিষ্যতেও বিবেকবিরুদ্ধ আর ধর্মবিরুদ্ধ না হইলে আইন মানিব। কোনকালেই পরের অনিষ্ট চেষ্টারূপ অধর্ম করিব না। কিন্তু কোনও কারণে দেশের মঙ্গল সাধনেও বিরত থাকিব না।"[১৭]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালী যে আপোষহীন জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার কথা ভেবেছিল তাকে পরম আন্তরিকতার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমর্থন করেছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি মনেপ্রাণে দেশবাসীকে সচেতন করবার মহান ব্রত নিয়েছিল। তিনি যুগের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নিজে যেমন বিভিন্ন স্বাদেশিক কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তেমনি আপন চিত্তের স্বাদেশিক আদর্শকেও দেশবাসীর মর্মগ্রন্থীতে অনুবিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন নিজ সারস্বত সাধনার মধ্য দিয়ে। স্বাদেশিকতার আদর্শ সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ ছিল,

"চলরে চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান
বীরদর্পে পৌরুষগর্বে সাধরে সাধ সবে দেশের কল্যাণ,
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য, কে করে মোচন ?
উঠ জাগো সবে বলো মাগো তব পদে সঁপিনু পরাণ।
একতন্ত্রে কর তপ, একমন্ত্রে কর জপ,
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক, একস্বরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাওরে আনিতে নবজ্ঞান,
নবভাবে নবোৎসাহে মাতো উঠাওরে নবতর তান॥
লোকরঞ্জন, লোকগঞ্জন, না করি দৃকপাত
যাহা শুভ যাহা ধ্রুব ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু-মুসলমান,
এক পথে একসাথে চল উড়াইয়ে একতা নিশান।"[১৮]

১৭ প্রবাসী : মাঘ, ১৩১৫, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : মন্মথনাথ ঘোষ ; পৃ. ১৬৫।

এবার আমরা তাঁর নাটকগুলিতে স্বাদেশিকতার স্বরূপটি উপলব্ধি করতে অগ্রসর হব।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশচিন্তা

২

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলি যে যুগ প্রভাবের অন্যতম ফসল, তা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে অনুমান করলে কোন ক্ষতি বা ত্রুটি হবে না। জাতির আত্মগৌরবের পুনরাবিষ্কার, স্বনির্ভরতার পরাকাষ্ঠা, পৌরুষ-চৈতন্যের পুনরুদ্ধার, সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বৈরী মনোভাব পরিত্যাগ করে দেশানুরাগ এবং জাতি-ঐক্য প্রতিষ্ঠা, যা সমকালের দেশনেতাদের সমস্ত কর্মের মূল লক্ষ্য ছিল; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের উপর তার সক্রিয় প্রভাব সহজে লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার নিজেও ব্যক্তিগতভাবে দেশের ঐ সকল আদর্শে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জাতীয় চেতনা শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতের অতীত ইতিহাসের গৌরব কাহিনী উদ্ধার করে তাতে উনিশ শতকের যুগবাণী সমন্বিত করেছেন এবং দেশবাসীর চিত্তভূমিতে বপন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

ঐতিহাসিক নাটক 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম রচনা। নাট্যকার গ্রীকরাজ সেকন্দর শার ভারত আক্রমণ এবং তাঁর সঙ্গে পাঞ্জাবের নরপতি পুরুরাজের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী এই নাটকে চিত্রিত করেছেন। অবশ্য 'পুরু-ঐলবিলা' এবং 'অম্বালিকা-সেকন্দর শা'র যে প্রেম কাহিনী আখ্যান হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে নাট্যকারের কল্পনা প্রসূত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কাহিনী গ্রহণ করলেও, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীর জাতীয়চিন্তা ও স্বাদেশিকতার স্বরূপটি 'পুরুবিক্রমে' ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। পুরুরাজের স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আদর্শ, নাট্যকার ইতিহাসানুগ না করে যুগানুগ করতে ব্রতী হয়েছেন। অখণ্ড ভারত চেতনার উপলব্ধি পুরুরাজের কালে একেবারেই ছিল না। সে সময়ে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ গৃহবিবাদ ও খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রের মধ্যে আত্মঘাতী কলহ সর্বজনবিদিত। সেকন্দর শা'র বিরুদ্ধে 'পুরুরাজে'র স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল সম্পূর্ণভাবে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার।

অথচ, পুরুবিক্রম নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে পঞ্চনদ-কুলবর্তী সমস্ত প্রদেশের রাজগণের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যুগচেতনার প্রভাব সম্বলিত অপর একটি চরিত্র—গায়িকা 'উদাসিনী'। এই চারণী চরিত্র পরিকল্পনার পিছনে সে যুগের বাঙ্গালীর বৃহত্তর ভারতচেতনা ও জাতীয় সংহতির আদর্শ বিমূর্ত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, 'হিন্দুমেলা'র ভারতগৌরব ও জাতীয় হিতাদর্শের প্রয়াসটিকে 'উদাসিনী' চরিত্রের মধ্যে অনুবিদ্ধ করে স্বাদেশিকতার মহত্ত্ব প্রচার করেছেন। 'হিন্দুমেলা'র বিখ্যাত গান, 'মিলে সব ভারত সন্তান, এক তান-মন-প্রাণ', এই চরিত্রের দ্বারা তিনি আরও ব্যাপক ও প্রয়োগপদ্ধতিতে প্রচার করেছেন।* 'উদাসিনী' চরিত্রটি প্রকৃত পক্ষে যুগচেতনার নাট্যরূপ। চারণী 'উদাসিনী' তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলেছেন, রাজকুমারী 'ঐলবিলা'কে,

"...আমি একজনকে প্রাণের সহিত ভালোবাসতেম, কিন্তু সে নির্দয় হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করেছে। সেই অবধি আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি, মানুষকে আর আমি ভালোবাসব না। সেই অবধি আমি স্বদেশকে পতিত্বে বরণ করেছি; আমি দেশকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি। আমি দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারি। আমার আর কোন কাজ নাই, আমি এই গানটি সকল জায়গায় গেয়ে বেড়াই; এই আমার একমাত্র ব্রত হয়েছে। আমার যে পাঁচ ভাই আপনার সৈন্যদলের মধ্যে নিবিষ্ট আছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই এই গানটি আমি শিখিয়ে দিয়েছি ও তাদের আমি বলে দিয়েছি যে, এই গানটি গেয়ে যেন তাঁরা সকল সৈন্যগণের মধ্যে দেশানুরাগ প্রজ্বলিত করে দেন।" (১।১গ)

অন্যত্র,

"...আমি 'হোক ভারতের জয়' এই গানটি দেশ-বিদেশে গেয়ে গেয়ে

---

* 'পুরুবিক্রম' দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৯) রবীন্দ্রনাথের—

"একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

গানটিও ব্যবহৃত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেই গানটির প্রথম প্রকাশ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন- 'গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি।' গানটি পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'সঙ্গীত প্রকাশিকা'র এক সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনা রূপেই স্বরলিপিসহ পুনর্মুদ্রিত হয়।

প্রসঙ্গ কথা: জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ; বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ৬৫০-৬৫১।

বেড়াই, এই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। যাতে সমস্ত ভারতভূমি ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমার মনের একান্ত বাসনা।" (৩।২গ)

প্রকৃতপক্ষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর উদ্যোগে পরিচালিত 'হিন্দুমেলা'র মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতার যে উৎসাহ-বহ্নি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকে তাই অভিব্যক্ত হয়েছে। এক অখণ্ড জাতিগঠন নির্মাণের মহান প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন 'হিন্দুমেলা'র ঋত্বিকগণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসপরিমণ্ডলও অনুরূপ মর্মাদর্শকে বরণ করেছিল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্য সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেন,

"সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে এখন একতা নাই—এখন হিন্দুজাতিকে একটি সমগ্র জাতি বলিয়াই যেন বোধ হয় না।...এই একতার অভাবেই আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি, এবং পৃথিবীর অনেক জাতিই এই একতার অভাবেই স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইযাছে।"[১৯]

দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য রচনা ও স্বদেশপ্রেম বিস্তারের যে মহতী দায়িত্ব 'হিন্দুমেলা'র সমস্ত যাজ্ঞিকরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকেই নাটক রচনার আদর্শগত উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই এ বিষয়ে পুরুবিক্রম নাটক রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

"...হিন্দুমেলার পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্ত্তন করিলে, হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কটকে থাকিতে থাকিতেই, আমি 'পুরু-বিক্রম' নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।"[২০]

শুধু পুরুবিক্রম নাটকের ক্ষেত্রে নয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে, এই দেশাত্মবোধ বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়েছে। এর জন্য তিনি প্রয়োজনবোধে ইতিহাস-সত্যকে অস্বীকার করতেও দ্বিধা করেননি।

স্বদেশপ্রেম জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের রস-রক্ত হলেও, তাতে কোন

১৯ ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২০ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃ. ১৪১।

উগ্রতা বা সঙ্কীর্ণতার ঠাঁই ছিল না। স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে, তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ঐক্য কামনা করেননি, মৈত্রী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনেরও অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর 'অশ্রুমতী' নাটকে, সম্পূর্ণ মানবিক আদর্শে 'সেলিম ও অশ্রুমতী'র প্রণয় ও প্রীতির চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই উদার মানবিকতা রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায় সহ্য করতে পারেননি। অশ্রুমতী নাটকে (১৮৭৯) 'সেলিম ও অশ্রুমতী'র প্রণয়চিত্র নিয়ে এক বিশেষ বাদানুবাদ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়।* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বিতর্কের উত্তর দিয়ে বলেন,

"যদি কেহ বলেন, প্রতাপসিংহের দুহিতা একজন মুসলমানকে ভালবাসিবে—দেখুন কিরূপ অবস্থায় অশ্রুমতী মানুষ হইয়াছিল—সে জানিত

* 'অশ্রুমতী ও 'সেলিমে'র প্রণয়চিত্রে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ যে ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন তার দুই একটি উদাহরণ নেওয়া হ'ল :

(১) বড়বাজার লাইব্রেরীর অবৈতনিক সম্পাদক পণ্ডিত কেশবপ্রসাদ মিশ্র ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০১ তারিখের পত্রে লেখেন,

"......Considering the great regard which the Rajputs have for their religion and the spirit of exemplary independence possessed by the great Maharana Pratap Singh, the story of his alleged daughter, Ashrurmati's love for the Mahomedan Prince Salim, based upon pure imagination, is a slur cast on the sacred memory of the Maharana, who has been highly revered by the Hindu Society."

(২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বারাণসীস্থ হিন্দী অনুবাদের প্রকাশক রামকৃষ্ণ বর্মা ২৯শে অক্টোবর ১৯০১ তারিখে লেখেন,

"......আপনার রচিত 'অশ্রুমতী' নাটক আমি নিজ খরচে ছাপাইয়াছিলাম, কিন্তু কতিপয় পত্রে উহার কুৎসা রটাইয়া আমাকে বাধিত করিল যে ভবিষ্যতে যেন আর বিক্রয় না করি। তন্নিমিত্ত আমাকে প্রতুল অর্থহানি সহ্য করিতে হইয়াছে।"

(৩) সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০শে নভেম্বর ১৯০৩ তারিখের পত্রে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথকে লেখেন,

"......ব্যাপার এই যে 'রাজস্থান সমাচার' নামক হিন্দী কাগজে এবং সেই সঙ্গে 'বেঙ্কটেশ্বর সমাচার' প্রভৃতি অন্য সকল হিন্দী কাগজে আপনার 'অশ্রুমতী'র কথা ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন চলিতেছে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে অশ্রুমতীর অনুবাদ লইয়া উহার অভিনয়ও চলিতেছে। এই অভিনয়-কারণ লোকের মনে অনায়াসেই বাঙ্গালী-বিদ্বেষ যেন দৃঢ়ীভূত হইতেছে।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : মন্মথনাথ ঘোষ ; পৃ. ৭৬-১০১।

না—রাজপুতকে, মুসলমানকে। যে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল তাকেই সে ভালবাসিবে—তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

এই নাটকে ঐতিহাসিক ভুল ও অসংলগ্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু আমি এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা প্রতাপ সিংহের উপর আমার যে শ্রদ্ধাভক্তি তাহা কাহারও অপেক্ষা কম নহে।"২১

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মানবতার উদার পরিমণ্ডলে স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচার করতে প্রয়াসী ছিলেন। বলেই, তাঁর 'অশ্রুমতী' নাটকে অশ্রুমতী বলেছে,

" ..আমি রাজপুতও জানি নে, মুসলমানও জানি নে—আমার হৃদয় যাকে চায় আমি তাকেই জানি।" (৪র্থ। ৮গ)

'যবন' অথবা 'মোগল' শব্দটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকে অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই শব্দটির তাৎপর্য গ্রহণ করা আবশ্যক। ইংরাজ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী মনোবাসনাকে সরাসরি আক্রমণ করে কোন কিছু রচনা করা সে সময়ে সম্ভব ছিল না। ইতিহাসের সনাতন ঘটনাটুকু শুধু তথ্য আকারেই নাটকের বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু নির্মোকের অভ্যন্তরে বাঁধা পড়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙ্গালীর মন ও মনন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, 'স্বপ্নময়ী' নাটকে (১৮৮২) জাতীয়তাবোধের স্বার্থে ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করেছেন। নাটকটিতে চিতোয়া ও বর্দার তালুকদার শুভসিংহের স্বদেশপ্রেমের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্যরূপ। বাঙ্গলার ইতিহাসে শুভসিংহ বা শোভাসিংহের যে পরিচয় পাই :

"শায়েস্তা খাঁর পরে নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙলার সুবাদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শায়েস্তা খাঁর শাসনে বঙ্গে মোগল অধিকারের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার সহিত সর্বাঙ্গীণ শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সেকালে রাজশক্তি ও প্রতাপ ব্যক্তিগত থাকায় শায়েস্তা খাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে অশান্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। এদিকে সম্রাট ঔরঙ্গজেব সমীচীন রাজনীতি রসাতলে দিয়া রাজ্যের প্রত্যেক শিরা পর্যন্ত শোষণ করিতেছিলেন; সুতরাং বিশাল মোগল সাম্রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। চতুর্দিকে ক্রমে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সূচনা দৃষ্ট হইতেছিল।

২১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : মন্মথনাথ ঘোষ; পৃ. ৮১-৮৩।

বঙ্গদেশে সেকালের বিদ্রোহের অধিনায়ক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চিতুয়া, বরদা পরগণার এক সামান্য ভূম্যধিকারী শোভা সিংহ। বর্ধমানের জমিদার রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত বিবাদ উপলক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া ১৬৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এক বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করেন। শোভাসিংহ উড়িষ্যা হইতে তদানীন্তন পাঠান দলপতি রহিম খাঁকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিলেন। রহিম সানন্দে অনুচরবর্গসহ বিদ্রোহে যোগ দিলেন। ইহার পর উভয়ে মিলিত হইয়া বাঙলার মোগল অধিকার উচ্ছেদে অগ্রসর হইলেন।

রহিম ও শোভা সিংহের বিদ্রোহী সৈন্য বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলে, দুঃসাহসিক কৃষ্ণরাম রায় তাঁহার সামান্য সৈন্যদলসহ অসংখ্য বিদ্রোহী সেনার সম্মুখীন হইলেন। কৃষ্ণরামকে নিহত করিয়া বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদ অধিকার করিল। রাজপরিবারবর্গ কারারুদ্ধ হইলেন। কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠপুত্র জগতরাম রায় কোনো প্রকারে পলায়ন করিলেন। বিদ্রোহীগণের এই প্রথম বিজয় ঘোষণা প্রচারিত হইলে চতুর্দিক হইতে দুষ্ট ও বিপ্লবপ্রিয় যুদ্ধ-ব্যবসায়ী জনগণ তাহাদের দল পুষ্ট করিতে লাগিল। তাহাদের আস্ফালন ও উপদ্রবে চারিদিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। জগতরাম ঢাকায় যাইয়া নবাব ইব্রাহিম খাঁকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ইব্রাহিম যুদ্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞ শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি এই তালুকদার বিদ্রোহ সামান্য ঘটনা মনে করিয়া নূরউল্লা খাঁর উপর বিদ্রোহ-দমনের জন্য এক পরওয়ানা জারি করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেন। ··সুবেদারের হুকুম পাইয়া স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক তিনি এই বিদ্রোহীগণকে নিপাত করিবার জন্য যথাসম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিপক্ষের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইবার আশঙ্কায়, হুগলী দুর্গে আশ্রয়গ্রহণপূর্বক চুঁচুড়া-নিবাসী ওলন্দাজবণিক-সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; দুর্গ-মধ্যে থাকাও নিরাপদ নহে ভাবিয়া, তিনি একরাত্রে কৌপীন পরিধান পূর্বক ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। হুগলী বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইল।

ইব্রাহিম খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া ওলন্দাজদিগের সাহায্যে হুগলী পুনরধিকার করিলেন। বিদ্রোহীরা হুগলী পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে গিয়া আড্ডা করিল। শোভাসিংহ সপ্তগ্রাম হইতে রহিম খাঁকে

অধিকাংশ সৈন্যসহ নদীয়া, মুরশিদাবাদ অঞ্চল অধিকারের জন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বর্ধমানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে ইন্দ্রিয়বিকার শোভা সিংহের কাল হইল। বর্ধমানের যে সকল রাজপরিবার বিদ্রোহীর হস্তগত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজার এক পরমাসুন্দরী কন্যাও বন্দিনী হইয়াছিলেন। শোভা সিংহ তাঁহাকে আপনার অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। অনুনয়-বিনয়ে সে কার্য সম্পন্ন হইল না দেখিয়া, পাশব বলে তাহাই পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, কামাতুর নরপিশাচ যেমন উন্মত্তবৎ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে যাইবেন, অমনি সেই বীরাঙ্গনা তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে লুক্কায়িত শাণিত ছুরিকা সবলে সেই নরপিশাচের উদর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। বিকট চীৎকারে শোভা সিংহ ভূপতিত হইলেন। ছুরিকা তাঁহার নাভিদেশ পর্যন্ত ভেদ করিয়াছিল, কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। দুর্মতি শোভা সিংহের পতনের পর, রাজকুমারী, 'পাপীর স্পর্শে কলঙ্কিত দেহভার বহন করিব না' প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই ছুরিকা নিজ বক্ষমধ্যে বিদ্ধ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।" (অনুবাদিত)[২২]

এযুগের ঐতিহাসিকের সাক্ষ্যও অনুরূপ। তিনিও শোভা সিংহের প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত করে লিখেছেন,

"Shova Singh a Zamindar of Cheto-Barda in the Ghatal—Chandrakona a Subdivision of Midnapur, took to plundering his neighbours, about the middle of 1695. Raja Krishna Ram Panjabi Khatri, who held the contract for revenue collection of the Burdwan District, opposed the brigand with a small force, but was defeated and slain (January 1696). His wife and daughters were captured by Shova Singh, who took the town of Burdwan itself with all the Rajah's property. With the vast wealth thus gained the rebal leader greatly increased his army, took the title of Raja, and began to plunder and occupy the neighbouring country. Rahim Khan the leader of the

২২ Narrative of the Govt. of Bengal: Francis Gladwin, 1788, pp. 5-8. (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ; পৃ. ৬৭৩—৬৭৫)

Orissa Afghans, joined him and greatly increased his military strength.……At Burdwan in making an attempt upon the honour of Raja Krishna Ram's daughter, Shova Singh was stabbed to death by that heroic girl, who next plunged the dagger. into her own heart".[২৩]

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, শোভা সিংহ কখনই জাতীয়তাবাদী বা স্বদেশপ্রেমিক দেশনেতা ছিলেন না। যদিও সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ তিনি করেছিলেন, তবুও তাঁর বিদ্রোহ ছিল প্রকৃতপক্ষে সামন্ততান্ত্রিক অভ্যুত্থান। ব্যক্তিগত প্রতাপ ও আধিপত্য বিস্তারই ছিল, তাঁর সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। সর্বভূতে মৈত্রী ও ঐক্যাদর্শ প্রচার, মানবহিতবাদীতার সুউচ্চ মহিমা ঘোষণা, আত্ম-নির্ভরতার মূলমন্ত্র বিস্তারে দেশবাসীকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াস এবং স্বাধীনতা অর্জনের বাসনাতে পৌরুষ-চৈতন্যের খর-আগ্নেয়দীপ্তির প্রকাশ, যা একত্রযোগে স্বাদেশিকতার পবিত্র ভাবনাকে সৃষ্টি করে এবং সমস্ত দেশবাসীর কর্মতৎপরতার মধ্যে বিজয়বৈজয়ন্তীতে অভিব্যক্ত হতে সচেষ্ট হয়, তার কোন ইঙ্গিতই শোভাসিংহের বিদ্রোহের মধ্যে ছিল না। তবুও নাট্যকার এই চরিত্রটিকে রূপান্তরিত করে স্বাদেশিকতার মূর্তি বিগ্রহে পরিণত করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পরিবর্তন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যক্তি-মানসের খেয়াল-খুসী নয়—যুগনির্দেশের অভ্রান্ত পরিণতি। তা না হলে, তাঁর নাটকগুলি ··'soul stirring national dramas of the time'[২৪] হতে পারত না। ফলে উনিশ শতকের মানসিকতা নিয়েই শুভসিংহের চরিত্র পাঠ করতে হবে।

"···প্রতারণা করা আমার স্বভাবের নিতান্ত বিরুদ্ধ।……ছদ্মবেশ ধারণ করে লোকের নিকট আপনাকে দেবতা বলে পরিচয় দি।……শীত নাই—গ্রীষ্ম নাই—দিন নাই—রাত্রি নাই—আমি লোকের বাড়ি বাড়ি বেড়িয়েছি, আরঙ্গজীবের অত্যাচারের কথা জলন্ত ভাষায় তাদের কাছে বর্ণনা করেছি; কিন্তু কিছুতেই তাদের উত্তেজিত করতে পারলেম না, কিছুতেই তাদের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হল না, সেই-সকল হীন জড় পদার্থের কিছুতেই চেতনা হল না। ·· ···আমি প্রতারণা করব? চিরজীবন যা আমি ঘৃণা করে

২৩ History of Bengal (Vol. II): Jadu Nath Sarkar, pp 393-394

২৪ Indian Stage (Vol. II): H. N. Dasgupta: p. 117

এসেছি, যা আমার দুই চক্ষের বিষ, যার একটু গন্ধও আমার সহ্য হয় না সেই জঘন্য প্রতারণাকে কিনা আমি এখন আমার অঙ্গের ভূষণ করব—আমার চিরজীবনের সঙ্গী করব ?...আমি দেশের জন্য—মাতৃভূমির জন্য, ধর্মের জন্য—আর সকল ক্লেশ সকল যন্ত্রণাকেই আলিঙ্গন করছি, কিন্তু—কিন্তু—দেবতার ভাণ করে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা—ছদ্মবেশ ধরে লোকদের প্রতারণা করা—ওঃ কি জঘন্য—কি জঘন্য—......বর্ধমান-রাজের কোষাগার লুঠ ? দস্যুবৃত্তি ? তার চেয়ে তাঁর নিকটে গিয়ে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলি-না কেন ? তিনি একজন হিন্দুরাজা, তিনি কি আমাদের এই মহৎ কার্যে সাহায্য করবেন না ?......বর্ধমানের রাজকুমারীকে হস্তগত করতে হবে ! তাও কি কখনো সম্ভব ? এ...অত্যন্ত অসম্ভব কল্পনা।" (শুভসিংহ ও সুরজমলের কথোপকথন ; ১ম।১গ)

আবার,

"আঃ, কি যন্ত্রণা—কত দেশদেশান্তর হতে কত কষ্ট করে এই সকল নিরীহ বিশ্বস্ত গ্রাম্যলোকেরা এসেছে—আমি কিনা স্বচ্ছন্দে এদের প্রতারণা কচ্ছি, আমার চেয়ে নরাধম আর কে আছে ? আর সহ্য হয় না—আমি ওদের প্রকাশ করে বলি—কিন্তু না না না—মাতঃ জন্মভূমি, আমি যা যথার্থ ছিলেম, তা তোমার কাছে আমি বলিদান দিয়েছি, আমি এখন আর সে শুভসিংহ নই, আমি আর-একজন। মা, তোমার শতকোটি সন্তানের মধ্যে আমি কে ? আমি আপনার অবমাননা করে তোমাকে অবমাননার হাত হতে যদি মুক্ত করতে পারি, আমি আপনাকে হীন করে তোমাকে যদি হীনতা থেকে উদ্ধার করতে পারি. তবে আমি কেন তা না করব ? কিন্তু সেই ললনা, সেই আলুলায়িতকেশা, উষার ন্যায় শুভ্রবসনা পবিত্রমূর্তি ললনা তাকেও ছলনা ?" (১ম।৪র্থগ)

অন্যত্র,

"...সেই বিশ্বস্তা কুমারীকে ভালোবাসা দেখিয়ে ছলনা করে তার কাছ থেকে তার পিত্রালয়ের গুপ্ত সন্ধানগুলি জেনে নেব ? ...যদিও সে ভালোবেসে থাকে, তাহলে কি এই রকম করে সেই বিশ্বস্তা সরলার কাছ থেকে ছলনা করে কথা বের করে নিতে হবে ?......যার মূল আমার প্রাণের অতি গভীর দেশে নিবদ্ধ—যার শাখা-প্রশাখা আমার শিরায় শিরায় বিস্তৃত—প্রাণের রক্ত দিয়ে আমি যাকে এতদিন পোষণ ও বর্ধন করে এসেছি—সে সংকল্প

হতে আমাকে কেউ কখনো বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।……আমি সেই বিশ্বস্তা সরলা বালাকে বুঝিয়ে বলব যে দেশই আমাদের আরাধ্যা জননী, তিনি পার্থিব পিতা হতে উচ্চ—মাতা হতে শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ হতেও গরীয়সী।” (২য়।৫মগ)

অপর দিকে, আমরা স্বপ্নময়ীকেও প্রথম থেকে শুভসিংহের প্রতি প্রেমানুরাগিণী হিসাবে দেখি,

“এইবেলা ফুল তুলি, হয়েছে সময়।
আজ রাতে মালাগুলি গেঁথে রেখে দেব,
কাল প্রাতে তাঁর পায়ে দিব উপহার।
কেন তাঁরে ফুল দিই? কেন যে, কে জানে?
প্রথম যখনি তাঁরে দেখিলাম আমি,
আপনি গেলাম কাছে, করিনু প্রণাম।
আঁচলে আছিল ফুল, দিলাম চরণে,
কেন দিনু ভাবিতেছি—কেন যে, কে জানে।

* * * *

যখন কুসুমগুলি দিই তাঁরে আমি,
এমনি কোমলভাবে চান মুখপানে,
তখন দেবতা বলে মনে হয় না তো!
কোমল মমতাময় সে আঁখি দেখিয়া
মনে হয় কাছে যেন বসিতেও পারি!
মাঝে মাঝে ভুলে যাই দেবতা যে তিনি—
সাধ যায় দুই দণ্ড বসে কথা কই—
হয়তো মানুষ তিনি—নহেন দেবতা!
নহিলে কেনবা মোর হেন সাধ যায়?
মানুষ বটেন তিনি স্বর্গের মানুষ—
দেখি নি মানুষ হেন দেবতার মতো,
জানি নে দেবতা হেন মানুষের মতো।
ললাটে বিকাশে তাঁর স্বরগের জ্যোতি,
নয়নে নিবসে তাঁর মর্তের মমতা।” (২য়।১গ)

আবার,

"যাই তবে যাই, তাঁরে মালা দিয়ে আসি।
সত্য কি দেবতা তিনি? লোকে তাই বলে!
দেবতার রুদ্রভাব দেখি নি তো তাঁর,
তা হলে যে কাছে যেতে মরিতাম ভয়ে!
তবে কি মানুষ তিনি? আহা যদি হন!
যদি হন, যদি হন, তা হলে—তা হলে!
কিন্তু সকলেই তাঁরে বলে যে দেবতা।
আহা কে করিবে মোর সংশয় মোচন!" (৩য়।১গ)

অথবা

"দেবতা না হন যদি বাঁচি তাহা হলে!
যত দিন যায়, আর যত দেখি তাঁরে,
ততই মানুষ বলে মনে হয় কেন?
দেবেরে মানুষ বলে মনে হয় কভু?
কখনো না—আমি তাঁরে পেরেছি চিনিতে।" (৬য়।১গ)

স্বপ্নময়ীর এই প্রেম প্রথম দর্শনে অনুরাগী হিয়ার গভীর আলোড়ন ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। শুভসিংহের প্রতি নিবিড় অনুরাগই তাঁকে স্বদেশ-হিতব্রতী করেছে। স্বাদেশিকতার অনুরাগে নয়; শুভসিংহের প্রতি প্রেম-বিহ্বলতাই তাঁকে পিতা রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের প্রতি বিদ্রোহিনী করেছে। তাঁর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি,

"সেই মোর জননীর সুবিমল যশ—
সে যশে যে করে বিন্দু কলঙ্ক অর্পণ
তাদের যে মিত্র বলি আলিঙ্গন করে
যদি বা সে ভাই হয়, পুত্র, পিতা হয়—
তবু সে মায়ের শত্রু, শত্রু সে দেশের।
ভাই বলো, বন্ধু বলো, পুত্র পিতা বলো
মাতৃভূমি চেয়ে কেহ নহে আপনার।" (৩য়।৩গ)

কিংবা,

"ধিক ধিক শত ধিক সেই কাপুরুষে
ভাই হোক, পিতা হোক শত্রু সে দেশের।" (৩য়।৩গ)

এই সকল উক্তিতে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি বা আদর্শের কোন পরিচয়ই

নেই। আবার অপর দিকে শুভসিংহের আত্মহত্যাতে ঐতিহাসিক সত্য অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে পীড়িত হয়েছে।

"শুভ। (স্বগত) আমা হতে জননীর কোনো কাজ হল না, আমার জীবনের সংকল্প বিফল হ'ল—আমার সহচরেরাও আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল, অবশেষে, মনে মনে যার চরণে আমার হৃদয় উৎসর্গ করেছিলেম, সে স্বপ্নময়ীর কাছেও আমি এখন ঘৃণিত—এ অপদার্থ জীবনে আর কি ফল? (স্বপ্নময়ীর নিকটে নতজানু হইয়া প্রকাশ্যে) স্বপ্নময়ী, আমার হৃদয়ের দেবতা, সত্যই আমার মার্জনা নাই, আমার জন্যই তুমি পিতৃহীন হয়েছ, আমার জন্যই এই সুন্দর প্রাসাদ ভস্মসাৎ হল, এ পাষণ্ড দৈত্যের প্রায়শ্চিত্ত আর কিসে হবে? আমি এই জঘন্য প্রাণকে এখনি তোমার পদতলে বিসর্জন করছি—

স্বপ্ন। হা! ওকি! ওকি! আমার দেবতা—আমার দেবতা—

শুভ। স্বপ্নময়ী, (অসির দ্বারা আত্মহত্যা) আমাকে মার্জনা—(মৃত্যু)"

(৫ম।৪র্থ গ)

তবুও আমাদের বারবার স্মরণ রাখতে হবে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই রূপান্তরের মধ্যে যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা স্বীকৃত হয়েছে। তিনি নাটকের মধ্যে নাট্যকারের ব্যক্তি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষা করেননি, তাঁর সে বিষয়ে উৎসাহ ছিল না। দেশ ও জাতির কল্যাণ ও মঙ্গলকে অস্বীকার করে তিনি কোন নির্বিকল্প রসলোকে স্বপ্নপ্রয়াণ করতে আগ্রহী ছিলেন না। দেশবাসীকে দেশাত্মবোধের মাহাত্ম্য শোনাবার উদ্দেশ্যেই তিনি নাটক রচনা করেন; 'হিন্দুমেলা'র আদর্শ বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতেই ছিল তাঁর সাহিত্যসাধনা এবং জীবনসাধনার ধারা। বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যে স্বাদেশিকতা প্রচারে তিনি ছিলেন চারণ-কবি। যুগচিন্তাকে কেবল নাটকের সংলাপের মধ্যে আবদ্ধ করে তিনি কর্তব্য সম্পাদন করেননি; দেশনেতাদের বিভিন্ন আন্দোলনকে কিভাবে স্বদেশবাসীর মধ্যে ক্রিয়াশীল করে তোলা যায়, তারও বিভিন্ন প্রয়াস তিনি চালিয়েছিলেন। এর কিছু উদাহরণ আমরা সংগ্রহ করেছি। সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে স্বাদেশিকতার নব-সংহিতা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মত নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথও স্বদেশপ্রেমকে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছিলেন। সে সময়ে ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। বিলাতি খেতাব ও রাজানুগ্রহ

পাবার মোহ একশ্রেণীর ভারতবাসীকে কিরকম প্রমত্ত করেছিল, তা এক স্বতন্ত্র আলোচনার ইতিহাস হয়ে আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই শ্রেণীকে তার নাটকে সচেতন করে দেন। যারা দেশদ্রোহী, স্বদেশের কল্যাণে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং আত্মরতি ও তৃপ্তিতে নিমজ্জিত, তাদের পরিণাম পরিশেষে কিভাবে অনিশ্চিত হয়ে ব্যর্থ হাহাকারের রোদন-বাষ্পে ভেঙ্গে পড়ে সমস্ত সৌধ-বিলাসকে ভূমিলীন করে দেয়; পুরুবিক্রম নাটকে 'অম্বালিকা' চরিত্রে নাট্যকার তাই দেখিয়েছেন। বিদেশী রাজা 'সেকেন্দর শা'র অনুরাগিনী 'অম্বালিকা' প্রত্যাখ্যাতা হয়ে হতাশার স্বরে বলেছে,

"অম্বালিকা।···সেকেন্দর শা। তোমার জন্য আমি দেশকে বলিদান দিলেম, বন্ধু-বান্ধবকে পরিত্যাগ করলেম, শেষে তুমি কিনা আমাকে এখানে ত্যাগ করে গেলে? আমার ভাই গেল, বন্ধু গেল, মান গেল, সম্ভ্রম গেল, এখন আমি শূন্য সিংহাসন নিয়ে কি করব? দেশ বিদেশে আমার কলঙ্ক রটে গেছে, এখন আমি কি করে ক্ষত্রিয়গণের নিকট, আমার প্রজাগণের নিকট মুখ দেখাব?" (৫ম।২গ)

দেশপ্রীতির মানদণ্ডেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মতে দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার প্রেমিক হলেও তিনি অজ্ঞাতকুলশীল, অভারতীয় এবং ভারতের শত্রু। ফলে তাঁর প্রেমে আছে শাঠ্য ও শৈত্যের পাণ্ডুরতা। এই দীপ্তিহীন প্রেমে কোন মঙ্গল বা কল্যাণাদর্শ নেই। যে প্রেমে ত্যাগের মহনীয়তা নেই, তাতে প্রকৃত ভালবাসা থাকতে পারে না। 'অম্বালিকা' উগ্র জৈবিক প্রবৃত্তি ও রাজমোহে ভালবাসার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি। তাছাড়া তার প্রেমের মধ্যে কোন উচ্চাদর্শ ছিল না। ফলে প্রত্যাখ্যানের মর্মবিদারী প্রদাহ যখন তার চৈতন্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করেছিল, তখন সে উপলব্ধি করল তার ভ্রান্তি। সে সময় তার স্বজাতি অনুরাগ ও স্বদেশপ্রেম মুক্তিপথ খুঁজে পেল। অপরদিকে পার্শ্বকাহিনীতে রাণী 'ঐলবিলা'র প্রেম মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে, রাজা 'পুরু'র সঙ্গে তার মিলন ঘটেছে। কারণ এরা দু'জনেই স্বদেশপ্রেমিক, দেশের সম্মান ও গৌরবরক্ষার জন্য উভয়েই উৎসর্গ করেছেন নিজেদের জীবন। ব্যক্তিগত কামনার পরিমণ্ডলে নিজেদের প্রেমকে সীমাবদ্ধ করেননি। প্রেমের অনুরাগ 'পুরু' ও 'ঐলবিলা'র দেশপ্রীতিকে দুর্বল করেনি। স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ ঘোষণা করে নরপতি 'পুরু' বলেছেন,

"……আমি যদি দেশকেই উদ্ধার করতে না পারলেম, তা হলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আমার কি গৌরব হবে? রাজকুমারি! আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষী নই। কিন্তু আমি এই কথা বলছি যে, যদি আর কেহই আমার সহায় না হয়, সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একাকীই আমি ঐ অসংখ্য যবন সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করব। এতে যদি প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু যবনেরা একথা যেন না বলতে পারে যে, তারা ভারতবাসিগণকে মেষের ন্যায় অনায়াসে বশীভূত করতে পেরেছে।" (১মা২গ)

অপরদিকে রাণী 'ঐলবিলা' পুরুকে দেশপ্রেমে উদ্দীপিত করে বলেছেন,

"কি? ভারতবাসিগণ অনায়াসে মেষের ন্যায় যবনের অধীনতা স্বীকার করবে? যদি কেহই আমাদের সহায় না হয়, তাই বলে কি আমরা যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হব? তা কখনোই না। ক্ষত্রিয় হয়ে কেউ কখনো কি এ কথা বলতে পারে? আমার বলার অভিপ্রায় এই যে, যতদূর সাধ্য, সহায় বল অর্জনে আমাদের চেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়। গৌরবের অনুসরণ হতে আপনাকে বিমুখ করতে আমার ইচ্ছা নয়, বরং যাতে আপনার গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাই আমার মনোগত ইচ্ছা। যান, মহারাজ! আপনার বাহুবলে যবনরাজের দর্প চূর্ণ করে দিন। ·····আমাকে অনুমতি দিন, আমি রাজা তক্ষশীলের সহিত সাক্ষাৎ করে একবার দেখি, তাকে কোনোরকম করে ফেরাতে পারি কিনা। এ আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, কোনো কাপুরুষকে আমার হৃদয় কখনোই সমর্পণ করব না।" (১মা২গ)

এমন কি পরবর্তী সময়ে রাণী ঐলবিলা, নরপতি 'পুরু'র রটনাজাত মৃত্যুসংবাদ শুনে স্বদেশের প্রতি কর্তব্যবোধে নিজের ব্যক্তিশোককে ভুলতে চেয়েছেন।

"(স্বগত) আর আমার বেঁচে সুখ নেই। যখন পুরুরাজ গেছেন তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাও জন্মের মতো বিদায় নিয়েছেন; যখন পুরুরাজ গেছেন তখন ভারত-ভূমির মস্তকে ভীষণ বজ্রাঘাত হয়েছে। যখন পুরুরাজ গেছেন তখন আমার সকলি গিয়েছে, আমার পৃথিবীর আশা ভরসা সকলি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু হৃদয়! এখনও ধৈর্য ধরো। যদিও আমার প্রেমের প্রস্রবন জন্মের মতো শুষ্ক হয়ে গেল, তবু দেশ উদ্ধারের এখনও আশা আছে। আর-একবার আমি চেষ্টা করে দেখব। তার পরেই এ পাপ-জীবন বিসর্জন

করে পুরুরাজের সহিত স্বর্গে সম্মিলিত হব। (প্রকাশ্যে) আমাদের সমস্ত সৈন্যই কি পরাজিত হয়েছে? আর একজনও কি বীরপুরুষ নেই যে, মাতৃভূমির হয়ে অস্ত্র ধারণ করে? বীরপ্রসূ ভারত-ভূমি কি এর মধ্যেই বীরশূন্য হলেন।" (৩য়।২গ)

আত্মঘাতী সংগ্রাম ও স্বজাতি-বিদ্বেষ ভারতের গৌরবময় ইতিহাসকে অনেকবার কলঙ্কিত করেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে বিষয়ে দেশবাসীকে বারম্বার সচেতন করে দিয়েছেন। আভ্যন্তরীণ বিভেদ-নীতি, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থগৃধ্নু মনোভাব ও গৃহকলহ পুনঃ পুনঃ বিদেশী শক্তিকে প্রভাব ও প্রতাপ বিস্তারে সাহায্য করেছে। 'অশ্রুমতী' নাটকে সে কথা বাণীরূপ পেয়েছে। 'প্রতাপ সিংহ', 'রাজমহিষী'কে সম্বোধন করে বলেছেন,

"কি বললে মহিষি! সৌভাগ্যলক্ষ্মী? সৌভাগ্যলক্ষ্মী কি আর আছে? সৌভাগ্যলক্ষ্মী অনেক দিন যে চিতোর পরিত্যাগ করেছেন তা কি তুমি জান না? হা! যে অশুভ দিনে চিতোর মুসলমানের হস্তগত হয়েছে, সেই অবধি লক্ষ্মী আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। আর এখন আমাদের কি আছে? চিতোরের যখন স্বাধীনতা গেছে তখন সকলই গেছে—(উঠিয়া) যে চিতোর পূজনীয় বাপ্পা রাওর স্থাপিত—যে চিতোর আমার পূর্বপুরুষের বাসস্থান—যে চিতোর স্বাধীনতার লীলাস্থল—সে চিতোর যখন গেছে তখন আর আমাদের কি আছে? ·· শ্রদ্ধা-ভক্তির উপর কিছুই বিশ্বাস নেই—কে এখন মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দেয়—কে না দেয়, তার এখন কিছুই স্থিরতা নেই। মুসলমানদের উৎকোচের প্রলোভন অতিক্রম করতে পারে, দুঃখের বিষয় এমন বিশুদ্ধ-রক্ত রাজপুত অতি অল্পই আছে। মেবারের রাজার অম্বরের রাজার বিষবৎ দৃষ্টান্ত রাজপুতদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই সংক্রামিত হচ্ছে।··· ভায়ে ভায়ে যতই শত্রুতা হোক-না কেন—দেশ-বৈরীর বিরুদ্ধে কি সকল ভ্রাতার তলবার একত্র হবে না?" (১ম।৫গ)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীকে মাতৃজ্ঞানে দেশকে সেবা ও পূজা করতে আহ্বান করেছেন। মাতৃভূমির দুর্দশা মোচনই জাতির প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। বিদেশী শোষণের ফলে ভারতের যে দুরবস্থা ঘটেছে; রিক্ততা ও হাহাকারের রোদন-বাষ্পে দেশবাসীর মানস-নভঃমণ্ডল শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশের মত অসহনীয় হয়েছে, নাট্যকার দেশ-নেতাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সে কথা প্রচার করেছেন। 'স্বপ্নময়ী' নাটকে শুভসিংহের উক্তিতে এর আভাস পাই।

"হাঁ, সেই জননী সম মোর জন্মভূমি।
সেই মাতা, স্নেহময়ী জননী মোদের
দেখ দেখ আজি তাঁর একি দুরদশা,
বামহস্তে ছিল যাঁর কমলার বাস,
দক্ষিণ কমল করে দেবী বীণাপাণি,
সেই দুই হস্তে আজি পড়েছে শৃঙ্খল!
বিদেশী মোগল যত দলে দলে আসি
দেখ, চেয়ে দেখ, তাঁর করে অপমান,
দেখ, তোর মায়েরে করিছে পদাঘাত!

* * * *

..... ·দেব মন্দির সকল
চূর্ণ চূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে
বেদ মন্ত্র ধর্ম কর্ম করিতেছে লোপ—
গো হত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে—
অপমান নয়? অপমান বলে কারে?

* * * *

সেই মোর জননীর সুবিমল যশ
সে যশে যে করে বিন্দু কলঙ্ক অর্পণ
তাদের যে মিত্র বলি আলিঙ্গন করে
যদি বা সে ভাই হয়, পুত্র পিতা হয়,
তবু সে মায়ের শত্রু, শত্রু সে দেশের;
ভাই বলো বন্ধু বলো, পুত্র পিতা বলো
মাতৃভূমি চেয়ে কেহ নহে আপনার।" (৩।১গ)

দেশ মাতৃকার চিন্ময়ীরূপ-বন্দনা উনিশ শতকে বাঙ্গালী মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'হিন্দুমেলায়' গীত ও পঠিত কবিতাগুলিতে এই মানস প্রবণতা অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে অনুশীলিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুরূপ চিন্তাদর্শের পরিচয় 'স্বপ্নময়ী' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। 'শুভসিংহ' স্বদেশভূমির চৈতন্যময় সত্তাকে স্বপ্নময়ীর কাছে প্রস্ফুটিত করে বলেছেন,

"কে তোমারে বক্ষে করে করেছে পোষণ?
কে তোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে?

কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা ?
ধন্যধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার ?
কে তোরে পোহালে নিশি, প্রভাত হইলে
পাখিদের মিষ্টতম গান শুনাইয়া
শুভ্রতম শান্ততম উষার আলোকে
ধীরে ধীরে ঘুম তোর দেন ভাঙাইয়া ?
কে তোরে আইলে রাত্রি বুকে তুলে নিযে
নিদ্রারে আনেন ডাকি গেয়ে ঝিল্লি গান ?
জোছনার শুভ্র হস্ত দেহে বুলাইয়া
অনিমেষ তারকার স্নেহ-নেত্র মেলি
ঘুমন্ত মুখের পানে রহেন তাকায়ে ?
এমন পাখির গান উষার আলোক,
এমন উজ্জ্বল তারা, ি মল জোছনা,
কোথায় কোথায় আছে বিশাল ধরায় ?
কে তোর পিতার পিতা মাতার জননী ?
কোথা হতে পিতা তব পেয়েছেন জ্ঞান ?
কোথা হতে মাতা তব পেয়েছেন স্নেহ ?
কে তিনি তোমার মাতা জান স্বপ্নময়ী ?
*   *   *   *
তিনি তোর জন্মভূমি।"   (৩।১গ)
*   *   *   *

…পরাধীনতার মর্মবেদনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে যারপরনাই ব্যথিত করে। তাঁর মনঃকষ্টের পরিচয় তিনি ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে বহুভাবে প্রচার করেছেন। 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' ও 'স্বপ্নময়ী' নাটক থেকে উদ্ধৃতি সংকলনের মধ্যে আমরা নাট্যকারের মানস-মণ্ডলের পরিচিতিটুকু সহজেই উপলব্ধি করতে পারব।

'সরোজিনী' নাটকে (১৮৭৫) 'রামদাসে'র খেদোক্তিতে প্রকারান্তরে নাট্যকারের ব্যক্তিগত চিত্তের রোদনভরা দীর্ঘশ্বাসই প্রতিধ্বনিত হয়েছে—

২

"আচ্ছন্ন ভারত-ভাগ্য আজি ঘোর অন্ধ তমসায় ;
জয়-লক্ষ্মী বাম, ম্লান আর্য-নাম
পুণ্য বীরভূমি এবে বন্দিশালা হায় !

৩

স্বাধীনতা-রত্নহারা, অসহায়া, অভাগা জননি !
ধন-মান যত, পর-হস্ত গত,
পর-শিরে শোভে তব মুকুটের মণি ।

৪

নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, কোষবদ্ধ নিস্তেজ-কৃপাণ ;
শর তূণাশ্রিত, রণবাদ্য হত,
ধূলায় লুটায় এবে বিজয়-নিশান ।

৫

দেখিব নয়নে কি গো আর সেই সুখের তপন,
ভারতের দগ্ধ-ভালে, উদিত হইবে কালে,
বিতরিয়া মধুময় জীবন্ত কিরণ ?

* * *

৭

তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন ;
হযে পদানত, দাস-ব্রতে রত,
কি সুখে বাঁচিব বল—মরণই জীবন ।

৮

জ্বলন্ত দহনে হায় জ্বলিতেছে আজি মন প্রাণ ;
তবে কেন আর, বহি দেহ-ভার
চিতানলে চিতানল করি অবসান ।

৯

দেখিয়াছি চিতোরের সৌভাগ্যের উন্নত-গগন ;
একি রে আবার, একি দশা তার,
স্বর্গ হতে রসাতলে দারুণ পতন !

১০

রঙ্গভূমি সম এই ক্ষণস্থায়ী অস্থির সংসার,
না চাহি থাকিতে, হেন পৃথিবীতে,
যবনিকা পড়ে যাক জীবনে আমার।" (৬ষ্ঠ অঙ্ক)

'অশ্রুমতী' নাটকে প্রতাপ সিংহের শোকার্তিতে নাট্যকারের চিত্তের সেই এক সুরই বেজে উঠেছে।

"হা! ···স্বাধীনতার জন্মভূমি—বীরের জননী—সেই চিতোর এখন বিধবা!" (১।২গ)

কিংবা,

"(স্বগত) জন্মভূমি চিতোর, তোমাকে জন্মের মতো বিদায় দি—তোমার এ অযোগ্য সন্তানের নিকট আর কোনো আশা কোরো না ·····হায়! এ-সব স্থান পূর্বে লোকালয় ছিল, গীত-বাদ্য উৎসব কোলাহলে পূর্ণ ছিল, কত হাস্যময় শস্যক্ষেত্র এখানে প্রসারিত ছিল, এখন এখানে কি ভীষণ অরণ্য—মধ্যাহ্নেও যেন দ্বিপ্রহর অমাবস্যা রাত্রি কি গভীর নিস্তব্ধ···।" (৩।১গ)

অনুরূপভাবে, বাদশাহ আরঙ্গজেবের জন্মদিনের উৎসবে দেশবাসীর 'আপনহারা মাতোহারা' আতিশয্য লক্ষ্য করে 'স্বপ্নময়ী' নাটকের নায়ক শুভসিংহ যেভাবে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন; তাতে নাট্যকারের বিষাদচেতনাই নয়নের জলে জীবনের গভীর হৃদয়স্তর থেকে অভিব্যক্ত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক রচনার কাল ছিল ভারতবর্ষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব কাল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'দিল্লীর দরবার' অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছিল। সেই উৎসব এদেশের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত করেন। কয়েকবৎসর পূর্ব থেকেই এই উৎসবের আমোদ-প্রমোদের ব্যয়ভার বহনের অর্থ ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সংগ্রহ করতে থাকেন। এ দিকে ভারতবাসীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ঐতিহাসিকদের বিবেচনায়, উনিশ শতকের সপ্ত দশকে ভারতবর্ষ মন্বন্তরের বাসুকি নিঃশ্বাসে দগ্ধ হয়েছিল। তাঁদের সমীক্ষাতে এই পর্ব ছিল,

"The period of the seventies was a period of heavy famines and distress, and the growing unrest had been demonstrated in the Deccan peasant risings. The disastrous famine of 1877 coincided with the costly

durbar at which Queen Victoria was proclaimed Empress of India and with the Second Afghan War. Unrest was met by repression. The freedom of the Press was removed by the Vernacular Press Act of 1878. In the following year the Arms Act left the villagers without even the means of defence against the raids of wild animals. The right of public meeting was cut down."[২৫]

তবুও দেশে আনন্দাতিশয্য কম হয় নি। সাধারণ মানুষকে উৎসবে আইন করে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। রাজাদেশ অমান্য করা ছিল গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ। দেশবাসীরাও বাধ্য হয়ে অশ্রুজল মনের কোণে লুকিয়ে আনন্দ-লহরীতে মাতোয়ারা হতে চেষ্টা করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আনন্দের নামে এই বিরাট প্রহসনকে সহ্য করতে পারেননি। তিনি নিজে স্বতন্ত্র থেকে সমস্ত বেদনা যেন একাই সহ্য করেছেন। 'শুভ সিংহে'র দুঃখাভিমানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের ক্ষোভকে প্রকাশ করেছেন।*

"দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর,
অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার,
ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে,
সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে,
ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে।
শুনিতেছি নাকি শতকোটি দাস,
মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,

২৫ India To-Day : R. P. Dutt, pp. 311-312

* "চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কস্থ শুভসিংহের স্বগতোক্তিটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলে চিহ্নিত করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দু-মেলার একাদশ অধিবেশন (১৮৭৭) রবীন্দ্রনাথ দিল্লি-দরবার সম্বন্ধীয় যে কবিতাটি পাঠ করেছিলেন, লর্ড লিটনের ভার্নাকুলার প্রেস-আক্ট-এর প্রভাববশত তা কোন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হতে পারেনি। 'ব্রিটিশে'র স্থানে 'মোগল' বসিয়ে কবিতাটিকে 'স্বপ্নময়ী'র মধ্যে সুপ্রস্থাপিত করা হয়েছিল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য সংগ্রহ : পৃ. ৬৭১

সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায়
　　হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে ?

* * *

তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়,
　　ভারত গাইছে মোগলের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—
　　কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হ'তে আসি ভারত-আসন
　　লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি,
　　ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তবে এই সব দাসের দাসেরা,
　　কিসের হরষে গাইছে গান ?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে
　　কিসের তরে গো উঠায় তান ?
কিসের তরে গো ভারতের আজি,
　　সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি ?
যতদিন বিষ করিয়াছে পান,
　　কিছুতে জাগে নি এ মহাশ্মশান,
বন্ধন শৃঙ্খল করিতে সম্মান
　　ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি ?

* * *

মোগল-রাজের মহিমা গাহিয়া
　　ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া।
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া,
　　মোগল চরণে লোটাতে শির—
ওই আসিতেছে জয়পুর রাজ,
　　ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ,
　　আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর !

হা রে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
মোগল-রাজের বিজয়-রবে ?
মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা,
যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে কজন আছি,
আমরা ধরিব আরেক তান।"* (৪।৪গ)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন ভারতের উন্নতি ভারতবাসীর পক্ষেই সম্ভব। 'হিন্দুমেলা'র নেতৃবৃন্দ দেশবাসীর চিত্তে ও কর্মাদর্শে স্বাবলম্বনের অভ্যাস পুনরুদ্ধার করতে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনিও 'অশ্রুমতী' নাটকে প্রচার করেছেন,

"হিন্দুর ভরসা আশা হিন্দুর উপর।" (৩।১গ)

আবেদন-নিবেদন নীতিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কোনদিন মনে-প্রাণে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন শক্তির আরাধনা ও বাহুবলের ভজনা দেশবাসীকে পরাধীনতার মালিন্য থেকে মুক্তি দিতে

* পরাধীনতার দুঃখ-বেদনা সে সময়ে অনেক কবিতাতে দেখা দিতে শুরু করে। যেমন,

(ক) "কত কাল পরে বল ভারত রে,
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ওকি শেষে নিবেশে রসাতল রে,
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পরদাস খতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে,
পর লৌহ বিনির্মিত হার বুকে,
পর দীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।" (গোবিন্দচন্দ্র রায়)

পারে। আবেদন-নিবেদনের প্রতি তাঁর ঘৃণা 'পুরুবিক্রম' নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। আলোচনার স্বার্থে উদ্ধৃতিটি গ্রহণ করা হ'ল,

"পুরু। এখনও শত্রুগণ বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। আমাদের সৈন্য ও সেনাপতিগণ সমরোৎসাহে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। তাদের মুখমণ্ডলে সাহস ও তেজ যেন মূর্তিমান হয়ে স্ফূর্তি পাচ্ছে, সকলেই পরস্পরকে উৎসাহ দিচ্ছে, ক্ষুদ্রতম পদাতিসেনা পর্যন্ত সমরক্ষেত্রে গৌরবলাভ করবার জন্য উৎসুক হয়েছে… সকলেই দেশের জন্য প্রাণপণ করেছে। আমি যাবা মাত্রেই সকলে—'জয় ভারতের জয়' বলে সিংহনাদ করে উঠল—আর আমাকে এইরূপ বলতে লাগল যে,—'আর কতক্ষণ আমরা এই শিবিরে বসে বসে কাল হরণ করব? শীঘ্র আমাদিগকে রণক্ষেত্রে নিয়ে চলুন। যবনরক্ত পান করে আমাদের অসির পিপাসা শান্তি হোক্।' এই বীর পুরুষদের আর কতক্ষণ থামিয়ে রাখা যায়?……

তক্ষশীল। কিন্তু মহারাজ!… ..সেকন্দর শার কি অভিপ্রায়, আমরা তো তা জানি নে। এমন হতে পারে, তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।

পুরু। কি বললেন মহারাজ! সন্ধি? সেই যবনদস্যুর হস্ত হতে আমরা সন্ধি গ্রহণ করব? ভারতভূমিতে এতদিন গভীর শান্তি বিরাজ কচ্ছিল, সে স্বচ্ছন্দে এসে সেই শান্তি উচ্ছেদ করলে; আমরা তার প্রতি অগ্রে কোনো শত্রুতাচরণ করিনি। সে বিনা কারণে খড়্গহস্তে আমাদের দেশে প্রবেশ করে, লুটপাট করে আমাদের কোনো কোনো প্রদেশ ছারখার করে ফেললে, এখন আমরা কিনা তার সঙ্গে সন্ধি করব? আমরা তাকে কি এর সমুচিত শাস্তি দেব না?……সেকন্দর শা মনে কচ্ছেন যে, যখন তিনি পারস্যের রাজা দারায়ুসকে অনায়াসে পরাভূত করেছেন, তখন আর কি?

(খ) "সোনার ভারত আজ যবনাধিকারে।
ভারত সন্তান বক্ষঃ ভাসে অশ্রুধারে।
জ্ঞান রত্নাদি খনি, সভ্যতার শিরোমণি,
আজি সেই পুণ্যভূমি. ডোবে গভীর আঁধারে।
* * * *
ভারত শ্মশান হোক, মরু হয়ে পড়ে রোক,
তবু অধীনতা বেড়ি, রেখো নারে পায়ে ধরি।"

(বীরনারী: দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।)

… ··কিন্তু কি ভ্রম ! বীর-প্রসূ ভারতভূমিকে এখনও তিনি চেনেন নি।…… তিনি যে এই সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন, তার বিনিময়ে তিনি কি প্রত্যাশা কচ্ছেন ? আপনি সহস্র সহস্র দেশকে জিজ্ঞাসা করুন যে, এইরূপ কপট সন্ধি করে তিনি সেই-সকল দেশকে অবশেষে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছিলেন কি না ? তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা করাও যা, তাঁর দাসত্ব স্বীকার করাও তা। সেকন্দর শা যেরূপ লোক, তাঁর সহিত মধ্যবিৎ ব্যবহার চলতে পারে না। হয় তাঁর ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে, নয় তাঁর প্রকাশ্য শত্রু হতে হবে।

তক্ষশীল।……কতকগুলি অসার স্তুতিবাদে যদি আমরা সেকন্দর শাকে সন্তুষ্ট করতে পারি তাতে আমাদের কি ক্ষতি ? ····তিনি শুধু গৌরব চান, তিনি তো আমাদের সিংহাসন চান না।……একবার তাঁকে বিজয়ী বলে স্বীকার করলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। যদি তিনি এইরূপ অসার স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হন, তাতে আমাদের কি ক্ষতি আছে ?

পুরু। কি ক্ষতি আছে বলছেন মহারাজ ? আপনি ক্ষত্রিয় হয়ে এ কথা অনায়াসে মুখ দিয়ে বলতে পারলেন ? হো ! এখন বুঝলেম, ক্ষত্রিয়গণের পূর্ববীর্য ক্রমেই লোপ হয়ে আসছে। ক্ষতি কি আছে বলছেন মহারাজ ! আমাদের মান সম্ভ্রম যশ পৌরুষ সকলই যাচ্ছে, তথাপি এতে কিছু ক্ষতি নাই ? যশোমানপৌরুষের বিনিময়ে যদি আমাদের শূন্য সিংহাসন আর এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণকে রক্ষা করতে হয়, তা হলে ধিক্ সে সিংহাসনকে, ধিক্ সে প্রাণকে, আর ধিক্ সেই কাপুরুষকে, যে এরূপ প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে। আপনি কি মনে করেন, ঐ দুর্দান্ত যবন প্রবল বন্যার ন্যায় মহাবেগে আমাদের দেশ দিয়ে চলে যাবে, অথচ তার চিহ্নমাত্রও পড়ে থাকবে না ? সেই বন্যার প্রবল স্রোত আমাদের রাজ্যসকল কি চূর্ণবিচূর্ণ করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না ? ·····বিজেতার অনুগ্রহের উপরই আপনার চিরকাল নির্ভর করে থাকতে হবে, কিছু ত্রুটি—একটু ছল পেলেই সে নিশ্চয় আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবে।···যদি মর্য্যাদা রক্ষা করবার ইচ্ছা থাকে, যদি সিংহাসন রক্ষা করবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে চলুন, আর বিলম্ব না— চলুন আজই, আজই আমরা যবনদিগকে আক্রমণ করি।···কাপুরুষতা ভীরুতা অতি লজ্জাকর, অতি গর্হিত, অতি জঘন্য—ক্ষত্রিয়ধর্মের একান্ত বিরুদ্ধ।" (১।২গ)

এই দুই নাট্য-চরিত্রের কথোপকথনে নাট্যকারের নিজস্ব রাজনৈতিক

মতবাদ যেমন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি অপরদিকে তদানীন্তন কালের 'মডারেট' পন্থীদের প্রতি তাঁর বীতরাগ ও অশ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। সে কালে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে স্বাধিকার অর্জনের পথকে অশুভ পন্থা বলে মনে করতেন। তাঁরা আবেদন নিবেদন নীতিকেই অধিক পরিমাণে প্রাধান্য দেন। বল-বীর্যের উপাসক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই পথকে আপন মতের অনুকূল বলে মনে করেননি। তিনি 'হিন্দু মেলা'র অন্যতম প্রাণপুরুষ, নবগোপাল মিত্রের ন্যায় মনে করতেন স্বাবলম্বন অভ্যাস, আত্মনির্ভরতা, পৌরুষানুশীলন ও আপোষহীন সংগ্রামের পথে ভারতবাসী পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা অথবা যুদ্ধ ব্যতিরেকে ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়ন অসম্ভব, একথা তিনি যেমন তাঁর প্রবন্ধাবলীতে প্রকাশ করেছেন, তেমনি ইতিহাস-কাহিনীর আশ্রয়ে প্রচার করতেও দ্বিধা করেননি। 'পুরু বিক্রম' নাটকে দেশের জনসাধারণের প্রতি নরপতি পুরুর যে আহ্বান, তা প্রকৃতপক্ষে নাট্যকারেরই মনোগত অভিলাষের অভিব্যক্তি।

"পুরু। ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে এক প্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ॥
বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তলবার
জ্বলন্ত অনলসম চল সবে রণে।
বিজয়নিশান দেখ উড়িছে গগনে॥
যবনের রক্তে ধরা হোক প্লবমান,
যবনের রক্তে নদী হোক বহমান,
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান।

* * * *

এত স্পর্দ্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ?
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারতভূমে
পুরুষ নাহিক একজন?

"বীর যোনি এই ভূমি যত বীরের জননী,"
না জানে এ কথা তারা অবোধ যবন।
দাও শিক্ষা সমুচিত, দেখুক বিক্রম॥
ক্ষত্রিয়-বিক্রমে আজ কাঁপুক মেদিনী,
জ্বলুক ক্ষত্রিয়-তেজ দীপ্ত দিনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক জ্বলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক শুনি সেই ধ্বনি।

* * * *

পিতৃপিতামহ সবে ছাড়ি দুঃখময় ভবে
গিয়াছেন চলি যাঁরা পুণ্য দিব্যধাম
রয়েছেন নেত্রপাতি, দেখো যেন যশোভাতি
না হয় মলিন—থাকে ক্ষত্রকুল নাম॥
স্বদেশ উদ্ধার তরে মরণে যে ভয় করে
ধিক্ সেই কাপুরুষে, শত ধিক্ তারে,
পচুক সে চিরকাল দাসত্ব-আঁধারে।
স্বাধীনতা বিনিময়ে কি হবে সে প্রাণ লয়ে?
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক বলি তারে॥
যাক যাক প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেঁচে থাক,
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোলো সবে তলবার,
ঐ শোনো ঐ শোনো যবনের রব।
এইবার বীরগণ! করো সবে দৃঢ়পণ
মরণশরণ কিম্বা যবন নিধন,
যবন নিধন কিম্বা মরণশরণ,
শরীরপতন কিম্বা বিজয়সাধন।" (৩।১গ)

অনুরূপভাবে 'সরোজিনী' নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ক্ষাত্রতেজ ও পৌরুষের জয়গান করেছেন। সম্রাট আলাউদ্দিনের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য একশ্রেণীর রাজপুতদের দৈব-মুখাপেক্ষা তিনি সমর্থন করতে পারেননি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানস-পরিমণ্ডল যে উনিশ শতকের সংস্কারমুক্ত-মন, দেব-বিনির্ভরতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মানবহিতবাদের আদর্শে গড়ে উঠেছিল,

এর সংবাদ আমরা ইতঃমধ্যে গ্রহণ করেছি। তাঁর এই আধুনিক মানসিকতার পরিচয় 'সরোজিনী' নাটকে চিহ্নিত হয়ে আছে। মেওয়ারের রাজা লক্ষ্মণ সিংহকে সম্বোধন করে নাট্যকারের ইপ্সিত চরিত্র বিজয় সিংহ বলেছেন,

"বিজয়। মহাশয়! কথায় কেবল উৎসাহ প্রকাশ কল্লে কোনো কার্য্য হয় না। মাতৃভূমির প্রতি কার অধিক অনুরাগ, যুদ্ধক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আপনি বলিদান দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করুন—কবে শুভগ্রহ উপস্থিত হবে, তারই প্রতীক্ষা করুন—কিন্তু বিজয় সিংহ এ সকলের উপর নির্ভর করে না।......

মহারাজ! সর্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা করে থাকলে মনুষ্য দ্বারা কোনো মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আমাদের কার্য্য তো আমরা করি। তারপর যা হবার তা হবে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি কত্তে গেলে আমাদের পদে পদে ভীত হতে হয়।...যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য কত্তে বলেছেন তখন তাই যথেষ্ট, আর-কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী...অতএব অদৃষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না করে পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বলছে—চলুন, আমরা সেইখানেই যাই।...

মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে? আমার জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।" (১।২গ)

স্বদেশ উদ্ধারের অনমনীয় দৃঢ় সঙ্কল্প এবং পৌরুষ-বীর্যের প্রতি একনিষ্ঠা প্রতাপসিংহকে জাতিপ্রেম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। দুর্বল, ভীরু, পরানুগ্রাহী এবং দাস-মনোভাব-সর্বস্ব ভারতবাসীর কাছে প্রতাপসিংহ হচ্ছেন এক আদর্শ চরিত্র। প্রবল দেশানুরাগ, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উগ্র বীর্য-সাধনা এবং জীবনব্যাপী কৃচ্ছ্র সাধনে যাতে সমস্ত দেশবাসী দীক্ষিত হয়, তারই প্রচার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চালিয়েছিলেন 'অশ্রুমতী' নাটকে প্রতাপ সিংহ চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে। সমকালে সুরেন্দ্রনাথ যেমন ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডীর দেশপ্রেমের কাহিনী প্রচার করে জনসাধারণকে স্বাধিকার অর্জনের বোধিতে একনিষ্ঠ করে তুলেছিলেন, তেমনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভারতের ইতিহাসের মধ্যে এই জাতীয় বীরের গৌরবময়

পূত জীবনকথা দেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করে স্বাধিকার অর্জনের বাসনাতে অনুরাগী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভারত-চেতনা ও ভারতীয়তা ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বাদেশিক-মানসের সবচেয়ে বড় সম্পদ। স্বদেশের ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা উদ্ধারে তিনি যেন নিজেও ছিলেন রাণা প্রতাপসিংহের মত উৎসর্গীকৃত প্রাণ। 'অশ্রুমতী' নাটকে প্রতাপসিংহের দুঃখ-বেদনাতে যেন নাট্যকারের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের বিলাপ-বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

"প্রতাপ। এখনো চিতোর উদ্ধার হয় নি—যতদিন না চিতোর উদ্ধার করতে পারব ততদিন······আমার আরাম নাই—বিরাম নাই—শান্তি নাই—নিদ্রা নাই। এই উদয়পুরের শিখর থেকে যখনই চিতোরের দুর্গপ্রাকার আমার দৃষ্টিগোচর হয় তখনই আমার হৃদয়ে যে কি যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তা আমিই জানি—আমার মনে হয় আমি নির্বাসিত চিরপ্রবাসী। যে চিতোর আমাদের পিতৃভূমি, যে চিতোরের সঙ্গে আমার পূর্বপুরুষদিগের কীর্তি-গৌরব জড়িত, যার শৈলদেশ তাঁদের শোণিতধারায় ধৌত, সেই চিতোরের নিকট আমি এখন কিনা একজন অপরিচিত বিদেশীমাত্র, তার সঙ্গে যেন আমার কোন সম্বন্ধই নাই!" (৪।১গ)

প্রতাপসিংহের উক্তিটিতে 'চিতোরে'র জায়গায় 'ভারত' কথাটি জুড়ে দিলে নাট্যকারের কণ্ঠস্বর আমরা যেন শুনতে পাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকগুলিই স্বাদেশিকতার ভাবাদর্শে সমৃদ্ধ। তবে মনে হয় 'অশ্রুমতী' নাটকে প্রতাপসিংহই নাট্যকারের আদর্শ পুরুষ—স্বদেশ সাধনার শ্রেষ্ঠ ধন। বিকানিয়রের রাজকুমার পৃথ্বীরাজের প্রেরিত প্রতাপ-প্রশস্তি পত্রে এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। মনে হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে 'হিন্দু মেলা'র আদর্শে অভিষিক্ত হয়ে এমন একজন জাতীয় বীরের অনুসন্ধান করেছিলেন, যাঁর মধ্যে ভক্তি ও কর্মের নিবিড় সামঞ্জস্য আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রতাপসিংহ চরিত্রই তাঁর মনের সাধ পূর্ণ করেছিল। এজন্য তিনি প্রতাপ-বন্দনাতে সর্বদা কম্বুকণ্ঠ হয়ে উঠতেন। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

"ভামশা। বিশ্বজন জিজ্ঞাসিছে 'কোন্ গুপ্ত বলে
এড়ালেন মহারাণা শত্রুর কৌশলে?'

নাহি প্রতাপের—শোনো—অন্য কোনো বল,
হৃদয়ের বীর্য্য আর কৃপাণ সম্বল!
আর্য্যবর! ক্ষত্রবর! চিতোরের রাজ্যেশ্বর।
চিরজীবী হয়ে থাকো মর্ত্ত এই ভবে,
যতদিন তব প্রাণ, ততদিন আর্য্য-মা
অক্ষত অক্ষুণ্ণ হ'য়ে অকলঙ্ক রবে।
যবনের তাড়নায়, ক্ষাত্র-লক্ষ্মী মৃতপ্রায়,
তোমা পানে চেয়ে শুধু এখনো অটল,
হৃদে তাঁর আশা পূর্ণ, যবনের দর্পচূর্ণ
তুমিই করিবে একা—তুমিই কেবল!
হীন ক্ষত্ররাজ দলে, আকবরের পদতলে,
লোটাক না নতশিরে—কি ক্ষতি তাহায়?
কাপুরুষ ভীরু যারা, ভারত-কলঙ্ক তারা,
দিল্লীর পথের ধূলি—তাদের কে চায়?
যবন—বিপ্লব মাঝ, কিসেরই ভাবনা আজ,
ধ্রুবতারা রূপে যার প্রতাপ উদয়;
চন্দ্র সূর্য্য থেকো সাক্ষী, আবার বিজয়-লক্ষ্মী
প্রতাপের গুণে শুধু হবেন সদয়।" (৩।১গ)

'হৃদয়ের বীর্য ও কৃপাণ সম্বলে'র কথা 'স্বপ্নময়ী' নাটকে শুভসিংহের উক্তিতে প্রচারিত হয়েছে।

"শুভ। শোধ তুলিবার যদি বল নাহি থাকে,
পাষাণ-নয়নে কিরে অশ্রুজল নাই?
ভয়ার্ত হৃদয়ে কিরে রক্তবিন্দু নাই?
আর কিছু নাহি থাকে মরণ কি নাই?
যাঁহার প্রসাদে আজি লভিয়া জনম
হয়েছিস বশিষ্ঠের অর্জুনের বোন
তাঁর অপমানে আজ মরিতে নারিবি?

* * *

সঁপিবি দেশের কার্য্যে কুমারী-জীবন
অমর জীবন পাবি তার বিনিময়ে।

সকলে জীবন পায় মরিবার তরে,
তুই বাঁচিবার তরে পাইবি মরণ।

* * *

আজ এই মহাব্রত কর্ রে গ্রহণ
ঊর্দ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ কর্ এই কথা ;
'অযুত ভারতবাসী মোর ভাই বোন
একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতামাতা'।" (৩৷১গ)

মৃত্যুর তোরণ দ্বার অতিক্রম করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশের স্বাধীনতারূপ কিরীটিনী উদ্ধার করতে ডাক দিয়েছেন শুভসিংহের উক্তিতে।

"শুভ। দূর আকাশের তলে, ওই যে রতন জ্বলে
আনিতে কে যাবি তোরা
এই বেলা আয় রে—
মায়ের আঁধার ভালে পরাবি ও রত্নখানি,
কে আসিবি আয় তোরা
মিছা দিন যায় রে।
সুমুখে দুর্গম পথ, প্রত্যেক কণ্টক তার
মাড়াইতে হবে বটে
রক্তময় চরণে
কিন্তু রে কিসের ভয়, আসুক সহস্র বাধা,
মাতৃ-মুখ উজ্জ্বলিবি,
কি ভয় রে মরণে।" (৪৷৪গ)

উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীদেরও আহ্বান জানান হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে নারীদের স্বদেশহিতার্থে বৃহত্তর অবদানের কথা শুনিয়েছেন। ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে প্রত্যেক নায়িকাই দেশপ্রেমকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করেছেন। বীরাঙ্গনা মূর্তিতে তেজস্বীতার সঙ্গে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হয়েছেন। এমন কি বিপদের সময়ে একদিকে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট এবং দারিদ্র্য স্বীকার ও অপরদিকে ব্যক্তিপ্রেমকে স্বদেশের স্বার্থে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাহীন মনোভাব তাঁদের মহীয়সীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'অশ্রুমতী' নাটকে রাজমহিষী যেমন 'ছায়েবানুগতা পতিম্' হয়েছেন, তেমনি 'পুরুবিক্রম' নাটকে ঐলবিলা

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আদর্শ নারীচরিত্রে। তাঁর 'পুরু'প্রেম স্বদেশ-প্রেমের মাহাত্ম্যে 'নিবাত নিষ্কম্প' দীপশিখায় ভাস্বর হয়েছে। আর সরোজিনীর আত্মবলিদানের তুলনা বোধহয় আর কোথাও নেই। চিতোর ইতিহাসের পাতাতে রাজপুতরমণীর জহর-ব্রত পালন দেশের স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে এক অক্ষয় গৌরবের কাহিনী হয়ে আছে। তাঁরা জীবন ডালি দিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য ও মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। 'সরোজিনী' নাটকের প্রভাব ছিল সে যুগে দুর্নিবার। বিশেষভাবে সমাপ্তি সংগীতটি "একদিন বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিত।"২৫

"জ্বল্, জ্বল্, চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনই প্রাণের জ্বালা॥
শোন্, রে যবন! শোন্, রে তোরা!
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

* * *

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ!
জ্বল্ক জ্বলুক চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্‌রে যবন! দেখ্‌রে তোরা!
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি;
জ্বলন্ত-অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী।
আয় আয় বোন! আয় সখি আয়!
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ।" (৬ষ্ঠ অঙ্ক)

২৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃ. ১৪৮।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে উনিশ শতকের ভারতবাসীর মনোবাসনা বাণীরূপ পেয়েছিল বলেই এর আবেদন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে তাঁর 'পুরু বিক্রম' নাটকখানি অসামান্য খ্যাতি অর্জন করে।* রঙ্গমঞ্চে এই নাটকটির সফল অভিনয় দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবনায় উদ্দীপিত করেছিল। তাঁর জীবনীকার এই বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তা সেকালের বাঙ্গালী-মানসের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি।

"আমাদের মনে পড়ে কৈশোরে আমরা কতবার অপূর্ব আগ্রহের সহিত এই নাটকখানি পাঠ করিযাছিলাম এবং সৈন্যগণের প্রতি পুরুরাজের সেই ওজস্বিনী বাণী তৎকালে আমাদের তরুণ হৃদয়ে উদ্দীপনার বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত করিত।"২৬

'সরোজিনী' নাটকের অভিনয় দেশের জনসাধারণের মনে বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস-স্রোত প্রবাহিত করে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে উপর্যুপরি কয়েকবার সাফল্যের সঙ্গে এই নাটক অভিনীত হয়। যাত্রাদলেও এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। এমন কি বাঙ্গলা দেশের সুদূর পল্লীগ্রামেও 'সরোজিনী' নাটকের অভিনয় খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে এই নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। শহর ও গ্রাম-বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে ও যাত্রার আসরে অভিনীত হয়ে 'সরোজিনী' নাটক বাঙ্গালীকে স্বদেশপ্রেমে মাতিয়ে তুলেছিল। সে কালের বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনীর, 'অভিনেত্রী জীবন' নিবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটকটি লোকচিত্তে যে অপরিসীম প্রভাব ও উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তার এক রৈখিক চিত্র পাই।২৭ উক্ত বর্ণনাটিতে সে যুগের জনসাধারণের দাসত্ব-শৃঙ্খল মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই প্রোৎসাহিত হয়েছে। 'সরোজিনী' নাটকের আবেদন বাঙ্গলাদেশের বিস্তীর্ণ চত্বরে ছড়িয়ে পড়ায় যে জাতীয়চেতনা শহরের কেবলমাত্র শিক্ষিত মানুষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তা সাধারণ ও অল্প-শিক্ষিত মানুষকেও সঞ্জীবিত করে দেশাত্মবোধে

---

* "পুরুবিক্রম শেষে গুজরাটী ভাষাতেও অনূদিত হয়। ইউরোপের বিখ্যাত সমালোচক ও সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শী Sylvain Le'vi সাহেব গুজরাটী-সাহিত্যের সমালোচনাপ্রসঙ্গে পুরুবিক্রমের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানি যে আমারই বাঙ্গালা পুরুবিক্রমের অনুবাদ তাহা তিনি জানিতেন না।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায, পৃ. ১৪১।

২৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : মন্মথনাথ ঘোষ, পৃ. ৪২।

২৭ আমার কথা : বিনোদিনী দাসী : পৃ. ৯৪-৯৫।

আত্মহারা করে তুলল। এর ফলে সমস্ত বাঙ্গলাদেশ বাঁধা পড়ল এক নিবিড় সাংস্কৃতিক ঐক্যে। এই ঐতিহাসিক নাটকটির নাট্য-সংঘাত সুউচ্চ হওয়ায়, দর্শক, অভিনেতা ও অভিনেত্রিগণ প্রত্যেকেই ভাবাবেগে আত্মবিস্মৃত হতেন। বিশেষ করে 'সরোজিনী'র শেষ দৃশ্যটি জনচিত্তে গভীর ছাপ ফেলেছিল। কলকাতার আর্ট স্কুলের তদানীন্তন শিক্ষক অন্নদা প্রসাদ বাগচী 'সরোজিনী' নাটকের শেষ দৃশ্যের একখানি ছবি এঁকেছিলেন, এবং সে সময়ে ছবিটি পৌরাণিক দেব-দেবীর চিত্রের সঙ্গে বহুদিন বাজারে বিক্রী হয়েছিল।[২৮]

বাঙ্গলাদেশে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ বিস্তারে 'সরোজিনী' নাটকের অবদান বিপিনচন্দ্র পালের লেখাতে ধরা পড়েছে।

"নবযুগের নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল।...স্বাদেশিকতার প্রেরণা হিসাবেও 'সরোজিনী' একটা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। 'সরোজিনী' রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। রাজপুতের অপূর্ব্ব দেশভক্তি বাংলা নাট্যকলায় প্রথমে 'সরোজিনী'তেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এই উদ্দীপনা 'সরোজিনী'র পূর্ব্বে জাগাইয়াছিল। কিন্তু যত লোকে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' পড়িত, তার চাইতে অনেক বেশী লোকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ 'সরোজিনী'র অভিনয় দেখিত। বাহির হইতে দেখিলে 'সরোজিনী'তে একটা মুসলমান-বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অন্ততঃ বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। হিন্দু মুসলমানকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত না, মুসলমানও হিন্দুকে ঈর্ষা করিত না। সুতরাং 'সরোজিনী' প্রভৃতিতে মুসলমান ইংরাজের প্রতীক রূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লোকে মুখে গালি দিত মুসলমানকে, অন্তরে ধ্যান করিত ইংরাজকে। পরোক্ষভাবে 'সরোজিনী'ও রাজপুত-মুসলমানের বিরোধের ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া লোকের মনে ইংরাজ-বিদ্বেষই জাগাইয়াছিল।"[২৯]

তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারও বাঙ্গালী নাট্যকারদের রচনাকৌশল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মুসলমান বিরোধিতার চিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে ইংরেজ বিদ্বেষ জাতির ধমনীতে অনুবিদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, এ কথা বুঝতে তাঁদের

২৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : মন্মথনাথ ঘোষ : পৃ. ৪২।

২৯ নবযুগের বাংলা : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ. ২৫৭-২৫৮।

কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। তা ছাড়া 'চা-কর দর্পণ' নাটক রচনা ইংরেজদের আরও অধিক পরিমাণে আতঙ্কিত করে তোলে। বিদেশী শাসকশ্রেণীর স্বার্থপুষ্ট পত্রিকা 'ইংলিশম্যান' নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে, এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির মূলে আঘাত হানতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক রচনার কালসীমাতে 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' (১৮৭৬) বিধিবদ্ধ হয়ে যায়। তখন বাঙ্গালী নাট্যকারেরা ভারতীয় ইতিহাসের সাম্রাজ্যবাদী মুসলমান বাদশাদের লেলিহান কামনা ও পররাজ্য আগ্রাসী কাহিনী নিয়ে নাটক রচনা করে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার করতে থাকেন। সেজন্য বিপিনচন্দ্র পালের উক্তিটি আমাদের তদানীন্তন কালের রাজনৈতিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও গ্রহণ করতে হবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমে কোন উগ্রতা ছিল না, একথা আমরা বারবার উপলব্ধি করেছি। তিনি ভারতবর্ষের প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়কে জাতি-গঠন ও স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচারে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর জীবন-দর্শন ও সাহিত্য-রচনা একই ধর্মে পরস্পর গ্রন্থিবদ্ধ ও নিরাভরণ সৌন্দর্যে উদ্‌ভাসিত।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেন যুগের চাহিদা শেষ করে ফুরিয়ে গেছেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তি মহাকালের ছাড়পত্র পায়নি। তাঁর স্বদেশপ্রেমে যে পরিমাণে ভাবোচ্ছ্বাস ছিল, পরিণামে সে পরিণতি ছিল না। তিনি সমসাময়িককালের রাজনৈতিকচেতনার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যকে সংমিশ্রিত করতে পারেননি। 'হিন্দু মেলা'র উদ্যোক্তাগণের মধ্যে যে অভাবটি পরিলক্ষিত হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুভাবনাতে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। বাঙ্গলাদেশে যখন রাজনৈতিক আন্দোলন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রত্যয়নিষ্ঠ হয়ে উঠতে শুরু করেছে, তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বাদেশিক হিতাদর্শের একজন সক্রিয় কর্মী হয়েও পৌরাণিক ঐতিহ্য এবং ভাবাতিশয্যের মোহমুদ্গর নিক্ষেপ করে দেশবাসীকে সচেতন করতে চেয়েছেন। স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগী হয়েও যেন তিনি যুগের কাল-তরঙ্গ গণনা করতে পারেননি। ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে মধ্যযুগের শৌর্য, ক্ষাত্রবীর্য ও আত্মোৎসর্গের মাহাত্ম্য প্রচারই স্বাধীনতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ নীতি ও একমাত্র পথ বলে তিনি মনে করেছেন। ফলে তাঁর নাটকে স্বাদেশিকতার যে ধারা প্রবাহিত তা

যুগের রাজনৈতিক তটভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে আদর্শবাদীতার বাষ্পীয়ভবনে নভোচারী হয়েছে। সেজন্য তাঁর নাটকে ও চিন্তাতে বিশেষ কোন মৌলিকত্ব নেই। অবশ্য উদ্দেশ্যমূলক রচনাতে সাধারণতঃ গভীরতা থাকে না। যুগের পটভূমিতেই এই সমস্ত রচনার বিচার হয়ে থাকে। শুধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেন, উনিশ শতকের প্রায় সমস্ত নাট্যকারদের চিন্তা তথ্য-সত্যে আবদ্ধ হওয়ার জন্য অনুরূপ দোষ-ত্রুটিতে অভিযুক্ত হয়ে আছে। তবে তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীয় ভাবনাকে যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচার করে গেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা নিছক আদর্শবাদের তত্ত্বেই কেন্দ্রিত। পরাধীনতার দীর্ঘ-সঞ্চারী মনোবেদনা তাঁর নাটকে প্রচারিত হলেও, সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণা ও বিপর্যয়ের কোন পরিচয়ই সেখানে গৃহীত হয়নি। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের কুশীলবগণ সাধারণ পরিবেশ ও স্তরের কেউ নয়। রাজপুরুষ অথবা দেশের অধিপতি হওয়াতে সাধারণ জীবনের কোন প্রভাবই এই সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ফুটে ওঠেনি। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পর্যুদস্ত মানুষের বেদনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আবার অপরদিকে ঐতিহাসিক রাজপুরুষদের স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ নাট্যকারের প্রকৃষ্ট সংযমের অভাবের জন্য অনেকাংশে বাক্যজালের ঘন-ঘটা বলে মনে হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ আবেগ-ধর্মী নাট্যকার। তিনি কল্পনাকে সংহত করতে পারতেন না। এছাড়াও অনেক সময় তাঁর নাটকগুলি নিজস্ব গতিপথ পরিত্যাগ করে কখন যে অন্য মার্গাবলম্বী হয়েছে, নাট্যকার তা টেরও পাননি। 'পুরুবিক্রম' নাটকে নরপতি পুরুর শৌর্য-বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম প্রচার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রধান বিষয়বস্তু হলেও, 'পুরু-ঐলবিলা' ও 'অম্বালিকা-সেকন্দর শাহে'র প্রেম সম্বন্ধীয় উপাখ্যান যেন অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। এমন কি রাণী ঐলবিলার প্রেমকে নাট্যকার স্বদেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ-আসন থেকে বিচ্যুত করে সাধারণ পুরু-প্রেমে নামিয়ে এনেছেন। স্বাধীনতা রক্ষার্থে পুরুর পরাজয় তাঁর চিত্তমধ্যে দেশপ্রেম ও ব্যক্তি-ভালবাসার যে মানস-দ্বন্দ্ব ঘটিয়েছে, তাতে রাণী ঐলবিলার দেশাত্মবোধের স্বাক্ষর থাকলেও, প্রেম ও অনুরাগী হিয়ার বেদনামথিত অশ্রুজল যেন অধিক পরিমাণে কপোল বেয়ে গড়িয়েছে। সমস্ত কিছুই শ্লথ ও সংলগ্নহীন—আড়ম্বরের আতিশয্যেই প্রাণ-

শক্তির স্ফুরণ ঘটেনি। তাই এই নাটকে কর্মচাঞ্চল্যের যে প্রকাশ তা বহুলাংশে অস্বাভাবিক বলে বোধ হয়। অত্যধিক আস্ফালনে বীররস তরল হয়ে যুদ্ধের সমস্ত ঘটনাকে 'থিয়েটারী' যুদ্ধের মত যান্ত্রিক করে তুলেছে। তাঁর সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকগুলি সম্বন্ধে এ কথা সর্বৈব প্রযোজ্য। একদিকে ইতিহাস-সত্যের পরিপূর্ণ বিকৃতি, অপরদিকে ঐতিহাসিক রস ও প্রকৃত একলক্ষ্যমুখী স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচারে সর্বৈব ব্যর্থতা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বিস্মৃতির স্বপ্নলোকে প্রেরণ করেছে।

তবে, স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মানবতার পূজারী ছিলেন। এই উচ্চ মানবতাবোধেই তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে তাঁর নাটকে স্বাভাবিক স্বীকৃতি ও মর্যাদার আসন দিয়েছেন। 'সরোজিনী' ও 'অশ্রুমতী'তে এর পরিচয় নিহিত আছে। কিন্তু তদানীন্তন একদল উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দু-সম্প্রদায় তাঁর এই মানবহিতবাদকে সম্মানিত না করে, কটু সমালোচনার বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছিল। তবুও 'অশ্রুমতী' নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেন যেন প্রতাপ সিংহের স্বাধীনতা রক্ষার আদর্শের প্রতি গভীর গুরুত্ব আরোপ করতে চাননি। প্রতাপসিংহের ইস্পাত-কঠিন ব্যক্তিত্ব দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বজ্র-কঠিন সংকল্প নাট্যকার প্রত্যয়ের সঙ্গে চিত্রিত করতে পারেননি। মেবারের রাণার বিদ্রোহী আত্মার প্রতিবাদ, স্বাধীনতার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন এবং পরিশেষে হতাশার মধ্যে প্রাণত্যাগ দর্শকচিত্তে পাণ্ডুর উত্তাপ সৃষ্টি করে মাত্র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিশীলিত মানবপ্রেম 'অশ্রুমতী ও সেলিমে'র প্রণয়চিত্র অঙ্কনে অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিল; এবং সেজন্য তিনি প্রতাপসিংহের চরিত্র চিত্রণে খুব বেশি গুরুত্ব দেননি, একথা মনে করলে বোধহয় অন্যায় হবে না। কারণ সে যুগে জাতীয়চেতনা অনেকাংশে সাম্প্রদায়িক ঐক্য সৃষ্টির দিকে ঝুঁকেছিল, এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে মনে-প্রাণে সমর্থন করেছিলেন। 'স্বপ্নময়ী' নাটকও বহুলাংশে বৈচিত্র্যহীন। 'শুভসিংহে'র বিদ্রোহ কোন স্থির স্বাদেশিক চিন্তার নির্দেশ দেয় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে আবেগঘন সংলাপের দেহ আছে, কিন্তু মত ও পথের কোন তরঙ্গসঞ্চারী ক্রিয়াশীলতা নেই—অর্থাৎ প্রাণের অবস্থিতি নেই। আত্মার অস্তিত্ব অনেক দূরের কথা।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের মনে রাখতে হবে আধুনিককালের রাজনৈতিক অনুভাবনা সে সময়ে ছিল না। বর্তমান কালের রাজনীতির পরিচিতি সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র ধরনের। অর্থনীতি, সমাজনীতি, উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন এবং সম্ভোগ ও শ্রমিক শ্রেণী বিন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন মতাদর্শের উপর রাজনৈতিক অনুভাবনা প্রতিষ্ঠিত। পরাধীন জাতির স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তা ও স্থির লক্ষ্যের সঙ্গে এই সমস্ত অনুভাবনা অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ব-রাজনীতির প্রভাব আমাদের দেশের রাজনীতির উপরে সবে মাত্র পড়তে শুরু করেছে। সুতরাং আজকের পরিণত রাজনৈতিক মতাদর্শ সে সময়ে খুঁজতে যাওয়া বা না পাওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করা দুই-ই অর্থহীন। ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তিচিত্তে স্বদেশ বলে উপলব্ধি করার স্বার্থকতার মধ্যেই উনিশ শতকের স্বাদেশিক আদর্শ চিহ্নিত হয়ে আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী এই বিষয়টিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন ও দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করেছেন। সে কালের রাজনৈতিক চিন্তা ও দেশাত্মবোধ প্রচারে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই তনু-মন-প্রাণ দিয়ে দেশ ও দশের হিত করে গেছেন। এইসব নেতাদের ভাবোচ্ছ্বাস ছিল সত্য, কিন্তু কোন পাটোয়ারী বুদ্ধি ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিত্ত স্বদেশের মঙ্গলের জন্য নিঃশেষিত হলেও, চিত্তের সম্পদ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অশেষ ছিল।

স্বাদেশিকতার আদর্শ বিচিন্তাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক সমন্বয়ী মনোভাব গ্রহণ করেন। আমরা দেখেছি তিনি পৌরুষ-চৈতন্য ও বীর্য-সাধনার উপাসক ছিলেন। বাহুবলের প্রতাপ ও সংগ্রামের পথকে তিনি দেশবাসীর স্বাধীনতার আদর্শ বলে মনে করতেন। এদিক থেকে তাঁকে Militant Nationalist বলা যায়। তবে জাতি গঠন ও স্বদেশপ্রেম বিস্তারে তিনি অসাম্প্রদায়িক ঐক্যভাবনাকে গ্রহণ করেছিলেন। মানবিকতার একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন বলেই তিনি ইতিহাস সত্যকে অস্বীকার করে হিন্দু-মুসলমান প্রণয়-চিত্র আঁকতে দ্বিধা করেননি। ভারতবর্ষের মানুষকে তিনি একটি বিশেষ ধর্ম অর্থাৎ মানবধর্মের উদার অঙ্গনতলে সমবেত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এইদিক দিয়ে তিনি ছিলেন আবার Constructive Nationalist। তাঁর সমস্ত কর্মে ও সাহিত্য রচনাতে এই যুগ্ম চিন্তাদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর বেহিসাবী অধ্যবসায় জাতির জন্য যে মহাসম্পদ সঞ্চয় করে গেছে, তার দিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজের প্রতি যে শ্রদ্ধা বিমিশ্র উক্তি তাতেই আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশালতা ও অমরত্ব—

"তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতিবহন করিয়াই আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।"[৩০]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলির ধ্রুবত্ব বোধ করি এখানেই।

৩০ জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃ. ১৪১

আট

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমকালীন গৌণ নাট্যকারগণ

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

পটভূমি বিচারে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, 'হিন্দু মেলা'র স্বাদেশিক আদর্শ ছিল প্রধানতঃ গণতান্ত্রিক। এই জাতীয় মেলার উদ্যোক্তাগণ গণমানসে দেশাত্মবোধের যথার্থ উন্মেষ ও প্রসার চেয়েছিলেন। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিতে তাঁরা দেশের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করেছিলেন বলেই তাঁদের স্বদেশ-প্রেমের আদর্শ সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতবর্ষের মানুষকে নিবিড় ঐক্যে আবদ্ধ করে। সুসংবদ্ধ অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতিগত মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে এক অখণ্ড জাতীয়তা-বোধের সঙ্গে স্বদেশহিতব্রতী মনোবাসনা তাঁরা জাগিয়ে তুলেছিলেন বলেই সমকালীন রাষ্ট্রনেতাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অনেকাংশে 'হিন্দু মেলা'র চিন্তানীতিকে আশ্রয় করেছিল। শিশিরকুমার ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান লীগ' ও সুরেন্দ্রনাথের 'ভারতসভা'র কর্মসূচীতে 'চৈত্র মেলা'র প্রেরণা যে কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার সংবাদ আমরা আগেই গ্রহণ করেছি। বাংলা নাট্য সাহিত্যের পুষ্টি ও প্রতিপালনে 'হিন্দু মেলা' ধাত্রী মাতার কর্তব্য পালন করেছিল। অর্থাৎ বাঙ্গলা নাটক স্বাদেশিকতার আদর্শ বিস্তারে 'হিন্দু মেলা'র প্রচারিত চিন্তা ও গৃহীত কর্মভাবনাকে বরণ করেছিল। এই সময়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, 'জাতীয় রঙ্গালয়ে'র (১৮৭২) শুভ উদ্বোধন। মননশক্তির বিশ্লেষণী আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে যে এক অখণ্ড জাতীয় ভাবনার ঘন সন্নিবেশের পরিণত রূপই সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করেছিল। এবং এরও উদ্যোক্তা ছিলেন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সম্প্রদায়। ফলে যে সর্বব্যাপী সংগঠন-ভাবনা ও ইংরেজ-বিদ্বেষ বাঙ্গালীকে রাষ্ট্রিক স্বাধিকার অর্জন, দেশ এবং জাতি নির্মাণে প্রত্যয়াভিলাষী করে তুলেছিল; সেই মনোবাসনাই উক্ত পর্বে স্বাদেশিক নাটক রচনা ও জাতীয় রঙ্গালয় স্থাপনের পটভূমিতে প্রাণশক্তি

হিসাবে কাজ করেছে। দেশ সংগঠন মহাব্রতে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা নাটক রচনাতে আত্মনিয়োগ করেন। এই বিষয়ে মনোমোহন বসু হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। অবশ্য 'হিন্দু মেলা'র আদর্শের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মনাম প্রচার* এবং রামকৃষ্ণদেবের সহনশীল ধর্মবোধ ও উদার মানবহিতবাদ বাঙ্গালীকে জাতীয় ঐক্যের পথ দেখিয়েছিল। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর দীর্ঘদিনের জীবন-সাধনা ও স্বাদেশিক-ভাবনা, দেশগরিমার ভাবোদ্দীপক নাটক রচনা ও অভিনয় সাফল্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে দেশবাসীকে স্বাবলম্বী, প্রত্যয়নিষ্ঠ ও ত্যাগ মহিমার গৌরবে ব্রতী এবং বলীয়ান্ হতে আহ্বান জানায়। কেবল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেই নয়, তাঁর সমকালীন অপরাপর নাট্যকারদের মধ্যেও এই মহাসত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুরূপ প্রতিভা ও নাট্যরচনার ক্ষমতা তাঁদের না থাকলেও, একই আদর্শ বিচিন্তাতে অভিষিক্ত হয়ে তাঁরাও দেশ গঠনের কর্তব্য পালনে অগ্রণী হয়েছিলেন। এইটুকু উপলব্ধি করার মধ্যেই আছে গৌণ নাট্যকারদের রচনা-প্রয়াসের প্রকৃত সার্থকতা। এ দের সৃষ্টিতে সৌরকরোজ্জ্বল ভাস্বরতা ছিল না, দূর নভোমণ্ডলে অবস্থিত গ্রহের ক্ষীণ দীপ্তিটুকুর মত এঁদের রচনার যা কিছু বৈশিষ্ট্য। শুধু মাত্র দেশাত্মবোধের মূল্য বিচারেই এই সমস্ত নাটকের যতটুকু মূল্যায়ন এবং মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমকালীন গৌণ নাট্যকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, হরলাল রায় ও উপেন্দ্রনাথ দাস।

'জাতীয় নাট্যশালা'য় কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব (১৮৭৩) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বে হয়েছিল। তিনি মুখ্যতঃ 'হিন্দু মেলা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দুটি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেছিলেন। একটি 'ভারত মাতা' (১৮৭৩) এবং দ্বিতীয়টি 'ভারতে যবন' (১৮৭৪)। ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসীর

---

* "তোরা আয়রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
নর-নারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার।"

দুর্দশা ব্যক্ত করে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে দীক্ষিত করাই ছিল তাঁর প্রথম নাটিকা রচনার মূল উদ্দেশ্য। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'তে এই নাটিকাটির অভিনয় সাফল্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল,

"গত শনিবার ন্যাশনাল থিয়েটারে জামাই বারিক প্রহসন অভিনয়ের পর 'ভারতমাতা' একটি দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। দৃশ্যের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি, যে উহা দেখিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিত হইয়াছিলেন। কোন অভিনয়ে পঞ্চ শতাধিক লোকের ১৫ মিনিট কাল পর্যন্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তম্ভিত ভাব আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। শ্রোতৃগণের দীর্ঘশ্বাস ও রোদনধ্বনিতে কেবল মধ্যে ২ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। সেদিন ন্যাশনাল থিয়েটারে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান হইতে এমন একটি ভাব অর্জন ও এমন একটি শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন, যাহা কস্মিনকালে বিনষ্ট হইবে না।"[১]

বিপিনচন্দ্র পাল এই ক্ষুদ্র পুস্তকের গৌরবকীর্তি বর্ণনা করে নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

"It was this stage that first proclaimed the gospel of the religion of the motherland in an opera, now completely forgotten, called 'Bharata-Mata' or 'Mother India.' I forget the details of the play, but the name indicates the nature of the theme and the religious idealisation which must have inspired it. Those were the days when a new passion for freedom, personal, social and political, had possessed the educated Bengalee mind"[২]

সাধারণ জনমানসে 'ভারত মাতা' নাটিকার প্রভাব বর্ণনায় নাট্যকার ও নট অমৃতলাল বসুর মন্তব্যটিও উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে।

"এই 'ভারতমাতা'র অভিনয় বড়ই শুভক্ষণে আরম্ভ হয়েছিল। সাধারণে বিষয়টি বড় 'এপ্রিসিয়েট' করলে। 'ভারতমাতা'র ক'খানা গান প্রচলিত ছিল, সেগুলোর আদর এমন বেড়ে গেল যে, আমাদের

১ অমৃত বাজার পত্রিকা; ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩।

২ Memories of My Life and Times: B. C. Pal; pp. 251-252.

যেদিন 'ভারতমাতা'র অভিনয় না হ'ত সেদিন দর্শকের তুষ্টির জন্য প্লাকার্ডের পরিশেষে ভারত সঙ্গীত বলে বিজ্ঞাপন দিতে হত।"[৩]

'হিন্দু মেলা'র উদ্যোক্তাগণ যেমন 'মলিন মুখ চন্দ্রমা' ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখ-দৈন্য দূর করতে অগ্রণী হয়েছিলেন, কিরণচন্দ্রও অনুরূপ ভাবাদর্শে ব্রতী হয়ে 'ভারতমাতা' নাটিকা রচনা করেন। 'সূত্রধারে'র উক্তিতে নাট্যকারের মনোবাসনার প্রকাশ ঘটেছে।

"হে ভ্রাতঃ ভারতবাসী দেখনা চাহিয়ে।
পাইতেছ কি যাতনা মোহ-মদে মাতিয়ে॥
রিপুর হইয়ে দাস, করিতেছ সর্ব্বনাশ,
ভুগিছ অশেষ ভোগ, লোভ কূপে পড়িয়ে,
হিংসা-রূপা পিশাচিনী, অতিশয় মায়াবিনী,
মজনা মজনা হায, তার প্রেমে ভুলিযে॥

ভারত-ভূমির ও ভারত-সন্তানগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা প্রদর্শনই 'ভারত-মাতার' উদ্দেশ্য। যদ্যপি সমাগত সুধীমণ্ডলীর একজনও এই অভিনয় দর্শনে ভারতমাতার দুঃখ দূর কোর্‌তে একদিনও যত্ন পান, তাহা হলেই আমার ও গ্রন্থকর্ত্তার শ্রম সফল।"

ভারতবাসীর দুরবস্থা ও বীর্যহীনতার চিত্র কিরণচন্দ্র 'ভারত-লক্ষ্মী' চরিত্রের মুখে দিয়েছেন,

"দেখগো ভারতমাতা তোমারি সন্তান।
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হয়ে হতজ্ঞান॥
সবে বল-বীর্য-হীন, অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ,
হেরিযে এদের দশা বিদরিয়ে যায় প্রাণ।
মরি এদশা তোমার, হেরিতে না পারি আর,
অপার জলধিপার চলিলাম ছাড়ি এস্থান।"

'ভারতমাতা'র উক্তির মধ্য দিয়ে কিরণচন্দ্র দেশবাসীকে আত্মসচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। সমকালীন 'হিন্দু মেলা'র বিভিন্ন অধিবেশনে জাতিজাগরণের যে সমস্ত ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা জাতীয় হিতবাদী নেতাদের দ্বারা পরিবেশিত হয়েছিল, 'ভারতমাতা' 'নাট্যমাঙ্কে' তারই যথাযথ

৩ গিরিশচন্দ্র : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ. ২৯৯।

প্রতিফলন আমরা যেন দেখতে পাই। 'ভারতমাতা' তাঁর ভাগ্যহীন সন্তানগণকে নৈরাশ্য, আলস্য ও হতচেতন ঘুম ঘোরে মগ্ন দেখে গভীর খেদ প্রকাশ করে বলেছেন,

"......ওরা অজ্ঞানান্ধকারে পড়ে দিক্‌ভ্রম হয়ে চক্ষু বুজিয়ে পড়ে আছে। বাছারা অন্নজল অভাবে পিপাসিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছে। আমি মহাপাতকিনী এইসব দেখে এখনও বেঁচে আছি।... (একজনের হাত ধরিয়া) বাবা, ওট ; এমন করে পড়ে থাকলে কি হবে? তোরা যে এখন পরাধীন বাপ্‌। তোদের ত' আর সে দিন নাই। ওট্‌ এখন এই রোগের প্রতিকারের চেষ্টা কর। (একজন ওটে আর একজন শোয়, আর একজন ওটে আর একজন শোয়, এইরূপে একে একে সকলে শয়ন করিল) হায়, হায়, হায়, তোদের যে এখন কি দশা, এতক্ষণে আমি বিলক্ষণ বুঝতে পাল্লেম্‌। উঃ একজনকে তুলি, আর একজন শোয়, আর একজনকে তুলি আর একজন শোয়।

উঠ উঠ যাদুমণি কতকাল ঘুমাবে আর।
পলাল ভারত-লক্ষ্মী তাঁর আরাধনা কর ॥
মায়ের বচন ধর, জ্ঞান অসি করে কর,
এ দুঃখ যন্ত্রণা হতে কররে মোরে উদ্ধার।
হইয়ে তোদের জননী, পরাধীনা অভাগিনী,
এ জ্বালা সহে না প্রাণে হর দুঃখ হর হর।
স্বাধীনতা মহাধন বলনারে কি কারণ,
লভিবারে বাছাধন, হও না কেন তৎপর।

* *

বাবা, আর কতকাল তোরা এ প্রকার নিদ্রিত থাকবি? একবার চোক্‌ চেয়ে ভাল করে পৃথিবীর ভাব গতিক্‌ দেখ দেকি। তোদের এখন কি দশা, তোরা কি ছিলি, কি হলি একবার ভাব দেকি? তোদের অভাগা জননীর দুরবস্থা একবার দেখ, বাবা অলঙ্কারগুলি দস্যুতে অপহরণ কোরেছে, একটু তেল পাইনে যে চুলে দিই, এই মলিন শতগ্রন্থী বস্ত্র আর কতকাল পোর্‌তে হবে যাদু? বাবা, তোরা সকলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে তোদের মার এই দুর্দ্দশা ঘোচা।

গীত

মম ধর বচন।
ত্যজ অভিমান, ইন্দ্রিয় দমন, করিবারে বাছা কররে যতন ॥
হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মান, অভিমান, স্বাধীনতা-পদে দাও বলিদান,
দেখরে সবারে ভায়ের সমান, অজ্ঞান পিশাচে কর দমন।
স্বাধীনতা অসি হেঁসে করে ধর, পরাধীন গ্রন্থী কাটরে সত্বর,
যতনে রতন, স্বাধীনতা ধন, লভিবারে যাদু কর প্রাণপণ ;
যে ধন বিহনে তোদের জননী, এই দেখ যাদু পথের ভিখারিণী,
বিহীনভূষণ, বিহীন বসন, চেষ্টা কর পেতে সেই মহাধন।"

দেশের সমস্ত জনগণকে আত্মসচেতন করে তোলার জন্যই নাট্যকার 'ভারতমাতা'র মুখের এই খেদোক্তি সকরুণ তুলিতে এঁকেছেন। আবার এর সঙ্গে তৎকালীন বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ছবিটিও হয়েছে সুপরিস্ফুট। ভারতসন্তানগণের উক্তিতে জাতীয় দুর্দশার পরিচয়টি আরও বেশি উজ্জ্বল। 'ভারতমাতা'র আবেদনে তাঁর সন্তানগণ নিজেদের অসহায়তার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,

"১ম। মা, আমাদের চারিদিক্ বন্ধ, কোনদিকে যাই মা ?, আমাদের চাকরীর পথ বন্ধ, ব্যবসার পথ বন্ধ, বাণিজ্যের পথ বন্ধ, মা কি কোর্‌বো মা ? কেমন করে খাব মা ?······

৩য়। মা, আমাদের দেশে এত নুন, আমরা একটু নুন পর্য্যন্তও খেতে পাইনে, দেখ মা, আমাদের দেশের তাঁতগুলি পর্য্যন্তও বন্ধ। কি করি, কোথায় যাই মা, কার কাছে গেলে দুটি খেতে পাব মা ?"

নাট্যকার কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্বাধীনতা' শব্দটি উচ্চারণ করলেও কোথাও তিনি ব্রিটিশ বিরোধিতার কথা বলেননি। বরঞ্চ ইংরেজ রাজত্বের প্রতি তাঁর অনুরাগই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ইংরেজ রাজত্বের অত্যাচারে জর্জরিতা 'ভারতমাতা' যখন 'কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ, কোথা রামমোহন, কোথায় রামগোপাল' প্রভৃতি সুসন্তানদের আর্তকণ্ঠে আহ্বান করে মূর্চ্ছা গেলেন তখন কিরণচন্দ্র জাতিকে ইংরেজ শাসনের গুণকীর্তন শুনিয়েছেন।

"······মা, ইংরাজ জাতি কখন এমন নীচ-প্রকৃতি নয়। তোমাদের অশ্রুপাতে অশ্রুপাত না করে, ভদ্র ইংরাজগণ মধ্যে অতীব বিরল। মা,

এইরূপ কতকগুলি অসভ্য দস্যুর নিমিত্তই আমাদের ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হচ্ছে। আমাদের মহারাণী অতীব দয়াশীলা। এমন কি তিনি প্রজারঞ্জনা-নুরোধে আপনার প্রাণপ্রিয় পুত্রকেও পরিত্যাগ কোরতে পারেন। তাঁর গুণের শেষ নাই। তাঁর ন্যায় সচ্চরিত্রা রমণী, রমণী কুলে দুর্লভ। তিনি তোমাদের মহারাজ রামচন্দ্রের ন্যায় অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন কোরে থাকেন। মা,······তুমি কি ফসেট্ টরেন্স প্রভৃতি মহাত্মাগণের নাম শোন নি, যাঁহারা অভাগা ভারত সন্তানদের দুঃখ দূর কোর্তে প্রাণপণে যত্ন করে থাকেন। আর এই যে সজ্জন-পালক প্রজারঞ্জক, মহামতি লর্ড নর্থব্রুক গবর্ণর জেনারেল হোয়েছেন, ইনিই তোমাদের দুঃখ দূর কোরবেন······।”

একদিকে ইংরেজদের অত্যাচার নগ্নরূপে প্রকাশ করা ও অপর দিকে রাজানুগত্য প্রদর্শন, এই দুই পরস্পর-বিরোধী মনোভাবই হচ্ছে স্বাদেশিকতার বয়ঃসন্ধি-পর্বের বৈশিষ্ট্য। এইভাবে বাঙ্গালী ক্রমশঃ স্বাধিকার আন্দোলনের যৌবন-মুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। এছাড়া, দীনবন্ধু তাঁর ‘নীলদর্পণ’ নাটকে যেভাবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ শাসকবর্গেকে সকল অত্যাচার অবসানের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, পরবর্তীকালের নাট্যকারেরা সেই আদর্শকে অনুসরণ করেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। প্রচণ্ড ইংরেজ বিদ্বেষ প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতকের কাহিনী।

আমরা এই পর্বে বাঙ্গালীর সংঘবদ্ধ জাতীয়তা ও স্বদেশচিন্তার আদর্শের পরিচয়টি ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছি। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যুগমনীষীদের সংগঠনী মনোভাবকেই বরণ ও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ‘সাহস’ ‘ধৈর্য্য, ও ‘ঐক্য’ ত্রয়ী আদর্শধারাকে নাট্যচরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করে দেশবাসীকে কর্তব্যপথের সন্ধান ও কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন।

ধৈর্য্য :— “আর কেন জননী গো করিছ রোদন।
ধৈর্য্য ধর শোকাবেগ কর সম্বরণ॥
আমি ধৈর্য্য—ধৈর্য্য আর ধরিতে না পারি।
কেমনে তোমার মাগো নিবারিগো বারি॥
ভ্রাতৃগণ আর কেন, কর গাত্রোত্থান।
জননীর দুঃখানল করিতে নির্বান॥
ওহে ভীরু,—ভীরু ভাব ছাড় হে এখন।
অভাগিনী জননীরে করহে যতন॥

হইয়ে আমার বশ, আশা পূর্ণ কর।
আমি ধৈর্য—মম দাস—(শ্বেতাঙ্গী অমর) ॥
নিজগুণে সবে বশ করিবে যেদিন।
জানিব রে সেই দিন তব শুভদিন ॥
জাতি হিংসা, অভিমান, লোভ, অপমান।
ত্যজরে এদের সবে, হয়ে সাবধান ॥
ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য ধর সবে।
অবশ্য তোদের ভাই বাসনা পূরিবে ॥"

সাহস :—

"কি ভয় সাহস আমি এসেছি আপনি,
লওরে আশ্রয় মোর, কি ভয় শমনে ;
আমার সহায়ে পার আমার জিনিতে,
রাক্ষসে কি ভয় তব ? ভেব না ভেব না,
অবিলম্বে দুঃখ নিশি হবে অবসান,
ভারতের সুখরবি উদিবে গগনে।
কায় মনে প্রাণপণে কররে যতন।
'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'।"

ঐক্য :—

"ভ্রাতৃগণ, অনৈক্যতা, আত্মাভিমান ও স্বজাতি-হিংসাই, তোমাদের সর্ব্বনাশের মূল। যতদিন তোমাদের অন্তর হতে এসকল ভাব দূরীভূত না হবে, ততদিন তোমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এখন সকলে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর ও কায়মনোবাক্যে জননীর দুঃখনাশব্রতে ব্রতী হও।

কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়,
'যতোধর্ম স্ততো জয়'—
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?"

এই সমস্ত উক্তিমালাতে 'হিন্দু মেলা'র প্রভাব অত্যন্ত সুচিহ্নিত। বিশেষভাবে, "স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য। ......সেই শুভ ফল (স্বাধীনতা) না আসা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইবেক।...জননীর

দুঃখাবমার্জ্জনে আর বিলম্ব করিও না ; জাগরুক হও, উত্থান কর, চক্ষুরুন্মীলন কর, পবিত্র প্রতিজ্ঞাজলে অভিষিক্ত হও, স্বাবলম্বনরূপ বসন পরিধান কর, ঐক্যরূপ শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধর ...ভ্রান্তি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিস্তীর্ণ কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হও"...৪

'হিন্দু মেলা'র এই ভাষণটির সঙ্গে, কিরণচন্দ্রের বক্তব্যের নিবিড় সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

'ভারতে যবন' (১৮৭৪) রূপকেও নাট্যকার একই চিন্তাকে গ্রহণ করেছেন। নাটিকাটির বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন,

"বঙ্গভাষায় 'ভারত-মাতা' প্রথম মাস্ক (রূপক)। সাধারণ ব্যক্তিগণ ভারত মাতার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে 'ভারতে যবন' দ্বিতীয় মাস্ক রচনা করিলাম, এখানিও যে সকলের মনোরঞ্জন করিবে, এমন আশা করি না। একমাত্র ভরসা ভারত-লক্ষ্মীর ক্রন্দনে আর্য্যসন্তানগণ সকলেই অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিবেন। এই মাস্কখানি ইংরাজ বাহাদুরের রাজত্বের দুই, তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রজাপীড়ক যবনদিগের রাজত্বকালের ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। যবনগণের উপর আর্য্যসন্তানদিগের যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ আশাকরি এই মাস্ক পাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। সে যাহা হউক আমি এক্ষণে 'ভারতে যবন' স্বদেশানুরাগী মহোদয়গণকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।"

স্বাধীনতা হীনতার বাণী এই নাটিকায় একটু উগ্র আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। মলাটের মুখে নাট্যকার বলেছেন,

"স্বাধীনতা সম কি আছে আর
পামর যবনে করি কি ভয়।"

নাট্যচরিত্রগুলির মধ্যে 'উদাসিন', 'গুরু বামদেব' ও 'ভারতসন্তান'-দের মুখে কিরণচন্দ্র 'স্বাধীনতা' শব্দটি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে সন্নিবেশিত করেছেন। ভীরুতা, কাপুরুষতা ও সর্বপ্রকার দাসত্বকে অস্বীকার করে দেশবাসীকে স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে; কারণ পরাধীনতাই ভারতের সমস্ত দুঃখের মূল ও উৎস। 'উদাসীনে'র সঙ্গীতে নাট্যকার অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে নিজের কাতরতার কথা ব্যক্ত করেছেন,

৪ মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল ; পৃ. ৮৯-৯৩।

"দেখিলাম এক নারী নগেন্দ্র কন্দরে বসি।
রাহু ভয়ে শশী যেন ভূতলে পড়েছে খসি॥
আলুলায়িত কেশা, ছিন্ন, ভিন্ন মলিন বেশা,
আহা কি মরি দুর্দ্দশা, স্বর্ণবর্ণ যেন মসি।
বলে ধনি হা বিধাত! হয়ে ভারত বীরেন্দ্রমাত:
বিজাতি বিপক্ষ হাতে হইলাম লাঞ্ছিত,
(হায়) পুত্র হয়ে মাতৃ দুঃখ কেননা নাশিছে আসি।
অতঃপর জানিলাম তিনি সাধারণের জননী,
ভারত স্বাধীনতা ধনি, অশ্রুমুখী দিবানিশি॥"

গুরু বামদেবের আত্মধিক্কারে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাই রূঢ়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

"......আমরা কি মনুষ্য? আমরা কি আর্য্যসন্তান? আমরা কি স্বর্গীয় মহাত্মা বীরচূড়ামণি মহারাজাধিরাজ ভরত-রাজবংশোদ্ভব? আমাদের বংশে কি পরশুরামাদি বীরকেশরীগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন? এমন বোধ হয় না। আমরা সে হিন্দু নই, সে আর্য্যসন্তান নই। ধিক্ হিন্দু কুলকলঙ্ক কাপুরুষগণ, তোমরা সকলে অম্লান বদনে জঘন্য সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিতেছ, ভ্রমেও স্বাধীনতা দেবীর প্রলাপে কর্ণপাতও করিতেছ না—তোমাদের ন্যায় ভীরু, কাপুরুষের জন্যই স্বাধীনতা দেবী ভারতভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনে নগেন্দ্রকন্দরে দিবানিশি হাহাকার কচ্চেন। একদিন একদণ্ড এক মুহূর্তের জন্যও তোমাদের মন জননীর দুঃখনাশব্রতে ব্রতী হয় না।"

'ভারতসন্তান'কে সংগ্রামী মনোভাবে অভিষিক্ত দেখে সকলকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন,

"ধন্য হিন্দুকুল-গৌরব, বৎস, যদি তোমার ন্যায় সকল আর্য্যসন্তানগণের অন্তঃকরণ স্বাধীনতাস্পৃহায় প্রজ্জলিত হতো, তাহলে এই পুণ্যভূমি ভারতভূমি কি কখন পরাধীন থাকে, ভারতমাতা কি এত দুর্দ্দশা ভোগ করেন, কখনই না।"

'ভারতমাতা' নাটিকাতে ইংরেজ রাজত্বের পটভূমিতে নাট্যকার কিরণচন্দ্র যা বলতে দ্বিধাচিত্ত হয়েছেন, 'ভারতে যবন' নাট্যমাস্কে তা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেছেন। নাটিকার পটভূমি ভিন্ন হওয়ার জন্য লেখকের মনের অভিব্যক্তি কোথাও কুণ্ঠিত হয়নি।

নাট্যকার আপন মনের অভীপ্সা, নাট্যচরিত্র গুরু বামদেবের উক্তির মধ্যে

প্রচার করেছেন। জাতি-জাগরণী চিন্তার অগ্নি-শায়ক কিরণচন্দ্র দিকে দিকে নিক্ষেপ করে দেশবাসীকে আত্মসচেতন হতে আহ্বান জানিয়েছেন। স্বাদেশিকতার উগ্রপ্রচার এই নাটকে প্রকাশ্যভাবে বিঘোষিত হয়েছে। সমস্ত বাঙ্গালীর চিত্তবিক্ষোভ ও সুতীব্র স্বদেশাভিমান নাট্যকারের বক্তব্যে যেন মুখর হয়ে উঠেছে।

"বাম। বাজাও দুন্দুভি বাজাও আবার,
দুর্দ্দান্ত যবনে কর ছারখার,
আনন্দে, সাহসে, অরাতি নিকরে,
আর্য্যভূমি হতে দাও দূর করে,
বীরপ্রসূ এই ভারত-জননী,
কত ক্লেশ আর সহিবে মানিনী?
স্বাধীনতা পদে সঁপ প্রাণমন,
লভিতে সে ধন ক .রে যতন।
মনে কর সেই আর্য্যসুতগণে,
হরিণ ভবনে, সিংহ সম রণে।
ঐ শোন কাঁদে ভারত জননী।
হাহাকার করি লুটায়ে ধরণী।
হারায়ে উজ্জল স্বাধীনতা-মণি।

(২)

স্বাধীনতা সম কি আছে আর,
বীরের জীবন, বীর অলঙ্কার,
বীর প্রসূ হায়! ভারত জননী,
অশ্রুজলে তাঁর ভাসিছে ধরণী
হারায়ে উজ্জল স্বাধীনতা-মণি,

(৩)

মলিন বসন আলুলিত কেশ,
উহু মরি মরি পাগলিনী-বেশ,
মুখে পুনঃ পুনঃ বলিছে হায়,
'যবন-পীড়নে মরি প্রাণ যায়'।

ওরে কুলাঙ্গার আর্য্যসুতগণ,
জননীর দশা দেখ্‌রে এখন,
পুত্র হয়ে হায় বল্‌ কি করে
মাতারে সঁপিলি যবন-করে ?
অধীনতা ভার না পারি বহিতে,
যবন-গঞ্জনা না পারি সহিতে,
ম্লেচ্ছ, নরাধম যবনে দেখিতে,
চাহেনা, চাহেনা, চাহেনা, প্রাণ,
এই ভিক্ষা, কর স্বাধীনতা দান।

(৪)

*　　　*　　　*

*　　　*　　　*

স্বাধীনতা হেতু কেনা বল হায়,
অরাতি-নিকরে বিক্রম দেখায় ?
কে না বল হায় করবাল ধরি
সমরে নাশিছে অসংখ্য অরি ?
পরাধীন নীচ, ভারত-সন্তান,
পশুর অধম, গর্দ্দভ-সমান,

*　　　*　　　*

ভারতের শিরে হোক্‌ বজ্রাঘাত,
ভারত-নারীর হোক্‌ গর্ভপাত,
সমূলে, সবংশে ভারত নিপাত,
জগদীশ ! যেন এখনি হয়,
অধীনতা-ক্লেশ আর না সয়।

(৫)

যাও শিশু যাও হরিষ-অন্তরে,
দুর্দ্দান্ত যবনে নাশরে সত্বরে

*　　　*　　　*

ধর করবাল, বিলম্ব না আর,
এখনি যবনে কররে সংহার

যবন মরিবে এ জ্বালা যাইবে,
জননীর দুঃখ আর না থাকিবে,
স্বাধীনতা-মণি হৃদয়ে ধরিবে,
বিলম্ব না আর, হও অগ্রসর,
বীর-দর্পে নাশ যবন-নিকর।"

মনে হয় কিরণচন্দ্রই নাট্যজগতে প্রথম প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে সম্মুখ-সমর নীতি গ্রহণের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। আত্মনির্ভরতা ও একতার সঙ্গে বাহুবলের সাধনা ও সংগ্রামের যে আবশ্যিক প্রয়োজন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কিরণচন্দ্র অত্যন্ত আবেগঘন চিত্তে প্রচার করেছিলেন। 'ভারতে যবন' নাট্যমাস্কে ভারত সন্তানের উক্তিতে নাট্যকারের স্বদেশচিন্তার রূপটি প্রকৃষ্টভাবে বিদ্যমান। ভারত রমণীকে উদ্দেশ্য করে ভারত সন্তান বলেছে,

"ভারত সন্তান। জননী, আপনার চরণ ও এই প্রাণপ্রিয় অসিই আমার সহায়......যদি একজন যবনকেও বিনাশ করতে পারি...আমি আপনাকে ধন্য মনে করবো। সেই নরাধম, কাপুরুষগণ কি পুরুষ, যারা অম্লানবদনে স্বদেশের মায়া ও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে বিদেশীর দাসত্ব স্বীকার কচ্ছে?...দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।......

জননী আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি, ভারতমাতা উচ্চৈঃস্বরে বলচেন্, 'পুত্রগণ! আর কতকাল আমি যবনগণের যথেচ্ছাচারের পাত্রী হয়ে থাকব, আর কতকাল দীন-হীন ভিখারিণীর ন্যায় কাল যাপন করবো, কতকাল অন্নবস্ত্রের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াব, আর কতকাল সন্তানগণের এরূপ দুর্দ্দশা সচক্ষে দর্শন করবো? যদি তোমরা আমার সন্তান হও শীঘ্র যবনের অধীনতা নিগড় ভগ্ন করে আমায় স্বাধীন কর—স্বাধীন হও?' মা এসব শুনে কি নিশ্চিন্ত থাকা যায়।"

'ভারতে যবন' নাট্যমাস্কে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য স্থির লক্ষ্যবাণী উচ্চারিত হলেও উগ্র জাতীয়তার বিষবাষ্প নাট্যকারের স্বদেশ-চিন্তাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছে। জাতীয় ঐক্যের ভেরী তিনি সুউচ্চে নিনাদিত করলেও সাম্প্রদায়িকতার মোহঘোরে সম্মোহিত হয়েছেন; এবং এরই ফলে 'ভারতে যবনে' ধর্ম-বৈষম্যজনিত বৈরিতার কথাই প্রধানভাবে স্থান পেয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিরোধ দূর করে যে জাতীয় মিলন

স্বদেশপ্রেমকে নিটোল করে তোলে, নাট্যকার কিরণচন্দ্র তার কোন পরিচয় এই নাট্যমাস্কে রাখেননি। তিনি যেন আধুনিক যুগের রাষ্ট্রচিন্তাতে মধ্যযুগীয় সংস্কারাবদ্ধ কলুষ পল্বল-বারি নিক্ষেপ করতে চেয়েছেন। তাঁর 'যবন' কথাটির প্রয়োগ ইংরেজদের বিকল্প প্রতীকচিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে, এই উক্তিগুলি—

"ম্লেচ্ছাসুর। সৈন্যগণ, আজ আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমরা অবিলম্বে এই মন্দির লুণ্ঠন আরম্ভ কর; কোন আশঙ্কা কোরো না, আবালবৃদ্ধবনিতা, কাহারো প্রতি দয়া প্রকাশ কোরো না, যে যাহা লুণ্ঠন কোর্‌বে সে সমুদায়ই তার নিজের ধন হবে। এই মন্দিরই কাফেরগণের সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয় স্থান, এই মন্দিরস্থ হিন্দু-দেবতার মস্তকে যে অমূল্য অত্যাশ্চর্য্য হীরক আছে, আমার নিকট প্রেরণ কোরো, অবশিষ্ট সমুদায় তোমাদের।

যবনগণ। আল্লা, আল্লা হো।" (লুণ্ঠন আরম্ভ)

অন্যদিকে,

"হর হর বোম হর হর হর
যবন বিনাশে হও অগ্রসর।"

উক্ত নাট্যচিত্রের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের ছায়াপাত আবিষ্কার করা কঠিন না হলেও, স্বাদেশিক চিন্তা বিস্তারে অন্যান্য নাট্যকারগণ রূপান্তরের যে তিরস্করিণীটি সুকৌশলে নিক্ষেপ করেছিলেন, কিরণচন্দ্র তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ফলে তিনি স্বাধীনতাকামী হয়েও খণ্ডিত ও সংকীর্ণ দলের অনুগামী হয়েছিলেন। বিশাল চিত্তের অধিকারী তিনি হতে পারেননি।

আর মনে হয় তাঁর নাট্যমাস্কটি শুধু এই একটি কারণের জন্য যুগের ছাড়পত্র পায়নি। এ ছাড়া জাতীয়তার দিক থেকেও তিনি কোন মৌলিক চিন্তা পরিবেশন করতে পারেননি। যুগচেতনার প্রভাবেই তাঁর রচনাগুলির যা কিছু মূল্যবোধ। নাট্যচরিত্রগুলি বাক্‌সর্বস্ব, ঘটনার কোন বিকাশ-বিস্তৃতি নেই ও পরিবেশনাও বহুলাংশে শিথিল। কেবলমাত্র দেশবাসীর স্তিমিত মনে আবেগ সঞ্চার করেই নাট্যমাস্কটি আপন কর্তব্য-কর্ম শেষ করেছে। তাই প্রচারধর্মী দৃশ্য-বক্তব্য হিসাবেই একে গ্রহণ করতে হবে। সমকালে 'ভারতে যবন' রঙ্গমঞ্চে কতখানি সফল হয়েছিল সে বিষয়েও সন্দেহ আছে, কারণ সে যুগের স্বাদেশিক নেতাগণ তাঁদের আত্মজীবনী অথবা জাতীয় আন্দোলন চিত্র বর্ণনাতে কোথাও এই নাট্যমাস্ক সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেননি।

মনোমোহন বসু

২

মনোমোহন বসু স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা নিয়েছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের কাছে। স্বদেশ, স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের মানুষ ও স্বদেশের প্রকৃতি সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের যেমন একটি শ্রদ্ধাবোধ সদাজাগ্রত ছিল, অনুরূপ স্পর্শকাতরতা মনোমোহনের স্বদেশচিন্তাতে পরিলক্ষিত হয়। দীক্ষাগুরু ঈশ্বর গুপ্তের মতো তিনি চেয়েছিলেন জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য ও আদর্শকে আধুনিক চিন্তার সঙ্গে সংমিশ্রিত করতে। এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল,

"আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই, দেশের পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও।"[৫]

'হিন্দু মেলা' বা 'চৈত্র মেলা'র বিভিন্ন স্বাদেশিক বক্তৃতায় এবং নাটক রচনার পশ্চাতে এই মনোবাসনার ছায়াপাত ঘটেছে। 'হিন্দু মেলা'র জাতীয়তাবাদী চিন্তায় প্রাচীন ও আধুনিক দুই-ধারার বৈশিষ্ট্য কিভাবে এক বেণীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, পটভূমি বিচারে আমরা তা লক্ষ্য করেছি সাগ্রহে। এবং এরই সঙ্গে উপলব্ধি করেছি মনোমোহন বসুর স্বাদেশিক চিন্তার স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গলা নাটক রচনার পশ্চাতে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক দুই বিপরীত মেরুকে এক সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এক কথায় তিনি তাঁর পৌরাণিক নাটকে প্রাচীন বিষয়-বস্তুতে আধুনিক চিন্তা পরিবেশন করেছেন।* উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ও প্রকৃতি তিনি তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতে বহুলাংশে সংযোজিত করেছেন। বিশেষভাবে 'হরিশ্চন্দ্র'

---

৫ জাতীয় নাট্যশালায় প্রথম সাম্বৎসরিক বক্তৃতা: মনোমোহন বসু।

* "এমন কোন অনুপমা পতিপ্রাণার মাহাত্ম্য চাই, যা শুনলে বিদেশীর বিস্ময়, স্বদেশভক্তি, বালিকার শিক্ষা, যুবতীর চৈতন্য ও বৃদ্ধার অনুতাপ হবে।"— প্রস্তাবনা: 'সতী'।

· "হায়! হায়! বহুবিবাহ কি অশেষ অনর্থের মূল!—কি অপ্রতিহতরূপে সকল সুখ ও সকল ধর্ম্ম নষ্ট করে! আজ নিশ্চয় জানলেম, পুরুষ যতই কৃতি হউন, যত সতর্ক থাকুন, তথাপি বহু বিবাহবৃক্ষে বিষময় ফলোৎপাদন হবেই হবে, তার সন্দেহ নাই।"—'রামাভিষেক' (৩।২)

"...আজ অবধি বঙ্গসমাজ যেন শিক্ষা পায় আর যেন কেউ কন্যা সন্তানের প্রতি অবজ্ঞা না করে, কন্যারত্ন আর পুত্ররত্ন উভয়কেই যেন সমদৃষ্টিতে দেখে, সমান যত্ন করে।"

—'আনন্দময়' (৫।৫)

নাটকে জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব স্পষ্ট। আমরা জানি অর্থনৈতিক বিপর্যয় সে সময়ে বাঙ্গালীকে কি ভাবে ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট করে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার দুর্নীতি ও ক্রমাগত শোষণ এদেশবাসীকে আত্মসচেতন করে ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা সম্পর্কে এক গভীর সচেতনতা দেখা দেয়। মনোমোহন বসুর স্বাদেশিক চিত্ত বাঙ্গালীর এই শোচনীয় বিপর্যয়ে ব্যথিত হয়। বাঙ্গলাদেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ে তিনি এক সংগীত রচনা করেছিলেন এবং 'হিন্দু মেলা'র অধিবেশনে তা গীত হয়েছিল। সংগীতটি জনমনে গভীর আবেদন সৃষ্টি করে। তিনি 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫) নাটকে এই সংগীতটি সযত্নে পরিবেশন করেছেন। পৌরাণিক পটভূমিতে, তিনি আপন যুগের সামাজিক জীবনের করুণ কাহিনী এবং নিঃস্বতার হাহাকারকে বিলাপের অশ্রুসজল দীর্ঘশ্বাসে সম্প্রসারিত করেছেন। নাট্যচরিত্র বিশ্বামিত্র ও মহামাত্যের কথোপকথনে নাট্যকার তৎকালীন করলাঞ্ছিত বাঙ্গালীর অসহায় জীবনের পাণ্ডুর চিত্রটি করুণ তুলিতে এঁকেছেন। আর এর সঙ্গে ইংরেজ শাসনব্যবস্থার রীতি-নীতি, বিচার ব্যবস্থা, রাজস্ব আদায়ের স্বরূপ, দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের দুর্গতি ও শিক্ষা-নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনাও করেছেন ব্যক্ত। সে সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যা আলোচনা হত 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে তাই নাট্য-সংলাপ হিসাবে স্থান পেয়েছে; উদ্ধৃতির সাহায্যে আমরা এর পরিচয় নিতে পারি। নাট্যচরিত্র শাসক নাগেশ্বরকে বৃটিশ প্রভুদের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

"বিশ্বামিত্র।—ভাল, ভাল, তাই ভাল একবার অভিযোগটাই শুনা যাক্ —বল দেখি, কি প্রণালীতে কিরূপ শাসন কচ্ছে ?...

মন্ত্রী। দৃষ্টান্ত অধিক কি দিব। দু' একটা প্রধান পরিবর্ত্তনের নাম কল্লেই প্রভু জান্তে পার্ব্বেন। তিনি আজ্ঞা দিলেন, সমাজ মধ্যে যত অধীন রাজা রাজড়া আছেন, তাঁরা দত্তক পুত্র লতে পার্ব্বেন না। অনেকের সকাতর প্রতিবাদে যদিও এখন স্থলবিশেষে তা হতে দিচ্ছেন, কিন্তু এরূপ প্রত্যেক ঘটনাতেই তাঁকে জানাতে হচ্ছে! শুধু জানিয়েই কি নিস্তার? বহু সাধ্য সাধনা বাধ্যতায় যদি তাঁর মন যোগাতে পারে তবেই অনুমতি প্রাপ্তির সম্ভাবনা। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, মৃত্যুকালীন দানপত্র দ্বারা যারে ইচ্ছা আপনার ত্যক্ত বিষয় দান করে যাবার অধিকারটি যে বিষয়াধিকারীর ছিল, ইনি তাতেও বাধা দিচ্ছেন!...তারপর নিয়ম-প্রচারক শাসনকর্তাদের কথা.

শুনুন ;—পূর্ব্বে অধীন দেশসমূহে সেই সেই দেশের লোকেরাই শাসনকর্ত্তৃপদে ও অন্যান্য রাজকার্য্যে নিযুক্ত হতেন, তাঁরা আপন আপন দেশের আচার, ব্যবহার, ভাব, অভাব, ভাষা প্রভৃতি এবং প্রকৃতিপুঞ্জের গতিমতি সম্যক্ প্রকারেই জ্ঞাত থাকতেন—তাঁরা যথার্থই অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপালন ক'র্ত্তেন।

পাতঞ্জল। এখন ? এখন ? এখন কি হয়েছে ?

মন্ত্রী। এখন সেই সব শাসনকর্ত্তাদের বিনাদোষে পদচ্যুত করে বিদেশীয় শাসনকর্ত্তার হাতে লক্ষ লক্ষ প্রজার ধন, মান, প্রাণ সমর্পিত হচ্ছে ! উচ্চ কর্ম্মমাত্রেই তুঙ্গদ্বীপের লোক নিযুক্ত। তারা এদেশের কিছুই জানে না, আপনাদের খেয়ালে যিটি ভাল বোধ হয় তাই করে, দেশীয় বিজ্ঞলোকেরা পরামর্শ দিতে গেলে উপহাসে উড়িয়ে দেয় ! ফলতঃ তারা দেশাচারে যেমন অনভিজ্ঞ, আত্মগরিমা আর যথেচ্ছাচারে তেমনি মত্ত ! অধিক কি, অধীন জাতিকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না।···

বিশ্বামিত্র। তোমরা কি নাগেশ্বরকে বুঝাও নি ?

মন্ত্রী। প্রভু ! বিস্তর বুঝিয়েছি—প্রজারাও বারবার জানিয়েছে, কিন্তু জানালে কি হবে, তাঁর দৃষ্টিতে এদেশবাসী কেউ যোগ্য নয়—কেউ মানুষই নয়—তিনি তাদের কারোকেই বিশ্বাস করেন না ! বিশেষ তাঁর স্বদেশের লোককে প্রতিপালন করাই যেন তাঁর সিংহাসন গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য······ প্রভু ! এ তো গেল শাসন বিভাগের কথা, এতে বরং নিম্নশ্রেণীতেও দেশীয় লোক নিযুক্ত হয়, কিন্তু সৈনিক বিভাগে অতি সামান্য কর্ম্মচারীর পদেও এদেশের লোক প্রবেশ কর্ত্তে পায় না ! এর ফল কি হচ্ছে ? সোনার ভারতবর্ষের তেজীয়ান্ অধিবাসীরা নিতান্ত নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন—তাঁরা পশুর ন্যায় কেবল আহার, নিদ্রা আর গৌরবহীন সামান্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে কাল কাটাচ্ছেন ! তাঁরা উচ্চ রাজকার্য্যে, কি জাতীয় উচ্চ ভাব-পালনে নিতান্ত অনভ্যস্ত, নিশ্চেষ্ট ; সুতরাং অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ছেন ! অধিক কি, এভাবে আর কিছুকাল রাজত্ব করে যদি নাগেশ্বর তাঁর স্বদেশের সকল লোক সঙ্গে এদেশ ছেড়ে যান, তারপর যথাযোগ্যরূপে রাজকার্য্য চালায়, কি শত্রুহস্তে রাজ্য রক্ষা করে, এমন যোগ্য লোক রাজ্যে থাকে কিনা সন্দেহ ! ··

বিশ্বামিত্র। ধর্ম্মাধিকরণের অবস্থা কিরূপ ?

মন্ত্রী। পূর্ব্বকার কিছুই নাই—পঞ্চায়তের বিচারে গ্রাম্যলোক সন্তুষ্ট হতো, তাদের ব্যয় বাঁচতো, এখন তার বিপরীত। এখন অতি জটিল, অতি কুটিল, অতি কঠিন, অসংখ্য ব্যবস্থাসকল বিধিবদ্ধ হয়েছে; সরল প্রজালোক তার কিছুই বুঝতে পারে না; সুতরাং ব্যবহারজীবী নামে একপ্রকার ভয়ানক ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হয়েছে, তারা প্রকৃতিবর্গের গায়ের রক্ত শোষণ কর্চ্ছে! এখন আর বিচার বিতরিত নয়, বিক্রীত হয়। 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ' সেকাল আর নাই—যারা অধিক ধূর্ত্ত, অধিক ব্যয়ক্ষম, অধিক উৎকোচদাতা, তাদেরি জয়, ধর্ম্মের জয় প্রায় ঘটে না! আবার, রাজার স্বদেশীয় লোকে ঘোর অত্যাচার কর্লেও স্বজাতীয় বিচারপতিদের পক্ষপাতে অনায়াসে মুক্তি পায়, কাজেই তাদের সেই দৌরাত্ম্য অদমনীয়রূপে নিত্যই বৃদ্ধি হচ্ছে! প্রভুকে আর অধিক কথায় বিরক্ত কর্ব্বো না—সংক্ষেপে আর দুটি প্রধান বিষয়ে কিছু নিবেদন কর্লেই হয়। সে দুটি আর কিছু না—রাজস্ব আর শিল্পবাণিজ্য।

বিশ্বামিত্র। রাজ্যের সুখ, দুঃখ সেই দুটির উপরেই অধিকতর নির্ভর করে বটে—সে দুটির হয়েছে কি?

মন্ত্রী। প্রভুর অগোচর নাই, রাজস্ববিভাগ মিতাচারে ও মিতব্যয়িতায় চালাতে না পার্লে রাজা কখনই সুপালক হতে পারেন না; কিন্তু নাগেশ্বরের রাজ্যে যেরূপ অমিতব্যয়িতা, অসুর জাতির রাজত্বকালেও তেমন ঘটে নাই; কাজেই ভারতের লোক এমন দুঃসহ করভারে আর কখনই প্রপীড়িত হয় নাই! নাগেশ্বরের যে কতবিধ কর, তার সংখ্যা করা ভার—প্রজারা কোনো পুরুষে সে সকলের নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করে নি! নাগেশ্বরের সচিবগণ কর-গ্রহণে যেন সহস্র-কর, তাঁদের নিয়ন্ত্রিত করের দায়ে ভারতে হাহাকার পড়েছে—যারে অসহ্য বলে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দশাই ঘটেছে! ঐ শুনুন, প্রজারা গীতচ্ছলে বোধহয়, সেই দুঃখই জ্ঞাপন কর্চ্ছে!

নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর!
দে কর, দে কর, রব নিরন্তর, করের দায় অঙ্গ জর জর!
সিন্ধু বারি যথা শুষে দিনকর,
শোণিত শোষণ করে শত কর;
কর দাহে নর নিকর কাতর,
রাজা নয়, যেন বৈশ্বানর! ১॥

ভূমি-কর মাত্র ছিল দেশে কর,
কে জানিত এত কর দুখাকর ?
কর বিনা রাজা করে না বিচার,
ধর্ম্মে নয়, ধনে জয়ী নর ! ২ ॥
বাড়ী-ঘর-আলো-শান্তি-জল-কর—
স্থল-পথে আর সেতুর উপর,
জলে গেলে তরী ধরে রাজচর—
শূন্য বই গতি নাহি আরো ! ৩ ॥
গো-অশ্ব-শকট-কর বহুতর—
পশু-নর, কারো নাহিক নিস্তার !
নীচ কর্ম্মে খাটে তাদের ধরে কর—
নীচাশয় এম্নি রাজ্যেশ্বর ! ৪ ॥
আয়-কর শুনে, গায়্ আসে জ্বর !
অস্থি-ভেদী রথ্যা কর কি দুষ্কর !
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর !
কত আর কব মুনিবর ! ৫ ॥
মাদকতা-কর ছলে দেশময় ;
মদ্যের বিপণি, নিত্য বৃদ্ধি হয় ;
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয় !
হাহাকার রব নিরন্তর ! ৬ ॥

... ...

বিশ্বামিত্র। শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, তাতেও আমাদের ভয়ানক দুরবস্থা। প্রভু জানেন, ভারতের তন্তুজাত কৌষেয় আর সূত্র-বসনেই সমস্ত সভ্যজাতি সজ্জিত হতো ; কিন্তু হায় ! আজকাল ভারতের সেই অসংখ্য তন্তু নিস্তব্ধ—সে সব কেবল ইন্ধন-কাষ্ঠ হয়ে পড়ে রয়েছে ! প্রভু, বল্‌তে লজ্জা করে, এখন তুঙ্গদ্বীপ হতে বস্ত্র এসে ভারতের সজ্জারূপে লজ্জা নিবারণ কর্চ্ছে ! আজ যদি সেই বস্ত্র আসা বন্ধ হয়, কাল পরিধেয় বসনের জন্য দেশে হাহাকার পড়ে যায়। আমাদের কর্ম্মকার-শ্রেণী কেবল সামান্য কুদ্দাল, নিড়ান, হাতা-বেড়ী, লাঙ্গলের ফাল প্রভৃতি গোটাকতক স্থূল কর্ম্মেই যা কিছু নিযুক্ত আছে, নচেৎ যত

সূক্ষ্ম কারু তুঙ্গদ্বীপ হতেই এখানে আনীত হচ্ছে! আর ব্যবহারিক বিজ্ঞান, কি উচ্চ অঙ্গের বড় বড় শিল্পানুষ্ঠান, দেশে যা প্রবর্ত্তিত হচ্ছে, তাতে এদেশের লোক অতি নিম্নস্তরেই যা কিছু সহকারিতা কর্ত্তে পায়, নতুবা তুঙ্গদ্বীপের লোকই সব! সুতরাং প্রভু, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি যা হচ্ছে, তার ফলভোগে এদেশের লোক সম্পূর্ণই বঞ্চিত—এদেশের লোকের মধ্যে প্রকৃত বণিক আর নাই বল্লেই হয়—সমুদ্র এখন তুঙ্গদ্বীপের পোতেই পরিপূর্ণ, আর্য্যপোত অদৃশ্য হয়েছে, বৎসর বৎসর এদেশের কোটি কোটি মুদ্রা লভ্যস্বরূপ নানা কৌশলে তুঙ্গদ্বীপে চলে যাচ্ছে, তাতে দেশ ক্রমে নিতান্ত নির্ধন হয়ে পড়ছে!

বিশ্বামিত্র। লেখাপড়ার, শিক্ষার বিধান কিরূপ?

মন্ত্রী। তাতে মন্দ বলতে পারি না, কিন্তু সাহিত্য ইতিহাসে যেমন উচ্চ ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়, গণিত আর বিজ্ঞানে যদি তেমন হতো, কি তার সঙ্গে ঐ শিল্প আর সমর-বিদ্যার অধ্যাপনা চল্‌তো, তবেই বুঝতেম নির্ম্মল প্রজাবাৎসল্য প্রকাশ পাচ্ছে! ফলকথা, যে সব বিদ্যার প্রভাবে উচ্চ অঙ্গের শিল্পবাণিজ্য, রণকৌশলাদির শিক্ষা পেয়ে প্রজারা যথার্থ উন্নত হবে, কি জাতীয় গৌরবের পদে আরোহণ কর্ত্তে পার্ব্বে, নাগেশ্বর সে দিগেও যান না!...

দিনের দিন, সব দীন, হয়ে পরাধীন!
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ!
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্য-ভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্যবংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু মুখে লীন্! ১॥

অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন্! ২॥

তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষী শেষে
হায় গো রাজা কি কঠিন্! ৩॥

তাঁতি, কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সুতা যাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র, বিকায় নাকো আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন্! ৪ ॥
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা, কিসে রবে লাজ?
ধর্ব্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ—
বাকল, টেনা, ডোর, কপীন্! ৫ ॥
ছুঁই, সুতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে—
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন্!" ৬ ॥ (৫ম অঙ্ক)

'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের এই সংলাপ-সমষ্টিকে আমরা যুগ-সমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি। 'সোমপ্রকাশে' যা লেখা হয়েছিল, মনোমোহন বসুর নাটকে তারই হুবহু প্রতিফলন ঘটেছে।

"বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তার সময়েও প্রকৃতপক্ষে প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা হইতেছে বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। প্রজাগণকে এই বলিয়া প্রবোধ দেওয়া হয় যে শাসন কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিতে গেলেই ব্যয় বৃদ্ধি হয় কিন্তু 'সুশাসন' এই শব্দটি আমরা কেবল শুনিয়াই আসিতেছি কাজে ত কিছুই দেখিতে পাই না। রাজধানীর মধ্যে চুরি ও হত্যা হইলে দশটার মধ্যে একটাও ধরা পড়ে না। মফস্বলের ত কথাই নাই। সর্ব্বত্র লাল পাগড়ি দেখ, কিন্তু প্রয়োজনের বেলা কাহাকেও পাইবে না। মফস্বল ও রাজধানীর উভয় স্থানেই অনুসন্ধানী পুলিশ আছেন, কিন্তু তোমার বাটীতে চুরি গেল তুমি যদি ইঁহাদিগের গাড়ী ভাড়া দিয়া নিরন্তর ইঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া অনুসন্ধান করিতে পার, তাহা হইলে ইঁহারা চোর ধরিয়া বাহাদুরী লইতে পারেন। নিজে পরিশ্রম না করিয়া যদি পুলিশের উপরে নির্ভর কর, অপহৃত দ্রব্য লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। বিচারালয় হইতে সুবিচার লাভের আশাও ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। আজিকালি আদালতে প্রকৃত কাজ যত হউক, আর না হউক বাহ্য আড়ম্বর বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইযাছে। একটি কূট তর্ক করিয়া মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিতে পারিলে

বিচারপতিগণ তাহার দোষগুণ বিচারে বড় প্রবৃত্ত হন না। বিচারপতিগণের এই রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। এদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, সুতরাং এখানে অল্প টাকার মকদ্দমার সংখ্যাই অধিক কিন্তু বিচারপতিগণ ও গবর্ণমেণ্ট যাহাতে খাস আপীলের সংখ্যা কমে তন্নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়াছেন। প্রকৃতার্থে এককালে ইহা উঠাইয়া দেওয়া তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। তাঁহারা এই কারণ প্রদর্শন করেন যে বিষয় লইয়া মকদ্দমা হয়, তাহার মূল্য অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অধিক পড়ে। এটি অযথার্থ নয়; কিন্তু অর্থদ্বারা সুবিচারের কি পরিমাণ করা কর্ত্তব্য! জেলার জজদিগের যে রূপ তাহাতে খাস আপীলের নিয়ম উঠাইয়া দিলে দরিদ্রদিগের যে কি দশা হইবে তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠে। ভূমিই আমাদিগের প্রধান উপজীব্য। আমরা জানিতাম, যে জাতিই এদেশে প্রভুত্ব করুন, যতই অত্যাচার হউক না কেন, কেহই আমাদিগের ভূমি মস্তকে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না। কিন্তু ইন্‌কাম ট্যাক্স, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, রথ্যাকর, প্রভৃতিতে ভূমির সমুদায় রস শোষণ করিতেছে। যাবতীয় করভার দরিদ্র কৃষকের উপরেই পতিত হইতেছে। কয়েক বৎসরাদি বাণিজ্য বৃদ্ধি নিবন্ধন কৃষকদিগের অবস্থার কতক উন্নতি হইতেছিল, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিবার যে রাজনীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে কৃষকদিগকে পুনর্ব্বার সেই পুর্ব্বতন অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। শস্যের উপরে রপ্তানীকর স্থাপিত হইলে বাণিজ্য বৃদ্ধি দ্বারা এদেশের কৃষকের অবস্থার উন্নতি সম্ভাবনা নাই। ইহাতেও গবর্ণমেণ্ট বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর পরম বন্ধু!

উচ্চতর শ্রেণী সম্বন্ধে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার তাহাদিগকে মূর্খ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। জমিদারগণ ত শাসনকর্ত্তাদিগের চক্ষুঃশূল; কৃষি, স্বাধীন ব্যবসায়, বাণিজ্য অথবা চাকুরী, এই কয়েকটি মধ্য-শ্রেণীর অবলম্বনীয়, কৃষিকার্য্যে যত সুখ লাভ হয় তাহা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্বাধীন ব্যবসায়ের মধ্যে চিকিৎসা এবং ওকালতী। কিন্তু অনেকে এই ব্যবসায় অবলম্বন করাতে ইহাতেও আর তাদৃশ লাভ নাই। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিষয়ক রাজনীতি নিবন্ধন এদেশের শিল্পের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইতেছে। বোধ হয়, ইংলণ্ডে যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট এদেশের কৃষিকার্য্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন।

শিল্পজাত দ্রব্যের উপরে এত কর হইয়াছে, যে তাহার দ্বারা লাভ হওয়া কঠিন। বাণিজ্যের পথে এত কণ্টক যে বিদেশের সহিত ভারতবর্ষীয়গণের বাণিজ্য করা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশের দ্রব্য ক্রয় করিয়া এদেশীয়দিগের নিকটে বিক্রয় করিবার পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে বটে কিন্তু দেশের দ্রব্য লইয়া বিদেশে বিক্রয়ের পথ বন্ধ হইয়াছে। সেনাদলের দ্বার রুদ্ধ আছে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের যে কিঞ্চিৎ সম্মান ছিল,······তাহাও গিয়াছে। অচিহ্নিত বিচারপতিগণকে ত পদে পদে অপমানিত হইতে হইতেছে।······কয়েকজন এতদ্দেশীয় সিভিলিয়ান হইয়াছেন, তাঁহারা যে উচ্চতর পদ লাভ করিবেন সে সম্ভাবনাও অল্প।······

আমরা যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই অত্যাচার লক্ষিত হয়। করভারে দেশ উৎসন্ন হইল। তথাপি গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত নহেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন করবার ভাণ করিয়া শিক্ষা ও শান্তি রক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় স্থানীয় আয় হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছেন।···দেশের লোকে প্রতিবাদ করিতেছেন বটে কিন্তু কোন ফল নাই।···সর্ব্বসাধারণের চিন্তার সীমা নাই।···একদিকে প্লাবন, পীড়া ও দুর্ভিক্ষে দেশ উৎসন্ন করিতেছে। লোকসংখ্যা সর্ব্বত্র কমিতেছে। তথাপি গবর্ণমেণ্ট কর সংগ্রহে ক্ষান্ত নহেন। এই সকল চিন্তা করিয়া আমাদিগের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে।"[৬]

দীনবন্ধু তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে ইংরেজ অত্যাচারের বিভিন্ন চিত্র যেমন তুলে ধরেছিলেন, মনোমোহন বসুও অনুরূপ ভাবনায় ইঙ্গ-রাজপুরুষদের অত্যাচার দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর নাট্যরচনাতে নানাবিধ চিত্রধর্মিতার অন্তরালে। এক সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সংবেদনশীল মনোভাব মনোমোহন বসুর নাটক রচনার পশ্চাতে কার্যকরী হয়েছিল বলেই, তাঁর নাটকগুলি জনচিত্তে সুগভীর প্রভাব মুদ্রিত করেছিল।

বহু রাজার নাট্যশালায় মনোমোহন বসুর নাটকগুলি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল। যে সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়ে মনোমোহন বসুর নাটকগুলির অভিনয় দর্শন করেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্বাদেশিক

৬ সোমপ্রকাশ : ১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেক উদার ইংরেজ সম্প্রদায়ও এই অভিনয়ে উপস্থিত থাকতেন।[৭]

মনোমোহন বসুর নাটকগুলির মূল্যবোধ কেবলমাত্র তার স্বাদেশিক ভাবনা প্রচারের মধ্যেই সীমিত। জীবনের শাশ্বত রসরূপে ও গভীর চিন্তার আলোড়নে তাঁর নাটকের কোন চরিত্র আলোড়িত হয়নি। মনোমোহন বসুর নাটকগুলিতেও এমন কোন চরিত্র নেই যা বৈশিষ্ট্য গৌরবে ভুষিত হ'তে পারে। ফলে এই সমস্ত নাটকগুলি যুগের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করেনি। তবুও স্বাদেশিক অনুভাবনার প্রচার আন্তরিকতার সঙ্গে করেছিল বলেই যুগমনীষীরা সমবেত হয়ে নাটকগুলির অভিনয় দর্শন করতেন ও দেশাত্মবোধে এবং স্বদেশগরিমাতে আত্মহারা হতেন। এছাড়াও মনোমোহন বসুর নাটকগুলি, বিশেষভাবে 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উপর আলোকপাত করেছিল বলে, এই নাটক জাতিকে কেবল স্বজাতি গৌরবে নয়; আত্মসমালোচনার পথে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে প্রত্যয়নিষ্ঠ হতে আহ্বান জানিয়েছিল। মনোমোহন বসু পৌরাণিক কাহিনীর অভ্যন্তরে উনিশ শতকের যুগবাণী প্রচার করেছিলেন বলে তাঁর নাটকগুলিকে একসঙ্গে সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

হরলাল রায়

৩

হরলাল রায়ের নাটকগুলি আলোচনার পূর্বে বাঙ্গালীর ইতিহাস-সাধনা ও সত্যানুসন্ধানের একনিষ্ঠ প্রয়াসের কথা স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্র অকৃত্রিম বঙ্গপ্রীতিবশেই বাঙ্গালীর ইতিহাস পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। জাতি-গৌরবের মহান্ ঐতিহ্যকে উদ্ধার করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর ইতিহাস সাধনার মহান্ ব্রত।

---

৭ Indian Stage (Vol. II) : H. N. Das Gupta ; p. 131.

তিনি বাঙ্গলা দেশের প্রচলিত কাহিনীগুলিকে যুক্তি ও মননে বিচার করে সত্যতা নিরূপণের চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল,

"কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।" (বাঙ্গলার ইতিহাসের ভগ্নাংশ)

বাঙ্গলার ইতিহাস ব্যাখ্যা তাঁর গভীর দেশাত্মবোধের আভাস দান করে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলার যে ইতিহাস চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে দেশপ্রেমের গভীর ব্যগ্র-ব্যাকুলতা থাকবে এটাই ছিল তাঁর প্রধান প্রত্যাশা। এই সচেতন মনোভাব নিয়ে তিনি বাঙ্গালীর অতীত কলঙ্ক যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে মোচন করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি পুনর্বার মন্তব্য করেন,

"আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে .....বল্লালের দেড়শত বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্য্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, উহা অনুমেয়। তখনও তাঁহারা এদেশে ঔপনিবেশিক মাত্র। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্য্য দিগের কিছু কমিতেছে বটে।" (বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার)

'মৃণালিনী' (১৮৬৯) রচনা কালে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক ইতিহাস অনুসন্ধানী মনোবাসনার পরিচয় আরও একবার লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্মণাবতী বিজয় বর্ণনা কালে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি,

"ষষ্টি বৎসর পরে যবন ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই।"

'মৃণালিনী'তে লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের পর মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে যে কথা বলেছিলেন, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত চিন্তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

"যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গৌড় নহে।"

এই উক্তির আর একবার পুনঃপ্রচার পাই পরবর্তী কালের অপর একটি রচনাতে,

"উত্তরবাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গালা কোন অংশই বখ্‌তিয়ার খিলিজি জয়

করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।" (বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা)

বঙ্কিমচন্দ্রের এইসব উক্তিতে কোন অহেতুকী দেশপ্রীতির প্রকাশ নেই। বর্তমান কালের ঐতিহাসিকদের নিরপেক্ষ গবেষণাতে মীনহাজ উদ্দিনের বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা দু'টি মন্তব্য গ্রহণ করব।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বিচার করে বলেছেন,

"দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নোদিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগরবাসীগণ প্রথম তাঁহাকে অশ্ববিক্রেতা বণিক মনে করিয়াছিল। তিনি প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া অবিশ্বাসীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময় রায় লখ্‌মানিয়া আহার করিতেছিলেন। তিনি মুসলমানগণের আগমন শ্রবণ করিয়া পুরমহিলাগণ, ধনরত্ন-সম্পদ, দাস-দাসী পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া বঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন।—ইহাই ইতিহাস-বেত্তা মিনহাজ-উস্‌-সিরাজের বিবরণ। মিনহাজ গৌড় বিজয়ের চত্বারিংশৎ বর্ষ পরে নিজামউদ্দিন এবং সমসামুদ্দিন নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে বখ্‌তিয়ারের বিজয় কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিনহাজ ৬৪১ হিজিরাব্দে (১২৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতী নগরে অর্থাৎ গৌড়ে সমসামুদ্দিনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্তৃক গৌড়ে ও রাঢ়ে সেনরাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু যে ভাবে বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রথম কথা নোদিয়া কোথায়? নোদিয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধহয় যে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার লুণ্ঠনোদ্দেশে আসিয়া সেন রাজ্যের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কারণ নবদ্বীপ যে সেন বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

দ্বিতীয় কথা, আগমনের পথ; কান্যকুব্জের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ, মগধ হইতে সামান্য সেনা লইয়া গৌড় বা রাঢ় লুণ্ঠন তত সহজ নহে।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কোন্‌ পথে নোদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তিনি যদি রাজমহলের নিকট দিয়া গঙ্গার দক্ষিণকূল অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অল্প সেনা লইয়া আসিতে পারেন নাই এবং রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার না করিয়া আসেন নাই। তখন ঝাড়খণ্ডের বনময় পর্ব্বতসঙ্কুল পথ সামান্য সেনার পক্ষে অগম্য ছিল। এই সকল কারণে অষ্টাদশ অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের গৌড়বিজয় কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। গৌড় জয়ের প্রকৃত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে। তাহা নূতন আবিষ্কারের আলোকে উদ্‌ভাসিত হইয়া না উঠিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না।

তৃতীয় কথা, লক্ষ্মণ সেন তখন জীবিত ছিলেন না। লক্ষ্মণ সেনের পুত্রত্রয়ের মধ্যে তখন কে গৌড় রাজ্যের অধিকারী ছিলেন তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল কিনা তাহাও অদ্যাপি স্থির হয় নাই। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের নোদিয়া বিজয় কাহিনী সম্ভবতঃ অলীক। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, নোদিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, কারণ মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান মুগীস্‌উদ্দিন যুজবেক নোদিয়া বিজয় করিয়া বিজয় কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিজয় কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রায় মুদ্রাঙ্কনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।...কান্যকুব্জ বিজয়ের পরে সুলতান শমস্‌উদ্দিন আলতামন্‌ এইরূপ মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান সিকন্দার শাহ্‌ কামরূপ বিজয়ের পরে স্মরণার্থ মুদ্রায় বিজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই তমসাচ্ছন্ন যুগে গৌড়ে সেনবংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল; কোন সময়ে কিরূপে গৌড়দেশ মুসলমান বিজেতার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। গৌড়রাজ্য বিজয়ের পরে লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ যে বঙ্গদেশে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ উস্‌-সিরাজ স্বয়ং সে কথা স্বীকার করিয়াছিলেন।"[৮]

আচার্য যদুনাথ সরকারও অনুরূপভাবে বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয় কাহিনী

৮ বাঙ্গলার ইতিহাস ১ম ভাগ: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: পৃ. ৩৬৮-৩৭০।

সমর্থন করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাননি। এ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন,

"Whatever view we might take of the nature and consequences of the Muslim raid on Nadiya, and Lakshmanasena's responsibility for the same his name should go down in history as that of a great and noble, though unfortunate ruler. Inspite of popular views to the contrary, based on a superficial knowledge of the account in 'Tabaquat-i-Nasiri', he must be regarded as the last great Hindu hero in Bengal of whom his country might well feel proud. Even a perusal of 'Tabaquat-i Nasiri' leaves the impression that the aged king showed far greater courage and patriotism than his Counsellors and Chieftains. It is not perhaps without significance that while the author of 'Tabaquat i Nasiri' passed over in silence, even such a famous king as Prithviraja, he want out of his way to bestow very high praises upon Lakshmanasena, the great Rae of Bengal, and even compared him with Sultan Qutabuddin. There must also be some good reason why the people of Gaya region clung fondly to his name for nearly a Century after his death and his memory was perpetuated in Mithila (North Behar) by the naming of an era after him."[৯]

তাহলে একথা স্বভাবতঃই স্পষ্ট যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যুক্তিবাদী আদর্শে যা গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা আরও গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে সমর্থিত হয়েছে। নাট্যকার হরলাল রায় তাঁর স্বাদেশিক চিন্তাদর্শের সমিধ বঙ্কিমচন্দ্রের মানসাদর্শলোক থেকেই গ্রহণ করেন। তাঁর 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪-৭৫) নাটকটি বঙ্কিমের চিন্তানায়কত্বে পরিচালিত। হরলাল রায়ের স্বাদেশিক ভাবনা ও জাতীয়তাবোধ যুগচিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিল,

৯ History of Bengal (Vol. I) : Dr. R. C. Mazumder ; pp. 224-225.

এবং তিনি পরাধীনতার বেদনায় ব্যথিত হয়েছিলেন। বাঙ্গালীকে হীন-বীর্য-গ্লানি থেকে উদ্ধারের জন্যই তিনি নতুন চিন্তা ও নতুন উপাদানের ভিত্তিতে লাক্ষ্মণ্য সেনের চরিত্রটিকে এঁকেছিলেন। উনিশ শতকের উত্তরার্ধের বাঙ্গালীর স্বাদেশিক বাসনার ছাপ এই নাটকটির সর্বাঙ্গে মুদ্রিত হয়ে আছে। জাতীয়তাবাদী চরিত্র হিসাবে লাক্ষ্মণ্য সেন হরলাল রায়ের তুলিতে চিত্রিত হয়েছেন। মন্ত্রী মহেন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁর পরাজয়ের একমাত্র কারণ। প্রকৃতপক্ষে লাক্ষ্মণ্য সেন বীর, যোদ্ধা, স্বদেশবৎসল এবং মহান্ দেশনায়ক। বৃদ্ধ লাক্ষ্মণ্য সেন দেশের শাস্ত্রবিচারকদের হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। বিদেশী শত্রুর ভয় ও আক্রমণ তাঁকে দুর্বল করতে পারে নি। তিনি বারবার জরাজর্জরে ক্লিষ্ট দেহ নিয়েও দেশপ্রীতিতে মুখর হয়ে উঠেছেন। যেমন,

"লাক্ষ্মণ্য। আমি নিজে প্রজাবর্গকে বড় স্নেহ করি। ধর্ম্ম বলছেন আমি তাহাদিগকে রক্ষা করব—রক্ষা করতেই হবে। এই জরাজীর্ণ শরীর নিয়েও রক্ষা করতে হবে। (উৎসাহের সহিত) যুদ্ধ করা উচিত—যুদ্ধ করব।

বিরাট। (সোৎসাহে) যুদ্ধ করব, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব, তাতে প্রাণ যায় যাবে।

হরিপ্রসাদ। বঙ্গভূমি কখনও পরাধীন নন—আমরা জীবিত থাকতে পরাধীন হতে দেব না। বঙ্গীয় তরবারিতে ম্লেচ্ছ রক্তের স্রোত প্রবাহিত করব।

লাক্ষ্মণ্য। বঙ্গবাসীমাত্রেই এইরূপ দৃঢ় সংকল্প হওয়া উচিত।" (৩।১গ)

আবার,

"লাক্ষ্মণ্য। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া আস্তে আস্তে পরিক্রমণ) হস্তপদ বদ্ধ হয়ে অতল বিষসাগরে নিমগ্ন হতে হল। এ শতজন্মের দুষ্কৃতির ফল। যার শরীর হতে মাংস পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বিগলিত হয়ে পড়ে সেও কি এত যন্ত্রণা ভোগ করে? কোটী কোটী লোক আমার প্রজা, আমি কিনা বিনাযুদ্ধে দুরাচার ম্লেচ্ছদিগকে রাজ্য ছেড়ে দিচ্ছি? বঙ্গে কি বীর নাই? কাপুরুষ লাক্ষ্মণ্য সেনের শাসনকালে বঙ্গ কি বীরশূন্য হ'ল? আমি মূর্ত্তিমান কলঙ্ক হয়ে পড়েছি! যুদ্ধ করলেম না—করতেও পেলেম না—বিধাতা দিলেন না।... বিধাতা, বঙ্গভূমি কি দোষে দোষী, যে তাহার গায়ে অধীনতা শৃঙ্খল পরাচ্ছ? বাঙ্গালীরা ধর্ম্মভীত, মহৎ, শান্তস্বভাব, তাই কি তাহাদিগকে পরাধীন করছ? কেন চির অনাবৃষ্টি, দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ, ভীষণ মহামারী দ্বারা বঙ্গভূমিকে

জনশূন্য করলে না? আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠ, হিংসা বিদ্বেষশূন্য ধর্ম্মপরায়ণ বাঙ্গালী জাতিকে পরাধীন ম্লেচ্ছাধীন, ম্লেচ্ছপ্রপীড়িত, ম্লেচ্ছপদদলিত হবার জন্য কি সৃজন করেছিলে? বাঙ্গালীরা কার সুখের হন্তা হয়েছিল, কার দুঃখের কারণ হয়েছিল, যে তাদের এই পরিণাম হ'ল?

গোবিন্দ। (সবেগে) সর্ব্বনাশ উপস্থিত—প্রস্থান করুন, করুন, এসেছে—মুসলমানেরা এসে পড়েছে—রাজবাটীতে প্রবেশ করেছে। প্রস্থান করুন, প্রস্থান করুন।

লাক্ষ্মণ্য। কি রাজভবনে প্রবেশ করেছে? লাক্ষ্মণ্য সেন এখনও মরে নাই। (বেগের সহিত অস্ত্রধারণ) প্রহরীরা দ্বার রক্ষা করতে পারলে না, আমি নিজে যাই, দেখি হিন্দু তরবারিতে ম্লেচ্ছের রক্তপাত করা যায় কিনা?··· (সাক্ষেপে) আমি রাজাধম, পুরুষাধম, নরাধম, নররক্ত এ শরীরে প্রবাহিত হওয়াই বিধাতার বিড়ম্বনা। লাক্ষ্মণ্য সেনের পক্ষে অস্ত্রধারণ করা মহাপাতক।" (৩।২গ)

আমরা প্রথম থেকেই জানি যে বাঙ্গলা দেশে আধুনিকতার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের পুনর্বিচার শুরু হয়েছিল। শাস্ত্রকে জীবনানুগ ও মানবান্বিত করবার এক প্রয়াস দেশের সংস্কারবেত্তাদের কর্ম ও চিন্তাতে অনুশীলিত হতে থাকে। যে শাস্ত্র জীবনকে মুক্তি দেয় না, সুস্থ জীবনসত্য বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে, আধুনিক শাস্ত্রকারেরা তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। "I do not believe in the holiness of the Ganges"[১০] —এই ধারনাই ছিল আধুনিক মনীষীদের নব্যচিন্তার বাণী। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ মানবহিতবাদী আদর্শেই শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কোমতের যুক্তিবাদীচিন্তাতে শাস্ত্র বিশ্লেষণ করে সার সত্যকে গ্রাণাইট স্তরের উপর স্থাপন করেন। তিনি আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করেন এবং অলৌকিক বিশ্বাস ও সঙ্কীর্ণতা থেকে ধর্মকে উদ্ধার ও রক্ষা করেন। নাট্যকার হরলাল রায়ও অনুরূপ যুগচিন্তার সৈকততটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, শাস্ত্র-সত্যে প্রথানুগত বিশ্বাস ও দৈব-নির্ভরতার প্রতি গভীর আনুগত্য এবং যুক্তিবাদী চিন্তাকে অস্বীকার, বাঙ্গালীর অধঃপতন ও পরাজয়ের অন্যতম কারণ। অহৈতুকী দৈববিশ্বাস ও নির্ভরতা এবং শাস্ত্রবাক্যের প্রতি

---

১০ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃ. ১২১।

যুক্তিহীন আস্থা লাক্ষ্মণ্য সেনের পরাজয়ের যে একমাত্র কারণ, হরলাল রায় তাকেই বিশ্লেষিত করেছেন,

"লাক্ষ্মণ্য। অবশ্য শাস্ত্রই মানবের চক্ষু। শাস্ত্র আমাদিগকে সকল বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন। পাঠ করুন।

বিরাট ও হরিপ্রসাদ। পড়ুন, পড়ুন, শাস্ত্রে উপায়ের কথা লেখা আছে, ঠিক সেইটাই অবলম্বন করা যাবে।

গোবিন্দ। মহারাজ শুনুন।...কলিশেষে যবনেরা প্রবল হয়ে বঙ্গজয় করবে। দৈব কার্য্য দ্বারা বা অস্ত্রবলে ইহাকে রক্ষা করা যাবে না। যবন সেনাপতি শ্বেতবর্ণ মহাকায়, দীর্ঘবাহু, প্রশস্ত বক্ষ, তাহাকে পরাস্ত করে কাহারও সাধ্য নাই।......

মহেন্দ্র। আশ্চর্য্য! শাস্ত্রে এ সবই আছে—যবন সেনাপতির বর্ণ, শরীরের গঠন—সমুদয়! মহারাজ, আজি যে দূত ফিরে এসেছে, সে যবন সেনাপতিকে এইরূপই বর্ণনা করলে। হা হতভাগ্য বঙ্গদেশ!

লাক্ষ্মণ্য। বঙ্গভূমির কপালে শেষে এই ছিল! যা হবার তাই হবে যুদ্ধ করব—বঙ্গের পতন হবার পূর্ব্বে লাক্ষ্মণ্য সেনের পতন হ'ক।

মহেন্দ্র। শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয় না। ইহা না জানাই ভাল ছিল, কুসত্য অপেক্ষা সুঅজ্ঞানতা বাঞ্ছনীয়।

গোবিন্দ। যুদ্ধ করা দেবতাদিগের অভিপ্রায় নয়, তাহলে শাস্ত্রে এরূপ লেখা থাকবে কেন?

লাক্ষ্মণ্য। বিধাতার ইচ্ছা বঙ্গভূমি যবনাধিকৃত হয়, কিন্তু বঙ্গের জন্য লাক্ষ্মণ্য সেনের প্রাণ দেওয়া দেবতাদিগের অনভিপ্রেত নহে।

গোবিন্দ। যাহা করা বৃথা তাহা অনাবশ্যক। মহারাজ যুদ্ধ করবেন না।

লাক্ষ্মণ্য। (সচিন্তিতভাবে) যুদ্ধ করব না! এই সুন্দর রাজ্য যবনেরা জয় করবে, অনায়াসে জয় করবে! (সবেগে) বঙ্গভূমির কি রক্ষক নাই, রাজা নাই, সৈন্য নাই? যবনেরা পতাকা তুলে জয়বাদ্যে গগন প্রতিধ্বনিত করবে, আর বঙ্গভূমি বিনা বাতাসে শুষ্কপত্রের ন্যায় নিঃশব্দে পতিত হবে—এবং কাপুরুষ লাক্ষ্মণ্য সেন জীবিত থাকবে! রাজ্য, স্বদেশ, জন্মভূমির জন্য যুদ্ধ করব না? নরদেহ বিশিষ্ট লাক্ষ্মণ্য সেন কি পাষাণমূর্ত্তি মাত্র? গুরুদেব লাক্ষ্মণ্য সেন বৃদ্ধ বটে, ভীরু নয়। যুদ্ধ করব ·আপনি নিষেধ করলে আমার সাধ্য নাই যুদ্ধ করি। (চিন্তিতভাবে) যুদ্ধ করব না। (সাক্ষেপে) বিরাট, মহেন্দ্র, আমাকে

জীবিত অবস্থায় চিতায় তুলে দগ্ধ কর। আমার নিরীহ প্রজাগণ শত্রু-হস্তগত হবে—উ-হ—বিধাতা! কেন রাজমুকুট শিরে ধারণ করেছিলাম, কাপুরুষদের মস্তকে রাজমুকুট শোভা পায় না। (মুকুট ভূতলে ক্ষেপণ) গুরুদেব, নিষেধ করবেন না, যুদ্ধ করি।" । (৩।১গ)

কিন্তু লাক্ষ্মণ্য সেন দেশের পরাধীনতার কথা স্মরণ করে মর্মপীড়া অনুভব করলেও, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে তিনি গুরুবচন ও তৎ কথিত শাস্ত্র বচনকে অস্বীকার করতে পারেন নি। একদিকে শত্রুদলনে মনের দুর্নিবার ইচ্ছা, অপরদিকে সংস্কার নীতিকে অস্বীকার করতে না পারাতে চিত্তপীড়া তাঁর জীবনে এক প্রবাহের সঞ্চার করেছিল এবং তারই ফলে মৃত্যুদৃশ্য হয়ে উঠেছে নিষ্করুণ। এই দৃশ্যে লাক্ষ্মণ্য সেন সকলের সহানুভূতি অর্জন করতে পেরেছিলেন। জাতির দেশাত্মবোধ পরাধীনতার কথা স্মরণ করে গভীরভাবে ব্যথিত-বেদন হয়েছিল।

"লাক্ষ্মণ্য। ন্যায়পরায়ণ হলেই বা কি আর প্রজাবৎসল হলেই বা কি? রাজার পক্ষে কাপুরুষ হওয়া অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ নাই। আমি সহজে ম্লেচ্ছগণকে রাজ্য সঁপে দিলাম, প্রজাদিগকে দুঃখার্ণবে ভাসালেম। বঙ্গভূমির রক্ত-মাংস-মজ্জা থাকতে ম্লেচ্ছেরা তাঁকে ছাড়বে না।

গোবিন্দ। বিধাতার নির্ব্বন্ধ—আপনার দোষ কি?

লাক্ষ্মণ্য। মানুষে এইরূপে আপনাদের দোষ বিধাতার উপর আরোপ করে। আমি অতি কাপুরুষ। আমার কথা উল্লেখ করে শত্রুগণ হাসবে, স্বপক্ষগণ আক্ষেপ করবে। ভারতবর্ষে অনেক রাজা আছেন—আমার ন্যায় কাপুরুষ কে? আমি বঙ্গভূমিকে, হিন্দুজাতিকে কলঙ্কিত করলেম।...... শতসহস্র বৎসর পরেও বঙ্গবাসীরা আমার নাম শুনলে আমাকে গাল দেবে, আর বলবে, 'পৃথিবীর ইতিহাসে লাক্ষ্মণ্য সেনের মত কাপুরুষ আর একটিও নাই।' ম্লেচ্ছ পীড়নে জর জর হবে আর আমাকে গাল দেবে। গুরুদেব, কত দুষ্কর্ম্মের ফলে যে কাপুরুষ নাম রেখে এ পৃথিবী হতে চল্লেম তা বলতে পারি না।......হা বঙ্গ! লাক্ষ্মণ্য সেন তোমার বুকে ছুরি দিয়েছে।··· বি-রা-ট, কাপুরুষের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখতে এসেছ? বাবা, কাপুরুষ লাক্ষ্মণ্য সেন চিরস্থায়ী কলঙ্ক রেখে চলল।···আমি তোমায় রাজ্য দিয়ে পরলোকগমন করব মনে করেছিলাম, এখন দিয়ে চললেম, ন রাজ্য, ন সম্পদ—শুদ্ধ মর্ম্মভেদী দুঃখ ও মনঃপীড়া।......বিরাট, কাপুরুষ লাক্ষ্মণ্য সেনের শতদোষ মার্জ্জনা কর।

ইষ্টদেব, আমার শতদোষ মার্জ্জনা কর। কিন্তু বঙ্গ, তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করতে পার না। বঙ্গ বিনাশ করে চললেম।…হা বঙ্গ-বঙ্গ-বঙ্গ।" (মৃত্যু) (৫।৪গ)

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর হীনবীর্যতার জন্য যেমন খেদোক্তি করেছিলেন, হরলাল রায়ও অনুরূপভাবে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের দুর্বলতাগুলির সমালোচনা করেছেন। বহিরাগত তুর্কী মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি ও তাঁর দূতের সঙ্গে কথোপকথনে বাঙ্গালীর নিস্তেজ প্রাণধর্ম্মিতার কথা তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

"বক্তিয়ার। বাঙ্গালীরা কেমন ?

দ্বিতীয় দূত। বাঙ্গালীরা বড় দুর্ব্বল, গায়ে অনেক মাংস আছে, কিন্তু পেটেই মাংসের ভাগটা অধিক।

বক্তিয়ার। (হাস্য করিয়া স্বগতঃ) বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল, খোদা তাদের সুখী করেই অকর্ম্মণ্য করে ফেলেছেন। খোদা তাদের সব দিয়েছেন, কিন্তু আত্মরক্ষার উপায় করে দেন নাই।

দ্বিতীয় দূত। বাঙ্গালীরা বড নিস্তেজ, তাদের কথায় তেজ নাই ; চলনে তেজ নাই, কাজে তেজ নাই। সহজে রাগে না, রাগলে এক লহমার মধ্যে রাগ পড়ে যায়। বাঙ্গালীরা মিঠে কথায় বড ভোলে।

বক্তিয়ার। বাঙ্গালীকে জয় করা বড় সহজ, জয় করে শাসনাধীনে রাখাও সহজ, এমন জেতের উপর গুরুতর অত্যাচার করেও তাদের দু'কথায় নরম করা যায়।" (২।৪গ)

অন্যত্র,

"প্রথম ছদ্মবেশী মুসলমান। বলি, বাঙ্গালামুলুক তো সহজে জিতে নেওয়া যায়, বাঙ্গালীরা তো অতি ভাল মানুষ।

দ্বিতীয় ছদ্মবেশী মুসলমান। বাঙ্গালীরা তো আদমীর মধ্যেই নয়, তাদের মুলুক জিতে নিতে আমাদের আওরাতেও পারে।

প্রথম ছদ্মবেশী মুসলমান। বাঘের কাছে গো, আর মোদের কাছে বাঙ্গালী।" (২।৪গ)

জাতীয় ঐক্যই দেশ ও দেশবাসীকে সুদৃঢ় করে। কিন্তু দেশের মানুষের ব্যক্তিচিত্তের স্বার্থপরতা ও আত্মতোষণের লোলুপতা রক্তিম আগুনে লেলিহান হয়ে উঠলে ঐক্যগ্রন্থী শিথিল হয়ে পড়ে এবং তারই ফাঁক দিয়ে বিদেশী শক্তি

ক্ষমতাধিকারের রাজপথ প্রশস্ত করে নেয়। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ছিদ্রপথেই ভারতের স্বাধীনতা বহুবার বিসর্জিত হয়েছে। ইতিহাস এ বিষয়ে আমাদের বহু নিদর্শন দেয়। বিশ্বাসঘাতকতাই দেশ ও জাতির অপমৃত্যুর অন্যতম কারণ। দেশাত্মবোধহীনতা থেকেই বিশ্বাসঘাতী মনোবাসনার সৃষ্টি হয়। এমন কি বিদেশীর কাছেও বিশ্বাসঘাতক মর্যাদা বা সম্মান লাভ করে না। নাট্যচরিত্র বক্তিয়ারের উক্তিতে এরই ছায়াপাত ঘটেছে,

"বক্তিয়ার। পঞ্চাশ হাজার সৈন্য—যুদ্ধ না করাই ভাল—বিনা রক্তপাতে রাজ্যলাভ। মন্ত্রী লোকটা বুদ্ধিমান কিন্তু বিশ্বাসঘাতক। যাক্ আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হলেই হ'ল। অতি জঘন্য লোক—স্বার্থের জন্য স্বাধীনতা অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতে পারে। যে জাতির মধ্যে এমন কুলাঙ্গার আছে তাদের কোন কালেই মঙ্গল নাই। খোদা কাফেরদের এইরূপই করেছেন—ধিক্ স্বার্থপর, কুলাঙ্গার, কাপুরুষ কাফের।" (২।৪গ)

আবার,

"বক্তিয়ার। আমি কেমন করে তোমাকে বিশ্বাস করি?

মহেন্দ্র। আমি লাক্ষ্মণ্য সেনের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করেছি বলে কি আপনারও নিকট বিশ্বাসঘাতক হব?

বক্তিয়ার। যে ব্যক্তি স্বজাতীয়, স্বধর্ম্মাবলম্বী, পরমোপকারক প্রভুর নিকট নেমক্‌হারামী করেছে, সে ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিদেশীয়ের নিকট কেমন করে বিশ্বাসী হতে পারে? তুমি সহস্র শপথ করলেও তোমাকে বিশ্বাস করতে পারিনে।

মহেন্দ্র। আমি রাজ্য দিয়েছি, তথাপি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন না?

বক্তিয়ার। সেইজন্যই তোমাকে আরও অবিশ্বাস করি।

মহেন্দ্র। আমি স্বীকার করি যে লোভে পড়ে বিশ্বাসঘাতক হয়েছি, কিন্তু যদি সে লোভ চরিতার্থ হয় তবে আর অবিশ্বাসী হব কেন?

বক্তিয়ার। লোভী অবিশ্বাসী হয়, আর অবিশ্বাসীর নূতন লোভ হতে কতক্ষণ?" (৫।৩গ)

এইভাবে দেশের বিশ্বাসঘাতকদের নিন্দা করে নাট্যকার হরলাল রায় স্বদেশবাসীকে স্বদেশের প্রতি অনুরক্ত ও আন্তরিক হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল গভীর, তাই তিনি দেশকে

সকলের উর্দ্ধে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন। পরাধীনতার মধ্যে অনন্ত সুখভোগ অপেক্ষা শত দারিদ্র্যের ভিতরে স্বাধীনতাই শ্রেয়—এই ছিল তাঁর স্বদেশচিন্তার মূলকথা। নাট্যচরিত্র বক্তিয়ার ও বিরাটের কথোপকথনে এই মনোবাসনার প্রকাশ ঘটেছে।

"বক্তিয়ার। আচ্ছা তুমি আমার নিকট জীবন প্রার্থনা কর না?

বিরাট। যখন জননীর হস্তপদ শৃঙ্খলে বাঁধা হ'ল, তখন আর সন্তানের বেঁচে কি প্রয়োজন?

বক্তিয়ার। তোমার বাক্য আমার অশ্রু আকর্ষণ করেছে। আমি তোমাকে জীবন দিচ্ছি—স্বাধীনতাও দিচ্ছি, যদি তুমি আমার অধীনে কোন উচ্চ পদ গ্রহণ করতে স্বীকার কর।

বিরাট। আমি তোমার অধীনে সর্ব্বোচ্চ পদও প্রার্থনা করি না।

বক্তিয়ার। আমার অধীন হয়ে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ কর।

বিরাট। যে আমার মায়ের অমূল্য নিধি চুরি করতে পারে, আমি তার অধীনে রাজত্ব স্বীকার করি না।

বক্তিয়ার। বুঝতে পেরেছি, তুমি পরাধীন দেশে বাস করতে চাও না। চল আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে চির স্বাধীন রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি সেখানে স্বাধীন লোকের সঙ্গে স্বাধীন হয়ে জীবন যাপন কর।

বিরাট। আপন মাকে দুরবস্থায় ফেলে কি পরের মাকে মা বলব? আমি বঙ্গমাতার সন্তান, এ আমার পরম গৌরব। ওহে মুসলমান সেনাপতি, বঙ্গভূমির তুল্য দেশ আর পৃথিবীতে নাই। বিদেশের সুখের জন্য বঙ্গভূমিকে ভুলতে পারি না।

বক্তিয়ার। তোমার বাক্য বাক্য নয়—মধুবর্ষণ। আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিচ্ছি, তুমি স্বদেশে থাক, কিন্তু স্বদেশীয়গণকে বিদ্রোহী করতে চেষ্টা ক'রও না।

বিরাট। বিরাট সেনকে স্বাধীনতা দিলে সে স্বদেশীয়গণকে স্বাধীন করতে নিশ্চয়ই উত্তেজিত করবে, অতএব—আমাকে তোমার স্বাধীনতা দিয়ে কাজ নাই। বল আমি তোমার ভয় নিবারণের জন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ফাঁসিকাষ্ঠে উঠছি।

বক্তিয়ার। বিরাট তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম। যাও তুমি সৈন্য সংগ্রহ করগে। তোমার মত বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুখ আছে। সাহসী শত্রু

ভাল, কাপুরুষ মিত্রও কিছু নয়। কিন্তু বিরাট, বাঙ্গালীরা কাপুরুষ, তারা তোমার কথায় অস্ত্র ধারণ করবে না।

বিরাট। মুসলমান সেনাপতি, মনুষ্যের কি এতদূর অবনতি হতে পারে যে সে স্বাধীনতা লাভের আশায় প্রাণ দিতে পারবে না? বাঙ্গালীরা কি মনুষ্যত্বহীন হয়েছে?

বক্তিয়ার। যা করতে পার কর গিয়ে। শত্রু হয়ে আমার হাতে পড়েছিলে, এখন মিত্রভাবে যাও।

বিরাট। আমার স্বদেশের শত্রু কখনই আমার মিত্র হতে পারে না। আমি শত্রুভাবে চললাম।" (৫।১গ)

শাসক সম্প্রদায় বাঙ্গালীর নবজাগ্রত স্বাদেশিক চিন্তাকে দমন করবার জন্য কেবল আইনবল প্রয়োগ করেননি, লোভনীয় প্রসাদের মোহপাশে বদ্ধ করে তাদের জাতীয়তাবোধকে শূন্যগর্ভ করতেও হয়েছিলেন উদ্যত। বৃটিশ রাজনীতির একটা বিশেষ দিক নাট্যকার কৌশলে বক্তিয়ার চরিত্র-চিত্রণে প্রচার করেছেন।

স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে হরলাল 'এগ্রেসিভ্' মনোভাবাপন্ন ছিলেন বলে মনে হয়। যখন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রকাশ্য বিরোধিতা ও রক্ত-বিপ্লবের কোন চিন্তাই উঠেনি, তখন তিনি বাঙ্গলা নাটকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার করেছেন উল্লেখ। একদিকে জাতীয় ঐক্য গঠন ও অন্যদিকে অগ্নিমন্ত্রের উপাসনা—দুয়ের প্রচার তিনি চালিয়েছেন নাটক রচনার মাধ্যমে। লাক্ষ্মণ্য সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র বিরাট সেন, নাট্যকারের এই মনোবাসনার বাহক। উনিশ শতকের জাতীযতাবাদের পূর্ণ আলোকে এই চরিত্রটি গড়া হয়েছে। বিরাটের পার্শ্বচর হরিপ্রসাদ ও আনন্দময়—প্রত্যেকেই আত্মনির্ভরতার মন্ত্রে শক্তিমান। নাট্যকারের বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি উক্তির সাহায্য নেব আমরা:

"বিরাট। আমরা কি আপনাদের দেশ রক্ষা করতে পারব না? বাঙ্গালা আক্রমণ করে করুক। আমরা যুদ্ধ করব। বিপক্ষগণকে পরাস্ত করব অথবা যুদ্ধক্ষেত্র মৃত্যুশয্যা হবে। যে বঙ্গভূমি চিরদিন স্বাধীন, তাঁকে প্রাণ থাকতে পরাধীন হতে দেব না।

... .

হরি। অগ্রে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা তারপর আত্মীয়-স্বজনকে সুখী করা।" (১৩গ)

আবার, দৈব-নির্ভরতার বিরুদ্ধে বিরাট মন্তব্য করেছে—

"বিরাট।......একবার দেখব বঙ্গে জীবন আছে কিনা, পুরুষত্ব আছে কিনা? আমি ঘরে ঘরে গিয়ে হাতে ধরে পায়ে ধরে সকলকে যুদ্ধে আহ্বান করব, একবার দেখব বঙ্গভূমি হতে এমন অনল উঠে কিনা যাতে ম্লেচ্ছ রাজত্ব শীঘ্র শেষ হয়।...আমি সাগর হতে হিমাচল পর্য্যন্ত পর্যটন করব। মাঠে, ঘাটে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে, অনাহারে, অনিদ্রায় কত কষ্ট সহ্য করতে হবে।... বিধাতা যদি প্রসন্ন হন আর সৈন্য সংগ্রহ করতে পারি, আমরা তিনজনেই (বিরাট-হরিপ্রসাদ-আনন্দময়) সৈন্যাধ্যক্ষ হব।··গৌরব সৌভাগ্য বঙ্গমাতাকে ত্যাগ করেছে, পুনর্ব্বার এসে জননীর চরণ সেবা করুক।" (৫।২গ)

পরিশেষে নাট্যকার বিরাট সেনের অনুশোচনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে জাতীয় দুর্বলতাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে আঘাত করেছেন। অবশ্য আঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছেন, আর আগামী দিনের জন্য দিয়েছেন প্রস্তুতির নির্দেশ।

"বিরাট। (স্বগতঃ) আক্ষেপ রাখি কোথায়? সমস্ত বাঙ্গালায় দশটি লোক পেলেম না যারা আমার কথায় অন্ততঃ একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। এরা যেন কোনকালে স্বাধীন ছিল না।—স্বাধীনতা গেছে যেন পায়ের নখ মাথার চুল ফেলে দেওয়া হয়েছে। কোটী বাঙ্গালীর মধ্যে দশজন স্বদেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত নয়। প্রাণে এত মমতা? দুদিনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কি এত বড় হলো, আর স্বাধীনতা কিছুই নয়! বাঙ্গালীরা কি জীবিত আছে? না, তাদের গতিবিধি আছে, আহার বিহার আছে, জীবন নাই। আক্ষেপে শরীর পুড়ে যায়। আমায় উপহাস করে উড়িয়ে দিলে! গম্ভীর স্বরে বললে, 'মিছে মারামারি করে কেন ধনে প্রাণে মারা যাব?' আমাকে নিরস্ত হতে পরামর্শ দিলে। আক্ষেপে বুক ফেটে যায়! কাপুরুষের পরামর্শে মহারাজ রাজ্য ছেড়ে দিয়ে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। কাপুরুষ বাঙ্গালীরা ম্লেচ্ছের দাসত্ব স্বীকার করলে—একবার তাদের মনে হল না যে নিষ্ঠুর ম্লেচ্ছরা তাদের সন্তান-সন্ততিগণকে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে চরণতলে দলন করবে। ধিক্ বঙ্গবাসিগণ! তোরা মাতৃভূমির দুঃখে উদাসীন হলি? মাতৃভূমিকে একেবারে ভুলে গেলি? মায়ের চক্ষের

জলে তোদের হৃদয় বিদীর্ণ হয় না? তোরা মায়ের কুসন্তান, আর্য্যজাতি-কলঙ্ক! কেন অভাগিনী বঙ্গমাতা তোদের জন্ম দিয়েছেন, কেন তোদের ক্রোড়ে ধারণ করে রেখেছেন, কেন তোদের শরীর পুষ্টির জন্য শস্য উৎপাদন করছেন? যে দেশে জল নাই. বায়ু নাই, শস্য-ফল নাই, তাহাই তোদের বাসযোগ্য। বঙ্গমাতা! তুমি অতুল সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়েছ কি এই কাপুরুষদিগের জন্য? তোমার শত শত নির্ম্মল-সলিল নদ-নদী প্রবাহিত হচ্ছে কি এই কাপুরুষদিগের জন্য? তোমার সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রসকল বিবিধ-শস্য-সুশোভিত হয়েছে কি এই কাপুরুষদিগের জন্য? তোমার কোটী সন্তান, তবুও তুমি নিঃসহায়। তুমি সুখের আবাসভূমি, তবু তোমার দুঃখের সীমা নাই। আক্ষেপের কথা কাকে বলি? বঙ্গভূমি, আমি তোমার অকৃতী সন্তান, কিছুই করতে পারলেম না, তোমার বক্ষের উপর দুরাচারেরা দম্ভের সহিত বিচরণ করছে, কিছুই করতে পারলেম না।······কতকগুলীন কাপুরুষ সন্তান নিয়ে পরাধীন হলে, চিরসুখী, চিরস্বাধীন থেকে শেষে দীনদুঃখিনী হয়ে করযোড়ে পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হল, কিছুই করতে পারলেম না। তোমার অকৃতী সন্তান বিরাট সেন তোমার উদ্ধারের জন্য দ্বারে দ্বারে বেড়ালে, তবুও কিছু করতে পারলে না। তাই আজ এখানে একাকী হাহাকার করছে। আর জীবনে কি প্রয়োজন? স্বদেশ উদ্ধার হল না, আর জীবনে কি প্রয়োজন?" (৫।৫গ)

এইভাবে নাট্যকারের দেশপ্রেমের যত্ননিরুদ্ধ অশ্রুজল অবলীলাক্রমে কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের মধ্যে সমবেত দর্শকদের মনকে করেছে দেশানুরাগে সিক্ত।

হরলালের অপর নাটক 'হেমলতা' (১৮৭৩)। রাজস্থানের বিশ্ববিশ্রুত দেশ-গৌরবের অমর কাহিনী এর পটভূমি। চিতোরের রাণা বিক্রমসিংহের কন্যা হেমলতার সঙ্গে চিতোরের সৈনিকপুরুষ সত্যসখার প্রণয়-কাহিনী নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু হলেও, সত্যসখার উক্তিতে দেশাত্মবোধের ছাপ অনেক জায়গায় পরিষ্কারভাবে ফুটেছে। এই নাটকে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রখর। আর্য্য বংশের হৃত-গৌরবের পুনরাবিষ্কার, হিন্দু-ধর্মরক্ষা, হিন্দুজাতির পৌরুষ-উদ্ধার ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা 'হেমলতা' নাটকে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। নাট্যকার সত্যসখা চরিত্রের মধ্যে আপন চিন্তাকে, দেশবাসীর জীবনচত্বরের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাব হরলাল রায়কে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন, ধর্মের শাশ্বত সত্যকে রক্ষা ক'রে জাতিকে আত্মপ্রবুদ্ধ করতে। জাতি-ধর্মের মধ্যে পৌরুষ ও মনুষ্যত্বকে অন্বিত করতে পারলে জাতীয়তাবোধ গৌরবান্বিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুসংস্কৃতি ও সনাতন আদর্শকে ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তি করেছিলেন। কারণ হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতিই ভারতের সত্যকার স্বরূপ। ভারতীয়দের ঐক্য এবং শক্তিসাধনাতে জাতি-ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে, আর এর জন্য প্রয়োজন—স্বাধীনতা। হরলাল রায় 'হেমলতা' নাটকে সত্যসখার উক্তিতে এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

"সত্যসখা। চিতোরবাসী ক্ষত্রিয়গণ পশু অপেক্ষা হীন নয়। মনুষ্যের মধ্যে আর্য্যবংশীয়েরা মহত্তম এবং আর্য্যবংশীয়দের মধ্যে রাজপুতগণ মহত্তম। তারা এত অপমান কি কখন সহ্য করতে পারে? তোমরাই বলেছ পশুতেও পারে না। আরও দেখ, দুরাচার পাপ-জীবন ম্লেচ্ছেরা আমাদের দেশের বক্ষের উপর স্বগর্ব্বে পদার্পণ করেছে। ইহার শ্রী, অর্থ, সুখ কণামাত্র থাকতে ইহাকে পরিত্যাগ করবে না। মনুষ্য জাতির শিরোভূষণ, মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক অধিকার যে স্বাধীনতা, তাহা আমাদিগের হাত হতে কেড়ে নেবে।......আর্য্যবংশীয়রা কে কবে পরাধীন হয়েছে, কে কবে কাপুরুষের ন্যায় পরাধীন হয়েছে? যে আর্য্যসুতগণ অনায়াসে অন্যের অধীনতা স্বীকার করতে পারে, তারা ছাগ-মেষের মধ্যে গণ্য, তারা ভারতের কুসন্তান, তারা স্বজাতির কলঙ্ক, পৃথিবীর ভারমাত্র, যত শীঘ্র নিপাত হয় ততই মঙ্গল। আর্য্যসুতগণ এরূপ করবার পূর্ব্বে যেন ভারত-ভূমি এককালীন রসাতল যান। চিতোরবাসী ক্ষত্রিয়তিলক আর্য্য-সন্তানেরা এত হীন জঘন্য হয় নাই। আরও দেখ, মনুষ্যের ও দেবতাদিগের শত্রু ম্লেচ্ছগণ তোমাদের ধর্ম নষ্ট করবে। যে ধর্মের জন্য ধন মান আত্মীয় স্বজন সুখ স্বচ্ছন্দতা জীবন পর্য্যন্ত দেওয়া যায় তারা তোমাদের সেই ধর্ম্ম নষ্ট করবে।......যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয়, আমরা প্রত্যেকে ধর্মের জন্য প্রাণ দেব। স্বাধীনতার কাছে জীবন কি? তোমরা স্ত্রী-পুত্র পরিবারগণকে স্নেহ কর, যদি তোমাদের স্বদেশের প্রতি অনুরাগ থাকে, যদি স্বাধীনতাকে তৃণজ্ঞান না কর, যদি হিন্দুধর্ম্মে তিলার্দ্ধ শ্রদ্ধা থাকে, সকলে চল ম্লেচ্ছদিগকে দূরীভূত করি। ...চল চল চল। তোমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার তোমাদিগকে

যুদ্ধ করতে বলছে। পুণ্যভূমি, আর্য্যভূমি, বীরভূমি, দেবভূমি ভারতবর্ষ তোমাদিগকে যুদ্ধ করতে বলছেন। বলছেন 'ম্লেচ্ছের অপমান আর সয় না, ম্লেচ্ছের পদাঘাত আর সয় না, তোমরা দেখছ কি? ম্লেচ্ছেরা আমার বক্ষের উপর বসে আমার বক্ষের রক্ত পান করতে উদ্যত, আমাকে দুরাচারদিগের হস্তে অর্পণ করো না। তা করলে তোমরা সুখী হবে না। তোমরা কি ম্লেচ্ছদিগের তরবারিকে ভয় কর? ম্লেচ্ছদিগকে ভয় কর? ম্লেচ্ছদিগের সংখ্যাকে ভয় কর? যদি তোমরা আমার কুসন্তান না হও, আমাকে ম্লেচ্ছ হস্ত হতে উদ্ধার কর, দুরাচারদিগকে দূর কর, দূর কর, দূর কর' সৈনিকগণ, দেবগণ তোমাদিগকে সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করতে বলছেন। স্বাধীনতা তোমাদের বল, স্বদেশানুরাগ তোমাদের বল, হিন্দুধর্ম্ম আমাদের বল, দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের বল। নিশ্চয় আমাদেরই জয় হবে। ভয় কি? ভয় কি? চল যুদ্ধে, জয় কিম্বা পতন।......পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের জয়! সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়! হরহর মহাদেব!" (৪।৪গ)

জাতীয়তাবাদী এইসব নাটকের অভিনয় সাফল্য ইংরেজ সরকারকে বিশেষ চিন্তিত করে তুলল। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ঐতিহাসিক, ইংরেজ সরকারের সমস্ত মনোভাবটিকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। প্রসঙ্গটি উদ্ধৃতি হিসাবে নেওয়া যেতে পারে।

"Now, these dramas produced a tremendous effect on the minds of the people, and naturally attention of the Government was drawn towards them. . .The Hon'ble Mr. Hobbhouse, the law member of the Viceroy's Legislative Council, wanted special powers of the Executive quoting history that in times of excitement there was no surer method of directing public feeling against individuals or classes or the Government itself, than by exhibiting them on the stage in an odious light and the best remedy was therefore to suppress such dramas.

No doubt, Mr. Hobbhouse, while presenting the Bill in the Supreme Legislative Council, presided over by His Excellency the Viceroy, on the 14th March 1876, did no

mention about these dramas in particular, but put clearly before the house, when Sir Richard Temple, the Lieutenant Governor of Bengal, was also present in the Council, the following:

"Now it had been found in all times and in all countries that no greater stimulus could be supplied to excite the passions of mankind than that supplied by means of the drama and that no feat was too difficult for a dramatist, who could produce any effect he pleased on the minds of the spectators:

Sequius irritant animos demissa
per aures
Suam que sunt oculis subjecta
fidelibus."[১১]

অবশ্য এইসময়ে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে প্রকাশ্য ইংরেজবিদ্বেষ প্রচার ফিরিঙ্গী সরকারের কাছে বিশেষ আতঙ্কের কারণ হয়েছিল। তাঁদের অশ্লীলতার অভিযোগ ছিল একটা অজুহাত। আসল উদ্দেশ্য ছিল— দেশাত্মবোধের জাগরণ ও অগ্রগতি রোধ করা। উপেন্দ্রনাথ দাস নাটকে জাতীয়তাবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র যুগের সূচনা করেছিলেন। বিষয় বা বিষয়ীর গৌরবে নয়, সমকালীন শাসক শ্রেণীর যথেচ্ছাচারের স্বচ্ছ চিত্র-চিত্রণের সাহসিকতাতেই এর যা কিছু মূল্যবোধ স্বীকৃত হয়েছে।

উপেন্দ্রনাথ দাস

৪

উপেন্দ্রনাথ দাস সুগভীর মনন শক্তির অধিকারী না হয়েও কেবলমাত্র অমিত প্রত্যয় ও সীমাহীন সাহসিকতার জোরেই বাঙ্গলার নাট্যজগতে তুফান তুলেছিলেন। ইংরেজ বিদ্বেষ তাঁর দেশপ্রেমের সার কথা। সমকালের ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার, বিচারের নামে প্রহসন ও বিভিন্ন

১১ Englishman: 15 March 1876.

ছলা-কলায় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে জালবিস্তার এবং সর্বোপরি স্বেচ্ছাচারের চণ্ড-শোষণনীতি এদেশবাসীকে কিভাবে অসহায়তার চোরা-বালিতে নিক্ষেপ করেছিল, সমস্ত কিছুকে তিনি দুঃসাহসভরে নাটকে প্রকাশ করেন। শাসিত শ্রেণীর প্রকৃত অবস্থাকে নগ্নভাবে তুলে ধরা তিনি জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। অতিরঞ্জন দোষে তাঁর নাটক দুষ্ট হলেও,* ঘটনার চিত্র-বিন্যাসে ও পরাধীনতার মর্মবেদনা সৃষ্টিতে নাট্যকার আন্তরিকতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করেছেন। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন দীনবন্ধু মিত্রের ভাবশিষ্য ও অনুগামী। এক সর্বব্যাপী সহানুভূতি ও সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা তাঁর নাট্যরচনার পশ্চাতে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। তবে তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ধত স্পর্দ্ধা ও দৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ স্বাভাবিকভাবে মিশে আছে। উপেন্দ্রনাথ দাস জাতীয়-তার ক্ষেত্রে ছিলেন, Militant Nationalist. তাই ইংরেজকে নিয়ে প্রকাশ্যভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, প্রয়োজনবোধে ফিরিঙ্গী পীড়ন, আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার এবং শ্বেতাঙ্গদের সম্মুখ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর নাট্যদ্বয় শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'তে শক্তিসাধনার উপাসনা চলেছে। উদ্দেশ্য—পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের ভূমিকায় তিনি লেখেন,

"ইচ্ছাকরে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে ;
সহি কিসে মাতৃ দুঃখ ?
... ...
চাহি না স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
মুহূর্তেক যদি পাই, স্বাধীন জীবন।"

পরাধীনতার প্রতি মর্মবেদনা 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকেও প্রচারিত হয়েছে সমভাবে। তবে উপেন্দ্রনাথ দাস হতাশার কৃষ্ণধূম্রচ্ছ্বাস বিপুল বিস্তারে সম্প্রসারিত না করে জাতিকে তীব্র ভর্ৎসনা ও তিরস্কারে সচেতন করতে চেয়েছেন।

* "শরৎ-সরোজিনী—সময়চিত্রের একদেশমাত্র। তাহাও তুলিকাবিন্যাস দোষে অসম—কোনস্থলে বা হীনপ্রভ, কোনস্থানে বা অতিরঞ্জিত।" —বিজ্ঞাপন॥ শরৎ-সরোজিনী।

"শরৎ। মত্ত হবার কি এই সময়? আমাদের ঘৃণা নাই? গরু গাধার মত দিবারাত্র শাসিত হচ্ছি, তা কি মনে থাকে না? পদে পদে ইংরাজদের বিজাতীয় অহঙ্কার দেখেও কি রক্ত ধমনীতে বিদ্যুতের মত প্রবাহিত হয় না? শরীর উত্তপ্ত হয় না? মনে ধিক্কার জন্মায় না? ·····আমরা যে হতভাগা কাপুরুষের জাত, দু'শ তিনশ বছরের মধ্যে যে হবে এমন আশাও মনে স্থান পায় না। কিন্তু যতদিন না ভারতে স্বাধীনতাসূর্য্য পুনরুদয় হয়, যতদিন না অত্যাচারের লোহিত মুণ্ড আমরা পদতলে লুণ্ঠিত, দলিত করতে পারি, ততদিন··· ··আমরা কৃতঘ্ন—পামর—নরাধম—দেশের কুসন্তান।" (১১গ)

ব্রিটিশ রাজত্বের উদ্ধত স্পর্ধা, ইংরেজদের হাস্যে-লাস্যে ভরা জীবনযাত্রা নাট্যকারকে মনে প্রাণে ব্যথিত করেছে। স্বাধীন জাতির গৌরব-গরিমার পাশে পরাধীন জাতির দীর্ঘমেয়াদী অবসাদ ও মর্মবেদনা, উপেন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে প্রচার করেছেন নাট্যচরিত্র শরৎ-এর উক্তিতে। ইডেন উদ্যানের বিলাস-বৈভব দেখে নাট্যকার নিজেই যেন বিক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছেন।

"শরৎ। (পরিক্রমণ) বাঃ কি মনোহর! (দীর্ঘশ্বাসের সহিত) কিন্তু এসব মহাপুরুষদের অনুগ্রহে ভোগ করছি মাত্র। ইচ্ছা হলেই দেবতারা নিয়ম করতে পারেন, বেলা ৫টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত ধবলমূর্ত্তি ভিন্ন আর কেউ এখানে বেড়াতে পারবে না।—চতুর্দ্দিকেই বিজাতীয় প্রভুত্বের চিহ্ন দেদীপ্যমান। (দক্ষিণ মুখ হইয়া) সম্মুখে ফোর্ট উইলিয়মের ভীষণ মূর্দ্ধা—বঙ্গের জীবন্ত প্রতিবাদ বিরাজমান। যেন কাপুরুষ বঙ্গসন্তানদের তারস্বরে বলছে, 'সাবধান, ভ্রমে, স্বপ্নেও স্বাধীন হতে অভিলাষ কর না,—কি যদিও কর, প্রকাশ ক'র না। আমার নির্ম্মাতারা বিশ্বদর্পহারী—ভুবনবিজয়ী—বজ্রবিদ্যুৎপাণি। যদি প্রহারিত সারমেয়ের ন্যায়, যদি ক্রীতদাসের বেশে আমার নিকট আসিতে চাহ, আইস,—আপত্তি নাই! কিন্তু বিদ্রোহীভাবে—অস্ত্রহস্তে—আমার নিকট আসিতে কদাচ সাহস করিও না। নিমেষমধ্যে তোমাদের সন্তপ্ত রক্ত শীতল হইবে, এই রমণীয় মাঠ তোমাদিগের মৃতদেহে আচ্ছাদিত হইবে।' (দীর্ঘশ্বাসের সহিত) ফোর্ট উইলিয়াম, যদি আমরা নিতান্ত স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ না হয়ে কিয়ৎ পরিমাণেও মনুষ্যনামের অধিকারী হতেম, তাহলে তোমার এই উদ্ধত বাক্য এতদিন সহ্য করতে হ'ত না, তুমি কোন্‌কালে ভূমিশায়ী হ'তে, তোমার একখানি ইষ্টকের উপর আর একখানি থাকত না।

কিন্তু যাঁরা দেশের শোচনীয় অবস্থার বিষয় সপ্তাহান্তেও একবার করে ভেবে থাকেন, তাঁদের সংখ্যা আঙ্গুলে গণনা করা যায় বল্লেও বোধহয় বড় অত্যুক্তি হয় না।" (১।২গ)

আমরা পটভূমি আলোচনাতে লক্ষ্য করেছি যে, ইংরেজরা কখনও এদেশে ভারতীয়দের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য ও ব্যবধান রচনাতে তাঁরা ছিলেন বিশেষ উৎসাহী। উচ্চশিক্ষা জগতে বাঙ্গালী যুবকদের ক্রমশঃ সাফল্য, ইউরোপীয় সমাজের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়েছিল। রাজনীতিতে ভারতবাসী যাতে সাফল্য অর্জন করতে না পারে, সেজন্য ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় উচ্চশিক্ষা খাতে ব্যয়-বরাদ্দ কমিয়ে দেন। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে উপেন্দ্রনাথ বিচারক ম্যাক্রেণ্ডেলের চরিত্র-চিত্রণে ইংরেজ জাতির মনোভাবটিকে দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন।

"ম্যাক্রেণ্ডেল। এমন চমৎকার উদ্যান, এমন সুমধুর বাদ্য, দেশীয় রাজাদিগের অধীনে থাকিলে তোমরা কখনও ভোগ করিতে পাইতে? ……কে ও ব্যক্তি বসিয়া আছে? আমাকে দেখিয়া সেলাম করা দূরে থাকুক, একবার উঠিয়া দাঁড়াইল না পর্য্যন্ত?—এ সকল সাধারণ উদ্যানে অৰ্দ্ধসভ্য বাঙ্গালীদিগের প্রবেশনিষেধের নিমিত্ত একটা বিশেষ রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া অতি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।—আমি বার বার বলিয়া আসিতেছি, উচ্চশিক্ষা বঙ্গ হইতে নির্ব্বাসিত না হইলে, এই সমস্ত অশিষ্টাচারের মূলে কখনই কুঠারাঘাত হইবে না।" (সংলাপ—হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেল ও কারালয়াধ্যক্ষ কৃষ্ণদাস।" (২।৬গ)

ব্রিটিশ-রাজত্বকালে বিচারের নামে তামাশা সৃষ্টি করা হত অত্যন্ত কৌশলে এবং আড়ম্বরের সঙ্গে। ধর্ম্মাধিকরণে ধর্ম বা সততার কোন বালাই ছিল না। ইংরেজ বিচারকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি অথবা যুক্তিকে মেনে চলতে বা গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ছল-বল-কৌশল গ্রহণে তাঁরা পরাঙ্মুখ হতেন না। নারীলোলুপতা ও স্বৈরাচার ইংরেজ বিচারকদের নিত্যকর্মের অঙ্গ ছিল। উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁর নাটকদ্বয়ে শ্বেতাঙ্গদের বিচারপদ্ধতির উপর একশ্রেণীর মানুষের অন্ধভক্তি ও বিশ্বাসকে প্রকৃত চিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে দূর করে দিয়েছেন। ব্রিটিশ রাজত্বের বিচারনীতির সমালোচনা করে 'শরৎ-সরোজিনী'র নায়ক শরৎ তাঁর বন্ধু হরিদাসকে বলেছেন,

"শরৎ। সে দিন কি হয়ে গিয়েছে শোনেন নি? অনন্তপুরে একজন শ্বেতকান্তি ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। তাঁর কাছারির সম্মুখে একটি পুষ্করিণীতে একজন স্ত্রীলোক নিত্য জল নিতে আসত। স্ত্রীলোকটি দেখতে বড় সুন্দরী নয়, কিন্তু যুবতী। প্রতিদিন তাকে দেখে দেখে মহাপুরুষ একদিন হঠাৎ—। (ক্রোধবিকম্পিত স্বরে) তারপর হতভাগা স্ত্রীলোকটার স্বামী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নামে উচ্চতর বিচারালয়ে অভিযোগ করলে। অভিযোগ অগ্রাহ্য হল—প্রমাণাভাব। শুধু তাই হয়ে শেষ হ'ল না। সত্যপরায়ণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী,—নিষ্পাপদেহ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে মিথ্যা অভিযোগ করেছে বলে, সেই স্ত্রীলোকটার আর তার স্বামীর তিন মাস করে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হ'ল।" (১।২গ)

আবার, নায়ক শরৎকুমার দত্ত ইংরেজ সার্জন প্রহারের মকদ্দমা সম্পর্কে বন্ধু বিপিনবাবুকে যা বলেছেন, তাতে একই সত্য ফুটে উঠেছে।

"শরৎ। হবে আর কি? ইংরেজ বাদী আর বাঙ্গালী প্রতিবাদী হলে যা সচরাচর হয়ে থাকে। আমার ২০০ টাকা অর্থদণ্ড হয়েছে। তবু আমি প্রথম মারি নি। আমি পুনর্বিচারেরও প্রার্থনা করেছি। দেখা যাক কি হয়।" (৩।৩গ)

এই প্রকাশ্য ইংরেজ বিরোধিতাতে বাঙ্গালীর শাসকজাতির প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়া শাসক-শাসিতের সম্পর্ক সে কালের মানুষের মনে কতখানি গভীর হয়েছিল, তা নীচের উদ্ধৃতি থেকে উপলব্ধি করতে পারি।

"শরৎ। আপনাকে (বিনয়) ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ভদ্রই হোন আর অভদ্রই হোন, বিচারের আগে আপনার গায়ে হাত দেবার কারও ক্ষমতা নেই।

(দুই জন পাহারাওয়ালা, একজন সার্জ্জন ও অনেকগুলি লোকের প্রবেশ)

সকলে। ধর বেটাকে, ধর বেটাকে।......

শরৎ। মারো মৎ। মারনেকা তুমহারা কুছ ইকত্যাহ্যার নেহি হৈ। উসকো থানামে লে যানে মাংগো, লে চলো।

সার্জ্জন। চুপ রহ, তু সুয়র, কুত্তাকা বচ্চা।

(শরৎকুমারের মুখে সবলে দণ্ডাঘাত ও পুনরায় বিনয়কে ধৃত করিবার চেষ্টা।)

শরৎ। কি আমাকে? (ক্রোধান্ধ হইয়া সার্জ্জনের হস্ত হইতে তাহার দণ্ড কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাহাকে গুরুতর প্রহার……পদাঘাত দ্বারা সার্জ্জনকে দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক) সাদা চামড়া দেখে লোকে আর ভয় করে না, জানিসনে নরাধম পশু।" (৩।১গ)

সে সময়কার ইংরেজদের দুর্নীতির আর এক চিত্র পাই 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে। বিশ্বাসের নামে জুয়াচুরি এবং বাঙ্গালী কুলবধূদের উপর অশ্লীল ইঙ্গিত ও কটাক্ষপাত ইংরেজ বিচারকদের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেদিনের বাঙ্গালী ছিল সম্পূর্ণ মোহমুক্ত, তাই নীরবে ইংরেজদের অত্যাচার সহ্য করার পরিবর্তে তারা সময়-সুযোগে তাদের ঠেঙ্গিয়ে অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করত। নিম্নোক্ত ছবিটিতে এই দুয়ের পরিচয় পাওয়া যাবে।

"ম্যাক্রেণ্ডেল। (সহাস্যে) নির্ব্বোধ, আমি বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথ-পূর্ব্বক যাহা বলিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের দুইশত বাঙ্গালীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এতকাল ইংরেজের রাজ্যে বাস করিয়া এই সামান্য জ্ঞান উপলব্ধি কর নাই? তোমার অজ্ঞতা দেখিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম।

সুরেন্দ্র। বিনাভিযোগে দিন, আমি ঐ টাকার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিতে স্বীকার আছি।

ম্যাক্রেণ্ডেল। তোমার এক সুন্দরী ভগ্নী আছে না? তাহাকে একদিন আমার শয্যায় পাঠাইয়া দিও। আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে স্বীকার আছি।

সুরেন্দ্র। (ক্রোধান্ধ হইয়া) কি? (ম্যাক্রেণ্ডেলের বক্ষে সবলে পদাঘাত ও তাহার পতন।)" (১।৪গ)

অন্যত্র,

"সুরেন্দ্র। আজ যে আমাকে লাথি মেরেছিস, তার পুরস্কার এই, এই (দুই কষাঘাত ম্যাক্রেণ্ডেলকে)—আমাকে যে চাবুক মেরেছিস, তার পুরস্কার এই, এই, এই (তিন কষাঘাত)—আর সুদের স্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ এই, এই, এই, এই (চারি কষাঘাত)।" (২।৬গ)

বিচার ব্যবস্থার মান-মর্যাদার যে অধোগতি ইংরেজ শাসনকালে হয়েছিল, নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস নাট্যচরিত্র সুরেন্দ্রের উক্তিতে তা প্রকাশ করেছেন,

"সুরেন্দ্র। বিচারালয় যে থেকেও নেই?—আত্মসমর্থন করতে আমাদের সকলেরই স্বাভাবিক অধিকার আছে, এবং করাও একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আত্মরক্ষা প্রকৃতির প্রথম অনুশাসন। কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের সহিত সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্যই সেই স্বত্ব ও অধিকার কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহারা সাধারণের প্রতিনিধিস্থলে অভিষিক্ত হয়ে, সত্যবিচার করবেন, এই শপথপূর্ব্বক সেই গুরুতর কর্ম্মের ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারাই যখন অত্যাচারী, উৎপীড়ক ও স্বার্থপরায়ণ হয়ে উঠেন, যখন ধর্ম্মাসনসকল পক্ষপাত দোষদুষ্ট হয়, যখন শুক্লকৃষ্ণবর্ণের তারতম্য অনুসারে বিচারফলেরও তারতম্য হতে আরম্ভ করে, যখন অজাতশ্মশ্রু, ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষী, লম্পট, বিদেশীয় বালকদের উপর সহস্র সহস্র লোকেদের ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা বা নষ্ট করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিক্ষিপ্ত হয়,—তখন আমাদের সেই আদিম স্বত্ব আমাদের হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন উপেক্ষা করে থাকা মূর্খতা, ভীরুতা, অমানুষতার কর্ম্ম—তখন তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলে ঘোর প্রত্যবায় আছে।" (২।৪গ)

এছাড়া, বিচারাধীন বন্দীদের অবস্থা ইংরেজ-বন্দীশালাতে ছিল অত্যন্ত দুঃসহ। বিদেশী শাসকদের কারাগারে বন্দীদের মর্মন্তুদ জীবন-যন্ত্রণার চিত্র উপেন্দ্রনাথ দাস প্রাণবন্ত তুলিতে এঁকেছেন।

"১ম বন্দী। ম্যাজিষ্ট্র্ বেটার বাড়ি আর সারা হয় না। রোজ নতুন ফরমাস্। কেবল ভাঙ্গ আর গড়। মাইনে ত' আর দিতে হয় না, সরকারী কাজের নাম করে আমাদের খুব খাটিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু নিত্যি ত' আর এ মারপীট, ভাই, সহ্য হয় না।

২য় বন্দী। আস্তে আস্তে বল্। কোন্ বেটা শুনতে পেয়ে, গিয়ে লাগিয়ে দেবে, আর পিঠের চামড়া থাকবে না।

১ম বন্দী। আর লাগাতে যাবে কে? সকলেরই ত' এক দশা।

৩য় বন্দী। আরে ভাই, যদি পেটপুরে খেতে পাই, তাহলেও না হয়, চক্ষু কান্ বুজে মার খাই। তা তাই বা পাই কই? পোন্ কুন্‌কে চেলের ভাত, আর দুহাতা মসুর ডাল, এইতে কি চব্বিশ ঘণ্টা চলে? সরকার বাহাদুরের যা দেবার হুকুম আছে, শুনেছি, তা দেয় না কেন?

২য় বন্দী। সে গুড়ে বালি। কেষ্টা শালা তার তিনভাগ চুরি করে।

৪র্থ বন্দী। (সক্রোধে) আরে রেখে দে তোদের ওসব কথা। ম্যাজিষ্টের্ বেটার হাত থেকে মাগ্-বনের ধর্ম্মরক্ষার উপায় কি বল্ দেখি?

১ম বন্দী। ধর্ম্মই ধর্ম্ম রক্ষা করবেন—আমরা আর কি করব বল্। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ)" (২।৩গ)

তদানীন্তনকালে ষ্টীফেন নামে কোন এক সাহেবের নতুন উদ্ভাবিত নীতি* ফিরিঙ্গী বিচারকদের অত্যাচার চালাবার পক্ষে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। নাট্যচরিত্র ম্যাক্রেণ্ডেলের উক্তিতে এর পরিচয় ধরা পড়েছে।

"ম্যাক্রেণ্ডেল। ষ্টীফেন সাহেবের নূতন বিধি আমাদিগের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ বিচারকদের হস্তে লৌহমুদ্গর স্বরূপ হইয়াছে, হোঃ হোঃ, হোঃ।" (২।৩গ)

'নীলদর্পণ নাটক আলোচনাতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে কৃষকদের উপর অত্যাচার করতে নীলকরদের সহায়তা করেছিল, এদেশীয় আমীন ও আমলারা। পরবর্তীকালে এই নীতি অব্যাহত ছিল। ব্রিটিশ পুঙ্গবদের সকল অত্যাচারের সহায়ক ছিল আমাদেরই দেশের কয়েকজন আত্মস্বার্থ-সর্বস্ব অনুগ্রহভাজন পদলেহী পার্শ্বচর। সাহেবদের অত্যাচার ও কামাগ্নিতে তারা ইন্ধন প্রদান করত। নারী-সরবরাহ ব্যাপারে এরা ছিল সিদ্ধ হস্ত। উপেন্দ্রনাথ দাস 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে বিচারদৃশ্য অঙ্কনের মধ্যে এই বিষয়টি বিশেষভাবে উজ্জ্বল করে চিত্রিত করেছেন। 'নীলদর্পণ' নাটকে দীনবন্ধু বিচার বর্ণনা প্রসঙ্গে যে চিত্র এঁকেছেন, উপেন্দ্রনাথের নাটকে তারই ছায়াপাত ঘটেছে। একদিকে ইংরেজদের বিচার-ব্যবস্থার দুর্নীতি, বিচারকদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার পরাকাষ্ঠা, চাটুকার ও স্বার্থপর দেশীয় আমলাদের পদলেহন এবং অন্যদিকে বিচারপ্রার্থীদের অসহায় রূপটি অত্যন্ত সার্থক ও সজীবভাবে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। নাট্যকার চিত্তের মধ্যে দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যের একান্ত তাগিদ যে অনুভব করেছিলেন, তার নিদর্শন এই চিত্রটিতে আছে। আলোচনার প্রয়োজনেই দৃশ্যটি উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা হ'ল।

"হুগলী—ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারালয়।

বিচারাসনে ম্যাক্রেণ্ডেল উপবিষ্ট।

বিরাজমোহিনী (সুরেন্দ্রনাথের ভগিনী), হরিপ্রিয়, রাজচন্দ্র, কৃষ্ণদাস (হুগলীর কারালয়াধ্যক্ষ), হারু গোয়ালা, প্রহরীগণ এবং অন্যান্য অনেক লোক উপস্থিত।

---

* প্রবঞ্চনার অপরাধে যে কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করাই উক্ত আইনের বৈশিষ্ট্য ছিল।

কৃষ্ণদাস। (হারু গোয়ালাকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক) এই গোয়ালা খাঁটি দুধ দেব বলে, খাঁটি দুধের দাম নিয়ে, আমাকে জলো দুধ বেচেছে। আর সেই দুধ খেয়ে আমার বাড়ীর ছেলে মেয়ে সকলের ব্যয়রাম হয়েছে। আমি এ ব্যক্তির নামে প্রবঞ্চনার অভিযোগ করছি।

ম্যাক্রেগেল। আপনি স্বয়ং দুগ্ধ ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস। আমার এই চাকর গিছল।

ম্যাক্রেগেল। (কৃষ্ণদাসের ভৃত্যের প্রতি) তুমি গিয়াছিলে?

ভৃত্য। (সেলামপূর্ব্বক) হাঁ ধর্ম্মাবতার।

ম্যাক্রেগেল। (হারু গোয়ালার প্রতি) ইহার বিরুদ্ধে তুমি কি বলিতে পার?

হারু। (কৃতাঞ্জলিপুটে) দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি ওঁকে কখন দুধই বেচি নি, তার আর জলো দুধ বেচব কি? এই খাতায় আমার সব খদ্দেরদের নাম আছে, (খাতা দেখিয়া) আপনি এক ার অনুগ্রহ করে দৃষ্টি করে দেখুন।

কৃষ্ণদাস। আমাকে একদিন হুজুর বেচেছিল।

হারু। (অর্দ্ধক্রন্দনের সুরে) ধর্ম্মাবতার, আপনি গরীবের বাপ মা, আপনি মারলে মারতে পারেন, রাখলে রাখতে পারেন। আমি ওঁর চাকরকে কোনদিন দুধ বেচি নি। ওকেই একটু কড়া করে জিজ্ঞেস করলে এখনি সব ধরা পড়ে যাবে এখন। দোহাই, ধর্ম্মাবতার।

ম্যাক্রেগেল। কৃষ্ণদাস বাবু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। উনি ভৃত্যের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আমি কোন প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি না! আর উহার তাহাতে কোন লাভ দৃষ্ট হয় না।—প্রবঞ্চনা অতি গুরুতর অপরাধ। যাও,—দশ বেত্রাঘাত ও দুইমাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস।

... ...

কৃষ্ণদাস। আমার আর এক অভিযোগ আছে। ছ'মাস হ'ল, আমার হাজার টাকা করে দু-খানা নোট খোয়া যায়। অনেক অনুসন্ধান করেও এতদিন পাওয়া যায় নি। আজ কোন নিভৃত সূত্রে সংবাদ পেয়ে, হঠাৎ গিয়ে পড়ে বাঁশবেড়ের সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে খানাতল্লাসী করা হয়। বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে,—এই স্ত্রীলোকটির বিছানার চাদরের নীচে সেই হারান নোট পাওয়া গেল। এই সেই নোট দু-খানা। (ম্যাক্রেগেলের হস্তে প্রদান)

ম্যাক্রেগুেল। উনি কে?

কৃষ্ণদাস। শুনছি, সুরেন্দ্রবাবুর ভগ্নী।

ম্যাক্রেগুেল। সুরেন্দ্রবাবুর ভগ্নী! উনি চুরি করিয়াছেন, এমন কখনই হইতে পারে না। উনি চুরি করিবেন কি প্রকারে? প্রয়োজনই বা কি?

কৃষ্ণদাস। তা আমি জানিনে, কিন্তু ওঁর বিছানার চাদরের নীচে নোট এল কোত্থেকে?

ম্যাক্রেগুেল। হাঁ, তাহা আপনি বলিতে পারেন। (বিরাজমোহিনীর প্রতি) ও নোট আপনার শয্যার মধ্যে কে রাখিয়াছিল, তাহা আপনি জানেন?

বিরাজ। (শোক, লজ্জা ও ঘৃণায় মৃতপ্রায়ভাবে, স্বগতঃ) পৃথিবী, দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি,—আর সইতে পারিনে।

হরিপ্রিয়। উনি লজ্জায় মরে যাচ্ছেন, তা আর প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি? এ কি সম্ভব যে উনি চুরি করেছেন!

ম্যাক্রেগুেল। তুমি কে?

হরিপ্রিয়। ওঁদের প্রতিবেশী ও আত্মীয়।

রাজচন্দ্র। ধর্ম্মাবতার, আমাকে এখানে সকলেই চেনে, আমি একটা নিবেদন করতে চাই। ইনি একজন বিশিষ্ট লোকের বাড়ীর মেয়ে, এঁ হতে এমন কাজ কখনই হয় নি—

ম্যাক্রেগুেল। আমারও তাই বিশ্বাস।

রাজচন্দ্র। ধর্ম্মাবতার, আপনার মত সদ্বিচারক অতি অল্প আছে।—তা, আজ এ মকর্দ্দমার ত নিষ্পত্তি হচ্ছে না, আজ এঁয়াকে জামিন নিয়ে খালাস্ দিন। যত টাকার জামিন চান, আমি দেব।

ম্যাক্রেগুেল। আমি সাতিশয় দুঃখিত হইতেছি, আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। অপহৃত দ্রব্যের সহিত ধৃত চৌরকে বিচারের পূর্ব্বে নিষ্কৃতি দেওয়া আমার ক্ষমতার বহির্ভূত—দণ্ডবিধিবিরুদ্ধ। রাজনীতি ধনী ও দরিদ্র উভয়কেই সমান চক্ষুতে দৃষ্টি করে। ন্যায়ের তুলাদণ্ডে এ উভয়ের মধ্যে কোন বিভেদ নাই। অদ্য রাত্রি ইহাকে থানায় থাকিতে হইবে। কল্য বিচারান্তে, যাহা হয় হইবে।"

... ...

কৃষ্ণদাস। (সকম্পে) ধর্ম্মাবতার, কাজটা হয়ে গেল বটে, কিন্তু ভয়ে

আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে! একে ত ওরা বড়মানুষ, তাতে আবার সুরেনবাবু যে রোকা।

ম্যাক্রেণ্ডেল। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) তোমার কোন ভয় নাই। সন্ধ্যার পর সেইখানে প্রেরণ করিও। কেহ যেন না দেখিতে পায়।—কাম ও প্রতিহিংসা উভয়কেই পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। কাপুরুষেরা কি অমূল্য সুন্দরীপ্রেমে বঞ্চিত!" (৩।৩গ)

উপেন্দ্রনাথ দাস কেবল ব্রিটিশ শাসকদের বিভিন্ন কু-কীর্তির নগ্নরূপ প্রকাশ করে আপন দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করেননি; দেশ সংগঠনের জন্য দেশীয় কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প-কলা ও শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতির স্বনির্ভরতা প্রয়োজন, একথাও তিনি পরম আন্তরিকতার সঙ্গে প্রচার করেছেন। 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে, নাট্যকারের এই চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে।

"শরৎ। এখনও (বন্দুক ধরবার) সময় হয় নি।...সকলে সমবেত হয়ে, জাতীয় অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের চেষ্টা করবে—দেশীয় কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি করবে—ভারতান্তরীণ সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপন ব্রতে ব্রতী হবে।" (১।১গ)

আবার,

"শরৎ। শিক্ষার অভাবে আর কুসংস্কারবশে জন্মভূমির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে স্কন্ধহীন হয়ে পড়েছে, এ উৎকট রোগের প্রতিবিধান করতে যে কত বৎসর, কত শতাব্দী লাগবে, তা বলা যায় না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) ভারতের অবনতি এত গভীর ও সর্ব্বগ্রাসী যে এই ঘৃণিত পরাধীনতার স্থায়িত্বই এখন আমাদের ভাবী উন্নতির একমাত্র অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ভীষণ ব্যাধি সমাচ্ছন্ন; এ অবস্থায় ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে যে পরামর্শ দেয়, বা ইচ্ছা প্রকাশ করে, সে শুদ্ধ মূঢ় ও অবিবেচক নয়—দেশের শত্রু।" (১।২গ)

অবশেষে তিনি দেশবাসীকে যত্নভরে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে,

"তোমাদের নিজ দোষে, আছ সবে পরবশ
হীনবল অপযশে ত্রিজগৎ পূরিল।
নরনারী পরস্পরে ভারত-উদ্ধার তরে
উদ্যোগী হও যত্নভরে, হও না তায় শিথিল।" (৬ষ্ঠ অঙ্ক)

কারণ,

"হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল
সোনার ভারত আহা ঘোর বিপদে ডুবিল ॥
শোক সাগরেতে ভাসি, ভারত মা দিবানিশি
স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি, কান্দিতেছে অবিরল,
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রুজল।"

(সুরেন্দ্র-বিনোদিনী)

অবশ্য উপেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার মূলকথা প্রতিরোধ ও প্রতিবাদে বিদেশীদের সম্পূর্ণ নিগৃহীত করে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা। তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন, Militant Nationalist তাঁর ইংরেজ বিদ্বেষ নাটকদ্বয়ে তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উপেন্দ্রনাথ তাঁর অকপট দেশভক্তির জন্য স্বদেশ-প্রেমিক ব্যক্তিদের কাছে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা (১২৮০ বঙ্গাব্দ) লিখেছিল,

"শরৎ-সরোজিনী বিদ্বৎসমাজে সমধিক সম্মানলাভ করিয়াছে। আমরা জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাইতেছি 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ততোধিক সম্মান লাভ করিবে। ·····অধিক কথা কি, এখানির পাঠকালে পাঠকের আত্মাও সজীব হইয়া উঠিবে। আমরা পাঠকালে প্রায় প্রতিপদেই পরম আনন্দ অনুভব করিলাম।······মফঃস্বলস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ইউরোপীয়েরা যে প্রকার অত্যাচার করেন, হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যাক্রেণ্ডেলের চরিত্র দ্বারা তাহা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।"

'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক বাঙ্গালীর কাছে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের সমতুল্য মর্যাদা লাভ করে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'তে (১২৮২ বঙ্গাব্দ, ১১ই ভাদ্র) যে মন্তব্য করা হয়েছিল, তাতে সে সময়কার বাঙ্গালীর মনোলোকের ছায়াপাত ঘটেছে।

"বাবু দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ নাটক লিখিয়া এদেশে প্রথম দেখান যে নাটক দ্বারা দেশের কত মঙ্গল সম্পাদিত হইতে পারে। নীলদর্পণের পর আর যত নাটক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেশের মঙ্গল হয় নাই তাহা আমরা বলি না, কিন্তু 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র গ্রন্থকর্ত্তা নাটক লেখার একটি নূতন আকার দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে একজন গ্রন্থকর্ত্তা নির্জ্জন গৃহে অবস্থিতি করিয়া গ্রন্থ রচনা দ্বারা দেশের কত মঙ্গল সম্পাদন করিতে

পারেন। যিনি 'বেঙ্গল থিয়েটারে' সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর অভিনয় দেখিয়াছেন, তিনি দৃঢ়রূপে জানিতে পারিয়াছেন যে এদেশের ম্যাজিষ্ট্রেটেরা কিরূপ অখণ্ড প্রতাপান্বিত, ষ্টিফেন সাহেবের নূতন দণ্ডবিধি আইন তাহাদের হস্তে কি ভয়ানক যন্ত্র, কারাগারবাসীরা কত কৃপার পাত্র, এবং তাহাদের উপর গভর্ণমেণ্ট কত নিষ্পীড়ণ করেন। যাহারা এইরূপ গ্রন্থ রচনা করেন তাহারা দেশের পরমোপকারী এবং যাহারা দেশ হিতৈষি তাহাদের সকলের এইরূপ গ্রন্থ-কর্ত্তাকে উৎসাহ প্রদান করা উচিত।"

'বান্ধব' পত্রিকাতে (৯ই বৈশাখ, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ) লেখা হয়েছিল,

"বাঙ্গালীর নীলদর্পণ ভিন্ন আর কোন নাটকে এইরূপ রুদ্রবর্ণনা আছে কিনা, আমরা জ্ঞাত নহি। সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর রচয়িতা আমাদিগের সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন।"

দীনবন্ধু মিত্রের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সুগভীর মানবিক সহানুভূতি উপেন্দ্রনাথের নাট্যরচনার চিত্ত-প্রদেশে কার্যকরী হয়েছিল সত্য, কিন্তু তিনি 'নীলদর্পণ'-এর নাট্যকারের মত অত্যাচারের বিশাল চত্বরে জীবনের বৃহত্তর অপচয় লক্ষ্য করেননি বা নাটকে চিত্রিত করেননি। এর ফলে দীনবন্ধুর ন্যায় মানুষের গভীর জীবন-যন্ত্রণা তাঁর নাটকে ফুটেনি। তবু উপেন্দ্রনাথ তাঁর রচনার অভ্যন্তরে এমন একটি সত্যের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভূমিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এবং এরই ফলে জাগ্রত জনমত ও উদ্দীপিত জাতীয়চেতনাকে রোধ করতে বিদেশী শাসক সম্প্রদায় বাঙ্গলা নাটকের অভিনয়ের কণ্ঠরোধ করতে ব্রতী হন ও 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল' (১৮৭৬) এই উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ করেন।

বাঙ্গালীর চিত্তে জাতীয়তাবোধ বিস্তারে 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র প্রভাব ছিল অপরিসীম। নাট্যমঞ্চে এই নাটকদ্বয় বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। 'শরৎ-সরোজিনী'র অভিনয় সাফল্য সম্পর্কে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'তে (২১শে ফাল্গুন, ১২৮১ বঙ্গাব্দ) লেখা হয়,

"গত শনিবার রাত্রিতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে শরৎ-সরোজিনী নাটকের চতুর্থবার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এবারও রঙ্গভূমি লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। দুই টাকার শ্রেণীতেও বসিতে স্থানাভাব প্রযুক্ত অনেককে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। অভিনয় উত্তম হইয়াছিল।"

'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র অভিনয় সাফল্য দেশের জনচিত্তে ফিরিঙ্গী শাসকদের

বিরুদ্ধে কিরকম উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল এবং ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গুণেছিলেন, তার পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করব। স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সাধক বিপিনচন্দ্র পাল উপেন্দ্রনাথের নাটকদ্বয় সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তাতেই আছে উপেন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা।

"নীলদর্পণ যে স্বাদেশিকতার বীজ বপন করিয়াছিল, উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' তাহাকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও কুসুমিত করিয়া তোলে। 'নীলদর্পণে'র কথা লোকে এখনও জানে। যতদিন বাংলা ভাষা থাকিবে, দীনবন্ধুর নাট্যাবলী ততদিন বাঙ্গালী সমাজে আদৃত হইয়া রহিবে। দীনবন্ধুর কবি-প্রতিভা উপেন্দ্রনাথের ছিল না। তাঁহার 'শরৎ-সরোজিনী' বা 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করে নাই। আজিকালিকার লোকে উপেন্দ্রনাথের নাম জানেন না, তাঁহার নাট্যকলারও কোন খবর রাখেন না। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে 'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' আমাদের নূতন স্বদেশ-প্রেমে ও ইংরাজ-বিদ্বেষে অসাধারণ ইন্ধন জোগাইয়াছিল। এই দুইখানি নাটকই স্বদেশ-প্রীতিমূলক। এই দুইখানিতেই ইংরাজের অত্যাচার ও অবিচারের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই দুইখানি নাটকেই বিদেশীর হাতে দেশের লোকের কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় তাহা বিশদ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে। হেমচন্দ্র তাঁর কবিতায়

ধীরে ধীরে যাই, ফিরে ফিরে চাই,
শ্বেতাঙ্গ দেখিয়ে আতঙ্কে পলাই।

বা

ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর
না হলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার।

এ সকল কথাতে যে ভাব জাগাইয়াছিলেন, গোবিন্দচন্দ্র 'কত কাল পরে বল ভারতরে' এবং 'নির্ম্মল সলিলে' গাহিয়া যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ কলাকুশলতা সহকারে সুনিপুণ তুলিকায় 'চন্দ্রশেখরে' ফষ্টারের চিত্র আঁকিয়া স্বদেশের যে মর্ম্মান্তিক অবমাননার কথা অন্তরে জাগরূক রাখিতে চাহিয়াছিলেন,—সেই ভাব ও সেই প্রেরণাকেই উপেন্দ্রনাথ 'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'তে প্রতিষ্ঠিত করিতে

চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেকালে এই হাওয়াটাই আমাদের মধ্যে বহিতেছিল। তারই জন্য 'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' তখনকার নাট্যকলাতে ও রঙ্গমঞ্চে এতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আধুনিক স্বাদেশিকতার অভিব্যক্তির ইতিহাসে এইজন্য উপেন্দ্রনাথ দাস এবং তাঁহার 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।

'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র একটা বৈশিষ্ট্য এই যে 'নীল-দর্পণ' ছাড়া এই দু'খানি নাটকই সর্ব্বপ্রথমে খোলাখুলিভাবে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের যে একটা সাঙ্ঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়া আছে, ইহা বলিতে চেষ্টা করে। ইহা পূর্ব্বে আমরা ঠারে ঠোরে মুসলমান আমলের ইতিহাসের আড়ালে যাইয়া ইংরাজ-রাজের প্রতি আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙা', সত্যেন্দ্রনাথের 'গাও ভারতের জয়', গোবিন্দচন্দ্রের 'কতকাল পরে বল ভারতরে' কিম্বা 'নির্ম্মল সলিলে'—এ সকলই পরোক্ষভাবে বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বেদনাকে জাগাইয়াছিল।...... সাধারণভাবে ইংরাজ-রাজের বা ইংরাজ-রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে 'নীলদর্পণে' স্পষ্টভাবে কোনও কথা বলা হয় নাই। তবে নীলকরদিগের অত্যাচারের ছবিতে ...সাধারণভাবে সকল বিদেশীয়ের এবং বিদেশী প্রভুশক্তির প্রতিকূলেও একটা বিরূপ ভাব জাগাইয়াছিল। 'শরৎ-সরোজিনী'তে এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'তে উপেন্দ্রনাথই প্রথমে এই ভাবটাকে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যভাবে ইংরাজ সমাজের ও ইংরাজ প্রভুশক্তির প্রতিকূলে পরিচালিত করেন।"[১২]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কিরণচন্দ্র বাঙ্গলা নাটকে Militant Nationalism-এর যে বীজ বপন করেছিলেন, উপেন্দ্রনাথ দাস তাকে পল্লবিত করে তোলেন। দীনবন্ধুর স্বদেশচিন্তাতে কোন militant স্বর ছিল না, যদিও পরবর্তীকালে বাঙ্গালীর চরমপন্থী মনোভাবের প্রতিচ্ছবি হিসাবে 'নীলদর্পণ' নাটক বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ প্রথম থেকে বাঙ্গলা নাটক রচনাতে বিদ্রোহের যে তূর্যনিনাদ করেছিলেন, পরবর্তীকালের নাট্যকারদের তা খুব বেশি প্রভাবান্বিত করেনি। এর ফলে বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাসে তিনি একক এবং নিঃসঙ্গ। তবে, এক স্বতন্ত্র সুরের বিঘোষণের জন্য বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তা ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে তিনি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে আছেন। বিস্মৃত হলেও বিলুপ্ত হননি।

---

১২ নব যুগের বাংলা : বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ. ২৫৫-২৫৭।

নয়

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬)

সমাজ-জীবনের সঙ্গে যুগচিন্তার গ্রন্থিরচনা নাট্যকারদের কর্মচেতনার প্রধান লক্ষ্য। মানুষের সাধনাকে প্রত্যক্ষ করে আরও স্থির ও প্রত্যয়নিষ্ঠ করবার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা নাটক রচনাতে তনু-মন-প্রাণ নিবেদন করেছেন যুগে যুগে। নাট্যকারেরা কখন ব্যক্তিগতভাবে আবার কখন যৌথভাবে মানুষের প্রগতি, উন্নতি ও মুক্তির আদর্শকে দেশবাসীর ঘরে ঘরে বহন করেছেন। মনের হতাশা, গ্লানি, দুঃখ, অজ্ঞানতা সমস্ত কিছু সংস্কার করে জাতির চিত্তে বলিষ্ঠ আদর্শ সঞ্চার করেছেন। শুধু কেবল ধর্মপুরুষদের জীবনাদর্শ ও কথামৃত প্রচার করেই নয়, জাতির প্রগতি এবং স্বাধীনতার বাণী প্রসারিত করবার মহান্ দায়িত্ব পালন করেছিলেন বাঙ্গলা দেশের নাট্যকারেরা।

বাঙ্গলাদেশের নাটক ও নাট্যশালার রচয়িতা এবং উদ্যোক্তাগণ অধিকাংশই ছিলেন আধুনিক চিন্তা ও মননে দীক্ষিত। যুক্তি-বিচার এবং মানবতাবাদের সঙ্গে তাঁরা আপন দেশের সনাতন আদর্শকেও গ্রহণ করেছিলেন সমান মর্যাদার সঙ্গে। স্বদেশপ্রীতি ছিল তাঁদের জীবনের রস ও রক্ত। প্রতীচ্যের জীবনমুখী দর্শনচিন্তা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁদের চিত্তে পরাধীনতার মর্মজ্বালা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে এক গভীর অনুভাবনা জাগিয়ে তোলে। নাট্যকারদের নাটক রচনার উদ্দেশ্য ছিল দেশসেবা। তাই তাঁদের কবিকল্পনা জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করে সাহিত্যের রসতীর্থে নির্বিকল্প স্বপ্নপ্রয়াণ করেনি। দেশ যেখানে পরাধীন, দেশবাসী সেখানে মুমূর্ষু, সেখানে কোনো খেয়ালী কল্পনা গ্রহণ করা নাট্যকারদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সংকটাপন্ন, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, অশ্রুস্নাত জীবনকে তাঁরা অধিক পরিমাণে ভালবেসেছিলেন। যুগের সংকট-শৈলতটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বলেই, নাট্যকারেরা বুঝেছিলেন—যে সুর জাতির মর্মবীণায় বাজে, তারই সঙ্গে নাটকের সুর বেঁধে নিতে না পারলে নাটক রচনায় নাট্যকারের যে জাতীয় দায়িত্ব আছে তা পালন করা যাবে না। তাই তাঁরা আপন কালের স্বজাতির মানস-প্রক্রিয়াকে নাটকে অত্যন্ত

সার্থকতার সঙ্গে ধরে রেখেছেন। শুধুমাত্র স্বাদেশিক ভাবাদর্শ প্রচার নয়, স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে দেশবাসীর মত ও পথ কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে অনেক মূল্যবান নির্দেশও তাঁরা দিতেন। নাটক ও নাট্যশালা পরিনির্মাণের ব্রতীগণ সখকে সাধনায় পরিণত করেছিলেন। শুধু উদার মানবহিতবাদী ধর্মনৈতিক কথা অথবা অতীতের মহান্ ঐতিহ্য ও গৌরব-কাহিনী নয়, দেশবাসীর দীর্ঘকালের নানা কুসংস্কার, জীর্ণ রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারে গভীর মমত্ববোধ এবং বিদেশী শাসকের প্রতি দাস-সুলভ আনুগত্য ও চাটুকারিতা—সমস্ত কিছুকে কখনো তীব্রভাবে কখনো রঙ্গ-রসে আক্রমণ করে তাঁরা দেশবাসীকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। বিদেশী শাসন-ব্যবস্থায় দেশের গলিত রূপটি নাট্যকাররাই প্রথম সার্থকতার সঙ্গে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন। শুধু আবেদন নিবেদন নয়, প্রযোজনবোধে শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও প্রয়োজন, বাঙ্গলার নাটক ও নাট্যশালা দ্বিধাহীন-ভাবে দেশবাসীকে এ কথা বলেছে। নাট্যকারেরা সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সর্বব্যাপী সহানুভূতির তুলিতে, বিদেশী শাসনের নির্যাতীত মানবাত্মার ক্রন্দন ও ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাস নাটকের মধ্যে প্রাণস্পর্শী করে তুলেছিলেন বলেই গ্রাম ও নগর-জীবন এক সাংস্কৃতিক বন্ধনে বাঁধা পড়ে। জাতি ও বর্ণের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেশবাসীর সকল স্তরে মানসিক ঐক্যগঠন, নাটক-রচয়িতা ও নাট্যশালার পাত্র-পাত্রীদের সবচেয়ে বড় অবদান। তাঁদের 'নেশন' তত্ত্বের বড় পরিচয় এটাই। আর এরই ফলে নাটক ও নাট্যশালা হয়ে ওঠে—'ন্যাশনাল'। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশে যে 'জাতীয় রঙ্গমঞ্চ' (ন্যাশনাল থিয়েটার) স্থাপিত হয়েছিল, তার গৌরব ও গুরুত্ব এই চিন্তাদর্শেই নিহিত ছিল।

নাটক ও নাট্যশালায় দেশপ্রেম ও স্বাধিকার অর্জনের যে সু-উচ্চ তুফান উঠেছিল তাতে ইংরেজ সরকার প্রমাদ গুণেছিলেন। ইতিহাসের গতি সম্পর্কে অতিসচেতন ইংরেজ বুঝতে পেরেছিল যে, নাট্যকারেরা যখন স্বাদেশিক হিতাদর্শে ব্রতী হয়ে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন ও ক্রমাগত অভিনয় সাফল্যের মধ্যে সেই আদর্শের দ্রুত বিস্তার ঘটছে; তখন দেশবাসীর বন্ধনমুক্তি হতে আর বেশি দেরি নেই। তাই তাঁরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন' বিধিবদ্ধ করে দেশের জাগরণী চিন্তা ও তার প্রসারকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয়তা-

বোধ ও স্বাধিকার-আন্দোলন এতে ক্ষুণ্ণ হয়নি বরং আরও তীব্র একমুখীনতা অর্জন করেছিল।

বক্ষ্যমান আলোচনাটি বিবৃতিমূলক। তাই ইতিহাসের প্রামাণ্য উপাদানের সাহায্যেই বাঙ্গালী-মানসের গতিপ্রকৃতি, আন্দোলন পরিচালনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের কাহিনীটি উদ্ধার করতে হবে।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্' ভারত পর্যটনে আসেন। স্বাদেশিক বাঙ্গালীরা রাজপুরুষের এই আগমনকে খুব একটা প্রীতির চোখে দেখেননি। বিশেষভাবে রাজ-অভ্যর্থনার জন্য ইংরেজ সরকার অর্থসংগ্রহে যে নিয়মনীতি প্রয়োগ করেছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে তা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমকালীন বাঙ্গালীর প্রতিবাদ ছদ্মনামের আবরণে প্রকাশিত হয়েছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়।

"It is hoped that the leaders of the loyalty movement will abstain from misappropriating municipal funds without the consent of the rate payers, and will not collect 'voluntary' subscriptions in the disgraceful manner restored to in Calcutta. If the Prince could be made aware of only one-tenth of the extortion and oppression which will be carried on in his name in the interior as well as in the Presidency towns and of the consequent ill feeling engendered among the poorer classes, he would very likely both from charitable and from political reasons be quite willing to forego the pleasure of paying a visit t, India.

Burning tears will be shed in many a poor man's family through whose village either the retinues of Rajas or the travelling cartage of the Prince passes, who poorman will be so hedged in by obsequicus officials, and so dazzled by all sorts of loyal demonstrations and spectacles Natives ordered to look happy, that he will consider the population of India to be enjoying a state of great prosperity and contenment. It is quite possible that a tew of the most

wretched poverty and shocking misery may accidently obtrude themselves to the contrary ; but momentary sights of this kind will not be strong enough to make any great impression and will soon fade from his memory among the crowd of the most pleasing and flattering 'Tumaphas' that will be prepared for him." (By a Native, অমৃত বাজার পত্রিকা ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫)

অর্থ-সংগ্রহ ব্যাপারে শোষণ ও নির্যাতনের বিপক্ষে নানা প্রতিবাদ দিকে দিকে উঠতে থাকে। অমৃত বাজার পত্রিকা দু'বার বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। প্রথমবারে লেখা হয় (অমৃত বাজার পত্রিকা ৪ঠা ভাদ্র ১২৮২ বঙ্গাব্দ)—

"আমাদের দেশে অনেকে যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ বিস্তর চাঁদা দিতেছেন কিন্তু একদল ইংরেজের কিরূপ রাজভক্তি তাহা এই ঘটনার দ্বারা প্রকাশিত হইবে। ইংলণ্ডের মধ্যে ব্রাডল সাহেব একজন প্রসিদ্ধ লোক। ইনি যদিও নাস্তিক কিন্তু ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী। সম্প্রতি একটি সভা করিয়া তিনি বক্তৃতা করেন যে যুবরাজ ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাদের সহিত শিকার ও অন্যান্য আমোদ করিতে যাইতেছেন, অতএব তাঁহাকে আমাদের একপয়সা দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, যদি এদেশে এমন কথা কেহ বলে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তদ্দণ্ডে তাহাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন।"

দ্বিতীয়বারে লেখা হয় (অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮ই ভাদ্র, ১২৮২ বঙ্গাব্দ)—

"যুবরাজ এখানে আগমন করিতেছেন এবং এই উপলক্ষ্যে আমাদের অন্যূন এককোটি টাকা ব্যয় হইবে। ভারতবর্ষে যে সমুদয় স্বাধীন রাজা, সর্দ্দার প্রভৃতি আছেন, ইহারা এই উপলক্ষ্যে অন্যূন ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। এবং অন্যান্য স্থানেও ৫০ লক্ষ টাকার কম ব্যয় হইবে না এবং জগদীশ্বর না করেন যদি যুবরাজ আমাদের মনের আশা পূর্ণ না করেন তাহা হইলে আমরা এই কোটি টাকার দ্বারা বাজি, বাজনা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি করিয়া কেবল আমাদের দুঃখের সাগর উত্তোলন করিব। আমরা ইচ্ছা করিলে এই অর্থ দ্বারা দুঃখের সাগর উত্তোলন না করিয়া সুখের সাগরে ভাসমান হইতে পারি। আমরা যদি এই অর্থের দ্বারা দেশে ধন বৃদ্ধির যত্ন

করি তাহা হইলে ২০ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে এত ধন হইতে পারে যে আমরা সমাজে ইংরাজদিগের ন্যায় প্রবল হইয়া উঠিব।”

জাতীয় হিতবাদী বঙ্গবাসীগণ দেশের ঘোর অর্থনৈতিক দুরবস্থার দিনে, রাজপুত্রের আমোদ-প্রমোদ ও স্ফূর্তির উদ্দেশ্যে কোনো অর্থ ব্যয় করতে রাজি ছিল না। কিন্তু অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীর অর্থসংগ্রহী অভিযান তাঁদের বিরূপ করে তোলে। আর এই বিরূপতা চরমে পৌছায় যখন একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় পুরনারীদের সঙ্গে নিয়ে ‘প্রিন্স অব্ ওয়েলস্’কে হিন্দুপ্রথামত বরণ করেন ও ঘরের মধ্যে নিয়ে আপ্যায়িত করেন। সমসাময়িক কালে ঘটনাটি বাঙ্গলা দেশের হিন্দু-সমাজে এক বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। সমস্ত হিন্দু-সম্প্রদায় বিষয়টিকে জাতীয় অমর্যাদা হিসাবে গ্রহণ করে ও তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়। ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লেখা, (৫ই জানুয়ারী, ১৮৭৬)

“That the national feeling had been outraged at the price the babu paid for his honour.”

তবে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’র স্বর ছিল খুব কড়া ও ভীষণ আক্রমণাত্মক। তাঁরা লেখেন (অমৃতবাজার পত্রিকা ২৩ শে পৌষ ১২৮২ বঙ্গাব্দ)

“হিন্দু সমাজ সকল নিষ্পীড়নই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু হিন্দু পরিবারের উপর কোনরূপ আঘাত হইলে উহা সহ্য করিতে পারে না। আমরা সর্ব্বস্বচ্যুত হইয়াছি……নাগাজাতির যে স্বাধীনতা রত্ন আছে আমাদের তাহাও নাই। ভিল জাতিরও একটি স্থান আছে যাহা তাহারা নিজস্ব স্বত্ব বলিতে পারে। আমাদের নিজের বলিবার একবিন্দু ভূমি নাই। অসভ্য কোন ২ জাতির স্বাবলম্বন আছে, আমরা সকল বিষয়েই অপরের কৃপাধীন। আমাদের ধন নাই, শক্তি নাই, অভিমান নাই, আত্মগৌরব নাই, অহংকার নাই, আমরা সমুদায় হারাইয়াছি। আমাদের থাকিবার মধ্যে হিন্দু-পরিবার আছে, আমাদের গৌরবস্থান এই পরিবার। এই পরিবারে যাহাতে কলঙ্ক হয়, এরূপ কার্য্য যিনি করেন তিনি হিন্দুজাতির পরম শত্রু, হিন্দু-সমাজের কলঙ্ক। তিনি যে কি তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না, বাঙ্গালাভাষায় এইরূপ কোন কথা নাই যাহা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যায়। অনারেবল জগদানন্দের যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি তাহাতে তাঁহার বিস্তর সম্মান হইয়াছে। তাঁহার ঐশ্বর্য্যও বিস্তর হইযাছে, তবে কেন তিনি এরূপ কার্য্যে

প্রবৃত্ত হইয়া হিন্দুজাতির কলঙ্ক করিলেন, হিন্দুমাত্রের মনে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিলেন। তিনি তাঁহার পরিবার রাজদ্বারে উপস্থিত করুন অথবা রাজপুত্রকে তাঁহার পরিবারের মধ্যে লইয়া যান. তাহাতে সাধারণের কথা কহিবার কোন স্বত্ব নাই। কিন্তু তিনি আপনার পরিবার হিন্দু পরিবার পরিচয় দিয়া উহার মধ্যে যুবরাজকে যখন প্রবেশ করিতে দিয়াছেন তখন তিনি এরূপ কার্য্য করিয়াছেন যাহাতে হিন্দু পরিবার মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আমরা জানি না আমাদের হিন্দু সমাজে এখন কতটুকু জীবনীশক্তি আছে। কিন্তু যদি হিন্দুসমাজ প্রকৃত জীবিত থাকেন এবং হিন্দু পরিবারের প্রতি আমাদের এখন বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে তবে সকলের প্রকাশ্যরূপে বলা উচিত যে জগদানন্দবাবু যে কার্য্য করিয়াছেন উহা হিন্দুজাতির অনুমোদনীয় নহে। আমাদের বিবেচনায় তিনি যে গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে যদি হিন্দুসমাজ বলেন যে, তুমি হিন্দুসমাজ হইতে স্থগিত হইলে, যে কুলকামিনীরা যুবরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের স্বামীগণ যদি তাহাদিগকে বলেন যে—তোমাদিগকে আমরা আর গৃহে লইতে পারি না তাহা হইলে হিন্দু সমাজ কি কামিনীগণের স্বামীদের প্রতি কেহ কোন দোষারোপ করিতে পারেন না। আমরা জানি না জগদানন্দবাবুর হিন্দুসমাজে কি পদ, তিনি যে সমাজভুক্ত সে সমাজের আচার-ব্যবহার কিরূপ, কিন্তু যাহার সমাজ আছে তিনি যে এরূপ কার্য্য করিতে সাহসী হইবেন আমরা উহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। যুবরাজ আমাদের শিরোধার্য্য, তাঁহাকে আমরা ধন, প্রাণ সর্ব্বস্ব দিয়া অর্চনা করিতে পারি, কিন্তু হিন্দুজাতির নিকট পরিবারের তুল্য কিছুই নহে। রাজার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে, পরিবারের গৌরব রক্ষা করিতে হিন্দুরা অনেক সময় রাজার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিয়াছেন। জগদানন্দবাবুর মনে এরূপ কথা একবারও উদয় হইল না যে তিনি যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিবারের মধ্যে লইয়া গেলে তিনি শুদ্ধ হিন্দুসমাজের নিকট হাস্যাস্পদ ও ঘৃণেয় হইবেন না, রাজপুরুষেরাও তাহাকে ঘৃণা করিবেন। যুবরাজের যদি হিন্দুপরিবার দেখিবার বাসনা থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাঁর রাণীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন। তিনি রাণীকে না আনিয়া হিন্দুপরিবার দেখিবার অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা জানেন যে রাজভক্তি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত পরিবারের মধ্যে রাজাকে

লইয়া যাওয়ার কোন প্রয়োজন করে না। হিন্দু মহিলাগণের পরণ-পরিচ্ছদ, রূপ-লাবণ্য দেখাইবার আরও তো অনেক উপায় ছিল? জগদানন্দবাবু কেন অবিবাহিতা কতকগুলি বালিকা যুবরাজের নিকট লইয়া গেলেন না?··· জগদানন্দবাবু তাহার এই কার্য্যটি দ্বারা ইহাও পরিচয় দিলেন যে হিন্দুজাতি কতদূর সম্ভব অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে. এবং যে জাতি আত্মমর্য্যাদা, অভিমান সামান্য লাভের নিমিত্ত অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহার আর উদ্ধারের উপায় নাই। তাঁহার এই কার্য্যটি দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। আমরা এতদিন পরে জানিলাম যে আমাদের চরম অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। যে হিন্দু পরিবারের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে রাজা তাহাতে আবার বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী রাজার প্রবেশ, ইহা শুনিলেই হিন্দুমাত্রেই রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবেন, লজ্জায় ও ঘৃণায় অধোবদন করিবেন। পরিবার মধ্যে রাজাকে প্রবেশ করিতে দিয়া রাজভক্তি দেখান এরূপ প্রবৃত্তি জগদানন্দবাবুর কিরূপে হইল তাহা আমরা জানি না।"

স্বদেশপ্রেমিক মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে একটি তীব্র শ্লেষাত্মক কবিতা লিখেছিলেন, কবিতাটির নাম ছিল—'বাজিমাৎ'। জনসাধারণের কাছে কবিতাটি প্রচণ্ডভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল। আলোচনার প্রয়োজনে কবিতাটি উদ্ধৃত করা হল—

"বেঁচে থাকো মুখুর্য্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে।
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে॥'
'ফিক্রু' দানে, এক তড়াতে, কল্লে বাজি মাৎ।
মাছ, কাতুরে ভেকো হলো– কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ॥

সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়!
দেখালে অদ্ভুত কীর্ত্তি বকুলতলায়!
পুণ্যদিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে॥
কোথায় কৈশবী দল? বিদ্যাসাগর কোথা?
মুখুর্য্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোতা॥
হরেন্দ্র নগেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি,
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি॥

ধন্য মুখুর্য্যের বেটা বলিহারি যাই !
সস্তা দরে মস্ত মজা কিনে নিলে ভাই !
ও যতীন্দ্র কৃষ্ণদাস ! একবার দেখ চেয়ে
বকুলতলার পথের ধারে কত শত মেয়ে—
কালো, ফিকে, গৌর, সোনা হাতে গুয়া পান,
রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান ॥
আসবে রাজা রাজপারিষদ, লাট সাহেবের মেয়ে—
মার্‌বেল মারা গিল্‌টি হলে, একবার দেখ চেয়ে ॥
বেলগেছেতে খানা দিয়ে খেটে হলে খুন ।
বিষ্ণুপুরে মিস্সের দেখ বড়ে টেপার গুণ ॥
ছি ! রাজেন্দ্র ! কাল কাটালে পুথি ঘেটে ঘেটে ।
শেষে আইনপেসার পেস্কারিতে মান্‌টা গেল ঘেটে ॥
ধন্য হে মুখুয্যে ভায়া বলিহারি যাই ।
বড় সাপ্টা দরে সাৎ করিলে খেতাব 'সি, এস্, আই ॥'
হেদে ও সহরবাসি আর কি হাসি হাসবি রেড়ো বলে ?
দেখ না চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে ॥
চৌঘুড়িতে সঙ্গে করে সাদা মোসাহেব—
নাড়ীটেপা ফেরার সাহেব, বার্‌টেল নায়েব ॥
আর কেন লো ঘোমটা খোল, কবির কথা রাখো ।
'লাইট' পেয়ে 'রাইট' হয়ে, পার হও লো সাঁকো ॥
ভয় কি তাতে লজ্জা কি তায় কাল বদনখানি ।
দেখ্‌বে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি ॥
কজ্জা তুলে দেখবে বাজু, দেখবে কানের দুল,
দেখবে কণ্ঠি, কণ্ঠহার পিঠের ঝাঁপাফুল ॥
আয় এয়োগণ করবি বরণ পরে চরণচাপ—
শিবের বিয়ে নয় লো ইহা ধরবে নাকো সাপ ॥
এগিয়ে এসো বড় ঠাকৃরুণ, সাত পোয়াতির মা ।
তক্ক পাবেন তোমার তিনি তাও কি জান না ?
সোনার থালে হীরের মালা তাতে ঢাকাই ধুতি,
নজর দিয়ে, দেখাও খুলে বউ বিননো পুতি ॥

বাহবা বুক, বুড় বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে,
রাজ্‌পূজাটি কল্লে ভাল, ফুলের মালা নিয়ে !
কোন্ শাস্ত্রে লেখে বল বামনের মেয়ে হয়ে।
রাজার ছেলের পা পুজিবে ফুলের সাজি লয়ে ॥
এখন—দাঁড়াও সরে বুড় দিদি, হাসিল্ হলো কাজ—
দেখ্‌বো আমি ভাল করে আর এয়োদের সাজ ॥
আয় না লো সব, একে একে, গোলাপী কাঞ্চন।
দেখি তোদের রূপের ছটা ঘটকালি কেমন ॥
ভয় করো না একলা আমি দেখতে নাহি চাই।
রাজার ছেলে আব্‌ডালেতে উকি মার্‌বো ভাই ॥
আমি—স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে ?
বলতে কথা বাছা বাছা কদম ফুলের ঝাড়।
ঘেল্লে আসি রাজকুমারে, ভাঙ্গলো কবির ঘাড় ॥
হীরের ঝলস, সোনার কলস, হাত ঝুম্‌কার বোল।
হুলু হুলু উলুর ধ্বনি, শাঁকের গণ্ডগোল,
বারাণসীর খস্‌খসানি, উঠলো মহা ধূমে ;
মার্‌বেলেতে মলের ঠমক্ বাজ্‌লো ক্রমে ক্রমে ॥
কবি হৈল হতভোম্বা হিঁদুর পর্দ্দা ফাঁক।
পালিয়ে যেতে পথ পায না ঘোরে কলুর চাক ॥
বাঙ্গালায় বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন !
বাঙ্গালী-কুলকামিনী হইল স্বাধীন ॥

সে নিশিতে কি সহরে কিবা পল্লীগ্রামে।
নিদ্রা নাহি যায় কেহ সুখের আরামে ॥
গৃহিণী যাহার ঘরে তারি কান্নাকাটি।
সারা নিশি গঞ্জনার চোটে ফাটে মাটি ॥
কহে কোন রাজনারী বিনায়ে বিনায়ে।
শয়নগৃহের পাশে পতিকে শুনায়ে ॥

'খালি সাটিনের সাজ, ফেটিন্ হাঁকান।
কেবল সেলাম্‌বাজি, লেবিতে বেড়ান॥
দিনরাত ঘুরে ঘুরে মরেন কেবল॥
ঘোড় দৌড়ে, টাউন্ হলে, মুড়িয়া মকবল॥
ক্লাইব লাটের আমল হতে পেসা খোসামুদি।
তাতেও গলদ্ এত—কি কব লো দিদি॥
এমন স্বামীর নারী বিড়ম্বনা খালি।
চাঁদা দিতে চাঁদি ফাটে মানের গুড়ে বালি॥'
শুনিয়া নারীর কথা মনে অভিমান।
কর্ত্তাটি জানালা খুলে স্নিগ্ধ বায়ু খান॥

অন্য কোন অট্টালিকা ভিতরে আবার।
পতি পাশে কোন রামা করে ঝঙ্কার॥
'পর্ব্বটা কি, শুনেছ তো লজ্জা নাই মুখে।
পোষাক খুলে চুপে চুপে শুতে এলে সুখে॥
রাণীর ছেলে দেখে গেল হলুদমাখা হাত।
সাতপুরুষে সভ্য মোরা হলেম শুদমজাৎ॥
পড়্‌তে পারি, বলতে পারি, ইংরাজী ভাষায়।
পিয়োনা বাজাতে পারি ইংরাজী প্রথায়॥
'এন্ লাইটেন' সবার আগে, কর্ত্তা বিলেত যান।
তোমার গুণে গুণমণি হারালে সে মান॥
পায়ে বুট, জোব্বা গায়ে, গলায় সোনার চেন।
তকমাওয়ালা আড়দালিতে হয় না শুধু 'ফেম'॥
বাপ পিতামোর নামে খালি হয় নাকো রাজভেট
'টাইম পেয়ে রাইট নেলে হিট্ চাই ষ্ট্রেট॥'
ধিক্ তোমারে ধিক্ সে তোমার হিরান্ডরি বুক।
এক মিনিটে বাগিয়ে কেমন লাগিয়ে দিলে হুক্॥'
খোঁটা খেয়ে অধোমুখে পতি তার চায়।
এইরূপ গঞ্জনায় সারা নিশি যায়॥

বলে কোন ধনাঢ্যের অভিমানী নারী
'বড় নাম, বড় জাঁক, বোঝা গেছে জারি ॥
দূর করে টেনে ফেল—টাকা দিও শয়ে।
এ হিড়িকে দাঁড়ালে না একটা কিছু হয়ে ॥
বাঁধা রোসনাই আলো সব কি গেল ফেঁসে।
রায় বাহাদুর নামটাও ছি না পাইলে শেষে ॥
সুযোগ বুঝে হুজুকে বামুন নাম কল্লে জারি।
তোমার কেবল আতস বাজি, মন্দ তুমি ভারি ॥'

জজের গৃহিণী কন 'ভ্যালা জজিয়তি।
নামে শুধু অনারেবল্. পদ বিলায়তি ?
ছোট লাটে আজ্ঞাকারী তোমা হতে দেখি
লক্ষগুণ বড় লোক, বল দেখি এ কি ?
কুঠি নিলে বাড়ী ছেড়ে সাহেব পাড়ায়—
তোমার কোর্টের উকিল তোমাকে হারায় !
ছি ছি, ছি ছি, ছেড়ে দাও এমন চাকরি।
শুদ্ধ খালি মার্কামারা পেয়াদার 'লিবরি'
ভাবতেম বুঝি কেষ্ট বেষ্ট তুমি এক জন—
জরাসন্ধ রাজা কিম্বা লঙ্কার রাবণ
ও মা ও মা পড়া ভাগ্যি, উকিলের ওঁচা।
হাড় জ্বালাতে পারেন খালি এনে নথির গোচা ॥'
বলে—ঠোন্‌কা মেরে জজমহিলা বারাণ্ডায় যান।
মিত্র ভায়ার রাত্রি শেষ ভাঙ্গতে তার মান ॥

পোনা, পুঁটি, খয়রা, চেলা গিন্নি আর যত।
পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়ান সে কত ॥
কেহ বলে আমার কর্ত্তাটি সে মুৎসুদ্দি।
ফ্যাটা বেঁধে যান খালি এই বিদ্যা বুদ্ধি ॥
বাপের কামানো টাকা বিলাতি চাটকে।
দিয়া নিজে জুজু হয়ে ঢোকেন ফাটকে॥

তাঁর টাকা তাঁর কড়ি তাঁরি লোক জন।
মাঝে থেকে লুটে খায় কুঠেল যবন॥
শেষে যবে 'হোমে' যায় দু বছর পরে।
বাজার দেনায় ইনি ঢোকেন শ্রীঘরে॥
এই তো বল্লেম তার বিদ্যার ওজন।
তা হ'তে আমার আর কি হইবে বোন্॥
বলে দালালের মাগ, দালালি ব্যাপারে।
আনে বটে ঢের কড়ি নিজ রোজগারে॥
পেটেতে কড়িটি ভোর কাল আঁচড় নাই।
সে কেমনে রাজপুত্র আনে বল ভাই॥
কাগজের এডিটরি করে মরে যারা।
তাহাদের কামিনীরা কেঁদে কেঁদে সারা॥
রাত্রি দিন এত খাটে হায় লো স্যাঙাৎ।
হপ্তায় মিনিট পাঁচ হয় না সাক্ষাৎ॥
এত লেখে এত পড়ে এত ছাপা ছাপে।
তবু পদ নাহি পায় অভাগীর পাপে॥
কবি বলে কামিনীরা কৃষ্ণনাম কর।
ফিরিবে তোদের ভাগ্য শুন অতঃপর॥
ডিপুটীর ভার্য্যা কন্ আমাদের তিনি।
চৌকিদারী কাজে পটু, মফস্বলে 'গিনি'॥
সহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার।
বল্‌বো কি লো ওলো দিদি অদৃষ্ট আমার—
ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে শরীর হলো কালি।
সাত শ টাকা মাইনে হলে হদ্দ ঠাকুরালি॥
মদ্দ বড় তবু এতে চোক্‌রাঙ্গানি কত।—
ঘুটের ঢিপে ভাবে দিদি দেখিলে পর্ব্বত॥
হোতাম যদ্যপি কোন উকিলের মাগ্!
বাড়িত আমার আজ কত অনুরাগ॥
সে রমণী বলে 'বোন' এপিট ওপিট।
একি ছাঁচে ঢালা দুই সমান টিকিট॥

যে টাকাটি মাসে মাসে করে উপার্জ্জন।
চৌদ্দ ভূতে পড়ে করে অর্দ্ধেক ভোজন॥
কপালে প্রত্যহ ঝাঁটা এজলাসে এজলাসে।
তিন তেরোটি লাথি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে॥
বেশ্যার বেহদ্দ পেশা কথা বেচে খায়।
পদের আবার মান সম্ভ্রম কোথায়॥
আমি উকিলের মাগ্ কথা শোন বোন্॥
মুখুয্যের সঙ্গে কার করো না ওজন॥
বটে বোন্ বটে বটে মানি তোর কথা।
বলে ধীরে ধীরে এক নারী আসে সেথা॥
আমার কর্ত্তাটি দেখ সরকারি উকিল।
মুখুয্যের 'সিনিয়র' উকিল সিবিল॥
বয়েসও হয়েছে কিছু, বুদ্ধিও পেকেছে।
ছোট বড় কর্ম্ম কাজ অনেক করেছে॥
পাকা হিন্দু প্রতিদিন দুর্গানাম করে।
তবুও রাণীর ছেলে ঢুকলো না লো ঘরে॥
ডাক্তারের নারী কহে ভারি ত মদ্দানি।
নাড়ী টিপে জারি কত, ঘরেতে শাসানি॥
পারেন কেবল পাড়ায় পাড়ায় পিটিতে ধম্বল,
মরণকালে শরণ 'চিবর' 'পার্টিজ' সম্বল॥
মরেন ঘুরে পথে পথে রোদে ধুকে ধুকে।—
ঘরে শুতে এলে এবার খেঙ্গরা দেব ঠুকে॥
কেরাণীর নারী যত পাঁদাড়ে ফোঁপায়।
মাষ্টারের 'মিসট্রেসরা' গোসাঘরে যায়॥
কবির ফিরিতে ঘরে হৈল বড় দায়।
অনেক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায়॥
কান্তা আসি হাস্যমুখে বলে কই দেখি।
কি পাইলে কাব্য লিখে, সোনা কিম্বা মেকি॥
বড় জ্বালাতন কর জেগে সারারাতি।
কালি ফেলে কাগজ ছিঁড়ে, পুড়িয়ে মোমের বাতি॥

শয়নে সোয়াস্তি নাই, বিরাম নিদ্রায়।
সাত রাকাড়ে সাড়া নাই রাত্রি বয়ে যায়॥
দেও দেখি গুণমণি কি পেলে শিরোপা।
বুলু রিবন, চাকি চাকতি, কিম্বা জরির খোপা॥
কবি কবে পায় কিবা, কি দেখাবে ধনি ?—
না বলিতে রাঙ্গা ঠোঁট ফুলায়ে তখনি॥
ধাক্কা দিয়ে গরবিণী গর্‌গরিয়ে যায়।
ফাঁপরে পড়িয়া কবি ফ্যাল ফ্যাল চায়॥"

জনমানসের এই বিপুল প্রতিক্রিয়া নাট্যালয়কে স্পর্শ করল। নাট্যকারেরা জনচিত্তের উত্তাল জলধি-তরঙ্গকে নাটকের বিষয়বস্তু করে নিলেন। লেখা হল 'গজদানন্দ প্রহসন'। অভিনীত হল 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে'। এ প্রহসনখানি কে রচনা করেছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে গানগুলি ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনা। বইটির কোনো মুদ্রণ সংস্করণ পাওয়া যায়নি। সব গানগুলিও বর্তমানে দুর্লভ। দু-একটি যা জনশ্রুতিতে ছিল তা হচ্ছে এই রকম—

"ওলো ঘুরতে পারিনে আর ধরে গিয়েছে পা
কেন গায়ে পড়িস্ ঢলে ওলো সরে যা
হাতে নিয়ে ঝাড়ি, চলতে কি পারি
একটু থেমে চল্ ওলো ঘেমে গিয়েছে গা।"

এ গানটি হত কোরাসে। আর একটি গান অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণি গাইতেন—

"আমি পিসী থাকতে ভাবনা কিরে বোকা ছেলে
অনেক সুকৃতির ফলে
আমার মতন পিসী মেলে।"

আর একটি গান গাইতেন বেলবাবু। দৃশ্যটি ছিল হাইকোর্টের সম্মুখ—

"(ওরে) জজ হতে চাও গজ গিরিধন"—ইত্যাদি

এই প্রহসনাভিনয়ে নট নগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হতেন 'যুবরাজ' এবং মহেন্দ্র বসু সাজতেন 'জগদানন্দ বাবু'। যুবরাজকে দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজীবের পুত্র ও জগদানন্দকে হনুমান বলে চিত্রিত করা হয়।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী 'সরোজিনী' নাটকের সঙ্গে 'গজদানন্দ

প্রহসন' অভিনীত হলে জগদানন্দবাবুর উদ্দেশ্যে জাতির ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও শ্লেষ ক্ষিপ্রগতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার আকাশ-বাতাসকে মাতিয়ে তুলল। জগদানন্দবাবু নিজেও পরিত্রাহি রব ছাড়লেন। এই সময়ে ব্রিটিশ সরকারও ভাবী সম্রাটের মহামান্য 'হোষ্ট' (Host)-কে রক্ষা করতে হলেন বদ্ধপরিকর। দেশের লোকেরা বিদেশী রাজপুত্রকে কুলবধূ দিয়ে অভ্যর্থনা করার রীতিকে সহ্য করতে পারেনি। তাই তারা সমালোচনায় মুখর হয়েছিল। কিন্তু এর মাঝে সরকারী শাসকগোষ্ঠী ও স্তাবকেরা রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়েছিলেন। তাই জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গবাণ আসলে ভাবী সম্রাটের বিরুদ্ধেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হল। কিন্তু আইনত তা প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না বলে, সরকারী মুখপাত্রগণ বে-আইনী আইন বিধিবদ্ধ করে নাট্যশালা ও নাটকের কণ্ঠরোধ করতে তৎপর হন। বড়লাট নর্থব্রুক, অর্ডিন্যান্স্ পাস করে 'গজদানন্দ প্রহসন'[১] বন্ধ করে দিলেন। অশ্লীলতার অভিযোগে এই সময় উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকও বাজেয়াপ্ত হয় এবং নাট্যশালার ব্যবস্থাপকেরা রাজরোষে বন্দী হন।[২] ইংরেজদের চণ্ডশাসন-নীতির বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর বিদ্বেষ এতই প্রবল হয় যে তারা প্রকাশ্যভাবে ইংরেজ শাসনের সমালোচনায় ব্রতী হয় (Police of pig and sheep)।[৩] সংবাদপত্রেও নানা প্রতিবাদ শুরু হয়। 'অর্ডিন্যান্স্' পাস করার পেছনে যুক্তি দেওয়া হল—অশ্লীলতার হাত

১ "২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬, 'হনুমান চরিত' বিজ্ঞাপন দিয়া প্রহসনটির পুনরাভিনয় হয়"—ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; পৃ. ৮১।

২ "'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের (৩।৪ গর্ভাঙ্ক) দৃশ্যটি অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। পুলিশ রিপোর্ট করে যে, সম্প্রদায় দেখাইতে চায় যে ম্যাজিষ্ট্রেটের পাশবিক অত্যাচারের ফলেই বালিকার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আর এই ঘটনায় তাহার বিবাহ হইবে না প্রমাণ করিতে চায়। এই অভিনয়ের পরেই থিয়েটার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা মার্চ তারিখে 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনীত হইতেছিল পুলিশ আসিয়া উপেন্দ্রনাথ দাস (ডিরেকটার), অমৃত বসু—ম্যানেজার, ভুবনমোহন নিয়োগী—স্বত্বাধিকারী, মহেন্দ্র বসু, মতি সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপাল দাস—অভিনেতা, রামতারণ সান্ন্যাল—সংগীত শিক্ষক প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে।" ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃ. ৮০।

৩ "পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট ল্যাম্ব সাহেব ও কমিশনার সাহেব ষ্টুয়ার্ট হগ্‌কে বিদ্রূপ করিয়া গজদানন্দ একটু রূপান্তরিত হইয়া Police of pig and sheep নামে অভিনীত হয় (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ ১লা মার্চ)"—ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; পৃ. ৮১।

থেকে সামাজিক ক্ষয়-ক্ষতি ও নাটক এবং নাট্যশালার মর্যাদা ও মান রক্ষার চেষ্টা। আর সাহিত্যের শ্লীলতা ও অশ্লীলতা বিচারের ভার দেওয়া হয়েছিল বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ একজন বিদেশী পুলিশ কমিশনারকে। 'অর্ডিন্যান্সে'র বিরোধিতা করে অমৃত বাজার পত্রিকা লিখেছিল (অমৃত বাজার পত্রিকা ৪ঠা চৈত্র—১২৮২ বঙ্গাব্দ)—

"লর্ড নর্থব্রুক একটি আইন করিতেছেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট যদি মনে ২ বুঝেন যে কোন নাটক অভিনয়ে কোনরূপ অশ্লীলতা, কি কাহার গ্লানি, কি বিদ্রোহসূচক কোন কথা আছে তাহা হইলে বিনা বিচারে ইচ্ছামাত্রে সে নাটক অভিনয় বন্ধ করিতে পারিবেন এবং যদি গবর্ণমেণ্ট অভিনয় বন্ধ করার আজ্ঞা প্রচার করা সত্ত্বেও উহা অভিনীত হয় তাহা হইলে অভিনয়কারী-দিগকে গবর্ণমেণ্ট দণ্ড দিবেন। সকলে অবগত আছেন অশ্লীলতা, গ্লানি, কি বিদ্রোহিতা প্রচার করিতে রাজদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে যে আইন করিয়াছেন তাহাতে এ সমুদয় অপরাধের দণ্ড বিধান হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সন্তুষ্ট নন। গবর্ণমেণ্ট এ সমুদয় অপরাধের নিমিত্ত অপরাধীকে যথাযোগ্য বিচারপূর্ব্বক শাস্তি দিতে প্রস্তুত নন। গবর্ণমেণ্ট যদি মনে মনে অবগত হইলেন যে নাটক অভিনয় দ্বারা উপরিউক্ত অপরাধত্রয়ের কোন এক অপরাধ হইতেছে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে অভিনয় স্থগিত করিতে পারিবেন। যে দেশে নাটক কি নাটক অভিনয়ের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে, সেখানে কঠোর শাসন দ্বারা ইহার কোনরূপ অপকার করিতে পারে না, কিন্তু আমাদের দেশে এ উভয়েই এখন শৈশব অবস্থা। এখন এরূপ স্বেচ্ছাচারী শাসনাধীন রক্ষিত হইলে নাটক ও নাটকাভিনয়ের সকল আশা অন্তর্হিত হইবে। নাটক অভিনয় দ্বারা দেশের মধ্যে অশ্লীলতা কি বিদ্রোহিতা প্রচলিত হয় —ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। ইহা নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট দণ্ডবিধি আইন প্রচলিত করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ কঠোর আইন দ্বারা এ সমুদয় শাসন করার আমরা কোন প্রয়োজন বোধ করি না। ইহাতে দেশের মঙ্গল হইবে না, প্রত্যুত বিস্তর অমঙ্গল ঘটিবে। সমাজ সংস্কার করার মত যতরূপ উপায় আছে, নাটকাভিনয় তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়। এ উপায়ের মূলে আঘাত করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। বঙ্গবাসীরা দেশের মঙ্গলের

নিমিত্ত যদি উচ্চ শিক্ষা সমর্থন করা মনে করেন, দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত যদি সম্বাদপত্রের স্বাধীনতা প্রয়োজন বোধ করেন তাহা হইলে নাটক অভিনয়ের স্বাধীনতা সমর্থন করা তাহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। আমরা এই নিমিত্ত বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে, এ দেশবাসীদিগের সমবেত হইয়া লর্ড নর্থব্রুকের আজ্ঞার প্রতি অচিরাৎ আপত্তি করা উচিত।"

কিন্তু বাঙ্গালীর এই আপত্তি টিকল না। দেশের মধ্যে প্রতিবাদের তুফান বইতে শুরু করল। দেশের বহু শিক্ষিত ও সম্মানিত ব্যক্তি অভিযুক্তদের পিছনে দাঁড়ালেন। হাইকোর্টের প্রধান অনুবাদক শ্যামাচরণ সরকার, 'আর্যদর্শন' সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কলিকাতা হাইকোর্টের দোভাষী মিঃ ওয়েন, আসামীদের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। এডুকেশন গেজেট লিখল—'বইটি রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রচারক।' রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মত প্রকাশ করলেন যে নাটকটির উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কার করা। বইটি অশ্লীলতাদুষ্ট নয়। পলিটিক্যাল পাদ্রী, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন (হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৮৭৬)—

"It was a work which indicated a good deal of genius in the author and judging it only as a book without having seen its representation on the stage. I am bound to say, I have not detected any passage, whether obscene in itself or likely to suggest obscene ideas to the readers mind.

It is not a book that I could recommend for the perusal of boys and girls, but that is all I can say against it, and from a moral point of view, I could say as much against some of the novels of Sir Walter Scott himself.

The scene between the Magistrate and maid Bairajmohini appeared to be an imitation on the scene between the knight Templar and the Jewish maid; only the Bengali author makes the girl actuelly jump down and then he brought up stairs again, bleeding from the wounds she recieved by the fall."

কিন্তু কোনো বিশ্লেষণেই কিছু হল না। বিচার শুরু হল। ইংরেজ

রাজত্বে আইন ও মানবতার নামে প্রহসন আর একবার বাঙ্গালী লক্ষ্য করল। এই বিচার পুনরায় 'নীলদর্পণ' নাটক বিচারের প্রহসন দৃশ্যের অবতারণা করল। বিচারক মিঃ ডিকেন্স অশ্লীলতার অভিযোগে[৪] নাটকটিকে বাজেয়াপ্ত ও উদ্যোক্তাদের দোষী সাব্যস্ত করলেন। মুখ্য আসামীদ্বয়, উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালকে একমাসের কারাবাসে দণ্ডিত করা হল। সমস্ত ব্যাপারটি পর্যালোচনা করে অমৃতবাজার পত্রিকার ইংরেজি স্তম্ভে এক গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা বার হল। বাঙ্গালীর তেজস্বী মনোভাবের স্বাক্ষর এতে বজায় আছে। সমালোচনাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল—(অমৃতবাজার পত্রিকা : মার্চ ৯, ১৮৭৬)

"...Police Inspector Mr. Robertson, pronounced the play (Surendra Binodini) obscene···The case was conducted by Mr. Inspector Robertson who pronounced the play to be obscene, but the defence cited witness to prove that it was not so. The witness for defence were such men as Pandit Mohesh Chandra Nayaratna, the professor of Sanskrit College and one of the profoundests intellect in the country. Mr. Owen deservedly holds the post of the Chief Interpretor

---

৪ অভিযোগগুলি ছিল এই রকম—

(ক) "উপেন্দ্রনাথ দাস (পরিচালক) ও অমৃতলাল বসু (ম্যানেজার) ১৮৭৬ সালের ১লা মার্চ প্রকাশ্যভাবে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অশ্লীল নাটকের প্রযোজনা করিয়াছেন। অন্যান্য আসামীরা তাহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া সহায়তা করিয়াছেন। এই নাটকের অভিনয়ে, শাড়ীর সম্মুখভাগ রক্তাক্ত এমনি একটি বালিকাকে একটি সাহেব কর্তৃক বহন করানো হইয়াছে, এবং প্রমাণ করান হইয়াছে যে বালিকাটি সাহেব কর্তৃক ধর্ষিতা।"

(খ) নট অমৃতলাল বসু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেলের ভূমিকায় নিম্নলিখিত অশ্লীল মন্তব্য করিয়াছেন—

(১) "তোমার একটি সুন্দরী ভগ্নী আছে না? তাহাকে একদিন আমার শয্যায় পাঠাইয়া দিও। আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে স্বীকার আছি।"

(২) "সুন্দরী, আর বিলম্ব করিতে পারি না। এখনও মিষ্ট কথায় বলিতেছি। প্রণয়দানে সম্মত হও, তাহা না হইলে তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও..."

(৩) "সুন্দরী, আমার আলিঙ্গনের ভিতর এসো, আমাকে ভয় পাইতেছ কেন। আমি ব্যাঘ্রও নহি, ভল্লুকও নহি, শূকরও নহি, আমি তোমার প্রেম আস্বাদন করিতে চাই।"

Indian stage (vol. II) : H. N. Dasgupta ; pp. 284-285.

to Government. His command over our language is vast. Shyamacharan Sarker is an authority on the subject, whose authority is simply unimpeachable. All these gentlemen pronounced that there was no obscenity in the Book. But all these went for nothing. The opinion of Robertson prevailed though we are not aware whether he knows Bengalee at all. His only claim to pronounce a judgement in this case is that he is an Inspector, and an Inspector of the River Police ! Mr. Dickens the Magistrate, emphatically declared that it is obscene in 'MY OPINION'. And so the matter was settled. Nothing can shake 'my opinion,' though Pandit Mahesh Chandra Nayaratna may say that the opinion is wrong. An English Magistrate passes an opinion upon a Bengalee drama, a professor of Sanskrit and a native of Bengal holding the highest rank which it is possible for a native to hold pronounces the opinion to be wrong But nothing is like 'my opinion '···The actors were punished, because there were some such words as 'love' and 'lady'. Now we can never promise that we shall never make use of such and similar words. Then again nobody knows how far Mr. Inspector Robertson or Mr. Magistrate Dickens was prepared to carry the matter. The expression 'to taste the nector of love' as pronounced by Mr. Dickens as 'grossly obscene'. From this it would appear that if the above expression is grossly obscene, words such as—'nector', 'taste' and 'love' are at least obscene in the opinion of Mr. Dickens."

কিন্তু ইংরেজ শাসক বাঙ্গালীকে নতি স্বীকার করাতে পারলেন না। জাতিবৈর আরও অধিক হল, তীব্র এবং সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের কথা দেশের লোকেরা সক্রিয়ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। টাকা সংগ্রহের জন্য অভিনীত

হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক। জনগণকে আবেদন জানিয়ে বলা হল (১১ই মার্চ, ১৮৭৬)—

"Patrons and Countrymen, now or never is the opportunity to help us."[৫]

এই আহ্বানে জনগণ সাড়া দিল। উঠল অনেক টাকা। হাইকোর্টের আপীলে নেতৃত্ব দিলেন তখনকার দিনের প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র-বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'কে অশ্লীল প্রমাণ করা সম্ভব হল না। পরন্তু প্রকাশ পেল যে, পুলিশ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে 'চার্জশীট' তৈরী করেছে। হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিদ্বয় ফিয়ার ও মার্কবী, ২০শে মার্চ, ১৮৭৬, ঘোষণা করলেন যে পূর্বের দণ্ডাজ্ঞা সম্পূর্ণ বে-আইনী। উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল মুক্তি পেলেন সসম্মানে। বাঙ্গালীর সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়চেতনার জয় ঘোষিত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার প্রমাদ গুণলেন। শাসকশ্রেণী মনে করলেন, প্রকাশ্য বিচারালয়ে মামলা তোলবার সুযোগ নষ্ট না করলে নাট্যশালা ও নাটককে সহজে স্তব্ধ করা যাবে না। আর এ বিষয়ে উদ্যোগী হলেন সেই সময়কার আইন সচিব, হব হাউস। ইতিপূর্বে তিনি ১৫ই মার্চ ১৮৭৬, নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল সুপ্রিম লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে উত্থাপিত করে বললেন,

"A respectable Hindu gentleman holding a good position in society, one of the legal advisers of the Government and a member of the Legislative Council of Bengal gave an entertainment at his house, which some of the cast fellows disapproved. In order to punish him they got up a play in which this gentleman, though he had done nothing, but what was perfectly lawful, perfectly innocent, perfectly honourable was represented as deliberately, setting the honour of himself and his family, in order to get promotion and money.

It was the case, which induced H. E. the Viceroy to issue an Ordinance for the purpose of giving the Government of

৫ Indian Stage (Vol. II) : H. N. Dasgupta ; p. 283.

Bengal, power to control 'dramatic performance', and the bill which was framed on the model of this ordinance. I am seeking leave to introduce,"*

প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে মি. হব হাউস বললেন যে বাঙ্গলাদেশে নাটক অত্যন্ত প্রবলভাবে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। জনগণকে প্রকাশ্যভাবে রাজদ্রোহী করবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বাঙ্গলাদেশের নাট্যশালা ও নাটকগুলি। কারণ, তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, নানা জাতীয় অনুভূতিকে উদ্দীপিত করতে নাটকের ন্যায় শক্তিশালী উত্তেজক আর কিছুই নেই। সেই সময়ে 'চা-করদর্পণ' নামে একটি নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ভারতে চা-কুলীদের দুর্দশা, দেশের অর্থনৈতিক অবক্ষয়, পক্ষান্তরে বিদেশীদের সুউচ্চ মুনাফা এবং অত্যাচার, সমস্ত কিছু প্রকাশ করে এই নাটক গণচিত্তকে উত্তাল করে তোলে। এই নাটকের জনপ্রিয়তায় ইংরেজ সরকার প্রমাদ গোনেন। মি. হব হাউস 'চা-করদর্পণ' নাটকটিকে আক্রমণ করে লেখেন (১৬ই মার্চ ১৮৭৬, ইংলিশ ম্যান)—

"In the course of the last year a work was printed and published in the form of a drama entitled 'Chakardarpan Natak' which, he might state, meant the mirror of tea-planters Its object was to hold up as monsters of iniquity the class of tea-planters and all persons engaged in promoting emigration to the tea-planting districts that was to say, men as respectable as any other body of men in the empire. These gentlemen, who carried on their business with great advantage to all concerned and possibly with a greater portion of advantage to the labourers, they employed than to any one else, had held up to them what was called a mirror in which they were represented as indulging, by way of their ordinary occupation, the basest of passions—cruelty, avarice and lust. The play was, however, not acted but there it was. Written for the stage and adapted for it in every

* Englishman : March 16, 1876,

respect and without any prevantive power the Government had, it might be acted at any moment."

মি. হব হাউসের প্রয়াসকে ইঙ্গ-সম্প্রদায় আনন্দের সঙ্গে সমর্থন জানিয়েছিল। তাঁরা পুলিশ, মি. ডিকেন্স ও মহামান্য বড়লাটকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন—

"We thank the Viceroy, and we thank the police and Mr. Dickens, the Magistrate for such noble efforts to stem the tide of public immorality and corruption. We are glad to observe that Lord. North brook's action in the matter has been duly appreciated by the Native Community as the following resolution unanimously passed at the last meeting of the Indian Reform Association will testify: This meeting rejoices that in the interests of the public morality stringent and prompt measures have lately been adopted under the orders of the Viceroy for the suppression of obscene dramatic representations in Calcutta, and accords its warmest thanks to His Excellency the Viceroy."*

দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা জগদানন্দ বাবুর মতো রাজানুগৃহীত ছিলেন, তাঁরাই নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলটিকে স্তাবকের মতো সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী বাঙালীরা এই বিলের সমালোচনায় মুখর হন। অমৃত বাজার পত্রিকা লিখেছিল—(১৬ ডিসেম্বর, ১৮৭৬)

"We are really sorry to see such a piece of misrepresentation in the Sunday edition of the 'Mirror', which is usually devoted to repentence and prayer. Did it never occur to our contemporary that the opinions of the general community must always differ from those of reformers? For it they did agree what is the necessity of reformers and reforming societies at all? It would thus appear that from intrinsic evidence the statement is a misrepresentation.

* অমৃতবাজার পত্রিকা, মার্চ ১৬, ১৮৭৬।

It is moreover very funny to conclude from a resolution of a society the existance of which is unknown to the public, that the recent arbitrary acts of the Government have given universal satisfaction. It would help nobody to discuss whether the misrepresentation was deliberately made or not, but our contemporary ought to have know that the native community feels sorely the late arbitrary proceedings of the Governments, the Magistrate, and the Police ; and the people are really very much alarmed.……

Now we see how the police were made use of this new power ··Nobody can say that the vagaries of the police are not a fit subject for public representation ; but the police felt interested and exercised its power to prevent it. This though the Ordinance served the Government at one time, it did in fact unnecessarily and unjustly encroached seriously upon the liberities of the subject. Criminal laws regarding obscene an seditious representations are quite competent to deal in such cases, but as we said before laws are not competent to satisfy those who are despotically inclined ··but there is no ground why they should be punished for a crime they never committed or that Inspectors of Police should be turned into Judges of Bengalee dramas."

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ফিয়ার, যেদিন সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক বিচারের রায় দিয়ে উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসুকে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলেন, সেই দিনই আইন সচিব মি. হব হাউস নাট্য-নিয়ন্ত্রণ বিলটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পেশ করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা গঠিত এই কমিটি বিলটিকে নিরঙ্কুশ সমর্থন জানালেন। এই কমিটিতে একজন মাত্র ভারতীয় ছিলেন—রাজা নরেন দেব। এই বিলের বিরুদ্ধে জনমত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে' উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

থিয়েটারগুলির পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। কিন্তু জনমতকে উপেক্ষা করে কয়েকমাস পরে সেই সময়কার বড়লাট লর্ড লিটন বিলটিতে স্বাক্ষর দান করে আইনে পরিণত করলেন। এই কাজের প্রতিবাদ করে বাঙ্গলা অমৃতবাজার পত্রিকা লেখে (১৬ই ডিসেম্বর ১৮৭৬)—

"এই আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপর আর একটি শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে নির্জীব হইয়া আছি। গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমুদয় কার্য্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধহয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপস্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরেজ শাসনের ভ্রূকুটি তাহাদিগকে আর ভীত করিতে পারিবে না।"

ইংরেজ সরকার বাহাদুর নাটকের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার যে অভিযোগ তুলেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণভাবেই উদ্দেশ্যমূলক। কোনো নাট্যকার কোনো সময়েই কোনো রুচিহীনতার পরিচয় দেননি। কারণ তাঁরা জানতেন সমাজের ক্ষতি যাতে হয়, তা নাটক হয় না। নাট্যকারেরা ছিলেন প্রকৃত দেশসেবক। জীবন ও মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণ তাঁদের নাটকে অনেক ক্ষেত্রে ধরা না পড়লেও, দেশবাসীর চিত্তসংকট পূর্ণভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। নাট্যকারেরা কোনোদিনই সংকীর্ণ মতবাদ প্রচার করেননি। জাতিগঠনমূলক ঐক্যভাবনা প্রচারই তাঁদের কর্মের আদর্শ ছিল। নাট্যকারদের সকল প্রয়াসের সার কথা ছিল—কেবল বন্ধনমুক্তিই বিপ্লব নয়, পরবশতার শৃঙ্খল ছিন্ন করাই স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়; বিদেশী শোষণের অচলায়তন যেমন ভাঙতে হবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গড়বার শক্তিও অর্জন করতে হবে। দাসত্বের বন্ধনডোর যেমন ছিঁড়তে হবে, তেমনি দেশ ও জাতিকে নির্মাণ করতে হবে। আর জাতির সমস্ত শক্তি অন্তর্মুখী হলেই দেশগঠন সম্ভব। দেশবাসীর মানসিক পরিবর্তনের দিকে নাট্যকারেরা বেশি জোর দিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা জানতেন, স্বাধিকার আন্দোলনের প্লাবন সরে গেলেই সত্যকার জাতি গঠনের কাজ শুরু হয়। মানুষের মনে যদি রূপান্তরের পলিমাটি জমা থাকে, তবেই ঘটতে পারে রাষ্ট্র ও সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সফল হয় নবসংগঠন।

তাই বাঙ্গালী নাট্যকারেরা ছিলেন—Constructive Nationalist. স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলনকে সহায়তা করবার বলিষ্ঠ তাগিদ তাঁরা মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁদের রচনা অনেকাংশে আঙ্গিক দুর্বলতা নিয়েও ছিল একান্ত আন্তরিক ও প্রাণস্পর্শী। গণ-সচেতনতার জন্য নাট্যকারদের সক্রিয় প্রয়াস—ইংরেজ সরকারকে মনে প্রাণে আতঙ্কিত করেছিল। জনজাগরণ বন্ধ করবার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা নাটক ও নাট্যশালা দমনে খড়্গপাণি হয়েছিলেন। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক ও 'গজদানন্দ' প্রহসনের উপর হস্তক্ষেপ, অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ করবার অজুহাত মাত্র। ইংরেজ সরকার ঐ সময়ে কোনো না কোনো কারণ দেখিয়ে অবশ্যই নাটক ও নাট্যশালার কণ্ঠরোধ করতেন।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের অনুলিপি

২

Act No. XIX of 1876. (16th December 1876)

AN ACT FOR THE BETTER CONTROL OF PUBLIC DRAMATIC PERFORMANCES.

Preamble.

Whereas it is expedient to empower the Government to prohibit public dramatic performances which are scandalous, defamatory, seditious or obscene ; it is hereby enacted as follows :—

Short title
Local extent.

1. This Act may be called the Dramatic performances Act, 1876. It extend to the whole of British India.

Magistrate defined.

2. In this Act 'Magistrate' means, in the presidency-towns, a Magistrate of Police, and elsewhere the Magistrate of the District.

Power to prohibit ertain dramatic performances.

3. Whenever the Local Government is of opinion that any play, pantomime of other drama performed or about to be performed in a public place is—

(a) of a scandalous or defamatory or

(b) likely to excite feelings of disaffection to the Government establised by law in British India, or

(c) likely to deprave and corrupt persons present at the performance.

The Local Government, or outside the presidency-towns and Rangoon the Local Government or such Magistrate as it may empower in his behalf, may by order prohibit the performance.

Explanation—Any building or enclosure to which the public are admitted to witness a performance on payment of money shall be deemed a 'public place' within the meaning of this section.

Power to serve order of prohibition. Penalty for disobeying order

4. A copy of any such order may be served on any person about to take part in the performance so prohibited,or on the owner or occupier of any house, room or place in which such performance is intended to take place; and any person on whom such copy is served, and who does, or

willingly permits, any act in disobedience to such order, shall be punished on conviction before a Magistrate with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

Power to notify order.

5. Any such order may be notified by proclamation, and a written or printed notice thereof may be struck up at any place or places adapted for giving information of the order to the persons intending to take part in or to witness the performance so prohibited.

Penalty for disobeying prohibition.

6. Whenever after notification of any such order :—

(a) takes part in the performance prohibited thereby or in performance substantially the same as the performance so prohibited, or

(b) in any manner assists in conducting any such performance, or

(c) is in wilful disobedience to such order present as a spectator during the whole or any part of any such performance, or

(d) being the owner or occupier, or having the use of any house, room or place, opens, keeps or uses the same for any such performance, or permits the same to be opened, kept or used for any such performance,

Shall be punishable on conviction before

a Magistrate with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

Power to call for information.

7. For the purpose of ascertaining the character of any intended public dramatic performance, the Local Government, or such officer as it may specially empower in this behalf, may apply to the author, proprietor or printer of the drama about to be performed, or to the owner or occupier of the place in which it is intended to be performed, for such information as the Local Government or such officer thinks necessary.

XLV of 1860.

Every person so applied to shall be bound to furnish the same to the best of his ability, and whoever contravenes this section shall be deemed to have committed an offence under section 176 of the Indian Penal Code.

Power to grant warrant to police to enter and arrest and seize.

8. If any Magistrate has reason to believe that any house, room or place is used, or is about to be used, for any performance prohibited under this Act, he may, by his warrant, authorise any officer of Police to enter with such assistance as may be requisite, by night or by day, and by force, if necessary, any such house, room or place, and to take into custody all persons whom he finds therein, and to seize all scenery, dresses and other articles found therein, and reasonably suspected to have been used, or to be inten-

ded to be used, for purpose of such Performance.

Saving of prosecutions under Penal Code, Sections, 124A and 294. XLV of 1860.

9. No conviction under this Act shall bar a prosecution under section 124 A or Section 294 of the Indian Penal Code.

Power to prohibit dramatic performance in any local area, except under license.

10. Whenever it appears to the Local Government that the provisions of this section are require in any local area, it may declare, by notification in the local official Gazette, that such provisions are applied to such area from a day to be fixed in the notification.

On and after that day, the Local Government may order that no dramatic performance shall take place in any place of public entertainment within such area, except under a license to be granted by such Local Government, or such officer as it may specially empower in this behalf.

The Local Government may also order that no dramatic performance shall take place in any place of public entertainment within such area, unless a copy of the piece, if and so far it is written, or some sufficient account of its purport, if and so far as it is in pantomime, has been furnished, not less than three days before the performance, to the Local Government, or to such officer as it may appoint in this behalf.

A copy of any order under this section may be served on any keeper of a place of public entertainment; and if thereafter he does or willingly permits any act in disobedience to such order, shall be punishable on conviction before a Magistrate with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fines or with both.

Power exercisable by Governor-General.

11. The powers conferred by this Act on the Local Government may be exercised also by the Governor General in Council.

Exclusion of performances at religious festivals.

12. Nothing in this Act applies to any Jatras or performances of a like kind at religious festivals.

তৃতীয় ভাগ

যৌবনমুক্তি পর্ব (১৮৮৫—১৯১৪ খ্রীঃ অঃ)

পূর্বকথা

'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' বাঙ্গলা নাটক ও নাট্যশালার কণ্ঠরোধ করতে পারল না। প্রকাশ্যভাবে ইংরেজ রাজপুরুষদের আক্রমণ ও তাঁদের শাসনরীতির সমালোচনা বন্ধ হয়ে গেলেও বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার প্রচার ত্যাগ, প্রেম, মৈত্রী ও ঐক্যভাবনায় ঋদ্ধ হয়ে সমানভাবে ব্যক্ত হতে লাগল। স্বাদেশিকতার যৌবনমুক্তি পর্বে (১৮৮৫—১৯১৪) বাঙ্গলাদেশে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাঙ্গালীর 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন পরিচালনা ও সাফল্য অর্জন। বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও চেতনা এই সময়ে সম্পূর্ণ পরিণত রূপ লাভ করে। বিভিন্ন সভাসমিতি ও বক্তৃতায় যে রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল, বাঙ্গলা নাটকের উপর তার প্রভাব পড়তে শুরু করে। দেশাত্মবোধের প্রেরণায় বাঙ্গালী পৌরাণিক চিন্তার ভাবমার্গী পথ পরিত্যাগ করে সংঘাতপূর্ণ জীবনকেই সাহিত্য সাধনার বিষয়বস্তু হিসাবে বরণ করেছিল। এর ফলে জন্মগ্রহণ করল স্বাদেশিক ভাবাদর্শে পুষ্ট ঐতিহাসিক নাটক। বাইরের সংঘাত, যা জীবনের তিমির প্রদেশে প্রবেশ করে চিত্তের বিক্ষুব্ধতাকে নিটোল করেছিল, সেই আহত বেদনাই অতীতের দূর ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর অন্তরালে প্রকাশিত হতে শুরু করল। স্বাদেশিকতার বয়ঃসন্ধিপর্বে (১৮৬১—১৮৮৪) কিছু ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছিল। মধুসূদন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক নাটক আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাতে পরাধীনতার বেদনার প্রকাশ থাকলেও বিরোধিতার সুতীব্র বিদ্বেষ নেই। এ ছাড়া সে সময়ে জাতির স্বদেশচিন্তা ও মুক্তিকামনা অনেকাংশে প্রকৃত পথের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের আবর্তে বারবার ঘুরপাক খেয়েছে। এই অন্বেষণ বাঙ্গলা নাটকের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। বিশেষভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে পরাধীনতার যত জ্বালা আছে, বিদ্বেষানলের উৎসার আছে,—ততখানি স্থায়িত্ব নেই। এরই ফলে বয়ঃসন্ধিপর্বের ঐতিহাসিক নাটকগুলির আয়ুষ্কাল হয়েছে সীমিত। যৌবনমুক্তি পর্বে ঐতিহাসিক নাটক ভাবালুতা ত্যাগ করে বাস্তবের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল; এবং এরই ফলে ক্রমাগত অভিনয় সাফল্য ইংরেজ

সরকারকে বাধ্য করেছিল অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে বাজেয়াপ্ত ও তার অভিনয় বন্ধ করতে। অবশ্য এ সমস্তই বিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের ঘটনা।

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চে স্বাদেশিক আদর্শের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসগুলি নাটকাকারে মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং ক্রমাগত অভিনয় সাফল্যের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর 'নেশন' বা জাতিগঠন মনোভাবকে করেছিল সুদৃঢ়। স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' এই সময়ে নাট্যমঞ্চ থেকে দিকে দিকে বিদ্যুৎ বহ্নির মত ছড়িয়ে পড়ে। 'আনন্দমঠে' দেশমাতৃকার অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপের পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন এবং দেশাত্মবোধের গভীর ভাবধারা স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদের তীব্রভাবে আন্দোলিত করে। এ ছাড়া 'সীতারাম' উপন্যাসে শ্রীর যে উক্তি, 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে' ? ও 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে গীতার নিষ্কাম কর্মসাধনার ভিতরে ভবানী পাঠক ও তাঁর দলের যে মুক্তিকামী স্বদেশহিত ব্রত, সমস্ত কিছুই রোমান্টিক আবেগে বাঙ্গালীর ভাব ও ভাবনাকে নতুন প্রত্যয়ে অভিষিক্ত করেছিল। যে বিপুল জীবনাবেগ বাঙ্গালী যৌবনমুক্তি পর্বে; আপন কল্পনায়, অনুভূতির তীব্রতায় প্রতি শিরা ও স্নায়ুতে উপলব্ধি করেছিল, তার গতিবেগ দিয়েছিলেন স্বাদেশিকতার ঋত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গলা নাটকের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যেন আর একবার নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেন। স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে পরবর্তীকালে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে 'পলিটিক্যাল গুরু' বলে অভিবাদন জানিয়েছেন।* কারণ, তিনি দেশ-প্রীতিকে ভারতের সনাতন ধর্মাদর্শের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলেন। এবং এরই জন্য 'আনন্দমঠে'র স্বাধীনতাকামী সন্তান সম্প্রদায়ের একহস্তে অস্ত্র ও অন্য হস্তে গীতা, তিনি তুলে দিয়েছিলেন। আর তারই ফলে ধর্ম ও রাজনীতি এক ঐক্য-রাখীতে আবদ্ধ হয়েছিল। তাই যৌবনমুক্তি পর্বে বাঙ্গালীর স্বাদেশিক

* "This is second great service of Bankim to his country that he pointed out to it the way of salvation and gave it the religion of patriotism, of the new spirit which is leading the nation to resurgence and independence, he is the inspirer and political Guru."

বঙ্কিম প্রসঙ্গ (পরিশিষ্ট-২) : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ; পৃ. ১৫ (১৯২১)।

চিন্তা ও স্বাধীনতা আন্দোলন কেবল নিছক রাজনৈতিক বিদ্রোহ ছিল না ; এক ধর্ম-বিপ্লব যেন জাতির সামগ্রিক অভ্যুত্থানের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। স্বাদেশিকতার এই উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রচার বাঙ্গলা নাটক ও নাট্যশালার মাধ্যমে চালান হয়েছিল। বিংশ শতকের সূচনাকাল থেকে বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে কর্মচাঞ্চল্যের যে সাড়া পড়েছিল, তা রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিসীমা অতিক্রম করে বাঙ্গলা নাটককে যেমন প্রভাবান্বিত করেছিল, তেমনি অপর দিকে জাতীয় আন্দোলনকে জনসাধারণের কাছে আবেগমুখর ও বরণীয় করে তুলেছিল বাঙ্গলা নাটক ও তার প্রাণবন্ত অভিনয়। সেদিন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে বাঙ্গলা নাটক ও নাট্যশালা এক বৃহত্তর জাতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে। এ বিষয়ে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ঐতিহাসিক যথার্থ মন্তব্যই করেছেন,

"Our country remembers that to the great national sorrow, Bengal was partitioned in 1905 and the agitation inaugurated, and the Swadeshi Movement started stirred the whole country from one end to the other. Meetings and processions help in propaganda to a certain extent only, but can not continue for long and unless there is a solid background, no movement can last. The above movements too would have proved short-lived, were not the aforesaid dramas produced at that time. At such time of the greatest need, these dramas acted like a great inspiration, and changed the servile mentality of the people. In fact at the time of the Swadeshi Movement what hundred lectures could not do, was accomplished by one single performance of Serajuddoula or Mirkasem,"[১]

কেবল গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'মীরকাসিম', অথবা 'ছত্রপতি' নয়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকগুলি সম্পর্কেও ঐ একই মন্তব্য করা যেতে পারে। জাতির এই চরম

১ Indian Stage (vol. iv): H. N. Dasgupta; p. 58.

দুর্গতির দিনে প্রত্যেক নাট্যকার দেশমাতৃকার ঋণ পরিশোধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সমকালের যুগচিন্তার অনুলিপিটি ছিল এই রকম,

"বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হওয়াতে সাহিত্যিকগণ নূতন ধরণের নাটক রচনার প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলেন। বাংলা দেশের জাতীয় জীবনে যে নূতন আত্মচেতনা আসে, তাহা বিংশ শতকের শুরু হইতে এমন-কি তাহার পূর্ব হইতেই সাহিত্যের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। নাটকে ও রঙ্গমঞ্চে তাহার প্রথম প্রতিক্রিয়া হইল…। রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাটে'র নাট্যরূপ 'বসন্ত রায়' আবার এই সময়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইল (১৯০১ এপ্রিল ৬)। এ কথা বলিলে বোধ হয় দুঃসাহসিকতা হইবে না যে, 'বসন্ত রায়' বাংলার প্রতাপাদিত্যকে বাংলার শেষ বীররূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নাট্যকারগণকে উদ্‌বোধিত করে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' (স্টারে ১৯০৩ অগস্ট ১৫)…স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই অভিনীত হয়।…দেশের মধ্যে এই শ্রেণীর নাটকের চাহিদা দেখা দিলে, দ্বিজেন্দ্রলালও এই দিকেই ঝুঁকিলেন।"[২]

স্বাদেশিকতার যৌবনমুক্তি পর্বে নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটকের পটভূমিকায় বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করেছিলেন। বাঙ্গালীর লুপ্তপ্রায় বীর্য ও বাহুবলের কাহিনী উদ্ধার করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাঁরা প্রয়াসী হন। স্বদেশপ্রেমিক দেশনেতা ও নায়কদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বীরত্ব গাথার সঙ্গে তুলে ধরেন তাঁদের সমকালীন বাঙ্গলা দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র এবং প্রচার করেন আত্মনির্ভরতার মহামন্ত্রে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের মত ও পথ। এই সময়ে নাট্যকারেরা ইংরেজ সরকারের সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতিকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁরা অনেক সময়ে ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করতেও পিছপা হননি। অবশ্য সে সময়ে বাঙ্গলা দেশের ঐতিহাসিকেরাও নানান দিক থেকে দেশের ইতিহাসের নব পর্যালোচনা শুরু করেছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ছিলেন এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী। যুগালোকের সম্পাতে ইতিহাস বিচিন্তাতে যে

২ রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয়খণ্ড). প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ; পৃ. ৩০৪-৩০৫।

নতুন সুর লেগেছিল, তাই নাট্যকারদের মনোভূমিকে করেছিল অনুরণিত; এবং এই অনুরণন তাঁরা নাটকে ধরে রাখেন। নাট্যকারেরা জাতীয় হিতবাদ ও স্বাদেশিকতার আদর্শ যে ভাবে প্রচার করেছিলেন, তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিল। ইংরেজ সরকার 'বন্দেমাতরম্' ও 'আমার দেশ' গানের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের, 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের, 'দাদা ও দিদি', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' ও 'নন্দকুমার' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণাপ্রতাপ' নাটকগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে প্রকাশনা ও অভিনয় বন্ধ করে দিলেন।* স্বদেশী যাত্রাতেও

* SEDITION IN TALKING MACHINES :—

"It is reported that the Government of India have decided to take action in the matter of alleged seditious songs and speeches which are being circulated through the medium of talking machine,records, and that warnings are being issued to dealers not to trade in certain records of which the names are given, The further warning is added that it, after the receipt of the notice any persons are detected selling the records, they will be prosecuted,

One of the proscribed records is the Bengali song 'Amar Desh' (My Country) said to have been reproduced before Sir Lancelot Hare, Lieutenant Governor of Eastern Bengal, Assam recently. Another series of records are selections from 'Seraj-ud-Dowlah', and some speeches delivered in connection with the Partition of Bengal. It has been reported to the Government that some of the songs and selections reproduced on records are highly seditious, and that they have been frequently used at functions at which European officials, not ignorant of the vernaculars, have been present." Statesman : December 7, 1908.

অন্য আদেশনামাটি ছিল এই রকমের :—

"The Commissioner of Police has just pohibited Gramophone Companies from reproducing 'Amar Desh,' 'Bandematram' and such other songs and ordered all such records to be destroyed. Conductors of theatres, too, one said to have been ordered to remove such songs from all pieces staged by them. Two songs in 'Jiban Sandhya', the new play at the Star, have been taken exception to and stopped, Moreover, pieces like 'Siraj-ud-Dowlah', 'Mirkasim', 'Chatrapati', 'Durgadas", 'Dada-o-Didi', 'Nanda Kumar', 'Jiban Sandha' are about to be re-examined by the Police and objectionable passeges from them taken out." Amrita Bazar Patrika : December 11, 1908.

জাতীয়তার প্রভাব হয়েছিল দুর্নিবার। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন,—ভূষণ দাস, মুকুন্দ দাস, নীলকণ্ঠ, মথুরা সাহা ও শঙ্কর চক্রবর্তী। ভূষণ দাসের 'মাতৃপূজা' ও 'শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ', মথুরা সাহার 'পদ্মিনী' ও 'ভরতপুরের দুর্গবিজয়' এবং মুকুন্দ দাসের সমস্ত পালাগানের মধ্যে দেশাত্মবোধের যে রক্তরাগ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ইঙ্গ-সরকার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বিশেষভাবে ভূষণ দাস ও মুকুন্দ দাসের নাটকগুলি রাজরোষে ভস্মীভূত হয়। ভূষণ দাসের 'শুম্ভ-নিশুম্ভবধ' ইংরেজ শাসকদের কাছে আতঙ্কের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে এ বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে :

"Then on the 11th November, the well-known Bhusan Das party played 'Shumba-Nishumba Badh' in day time, and though nothing happened that day, they came in the afternoon and told the organisers that they would not be permitted to hold any further 'jatras'. At the same time the performers themselves were served with a notice under section 108, Cr. P. Code to show cause why they should not be bound down and not enter into personal recognisances for performing seditious plays. In the evening Maharaja saw the Magistrate and explained matters to him, when the latter personally could see no reason why there should no 'jatras', but all the same he wired the Divisional Commissioner for orders which were received that very night. Meanwhile the 'Jatra' party shewed cause explaining how the piece had been performed two years before at the Calcutta Industrial Exhibition and elsewhere, but had no where been taken exception to. The police, however, protested that the play had been stopped at Calcutta ; and so the District Superintendent at once wired to the Commissioner of Calcutta enquiring about the matter. In reply the Commissioner said that the piece had not been

interdicted in Calcutta. The matter then again came before the Magistrate; when the Public Prosecutor Maulavi Mahomed Ismail, on behalf of the Police made the astounding remark that in this incident from the Ramayana the English had been represented as 'Asurs', and that the book had been written with an eye to the present unrest. It never occured to him that a book written two years or more before, could not possibly deal with the present situation. After hearing both sides, the Magistrate promised to pass a written judgement. When the matter was again broached before the Magistrate, a fresh charge was preferred against the 'jatra' party in that they had stopped the play on the day of Kanailal's executions as a mark of honour and grief. The accused urged that they had no engagement on the day in question, and that they were quite willing to expunge any portion that the police might indicate as seditious. But their prayer was not heard and the fiat went forth that they would not be permitted to play anywhere in Mymensing."[৩]

স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ নিয়ে বাঙ্গলা নাটক ও স্বদেশী যাত্রার পালাগানগুলি জনচিত্তে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, যা সেই সময়কার জনগণকে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছায় অধীর করে তোলে। বাঙ্গালী, বাঙ্গলা নাটক থেকে আর অন্য কিছু প্রত্যাশা করত না। যে সংগ্রামী মনোভাব দেশবাসীর বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল, রঙ্গশালা ও নাটকে তারই প্রতিফলন দেখতে সবাই ছিলেন উদ্‌গ্রীব। বিদেশী শক্তির সঙ্গে বিরোধ বা সংঘাতের চিত্র দেখলেই তাঁদের ধমনীতে রক্ততরঙ্গ উচ্চবেগে প্রবাহিত হত। তারই ফলে বাঙ্গলা নাটক হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিলিপি। যা হোক্ বাঙ্গলা নাটকে বাঙ্গালীর যৌবন দীপ্তির উজ্জ্বল পরিচিতিটুকু বুঝতে হলে, জাতির জাগরণীচিন্তা ও কর্মের বিভিন্ন দিককে সংক্ষেপে উপলব্ধি করতে হবে। এখন সেই সংবাদই গ্রহণ করা যাক্।

৩ Amrita Bazar Patrika : December 1, 1908.

এগার

বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার মুক্তি

১

সূচনা

বাঙ্গালীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিকচেতনা ইংরেজ সরকারকে কেমন বিচলিত করেছিল, তার সংবাদটি আমাদের কাছে পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সুপরিস্ফুট হয়েছে। ইংরেজেরা সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের রাজনৈতিক আন্দোলনকে রাজবিদ্রোহ হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপন অবসর গ্রহণ করলে, সমগ্র ভারতবর্ষ অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিল। ভারতবাসীর এই রাজপ্রীতি ইংরেজদের ভাল লাগেনি। সেই সময়কার ভারতের রাজস্ব-সচিব স্যার অকল্যাণ্ড কলভিন্, 'If it be real, what does it mean' পুস্তকে প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করলেন যে, এরূপ ব্যাপার ভারতে ক্রমাগত অব্যাহত থাকলে দেশে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হবে। তাই বিদ্রোহের আওতা থেকে ভারতবাসীদের মনকে সরিয়ে এনে ইংরেজদের অনুকূলে কেবলমাত্র আবেদন-নিবেদন নীতিতে দাবি-দাওয়া জ্ঞাপনের জন্য অ্যালেন অক্টোভিয়াস হিউম, লর্ড ডাফরীণের পরামর্শে 'কংগ্রেস' (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেছিলেন।

কংগ্রেস প্রথম দিকে ইংরেজদের মিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ব্রিটিশ ভারতে স্থায়ী বিরোধী দল রূপে পরিচিত হলেও, প্রথম দিকে ইংরেজ প্রীতিই ছিল এই রাজনৈতিক সমিতির স্থির লক্ষ্য। কংগ্রেসের এই তোষণ-নীতি বাঙ্গালী কোনদিনই প্রীতির চোখে দেখেনি। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদা ও নিম্ন সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ প্রথম দিকে কংগ্রেসের কর্ম-সূচীতে কখনও স্থান পায়নি। এ ছাড়া বোম্বাইয়ে, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালী আমন্ত্রিত হননি। এমন কি আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁরা এই সময়ে সর্বভারতীয় নেতারূপে

অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তাঁদেরও প্রথম অধিবেশন থেকে বাদ দেওয়া হয়। কারণ তাঁরা প্রকাশ্যভাবে ব্রিটিশ শাসকদের শাসন নীতির কঠোর সমালোচনা করতেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও নিখিল-ভারত জাতীয় সম্মেলনে বাঙ্গালীর ঠাঁই নাই দেখে, রবীন্দ্রনাথ সখেদে মন্তব্য করেছিলেন,

"পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কই রে বাঙ্গালী কই !"[১]

কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতি, ইংরেজ-প্রশস্তি, পরনির্ভরতা ও স্বদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষা বাঙ্গালীকে বিষম ব্যথিত করেছিল। 'নবভারত' পত্রিকা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লেখেন,

"কোন কোন প্রেসিডেন্টের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে, 'কংগ্রেস' ইংরেজি শিক্ষিতদের সভা। ইহা সত্য এবং প্রকৃত। অতঃপর সে সত্য ও প্রকৃত বাক্যে (কার্য্যে হইয়াছে ও হইতেছে), ব্যক্ত ও ঘোষিত হওয়া উচিত, তাই, এই কংগ্রেস শিক্ষিত ও ধনীদিগের বৈষয়িক স্বার্থের প্রতিনিধি। কংগ্রেস কৃষিজীবী রায়তদের জমি-জমা সম্বন্ধীয় স্বার্থের প্রতিনিধি নহে—এই একটি মাত্র কথা কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রকাশ্য ও বিশ্বস্তভাবে ব্যক্ত হইলে অনেক গোল মিটিয়া যায়।"[২]

যা হোক্, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ পরবর্তী দ্বিতীয় অধিবেশনের পূর্বে একটি মহাসত্য উপলব্ধি করেন যে, বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী নেতাদের বাদ দিয়ে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন রচনা সম্ভব নয়। তাই যথার্থ স্থান হিসাবে কলকাতাকেই তাঁরা নির্দিষ্ট করেন। কলকাতাতে এই অধিবেশন কি রকম উত্তাল হয়েছিল তার সংবাদ আমরা পূর্বেই গ্রহণ করেছি 'সোম-প্রকাশ' পত্রিকার প্রতিবেদনে। কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলনে জাতির উদ্দেশ্যে যেটুকু দাবি ও প্রয়োজনের কথা তুলে ধরা হয়েছিল, তাতেই ইংরেজ সমাজ আতঙ্কিত হয়ে উঠেন। লর্ড ডাফরীণ অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লেখেন,

"I cannot help expressing my regret that they should seem

১ দ্রঃ রবীন্দ্রজীবনী (১ম): প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; পৃঃ ২০১।
২ নব ভারত: ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়; মাঘ, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।

to consider such momentous topics, concerning as welfare of millions of their fellow-subjects, as beneath their notice, and that they should have concerned themselves instead with matters in regard to which their assitance are likely to be less profitable. It is still greater matter of regret to me that the members of the Congress should have become answerable for distribution—as heir officials have boasted—amongst thousands and thousands of ignorant and credulous men of publications animated by a very questionable spirit, and whose manifestation is to excite the hatred of the people aganist the public servants of the Crown in this country. Such proceedings as these, no Government could regard with indifference."[৩]

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময়কাল থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা চরমে পৌঁছেছিল। ব্রিটেন থেকে ভারতে আমদানী পুঁজির পরিমাণ, রপ্তানী পুঁজির পরিমাণের চেয়ে ছিল অনেক বেশি। আর এই সময়ে এশিয়া ও ইউরোপের যুদ্ধের যাবতীয় খরচ, ভারতবাসীর উপর বিভিন্ন কর ও ঋণের বোঝা হিসাবে চাপিয়ে জোর করে আদায় করা হত। এছাড়া, সমগ্র ভারতব্যাপী রেলপথ নির্মাণ, যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা ও অন্যান্য পরিকল্পনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যের জন্য সমস্ত ব্যয়ভার ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণ এদেশের অধিবাসীর স্কন্ধে চাপিয়ে দেন।[৪] এইভাবে দেশের অর্থশোষণ ছিল অব্যাহত; এবং এর ফলে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য বিনষ্ট হয়ে যায় ও ভারতের দৈন্যদশা চরমে দাঁড়ায়। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ১৮ বার এবং শেষ দশ বৎসরে দুর্ভিক্ষে প্রাণনাশ ঘটেছিল প্রায় দু'কোটি লোকের।[৫] দেশের সাধারণ মানুষের চারিত্রিক শক্তি, নৈতিকবল ও বিবেককে নষ্ট করে দেবার জন্য ইংরেজ সরকার, মদ ও মাদক দ্রব্য ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করেন; এবং এর ফলে

৩ দ্রঃ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া: প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১১৪।

৪ India To-day : R. P. Datta ; pp 296-311.

৫ নবভারত: পৌষ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

ভারতবর্ষের গ্রাম-গঞ্জ, শুঁড়িখানা ও মদ্যশালাতে ছেয়ে যায়।[৬] কিন্তু এত অনিষ্ট সাধনের পন্থা আবিষ্কার করেও ইংরেজ সরকার জাতির মনোবলকে ভাঙ্গতে পারলেন না। ভারতবাসীর আত্মসংরক্ষণ ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। এ সময়ে বোম্বাই প্রদেশে প্রচণ্ড আকারে মহামারী রূপে প্লেগ দেখা দিয়েছিল। বিদেশী সরকার জনকল্যাণ চিন্তা ও মহামারী প্রতিকারের কোন চেষ্টা না করে নিদারুণ নির্যাতন চালিয়েছিলেন। এর জন্য মহারাষ্ট্রবাসীরা ইংরেজের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে সেখানে গুপ্ত সমিতিগুলি অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠে। মহারাষ্ট্রে 'শিবাজী উৎসব' ও 'গণপতি মেলা'র প্রচলন হয়েছিল এই সময়ে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আদেয়ার রণাঙ্গণে কৃষ্ণকায় আবেসিনিয়দের কাছে ইতালীর পরাজয় ঘটে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে। শ্বেতজাতির এই পরাজয় ভারতের চিন্তাশীল মনীষীদের অত্যন্ত উৎসাহী করে তোলে। আত্মশক্তির জাগরণে ভারতবর্ষে যে অনুরূপ ঘটনা ঘটানো সম্ভব, এই মর্মে তাঁরা প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন। ঠিক এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববিজয় ভারতবাসীকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। দাক্ষিণাত্যের ভীষণ দুর্ভিক্ষে জনগণের হয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, মহামতি বাল গঙ্গাধর তিলক। তাঁর বিচারকালে দেশবাসীর কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ হয়েছিল—'সিডিশন্ বিল'। এর সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন,

"আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধ করি নির্বোধও নহি, উদ্যত রাজদণ্ডপাতের দ্বারা দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যুর ইচ্ছাও আমার নাই; কিন্তু আমাদের রাজকীয় দণ্ডধারী পুরুষটি ভাষার ঠিক কোন্ সীমানায় ঘাঁটি বাঁধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা আমি স্পষ্টরূপে জানি না,—এবং আমি ঠিক কোন্খানে পদার্পণ করিলে শাসনকর্তার লগুড় আসিয়া আমাকে ভূমিশায়ী করিবে তাহা কর্তার নিকটও অস্পষ্ট,—কারণ কর্তার নিকট আমার ভাষা অস্পষ্ট, আমিও নিরতিশয় অস্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতই তাঁহার শাসনদণ্ড আনুমানিক আশঙ্কাবেগে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া দণ্ডবিধির ন্যায়সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক আকস্মিক উল্কাপাতের ন্যায় অযথা স্থানে দুর্বল জীবের অন্তরিন্দ্রিয়কে অসময়ে সচকিত করিয়া তুলিতে পারে।

---

৬ India in Bondage : J. T. Sunderland ; p. 131.

…অতিদূরে রুশিয়ার পদধ্বনি অনুমানমাত্র করিলে তাঁহারা কিরূপ চকিত হইয়া উঠেন তাহা আমরা বেদনার সহিত অনুভব করিয়াছি। কারণ, প্রত্যেকবার তাঁহাদের সেই হৃৎকম্পের চমকে আমাদের ভারতলক্ষ্মীর শূন্যপ্রায় ভাণ্ডারে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, আমাদের দৈব-পীড়িত কঙ্কালসার দেশের ক্ষুধার অন্নপিণ্ডগুলি মুহূর্ত্তের মধ্যে কামানের কঠিন লৌহপিণ্ডে পরিণত হইয়া যায়,—সেটা আমাদের পক্ষে লঘুপাক খাদ্য নহে।

…ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সচকিত ভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ-প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না—আমরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর !"[৭]

এইভাবে প্রত্যক্ষ সমালোচনার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে দেশবাসীর বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল। ভারতবাসীর সমস্ত দাবীকে তাঁরা নিদারুণভাবে উপেক্ষা করলেন। এক নতুন চেতনা ও ভাবধারাতে ভারতবাসী চাইল স্বাবলম্বী হতে। এরজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল, স্বদেশী শিল্পের প্রসার ও জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। বিংশ শতকের শুরু থেকেই বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে এই সমস্ত ইচ্ছার কার্যাবলী বাস্তব রূপ নিতে শুরু করল।

স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী

২

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এক আন্তর্জাতিক শিল্পমেলার আয়োজন হয়। পৃথিবীর বিভিন্নস্থান থেকে নানারকম শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রী এই মেলাতে আসে। কলকাতায় এই শিল্পপ্রদর্শনীটি বাঙ্গালীর চিত্তে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের ন্যূনতা ও অভাব লক্ষ্য করে বঙ্গবাসী ক্ষোভের সঙ্গে লেখেন,

৭ ভারতী : বৈশাখ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।

"পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই দ্রব্যজাত আসিয়াছে, কিন্তু…ইংলণ্ড হইতে যত দ্রব্য আসিয়াছে তাহার তুলনায় অন্যান্য দেশের নাম না করাই ভাল। কলকারখানা প্রদর্শনে ইংলণ্ড অদ্বিতীয়, ভারতে কল নির্ম্মাণের সকল উপকরণই আছে, কল নাই। যদি পরাধীনতার বিষময় ফল দেখিতে চাও, তবে একবার ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের কলকারখানা আর ভারতের খনিজদ্রব্যগুলি দেখিবার জন্য প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিও। যদি প্রদর্শনী স্বদেশের দুরবস্থা প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত না করে তবে প্রদর্শনী বৃথা হইল।……পৃথিবীর সকল স্থানের উৎকৃষ্ট জিনিস একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ভারতের মত এমন কারুকার্য্য সম্পন্ন জিনিস কোথায় দেখিবে? ভারতবাসী না পারে এমন কার্য্যই নাই।… ভারতবাসী যদি স্বদেশানুরাগী হইতে পারেন, তবে প্রদর্শনীর জন্ম সার্থক হইবে।"[৮]

দেশে যাতে স্বদেশী শিল্পের প্রসার ঘটে, বাঙ্গালী তথা সমস্ত ভারতবাসী স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে যাতে বিদেশ থেকে রপ্তানীজাত শিল্প-সামগ্রীকে পরিত্যাগ করতে ব্রতী হয়, এই মর্মেও প্রচার চালান হয়েছিল আতিশয্য সহকারে। ভারতের খনিজ সম্পদ, শিল্পজাত দ্রব্য ও কারিগরগণ যে কত উচ্চ মানের, সে সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছিল।

"ভারতের পল্লীতে পল্লীতে কত উৎকৃষ্ট কারিগর আছে কে তাহার খোঁজ লয়? কেবা তাদের জিনিস কেনে? বিলাতী জিনিস ক্রয় না করিয়া দেশোৎপন্ন জিনিস কিনিলে অল্প পয়সায় ভাল জিনিস পাওয়া যাইতে পারে, দেশের টাকা দেশে থাকে, ইংরেজের উদরে না যাইয়া গরীব ভারতবাসীর উদর পূর্তি করে।

রজার্সের ছুরি কাঁচি অপেক্ষা বর্দ্ধমানের প্রেমচাঁদ কর্ম্মকারের ছুরি ও কাঁচি কোনও অংশে হীন নহে, অথচ দাম কম। ভবানীপুরের তিনকড়ি নন্দনের অস্ত্র-চিকিৎসাযন্ত্র, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি বিলাতী কারিগর অপেক্ষা খারাপ নহে, অথচ কেবা তাহার নাম জানে? কেবা তার জিনিস কেনে? আমরা এমনই হতভাগ্য হইয়াছি যে বিলাতী মেকী জিনিসও দেশী ভাল জিনিস অপেক্ষা ভালবাসি। আমাদের অধঃপতনের আর কি প্রমাণ চাই? যাহা কিছু দেশী ভাল ভাল জিনিস, তাহারও বিলাতী নামকরণ করিয়াছি। মাঞ্চেষ্টারের তাঁতিকুল অপেক্ষা পাবনার কারিগরদের কাপড় কত টেকসই,

৮ সঞ্জীবনী: ১লা পৌষ, ১২৯০ বঙ্গাব্দ।

অথচ আমরা বিলাতী কাপড় কিনিতেই ব্যস্ত। এমন দেশানুরাগ কি জন্মিবে না—আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার সময় বিলাসিনী রমণীগণ যেমন বিলাতী কাপড় ছাড়িয়া দেশী মোটা কাপড় পরিয়াছিল। এমন দেশানুরাগ কি জন্মিবে না যে আমরাও প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশী শিল্পদ্রব্য ব্যবহার আরম্ভ করিব, বিদেশী বিলাতী শিল্প ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিব? দেশানুরাগ যদি জন্মিয়া থাকে তবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কি আমরা অমোঘ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিব না যে, দেশে যে সব জিনিস পাওয়া যায় তাহার উন্নতির জন্য আমরা আজ হইতে বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ করিলাম।"[৯]

দেশবাসীকে স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগী হতে নানাদিক থেকে প্রচার কাজ চালান হয়েছিল। আমরা উদাহরণ হিসাবে, কেবল একটি মাত্র গ্রহণ করলাম। কালক্রমে কংগ্রেসও উপলব্ধি করতে পারে যে দেশজ শিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা জাতীয় জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়। ফলে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে দেশীয় শিল্পের প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল।

দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে, জাতির রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের সঙ্গে স্বাবলম্বী হবারও একনিষ্ঠ প্রয়াস চালান হয়েছিল। পরাধীনতার গ্লানি দেশবাসীকে বহুলাংশে হীনমন্য করে তোলে। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ভারতবাসীর নিম্নমানের জীবনচর্যা ও রুচির কথা স্মরণ করে স্বদেশ-প্রেমিক চিন্তাশীল মনীষীরা মর্মাহত হন। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের যে নৈতিক ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে গোপালকৃষ্ণ গোখলে ১৮৯৭ সালে 'রয়াল কমিশানে'র সামনে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন,

"There is a moral evil which if anything, is even greater. A kind of dwarfing or stunting of Indian race is going on under the present system. We must live all these days of our lite in an atmosphere of inferiority and the tallest of us must bind in order that the exigencies of the existing system may be satisfied.···Our administrative and military talents must gradually disappear owing to sheer disuse, till at last our lot as hewers of wood and drawers of water is sterotyped."[১০]

৯ সঞ্জীবনী : ২৭ শে পৌষ, ১২৯০ বঙ্গাব্দ।

১০ দ্রঃ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া : প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ. ১৩২-১৩৩।

শাসক ও শাসিতের বিরোধিতা এর পরে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আরও রুদ্র টঙ্কারে ঘোষিত হল।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বাদেশিকতার উষ্ণ স্রোত

৩

বাঙ্গালীর বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ ইংরেজ সরকার কোনদিন প্রীতির চোখে দেখেননি। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে এসেই বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধকে দমিয়ে দিতে চাইলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'য়ুনিভারসিটি বিল' পাশ করে বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষা অর্জনের পথে সৃষ্টি করলেন অন্তরায়। এই বিলের ফলে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে একটা মর্মান্তিক বিচ্ছেদের পথও হল প্রশস্ত। রবীন্দ্রনাথ বিলটির বিরোধিতা করে জাতীয় শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন,

"আমাদের ভাবনার বিষয় এই যে, দেশে বিচার দুর্মূল্য, অন্ন দুর্মূল্য, শিক্ষাও যদি দুর্মূল্য হয়, তবে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে। বিলাতে দারিদ্র্য কেবল ধনের অভাব নহে, তাহা মনুষ্যত্বেরও অভাব—কারণ, সেখানে মনুষ্যত্বের সমস্ত উপকরণই চড়া দরে বিক্রয় হয়।······এই জন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা।"[১১]

এরপর কলকাতা পৌরসভার স্বাধীনতা হরণ বাঙ্গালীকে ভীষণভাবে আঘাত করে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে লর্ড কার্জন প্রাচ্য দেশবাসীর স্বভাব সম্পর্কে যে কটু মন্তব্য করেছিলেন,* তাতে শিক্ষিত সমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এর আগে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর দরবার জাতির বিরোধানলে হবি প্রদান করেছিল। কারণ তার পূর্বে

১১ বঙ্গদর্শন—নবপর্যায়: য়ুনিভার্সিটি বিল, আষাঢ়, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

*" If I were asked to sum in a single word the most notable characteristics of the East—physical, intellectual and moral—as compared with the West, the word exaggeration or extravagance is the one that I should employ. It is particularly patent on the surface of the native press."

—Convocation Address : Calcutta University ; p. 924.

ভারতবর্ষে যে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এসেছিল, তাতে বৃটিশ সরকার কোন সহানুভূতি দেখাননি, অথচ জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনের অর্থনৈতিক দায়িত্বকে অস্বীকার করে তাঁরা দরবারের আয়োজন করেছিলেন। বাঙ্গালীর মানসিক আকাশ যখন এইভাবে অশান্ত ও উত্তাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে, তখন লর্ড কার্জন আপন রাজকার্যের সুবিধার জন্য বঙ্গভঙ্গ করবার পরিকল্পনা করলেন। এর ফলে বাঙ্গলাদেশ বিক্ষোভে ভেঙ্গে পড়ে। প্রতিবাদের উদ্যত নিশান দিকে দিকে উত্তোলিত হল। সভাসমিতি ও রাজনৈতিক বক্তৃতায় বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদী চিন্তার বলিষ্ঠ ভাবনা প্রকাশ হতে শুরু করল। কিন্তু জাতির সমস্ত দাবী ও প্রতিরোধকে পদদলিত করে লর্ড কার্জন 'বঙ্গভঙ্গ আইন' বিধিবদ্ধ করলেন। 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' বাঙ্গালীকে সুদৃঢ় জাতীয়তাবাদে করল অভিষিক্ত।* দেশনেতা আনন্দমোহন বসু সখেদে 'ফেডারেশন হলে' শিলান্যাসের সময় বললেন,

"Lord Curzon had done us indeed signal service and enables us to lay the priceless foundation of a new national life······whereas the Government has thought fit to effectuate the Partition of Bengal inspite of the universal protest of the Bengalee nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power

* "A very important change, with far reaching consequences, took place in civil administration in 1905. Until then Bengal, Bihar and Orissa had formed one province ruled by a Lt. Governor. Lord Curzon thought that this territory comprising of 189,000 square miles, was too large a unit for efficient administration and dicided to rearrange the provincial boundaries. It was ultimately decided to seperate the divisions of Dacca, Chittagong and Rajshahi from the province. These were joined to Assam......and a new province was constituted, called East Bengal and Assam with Dacca as its capital. The proposal was carried into effect in 1905 inspite of strong protests from the public, and this partition of Bengal caused a treamendous political agitation which stirred national feeling in India to its very depths."

—An Advanced History of India: Dr. R. C. Mazumdar Dr. N. C. Roychaudhury and Dr. Kali Kinkar Dutta.

to counter act the evil effects of the dismemberment of our Province and to maintain the integrity of our race. So God help us."১২

বাঙ্গালী এই ভাবে বিদেশী সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আপন মুক্তি কামনার প্রয়াস চালাতে শুরু করল।

স্বাদেশিকতার উত্তাল তরঙ্গ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাঙ্গালী গ্রহণ করল বলিষ্ঠ কর্মসূচী। বয়কট, স্বদেশী শিল্পের প্রসার ও জাতীয় শিক্ষানীতির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল অত্যন্ত গভীরভাবে। বয়কট ও স্বদেশী শিল্পের প্রসার উভয়ের সম্পর্ক ছিল অঙ্গাঙ্গী। বিদেশী দ্রব্য ও শিল্প সামগ্রী পরিত্যাগের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে গড়ে উঠতে থাকে দেশী কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স-কোম্পানী, সাবানের ফ্যাক্টরী, চামড়ার কারখানা, ওষুধের প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। স্বদেশী মূলধনে, স্বদেশী মনোভাবের তাগিদে ও রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সরলা দেবীচৌধুরাণী 'লক্ষ্মী-ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী শিল্প-দ্রব্যের একটি আড়ৎ খুলেছিলেন।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কয়েকটি উৎসাহী যুবকের সহযোগিতায় মেট্রোপলিটান স্কুল ঘরে 'ডন সোসাইটি' নামে একটি জাতীয় হিতবাদী সমিতি গঠন করে স্বাদেশিকতার প্রচার শুরু করলেন। এই সমিতির মুখ্য ও অন্যতম পত্রিকা 'ডন' স্বদেশী ভাব, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। বিশেষভাবে, জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নানা গঠনমূলক আয়োজন 'ডন সোসাইটি' থেকে করা হয়। এই সময়ে 'ভাণ্ডার' পত্রিকাও জাতীয়তা প্রচারে প্রয়াসী হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর উগ্র বয়কট নীতিকে সমর্থন না করলেও, স্বদেশী শিল্পের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় লিখেছিলেন,

"আমাদের এবারকার আন্দোলনে আমরা বিলাতি জিনিষ পরিত্যাগ করিয়া দেশি জিনিষ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে ইংরেজ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবে কিনা জানি না ;—কিন্তু এই ব্যাপারে—দেশ যে আমার—এই কথাটা আমাদের সাধারণ লোকের কাছে বিনা ভাষায় এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট

১২ The Roll of Honour : K. C. Ghose ; pp. 78-79.

হইয়া উঠিয়াছে। এক যুগ ধরিয়া বক্তৃতা করিলেও এমনটা ঘটিতে পারিত না।”[১৩]

এর আগে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে বাঙ্গালীর সামনে গঠনমূলক পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি পরিষ্কার উপলব্ধি করেছিলেন যে, সাময়িক অস্থিরতা ক্ষেত্র বিশেষে মূল্যবান হলেও, তাতে কোন চিরস্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন—জাতির আত্মশক্তির উদ্‌বোধন। আর এর জন্য প্রয়োজন হয়েছিল—সংগঠন, সমবায় ও পল্লী সংস্কার। শেষোক্তের উপর তিনি গুরুত্ব দেন অধিক। শরীর্ ব্যাধিগ্রস্ত হলে যেমন স্বাস্থ্যের হানি ঘটে, তেমনি পল্লীগুলিকে নির্জীব ও অন্ধকারে রেখে জাতির ঐক্যগ্রন্থী রচনা ও মুক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হয় না। স্বদেশবাসীকে নিশ্চেষ্টতা ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে উদ্ধার করবার জন্য তিান লিখেছিলেন,

“আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়।……প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নব প্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোন প্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংশ্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-ভূমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে তাহার প্রতিকারে পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

... ...

গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, একথা আমি কোনোমতেই বলিব না—আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতা লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই

১৩ ভাণ্ডার: বৈশাখ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনঃই ব্যর্থ হইতে থাকিবে।"[১৪]

আত্মশক্তির বিকাশের জন্য বাঙ্গালী তরুণেরা, ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের উৎসাহে গঠন করলেন 'অনুশীলন সমিতি।' শক্তিচর্চার মহান্ নির্দেশ তরুণেরা পেয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী থেকে।[†] আরও কয়েকজন তরুণ এগিয়ে এসে স্থাপন করলেন 'বেঙ্গল ষ্টোর্স'। ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইণ্ডিয়ান ষ্টোর' নামে এক স্বদেশ ভাণ্ডার। সরলাদেবী 'বীরাষ্টমী মেল'র আয়োজন করে শক্তিচর্চার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করে দিলেন। তাঁর 'বীরাষ্টমীর গান'টির প্রতি চরণে স্বদেশপ্রেমের বলিষ্ঠ স্বর প্রতিধ্বনিত। আলোচনার স্বার্থে শেষ কয়েক পংক্তি গ্রহণ করা হল,

"স্বদেশানুরাগে যেই জন জাগে, অতি মহাপাপী হোক না কেন,
তবুও সে জন অতি মহাজন সার্থক জনম তাহার জেনো।
দেশহিতব্রত এ পরশমণি, পরশিবে যারে বারেক যখনি,
রাজভয় আর কারাভয় তার ঘুচিবে তাহার তখনি জেনো।
মাতৃভূমি তরে যেই অকাতরে নিজ প্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে
অপঘাত ভয় আশু তার যায় মরণে গোলোকে যায় সেই জন।"[১৫]

ঠিক এই সময়সীমার মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা। ইংলণ্ডে থাকাকালীন, 'র‍্যাডিকাল' দলের যে প্রভাব তাঁর মনে নতুন রাজনৈতিক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করেছিল, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'নিউ ইণ্ডিয়া' ছিল তাঁর সেই মানস-চিন্তার ফসল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে এক ঐক্যমূলক ভাব ও ভাবনায় গ্রথিত করে একটি অখণ্ড রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলবার দায়িত্ব নিয়েছিল বলেই,

১৪ বঙ্গদর্শন—নবপর্যায় : ভাদ্র, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

† "That nationalist movement smouldered for a long time, until Vivekananda's breath blew the ashes into flame, and erupted violently three years after his death."—The Prophets of New India: Romain Rolland, p. 497.

১৫ ভারতী : কার্তিক, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা বিশেষ বেড়ে যায়।* বাঙ্গালীর এইসব প্রচেষ্টার মূল কারণ ছিল, 'বঙ্গভঙ্গ বিল' রোধ করা। কিন্তু বাঙ্গালীর এই প্রয়াস সাময়িক-ভাবে হল ব্যর্থ। লর্ড কার্জন বিলটিকে আইনে পরিণত করলেন। কিন্তু বাঙ্গালীও দ্বৈরথ সমরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল না। যুদ্ধ করে জয়লাভ করবার আগ্নেয় শপথ নিল তারা। বাঙ্গলাদেশের এই দুর্যোগে, সমগ্র ভারতবর্ষ পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। জাতির এই দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

"ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের বঙ্গভূমি রাজকীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নই হয় তবে সেই বিচ্ছেদ-বেদনার উত্তেজনায় আমাদিগকে সামাজিক সদ্ভাবে আরো দৃঢ়রূপে মিলিত হইতে হইবে, আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, সেই চেষ্টার উদ্রেকেই আমাদের পরম লাভ। ··আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য্য আমাদিগের নিজের হাতে লইতে হইবে।······চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব, এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব।···আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে একথা আমরা কোনমতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাঙ্গালার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই পুরাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায়

* নিউ ইণ্ডিয়ার প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল,

"The New India is neither Hindu. though the Hindu unquestionably forms the original stock and staple of it, nor Mahomedan, though they have made very material contribution to it......but is made up of the varied and valuable material supplied in successful stages of its evolution......by them ···A nation is an organic whole, its component parts are Hindus and Mahomedans and Parsees and Christians and the aboriginal tribes still living in the primitive stages of social evolution." —The studies of Bengal Renaissance : Jnanjan Pal : p. 564.

উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে, জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙ্গালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্র মূর্ত্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একই মাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব;—সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।"[১৬]

বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন

ব্যথিত-বেদনভারে বাঙ্গালী হতপক্ষ গরুড়ের ন্যায় নিষ্ক্রিয় না হয়ে আত্ম-চেতনার মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হতে শুরু করল। নিষ্ঠুর আঘাত বাঙ্গালীকে করে তুলল আত্মশক্তিতে নির্ভর। চীন-মার্কিন দ্রব্য বর্জনের সাফল্য দেখে এদেশের স্বদেশ হিতৈষিগণ অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে উঠলেন। বিশেষভাবে কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাতে, বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয় আন্তরিকভাবে। জনসাধারণকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্যে এই পত্রিকায় একটি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশিত হয়। প্রতিজ্ঞাপত্রটি ছিল এই রকম,

"আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইতে কোনও বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য্য করিতে যদি আর্থিক বা অন্য কোনও প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এরূপ কার্য্য কেবল নিজেরাই করিয়া ক্ষান্ত হইব না, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকেও এইরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সংকল্পে সহায় হউন।"[১৭]

বৈদেশিক দ্রব্য বর্জন সম্পর্কে এই পত্রিকায় আরও লেখা হয়েছিল,

"স্বদেশে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইংলণ্ডের সে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিব না। স্তব-স্তুতি অনেক হইয়াছে, আর নয়। এখন আইস, আমরা নিজের পদভরে দণ্ডায়মান হই। বিদেশী দ্রব্য আর ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। এবার সকলে মাতৃভূমির নামে প্রতিজ্ঞা করি—ইংলণ্ড-জাত বস্ত্র ক্রয় করিব না। এবার ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া রাজপথে বাহির হইব

১৬ বঙ্গদর্শন—নবপর্য্যায়: অবস্থা ও ব্যবস্থা; আশ্বিন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

১৭ সঞ্জীবনী: ২০শে জুলাই, ১৯০৫।

তবুও বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিব না। আমরা আবার বলি, যদি সকলে এই প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে, বাঙ্গালীকে হীন করিতে পারে। যদি সকলে এই প্রতিজ্ঞা করেন, তবে বঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় জোড়া লাগিবে। এস, ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সকলে সপরিবারে প্রতিজ্ঞা করি স্বদেশজাত দ্রব্য পাইতে বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করিব না।"[১৮]

'সঞ্জীবনী'তে নির্ধারিত কর্তব্য বাঙ্গালীকে নব প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত করল। বাগেরহাটের জনসাধারণ সকলের আগে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ করে। স্বদেশী সংকল্প গ্রহণে ছাত্র সম্প্রদায় ছিল সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। তাঁরা দেশজ দ্রব্য মাথায় নিয়ে দরজায় দরজায় 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই' গান গেয়ে ফেরি করতে লাগলেন। তাছাড়া এই সময়ে আরও কয়েকটি স্বদেশী সংস্থা গড়ে উঠে। যেমন, বড়বাজারের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী দুর্লভচন্দ্র কুণ্ডু ও কুবেরজি স্বদেশী বস্ত্র আমদানি করেন। অধ্যাপক কালীশঙ্কর সুকুল, কালীশঙ্কর ডুলিচাঁদ ও কালী শঙ্কর রামেশ্বর তাঁদের দোকানে দেশী সূতায় তৈরী বস্ত্র এবং পোষাক বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন। মফস্বলের রামপুরহাট ও কৃষ্ণনগরে স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপিত হয়েছিল। 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন'কে পরিচালনা করবার জন্য 'টাউন হলে' যে জনসমাবেশ হয়েছিল তাতেও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।*

স্বদেশী আন্দোলন দেশের সর্বত্র সমস্ত সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হলে, উৎসাহের প্রাবল্যে বাঙ্গালীর জীবনে স্বাদেশিকতার জোয়ার ভীমবেগে প্রবাহিত হল। এই বঙ্গচ্ছেদকে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে সৌভ্রাত্রের রাখীবন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানালেন। কলকাতার 'রাখীবন্ধন উৎসবে, তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে তিনি লিখলেন,

"বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে।

---

১৮ সঞ্জীবনী : ৩রা আগস্ট, ১৯০৫।

* "Immediately after the official announcement of the Partition Scheme on August 7th, the Hono'ble Magistrate Maharja Manindra Chandra Nandi of Kasimbazar presiding over an enormous gathering of the citizen of Calcutta inaugurated the movement for the boycott of all foreign goods as a measure of retaliation. This movement came to be known in later days as the great Swadeshi Movement."

—Life and Times of C. R. Das : Prithwis Chandra Roy ; p. 39.

বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া প্রতিকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে।”[১৯]

বাঙ্গলার অখণ্ডতা ও বাঙ্গালীর ঐক্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান লিখলেন,

“বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥”

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাখীবন্ধন উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। এই উৎসবের দিনে তিনি বাঙ্গালীকে দিলেন অরন্ধনের পরিকল্পনা। ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা’য় তিনি লিখলেন,

“...মা, তুমি বাংলার লক্ষ্মী, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না; আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর......আমরা এখন থেকে মানুষের মত মানুষ হব; আর পুতুল খেলা করব না; কাঞ্চন দিয়ে কাচ কিনব না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না; মা তুমি আমাদের ঘরে থাক।”[২০]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলমানদেরও বিশেষ সমর্থন ছিল। ইংরেজ সরকার ইতোমধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ভিতরে সাম্প্রদায়িক বিরোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সব জায়গায় তাঁদের বিভেদনীতি কার্যকরী হয়নি। ঢাকার নেতা সরিফ খাজা আতিকুল্লা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন,

“I may tell you at once that it is not correct that the Mussalmans of East Bengal are in favour of partition of Bengal. Real fact is that it is only a few leading Mohamedans who for their own purpose supports the measure.”[২১]

---

১৯ বঙ্গদর্শন—নবপর্যায়ঃ কার্তিক, ১৩১২ বঙ্গাব্দ

২০ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথাঃ পৌষ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

২১ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়াঃ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; পৃ. ১৪০।

কলকাতায়, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা বক্তৃতা দিয়ে বাঙ্গালীকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল, মৌলবী আবুল কাসেম, আবুল হোসেন, দেদার বক্স, দীন মহম্মদ, ডাক্তার গফুর ও লিয়াকৎ হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

'রাখীবন্ধন' উৎসবের দিনে মিলন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। ঐদিন সমস্ত বাঙ্গলাদেশে ব্যাপকভাবে হরতাল পালন করা হয়। 'ভারতবর্ষীয় সভা'র পক্ষ থেকে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, 'জমিদার সভা'র পক্ষ থেকে আশুতোষ চৌধুরী এবং 'ভারত সভা'র পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতির নিজস্ব সম্মিলন মন্দির গড়ে তোলবার জন্য দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানালেন। জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন মানসে সেদিন পঁচিশ হাজার টাকা ও পরদিন চোদ্দ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

বাঙ্গলা দেশের মেয়েরাও স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। উগ্র রাজনৈতিক মতবাদ ছড়াবার দায়ে যুগান্তরের সম্পাদক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অভিযুক্ত ও কারাগারে অন্তরীণ হলে, দেশমাতৃকার নির্ভিক সন্তানকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবার জন্য সমগ্র নারী-সমাজ একত্রিত হয়ে, তাঁর মাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ইংরেজি পত্রিকা 'বন্দেমাতরমে' এ রকম জনসভার মূল্য বিচার করে লিখেছিলেন,

"The ladies gathering at the house of Dr. Nilratan Sircar to do honour to the aged mother of Sriman Bhupendranath Dutt, who has heroically faced bureaucratic persecution in the cause of the country, is a fresh proof of the awakening of Indian Womenhood."[২২]

২২ বন্দেমাতরম্ পত্রিকা: সম্পাদকীয়, ১৩ই আগস্ট, ১৯০৭।

ছাত্র জাগরণ ও জাতীয় শিক্ষাবিস্তার

৪

সুরেন্দ্রনাথ স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, দেশে রাজনৈতিক প্রগতি আনতে হলে দেশের ছাত্রদের দেশের কথা ভাবতে শেখাতে হবে।* পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি তরুণদের দেশগঠনের মহান্ কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন,

"At all times and in all ages it is to the young that the preachers of the new movements have addressed themselves. 'Suffer little children to come up to me' were the words of the divinely—inspired Founder of Christianity. In Greece, in Italy, in America, in Germany all over the world, when a new Gospel was preached, charged with the message of a new hope it was the young who enthusiastically responded to the call."[২৩]

'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে'র সময়ে বাঙ্গলাদেশের ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। ছাত্রদের সাহায্য ব্যতিরেকে এই বৃহত্তম আন্দোলন সফল হওয়া কঠিন ছিল। প্রথম থেকেই দেশনেতৃবৃন্দ তরুণদের রাজনীতি চত্বরে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে, জাতীয় স্বার্থে তিনি ছাত্রদের রাজনৈতিক আঙ্গিনাতে আহ্বান করেছেন।†

* "The beginnings of public life must be implanted in them." A Nation in Making : S. N. Banerjea ; p. 35.

২৩ A Nation in Making : S. N. Banarjea , p 181

† "I appealed to the young to help us in the Great National Movement I knew how deeply they were stirred when I was sent to prison for contempt. of court, and I felt that they would help to create a body of public opinion without which we could not hope to succeed. I addressed them at noumerous public meetings and warm was the response."

A Nation in Making ; S. N. Banerjea ; p. 35.

১৯০৫ সালে, টাউনহলে সভার পর থেকে ছাত্রগণ স্বদেশী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন। বিভিন্ন জায়গায় সভাসমিতি করে তাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলামখানা' নাম দিয়ে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানান। আহ্বায়কদের মধ্যে প্রধান ছিলেন —হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। বিশেষভাবে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার চেষ্টায় 'ব্রতীসমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠে। এই সমিতির মূলমন্ত্র ছিল, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। ব্রতীসমিতির সভ্যদের গৃহীত প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল,

"জননীস্বরূপা জন্মভূমির কল্যাণের জন্য বিদেশজাত এনামেলের বাসন, কাঁচের দোয়াত, কাঁচের নানা প্রকার খেলনা, ফুলদানি ও বাটি, বিদেশী সাবান, বিদেশী বিস্কুট ও চায়ের সরঞ্জাম, বিদেশী ছুরি, কাঁচি, বিদেশী তামাক ইত্যাদি আর কখনও ব্যবহার করিব না এবং আমার পরিবারে ও বান্ধব-সমাজে অথবা আমার অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহাতে এই সমস্ত বস্তু ক্রীত বা ব্যবহৃত না হয় সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইব। যাহাতে দেশীয় লোকেরা স্বদেশজাত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিব। শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টা পাইব।"[২৪]

এই সময়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'বন্দেমাতরম্' ও নলিনীরঞ্জন সরকার 'বন্দনা' নামে দু'টি স্বদেশী-সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শহরে, গ্রামে ও গঞ্জে যুবকদের মুখে মুখে এই স্বদেশী সঙ্গীতগুলি সর্বদা গীত হত। তবে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সরলাবালা দেবীচৌধুরাণী, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।* সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নেতৃত্বে সমকালে কলকাতাতে 'বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়' গঠিত হয়েছিল। কালীঘাট ও ভবানীপুর অঞ্চলের ছাত্রদের নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল 'সন্তান সম্প্রদায়' সংগঠন। বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এর সম্পাদক। বাঙ্গলা

২৪. ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া: প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; পৃ. ১৪৫।

* "The national song composed during the period by Dwijendralal Roy, Rabindranath Tagore, Saralabala Debichowdhurani, Mr. A. P. Sen and the late Rajani Kantoo Sen, smote on the heart of the people as on a giant's harp, awakening out of it a storm and a tumult such had never been known through long centuries of her political freedom.' Life and Times of C. R. Das : Prithwis Chandra Roy ; p. 39.

দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে ছাত্র জাগরণের উত্তাপ পরিলক্ষিত হয়েছিল। বিশেষভাবে কৃষ্ণনগর, বরিশাল, ঢাকা, মৈমনসিংহ, মালদহ অঞ্চলে ছাত্র-আন্দোলনের ঢেউ হয়েছিল উত্তাল। বরিশালের ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত।

সকল শিক্ষা নিকেতন থেকে 'বয়কট' নীতি, ইংরেজ সরকারকে বিশেষভাবে চিন্তিত করেছিল। ছাত্রেরা যাতে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে যোগ দিতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ থেকে মিঃ কার্লাইল একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত ও প্রতিরোধ করা। ফিরিঙ্গী সরকারের এই নিয়ন্ত্রণ প্রয়াস দেশবাসীর চিত্তের অনল শিখাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এই রকম অবস্থায় বাঙ্গলা দেশের রাজনৈতিক নেতা ও স্বদেশপ্রেমিক মনীষিগণ জাতীয়-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন আন্তরিক-ভাবে উপলব্ধি করলেন। জাতীয়তার আদর্শে শিক্ষাদানের সমস্ত ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হল। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে কলকাতার টাউন হলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষে এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন ডঃ রাসবিহারী ঘোষ। এই সভাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। দেশবাসীর শুভ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করে তিনি বলেন,

"আমরা যে ইংরেজি লেক্‌চারের ফনোগ্রাফ, বিলিতী অধ্যাপকের শিকল বাঁধা দাঁড়ের পাখি হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের নূতন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি।"[২৫]

স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছাত্রদের দমন করার কঠোর বিধি-ব্যবস্থাকে সমালোচনা করে ইংরেজ সরকারের মনোভাব ও আচরণের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষাসংস্কার' প্রবন্ধে লিখলেন,

"ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাতে যে-পরিমাণ পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, ইহাতে তাহাদিগকে নিঃস্বত্ব করা হইবে। ছেলেদের মধ্যে ছেলেমানুষের চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর তাহা স্বদেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালোই বোঝে।"[২৬]

২৫ বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) : ভাদ্র, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

২৬ ভাণ্ডার পত্রিকা : আষাঢ়, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

সরকারী নির্দেশকে অমান্য করে ছাত্রেরা গড়ে তুলল 'Anti Circular Society'. এর সভাপতি ছিলেন প্রবীণ কৃষ্ণকুমার মিত্র। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট 'National Council of Education' বা 'জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে'র দ্বার উদ্ঘাটিত হল। এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ডন' সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও রাসবিহারী ঘোষ। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আচার্য পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন অরবিন্দ ঘোষ (শ্রী অরবিন্দ)। এই নব ভাবের প্রেরণায় বাঙ্গলার নানা স্থানে জাতীয় শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল। গণ-শিক্ষা বিস্তারের জন্য গড়ে উঠে শ্রমজীবী বিদ্যালয় ও গ্রাম্য জাতীয় বিদ্যানিকেতন। স্বদেশী কাপড়ের কল, জীবন বীমা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সঙ্গে বহু জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানও দেখা দেয় এই সময়ে। বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'-এর জন্ম এই কালেই হয়েছিল।

সমসাময়িক পত্রিকায় বাঙ্গালীর জাতীয়চেতনার স্রোত

৫

স্বদেশী আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি হয়েছিল (১৯০৬)। একদল 'Moderate' বা নরমপন্থী আর একদল 'Extremist' বা চরমপন্থী। নরমপন্থী সম্প্রদায় ইংরেজের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে কাজ করতে চাইলেও চরমপন্থীদের দাবী ছিল—পূর্ণ স্বাধীনতা। বাঙ্গলাদেশে চরমপন্থীদের প্রভাব ছিল অসামান্য। চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রী অরবিন্দ, লালা লাজপৎ রায় ও বাল গঙ্গাধর তিলক। চরমপন্থীদের নতুন চিন্তা বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধে অরণি-কাষ্ঠ নিক্ষেপ করল। বাঙ্গালী যুবকেরা শূর-ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্যে শুরু করলেন বীরপূজা। বাঙ্গলা দেশে 'শিবাজী-উৎসব' এই পর্বেরই ঘটনা। সুরেন্দ্রনাথের নরমপন্থা বা রাজানুগত্য মতবাদ ও 'লাল-বাল-পাল' নেতৃত্রয়ের আপোষহীন মনোভাবের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশে আর একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী সংস্থার আবির্ভাব হয়েছিল,—এঁরা প্রকাশ্য বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা কামনা

করেছিলেন। এই সংস্থার সভ্যবৃন্দ মাতৃভূমিকে সাক্ষাৎ জীবন্ত মা বলে সেবা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং আত্মবিসর্জন দিতেও ছিলেন সমানভাবে প্রস্তুত। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করাই ছিল এঁদের মূলমন্ত্র। রক্তের বদলে রক্ত গ্রহণের শপথ তাঁরা আপন রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর করতেন—'অনুশীলন সমিতি'র নিয়ম-নীতির পৃষ্ঠায়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'যুগান্তর' পত্রিকা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' ও শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি কাগজ 'বন্দেমাতরম্' ছিল এই মতবাদের প্রকাশ্য প্রচার-পত্রিকা। বাঙ্গলা দেশের জাতীয় আন্দোলনে ত্রি-ধারার বেণীবন্ধন হয়েছিল এ ভাবেই। কিন্তু বরিশাল জেলায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে ইংরেজদের প্রকাশ্য নির্যাতন ও ছাত্রদলন, বাঙ্গালীকে করে তুলল আরও দুঃসাহসী। ঐতিহাসিকের কথায়, "বাঙ্গালী হাসিমুখে মৃত্যুবরণ পণ করেও মুখের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ছাড়ে নি।"†

বাঙ্গলাদেশে যাঁরা বিপ্লবী চিন্তাদর্শের প্রচার চালিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তিনি বাঙ্গালীকে অগ্নিশুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সমস্ত দেশাত্মবোধক কাজকে অধ্যাত্ম শক্তির চরম বিকাশ বলে মন্তব্য করেছিলেন।

"ভারতীয় সভ্যতার বলে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্টি সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। সেইজন্য ভগবান আমাদের পাশ্চাত্ত্য ভাব যুক্ত আন্দোলন ধ্বংস করিয়া বহির্শক্তিকে অন্তর্মুখী করিয়াছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দিব্যচক্ষুতে যাহা দেখিযাছিলেন, দেখিয়া বার বার বলিতেন শক্তিকে অন্তর্মুখিন্ কর।"২৭

ব্রহ্মবান্ধব নিজে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি কোন এক প্রসঙ্গে আনন্দমোহন বসুকে বলেছিলেন যে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব—'not through pen but through sword,'* আর তাঁর এই মতাদর্শের প্রধান বাহক ছিল 'সন্ধ্যা' ও 'স্বরাজ' পত্রিকা। এই পত্রিকাদ্বয়ের তীব্র শাণিত বক্তব্য বাঙ্গালীকে ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপিত করে। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

---

† মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ২২০।

২৭ ধর্ম্ম ও জাতীয়তা : শ্রীঅরবিন্দ; পৃ. ৮৭।

* আমার ভারত উদ্ধার : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়; ১৯০৭।

"সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমনে যে আবর্ত্ত আলোড়িত হয়ে উঠল, তারই মধ্যে একদিন দেখলুম, সেই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন সন্ধ্যা কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বহিয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথম দেখা গেল বাঙ্গলা দেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা।"[২৮]

ব্রহ্মবান্ধবের জাতীয়তার মূলকথা ছিল, আত্মশক্তির পুনরুদ্ধার, সর্বজনীন মানবপ্রীতি এবং ধর্মীয় ঐক্যবোধ। তিনি সকল বিষয়েই বেদান্তের অনুগামী ছিলেন। এরই ফলে বাঙ্গালীর জীবনচিন্তা সংহত হয়ে অন্তর্মুখী হয়েছিল। তিনি প্রচার করেন যে, ভারতের উন্নতি একমাত্র ভারতবাসীর দ্বারাই সম্ভব; রাজনীতিতে ভিক্ষাবৃত্তি অচল। আত্মশক্তির এই বিজয়গৌরব 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে প্রচারিত হত বলেই জাতির সকল স্তরে এর আবেদন ছিল অপরিসীম।[†] ব্রহ্মবান্ধব বাঙ্গালীকে রজোগুণে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। শক্তির পূর্ণ বিকাশ ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব, একথা ব্যক্ত করে তিনি 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় লেখেন,

"তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। রজোগুণটা স্বভাবতঃ কিছু কড়া। তাই যাঁহারা নরম প্রকৃতির লোক তাঁহাদিগের এই কড়া মেজাজটা ভাল লাগে না। যে আফিম খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে না চাবকাইলে তাহার সংজ্ঞা থাকিবে না।……দেশের রোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকরধ্বজের উপরেও চটী খাওয়াইতে হইবে। দেশের চারিদিকে তমোভাব—অসাড়তা। এখন হাত বুলাইলে চলিবে না।…… রজোগুণের দ্বারা তমোভাব দূর হইলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। তমঃতে সত্য বসে না, তাই রজঃ চাই। শেষে সত্ত্ব। সত্ত্বই বা শেষ কেন? তিন গুণের অতীত হওয়াই শেষে নির্বাণ মুক্তি—।"[২৯]

২৮ দ্রঃ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব: প্রবোধচন্দ্র সিংহ: পৃ. ৮০।

† "দোকানের দোকানী পশারী, জমিদারের সরকারী গোমস্তা, পাঠশালার গুরুশিষ্য, রাস্তার মুটে-গাড়োয়ান সকলেই হাসিত কাঁদিত। জমিদার, গৃহস্থ, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত পুরনারী, বালক-বালিকা, যুবকবৃন্দ সকলেই কখন আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িত, কখনও বা প্রায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। কখন সন্ধ্যা আসিবে, আজ সন্ধ্যায় কি লিখিয়াছে এই জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত।"—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব: প্রবোধচন্দ্র সিংহ: পৃ. ৯০।

২৯ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব: প্রবোধচন্দ্র সিংহ: পৃ. ৮৯।

এইভাবে রজোগুণের প্রসার ঘটিয়ে ব্রহ্মবান্ধব বাঙ্গালীর ক্লীবত্ব মোচন করতে চেয়েছিলেন। জাতির বিষাদযোগে তিনি আত্মনির্ভরতা ও শক্তি সাধনার পরম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তাঁর চরমপন্থী মনোভাব ইংরেজ সরকারকে একান্তভাবে বিরূপ করে তোলে। অবশেষে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা 'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' প্রবন্ধের জন্য রাজরোষে পতিত হয়। রাজদ্রোহের অপরাধে সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার হলেন। তিনি আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টা করেননি। এ বিষয়ে ব্রহ্মবান্ধব লেখেন যে তিনি "not responsible to an alien Government for his humble share in the God-ordained mission of Swaraj."[৩০]

এই সত্যসন্ধ সন্ন্যাসী সর্ব বিষয়ে প্রথম অসহযোগিতা করলেন বিদেশী শাসকদের সঙ্গে। অবশ্য মামলা চলাকালীন তিনি পরলোক গমন করেন।

ব্রহ্মবান্ধবের জীবনব্যাপী সাধনা ছিল মাতৃ-উপাসনা। দেশকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত শক্তিময়ী চিন্ময়ীরূপে বন্দনা করেছিলেন।* বিবেকানন্দ বাঙ্গালীকে দেন 'ভারত-ধ্যান', বঙ্কিমচন্দ্র দেন 'বন্দেমাতরম্,' মন্ত্র আর ব্রহ্মবান্ধবের কাছে বঙ্গবাসী দীক্ষা গ্রহণ করে—মৃত্যুকে বরণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার মহান্ ব্রতের। জাতির ললাটে তিনিই প্রথম আত্মোৎসর্গের রুধির টিকা এঁকে দিয়েছিলেন। 'স্বরাজ' পত্রিকা ছিল তাঁর এই মতাদর্শের অন্যতম প্রচার-পত্র।

'সন্ধ্যা' পত্রিকা বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে যুদ্ধভেরী বাজিয়েছিল, তারই সুর পরবর্তীকালে অনুরণিত হয়ে উঠল 'যুগান্তর' পত্রিকাতে। 'যুগান্তর' ছিল

৩০ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া : প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৫৫।

* "আমি জানি—আমার জননী তিলোত্তমার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নহেন—মা জগল্লক্ষ্মীর ন্যায় সর্ব্বগুণশালিনী নহেন। কিন্তু তবু তিনি আমার মা।···সেই সুষমা, সেই শোভা আমাকে আত্মহারা করে—আমাকে মায়ের চরণে বাঁধিয়া রাখে।······মায়ের সন্তান, সমগ্র মাতৃবস্তুকে ভালবাসে—ভাল বলিয়া বাসে—অঙ্গীকার করে—দোষগুণের সমালোচনা করে না। ···যদি বিমলচন্দ্রিকা ও কলঙ্করেখা বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখ, তাহা হইলে তুমিও জেন চাঁদেরও নিন্দুক হইয়া উঠিবে।...মা, তাঁর লুকানো রাঙা চরণে স্বরাজশ্রী ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার মুক্তি-সাধনে ও স্বরাজনীতি পালনে বিঘ্ন ঘটিলে, বিঘ্ননাশিনী শক্তি জাগিয়া উঠিবে—মায়ের অসি ঝলসিবে—তাণ্ডব রণনৃত্যে স্বরাজ আবাস মাতিয়া উঠিবে···

মাগো,—কবে তোর লুকানো চরণ কমল দেখা যাইবে—আর সেই রাঙা চরণের জ্যোতিতে স্বরাজশ্রী ঝলসিয়া উঠিবে।"—স্বরাজপত্র : ২৯শে ফাল্গুন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম প্রচার-পত্র। অনুশীলন সমিতির সন্ত্রাসবাদী যুবকবৃন্দ শক্তিচর্চা ও ভক্তিচর্চা চালিয়েছিলেন একই সঙ্গে। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে গীতার কর্মযোগে ব্রতী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও বিবেকানন্দের 'সোহম্' তত্ত্ববাদ তাদের কর্মাদর্শ ও দর্শনচিন্তা গড়ে তোলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের 'ভবানী মন্দিরে'র শক্তিতত্ত্ব। বাঙ্গালী বিপ্লবীদের কাছে এই বইখানির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ভারতের নবজন্ম সার্থক করতে হলে শক্তির মাধ্যমেই তা করতে হবে, একথাই ছিল গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সমকালীন বিপ্লবীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা বুঝতে হলে 'ভবানী মন্দির' পাঠ একান্ত প্রয়োজন।† তদানীন্তন বৃটিশ সরকারও

† "Bhawani is Shakti. In the present age, the Mother is manifested as the mother of strength. She is pure Shakti....Bhakti is the leading flame. Shakti is the fuel. If the fuel is scanty how long can the fire endure? ...India therefore needs Shakti alone. The deeper we look, the more we shall be convinced that the one thing wanting, which we must strive to acquire before all others, is strength,...strength physical, strength mental, strength moral, but above all strength spiritual which is the one unexhaustible and imperishable source of all the others. If we have strength everything else will be added to us early and easily and naturally, In the absence of strength we are like men in a dream who have hands but can not seize or strike, who have feet but cannot run. ...If India is to survive, she must be made young again. Rushing and billowing streams of energy must be poured into her; her soul must become, as it was in the old times like the surges, vast, puissant, calm or turbulant at will, an ocean of action or of force. ...India must be Reborn. Because her Rebirth is Demanded by the Future of the world. ...It was to initiate this great work, the greatest and most wonderful work ever given to a race, that Bhagawan Ramkrishna came and Vivekananda preached. If the work does not progress as it once promised to do it is because we have once again allowed the terrible cloud of Tamas to settle down on our souls—fear, doubt, hesitation, sluggishness. We have taken, some of us, the Bhakti which poured forth from the one and the Jnana given us by the other, but from the lack of Shakti, from the lack of Karma, we have not been able to make our Bhakti—a living thing. May we yet remember that it was Kali, who is Bhawani, Mother of strength whom

এই বইটির রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারেননি।* তাঁরা ধর্মের বহিরাবরণে রাজনৈতিক চেতনার স্বরূপটি বুঝতে পেরেছিলেন।* রক্ত-বিপ্লবে বিশ্বাসী যুবকদল মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে একহাতে গীতা ও অন্যহাতে পিস্তল নিয়ে সম্মুখ সমরে ঝাঁপ দেন। 'যুগান্তরে' লেখা হয়েছিল যে, প্রকাশ্য হত্যা পাপ নয়। রাজনৈতিক হত্যাকে আধ্যাত্মিক করার জন্য, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে নরহত্যায় প্ররোচিত করেছিলেন, তার সমর্থনসূচক দৃষ্টান্ত এই পত্রিকায় আবেগের সঙ্গে প্রচার করা হয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুনকে জ্বালিয়ে তোলবার জন্য গণ-অভ্যুত্থানের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি প্রচার করত বলেই এই পত্রিকা জনগণকে নাড়া দেয়।† অস্ত্রসংগ্রহ, বোমা তৈরী সকল ব্যাপারে নানা প্রকাশ্য আলোচনা 'যুগান্তর' পত্রিকাতে স্থান পেত। একবার তাতে লেখা হয়,

"দেশের মধ্যেই অস্ত্র আছে, তাহা সহজেই পাওয়া যায়, আর বোমা তৈরীর ব্যবস্থা তো আছেই। কিন্তু এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা অবলম্বন করিতে হইবে।"৩১

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অনেক শিক্ষিত স্বদেশপ্রেমিক নেতা সমর্থন ও প্রকাশ্য সাহায্য করেছিলেন অর্থদান করে। শোনা যায় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

---

Ramkrishna worshipped and with whom he became one. ...But the destiny of India will not wait on the falterings and failings of individuals; the mother demands that men shall rise to institute Her worship and make it universal. ...To all the children of the mother the call is sent forth to help in the sacred work." —Bhawani Maindor : Sri Aurobindo.

* "The Bhawani Maindor (Temple of Bhawani, one of the Manifestations of the Goddess Kali) exalts Bhawani as the manifestation of Shakti. Indians must acquire mental, physical, moral and spiritual strength. They must copy the methods of Japan. They must draw strength from religion. How this is to be done is described in moving and powerful terms. The book is remarkable instance of Perversion of religious ideals to political purposes."

—Sedition Committee Report : 1908 ; p. 17.

† "১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ১৮,০০০ বৃদ্ধি পায়।"

. — ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ঃ সুপ্রকাশ রায়; পৃ. ১০১।

৩১ ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : সুপ্রকাশ রায় ; পৃ. ১০১।

বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে 'ফুলার' হত্যার ব্যাপারে এক সহস্র মুদ্রা সাহায্য করেন।* বাঙ্গলাদেশে বিপ্লববাদকে সঞ্জীবিত করার জন্য বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে সাহায্য করেন বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা ও জাপানের ওকাকুরা। 'যুগান্তর'-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, ভগিনী নিবেদিতা ম্যাটসিনীর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডটি বৈপ্লবিক সমিতিকে দেন। এই পুস্তকটি সমস্ত বাঙ্গলাদেশে ঘুরত। গেরিলা যুদ্ধের নিয়মাবলী সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এতে ছিল। ভগিনী নিবেদিতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে 'Memories of a revolutionist' এবং 'In Russian & French Prisons,' নামে দুখানি বৈপ্লবিক চিন্তাসমন্বিত পুস্তক উপহার দেন। সন্ত্রাসবাদী যুবক-সম্প্রদায়, রাশিয়ার 'নিহিলিষ্ট' ও আয়ারল্যাণ্ডের 'সিন্ ফিন্ মুভমেণ্টে'র কর্মপন্থার অনুসরণ করতেন। ভগিনী নিবেদিতা নিজে ছিলেন আইরিশ, তাই ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল তাঁর জন্মগত। এই শিখাময়ী রমণী বিবেকানন্দের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। বিবেকানন্দকে না জানলে যেমন বাঙ্গলার তপঃশক্তির পরিচয় জানা যায় না, তেমনি নিবেদিতার কর্মধারাকে উপলব্ধি না করলে বিবেকানন্দের ভারত-স্বপ্নকে জানা অসমাপ্ত থেকে যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর জীবনস্বপ্ন। 'ভারত'-চিন্তাই ছিল ভগিনী নিবেদিতার গায়ত্রী-মন্ত্র। বিবেকানন্দের আদর্শে তিনি যেমন দরিদ্র নারায়ণের সেবা ও লোক-শিক্ষার কাজে জীবন ঢেলে দিয়েছেন; তেমনি উজাড় করে ভালবেসেছেন হতভাগ্য দেশের প্রাণচঞ্চল তরুণদের। বিবেকানন্দ নিজেকে 'সোসালিষ্ট' বলে মনে করতেন। ভগিনী নিবেদিতা ভাবতেন যে ,রক্তমাখা পথেই ভারতের স্বাধীনতা আসবে। সে স্বাধীনতা হবে নর-নারায়ণের—অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ তফাৎ ঘুচে গিয়ে যে নবীন ভারত জেগে উঠবে, তার ভিত্তিভূমি হবে সমাজতন্ত্রবাদ। ঋষি অরবিন্দও অনুরূপ ভারতবর্ষের কল্পনা করেছিলেন। অবশ্য সমকালে ওকাকুরা 'Asia is one' মন্ত্রে ভারত-চিন্তাকে জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চান। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন বাঙ্গলাদেশে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব আন্দোলনের স্রষ্টা প্রজাপতি

* "বারীন্দ্র যখন ১৯০৬ সালে ফুলারকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা গোপনে দেন বলিয়া শোনা যায়।"

—ভারতে জাতীয় আন্দোলন : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; পৃ. ২৬১।

—নির্বাক, নির্বিকার অথচ অত্যন্ত সক্রিয়। তাঁর ইংরেজি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা পূর্ণ স্বাধীনতার খসড়া বুকে নিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। 'Strength and Weakness' শিরোনামায় এই পত্রিকা আপন বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে বলে,

"If we are to see our countrymen once more good and great amongst the nations of the world, we must first of all be politically free. The wonderful activities with which the Americans astonished the world after their cession from the mother-country, have been attributed to independence, both by Edmund Burke and John Morley. Foreign control represses all noble aims. If a nation loses its power for good, what is the good of its animal existence ? The despot's frown never marked the destiny of a nation. The Austrians frowned, but Italy is free, the Britishers frowned, but the American colonists are free. The seeming witness of a subject people has always turned into invincible strength through inspiring ideal of freedom."[৩২]

ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণের নিরিখে এই নতুন রাষ্ট্রচেতনা বাঙ্গালীর সম্মুখে এক স্থির আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি স্থাপন করে। শ্রীঅরবিন্দের স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে বড় অবদান,—জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আধ্যাত্মমুখী করা। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, শ্রীঅরবিন্দ কেবল রাজনৈতিক অধিকার দাবী করেননি, দেশবাসীর সার্বিক মুক্তি কামনা করেছিলেন। আর সে জন্যেই তিনি চেয়েছিলেন দেশের আধ্যাত্মশক্তির শুভ উদ্বোধন। কারণ ধর্মানুশীলনের মধ্যেই জাতি নির্ভীক ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে।* শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তা প্রচারের ক্ষেত্রে বেদান্তসম্মত ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাতির সমস্ত

৩২ বন্দেমাতরম্ পত্রিকা : সম্পাদকীয় ; ১লা আগষ্ট, ১৯০৭।

* "Political freedom is the life breath of a nation, without it a nation cannot grow cannot expand ...Nationalism is a religion that has come from God.... It has not been crushed. It is not going to be crushed.

শক্তিকে অন্তর্মুখী করে সংহতি দিয়েছিলেন তিনি। ধর্মের সঙ্গে কর্মের এমন অপূর্ব সমন্বয় আর ইতিপূর্বে ঘটেনি। তিনি দেশবাসীকে জানান যে, জাতির নিজস্ব উৎসর্গিত জীবন-সাধনার পুণ্যফলে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, পরের দয়ায় নয়। তাঁর মতে স্বরাজের অর্থ ছিল,—সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব।

শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তার ক্ষেত্রে মাতৃমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাঁর দিব্য জীবনের সাধনা ছিল মাতৃ-সাধনার রূপভেদ মাত্র। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতিকে দিব্যজীবনের স্পর্শ পেতে হলে প্রথমে মাতৃমুক্তির সাধনায় নিরত হতে হবে, আর সেজন্যে চাই শক্তি। তাই সমকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 'ধর্ম্ম' পত্রিকাতে লেখেন,

"বঙ্গবাসী অনেকদিন ঘুমাইয়া রহিয়াছে, যে সব জাগরণ হইয়াছিল, যে নবপ্রাণ সংস্কারক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত করিয়াছিল, তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ম্রিয়মান অবস্থায়, অর্দ্ধনির্ব্বাণ অগ্নির ন্যায় অল্প অল্প জ্বলিতেছে। এমন সংকটাবস্থা যদি বাঁচাইতে চাও, মিথ্যা ভয়, মিথ্যা কূটনীতি ও আত্মরক্ষার চেষ্টা বর্জ্জন করিয়া কেবলই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবার সম্মিলিত হইয়া কার্য্যে লাগ।...মধ্যপন্থী দল জাতীয় পক্ষের সহিত মিলিত হইতে চায় না, গ্রাস করিতে চায়। সেইরূপ মিলনের ফলে যদি দেশের হিত হইত, আমরা বাধা দিতাম না। যাহারা সত্য-প্রিয়-মহান্ আদর্শের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, ভগবান ও ধর্ম্মকে একমাত্র সহায় বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাঁহারা না হয় সরিয়া যাইতেন। যাঁহারা কূটনীতির আশ্রয় লইতে সম্মত, তাঁহারা মধ্যপন্থীদের সহিত যোগদান করিয়া 'মেহেতা'র আধিপত্য, 'মরলী'র আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দেশের হিত করিতেন। কিন্তু

Nationalism survives in the strength of God, and it is not possible to crush it. Nationalism is immortal, nationalism cannot die, because it is no human being, it is God who is working in Bengal....

Nationalism is no itself of creation of individuals, and can have no respect for persons. It is a force which God has created and from Him it has received only one command to advance and advance and ever advance until He bids to stop—because its appointed mission is done.... Nationalism is a Avatara and cannot be slain. Notionalism is a divinely appointed Shakti of the Eternal and must do its God given work before it returns to the bosom of the Universal Energy which it came"—Bandematram ; 1907.

সেইরূপ কূটনীতিতে ভারতের উদ্ধার হইবার নহে। ধর্ম্মের বলে, সাহসের বলে, সত্যের বলে ভারত উঠিবে। যাঁহারা জাতীয়তার মহান্ আদর্শের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা জননীকে আবার জগতের শীর্ষ স্থানীয়, শক্তি-শালিনী, জ্ঞান-দায়িনী-বিশ্বমঙ্গলকারিণী ঐশ্বরিক শক্তি বলিয়া মানব জাতির সম্মুখে প্রকাশ করিতে উৎসুক, তাঁহারা মিলিত হউন। ধর্ম্মবলে, ত্যাগবলে বলীয়ান হইয়া মাতৃকার্য্য আরম্ভ করুন। মায়ের সন্তান আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছ, আবার ধর্ম্মপথে এস। কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বলে যেন কার্য্য না কর। সকলে মিলিয়া এক প্রতিজ্ঞা, এক পন্থা, এক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া যাহা ধর্ম্মসঙ্গত, যাহাতে দেশের হিত অবশ্যম্ভাবী তাহাই করিতে শিখ।”[৩৩]

ঋষি অরবিন্দের ‘এক বিশ্বচিন্তা’ (One World) এই মাতৃসাধনার মধ্যেই রূপকল্প অর্জন করে। তিনি জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের অন্তর্মুখী সাধনাতে বিশ্বমাতার দশ-প্রহরণ-ধারিণী রূপ চিন্তা করে বলেন,

“সেই মহাসৃষ্টিকারিণী, মহাপ্রলয়ঙ্করী, মহাস্থিতিশালিনী জ্ঞানদায়িনী মহাসরস্বতী, ঐশ্বর্য্যদায়িনী মহালক্ষ্মী, শক্তিদায়িনী মহাকালী, সেই দেশের সংযোজনে একীভূতা চণ্ডী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে কৃতোদ্যম হইবেন। ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তি প্রদর্শন এবং জগৎময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার।”[৩৪]

এইভাবে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রিক সাধনা অধ্যাত্মবাদের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল বলেই, স্বাধীনতা সংগ্রাম এমন দুর্নিবার হয়ে উঠে। শুধু মাত্র স্বাধীনতা কামনাই নয়, একটি সর্বব্যাপক জীবনচিন্তা—যা সৃষ্টি ও রক্ষার মধ্যে সার্থক হতে চায়; সেরূপ একটি উচ্চ জীবনবোধ দর্শনরূপে জাতির চিত্ততল থেকে বিকশিত হয়েছিল। তাই ধর্মরক্ষা, সমাজরক্ষা, স্বদেশরক্ষা, প্রজারক্ষা সমস্ত কিছুতেই বাঙ্গালীর চিন্তা তরঙ্গায়িত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে থাকে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেম। আর মানুষের চিন্তা-ভাবনা, কার্যধারা, আবেগ-অনুভূতি সমস্ত কিছু দর্শনে রূপায়িত না হলে সত্যকার বিপ্লব পরিচালনা করা যায় না। সে কারণে বাঙ্গলার জাতীয় নেতারা সংগ্রামী

৩৩ ধর্ম্ম পত্রিকা : ১২ই পৌষ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

৩৪ ধর্ম্ম পত্রিকা : ১২ই পৌষ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

মন ও শক্তি গড়ে তোলবার জন্যেই জাতির দুর্যোগের করাল রাত্রে মাতৃসাধনায় তৎপর হয়েছিলেন। বাঙ্গলা মায়ের দামাল ছেলেরা দেশমাতৃকার জন্য বলি প্রদত্ত হয়েছিল। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, উল্লাসকর দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত প্রভৃতি সমর-সৈনিকেরা মরণ-সাগর-পারে অমর হয়ে রয়েছেন।

ইংরেজ সরকার বাঙ্গালীর এই তন্ত্র সাধনাকে অত্যন্ত ভীতির চোখে দেখেছিলেন। জাতীয় জাগরণকে দমন করতে তাঁরা কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেননি। কিন্তু বাঙ্গলাদেশ রক্তের শপথ দিয়ে 'বঙ্গভঙ্গ' রোধ করল (১৯১১)। এমন কি ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ভারতে মুক্তি আন্দোলন যে রূপ পেয়েছিল, তার ভিত্তি ছিল বাঙ্গলা দেশের স্বদেশী আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনে যে 'বয়কট' নীতি গৃহীত হয়েছিল, পরবর্তী কালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে তা আরও তীব্র হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে। সারা ভারতব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের সূচনা যে ১৯০৫ সালে বাঙ্গলার মাটিতেই হয়েছিল—ইতিহাসের এই মহাসত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

শেষ কথা

৬

স্বাদেশিকতার যৌবন-মুক্তি পর্বে বাঙ্গালী প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বরাজের দাবী জানিয়েছিল; আর এই স্বরাজের অর্থ ছিল পূর্ণ কর্তৃত্ব। গণসংযোগের মাধ্যমে আত্মশক্তির বিকাশ ঘটেছিল বলেই বাঙ্গালীর রাজনৈতিক আন্দোলন এমন উত্তাল হয়ে উঠে। এই পর্বে বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তা ভাবরূপ ত্যাগ করে মৃত্তিকাস্পর্শ লাভ করে। বিপিনচন্দ্র পাল পূর্বের সঙ্গে বর্তমানের স্বদেশচিন্তার পার্থক্য দেখিয়ে বলেন,

"This new love is not, as of old, a vague sentiment and a fairy fancy···but something real and true, not merely a subjective attitude but something that yearns for an

objective expression and realisation, through acts and symbols, as always happens with all real and true love".[৩৫]

আইডিয়ার 'রিয়েলিজমে' উত্তরণই এই পর্বের শ্রেষ্ঠ ঘটনা। আর তাই দেশপ্রেমের গভীর অনুভূতিতে স্বদেশী আন্দোলনের সময় শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, ব্যবসাবাণিজ্য, পল্লীগঠন প্রভৃতি দেশগড়ার কাজে বাঙ্গালী আত্মনিয়োগ করে। রাজনৈতিক আন্দোলন সে সময়ে জাতিকে দেশ, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে পূর্ণতর সজাগ দৃষ্টিভঙ্গী দান করেছিল। 'বঙ্গভঙ্গে'র ফলে দেশে যে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়, তার স্পন্দন সুদূর গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ বাঙ্গালীর জাতীয় ঐক্য অখণ্ড গ্রন্থীতে বাঁধা পড়ে। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ বাঙ্গালীকে আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঘটনা।

বাঙ্গালী নাট্যকারগণ জাতির এই জাতীয় চেতনার দিনে স্বাদেশিক ভাবধারায় মেতে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক সমরে যোগ দেন। যে চিন্তায় বাঙ্গালী দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হয়েছিল, তাকেই তাঁরা নাটক রচনার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। দেশের উন্নতি করতে হলে জাতিকে কি ভাবে দেশকে ভালবাসতে হবে, সমস্ত দোষগুণের মধ্যে ভাব সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে, পরনির্ভরতা ত্যাগ করে স্বাবলম্বী হতে হবে—সমস্ত কিছুই তাঁরা নাটকের বিষয়বস্তুর অন্তরালে গ্রহণ করে দৃশ্যকাব্যরূপে জনচিত্তের সামনে অভিনয়ের দ্বারা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ধর্মকে জাতির স্বার্থে পুনরুদ্ধার করে দেশ ও দেশবাসীকে অক্ষয় ঐক্যে বেঁধে দেবার মহমন্ত্র প্রচার করেছিলেন নাট্যকারেরা। দেশে যাতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, পল্লী সংঘটন দ্রুত হয়, জাতি ও ধর্ম-বিদ্বেষ দূর হয়ে উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান গভীরভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে মিলতে পারে; অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে ও দারিদ্র্য মোচন হয়—তার সমস্ত কিছু পরিকল্পনা নাট্যকারেরা নাট্যমঞ্চ থেকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। এককথায় বাঙ্গলা নাটক ছিল সেকালের সমাজ বিপ্লবের চিত্ররূপ, আর নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

৩৫ Swadeshi and Swaraj: B. C. Pal; pp. 18-19.

বার

গিরিশচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার প্রাক্ কথন

১

গিরিশচন্দ্রের স্বাদেশিকতার স্বরূপ তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে আছে। তবে তিনি ছিলেন প্রধানতঃ পৌরাণিক নাট্যকার। ধর্মাশ্রিত ঐক্যভাবনা ও হিন্দুসংস্কৃতির প্রসার ঘটানই তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতীয়দের জাতীয় ভাবনা বলতে তিনি দেশের সনাতন হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছিলেন। নিম্নলিখিত বক্তব্যের মধ্যে আমরা গিরিশচন্দ্রের মানসিক আকাশ ও নাটক রচনার স্বরূপটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

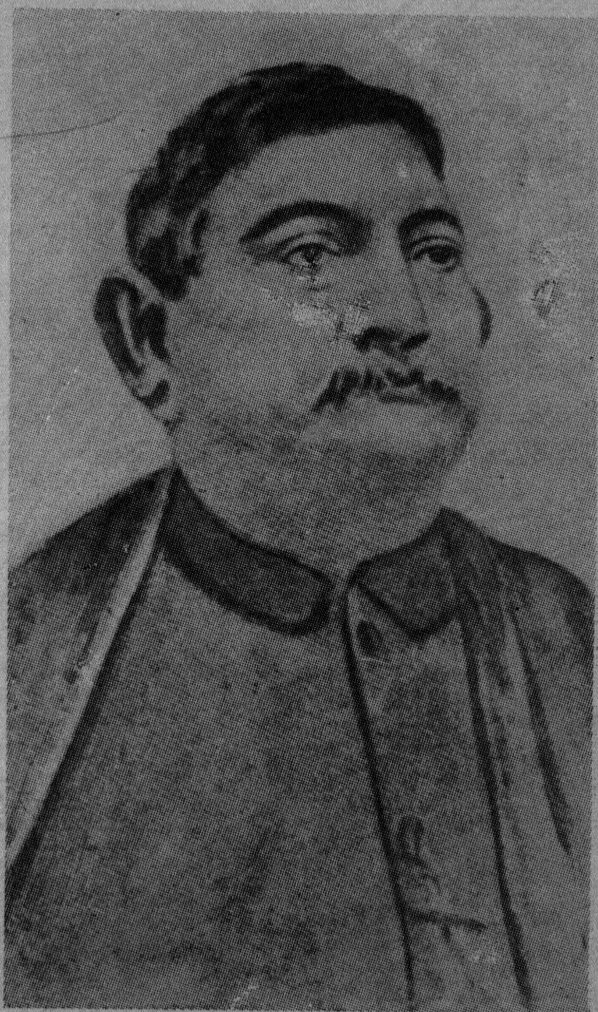
"জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতির হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্ম—ধর্ম্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্ম্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হলসঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্ব্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণনামেই হইবে। ইংরাজী ভানে, বিদেশীয় ভানে যাহারা সেই ভান করেন (তাঁহারা সেই ভানের মর্ম্ম বোঝেন না) সেই ভানে জাতীয় উন্নতি কখনও হইবে না। জাতীয় হৃদয়ের উপর উন্নতির ভিত্তি। ·· ···

হিন্দুস্থানের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্ম। মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্ম, বিদেশীয় ভীষণ তরবারি-ধারে উচ্ছেদ হয় নাই।··· ··

যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই Mythological অর্থাৎ পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে হোমার; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভার্জ্জিল; খৃষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিলটন; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গলায় মাইকেল। যিনি পৌরাণিক গ্রন্থের বল জানেন না· ·মনুষ্য-জীবনের দায়িত্ব তিনি বুঝেন নাই।"[১]

---

১ পৌরাণিক নাটক (রঙ্গালয় সাপ্তাহিক পত্রিকা): গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ৩০শে চৈত্র, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

উনিশ শতকের উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের সাধনায় স্বদেশ ও স্বধর্ম সম্পর্কে যে একটি গৌরবময় ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, তারই সার্থক বিকাশ ঘটেছে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকে। ভারতের চিরন্তন ধর্মাদর্শের মধ্যে জ্ঞান-প্রেম-ভক্তি সাধনার যে মহামন্ত্র আছে, তাকে ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে বাঙ্গালীর উনিশ শতকের নব্য জীবনবাণী ও জাতীয় হিতাদর্শের মধ্যে অনুবিদ্ধ করে দেন। গিরিশচন্দ্রের সাধনাতে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মচিন্তা ও বিশ্লেষণ, আধুনিক যুগের মননে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃপ্ত মর্যাদায় এক স্বতন্ত্র গৌরব লাভ করে। দেবতা ও দেবলোকের চাইতে শতশৃঃখলাঞ্ছিত মানবজীবন এবং ধরণীতল অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও গৌরবময় স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়। আত্মনিবেদনের পরিবর্তে পৌরুষসাধনা ও বীর্যপ্রকাশই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি লাভ করে।* অবশ্য এই মনোভাবনার পশ্চাতে বিবেকানন্দের ধর্মাশ্রিত মানবধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল। গিরিশচন্দ্র, স্বামীজীর মত বিশ্বাস করতেন যে ভারতের ধর্মসাধনাকে ত্যাগ, সেবা ও জাগ্রত পৌরুষসাধনার মধ্যে জাগিয়ে

---

* "জনা। দেহ আজ্ঞা, যাব রণে নন্দনে লইয়ে,
আজ্ঞা মাত্র চাই ;
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব,
তনয়ে করিব রথী, সারথী হইব,
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে।
নারায়ণ অরিরূপী যার
করগত গোলক তাহার!
সুসময় উদয় ভূপাল,
অরিরূপে নারায়ণ আসিয়াছে ঘরে।
বাজ্য ছাড়, জীবন অসার,
অতুল গৌরব ভবে রাখ, নরবর,
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সনে বাদ করি।
ব'য়ে যায় জাহ্নবীর পূজার সময়,
বিদায় চরণে এবে।
যথা ইচ্ছা কর নরপতি,
পতি তুমি কত আর কব,
রণে যেতে পুত্রে কভু আমি না বারিব"। জনা (১।৪গ)

অথবা

তুলতে পারলেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সার্থক হবে। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিবেকানন্দের বাণী ও কর্মভাবনার আদর্শ প্রচার করে বলেন,

"আমার বিশ্বাস দেশ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের আর আদেশের অনুসরণ না করলে কিছুতেই অগ্রসর হবে না। তিনি বারবার দেশকে বলে গেছেন যে ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূল প্রাণ ধর্ম্মে।"[২]

গিরিশচন্দ্রের কর্মচিন্তাতে বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও বেদান্তশাখাশ্রয়ী জ্ঞানকাণ্ড একই সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছিল বলে, তিনি পৌরাণিক নাটকে গতানুগতিক হিন্দুধর্মের সনাতন ভক্তিবাদ ও শাশ্বত পারলৌকিক প্রীতি প্রচার করেননি। জ্ঞান-প্রেম ও কর্মের ত্রিবেণী, পৌরাণিক নাটকে মুক্তধারার মত

"জনা। ধিক্ মন্ত্রিবর, শত ধিক্ সেনাপতি!
প্রায় নিশা অবসান,
আছ সবে জম্বুক-সমান দাঁড়াইয়ে ?
প্রাতে অরি আক্রমিবে পুরী,
উৎসাহ-বিহীন আছ পুতলি সমান ?
মরণে কি মন্ত্রী এত ভয় ?
রণ-মৃত্যু না হ'লে কি এড়াবে শমন ?" জনা (২।৩গ)

পুনরায়,

"জনা। ধন্য ধন্য মহারাজ,
দাসত্বে আনন্দ তব বহু!
রাখিলে ক্ষত্রিয়-কীর্ত্তি অতুল জগতে,
পুত্রঘাতী বিপক্ষের দাস!
... ...
উঠ, উঠ, নরপতি!
পুত্রঘাতী রয়েছে জীবিত।
সাজ, সাজ, বীরবীর্য করহ প্রকাশ।
... ...
ধন্য! ধন্য কৃষ্ণভক্তি তব!

হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার।
বাঁধ বুক, ধর ধনু, প্রবেশ সমরে।" জনা (৪।৩গ)

২ গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য : কুমুদবন্ধু সেন ; পৃ. ৭-৮।

স্রোতোস্বিনী ছিল বলে, তাঁর প্রত্যেক রচনাই লোকশিক্ষার পীঠস্থান হয়ে উঠে। এ বিষয়ে তিনি গুরুর নির্দেশ, নিষ্ঠাবান ভক্তের মত পালন করেছিলেন।†

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গলা নাটক রচনাতে যুগাদর্শে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। সে সময়ে দেশনেতাদের বক্তৃতায় ও লেখনীতে হিন্দু ধর্মাদর্শ ও জাতীয় ভাবনার যে এক ভাবসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছিল, গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটক রচনার বিষয়বস্তুতে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। দেশের সনাতন ধর্মচিন্তার সঙ্গে উনিশ শতকের নব্য জীবনচিন্তাকে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করে তিনি দেশ নেতাদের সঙ্গে একই সঙ্গে জাতীয় কর্তব্য পালন করেন। আর এরই জন্য তাঁর জাতীয়তাবোধ ইউরোপীয় 'Patriotism' মার্গ অনায়াসে পরিত্যাগ করেছিল। দেশ ও দেশের মানুষকে তিনি নাটক রচনা ও নাট্যশালাতে অভিনয়ের মাধ্যমে আপন সংস্কৃতিবোধ ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিলেন বলেই, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে নাট্যরূপ দিয়ে তাঁর মনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি দেশবাসীর বৃহত্তর প্রয়োজন মেটাতেই নাটক রচনা ও রঙ্গালয় পরিচালনা করেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল,

"দেখ, যুগধর্ম্ম বলে একটা জিনিষ আছে। এই স্বদেশীযুগে যে প্রবল দেশহিতৈষণার বন্যা ছুটে আসছে, আমাদের রঙ্গালয়কেও সেই ভাবে টেনে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হচ্ছে নাটকের ভিতর দিয়ে দেশহিতৈষণা preach করি। রঙ্গালয়কে powerful করতে এই একটা মস্ত সুযোগ। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস পড়লে একটা বিশেষ সত্য দেখতে পাবে—রঙ্গালয় দেশের জাতি ও সমাজকে উন্নততর স্তরে চালিয়ে নিতে কতটা সাহায্য করেছে সাধারণ মানুষের প্রাণে একটা নূতন প্রেরণা জাগাতে। আমার ইচ্ছা, আমাদের বাঙ্গালার, ভারতের এমন কতকগুলি মহামানবের চরিত্র নিয়ে নাটক লিখি, যে নাটক পড়ে বা অভিনয় দেখে মানুষ সত্যিকার

† "গিরিশচন্দ্র। আমি আপনাকে পেয়েছি, আবার কি আমায় ওখানে (থিয়েটারে) যেতে হবে? আর কি দরকার?

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁ, যেতে হবে বৈ কি। তুমি যা কচ্ছো, তাই করবে। ওতে লোকশিক্ষা হবে। তাই তোমার দরকার। . .

গিরিশচন্দ্র। জয় রামকৃষ্ণ।" শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।"

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। যে জাতি আপনার ধর্ম্ম, জাতি, মানুষ ও দেশের সাধককে ভালবাসতে পারেনি, ভালবাসতে শেখেনি, সে কি করে বড় কাজ করবে। আমার মনে হচ্ছে রঙ্গালয়কে নূতন করে গড়ি। একটা জাতির জীবন যে রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয়ে প্রতিফলিত হয়, এই সত্যকথা বোঝাবার জন্যই আমি রঙ্গালয়ে—তিরস্কার পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করে, অভিনেতার জীবন হতে নাটক পর্য্যন্ত লিখে চলেছি। বিধাতা আমাদের জাতির কল্যাণের জন্যই বোধ হয় রঙ্গালয়ের সহিত আমাকে সংশ্লিষ্ট করেছেন।······জানো, আমরা মরে যাব, কিন্তু এমন একদিন হয় ত আসবে, যখন লোকে জানবে—আমরা রঙ্গালয়ের ভিতর দিয়ে দেশের সব বিভেদ ভুলিয়ে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সব জাতি এক করে দেশের ঐক্যমন্ত্র সাধন ও কল্যাণের জন্য কি করেছি। জানো, গিরিশ ঘোষকে যদি কেউ বলে, মশাই, সভায় এসে বক্তৃতা করুন, সভাপতি হন। আমি বলব No never! আমি ওসব বক্তৃতার হাঙ্গামা ভালবাসি না। কাজ চাই। Not in words but in deeds."[৩]

কেবল নাটক রচনা অথবা রঙ্গালয় পরিচালনা করে নয়, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল খুবই আন্তরিক। বিশেষভাবে 'মহাপূজা' (১৮৯০) রূপক নাট্যের, 'নয়নজলে গেঁথে মালা পরাব দুঃখিনী মায়' ও 'সোনার বাংলা' গান দু'টি অত্যন্ত আবেগ সৃষ্টি করেছিল জনচিত্তে। পরানুবাদ, পরানুকরণ ও মোহঘোর থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করবার পরিকল্পনা নিয়েই তিনি এই গানগুলি রচনা করেন। পরাধীনতার মর্মবেদনা 'সোনার বাংলা'র সর্বাঙ্গে মিশে আছে। যেমন,

... ...

(সন্তানের উক্তি)

"শুনি মা তুই সোনার বাংলা
শুনি যেমন সোনার কাশী।
তুই যদি মা সোনার বাংলা
আমরা কেন উপবাসী॥

... ...

---

৩ মহাকবি গিরিশচন্দ্র : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : পৃ. ৮৩-৮৪।

দু'পাতা ইংরাজি বেটে,
দেমাকে মরেছি ফেটে,
সারা হলেম খেটে খেটে,
গলাতে গোলামী-ফাঁসী ॥
... ...
(মাতার উক্তি)
ঘুমিয়ে আছ অঘোর হয়ে—
তাইতে থাক উপবাসী।
ডাকি কত উঠ নাতো,
চোখের জলে সদাই ভাসি ॥
.. ..
সোনার আমি যাদুমণি,
ক্ষেত্র আমার সোনার খনি,
ভ্রাতৃপ্রেমের বিমল জলে
ধোও রে মায়ের মলারাশি ॥"[8]

বাঙ্গলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে 'বয়কট' নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তার সার কথা হচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন ও দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কোন বৈষম্য নেই, এই মহাসত্যটি 'বয়কট' আন্দোলনে প্রচার করা হয়।* দেশের রাজনৈতিক

৪ গিরিশ গীতাবলী : প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (১৩১৪ বঙ্গাব্দ)।

* "Honest Swedeshism is Swedeshism within the limits of Free Trade policy. *** Honest Swedeshism is said to be economic Swedeshism. But every tryo in political economy knows that there can be no economics divorced from politics. Economics and politics are organically related to one-another; and India cannot consider the two apart, separated from and unconnected with one another. * * *

Economic Swedeshism before Swraj aims at stimulating production; improving the quantity of native products, improving the quality of our industries; and by larger production and better quality, honest Swedeshism hopes gradually to push foreign imports out of the Indian market. That is the position of honest Swedeshism."

Swedeshi and Swraj: (Boycott) B. C. Pal; pp. 223-226.

নেতাদের মতন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র দেশের পুঁজিকে দেশেই সংগচ্ছিত করতে ইচ্ছুক ও প্রয়াসী ছিলেন। তিনি দেশবাসীকে সর্ব বিষয়ে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই মর্মে তিনি যে একটি স্বাদেশিক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তাতে স্বদেশী আন্দোলনের মূল তত্ত্বটি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে ধরা পড়েছে।

"কেন আর ভাব্‌ছ অত, দু'দিন থাক র'য়ে স'য়ে।
এস ভাই থাকি সবাই, মায়ের ছেলে মায়ের হ'য়ে॥
স্বদেশী কাপড় নিতে পেছিয়ো না ভাই দু'পাই দিতে,
হার হ'বে না, যাবে জিতে, দেশে টাকা যাবে র'য়ে॥
ভয় ক'রো না চড়া দরে, সস্তা হবে দু'দিন পরে,
তাঁত বসেছে ঘরে ঘরে, সস্তা কাপড় দেবে ব'য়ে॥
কাজ কি বিদেশী ধাঁজে, ফক্কিকারী কিনে বাজে,
আধা দিলে দেশের কাজে, কেউ তো ভাই যাব না ক্ষয়ে॥
প'ড়ে থেকে পরের পায়ে, পেটে ভাত নাই, বস্ত্র গায়ে,
মাথা দিতে আপন দায়ে, ভীরু যে সে পেছোয় ভয়ে॥
দুখের তো নাই অবধি, দেখি কিছু হয় হে যদি,
সইবো কত নিরবধি, যা' হ'বার যাক্ হ'য়ে ব'য়ে॥"[৫].

আবার, 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' প্রহসনে বঙ্গরমনীদের কণ্ঠসঙ্গীতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব সুস্পষ্ট।

"বাঙ্গালী বাঙ্গালীর মেয়ে,
কাজ কি বিবিয়ানা বাই।
বুকে-পিটে সেঁটে ধরে,
জ্যাকেট-বডির মুখে ছাই॥
এখন চল্‌ছে কস্তাপেড়ে সাড়ী,
শাঁখার আদর বাড়ী বাড়ী,
ভেঙ্গে কাঁচের বাসন কাঁচের চুড়ি,
ঘুচেছে কাঁচের বালাই॥

৫ গিরিশ গীতাবলী: প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (১৩১৪ বঙ্গাব্দ)

পরেছে ধুতি চাদর, বেড়েছে তাঁতীর আদর,
কর্কচের কদর এখন,
লিবারপুল আমদানি নাই ॥
দেখেছে ঠেকে শিখে,
সাহেবয়ানা বেবাক ফিকে,
বলে না সাজতে বিবি,
সাবান ছেড়ে ব্যাসম তাই ॥
সাহেব ব'লে দিতে ধোঁকা,
নাম রাখে না আঁকাবাঁকা,
(এখন) বলতে বাঙ্গালীর ছেলে,
বাঙ্গালীর আর সরম নাই ।
বুঝি বা এতদিনে গরবের দিন এলো ভাই ॥"* (অষ্টমদৃশ্য)

* সমকালে অনেকগুলি বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীত রচিত হয়েছিল। বাঙ্গলাদেশে তথা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্পদ যাতে বিদেশী বণিকদের দ্বারা লুণ্ঠিত না হয়ে দেশের মধ্যে থাকে, এই মর্মে অনেক প্রচার চালান হয়। অর্থনৈতিক নির্ভরতায় দেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও জাতিকে স্বদেশমুখী করতে স্বদেশী সংগীতগুলির ভূমিকা ছিল অসাধারণ। কয়েকটি উদ্ধৃতি যুগপর্যালোচনার স্বার্থে গ্রহণ করা হল।

(ক) "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই ;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাঁচ, সাবান, মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই ;
পরের জিনিস কিনবো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।" (রজনীকান্ত সেন)

গিরিশচন্দ্র, স্বদেশী আন্দোলনের 'বয়কট' নীতিকে সমর্থন করলেও, কোনদিন উগ্র জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, দেশের অর্থ সংরক্ষণের জন্য দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উদ্ধার ও প্রসার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু, সে সময়ে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপর 'বয়কট' নীতিকে যেভাবে জোর করে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছিল, তাকে তিনি সমর্থন জানাতে পারেননি। এই বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতানুগামী ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল,

"একে গরীব দেশ, তাতে কত কষ্টে লোকে এক জোড়া কাপড় কিনতে পারে। দেশের আর্থিক অবস্থা কি এতই স্বচ্ছল যে লাখ লাখ টাকার জিনিস লোকে আগুনে আহুতি দিতে পারে।"[৬]

(খ) "ছেড়ে দাও কাচের চুড়ী বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর প'রো না।
জাগ গো ও ভগিনী, ও জননি!
মোহের ঘোরে আর থেকো না!
কাচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে
কলঙ্ক হাতে মেখো না,
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্ম্ম সাক্ষী,
জগৎ ভরে, আছে জানা;
... ...
বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে,
বার লাখের কম হবে না,
পুঁতি কাচ ঝুটা মুক্তায়, এই বাঙ্গলায়—
দেশ বিদেশে কেউ জানে না;
ঐ শোন বঙ্গমাতা, শুধান কথা,—
উঠ আমার যত কন্যা
তোরা সব করিলে পণ, মায়ের এ ধন,
বিদেশে উড়ে যাবে না।
আমি যে অভাগিনী, কাঙ্গালিনী,
দুই বেলা অন্ন জোটে না;
কি ছিলাম, কি হইলাম, কোথায় এলাম?
মা যে তোরা ভাবিলি না!"
(মুকুন্দদাসের গান)

৬ গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য: কুমুদবন্ধু সেন; পৃ. ৫-৬।

গিরিশচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকে অন্তর দিয়ে সমর্থন করেন। তবে অনর্থক বিবেচনাহীন রাজনৈতিক মাতামাতিকে তিনি স্বাগত জানাতে পারেননি। দেশানুরাগের অন্ধ উচ্ছ্বাসের চেয়ে জাতির সংগঠন মনোভাবনাকে তিনি বেশি পরিমাণে আবশ্যিক কর্তব্যচিন্তা বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, বাঙ্গালী সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করুক। স্বদেশী আন্দোলনের বিপথগামীতা লক্ষ্য করে তিনি বলেন,

"এই আন্দোলন 'মিসডাইরেক্‌টেড্', —কতকগুলি পেশাদার রাজনৈতিক নেতার হুজুগে ছেলেরা মেতে উঠেছে। ...যেখানে লাখ লাখ লোক অনাহারে, অর্ধাহারে রয়েছে, ম্যালেরিয়ায়, প্লেগে আর অন্যান্য উৎকট ব্যারামে লাখ লাখ ভারতবাসী মরছে,—যেখানে নৈতিক চরিত্র-হীনতায়, মূর্খতায়, ব্যভিচারে, কদাচারে কোটি কোটি লোক উচ্ছন্ন যাচ্ছে সেখানে তাদের উদ্ধারে, তাদের সেবা, তাদের জন্য স্বার্থত্যাগ করা কি 'বেঙ্গল পার্টিসান' রদ করবার চেয়ে বড় নয়।"[৭]

গিরিশচন্দ্র, সেবাধর্মকে জীবনের অন্যতম ব্রত বলে মনে করতেন। নিষ্কাম কর্ম ও জীবসেবাকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ী উদার মতবাদ ও বিবেকানন্দের জীবন-অনুবিদ্ধ ধর্মবোধ তাঁর সমস্ত কর্মের প্রেরণা ছিল। এজন্য তিনি, যে কর্মচিন্তাকে দেশের বিস্তৃত চত্বরে প্রসারিত হতে দেখেননি অথবা এক সংকীর্ণ পরিমণ্ডলে আবদ্ধ দেখেছেন, তাকে সমর্থন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই তিনি কংগ্রেসের প্রথম দিকে দেশের বিস্তৃত জনসাধারণের হিতবর্জিত, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্বাগত জানাতে পারেননি। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন,

"কংগ্রেসে কন্‌ফারেন্সে যে রাজনৈতিক আন্দোলন—তা বক্তৃতার ফোয়ারা। পড়তে বেশ, শুনতে বেশ। তাতে কি হবে? দেশের দুর্দ্দশা মোচন, দেশের দুর্দ্দশার জন্য 'ডিপ ফিলিং', বা গভীর বেদনাবোধ দুই-একজনের থাকতে পারে—কিন্তু অপর সকলে একটা হুজুগে পড়ে যায় এই তো আমার বিশ্বাস।"*[৮]

৭ গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য: কুমুদবন্ধু সেন; পৃ. ৬।

* স্বামী বিবেকানন্দের মত ও চিন্তার প্রভাব গিরিশচন্দ্রের বক্তব্যের উপর প্রতিফলিত হয়েছে:

"অশ্বিনীবাবু। কংগ্রেসের কাজকর্মে কি আপনার কোন আস্থা নেই?

বাঙ্গলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ণ জোয়ারে তিনি সংগঠনমূলক চিন্তাকে মনে-প্রাণে একনিষ্ঠ তাপসের মত গ্রহণ করেন, এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দের আদর্শকে শিরোধার্য করে কর্মক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ চত্বরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশ ও জাতিকে স্বাদেশিকতার পূতাদর্শে দীক্ষিত করবার জন্য তিনি পরিচালনা করলেন রঙ্গালয়, রচনা করলেন দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য নিয়ে ধর্মাশ্রিত ও ঐতিহাসিক বাঙ্গলা নাটক। মানবিকতার উচ্চ বেদীতে তাঁর চিত্তের ভাবসৌকর্য অবস্থিত ছিল বলেই রঙ্গালয়ের নট-নটীরা সামাজিক জীবনে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তাই গিরিশচন্দ্র ছিলেন সর্ববিষয়ে **Constructive Nationalist.**

নট ও নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্যে এক অক্ষয় গৌরবের অধিকারী। এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে আছে রঙ্গালয়ের প্রতি তাঁর গভীর অঙ্গীকার ও জাতীয় কর্তব্যের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ অনুধ্যান। নাট্যকারের বিনম্র চিত্তের অনুরাগ ও দায়িত্ব নিজের বিনীত ভাষ্যেই স্বীকৃতি লাভ করেছে।

"তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ।
রঙ্গভূমি ভালবাসি হৃদে সাধ রাশি রাশি
'আশার নেশায় করি জীবন যাপন ॥"

স্বামীজী। না, তা নেই। 'তবে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'। ···বলতে পারেন, কংগ্রেস জনসাধারণের জন্য কি করেছে? আপনি কি মনে করেন, কয়েকটা প্রস্তাব পাশ করলেই স্বাধীনতা এসে যাবে? ······প্রথম জাগাতে হবে জনসাধারণকে। গোড়ায় তাদের পেট পুরে খেতে দেওয়া হোক, তাহলেই তারা নিজেদের মুক্তির পথ করে নেবে। ······আপনারা যান অস্পৃশ্য মুচি-মেথরদের কাছে; তাদের গিয়ে বলুন, তোমরাই জাতের প্রাণ, তোমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে তা দুনিয়াকে ওলট-পালট করে দিতে পারবে। জাগ তোমরা, বাঁধন ছিঁড়ে ফেল, সারা জগৎ তোমাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে।"

দ্র: বিশ্ববিবেক (মনীষী-সঙ্গমে):

ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত; পৃ. ১৪৪-৪৫

৮ গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য: কুমুদবন্ধু সেন, পৃ. ৬।

২

মহাকবি গিরিশচন্দ্র যুগধর্মের সঙ্কটাবর্তে যে আলোড়িত হয়েছিলেন, তার চিহ্ন তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে পাওয়া যায়। দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যের অকৃত্রিম তাগিদ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, ভক্তিরসাশ্রিত নাটক রচনা থেকে তিনি সাময়িকভাবে সরে এসে রণরঙ্গমুখর ঐতিহাসিক কাহিনীতে দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর এই মানসিক রূপান্তরের পিছনে আছে একনিষ্ঠ স্বদেশানুরাগ। দেশবাসীর দুর্যোগের ঘন অমানিশাতে গিরিশচন্দ্রের দরদী চিত্ত, জাতীয় আত্মার ব্যাকুল ক্রন্দনে ব্যথিত হয়েছিল। জাতিকে আত্মস্থ করে সাম্প্রদায়িক ঐক্যবিচিন্তাতে অভিষিক্ত করাই তিনি স্বদেশী আন্দোলনের কালে একমাত্র প্রয়োজনীয় কর্ম বলে মনে করেন। ভারতের বিশ্বমৈত্রী, সনাতন মানবধর্মের আদর্শবাদ প্রচার, ঐতিহাসিক সত্যের পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা এবং দেশবাসীকে সর্ব বিষয়ে স্বাবলম্বন অভ্যাসে দীক্ষিত করাই ছিল তাঁর স্বাদেশিক ভাবনার মূলমন্ত্র। গিরিশচন্দ্রের 'ত্রয়ী' ('সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি') নাটকে, নাট্যকার তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তিকে প্রচার করে দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে আন্তরিক হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

গিরিশচন্দ্রের ইতিহাস প্রীতিতে যুগধর্মের লক্ষণই প্রকাশিত হয়েছে। তবে নাট্যকার 'বঙ্গ-ভঙ্গ' আন্দোলনের পূর্বে যে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন, তাতে রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধ অপেক্ষা ধর্মাশ্রিত জাতীয়তাবোধ অধিকতর স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। কারণ, তাঁর মানসিক প্রবণতা সর্বদা পুরাণচর্চা ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যার দিকে আগ্রহী ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, 'সৎনাম' (১৯০২) নাটকটিতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের সুর গভীরভাবে ধ্বনিত হয়েছে এবং নাট্যকার উদার ধর্মবিশ্বাসের বিশাল চন্দ্রাতপে ধর্মীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক মিলনবাণী প্রচার করেছেন। তবে তিনি ইতিহাসের আনুগত্যকে কোথাও অবহেলা করেন নি। অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত ঘটনাবলীর মধ্য থেকে জাতি প্রকৃত সত্য ও তথ্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হবে, এই বিশ্বাসে তিনি স্বাদেশিকতার আদর্শ

প্রচারের সঙ্গে ইতিহাসের যথার্থ অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণে রত হয়েছিলেন।* স্বদেশী আন্দোলনের সমকালীন দেশাত্মবোধ ও স্বাদেশিক ভাবধারা 'সৎনাম' নাটকে অনুপস্থিত। আবার, কয়েকটি ইতিহাস বহির্ভূত চরিত্রের অতিনাটকীয় আচরণে এবং রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডির আতিশয্যে নাটকটি যথার্থ পরিণতি লাভ করেনি। তাছাড়া ধর্মতত্ত্বের প্লাবনী ব্যাখ্যায় দেশপ্রেমের কথা, ও দেশাত্মবোধের ঋজুতা বহুলাংশে 'সৎনাম' নাটকে ব্যাহত হয়েছে। ধর্মভাবের মূল প্রেরণা গভীরভাবে অনুবিদ্ধ হওয়ার জন্য রাজনৈতিক চিন্তার প্রত্যক্ষতা নাটকটিতে নেই। নাট্যকারের রচনা বহুলাংশে শিথিল এবং অসংবদ্ধ হওয়াতে জনচিত্তে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি।

'সৎনাম' নাটকটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র আদর্শে রচিত। 'আনন্দমঠ' উপন্যাস যেমন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত, তেমনি 'সৎনাম'নাটকটি, 'সৎনামী' সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ অবলম্বনে রচিত। সৎনামী সম্প্রদায় কৃষকদের সংগঠিত করে ভারতসম্রাট ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং সাময়িকভাবে সাফল্য অর্জন করেছিল, গিরিশচন্দ্র এই ঘটনাটিকে ইতিহাসের স্বীকৃত তথ্য থেকে গ্রহণ করেছেন।† কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মবোধে স্বদেশচিন্তার যে যুক্তিবাদী গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্য আছে, জাতীয় চরিত্র গঠনের মধ্য দিয়ে

* "মুসলমানের প্রতি রচয়িতার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, এবং মুসলমান যে সমস্ত গুণগ্রামে ভূষিত, তাহা হিন্দুর আদর্শ হওয়া উচিত,. এইরূপ নাট্যকারের ধারণা। হিন্দু মুসলমান এক্ষণে আমরা এক হিন্দুস্থানবাসী—সুখদুঃখের অংশী। অতএব পূর্ব্বকালে হিন্দু মুসলমানে যে সকল দ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখে কোন জাতির ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। এবং ইতিহাসদৃষ্টে উভয় জাতির পূর্ব্বভ্রম সংশোধিত হইতে পারে। ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধীয় এবং রাউণ্ডহেড ও ক্যাভেলিয়ারের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধীয় সার ওয়ালটার স্কটের উপন্যাস ইহার প্রমাণ।"—ভূমিকা (সৎনাম)।

† " 'সৎনামী' সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত। ইঁহারা ভগবানকে 'সৎনাম' বলে, এই নিমিত্ত ইঁহাদের নাম 'সৎনামী'। নাটকের ঐতিহাসিক অংশ কয়েকখানি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

[1. The Posthumous papers of the late H. M. Elliot, K. G. B. 2. British India by Hugh Murray, F. R. S. E and others. 3. Scott's History of Dekkan. 4. Calcutta Review. 5. Elphinstone's History of India. 6. Mogul Dynesty (Catron).]

"বৈষ্ণবী নাম্নী জনৈক রাজপুতরমণী এই বিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন। আমার ধারণায় ঐতিহাসিক

স্বাধীনতা অর্জনের যে প্রকৃত পন্থা নির্ধারিত হয়েছে; গিরিশচন্দ্রের 'সৎনাম' নাটকে তার কিছুই নেই। নাট্যকারের আবেগপ্রবণ চিন্তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ স্বীকৃতি পায়নি। তিনি কেবল হিন্দুশাস্ত্রের বিবিধ বিধানের নিয়ম-নীতির অযথা কচকচানি করেছেন, কোন স্থির লক্ষ্যের সন্ধান দিতে পারেন নি। এক অলৌকিকতার মধ্যে নাটকখানির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তবে পরবর্তী কালের নাট্যচিন্তার আভাস ও ইঙ্গিত এই নাটকে বর্তমান। গিরিশ-চন্দ্রের স্বাদেশিকতার পূর্বাভাষ 'সৎনামে' পরিলক্ষিত হয়। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তিনি জাতির সকল দুর্বলতাকে দূর করে শৌর্যবলে বলীয়ান করতে চেয়েছেন। হিন্দুজাতির অনৈক্য, বীর্যহীনতা, অযৌক্তিক শাস্ত্রবিচার এবং জাতিভেদ, সমস্ত কিছুকে নাট্যকার ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নাট্যচরিত্র রণেন্দ্রের মুখে নিজের অনুভূতি ও বিশ্বাসকে বাণীরূপ দিয়েছেন,

"রণেন্দ্র। কি হেতু যবনগণ অজেয় ভারতে ?
বীর্য্যহীন হিন্দুগণ এ নহে কারণ—
মেরুশীর, উপত্যকা, বিশাল প্রান্তরে
হিন্দুর বীরত্ব-গাথা রয়েছে অঙ্কিত।
হিন্দুর পতন, অনৈক্য কারণ ;—
দ্বেষ-হিংসা পরস্পরে,
উচ্চনীচ জাতি-অভিমান—
দৃঢ়ীভূত কুমন্ত্রীর উপদেশে—
ধর্ম্ম-অভিমানে
স্বজাতি-বান্ধব-পরিত্যাগ।
অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বার্থপর
ব্রাহ্মণের মুখে ;
হীনমতি অশাস্ত্রীয় শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনি,

নাটক বা উপন্যাসের রচয়িতার কর্ত্তব্য এই যে তাঁহার রচিত পুস্তকে সাময়িক অবস্থা ও ঘটনার বৈলক্ষণ্য না দৃষ্ট হয়। ভিক্টর হুগো, ডুমা, ইউজিন সু, 'সার ওয়ালটার স্কট প্রভৃতির গ্রন্থ এরূপ রচনার দৃষ্টান্তস্থল। এই নাটক প্রণয়নে আমি তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বিচার পাঠকগণের উপর নির্ভর।" ভূমিকা (সৎনাম); গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

অশাস্ত্রীয় হীনবিধি করিয়া আশ্রয়,
ভেদবুদ্ধি জন্মেছে ভারতে।
সেই হেতু স্বরূপ-শাস্ত্রের মর্ম্ম
করিতে লঙ্ঘন,
স্বতন্ত্রতা-ভাব যত হিন্দুর হৃদয়ে,
ভারতের পতনের কারণ এ সব।
অংশে অংশে পরাজিত হয়েছে ভারত।" (২।১গ)

গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রধানতঃ মাতৃসাধক। তিনি মাতৃমন্ত্রে জাতিকে মাতিয়ে তুলতে চান। দেশবাসী মাতৃমন্ত্রে অভিষিক্ত হলেই দেশের অতীত গৌরব উদ্ধার ও স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। ইতিহাসের জাতীয় বীরদের কর্মসাফল্যে মাতৃসাধনার ইষ্টগৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি 'গরুড়' প্রবন্ধে লেখেন,

"মাতৃমন্ত্র ইউরোপে ফলে, এমত নহে। বিপদ্-দীক্ষিত আকবর, রাণা প্রতাপের সিংহনাদে কম্পিত হইতেন। রাণা একজন মাতৃ-উপাসক। ইতিহাসে শুনি, তাঁহার জয় অপেক্ষা পরাজয় গৌরববর্দ্ধিনী! যখন সমস্ত রাজপুতানা আকবরের সিংহাসনতলে যুগলকরে দণ্ডায়মান, তখন পুরুষসিংহ রাণার সিংহনাদ আরাবলী পর্ব্বত শুনিতেছে। দৃঢ় অস্ত্রধারী যবন-রক্ষিত দুর্গসকল একে একে পদানত হইতেছে। সভয়ে আকবর সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন। ইহা সকলেই সেই মাতৃমন্ত্রের ফল। শতদ্রুসলিল কম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ উঠিল—পাণ্ডু-গণ্ড ইংরাজ শুনিল! দেখিতেছি, এ মন্ত্রহীন ভারতবর্ষেরও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, কেহই ঈদৃশ হীন নাই, যিনি মনে করিলে, এ মন্ত্র না গ্রহণ করিতে পারেন। তবে কি নিমিত্ত আমরা আপনাকে হীন বিবেচনা করি? সিদ্ধ মন্ত্র রহিয়াছে, হায়! কেহ গ্রহণ করিতে নাই!"[৭]

দেশবাসীকে মাতৃসাধনা ও মাতৃনামে দীক্ষিত করলে জাতিভেদ, অনৈক্য ও সকল প্রকার বিরোধ-বৈষম্য দূর হয়ে যাবে, এই বিশ্বাস গিরিশচন্দ্রের ধ্রুব ছিল। মাতৃপ্রীতি ও মাতৃ-অনুরাগ যে সকল শক্তির উৎস এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পশ্চাতে ভৈরবী শক্তি যে অন্তর্লীনভাবে কার্যকরী হয়েছে,

[৭] গরুড়: গিরিশ রচনাবলী (৩য়); সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ৮১৯-৮২০।

তন্ত্রশাস্ত্রে একান্ত বিশ্বাসী এই ভক্ত ভৈরবের মনে তা ছিল সুদৃঢ়। 'সৎনাম' নাটকে তিনি মাতৃতন্ত্রসাধনাকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে প্রচার করেছেন। গিরিশচন্দ্র হিন্দুধর্মের উদারতায় বিশ্বাসী ছিলেন। বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে তাঁর এই বিশ্বাসের ব্যাপ্তি আরও বিস্তৃত হয়েছিল। যাঁরা হিন্দুধর্মের মূল নীতিকে অস্বীকার করে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যাবতীয় তথ্য ও মতবাদ প্রচার করেছেন, তাঁদের আক্রমণ ও নিন্দা দেখতে পাই 'সৎনাম' নাটকে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' মতবাদ গিরিশচন্দ্রের চিত্তের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা দূর করে দেয়। তিনি যে উদার ধর্মবিশ্বাসের অনুপন্থী ছিলেন, তার পরিচয় 'সৎনাম' নাটকে গুলসানা ও রণেন্দ্র নাট্যচরিত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রচার করেছেন।

"রণেন্দ্র। ...তুমি হিন্দু-কুমারী;—কি নিমিত্ত মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করতে চাও? তুমি কি জান না, কোরাণ বেদের অন্তর্গত? কোরাণে এমন কিছুই নাই, যাহা বেদে নাই। বেদ পুরাতন, মহম্মদীয় ধর্ম্ম আধুনিক। পুরাতন আপ্তবাক্য পরিত্যাগ ক'রে কোরাণে তোমার কেন শ্রদ্ধা?

গুলসানা। মহাশয়, আমার একটি কথার উত্তর দিলে আমি বুঝতে পারবো, যে হিন্দুধর্ম্ম সনাতন কি মহম্মদীয় ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। কোরাণ বেদের অন্তর্গত কি বেদ কোরাণের অন্তর্গত আমার উপলব্ধি হবে।

রণেন্দ্র। কি বল।

গুলসানা। বেদে কি এমন বিধি আছে, যে মুসলমানীকে হিন্দু করা যায়?

রণেন্দ্র। অবশ্য আছে।

গুলসানা। লিপিবদ্ধ থাকলে থাকতে পারে। কিন্তু কার্য্যে তো দেখি, রন্ধনগৃহে কুকুর, বিড়াল প্রবেশ করলে ভোজ্যবস্তু নষ্ট হয় না, কিন্তু মুসলমান প্রবেশে সে সকল আহার্য্য দ্রব্য পরিত্যাগ করতে হয়। দেখ্‌তে পাই সামান্য পশুকে হিন্দু আদর করে, কিন্তু মুসলমান স্পর্শে হিন্দু আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করে। যদি বেদে বিধি থাকে, তবে কার্য্যে সে পরিচয় কই?...মুসলমান কায়মনোবাক্যে জানে, যে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণে মনুষ্যের পরমার্থ লাভ হয়। সেই নিমিত্ত অসি মোচন ক'রে বলে যে, কোরাণ গ্রহণ করো নয় মরো। উদ্দেশ্য এই, শত ব্যক্তির মধ্যে ভয়ে হোক্, যা'তে হোক্—একজনকেও যদি মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা যায়, তা হ'লে সে স্বর্গে যাবে। মানবের স্বর্গ কামনায় মুসলমানের নিষ্ঠুরতা। এই মহাকার্য্যে মুসলমান নদীর স্রোতের

ন্যায় শোণিতপ্রবাহ দানে মানবের হিত সাধন চেষ্টা করেছে। কিন্তু হিন্দুর বেদান্তে কি বলে? অপর জাতি দূরে থাক, নিজ সমাজ পরিত্যাগ ক'রে, পর্ব্বত গুহায় বাস করো,—আপন মুক্তি সাধন করো। স্বার্থপরতা! —এর অধিক স্বার্থপরতা আমার কল্পনায় আসে না! তবে হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম কেন বলেন?

রণেন্দ্র। ...তুমি যথার্থই বলেছ। কিন্তু জেনো, হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম তা নয়। ধূর্ত্ত, শঠ, নিশাচর, কপট, অর্থলোভী ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ ধর্ম্ম প্রচার করেছে। তা'রা প্রকৃত ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ বলে। কিন্তু দেখ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষ আবির্ভাব হ'য়ে যবনকেও সনাতন ধর্ম্ম প্রদান করেছেন। মুসলমান দবাফ্ খাঁ রচিত গঙ্গাস্তোত্র, স্নানান্তে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে পাঠ করে। ধর্ম্মবিপ্লবেই ভারতের দুর্গতি হয়েছে। সৎনামীর সেই কুসংস্কার দূর করবার জন্য অস্ত্রধারণ।......

গুলসানা। আপনি কি মুসলমানীকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দিতে পারেন? আপনি কি মুসলমানীকে হিন্দু করতে পারেন?

রণেন্দ্র। অবশ্য পারি। প্রকৃত যে ধর্ম্মপিপাসু, সে হিন্দুর আদরণীয়।

গুলসানা। প্রকৃত অপ্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু মুসলমানের সে কথা নাই। প্রকৃত হোক্, অপ্রকৃত হোক্, ভয়ে হোক্, মৈত্রতায় হোক্, প্রলোভনে হোক্, ধর্ম্মতৃষ্ণায় হোক্,—ধর্ম্মদীক্ষা দানে মুসলমান সর্ব্বদা প্রস্তুত।

রণেন্দ্র।...তুমি জান না, দয়াল নিতাই দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়েছেন। দেশে দেশে সঙ্কীর্ত্তন করে বলেছেন,—জান্‌তে, অজান্‌তে, ভ্রান্তে, অভ্রান্তে যে হরি বলে, সেই ধন্য...।" (৪।৩গ)

কিন্তু তবুও নাট্যকার হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণতাতে ব্যথিত হয়েছেন। যুগ যুগ ধরে অযৌক্তিক আচার ও বিচারের কঠিন বেড়াজাল ও অমানবিক নিয়ম-নীতির পুরশ্চরণে ধর্মের প্রকৃত তথ্য বিকৃত হয়ে গিয়েছে। গিরিশচন্দ্র হিন্দুধর্মের সর্বদ্বারবদ্ধ অচলায়তনের লৌহকপাট কঠিন আঘাতে ভাঙ্‌তে সচেষ্ট হয়েছেন।

"রণেন্দ্র। ...মুসলমানে কন্যাদান করে যেই কুলে,
ভোজনে তাহার সনে
হয় যদি পাপের সঞ্চার,
স্বদেশবৎসল নাহি গণে সেই পাপ।" (২।১গ)

স্বদেশহিতার্থে গিরিশচন্দ্র এক উদার মানবধর্মের প্রসার ও প্রয়োগ চেয়েছিলেন। মানুষের প্রকৃত মঙ্গল ও কল্যাণচিন্তা ছাড়া তাঁর অপর কোন ভাবনা ছিল না। এ বিষয়ে তিনি নানকের প্রচারিত মানবহিতবাদী 'শিখধর্ম'ও 'সৎনামী' ধর্মচিন্তাকে প্রচার করতে আগ্রহী ছিলেন। 'ইস্‌লাম' ধর্মের উদারতাও তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। 'শিখ', 'সৎনাম ও 'ইস্‌লাম' ধর্মের উদার বিশ্বভ্রাতৃত্ব-নীতির পাশে হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণতা তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করে। ভারতবাসীর পরাধীনতার কারণ হিসাবেও তিনি জাতির সর্ববিষয়ে ক্ষুদ্রতাকে দায়ী করেছেন। নাট্যচরিত্র রণেন্দ্রের মুখে গিরিশচন্দ্রের ক্ষোভ ও ইচ্ছা একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

"রণেন্দ্র। করি মোরা নির্ব্বাণ কামনা,
কিন্তু স্বজাতিরে ঘৃণা প্রথম প্রক্রিয়া তার।
অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়ে শ্রবণ
জন্মিয়াছে হেন সংস্কার।
জনকের অবতার মহাত্মা নানক—
এই ভেদ-বুদ্ধি নাশ হেতু,
শিখ ধর্ম্ম করেন প্রচার ;—
হিন্দু হয় মুসলমানগণে।
দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ কেহ হইলে যবন,
শিখ সম্প্রদায় তারে করিবে গ্রহণ,—
যবন যেমন—
হিন্দু হ'লে কোন মুসলমান,
পুনঃ করে সমাজে গ্রহণ,
হয় সে নির্ম্মল লয়ে ঈশ্বরের নাম।
হিন্দু করে স্বজাতিরে পরিত্যাগ।
কিন্তু শত মুখে ঘোষে—
মহাপাপ নাশ হয় দেব-দেবী নামে।
হায় হায়! কিবা বিড়ম্বনা,
ঈদৃশ উদার ধর্ম্ম যার—
কুঞ্চিত কুটিল ভাব ব্যবহারে তার।

* * *

…করি মোরা নির্ব্বাণ-কামনা ;—
সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান প্রধান সাধন।
মৃত্যুরে যে ডরে, বিপদে আশঙ্কা যার,
উচ্চকার্য্যে একাকী না হয় অগ্রসর—
কার্য্য করে অন্যের আশ্রয়ে—
মোক্ষের কি সেই জন হয় অধিকারী ?
মোক্ষলুব্ধ মহাত্মা না দেখে ফলাফল ;—
চাহে সৎকার্য্যের ভার,
কার্য্য অনুষ্ঠান জীবনের সার,
একা, বহু, না করি বিচার—
আত্মত্যাগে অভিপ্রেত কার্য্যে হয় ব্রতী ;—
হেন মহাজন ধরে অমোঘ শকতি।
মুক্ত যেই পুরুষ প্রধান,
সংস্কারে অসাধ্য কিবা তার ?
হে ধীমান্! মোরা সবে সৎনাম-আশ্রিত ;—
উচ্চরবে সৎনামের জয় করি গান
কার্য্য করি অনুষ্ঠান,
রাখি মাতৃভূমির মান,
ধর্ম্মের গৌরব ব্যক্ত করি পুণ্যধামে।" (২।১গ)

দেশমাতৃকার গৌরব উদ্ধার, জাতিগঠন ও স্বাধীনতা অর্জনে গিরিশচন্দ্র দেশবাসীকে 'রজগুণ' অর্থাৎ শক্তিধর্মে দীক্ষিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী ছিলেন।* 'সৎনাম' নাটকে নাট্যচরিত্রদ্বয়, ফকীর ও মহান্তের কথোপকথনে নাট্যকারের ইচ্ছাই ঘোষিত হয়েছে।

* "Rajas is badly needed just now. More than ninety percent of those whom you now take to be men of the Sattwa quality are only steeped in the deepest Tamas. What we now want is an immense amount of Rajasika energy, for the whole country is wrapped in the shroud of Tamas. The people of this land must be fed and clothed—must be awakened—must be made more fully active. Otherwise they will become inert, as inert as trees and stones."

Thus Spake Vivekananda: pp. 14-15.

"ফকীর। আপনার কি ধারণা, যে, হিন্দুরা সকলে সত্ত্বগুণী তাই বিজাতীয়ের পদাঘাত সহ্য করে? তা নয়।—একবার চক্ষু খুলে দেখ, যে ঘোর তমোতে দেশ আচ্ছন্ন—অলসে কুম্ভকর্ণের মত জড় হ'য়ে পড়ে আছে! অনলস হ'য়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'লে, তবে সে জড়তা দূর হবে। রজোগুণের প্রভাবে তমোগুণ নাশ হ'বে।...জড় তমোগুণী কি চৈতন্য লাভ করতে পারে?" (১।১গ)

আবার, ফকীররাম ও নাগরিকগণের সংলাপে এই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই,

"ফকীর। ধর্ম্মের ভাণ ক'রে, হিন্দুর হৃদয়ে ভীরুতা অধিকার করেছে। যদি বলবান্ হতে, যদি যবনকে মার্জ্জনা করতে পারতে, অত্যাচারে যদি বিচলিত না হ'তে, যদি অন্তরে অন্তরে ভগবানকে ডেকে যবনকে না অভিশাপ দিতে, তা হ'লে জানতেম, যে, ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রতিশোধ দাও নাই। কিন্তু তা নয়,—তোমার মার্জ্জনা ভয়ে;—যবনের নিকট পরাস্ত হবে, এই ভয়ে মার্জ্জনা। দেখ কি ভীরুতা! সকলে ঐক্য হয়ে অগ্নিকুণ্ডে পড়তে চাচ্ছো, কিন্তু যবন সম্মুখীন হ'তে সাহসী হচ্ছো না। অধীনতায় অবনত প্রাণের আর কি পরিচয় দেবে? মাতৃভূমির দুঃখে অন্ততঃ একজনও শোণিত দান করে, হায় এমন সাহসী কেউ নাই!" (২।১গ)

'সৎনাম' নাটকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মনৈতিক জাতীয়তাবোধ এই নাটকে বিশেষভাবে চিহ্নিত;—ঐতিহাসিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা প্রায় অনুপস্থিত। তবে পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনে গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক নাটক রচনাতে যে পারঙ্গমত্ব অর্জন করেছিলেন ও দেশবাসীর চিত্তে স্বাদেশিকতার ঢেউ তুলে স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তার পূর্বাভাষ 'সৎনাম' নাটকে বর্তমান। 'সৎনাম' নাটকে তিনি স্বাদেশিকতার নান্দীপাঠ করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে গিরিশচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক, 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৫)। বাঙ্গালীর সক্রিয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দিনে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে জাতিকে অতীত গৌরবের ঐতিহ্যে অভিষিক্ত করেন। এই সময়ে বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটকের আনন্দবাজার শুরু হয়েছিল। সমকালে বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ জাতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে

ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির পুনর্মূল্যায়ণ করতে তৎপর হন। গিরিশচন্দ্রের স্বদেশহিতবাদী চিত্ত অনুকূল বাতাসে ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে জাতীয় নায়কদের গৌরব-মাহাত্ম্য অনুসন্ধানে হয়েছিল ব্যাপৃত। তিনি তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় নাট্যরচনার প্রয়াসে নবাবী-হাটের প্রদোষলগ্নের কাহিনীকে গ্রহণ করেন। নাটকদ্বয়ের বিষয়বস্তুতে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সরাসরি মর্মজ্বালা ও বিক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ ছিল বলে, নাট্যকারের স্বাদেশিকমানস জাতি গঠন ও স্বাধীনতা আদর্শের প্রতি উত্তাল রক্তবেগতরঙ্গে মুখরিত হয়ে উঠে; এবং এরই ফলে ব্রিটিশ রাজরোষে নাটকগুলি বাজেয়াপ্ত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনয় নিষিদ্ধ হয়।

গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। তিনি নাটক রচনা করবার পূর্বে আবশ্যকীয় তথ্য সযত্নে সংগ্রহ করতেন এবং বিষয়টিকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে তবেই 'শ্রীদুর্গা' শিরোনামে লেখনী পরিচালনা করতেন। বিশেষভাবে 'সিরাজদ্দৌলা' রচনাকালে কলকাতার 'এসিয়াটিক সোসাইটি'তে দেশী ও বিদেশী সমস্ত ঐতিহাসিকদের রচনা সযত্ন অভিনিবেশে পাঠ করেছিলেন।* তবে, সিরাজ-চরিত্র চিত্রণে তিনি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায় ও অন্যান্যদের মতাদর্শে বিশ্বাসী ও অনুগামী হন। অপর ঐতিহাসিক নাটক 'মীরকাসিম' (১৯০৬) সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' আখ্যানকাব্য রচনার পর থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে স্বাদেশিক চিন্তাসমৃদ্ধ ঐতিহাসিকেরা সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য অনুসন্ধান করেন। বিশেষভাবে, ইংরেজ বর্ণিত সিরাজ চরিত্রের কলঙ্ক খণ্ডনই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। যুগধর্মে বিশ্বাসী গিরিশচন্দ্র অনুরূপ ভাবাদর্শে আন্দোলিত হয়েছিলেন। তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রচনাতে জাতিগত মনোলোকের প্রতিফলন হয়েছে। এই নাটকের ভূমিকাতে তিনি নিজে সে কথা স্বীকার করেছেন,

* "গোলাম হোসেন প্রণীত সায়েরুল মুতাক্ষরীণ, রেয়াজ সউল, সেলেক্টিন, আর্মির হিন্দুস্থান, হলওয়েল লিখিত বিবরণ, Hastings m.s.s, in British Museum, স্টুয়ার্টের ইতিহাস, Serafton's Ires Journal, Despatches to Court of Directors, Letters from Olive and Watson, Mill's History of British India, Hunters Statistical Account of India প্রভৃতি।"
গিরিশ প্রতিভা: হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত; পৃ.২৫৬।

"বিদেশী ইতিহাসে সিরাজচরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপচিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী।"

গিরিশচন্দ্র নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নাটকে দেশহিতব্রতী স্বদেশ-সন্নত বীর হিসাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি একজন প্রজাপালক, কর্তব্যপরায়ণ, স্বদেশ-বৎসল নরপতি। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে অনুসরণ করবার প্রবণতা বিশেষভাবে নাট্যকারের চিত্তে লক্ষ্য করা যায়। সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের অভিমত নিম্নরূপ,

"সিরাজদৌল্লার কলঙ্ক কাহিনীতে স্বদেশ-বিদেশ সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কলঙ্কের ইতিহাস সর্ব্বজন পরিচিত, কলঙ্কসৃষ্টির ইতিহাস সেরূপ নহে।...... সিরাজ কলঙ্ক প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—প্রাচীন এবং আধুনিক। এই সকল কলঙ্ক আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—লিখিত এবং অলিখিত। প্রাচীন লিখিত কলঙ্ক সংখ্যা অধিক নহে; আধুনিক লিখিত কলঙ্ক সংখ্যাই অধিক। কিন্তু অলিখিত কলঙ্কের নিকট লিখিত কলঙ্ক পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। লিখিত কলঙ্কগুলি ইতিহাসে সীমাবদ্ধ, অলিখিত কলঙ্কের আর সীমা নাই, তাহা এখনও থাকিয়া থাকিয়া জন্মলাভ করিতেছে। এই সকল কারণে আমরা এখনও সিরাজদৌল্লার নামে শিহরিয়া উঠি এবং তাঁহার নামে কলঙ্ক সৃষ্টি করিবার সময়ে অথবা কলঙ্ক রসাস্বাদন করিবার সময়ে সত্য-মিথ্যার আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করি না।...Shirajuddaulah was more unfortunate than wicked. বলা বাহুল্য যে ইহাই নিরপেক্ষ ইতিহাসের সত্যানুমোদিত সরল সিদ্ধান্ত।"[১]

আবার,

"ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ সিরাজদৌল্লাকে কুক্রিয়াশক্ত তরুণ যুবক বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, তিনি যে বুদ্ধিহীন পশুবিশেষ তাহাও প্রমাণ করিবার জন্য অনেকখানি কলমের অপব্যয় করিয়াছেন। সিরাজ যে সকল

১ সিরাজদৌল্লা (ভূমিকা): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়; পৃ. ।০ ।/.

অমানুষিক অত্যাচারে বাঙ্গালী-হৃদয়-দলন করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস, তাহার স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। আমরা সেজন্য সিরাজের নাম শুনিলে এখনও যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি।……ইতিহাস বিমুখ বাঙ্গালাদেশে ইংরাজ শিক্ষক যেমন শিখাইয়াছেন তাহাই কণ্ঠস্থ করিয়া ……লোকের সমাজে পণ্ডিতম্মন্য হইতেছি। ……

ইংরাজের ইতিহাসে সিরাজদৌল্লা কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণ অকর্মণ্য জঘন্য রুচির চঞ্চল যুবক বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু সিরাজদৌল্লা স্বয়ং অসিহস্তে যতবার সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, বিপদের সংবাদ পাইয়া যতবার ক্ষিপ্রহস্তে অসি চালনা করিয়াছেন, আলিবর্দ্দী ভিন্ন আর কোন নবাবই সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই।……প্রায় প্রতিবর্ষেই বর্গীর হাঙ্গামার ইতিহাসের সঙ্গে সিরাজের রণশিক্ষার ইতিহাস সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কখনও বা মাতামহের আজ্ঞাবহ হইয়া, কখনও বা রাজাজ্ঞায় স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিয়া এই বীর বালক যে সকল সমর কৌশলের পরিচয় প্রদান করেন, বড় বাটীর দুর্গজয় কাহিনী বর্ণনা করিবার সময়ে মুসলমান ইতিহাস লেখক তাহার সমুচিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে রণপণ্ডিত করিবেন বলিয়াই আলিবর্দ্দী শৈশবে সেনাচালনার ভার প্রদান করিয়াছিলেন।… ‥পদে পদে মাতামহের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া সেই প্রবীণ নরপতির যুদ্ধ কৌশলের ভ্রম প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়া যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, কেহ নিরপেক্ষভাবে সিরাজদৌল্লার ইতিহাস লিখিলে তাহার জন্য নিশ্চয়ই তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।……

যাঁহারা (সিরাজের চরিত্র পতনের) প্রধান অপরাধী তাঁহারা বেকসুর খালাস পাইয়াছেন, আর তাঁহাদের মোহজালে জড়িত হইয়া মোহান্ধ বালক একাকী সকলের কলঙ্ক বহন করিয়া লোকসমাজে শত গঞ্জনা সহ্য করিতেছে।……সিরাজদৌল্লার সমসাময়িক ইংরাজ এবং মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ তাঁহার জীবনকালে যে সকল ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার অনেক কুকীর্ত্তির উল্লেখ আছে। কিন্তু গর্ভিনীর গর্ভবিদারণ, নৌকা সহিত ভাগীরথী গর্ভে নরনারী নিমজ্জন প্রভৃতি অদ্ভূত অত্যাচারের কোনই উল্লেখ নাই! বলা বাহুল্য যে ইহার অধিকাংশই 'রচা কথা'।”[১০]

---

১০ সিরাজদৌল্লা : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ; পৃ. ১৭ ও ৩৯-৪০

কিন্তু পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে নবাব সিরাজদ্দৌলা প্রকৃতিস্থ, প্রজারঞ্জক, স্বদেশবৎসল নরপতি হিসাবে গৃহীত হননি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে,

"He was given no education for his future duties, he never learned to curb his passionate impulses, none durst correct his vices ; and he was kept away from manly and martial exercises as dangerous to his precious life. Thus the apple of old Alivardi's eye grew up into a most dissolute, haughty, reckless and cowardly youth, and the prospect of his succession to the government of Bengal, filled all people with alarm."[১১]

আবার ডঃ সাদাথ আহম্মদ একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন,

"Allivardi Khan in his dotage shared the weakness of an old man by lavishing his affections on a vicious and spoilt boy, infamous under the name of Siraj-ud-daullah.

Siraj ud-daullah was rash, headstrong and stupid. He had been completely spoilt by the fondness of Allivardi Khan and the possession of the throne did not produce any change in his character. He was untruthful, cowardly, base, and ungrateful. He lacked all the qualities which had been exhibited by his predecessors and did not know how to use the few virtues which he possessed. He was fond, in his easy, indifferent way, of exacting money from his rich subjects, and this alienated the sympathy of the rich and powerful class of Hindu traders. The Hindu commercial classes grew naturally impatient of the growing demands, and increasing extortions of the Muslim Subedar. Siraj-ud-daullah's position was, therefore,

১১ History of Bengal (Vol II) : Sir Jadunath Sarkar ; p.369.

a critical one. The zemindars were rebellious, his army was commanded by a traitor, his servants were treacherous, and his own house was divided against him. Siraj-ud-daullah alienated the house of the great Jagat Seths and hastened his fall by quarrelling with the English.

It is hardly likely that Siraj-ud-daullah meditated the expulsion of all Europeans, nor is there any truth in the statement that he wished to expel the English."[১২]

ফলে, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক অঙ্কিত সিরাজ-চরিত্র পূর্বে বা পরে কোন সময়ে ঐতিহাসিকদের বিচারে সমর্থিত হয়নি। ইংরেজ, মুসলমান এবং ফ্রেঞ্চ ইতিহাসবেত্তাগণ কেউ নবাব সিরাজদ্দৌলার গুণগান করেননি।* সুতরাং গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে সিরাজদ্দৌলাকে ইংরেজবিদ্বেষী, প্রজাহিতৈষী, হিন্দু-মুসলমান মিলনাভিলাষী ও জাতীয়-হিতব্রতী নবাব বলে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে ঐতিহাসিক সমর্থন নেই। অক্ষয়কুমারের বক্তব্যে যেমন স্বদেশপ্রেমের তপ্ত আতিশয্য, গিরিশচন্দ্রের নাটকে তারই অনুরক্ত অনুস্মৃতি। ফলে তাঁর এই রচনাটিকে একাধারে নাটক ও অন্যধারে ইতিহাস—দুই খেতাব একসঙ্গে দেওয়া যায় না।

'মীরকাসিম' নাটকে, নাট্যকার অনুরূপভাবে যুগধর্মের পরিচয়টি সযত্নে তুলে ধরেছেন। এই নাটক রচনাতেও গিরিশচন্দ্রের অধ্যয়ন স্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি Col Malleson প্রণীত 'The Decisive Battles of India' গ্রন্থ থেকে নাটকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন। এছাড়া, 'A narrative of the Transactions in Bengal from 1760-64 during the Government of Mr. Henry Vansittart. (London 1766)' গ্রন্থটিও পাঠ করেন। তবে মীরকাসিম চরিত্র-চিত্রণে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেন। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার দেখিয়েছেন,

"নূতন নবাব, নাসির-উল-মোলক ইমতিয়াজদ্দৌলা মীরমহম্মদ কাসিম

---

১২ A School History of India : Sir Sadath Ahamed.

দ্রঃ মহাকবি গিরিশচন্দ্র : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ; পৃ. ৯২-৯৩

* সিয়ার উল মুতাক্ষিরীণ কার, কাসিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ মঁসিয়ে ভেঁল সাহেব, ডঃ রমেশচন্দ্র দত্ত প্রত্যেকেই সিরাজকে দুর্বিনীত, হঠকারী ও শঠ বলে বর্ণনা করেছেন।

আলি খাঁ নসরৎ জঙ্গবাহাদুর,—সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াই অর্থসঞ্চয়, বিদ্রোহ দমন…প্রজারক্ষার উপায় উদ্‌ভাবনার্থ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।……

অর্থ সংগ্রহের জন্য কাসিম আলি যে সকল নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন তাহা কাহারও বিস্ময়োৎপাদন করিল না। নূতন নবাবের আদেশে মোগল রাজপ্রাসাদের ইতিহাস-বিশ্রুত বিলাস তরঙ্গ সহসা তিরোহিত হইয়া গেল; নৃত্যগীত অর্দ্ধপথে স্তম্ভিত পদে অবসন্ন হইয়া পড়িল; হাস্য-কৌতুক প্রাসাদ হইতে সসম্ভ্রমে বহুদূরে দণ্ডায়মান হইল; ঐশ্বর্য্যচ্ছটা অপসারিত হইয়া গেল; অগণিত দাস দাসীর সংখ্যা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিল;—যাহা না থাকিলে সংসার চলে না, কেবল তাহাই রহিল। অন্যান্য সকল বিষয়েই ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়া গেল। রাজপুত রাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজা প্রতাপ সিংহ বৃক্ষপত্রে ভোজন ও তৃণশয্যায় শয়ন করিতেন; মোগল রাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার আশায় কাসিম আলি আত্মসুখ সম্ভোগের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা তিরোহিত করিয়া ব্যয়সংক্ষেপ সাধন করিলেন। এ বিষয়ে কাসিম আলির সমকক্ষ নরপতি বঙ্গসিংহাসনে পদার্পণ করেন নাই।"[১৩]

গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমারের চিন্তা ও মন্তব্য শিরোধার্য করে দেখিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক কারণের জন্য মীরকাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ উপস্থিত হয়। নবাব মীরকাসিম যদি স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর না হতেন তবে তাঁর সর্বনাশ ঘটত না। 'মীরকাসিম' নাটকের ভূমিকায় তিনি লেখেন,

"……স্বদেশের শিল্পবাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হইলে, মীরকাসিমের সর্ব্বনাশ হইত না।

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাব প্রজারক্ষার জন্যই আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহাই মীরকাসিমের ইতিহাসের প্রধান কথা।"

কিন্তু আধুনিককালে ঐতিহাসিকদের বিচারেও মীরকাসিম প্রকৃত দেশহিতব্রতী নরপতি বলে চিহ্নিত হননি। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিরোধের মূলে অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল নবাবের

১৩ মীরকাসিম : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়; পৃ. ৬৯-৭০।

ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্য; দেশ ও জাতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। নবাব মীরকাসিমের দেশাত্মবোধ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে একালের একজন মননশীল ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন,

"It may be pointed out in this connexion that an attempt has been made by some modern Indian writers with a patriotic bias to paint Mir Quosim as a heroic administrator and statesman, solicitous of the interests of his subjects as to nobly sacrifice his 'masnad' in their defence."[১৪]

তবে প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখতে হবে, স্বাদেশিকতার যৌবনমুক্তি পর্বে নাট্যকারদের ইতিহাস-আনুগত্য পূর্বের নাট্যকারদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে সুদৃঢ় ছিল। গিরিশচন্দ্র ইতিহাসের প্রকৃত তথ্যের কাছে আনত হয়েও যুগধর্মকে অস্বীকার করতে পারেননি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ-বিদ্বেষ প্রচারের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যরচনা, স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জন প্রচার, জাতীয় নেতাদের রাজনৈতিক চিন্তার মূল নীতি ছিল। সে কালের ঐতিহাসিকগণও স্বাদেশিকতার বিস্তৃততর পটভূমি রচনা করার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই ঔৎসুক্যের জন্য সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম, বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাবদ্বয় জাতীয় বীর হিসাবে চিহ্নিত হন। গিরিশচন্দ্রের নাটকে এরই ছায়াপাত ঘটেছে। সুতরাং আমাদের নাট্যকার গিরিশের ইতিহাস বিচ্যুতিকে যুগধর্মের অবশ্যম্ভাবী প্রভাবজনিত রূপান্তর সাধন বলে গ্রহণ করতে হবে।

আমরা জানি, 'বঙ্গ-ভঙ্গ' আন্দোলনে বাঙ্গলায় দেশাত্মবোধের যে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, তারই প্রভাবে অনেক নতুন তত্ত্ব গড়ে উঠে। 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম' নাটকে এর প্রভাব দেখতে পাই। নাট্যকার; নবাব সিরাজদ্দৌলার উক্তির মধ্যে বাঙ্গালীর ইতিহাস-চিন্তাকেই অনুবিদ্ধ করেছেন। যেমন,

"সিরাজ। জন্মিয়াছে ধারণা আমার,
রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার,

১৪ মীরকাসিম: ডঃ নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়।
দ্রঃ মহাকবি গিরিশচন্দ্র: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃ. ১০০।

নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে ;
প্রজার মঙ্গল কার্য্য সতত সাধন,
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।" (১৫গ)

আবার, নবাব, দরবারের সকলকে সম্বোধন করে বলেছেন,

"সিরাজ। হে অমাত্যগণ, আমায় শত্রু বিবেচনা করবেন না। কিন্তু যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাঙ্গলার নই। আপনাদের যদি বর্জ্জন করা আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীকেই রাজকার্য্য প্রদান করবো।.....হিন্দু মুসলমানগণ এক স্বার্থে বাঙ্গলায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীই কার্য্যভার প্রাপ্ত হবে। যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করেন...বিদ্রোহীর ধ্বজা উড্ডীন করে যোগ্যজনকে সিংহাসন প্রদান করুন। কিন্তু স্থির জানবেন, ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার দুশমন।" (ঐ)

পুনরায় কৃষ্ণদাসকে,

"সিরাজ। কৃষ্ণদাস, নবাব-চরিত্র তুমি অবগত ছিলে না, সেই নিমিত্ত কলিকাতায় এসে ইংরাজের শরণ নিয়েছিলে। আমি যৌবনসুলভ অনেক দোষে দোষী, স্বীকার করি। কিন্তু কেউ শরণাগত হ'য়ে আশ্রয় পায় 'ন, বা গুরুতর অপরাধ ক'রে মার্জ্জনা প্রার্থনায় দোষ মাপ হয় নি, বোধ হয় আমাদের শত্রুর মুখেও শুনবে না। বিদেশী আপনার হয়, ইতিহাস পৃষ্ঠায় এর দৃষ্টান্ত নাই।......যাঁর হৃদয়ে ধারণা যে, স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশী আপনার হয়, তাঁর সে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রম......যে হিন্দু বা মুসলমান স্বার্থচালিত হ'য়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে কুলাঙ্গার। মাতৃভূমির কলঙ্ক। তার জীবন ঘৃণিত!.....যদি বঙ্গবাসীর মনে প্রতীতি জন্মায় যে, শত দোষে দোষী হ'লেও স্বদেশী আপনার, বিদেশী চিরদিনই পর, তা'হলে আমাদের যুদ্ধশ্রম ও রণব্যয় সফল!" (১১১০গ)

অথবা, লুৎফউন্নিসাকে,

"সিরাজ।..... যদি সুখ-ইচ্ছায় রাজ্যভার গ্রহণ করতেম, তা'হলে ছার রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে তোমার সহিত নির্জ্জনে বাস করতেম। কিন্তু রাজ্যের সহিত আমার উপর গুরুভার স্থাপিত। মাতামহ মৃত্যুশয্যায় আমার মস্তকে গুরুভার অর্পণ করেছেন;—প্রজার মঙ্গল সাধন ভার আমার উপর, নবাব বংশের মর্য্যাদা রক্ষার ভার আমার উপর, বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ শান্তি স্থাপনের

ভার আমার উপর, বিদেশী দস্যুর হস্ত হতে প্রজারক্ষা করার ভার আমার উপর, এ সমস্ত ভার তাঁর মৃত্যুশয্যায় আমি গ্রহণ করেছি, এখন কিরূপে পরিত্যাগ করবো ?" (৩।১গ)

নাট্যচরিত্র করিমচাচার প্রহসনোক্তিতে নবার সিরাজের উদারতার যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে নাট্যকারের যুগভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে।

"করিম। চাচা উমিচাঁদ, কিছু বেয়াদবি হয়েছে কি? বেকুব নবাব, নবাবিই জানে না ; কারুর গর্দ্দানী নেবার হুকুম দেয় না,—ওকে আগে তক্তা থেকে নাবাও। এমন একজন নবাবের বেটা নবাবকে বসাও, যে হুটু ব'লতে জুতো শুদ্ধ লাথি ঝাড়ে, যে কয়েদ ক'রে টাকা আদায় করে! টাকা ভাঙ্গলে মাপ, শত্রুতা ক'রলে মাপ—এ ব্যাটা কি নবাব, ছ্যাঃ।" (১।১০গ)

এমন কি সিরাজের মৃত্যু, নাট্যকারের তুলিতে অত্যন্ত মহনীয় হয়ে উঠেছে। নাট্যচরিত্র জহরাকে পরিহাস করে করিমচাচা বলেছে,

"করিম। ভ্যালা মোর চাচী, খুব কারখানা দেখালে! তোমার অতটা না করলেও চলতো। এই রাজ-রাজড়া, আমির-ওমরাও আর ঘসেটী বেগম হ'তেই কাজ রফা হ'তো। এত ক'রেও ইতিহাসে স্থান পেলে না চাচী, ...বেইমানের কালিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভ'রে যাবে, তোমার আমার জায়গা হবে না। বাহাদুরি তো নিলে, কিন্তু যে নবাব, হোসেনকুলিকে কেটেছিল, তার কিছু করতে পারলে না। সে ছিল মাতাল নবাব—আর এ হচ্ছে প্রজাপালক, নিরীহ নবাব! (রায়দুর্লভের প্রতি) রায়দুর্লভ চাচা, আলিবর্দ্দী মরবার সময় নবাবকে মদ ছাড়িয়ে নবাবী রোকটুকু কেড়ে নিয়ে, আর তোমাদের মতো সাতশো রাক্ষুসীর হাতে পুতে সঁপে দিয়ে বড় কাজ করে গেছেন। ছোঁড়াটা ভ্যাবাচাকা মেরে গেল কিনা! পলাশীতে যদি দু'পেয়ালা মদ দিতে পারতাম, তাহলে তোমাদের বেইমানি খাটতো না, আর ক্লাইবেরও 'হিপ্ হিপ্ হুররে' চলতো না! নবাব হাতীর উপর সোয়ার হ'য়ে বলতো—'লাগাও'—কেউ নবাব ছেড়ে তোমাদের দিকে দাঁড়াতো না। সব সাফ্ হ'য়ে যেতো, কাঁধের উপর কারো মাথা থাকতো না, যে মাথা তুলে আমায় ধমক মারতে! (জহরার প্রতি) চাচী সেলাম, এতটা কারখানা করলে, জোগাড় করে একটু নবাবকে বিষ দিলেই পারতে, বাঙ্গলাটা কেন জ্বালালে?" (৫।৪গ)

'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে যেমন দেশের একটি বিশেষ চিন্তাকে নতুন

মূল্যবোধে অভিষিক্ত করানোর প্রয়াস গৃহীত হয়েছে, 'মীরকাসিম' নাটকেও নাট্যকারের অনুরূপ আগ্রহ ও প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। মীরকাসিমও সিরাজদ্দৌলার মত দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

নবাব মীরকাসিম, বন্ধু আলী ইব্রাহিমকে সম্বোধন করে বলেছেন,

"কাসিম। ইব্রাহিম,······আমি যেরূপে পারি, প্রজারক্ষার চেষ্টা পাবো। এতে আমার সর্ব্বনাশ হয়, জীবন নাশ হয়, কলঙ্ক হয়, লোকের নিকট ঘৃণিত হই···স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করতে হয়, নরকগামী হ'তে হয়—তাতেও আমি প্রস্তুত ; —নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দীন প্রজার দুঃখ আর আমি সহ্য করবো না।"

(১।২গ)

পরে, মীরকাসিম বেগমকে বলেছেন,

"কাসিম। আমি তোমা অপেক্ষা শতগুণে ব্যাকুল !······আমি বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার জন্য ব্যাকুল !···আমি সহস্র সহস্র অন্নহীন প্রজার জন্য ব্যাকুল ! ···আমি কুটীল কুচক্রী ইংরাজের শঠতার জন্য ব্যাকুল !······জান তো, আমি কাপুরুষ নই। কার্য্যের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা ; জীবনসংগ্রামে অবিরাম সংগ্রাম করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা ; মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা ; দেশবৈরীর সহিত সংগ্রাম করতে জন্মগ্রহণ করেছি,······যদি মাতৃভূমিকে করাল বিদেশী কবল হ'তে উদ্ধার করতে পারি, তবেই জীবন সার্থক,—নচেৎ জন্ম বৃথা, কর্ম্ম বৃথা, জীবন বৃথা !" (১।৩গ)

আবার,

"কাসিম। বেগম, যদি ভোগ-বিলাসের নিমিত্ত সিংহাসন গ্রহণ করতেম, তা হ'লে আমা অপেক্ষা আর ঘৃণিত জীব ভারতে নাই !······আর কি নবাব-পুরে, তোমার নূপুর-ঝংকার শ্রবণগোচর হয় ? আর কি নবাবকে শত শত দাস-দাসী পরিবেষ্টিত দেখো ? আর কি বেগমপুরে সহস্র সহস্র খোজা-বাঁদীর কোলাহল শুনতে পাও ? আর কি নবাবের পরিচর্য্যার জন্য, নানাদেশ হ'তে বহুমূল্য আহার্য্য দ্রব্য সংগৃহীত হয় ? না, আমি বিলাসী নই, আমি স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমির নিমিত্ত কাতর। পারি, বাঙ্গলার উদ্ধার সাধন করবো, মুমূর্ষু মোগল-গৌরব পুনর্জ্জীবিত করবো ; বিদেশী দাম্ভিক মাতৃশোণিতশোষক ইংরাজকে বিতাড়িত করবো। এই নিমিত্ত নবাবী গ্রহণ ক'রে চিন্তা-হ্রদে ঝম্প প্রদান করেছি। চিন্তাই আমার জীবন, কার্য্যই আমার বিলাস। যদি

মনোরথ সফল হয়, তবেই আমি নবাব… ..তবেই আমি মনুষ্য, নচেৎ আল্লা-প্রদত্ত পবিত্র আত্মা কেন মৃত্তিকা-পিঞ্জরাবদ্ধ রাখ্‌বো ?" (২।১গ)

আবার, সেনাপতি গুরগিণ খাঁ ও তকী খাঁর প্রতি,

"কাসিম। গুর্‌গিণ, আমার মনের আশঙ্কা শোনো—যুদ্ধভয়, প্রাণভয়, আমার হৃদয়ে স্থান পায় না, আমার ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই, আমার নবাবী গ্রহণ—কার্য্যের নিমিত্ত—নবাবীর নিমিত্ত নয়। আমার নবাবী যায়, জীবন যায়, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রজা আমার প্রাণ ;—ইংরাজ-যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু হয়, যদি ঈশ্বর-অনুগ্রহে স্বর্গে স্থান পাই, তথাপি আমার শান্তি হবে না। আমি প্রজার দুঃখে দিবারাত্র ব্যাকুল। অতি অভাগা! সামান্য জীবজন্তুও আহার পায়, বাঙ্গলার প্রজা অনাহারী ;—সমস্ত জীবন দুঃখময়, সমস্ত জীবন পরপীড়ন সহ্য করে, সমস্ত জীবন অধীনতায় অতিবাহিত করে।……

তকী, তুমি কার্য্যভার প্রার্থনা কচ্ছ ? অতি গুরুতর কার্য্য আমাদের উভয়ের উপস্থিত,—কার্য্য আত্মত্যাগ।……জেনো, ভারতে বীরত্বের অভাবে পরাজয় হয় নাই, ভারতে বীরত্বের অভাব নাই, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাই আমাদের অধঃপতনের কারণ। সকলকে বিনীতভাবে সন্তুষ্ট রাখ্‌বে, যাতে একতায় আবদ্ধ হয়, তার চেষ্টা পাবে ;—স্বদেশের শত্রুদমনে যা'তে একাগ্রতা জন্মে, তারই প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আমাদের আত্মগৌরব ত্যাগ কর্‌তে হবে। বাঙ্গলার দীন প্রজা একমাত্র আমাদের লক্ষ্য, বিদেশীর করাল কবল হ'তে তাদের রক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য।……

হয় ইংরাজ বাঙ্গলা পরিত্যাগ করে সমুদ্রে গমন কর্‌বে, নয় মোগল রাজমুকুট অতলজলে নিক্ষিপ্ত হবে। বীরত্ব, মনুষ্যত্ব, স্বদেশভক্তি প্রদর্শনের সময় উপস্থিত, দীন প্রজা রক্ষার সময় উপস্থিত, দাম্ভিক প্রজাপীড়কের দমন সময় উপস্থিত। তকী, আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত প্রবলবেগে ধাবিত, আমার হৃদয় অধীর ;—কিরূপে বিদেশীর পীড়ন হ'তে বঙ্গমাতাকে রক্ষা কর্‌বো, কিরূপে দীন প্রজার দুঃখ নিবারণ কর্‌বো, কিরূপে স্বাধীনতার ধ্বজা আবার বঙ্গে উড্ডীয়মান হবে, এই চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান ;—শত্রু দমন বা প্রাণবিসর্জ্জন।" (২।৬গ)

অন্যত্র,

"কাসিম। গুর্‌গিণ…তুমি আমার বিশ্বাসী, দেখো বিশ্বাসঘাতকতা করো না। যদি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো, তাতে ক্ষতি নাই,

কিন্তু স্বদেশ, স্বজাতিকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ কোর না ;—ইংরাজ জয় করো। যদি তোমার উচ্চ বাসনা থাকে, আমি মাতৃভূমির নামে শপথ কচ্ছি, সে উচ্চ বাসনা তোমার পূর্ণ কর্‌বো।.... যে ইংরাজ জয় কর্‌বে, আমি রাজমুকুট তার শিরে স্বহস্তে পরিয়ে দেবো, আমি স্বয়ং জানু পেতে নবাব ব'লে তারে সেলাম কর্‌বো। আমি নবাবীর প্রার্থী হ'য়ে নবাবী গ্রহণ করি নাই। আমি স্বদেশ উদ্ধারের প্রার্থী, স্বদেশ-পীড়ক দমনের প্রার্থী, বাঙ্গলায় শান্তিস্থাপন প্রার্থী। যে এ মহাকার্য্য সাধন কর্‌বে, তারে আমি নবাবী প্রদান ক'রে ফকির হ'য়ে মক্কায় গমন কর্‌বো। একদিন—এক মুহূর্ত্ত যদি বাঙ্গলা ইংরাজবর্জ্জিত দেখে আমার মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যু আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থী। বাঙ্গলা বাঙ্গালীর হোক এই আমার প্রার্থনা। যে বঙ্গভূমি রক্ষা কর্‌বে—সেই নবাব,—আমি তার দাসানুদাস।...যদি সমস্ত বঙ্গবাসী না বোঝে, তুমি বোঝ, যে স্বাধীনতা পরম রত্ন—স্বর্গীয় রত্ন ;—স্বর্গের সুখ স্বাধীনতা—অপর সুখ স্বর্গে নাই। স্বর্গ অপেক্ষা গরীয়সী মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করো।" (৪।১গ)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে আমরা কেবল যুগমানসের প্রকৃত রূপটি যে উপলব্ধি করতে পারি তা নয়, নাট্যকারের স্বাদেশিক মানসের সত্যকার পরিচয়টিও এই নবাবদ্বয়ের চরিত্র-চিত্রণে ধরা পড়েছে। 'সিরাজদ্দৌলা নাটকে নবাব সিরাজ ও 'মীরকাসিম' নাটকে নবাব মীরকাসিম দুই নরপতির দরবেশী রূপের অন্তরালে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মর্মবাণীই প্রচারিত হয়েছে।

তবে. একমাত্র প্রধানচরিত্র পরিকল্পনাতে নাট্যকারের যুগমানসের প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করা গেলেও, নাটকের অন্যান্য বিষয় চিত্রণে গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক তথ্যকে অবিকৃতভাবে অনুসরণ করেছেন। ইংরেজদের লুণ্ঠন স্পৃহা এবং অর্থলোলুপতায় দেশের কুটির শিল্প ও শিল্পীদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারের সঙ্গে, সাম্প্রদায়িক অনৈক্য, জাতীয়তার অভাব এবং গৃহযুদ্ধ, যা বিদেশী শক্তিকে আধিপত্য বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করেছিল; তার প্রত্যেকটি চিত্র তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম' নাটক দুটিতে। দেশের উষরময় জীবনচিত্রণের সঙ্গে তিনি প্রচার করেছেন, জাতিগত ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের সকল স্তরে সংগঠন-চেতনা বিস্তার। এমন কি প্রয়োজন সিদ্ধির স্বার্থে গিরিশচন্দ্র ইংরেজদের সুউচ্চ

জাতীয়তাবোধকেও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ও স্তুতি করেছেন। দেশে একটি সুসংবদ্ধ জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর স্বাদেশিক চিন্তার মূল উদ্দেশ্য।

গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম' নাটকে প্রচার করেছেন, যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর চিত্তে জাতীয়তাবোধ না থাকার জন্যই বিদেশী ইংরেজদের এদেশে অনুপ্রবেশ এত সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছিল। নাট্যকারের এই চিন্তা বর্তমান কালের ঐতিহাসিকদের মননশীল অনুধ্যানে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁদের চিন্তাতে,

"...It is to be remembered that the establishment of the British rule in Bengal was not really a foreign conquest, that is to say, conquest of Bengal by England, but rather the result of an internal revolution...'India can hardly be said to have been conquered at all by foreigners. She has rather conquered herself.'...there was no India in the political sense. It was a mere geographical expression, and was therefore easily conquered by a foreigner just as Italy and Germany were conquered by Napoleon. There was no national feeling in at least the greater part of India, as there was none in Germany and Italy. Nor had India any jealousy of the foreigners, because she had no sense whatever of national unity, because there was no India and, therefore, properly speaking, no foreigner."[১৫]

সমস্ত বাঙ্গলা তথা ভারতে, কোন জাতীয়তাবোধ ছিল না। অনৈক্য ও স্বার্থপরতার ছবি আমরা 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম' নাটকদ্বয়ে দেখতে পাই। নাট্যচরিত্র করিমচাচা, মীরমদন ও নবাব সিরাজদ্দৌলাকে বলেছে তার স্বভাবসুলভ রসিকতাতে,

"করিম। চাচা, এই রাজসভাসদ্‌দের ন্যায় গোটাকতক আগাছা গজায়। নইলে এই বঙ্গভূমিরূপ বিধাতার সাধের উদ্যানে স্বার্থকুসুম ফুটেই রয়েছে, ছোট বড় সব স্ব স্ব প্রধান,—সুসৌরভে এ বলে আমায় দেখ—ও বলে আমায় দেখ!

১৫ History of the Freedom Movement in India (Vol I): Dr. R. C. Marumdar, pp 14-16.

এ বাঙ্গালায় যিনি শান্তি স্থাপন করবেন, তিনি বিধাতা পুরুষ। বাঙ্গালা ফিরে গড়তে হবে, পুরানো বাঙ্গালায় চলবে না।······

জনাব, এই বাঙ্গালায়, যদি তিন জনের দু'মত দেখাতে পারেন, তা হ'লে নাকে খৎ দিয়ে, আফিং ছেড়ে দেবো। তিন জনের তিন মত! যদি একমতে বাঙ্গালায় কাজ হতো, বঙ্গবাসী যদি এক মতে চল্‌তে শিখতো, তা হ'লে বাঙ্গালায় মাটি থাকতো না, সোনা হতো। বাঙ্গালার বুদ্ধিও যেমন প্রখর, প্যাঁচও তেমনি ঝুড়ি ঝুড়ি। এই প্যাঁচ খেলা চলেছে—যেটা কাটে, যেটা থাকে।" (২।৪গ)

অনুরূপভাবে জহরা, শ্বেত সেনাপতি ক্লাইভকে বলেছে,

"জহরা। সাহেব, তুমি এতদিন বাঙ্গালায় আছো, আজও কি বাঙ্গালীর চরিত্র অবগত হও নাই? তোমার কি মনে হয়, কারো হৃদয়ে স্বদেশ-অনুরাগ আছে? তোমার কি মনে হয়, কারো হৃদয়ে জাতীয়তা আছে? তোমার কি মনে হয়, মাতৃভূমির ভালোমন্দ কেউ চিন্তা করে? না! যদি বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের কিছুমাত্র হৃদয় থাক্‌তো, স্বদেশের উপর যদি তাদের কিছুমাত্র স্নেহ থাক্‌তো, যদি স্বদেশের উন্নতির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাক্‌তো, তা'হলে কি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষাদ্বেষ করে? তুমি কি এখনো বোঝ নি, যে যারা যারা তোমাদের সহায় হয়েছে, তাদের সকলের এক স্বার্থ নয়,—বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারীরা এক স্বার্থে চালিত নয়,···সকলেরই মনোগত কিসে রাজ্য করগত হবে! রাজ্য করগত করা, রাজ্যের মঙ্গলার্থে নয়; দুর্দ্দান্ত নবাবকে দমন করবার জন্য নয়, প্রজার শান্তির জন্য নয়—স্বার্থের জন্য! যদি না স্বার্থপর হ'তো, তুমি সকলের চক্ষে ধূলি দিয়ে, প্রতারিত ক'রতে পারতে না। সাহেব, তোমাদের স্বার্থ একরূপ,—পরস্পর স্বার্থের জন্য বিবাদ করো,—কিন্তু ইংরাজ-শত্রুর বিরুদ্ধে সকলে মিলে ভ্রাতৃভাবে অস্ত্র ধারণ করো! সে স্বার্থ বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের নয়;—অতি হীন স্বার্থ। সেই হীন স্বার্থের আবরণে সকলে অন্ধ হয়েছে,—তোমার কৌশলে নয়। যদি নিজ নিজ স্বার্থে এরূপ অন্ধ না হতো, তাহ'লে বুঝতো, যে দূরদেশ হ'তে ছ'মাস সমুদ্রে ভেসে, নিজ স্বার্থ নিমিত্ত এসেছ, তাদের স্বার্থের জন্য নয়। যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে তাদের গদী দিতে এসো নাই, আপনার প্রভুত্বের জন্য এসেছ। সকলেই বুদ্ধিমান, কিন্তু স্বার্থ এরূপ বলবান, যে তোমাদের স্বরূপ মনোভাব, কেউ বুঝতে সক্ষম হয় নি।" (৪।১গ)

'মীরকাসিম' নাটকেও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর পরাধীনতার কারণগুলিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করে, সমস্ত বিষয়টি দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য ছিল জাতিকে সত্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করা। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বাঙ্গালীকে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তিতে সঞ্জীবিত করার জন্য গিরিশচন্দ্র যে কারণগুলিকে পরাধীনতার মূল বলে প্রচার করেন, তাতে দেশবাসীর চিত্ত ও চেতনা শাণিত হয়েছিল। 'মীরকাসিম' নাটকে নাট্য-চরিত্রদ্বয় আলী ইব্রাহিম ও নবাব মীরকাসিমের মুখে প্রথমেই আমরা শুনতে পাই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ এবং অনৈক্যের কথা ও কাহিনী,

"আলী। জনাব, পলাশীক্ষেত্রে যখন নবাব-সৈন্য পরাজিত হয়, তখন কি ইংরাজ-সৈন্যের আধিক্য ছিল? শৌর্য্য-বীর্য্যে মোগল-সৈন্য কি কারো অপেক্ষা ন্যূন? নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনার অভাব ছিল না, অর্থের অভাব ছিল না, উপযুক্ত সেনানায়কের অভাব ছিল না, অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব ছিল না, —অভাব ছিল একতার, অভাব ছিল মনুষ্যত্বের, অভাব ছিল স্বদেশ-অনুরাগের!—সেই অভাব এখনো বর্ত্তমান।...এখন সেনানায়কেরা অধিকাংশই বিদেশী, অর্থের নিমিত্তই অস্ত্রধারণ করেছে; মোহনলাল, মীরমদনের ন্যায় নায়কের অভাব, আর কৃতঘ্ন হিন্দু-মুসলমান শতগুণে বর্দ্ধিত।

কাসিম।...যারা আমার পক্ষে প্রকাশ্যে আছে, তারাও সকলে স্বার্থের নিমিত্ত ব্যাকুল।...হায় হায় কি দুর্দ্দিনই উপস্থিত হলো! কেউ একবার মনে করে না, যে বিদেশীর পদানত হ'য়ে চিরদিন যাপন ক'রতে হবে, পুত্র-পৌত্রেরা বিদেশীর গোলাম হবে, অনুগত দীন প্রজারা অন্নাভাবে মরবে, শস্যশালিনী রত্নপ্রসূ বাঙ্গালা ছারখার হবে! ধিক্ ধিক্—বাঙ্গালায় ধিক্! বাঙ্গালীকে ধিক্! স্বার্থে ধিক্! হীনতায় শত ধিক্!...

আলী। জনাব,...এ বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানের ভিতর কয়জন আছে, যে কায়মনোবাক্যে ইংরাজের দাসত্ব না প্রার্থনা করে!...ইংরাজের সামান্য বেতনের নিমিত্ত পিতা, পুত্র, স্বদেশীকে হত্যা করতে সহস্র সহস্র লোক উদ্যত। অর্থদানে কপর্দ্দকশূন্য ইংরাজকে গদীয়ান ক'রে, তাদের মুৎসুদ্দি হবার শত শত লোক প্রার্থী! ইংরাজের কেরাণীর পদ যদি প্রাপ্ত হ'তে পারে, তা'হলে শত শত লোক আপনাকে ধন্য বিবেচনা করে।...

জনাব, স্বদেশ-অনুরাগ, প্রভুভক্তি, কৃতজ্ঞতা যদি এ সকল অমূল্য রত্ন বাঙ্গালায় থাকতো, তা হ'লে কি সামান্য রত্নের প্রার্থী হ'য়ে বিদেশী বণিকের পদলেহনে প্রবৃত্ত হয়!" (২।৩গ)

আবার, মীরজাফর-মহিষী মণিবেগম তাঁর স্বামীকে যে কথা বলেছেন, তাতে একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। মীরকাসিমের ইংরেজ-বিদ্বেষ, প্রজানুরাগ ও দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সমালোচনা করে তিনি যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তাতে অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে:

"মণি। ...সে সাহেবদের চিনেও চেনে না,—প্রজার মুখ চেয়ে সাহেবদের কাজের হানি করছে। মনে করেছে সৈন্য সংগ্রহ ক'রে সাহেবদের পরাস্ত করবে। কিন্তু জানে না, যে তার সৈন্য তার স্বদেশী,—যে স্বদেশী, সাহেবদের আট টাকা বেতনের জন্য, আপনার বাপ ভাইকে গুলি করতে প্রস্তুত, আপনার গ্রাম জ্বালাতে প্রস্তুত। বোঝে না যে, তার সেই স্বদেশী সৈন্য, বিদেশী সেনানায়ক দ্বারা চালিত,—সে সেনানায়কেরা অর্থের লোভে তার পক্ষ,—দেশের জন্য নয়, স্ত্রী-পুত্রের জন্য নয়, অর্থ উপায়ের জন্য যুদ্ধ করবে! এই সৈন্য নিয়ে ভেবেছে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এক স্বার্থে আবদ্ধ ইংরাজকে দমন করবে? এই দারুণ ভ্রম তার সর্ব্বনাশের কারণ হবে।" (২/৪গ)

পরে, তিনি হে এবং জন কার্ণাক সাহেবকে সম্বোধন করে বলেছেন,

"মণি। বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের চরিত্রই তোমাদের সম্পূর্ণ অনুকূল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা, পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষ, স্বার্থসিদ্ধির আশা,—বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজিত। ভেদমন্ত্রে তোমরা বিশেষ পারদর্শী; হিন্দু-মুসলমানকে তোমরা সম্পূর্ণ ভেদ করেছ—তোমরা ধন্য!" (ঐ)

"সাহেব, তোমার কথায় আমার হাসি পাচ্ছে। ভারতবর্ষে ফৌজের অভাব? যেথায় আট টাকা বেতন পেলে, পিতাকে গুলি করতে প্রস্তুত, ভাইকে গুলি করতে প্রস্তুত, মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার যে গৃহে অবস্থান কচ্ছে, সে গৃহ দগ্ধ করতে প্রস্তুত, সেখানে ফৌজের অভাব?...এ বাঙ্গালায় কে কার পক্ষ?......বাঙ্গালায় পক্ষাপক্ষ নাই। একটা গোলযোগ চাই, নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা চাই, বাঙ্গালায় কেউ কারো মুখ চায় না।" (৩।৭ গ)

উদাসিনী তারার প্রতি মণিবেগমের যে উক্তি, তাতে অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃত চিত্তের প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত নিষ্করুণভাবে ফুটে উঠেছে।

সে সময়ে দু'একজন জাতীয়তাবাদী স্বদেশবৎসল ব্যক্তির আবেদন, ব্যর্থতার নিষ্ফল হাহাকারে কিভাবে রোদনক্লান্ত হয়ে চতুর্দিকের আকাশকে শ্যামলী সন্ধ্যার বিধুরতায় ভরিয়ে দিয়েছিল ; অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী-পুরুষ সে বিষয়ে উদাসীন থেকে আত্মকলহে দেশকে অধঃপতনের তমোগহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল,—তার চিত্রটি নাট্যকার গিরিশচন্দ্র দেশবাসীর কাছে জাতীয়তার স্বার্থে তুলে ধরেছিলেন।

"তারা। মা, তুমি বঙ্গ-রমণী, তোমরা সকলে বঙ্গবাসী, কি সর্ব্বনাশ কচ্ছ? কার জন্য কচ্ছ? তোমাদের কি আত্মীয়ের মমতা নাই? স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে কি সুখ লাভ করবে?...ক'দিনের জন্য ভোগ করবে? ক্ষণস্থায়ী জীবন কেন কলঙ্ক-কালিমা পূর্ণ করবে? এখনো নিরস্ত হও... এখনও স্বাধীনতা রক্ষা ক'রো। নবাবী, আমীরি, জমিদারী—তোমাদের কি স্বাধীনতা অপেক্ষা প্রিয়?... স্বামীর প্রতি দয়া ক'রো, স্বামীকে পরাধীন ক'রো না ; সন্তানের প্রতি দয়া ক'রো, সন্তানকে পরাধীন ক'রো না ; ...জাতির প্রতি দয়া ক'রো, স্বজাতিকে পরাধীন ক'রো না ; স্বদেশের প্রতি দয়া ক'রো, স্বদেশীকে পরাধীন করো না ;...তুমি রমণী, রমণীর কার্য্য করো, বাঙ্গালায় উচ্চ আদর্শ স্থাপন করো, বঙ্গবাসীর হৃদয়ে চিরপূজ্যা হ'য়ে, অনন্তকালের নিমিত্ত অবস্থান করো।

মণি বেগম।...তুমি কি নিমিত্ত ব্যাকুলা? বঙ্গভূমির নিমিত্ত? দেখো—সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করো—দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করো,—যদি একজন স্বার্থত্যাগী পাও, যদি একজনকে বঙ্গভূমির জন্য কাতর দেখো, যদি এমন কাকেও দেখ্‌তে পাও, সে আত্মোন্নতি পরিত্যাগ ক'রে দেশের উন্নতির জন্য ব্যাকুল, তারে আমার কাছে নিয়ে এসো। যদি সত্য কেউ এমন মহাপুরুষ থাকে, যদি আমার হৃদয়ে প্রতীতি জন্মায়, যে সত্যই সে স্বার্থত্যাগী, সত্যই সে স্বদেশের উন্নতি কামনা করে, আমি সকল লালসা বর্জ্জন করবো...যাও, এ বাঙ্গালা তোমার স্থান নয়, তুমি বৃথা ভ্রমণ কচ্ছ! স্বার্থপর বঙ্গভূমির পরাধীনতা ভিন্ন উন্নতি-সাধনের আর অন্য উপায় নাই।...পরাধীনতা ভিন্ন রক্তস্রোত নিবারণ হবে না! নচেৎ দিন দিন, পিতা পুত্রের শত্রু—ভ্রাতা ভ্রাতার শত্রু—আত্মীয় আত্মীয়ের শত্রু হ'য়ে, পরস্পর পরস্পরের রুধির মোক্ষণ করবে; বাঙ্গালা অরণ্যে পরিণত হবে...।" (৪।২ গ)

হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ইংরেজদের ক্ষমতা-লাভের সরণিকে বিস্তৃত করেছিল অষ্টাদশ শতকে। গিরিশচন্দ্র ইতিহাসের নিদর্শন তুলে বাঙ্গালীর উভয় সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছেন আত্মঘাতী সংগ্রাম ও কলহের বিরুদ্ধে। অষ্টাদশ শতকে সেমীয় শাসকদের অত্যাচারে হিন্দুদের অসহনীয় জীবন-যন্ত্রণার কথা ইতিহাসবিশ্রুত।* নিষ্পীড়নের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে তাঁরা যে ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিলেন, তাও পরবর্তীকালের সমীক্ষায় স্বীকৃত হয়েছে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 'মীরকাসিম' নাটকে তারা ও জগৎশেঠের কথোপকথনে জাতিবিদ্বেষের ছবিটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। স্বজাতির মধ্যে ঐক্য প্রচার, তার স্বাদেশিক ধর্মের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, তারও পরিচয় আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

"তারা। বড় যন্ত্রণায় এসেছি, স্থির হ'তে পারিনে তাই এসেছি,… মহারাজাধিরাজ আপনারা সকলে একত্র হ'য়ে কি করছেন?—আবার কি কুৎসিৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হচ্ছেন? আজও কি আপনাদের শিক্ষা হয় নাই?… নবাব-বংশধরকে বঞ্চিত ক'রে সেই সময় হ'তেই মুসলমানদের রাজ্য-লিপ্সা প্রবল হয়েছিল, সেই সময় হ'তেই কৃতঘ্নতা প্রবল, সেই সময় হ'তেই রাজ-বিদ্রোহীর সৃষ্টি। সিরাজের স্থানে মীরজাফরকে বসিয়েছেন, তাতে কি উন্নতি হ'লো? ইংরাজের টঙ্কশালায় মুদ্রা চলিত হ'লো—আপনাদের কার্য্যে ব্যাঘাত হ'লো। আপনারাই ষড়যন্ত্র ক'রে কাসিম আলীকে সিংহাসন দিয়েছেন,

* "The greater part of Hindustan having been for several centuries subject to Muhammadan Rule, the civil and religious rights of its original inhabitants were constantly trampled upon, and from the habitual oppression of the conquerors,...but the Natives of Bengal wanting vigor of body, and adverse to active exertion, remained during the whole period of the Muhammadan conquest, faithful to the existing Government, although their property was often plundered, their religion insulted, and their blood wantonly shed. Divine Providence at last, in its abundant mercy, stirred up the English nation to break the yoke of those tyrants, and to receive the oppressed Natives of Bengal under its protection."—Rammohan Roy : the petition to the King in Council, 1823.

আবার কেন ষড়যন্ত্র কচ্ছেন? কাসিম আলীর শত্রুদমনের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন, জমীদারদের নিকট সেই অর্থের সঞ্চয় করেছে, এই কি আপনাদের বিরক্তির কারণ? দেশীয় শত্রু দমনের নিমিত্ত, আপনাদের সে অর্থ স্বেচ্ছায় প্রদান করা উচিত ছিলো। কাসিম আলী নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ কর্‌বার জন্ত অর্থ সংগ্রহ করে নাই, নিজ বিলাসের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করে নাই, দেশ-বৈরী নির্য্যাতনের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করেছে;—আপনারা সকলে তাঁর সাহায্য করুন।...

জগৎশেঠ। মা, আমরা হিন্দু—আমাদের আর দেশ কি বলুন? আমাদের পক্ষে মুসলমান রাজাই বা কি আর ইংরাজ রাজাই বা কি?

তারা। বঙ্গবাসী হ'যে এমন কথা মুখে আনছেন?...মুসলমান রাজ্যে হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু সেনাপতি, উচ্চ রাজকার্য্যে হিন্দুরা প্রতিষ্ঠিত।...মুসলমান রাজা স্বদেশী, তার রাজকোষ পূর্ণ থাক্‌লে, স্বদেশী রাজকোষ পূর্ণ থাক্‌বে। বিদেশী অধিকারে বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য বিদেশে যাবে, রাজকার্য্য বিদেশীয় হবে।

রাজবল্লভ। মা, সেদিন আর নাই। নবাব হিন্দুদ্বেষী, একে একে হিন্দুদের পদচ্যুত ক'রে, মুসলমানদের রাজকার্য্য দিচ্ছে।

তারা। এ বিদ্বেষের কারণ হিন্দু—তা কি এখনও বোধগম্য হয় নাই? মুসলমানেরা সৈন্যভার নিয়ে, আপনারা আমোদ-প্রমোদ ক'রে দিন যাপন করেন। তারা যে নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরোধী হ'য়েছিল সে হিন্দুর পরামর্শে, কুটীল মন্ত্রণা সমস্তই হিন্দুর। হিন্দুর মন্ত্রণায় পলাশীর যুদ্ধ, হিন্দুর কুচক্রে হিন্দু-মুসলমান ভেদ,—স্বদেশবাসী পরিত্যাগ ক'রে, বিদেশীর আনুগত্য হিন্দুরাই কচ্ছে।

জগৎশেঠ। মা, সমস্ত সংবাদ তো অবগত নও। হিন্দুরা প্রাণভয়েই এরূপ করে। ইংরাজের আনুগত্য না ক'র্‌লে, মীরণের দৌরাত্ম্যে সমস্ত উচ্চপদস্থ হিন্দুই নিহত হতো।" (২।৫গ)

সাম্প্রদায়িক ও স্বজাতি-বিদ্বেষের পরিমাপ সে যুগে কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তারও পরিচয় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র দিয়েছেন। 'মীরকাসিম' নাটকে নবাবের আর্তিতে ও আলী ইব্রাহিমের উক্তিতে সে কথা আমরা জানতে পারি:

"কাসিম। লালসিং, আমি তোমার নিকট প্রার্থী! তোমার ন্যায়

প্রভুভক্ত হিন্দু আমায় আর একজন এনে দাও! তারে অর্দ্ধরাজ্য বিনিময়ে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এই স্বদেশদ্রোহী সমাজে বাস ক'রে, তোমার এরূপ প্রভুভক্তি, এরূপ শত্রুবিজয়ে অনুরাগ, তোমার এরূপ বীরত্ব! এর পুরস্কার কেবল ঈশ্বর তোমায় প্রদান করতে পারেন, আমি প্রদান করতে অক্ষম! লালসিং, হেথায় করজোড়ে শত্রু-সংহার আদেশ প্রার্থনা করছ, কিন্তু এই সময়েই শত শত হিন্দু, শত্রুর জয় কামনায় নিযুক্ত আছে। কেবল হিন্দু কেন —শত শত মুসলমানও এই কুৎসিৎ কার্য্যে ব্যাপৃত। শত্রু হস্তে স্বদেশ পরাজয়ের নিমিত্ত তারা অর্থদানে প্রস্তুত, সৈন্যদানে প্রস্তুত, পরামর্শদানে প্রস্তুত, বিশ্বাসঘাতকতায় প্রস্তুত, স্বজাতির সর্ব্বনাশে প্রস্তুত, সর্ব্বস্বদানে প্রস্তুত; কিন্তু দেশ-শত্রুর বিরুদ্ধে অঙ্গুলি উত্তোলন করতেও ভার জ্ঞান করে!...

...ক্রীতদাসের হৃদয়ে, যে স্বাধীনতার ভাব অবস্থান করে, বাঙ্গালায় আমীর-ওমরাও বাজাধিরাজের বক্ষে সে স্বাধীন ভাব নাই! কি কুহক! যাদের নিকট, ইংরাজ দ্বারস্থ হ'য়ে জানু পেতে আবেদন করেছে, তাদের দাসত্ব প্রার্থনায় সকলেই ব্যাকুল! মান, মর্য্যাদা, ধনজন সমস্ত অর্পণ ক'রে, সেই দাসত্ব ক্রয়ের নিমিত্ত দিবারাত্র ব্যাকুল!...

আলী। আজ্ঞে এতে আমাদেরই বিশেষ গুণপনা,—আমরা যে তাদের ক্রীতদাস হতে চাই, সে আমাদেরই কৌশল! জনাব...ইংরাজ যেমন অর্থলোলুপ, আমরা সেইরূপ আত্মীয়-ধ্বংসলোলুপ। বঙ্গবাসীর আত্মীয়ই আত্মীয়ের পরম শত্রু। পিতা শত্রু, ভ্রাতা শত্রু, বন্ধু শত্রু, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, স্বদেশী সকলেই শত্রু—আর বিদেশী মাত্রেই বন্ধু! আমরা বহুদিন হ'তে ক্রীতদাস ক্রয় ক'রে আসছি, বহুদিন সেই ক্রীতদাসের সংসর্গে আপনারা ক্রীতদাস হয়েছি।" (৩।৬গ)

ইংরেজ-ডাক্তার ফুলারটনের উক্তিতে অষ্টাদশ শতকের হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর বাঙ্গালীমানস সুচিত্রিত হয়েছে। তিনি নবাব মীরকাসিমকে যে কথা বলেছেন, তাতে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে:

"ফুলার। জনাব,...জনে জনে জিজ্ঞাসা করুন—কি নিমিত্ত স্বদেশ ছাড়িয়া, স্বজাতি ছাড়িয়া, সকলে ইংরাজের বশীভূত হইতেছে। তারা বুঝিয়াছে কি জানেন? হিন্দুরা বুঝিয়াছে—মুসলমান তাদের উপর

জবরদস্তি করে, ইংরাজ তাদের পালবে। মুসলমান বুঝিয়াছে—যে আমরা সব নবাব হইতে পারি, এ কেন আমাকে ছাড়াইয়া বড় হইবে ; যদি সর্ব্বনাশ হয়, সবারই হোক! যেখানে এমন অবস্থা, যেখানে এইরূপ অসভ্যতা, সেখানে প্রজার দুঃখ বই আর সুখ হয় না। ভারতবর্ষের চারিদিকে দুঃখ! বড়লোকে লড়ে, গরীবলোক মারা যায়। তাই ইংরাজের জয় হইতেছে! ইংরাজের অধিকারে যে একটা পানের খিলি বেচে, তাকে আমীরি দিলে ভি ইংরাজের রাজ ছাড়িয়া মুসলমানের তাঁবেদারি করিবে না।"
(৪।৬গ)

কেবল বাঙ্গলা নয়, সমস্ত ভারতের চিত্রও ছিল অনুরূপ। দেশবাসীর জীবন ও অনুভূতির কোন স্তরেই জাতীয়তাবোধ বা স্বাদেশিকতা ছিল না। গৃহযুদ্ধ, আত্মঘাতী কলহ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা সমস্ত ভারতবর্ষকে রাহুর পূর্ণগ্রাসে আচ্ছন্ন করেছিল। নাট্যচরিত্র আলী ইব্রাহিমের প্রতি ছদ্মবেশী বেগমের উক্তিতে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় :

"বেগম। তুমি কি মনে করো, কেবল বাঙ্গালার মুসলমানই স্বদেশদ্রোহী —বিশ্বাসঘাতক ? তা নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান-হৃদয় কলঙ্কিত হয়েছে। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থের নিমিত্ত ব্যস্ত। স্বদেশের মমতা কারো হৃদয়ে নাই। বাঙ্গালারও যে অবস্থা, অযোধ্যারও সেই অবস্থা! বাঙ্গালায় যেরূপ শত্রু প্রবেশ করেছে, সেইরূপ একবার অযোধ্যায় শত্রু প্রবেশ করলে, সকলই প্রকাশ পাবে। প্রকাশ পাবে বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমানের যে অবস্থা— অযোধ্যারও হিন্দু-মুসলমানের সেই অবস্থা।" (৪।৮গ)

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাঙ্গলাদেশ ইংরেজদের লুণ্ঠনক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে বাঙ্গলা লুণ্ঠনের কাহিনী মীরকাসিম নিজেই ব্যক্ত করেছিলেন :

"Having been certainly informed that the greater part of merchants of my country have suffered considerable losses and have laid aside all traffic, sitting idle and unemployed in their house—···Therefore with a view to the welfare and quiet of this kind of people I have ceased all duties of customs, chaukidary mangan, collections upon new-built boats and other lesser taxes by land and water, for two

years to come, to be removed and my Sunnod is accordingly sent to enforce it "[১৬]

নবাব মীরকাসিম, ভ্যান্সিটার্টকে আরও লিখেছিলেন,

"In every parganah and every village they have established 10 or 20 factories. In every factory they buy and sell salt, betel-nut, ghee, rice, straw, bamboo, fish, gunnies, ginger, sugar, tobacco, opium and many other things."[১৭]

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার নাট্যরূপ দিয়েছেন। নবাব মীরকাসিম, ভ্যান্সিটার্টকে বলেছেন,

"কাসিম। আরও অনুধাবন করুন,—যে সকল কার্য্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কখনও নিযুক্ত ছিলেন না, সমস্তই তাঁরা কচ্ছেন, সামান্য ব্যবসাও বলপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ কচ্ছেন,—ঘৃত, চাউল, লবণ, সুপারি, খড়, বাঁশ, পান, তামাক, চিনি প্রভৃতি দেশীয় লোকের সামান্য ব্যবসা পর্য্যন্ত আর দেশীয় লোকের নাই। প্রতি পরগণায়, বৎসর বৎসর দশ কুড়িটি নূতন কুঠী সংস্থাপিত হচ্ছে! কুঠীয়াল সাহেবেরা, আমার কর্ম্মচারীকে গ্রাহ্য করেন না।" (২।৩গ)

নাট্যচরিত্র মীরকাসিম ও মণিবেগমের কথোপকথনে একই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে,

"কাসিম। বেগম সাহেব,......দেশের অবস্থা শুনুন, ইংরাজের অযথা বাণিজ্য-বিস্তারে প্রজার সর্ব্বনাশ হচ্ছে। বাদ্‌শাই ফার্ম্মাণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিনা শুল্কে বিদেশী বাণিজ্য কর্‌বার অধিকার আছে, কিন্তু এখন স্বদেশী বাণিজ্য বিনা শুল্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক'চ্ছে;—তার কর্ম্মচারীরাও জনে জনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফার্ম্মাণ দেখিয়ে শুল্ক প্রদান করে না; এ সওয়ায় যে ইংরাজ বাঙ্গালায় পদার্পণ ক'চ্ছে, সেই একটি কুঠীয়াল হ'য়ে অন্যায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত। বেইমান দেশের লোক, নিজে অর্থ দিয়ে তাদের মুৎসুদ্দির পদ গ্রহণ করে; কোম্পানীর সেপাই, তাদের কর্ম্মচারীদের সেপাই, কেউ বা সেপাই সাজিয়ে প্রজাদের ধরে নিয়ে যায়, শিল্পীদের পীড়ন ক'রে দাদন দিয়ে মুচ্‌লেখা লিখিয়ে নেয়,

১৬ The Economic History of British India, Under Early British Rule: R. C. Dutt; p. 23.

১৭ History of Bengal (vol. II): Jadunath Sarkar; p. 35.

বণিকদের নিকট মুচ্‌লেখা লিখিয়ে নিয়ে অল্প মূল্যে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে, আর দশগুণ মূল্যে বিক্রয় করে। এতে সমস্ত প্রজা দিন দিন নিঃস্ব হ'চ্ছে"··· (১।১গ)

ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য-নীতির ফলে বাঙ্গলাদেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। দেশের অর্থনৈতিক অবনতি ও শিল্পীদের দুরবস্থা কিরকম সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল, তা নিম্নলিখিত একটি উদাহরণেই প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হবে,

"The English, with their Banyans and black Gomastahs, arbitrarily decide what quantities of goods each manufacturer shall deliver and the prices he shall receive for them ..... The assent of the poor weaver is in general not deemed necessary ; for the Gomastahs, when employed on the Company's investment. frequently make them sign what they please ; and upon the weavers refusing to take the money offered, it has been known that they have been tied in their girdles, and they have been sent away with a flogging......A number of these weavers are generally also registered in the books of the Company's Gomastahs, and not permitted to work for any others, being transferred from one to another as so many slaves......The roguery practised in this department is beyond imagination ; but all terminates in the defrauding of the poor weaver ; for the prices which the Company's Gomastahs, and in confederacy with them the Jachendars (examiners of fabrics fix upon the goods, are in all places at least 15 per cent, and some even 40 per cent less than the goods so manufactured would sell in the public bazaar or market upon free sale."[১৮]

১৮ Considerations on India Affairs (1772): William Bolts; pp. 191-194.

ইংরেজ রাজত্বের সূচনাতেই বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী জীবনে দুর্ভাগ্যের যে করালকৃষ্ণ যবনিকা নেমে এসেছিল, তার নাট্যচিত্র 'মীরকাসিম' নাটকে গিরিশচন্দ্র এঁকেছেন ইতিহাসের প্রতি গভীর আনুগত্য প্রদর্শন করে। তাঁর কবি-কল্পনা বিমানবিহারী না হয়ে বহুলাংশে বাস্তবতার গুরুভারে মন্থর ও মৃত্তিকাতলচারী হয়েছিল। এরই ফলে গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি একদিকে যেমন ইতিহাস, তেমনি অপরদিকে অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনচিত্র। ঐতিহাসিক সত্যের প্রকৃত তথ্যের উদ্ঘাটন করে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন রূপ স্বদেশবাসীর কাছে তুলে ধরেন। ইংরেজদের শাসনব্যবস্থা ও রাজকার্য পরিচালনার প্রতি বাঙ্গালীকে মোহমুক্ত করাই তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার অপর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এখন আমরা নাট্যচিত্রে নাট্যকারের প্রয়াস সাগ্রহে লক্ষ্য করে দেখব, কেমন দক্ষতার সঙ্গে তিনি অতীত যুগের প্রকৃত ঘটনাকে বিংশ শতকের অগ্নিশিখাতে বিশুদ্ধ করে পরিবেশন করেছিলেন। নিম্ন উৎকলিত দৃশ্যটি আকারে বিস্তৃততর হলেও আলোচনার স্বার্থে সবটাই গ্রহণ করা হল,

"মুৎসুদ্দি। সাহেব, এই এক বেটা তাঁতী,—মুচলেখা সই কর্‌বে না, দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে।

সাহেব। বাঁধো—কুঠী চালান দেও। Rascal, তুমি মুচলেখায় সহি করিবে না,—জুতোর চোটে সহি করিবে। (প্রহার)

তাঁতী। সাহেব মলুম, দু'দিন পেটে অন্ন নাই, মার্‌বেন না, মারা যাবো।—রাতদিন বুন্‌ছি, কাজ শেষ কর্‌তে পারি না; যা পাই, তাতে অর্দ্ধাশন হয় না।

মুৎসুদ্দি। নে নে ঢেড়া সই দে, কেন মার খেয়ে মরবি?

তাঁতী। নিন্—নিন্—ঢেড়া সই দিচ্ছি। (ঢেড়াসহিকরণ)

সাহেব। এ দুই ব্যক্তি কে?

মুৎসুদ্দি। এরা মস্ত মহাজন, এ বেটা কুঠীর তামাক কিন্‌তে চায় না, সব তামাক কুঠীর গুদামে পচ্চে। আর এ বেটাদের পান, সুপারি, তেঁতুলের কারবার, কোনমতেই বেটারা কুঠীতে বেচ্‌বে না!

সাহেব। চাউলের মহাজনকে ধরিতে পার নাই? চাউলের বড় দরকার, রপ্তানী দিতে হইবে।

মুৎসুদ্দি। আজ্ঞে সেপাই পাঠিয়েছি, এখনি ধ'রে আনবে।

সাহেব। তুমি রোজই লোক পাঠাও,—বাঁশখড়ের একটা আদমি আনিতে পারিলে না। তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছ, লাখ টাকা দিয়ে মুৎসুদ্দি হইবার জন্য আমায় সাদাসাদি করিতেছে।

মুৎসুদ্দি। সাহেব—সব ঠিক কর্‌ছি—সব ঠিক কর্‌ছি। আমাকেই দোষেন, আপনাদের শাসন নাই, এই এরা বায়না-নামায় সই করতে চায় না।

সাহেব। (মহাজনগণের প্রতি) তোমরা কয়টা কোড়া খাইয়া সহি করিবে ?

সুপারির মহাজন। সাহেব, সিকি দরে কি ক'রে বেচ্‌বো ? কেনার উপর বারো আনা লোকসান।

সাহেব। এই লাভ লইয়া বেচো। (প্রহার)

সুপারির মহাজন। গেলুম—গেলুম—মলুম। সই ক'চ্ছি—সই ক'চ্ছি।

(সহিকরণ)

মুৎসুদ্দি। পথে এসো বাবা, বুঝিয়ে বল্লে তো শোন না ? (তামাকের মহাজনের প্রতি) ওহে এগিয়ে এসো,—সাহেব তোমায় দশ গুণ দরে তামাক বেচ্‌তে চায়—না ? লাভ খাবে, না সই কর্‌বে ?

তামাকের মহাজন। আজ্ঞে সই কচ্ছি—আজ্ঞে সই কচ্ছি। (সহিকরণ)

সাহেব। বায়নার টাকা কুঠী যাইয়া লইও।

তামাকের মহাজন। যে আজ্ঞে (স্বগত) দেশে থাকি, কুঠীতে গিয়ে নেব।

মুৎসুদ্দি। এই যে সাহেব, চালের মহাজনকে ধরে আন্‌ছে।

(চাউলের মহাজন ও আরও কয়েকজন তাঁতীকে লইয়া সেপাইগণের প্রবেশ)

১ সেপাই। আজ্ঞে সব তল্‌পি-তল্‌পা বেঁধে নিয়ে ঘর-বাড়ী ছেড়ে সব পালাচ্ছিলো।

সাহেব। সব কুঠী চালান দেও, ধূপে দাঁড়াইয়া আমার মাথা ধরিয়াছে।

(সাহেবের প্রস্থান)

তাঁতী। মুৎসুদ্দি ম'শায়, আর কেন ? আমাদের হাত কেটে দিন, দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে খাই। অন্নাভাবে গায়ে বল নাই যে না খেয়ে বুন্‌বো,—দুটো ছেলে না খেয়ে মারা গেছে।

মুৎসুদ্দি। লে চল'—লে চল'—কুঠী লে চলো, সই না ক'রে বাপু ছাড়ান পাচ্ছ না। (মুৎসুদ্দির প্রস্থান)

তাঁতী। সেপাই, আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি যা আছে নাও, আমাদের ছেড়ে দাও।

সেপাই। তো সবদের ছোড়িয়ে দিবো, আর সাহেবের জুতা খাইবো?

... ...

কাসিম। আহা, দেখ—দেখ, বুঝি এদের প্রহার করেছে।

সুপারির মহাজন। খাঁ সাহেব, প্রাণ গলে গেল! আমাদের মেরেছে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে! রক্ষা করুন!—রক্ষা করুন! অন্ন গেল—বস্ত্র গেল—স্ত্রী-পুত্র মারা গেল—মার খেয়ে প্রাণ গেল—খেটে খাবার যো রাখ্‌ছে না!

তাঁতী। সব দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সাতশো ঘর তাঁতী একা রাজসাহী হ'তেই চলে গেছে। ব্যাপারীরা সব মারা গেল! ব্যবসায় আয় নাই, জমীদার ঘরবাড়ী বেচে খাজনা নিচ্ছে।

তামাকের মহাজন। হুজুর, দেশী লোকের সকল ব্যবসাই ইংরাজ নিলে,—লবণ, সুপারি, ঘৃত, চাউল, খড়, বাঁশ, মৎস, চিনি, তামাক, পান, যে কাজে দেশী লোক দু'পয়সা পেতো, কুঠীওয়ালা ইংরাজ সকল ব্যবসা কেড়ে নিলে।" (১।২গ)

নাট্যচরিত্র তারার গীতেও একই চিত্র অনুলিখিত,

"পরাধীনা জননী আমার।
লাঞ্ছিত সন্তানগণে পীড়নে কঙ্কাল সার॥
হৃদয়ে শোণিত নীর, কটীতটে জীর্ণ চীর,
নির্জ্জীব আনতশির, দেহমাত্র ভার॥
রোগে জীর্ণ হীনবল, শোকে শুষ্ক হৃদিস্থল,
দাবানল ক্ষুধানল, নেহারে আঁধার॥
নিরাশ বিকট হাস, নৃত্য করে মহাত্রাস,
বহে উষ্ম দীর্ঘশ্বাস, আবাস কান্তার॥" (১।২গ)

অপর একটি উক্তিতে নাট্যচরিত্র তারা মুর্শিদাবাদের দীপমালাশোভিত পথে ইংরেজ সৈন্যের আনন্দনৃত্য দেখে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন,

"তারা। মাগো, কেন এ দীপমালায় সজ্জিতা হয়েছ? কেন এ সৌরভিত পতাকাশ্রেণী? কেন মা, আজ তোমার কিসের আনন্দ! তোমার অন্তর তো নিবিড় তমসাছন্ন, তবে এ বাহ্যিক আনন্দ কিসের? আবার

কি রুধিরস্রোতের তৃষায় এরূপ মনোহর বেশ ধারণ করেছ? মাগো! কার শোণিতে এই দীপমালা জ্বলেছে? কার অস্থিপেশিত অর্থে তোমার পতাকা? সন্তানের মমতা একেবারে বিসর্জ্জন করেছ? আজ কি তোমার আনন্দের দিন, যে আনন্দ কচ্ছ! অভাগিনী দুঃখিনী নন্দিনীকে আর কত যন্ত্রণা দেবে? আর যে হাহাধ্বনি শুনতে পারি নে মা? হাহাকার ধ্বনিতে কি তুমি বধিরা? তুমি কি নির্জ্জীব শব! শবদেহে কি এই সকল সজ্জা? মা—মা, আর সন্তানের প্রতি বিরূপ হ'য়ো না!"

(১।৬গ)

আবার, হেষ্টিংসকে লক্ষ্য করে তারা পুনরায় বলেছেন,

"তারা। সাহেব, কি দেখ্‌তে এসেছ? দেশের অবস্থা! দেখ ঐ পর্ণকুটীর দেখ,—তথায় আমীরের ন্যায় বণিকের অনাথা স্ত্রী-পুত্র অন্নাভাবে মুমূর্ষু হ'য়ে অবস্থান কচ্ছে! ঐ দেখ, অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দু ও মুসলমান বণিতা উদরান্নের জন্য শাক আহরণ কচ্ছে! ঐ দেখ, ধনাঢ্য বণিক, শিশু সন্তান কোলে ল'য়ে, সস্ত্রীক দেশ ত্যাগ কচ্ছে! দেখ, দেখ, ক্ষেত্র দেখ—শস্যশূন্য, গঞ্জ পণ্যদ্রব্যশূন্য, জনশূন্য হাট সমাধিভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ! নদীর বক্ষে পতাকাশ্রেণী দেখ! ঐ সমস্ত পতাকা ইংরাজ বণিকের; প্রত্যেক নৌকা বলপূর্ব্বক সিকি মূল্যে গৃহীত পণ্যদ্রব্যে ভারাক্রান্ত, পাঁচগুণ মূল্যে বিক্রীত হবার জন্যে স্থানান্তরে যাচ্ছে। দেখ দেখ, ঐ সকল তন্তুবায়দের গৃহে, শৃগাল কুকুর প্রবেশ কচ্ছে, শিল্পীরা স্থান ত্যাগ করেছে; —কেনো জানো? তোমাদের দৌরাত্ম্যে!...ইংরাজ পতাকা শত শত উড্ডীয়মান, সেই পতাকাতলে দেশীয় লোক অন্নাভাবে অস্থিচর্ম্মসার!"

(২।২গ)

এইভাবে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক নাটকদ্বয়ে ইংরেজ শাসনের অত্যাচার, দেশীয় আমলা ও মুৎসুদ্দিদের স্বার্থ ও অর্থলোলুপতা এবং দেশীয় লোকের ঊষর জীবনের কথাচিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক ও জাতীয়হিতবাদী মনীষী। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল মুখরতার দিনে তিনি ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচনা করে দেশবাসীকে দেশের অখণ্ডতা সংরক্ষণে বিভিন্ন পথ ও মতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও ধর্মভেদ দূর করে একতা বিস্তার, স্বদেশভূমিকে মাতৃজ্ঞানে সেবা এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ রচনা করাই

তাঁর স্বাদেশিক কর্মের মূল প্রয়াস ছিল। তিনি ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেশবাসীকে ধ্বংসের পথ থেকে উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের দুর্যোগ ঘটনাবলীকে গ্রহণ করে তিনি বিংশ শতকের জীবনচিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাকে যুগোপযোগী করে তুলেছেন। এর ফলে তাঁর যেটুকু ইতিহাস-ব্যত্যয়, তাকে যুগের অনিবার্য স্বীকৃতি বলেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সিরাজের মুখে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতি যে আহ্বান ও ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার, তা প্রকৃতপক্ষে নাট্যকারেরই স্বাদেশিক আদর্শের অনুলিপি।

"সিরাজ। ওহে হিন্দু-মুসলমান—
এস করি পরস্পর মার্জ্জনা এখন ;
হই বিস্মরণ পূর্ব্ব বিবরণ ;
করো সবে মম প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন।
... ...
... ...
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাঙ্গালায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব।
কিন্তু সাবধান—
নাহি দিও ফিরিঙ্গিরে সূচ-অগ্র স্থান
জানিহ নিশ্চিত—
রাজ্যলিপ্সা প্রবল সবার।
দাক্ষিণাত্যে বুঝহ ব্যভার
ছলে বলে বিস্তার করিছে অধিকার।
ইংরাজের অমাত্য ইংরাজ,
মন্ত্রণায় স্থান নাহি পায় দেশবাসী।
বঙ্গের সন্তান—হিন্দু-মুসলমান,
বাঙ্গালার সাধহ কল্যাণ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ—
নাহি হয় ফিরিঙ্গি-নফর।
শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার ;
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,

স্বার্থপর—চাহে মাত্র রাজ্য-অধিকার।
হও সবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।" (১।৫গ)

অপর একস্থানে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নবাব সিরাজের মুখে হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের নিন্দা করে, দুই সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশবাসীকে সুষুপ্তির মোহঘোর থেকে উদ্ধার করে চৈতন্যের কঠিন উপল খণ্ডে স্থাপন করাই তাঁর কর্মচিন্তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর ধর্মবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্য তাঁকে কতদূর ব্যথিত ও চিন্তাক্লিষ্ট করেছিল, তার পরিচয় তিনি নবাব সিরাজের উক্তিতে বাকরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বাণীবদ্ধ করেছেন:

"সিরাজ। না মীরমদন, জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে, পরস্পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হ'য়ে, সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত ক'রে স্বদেশবাসীর অপমানে আপনার অপমান জ্ঞান করে, যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়,—এই দুর্দ্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব; নচেৎ অভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য্য!" (২।৬গ)

'মীরকাসিম' নাটকে গিরিশচন্দ্রের স্বাদেশিক আদর্শ প্রচার আরও সক্রিয় ভাবে হয়েছে। নাট্যচরিত্র তারার আকুল উক্তি ও কার্যকলাপে নাট্যকারের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও প্রয়াসই প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্মশিক্ষা, স্বার্থত্যাগ, স্বদেশী স্বার্থের প্রতি স্থির লক্ষ্য ও অনুরাগ এবং বিদেশী শাসনের প্রতি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য আহ্বান—সমস্ত কিছুর মধ্যে গিরিশচন্দ্রের জাতীয়হিতবাদী চিন্তাই প্রসারিত। নাট্যচরিত্র তকী খাঁকে সম্বোধন করে তারা বলেছেন,

"তারা। বাবা দেখ্‌ছো! সোনার রাজশাহী দেখ্‌ছো!...সকলি গেল—সকলি গেল! দোকানি, দোকান বন্ধ ক'রে চ'লে গিয়েছে,—ধনী, পাগল হ'য়ে ধুলো হাঁট্‌কাচ্ছে—বালক, ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে কাঁদছে,—অন্নাভাবে গৃহিণীর চক্ষে শতধারা! দেখ—দেখ! আরো দেখ, কবে রাজ্য মরুভূমি হয় দেখো!—সোনার বাঙ্গালায় তৃণ থাক্‌বে না...গেল—সকলি গেল!

তকী। মা, তুই তো কেঁদে বেড়াস্, কিছু উপায় আছে কি ?

তারা। উপায় নাই ?—এমন কথা বলো না। আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে স্বদেশীর দুঃখে দুঃখিত হও, নিজ স্বার্থ ত্যাগ ক'রে, স্বদেশীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করো, ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করো, ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করো, জন্মভূমির প্রতি লক্ষ্য করো উপায় নাই ? উপায় আছে—করো !

তকী। মা, তুমি শিখিয়ে দাও।

তারা। শুন্‌ছো না—শুন্‌ছো না ? মা তৃষ্ণায় হা-হা কর্‌ছে, মা'র তৃষ্ণা নিবারণ করো ! সামান্য বারি-পানে সে তৃষ্ণা দূর হবে না,—শোণিত-পিপাসা !—বক্ষের শোণিত দান করো ! মা—মা—মা, আমার বক্ষের শোণিতে কি তুই তৃপ্ত হবি নে ;—নে মা—নে, আর যে আমার সয় না ! আমি যে তোর দাসী, আমি যে তোর কন্যা, আমার প্রতি সদয়া হও মা ! নাও মা—নাও, আমার বক্ষের শোণিত নাও ! সন্তানের প্রতি চাও ! বড় অভাগা—বড় অভাগা !

তকী। মায়ি, আমি তোর ছেলে, আমায় শোণিত দিতে শেখা না ? কি কাজে বুকের শোণিত দেব বলে দে ?

তারা। বাবা, ভাইদের ধর্ম্মশিক্ষা দাও, বাঙ্গালার কৃতঘ্নতা দূর ক'রো, বাঙ্গালার সেবায় নিযুক্ত হও ; প্রেমে সকলকে বশীভূত ক'রো—স্বদেশ-প্রেম—স্বদেশপ্রেম—সেই প্রেমে বক্ষের শোণিত দানে প্রস্তুত হও ;—আর তো কিছু শিক্ষা নাই ! আহা ! আর সহ্য হয় না—আর সহ্য হয় না।

দুখিনী সন্তান কি আছে তোমার।
দান'—প্রাণদান'— রুধির ধার,
তাপিতা মাতা তাপ নিবার ॥
ধরম করম ভবে মাতৃসেবা,
মাতৃভক্ত বিনা মুক্ত কেবা ?
কাতর মার তরে, মাতৃবেদনা হরে,
নরত্ব-গৌরব-অধিকারী যেবা।
  মাতৃবৎসল, অটল অচল,
বহে না অধীন-জীবনভার,
  শ্রীহীনা জননী নেহার ;—

মাতৃঋনী তুমি, শুধিতে ধার,
ঢাল ঢাল হৃদয় স্থসার—
কিবা আছে আর দুখিনী কুমার ॥

তকী। মায়ি, আজ তোর কাছে শিখ্‌লেম। ধর্ম্ম শিখ্‌লেম, কর্ম্ম শিখ্‌লেম, খোদার কার্য্য শিখ্‌লেম, জন্মভূমির কার্য্যে বুকের রক্ত দিতে শিখ্‌লেম ;—মায়ি তোর উদ্দেশে সেলাম করি।" (১।৪গ)

অপর একস্থানে নাট্যকারের ইচ্ছা তারার উক্তিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে বলে মনে হয় :

"তারা। ···দিবারাত্র ভ্রমণ করা আমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা ; যথায় রোদনধ্বনি, তথা দ্রুত গমন করা আমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা ; যথায় রোগ, শোক, তথায় সেবা করা আমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা ;······বঙ্গমাতার ন্যায় দিবা-রাত্র অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করা আমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা ; যতদিন মাটির দেহ মাটিতে না মিশ্‌বে, যতদিন চৈতন্যশূন্য না হব, ততদিন স্বদেশীর হাহাকার শোনা আমার কার্য্য, স্বদেশীর দুঃখ শোনা আমার কার্য্য, সে দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করা আমার কার্য্য।" (২।২গ)

পরিশেষে স্বাদেশিকতার চারণী, উদাসিনী তারা, নবাব মীরকাসিমকে যে কর্তব্য ও কর্মপথের নির্দেশ দিয়েছেন, তাই প্রকৃতপক্ষে ছিল নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের স্বদেশবাসীর প্রতি, 'এষ আদেশ, এষ উপদেশ'।

"তারা। বাবা, তুমি হেথায় কি ক'চ্ছ? কি চিন্তা ক'চ্ছ? আর চিন্তার সময় কই? ঘোর কার্য্য উপস্থিত!······ভাবছো, তোমার সৈন্য সুশিক্ষিত, তারা রণজয় করবে ;—তোমার সেনানায়কেরা সব রণদক্ষ, তারা সমর জয় করবে, তাদের কি সাধ্য যে রণজয় করে?······তারা বর্ব্বর, তারা ঈর্ষ্যাপূর্ণ, তারা দাম্ভিক, তারা আত্মগৌরব, আত্মযশ প্রার্থী,—তারা স্বদেশ-গৌরব, স্বজাতি-গৌরব প্রার্থী নয় ;······যাতে স্বজাতির উন্নত শির শত্রুপদে অবনত হয়, তার নিমিত্ত ব্যগ্র। প্রধান শিক্ষা—একতা! তারা একতাবর্জ্জিত, তাদের উপর নির্ভর ক'রো না।······

মীরকাসিম, তুমি স্বদেশবৎসল! বঙ্গমাতা অতি কঠিনা জননী! তাঁর শোণিত পিপাসা প্রবল, সামান্য শোণিতে তাঁর তৃপ্তি নাই! স্বদেশভক্ত, স্বদেশবৎসল, স্বদেশপ্রিয়, স্বার্থশূন্য-হৃদয়ের শোণিত পানে পিপাসা!—সে পিপাসা তৃপ্ত না হ'লে, বঙ্গভূমি প্রসন্না হবেন না। যুদ্ধে অগ্রসর হও,

বক্ষের শোণিত দান ক'রো,—তোমার ন্যায় স্বদেশবৎসল সকলে একত্রে মিলে শোণিত দান ক'রো। কঠিন ব্রত—বক্ষের শোণিত দান-ব্রত—নচেৎ এ মহাব্রত উদ্‌যাপন হবে না!......

কাসিম। সত্য—এই একমাত্র উপায়,—রণ-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করবো!......" (৪।১গ)

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে চরমপন্থী নেতারা শক্তি সাধনার তন্ত্রে ও মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। দেশমাতৃকার দশপ্রহরণধারিণী রণমূর্তির উপাসনা ও শোণিত-সাধনা একশ্রেণীর বাঙ্গালীর দেশোদ্ধার চিন্তার বীজমন্ত্র ছিল। 'তোমরা মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত'—স্বামী বিবেকানন্দের এই কথাটি তাঁদের আত্মোৎসর্গে ব্রতী করে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সর্ব বিষয়ে বিবেকানন্দের মতানুগামী ছিলেন। ফলে তাঁর নাটকে যে তন্ত্র পূজা, তা প্রকারান্তরে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তারই পূজা ও প্রচার। তবে, আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, গিরিশচন্দ্র স্বাদেশিকতার আদর্শ বিস্তারে ছিলেন Constructive Nationalist। ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে ও নাট্যচিন্তায় নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তিনি যা সত্য ও যথার্থ বলে মনে করেছিলেন, তাকেই নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিমনের কোন স্বেচ্ছাচারিতাকে তিনি কোন সময়েই প্রাধান্য দেননি বা রোষবসে ইংরেজদের আক্রমণ করে অযথা বাক্যের ধূম্রচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেননি। বরং ইংরেজদের উচ্চ জীবনচিন্তা, জাতীয় ঐক্যবোধ এবং মানবিক নীতিকে অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন জানিয়েছেন। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে ক্লাইভের, মোহনলালের বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমের প্রতি যে উচ্ছ্বাস ও প্রশংসা, তা নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের উন্নত মানসিকতার স্বীকৃতি।

"ক্লাইভ। মোহনলাল, আপনি বীরপুরুষ। আপনাকে খোলোসা দিবার আমার একৃতার নাই, কিন্তু হামি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি-You are a brave soldier. সত্যই বলিয়াছেন, মৃত্যুতে আপনার গৌরব খর্ব্ব হইবে না,—You are a patriot!" (৫।৬গ)

নবাব সিরাজের মুখেও নাট্যকার নিজের উদারনৈতিক চিন্তার স্বাক্ষর চিহ্নিত করেছেন:

"সিরাজ। হলওয়েল, তোমরা উচ্চ জাতি, তার আর সন্দেহ নাই।

তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।···তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা বাঙ্গালার কর্তব্য।" (১।১০গ)

'মীরকাসিম' নাটকে নাট্যকারের অনুরূপ মানসিকতার ছাপ পুনরায় লক্ষ্য করা যায় নাট্যচরিত্র নন্দকুমারের প্রতি হে সাহেবের উক্তিতে,

"হে।······হামরা ঘরের ভিতর ঝগডা করে, এমন ঝগড়া করে, duel লড়ে, লেকেন দোস্‌রা যখন দুশ্‌মন খাড়া হবে, সব ঘরোয়া ঝগড়া মিটিয়া যাইবে। হামাদের সব শিখিতে পারিবে, হামাদের এইটা India শিখিতে পারিবে না,—জাতের দুশ্‌মন সবার দুশ্‌মন—এ India-র লোক কখনো শিখিবে না।" (২।৪গ)

অপর নাট্যচরিত্রদ্বয় মুন্সী ও নন্দকুমারের কথোপকথনে, ভারতবাসীর আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও অনৈক্যের পাশে ইংরেজদের জাতিগত ঐক্যের গুণগান নাট্যকার করেছেন :

"মুন্সী।···দেখুন ম'শায়, জাত দেখুন, যেই এই জাত ভাইয়ের হত্যাকাণ্ড শুন্‌লে আর সব ঝগড়া মিটে গেল, কোলাকুলি ক'রে যুদ্ধে চল্‌লো। আর আমাদের হিন্দু-মুসলমানের ভিতর এরূপ কলহ হ'লে, যদি সহজে মেট্‌বার কোন সম্ভাবনা থাকৃতো, এ অবস্থায় সে বিবাদ পাকা হতো; টিট্‌কিরি দিয়ে এক পক্ষের লোক বল্‌তো ;—'যেমন নবাবের বিপক্ষ হ'য়ে বিবাদ কর্‌তে গিয়েছ, তেমনি মুখের মত হয়েছে—বেশ হয়েছে'!" (৩।৫গ)

গিরিশচন্দ্রের সর্বশেষ ঐতিহাসিক নাটক 'ছত্রপতি' (শিবাজী)। বাঙ্গলা দেশে যে 'শিবাজী উৎসব' (১৯০২-১৯০৬) শুরু হয়েছিল, সেই পটভূমিকায় ও আদর্শে গিরিশচন্দ্র এই নাটকটি রচনা করেছিলেন। বাঙ্গলাদেশে যাঁরা 'শিবাজী উৎসব' পরিচালনা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন 'চরমপন্থী' সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁদের আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন। জাতীয়হিতবাদী নেতাদের মধ্যে এই শ্রেণীর নেতারা ছিলেন আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভকে তাঁরা যথার্থ পথ বলে মনে করতেন না। অবশ্য 'চরমপন্থী' সম্প্রদায়ের নেতারা যে ভাবে কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে হিন্দু পৌরাণিক জাতীয়তার উদ্ভব ঘটে। এই নূতন জাতীয়তাবোধ বা স্বাদেশিক চেতনা বহুলাংশে বঙ্কিম-প্রদর্শিত মার্গকে অনুসরণ করেছিল। 'শিবাজী উৎসব' মুখ্যতঃ রাজনৈতিক উৎসব হলেও, এর সমস্ত কর্মচিন্তা ধর্মনৈতিক বেদীতে স্থাপন করা হয় :-

এবং এরই ফলে ধর্ম ও জাতীয়তা এক সমন্বয় সূত্রে বাঁধা পড়ে। ১৩১৩ বঙ্গাব্দ থেকে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সিংহবাহিনী ভবানী মূর্তি ও গুরু রামদাসের সংশ্রব গড়ে ওঠে। 'শিবাজী উৎসবে'র সঙ্গে এবং ভবানী মূর্তি ও গুরু রামদাসের অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে সমর্থন করে চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন,

"শিবাজী চরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে গেলে যেমন ভবানীকে ছাড়িলে চলিবে না, তেমনি রামদাসকেও ছাড়িলে চলিবে না। ফলত ভবানী ও রামদাস পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াই শিবাজীর নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন। .....

আমাদের আজকালকার ভাব ও ভাষায় শিবাজীর এই উদ্দীপনা ও প্রেরণাকে ব্যক্ত করিতে গেলে আমরা ইহাকে জাতীয় শক্তি নামে হয়ত অভিহিত করিব। যখন যে দেশে যে-কোন ব্যক্তি স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধার সাধনে বদ্ধপরিকর হন, তখনই তাঁহার মধ্যে এই শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। এই জাতীয় মহাশক্তি, এই spirit of the race-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ না হইলে, কেহ কদাপি স্বদেশের জন্য সত্যভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন না।......ইহুদীরা রোমক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, খৃষ্ট জন্মকালে, এই মহাশক্তিকে,—আপনাদের এই সনাতন spirit of the race-কেই মশি বা Messiah নামে অভিহিত ও তাহার প্রতীক্ষায় পরাধীনতার সমুদয় ক্লেশযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল। ফরাসী-বিপ্লবকালে ফরাসীরা এই মহাশক্তিকেই স্বাধীনতা (Liberty) নামে ভজনা করিয়াছিল।... ..জাপানবাসিগণ মিকাডোর মধ্যে আপনাদের এই Race spirit-কেই প্রত্যক্ষ করে, এবং স্বজাতির সনাতন মহাশক্তি ও মহাপ্রাণতার প্রকট-মূর্ত্তি ও প্রত্যক্ষ বিগ্রহরূপেই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া একই সঙ্গে দেশভক্তি ও রাজভক্তির চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। এই জাতীয় শক্তি, এই spirit of the race-ই শিবাজীর নিকটে ভবানীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।"[১৯]

বাঙ্গলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে ভবানীপূজা শুরু হয়েছিল, তাতে মহাশক্তি দেশমাতৃকার আরাধনাই ঘটে। কারণ চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতারা স্বদেশী আন্দোলনকে অধ্যাত্ম বিপ্লব বলে অভিহিত

১৯ শিবাজী উৎসব ও ভবানীমূর্তি : বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়); আশ্বিন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

করেছিলেন। যে অলৌকিক শক্তিপূজা করে শিবাজী খণ্ড বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ততার মধ্যে জাতীয়তার এক মহান্ ঐক্য সৃষ্টি করেছিলেন, সেকালের জাতীয়তাবাদী নেতারা তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়েছিলেন 'শিবাজী উৎসব' ও 'ভবানী পূজা'র মধ্যে। প্রধানতঃ, 'শিবাজী উৎসব' ছিল শূরধর্ম ও আদর্শের উপাসনা। 'শিবাজী উৎসবে'র কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন,

"... ..the strength and inspiration of which we sadly need at the present day for the reconstruction of our new national life. It is for this reason that we regard the Sivaji celebrations as a sacrament of the new civic life in India, and willing to lend it our most cordial support.......

Sivaji represents a movement, an idea, a national ideal. We honour him as not a mere man, nor even as a mere King or warrior, but as the symbol of a grand Idea—the memory of a noble experiment—the mouth piece of a great movement. That Idea was the idea of a Hindu 'RASTRA', which would unite under one political bond, the whole of the Hindu people, united already by communities of traditions and scriptures.···He represented the political side of the Indian renaissance which was the result of our contact with Moslem thought and life, and which preached a new gospel of Divine Unity and Social Emancipation, the gospel of the freedom of the spirit of religion from its external and accidental forms, of ethics from ceremonialism and of merit from accidents of caste and birth—the gospel of purity of mind and of a love that embraced both man and beast······

The movement of Sivaji, though outwardly a political movement, was inwardly profoundly spiritual."[২০]

২০ Swadeshi and Swraj : Bipin Chandra Pal, pp. 76-82

'শিবাজী উৎসব' বাঙ্গালীচিত্তে বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসের স্রোত প্রবাহিত করে। জাতিধর্মের সঙ্গে রাজনীতির আত্মীয়তা স্থাপিত হওয়ার জন্য স্বাদেশিকতার সুউচ্চ প্রবাহ ভীমবেগে প্রবাহিত হতে থাকে। বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন গ্রামে ও গঞ্জে 'শিবাজী উৎসব' আনন্দ ও অধীরতার সঙ্গে পালিত হয়েছিল। দেশবাসীর চিত্তোন্মাদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'শিবাজী উৎসব' কবিতা রচনা করেন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রও অনুকূল বাতাসে 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটক দেশবাসীকে উপহার দিলেন। তাঁর ধর্মনৈতিক জাতীয়তাবোধ বাঙ্গালীর এই অধ্যাত্মচিন্তাসমন্বিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। তিনি নিজেও ধর্মকে জাতীয়তার ভিত্তি বলে মনে করতেন। শিবাজীর ধর্মনীতি ও ভবানী পূজার মধ্যে যে শক্তিসাধনা, গিরিশচন্দ্র তাকে স্বাধিকার অর্জনের শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করেছিলেন, এ সংবাদ আমরা পূর্বেই গ্রহণ করেছি। আর এই আদর্শের প্রতি অনুরাগী হয়েই তিনি ধর্মনৈতিক জাতীয়তাবোধের প্রচার চালিয়েছিলেন বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চ থেকে। এছাড়া আরও মনে হয়, শ্রীঅরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' পুস্তকের অধ্যাত্মবাদী জাতীয় আদর্শ সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট বিশ্বাসী ছিলেন। যুগনায়কেরা যেমন ধর্ম-শক্তি-কর্ম, ত্রয়ী আদর্শবাদ প্রচার করে জাতীয়চেতনা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্রও অনুরূপ মতাদর্শ প্রচারে ব্রতী হন।

নাট্যচরিত্র গুরু রামদাসের উক্তিতে নাট্যকার মাতৃসাধনা ও ধর্মনৈতিক জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছেন :

"রাম।······দেবীর ভগ্ন শরীর দৃষ্টি ব্যতীত নিদ্রিত হিন্দুর হৃদয় জাগ্রত হবে না, ধর্ম্মহীন জীবনে ধর্ম্মসঞ্চার হবে না, হীন প্রাণে মাহাত্ম্য উদয় হবে না।······এখন হ'তে যে ব্যক্তির শরীরে একবিন্দু হিন্দুশোণিত প্রবাহিত, অতি হীন হ'লেও সে ব্যক্তি উত্তেজিত হবে, অতি ক্ষীণ বাহুও বীরের ন্যায় তরবারি গ্রহণ কর্‌বে, ভীরু ব্যক্তিও তৃণের ন্যায় সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিতে উৎসুক হবে, এ অমঙ্গল নয়—শুভ—হিন্দু স্বাধীনতার ভিত্তি। অত্যাচার চরম সীমায় না উপস্থিত হ'লে পরাধীন দেশে পরাধীন জাতি নবজীবন প্রাপ্ত হয় না।" (১৬৩)

গিরিশচন্দ্র দেশোদ্ধার কর্মকে দেশবাসীর মাতৃঋণ পরিশোধ বলে প্রচার করেন। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন দেশবাসীকে অন্য দেবদেবী বিস্মৃত হয়ে

দেশমাতৃকাকে একমাত্র আরাধ্যা দেবী বলে পূজা ও সেবা করতে বলেন, নাট্যকারও তেমনি স্বদেশবাসীকে ভবানী দেবীর বন্দনায় এবং প্রয়োজনবোধে আত্মোৎসর্গের জন্য আহ্বান জানান। নাট্যচরিত্র জিজাবাইয়ের উক্তিতে গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব মতাদর্শই প্রচারিত হয়েছে। শিবাজীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন,

"জিজাবাই।......তোমায় বার বার বলেছি, তুমি ভবানীর পুত্র, ভবানীর কার্য্যে অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছ, পুণ্যভূমি উদ্ধারের জন্য তোমার জন্ম; সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন তোমার একমাত্র ধর্ম্ম,—মহারাষ্ট্র স্বাধীনতার ধ্বজা ধারণ কর্‌বার জন্য তোমার বীরবাহু। শত্রুকে কম্পিত কর্‌বার জন্য তোমার তরবারি। তুমি ভবানীর পুত্র, আমার পুত্র নও। আমি ভবানীর দাসী, আমার গর্ভে তোমায় স্থান দিয়েছেন,......এই আমার শ্লাঘা। তোমার কর্ত্তব্য তুমি স্থির করো,......ভবানী-কার্য্যে যে দুষ্কর ক্রিযার প্রয়োজন হয়, সেই কার্য্যে অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হও। তোমার কার্য্য ভবানীর কার্য্য; তোমার মাতা নাই, পিতা নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—যে ভবানীর কার্য্যে অগ্রসর, সে-ই তোমার পিতা, সে-ই তোমার মাতা, সে-ই তোমার ভ্রাতা, সে-ই তোমার বন্ধু। শোনো শিব্বা! মা ভবানীর নামে জানু পেতে, ভবানীকে স্মরণ ক'রে..... দেবীকার্য্যে যদি আমার মস্তক ছেদন করো, তোমার মাতৃহত্যা হবে না, তোমার কোন অপরাধ হবে না...।" (১।২গ)

কেবল মাতৃসাধনার মধ্য দিয়ে শৌর্য্যশক্তির উদ্‌বোধন নয়, গিরিশচন্দ্র 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকেও অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের মত জাতির অধোগামীতার কারণগুলিও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, হীন শাস্ত্রবিচার, পরানুকরণ, স্বার্থপরতা, ক্লৈবত্ব, অনৈক্য সমস্ত কিছু একত্রযোগে দেশবাসীর স্বাদেশিক চিন্তাকে মুমূর্ষু করে দিয়েছে। নাট্যকারের আক্ষেপ ও খেদোক্তি নাট্যচরিত্র শিবাজীর মুখে প্রচারিত হয়েছে। দেশের মানুষকে সর্ব বিষয়ে সজাগ ও সচেতন করে তোলাই ছিল তাঁর স্বদেশানুরাগের অন্যতম ব্রত। শিবাজী শিক্ষাগুরু দাদোজী কোণ্ডদেবকে বেদনার্ত স্বরে বলেছেন,

"শিবাজী।......পিতৃ-আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হ'য়ে সুলতান সভায় গমন করি, সেই দিন হ'তে ভবানীর কৃপায় আমার চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। সুলতান সভায় দেখ্‌লেম, হিন্দুর হিন্দু-পরিচ্ছদ নাই, হিন্দু-অভিবাদন নাই, হিন্দুর হিন্দু

ভাবে সদালাপ নাই, বিজাতীয় আদর্শে সকলেই প্রায় বিজাতীয় ভাবাপন্ন। বিজাপুর হ'তে যে সময় মহারাষ্ট্রে প্রত্যাগমন করি, পথে যে দৃশ্য দেখ্‌লেম, সে আমার হৃদযের স্তরে স্তরে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হ'য়ে আছে। দেখ্‌লেম— দেবমন্দির ভগ্ন গোহত্যায় পৃথিবী কলুষিত, অনাচার, স্বধর্ম্মী-পীড়ন, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা নাই, বর্ণাশ্রম লুপ্তপ্রায়,...

গুরুদেব, ..ধর্ম্ম নষ্ট, কর্ম্ম নষ্ট, আচার নষ্ট, অমঙ্গলের আর থাকী কি?... মাতৃভূমি পীড়ন, ধর্ম্ম পীড়ন, বিত্তাপহরণ,—কাপুরুষের ন্যায় সহ্য কর্‌বো?... শিক্ষা, দীক্ষা সকলই কি বৃথা? তা হ'লে এ ক্ষণভঙ্গুর জীবন ধারণে তিলমাত্র ফল দেখি না। দেশের অবস্থা দেখুন...এ আমার স্বপ্ন নয়—সত্য। মহারাষ্ট্র আজই স্বাধীন হয়, কেবল এক বাধা, পরস্পর হীনস্বার্থাধীন। হীন স্বার্থে মহারাষ্ট্র পরাধীন; জাইগিরদার পরস্পর-বিরোধী —এই হেতুই পরাধীন। যদি নিজ স্বার্থ উপেক্ষা ক'রে সকলে একবার সাধারণ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করেন, তা হ'লে অদ্যই মহারাষ্ট্র স্বাধীন।" (১১গ)

যে সমস্ত স্বদেশী, বিদেশীর প্রতি অনুরক্ত, তাদের মোহমুক্ত দৃষ্টিতে দেশের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করাবার জন্য নাট্যকার গিরিশচন্দ্র আহ্বান জানিয়েছেন নাট্যচরিত্র শিবাজীর মাধ্যমে। শিবাজী, মাতুল শম্ভাজী মোহিতেকে সম্বোধন করে বলেছেন,

"শিবাজী। মামাজি,...মহারাষ্ট্র আপনার জন্মভূমি। একবার নয়ন উন্মীলন ক'রে জন্মভূমির অবস্থা দেখুন, দেবভূমি—আর্য্যভূমি বিধর্ম্মীপীড়িত। যে গো-দুগ্ধে অসহায় বাল্যাবস্থায় শরীর পুষ্ট হয়, আপনার মাতৃভূমে সেই গো-হত্যা নিত্য উদাসভাবে আর কতদিন সহ্য কর্‌বেন?—কতদিন আর স্বজাতির দুর্গতি দেখ্‌বেন?—কতদিন লোকনিন্দা শুনবেন?—কতদিন ধর্ম্মের গ্লানি, প্রতিমা ভগ্ন উপেক্ষা কর্‌বেন?—কতদিন দীনহীন মহারাষ্ট্র-সন্তানের পরপীড়ন দর্শন ক'রে নিশ্চিত হ'য়ে আহার কর্‌বেন? দেশে অন্ন নাই; বস্ত্র নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, সকলই শেষ হলো।...জগতে এমন হীন পশু নাই, যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'লে মস্তক সঞ্চালন না করে। কেবল কি আমরা বিনা চেষ্টায় সেই বন্ধনে স্থির থাক্‌বো?—পরপীড়ন সহ্য কর্‌বো? না—আমরা আর্য্যসন্তান, আমরা হীন নই, আর্য্যকীর্ত্তি স্মরণ ক'রে, আর্য্যসন্তান বীরদম্ভে উত্থিত হোন,—শৃঙ্খল ছেদন করুন,—মাতৃঋণ পরিশোধ করুন,—মাতার দাসীত্ব মোচন করুন।" (১৩গ)

বিশেষভাবে নাগরিকদের প্রতি শিবাজীর ভাষণে নাট্যকার যেন আপন হৃদয়ের উৎসমুখ খুলে দিয়েছেন। নিম্নলিখিত উক্তিটি তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের প্রদত্ত ভাষণের নাট্যলিপি :

"শিবাজী। ভাই, আক্ষেপের সময় নাই, আক্ষেপে অত্যাচার নিবারণ হবে না। হিন্দুরা মোহমুগ্ধ, তাই এই দুর্দ্দশা ; এ সকল আমাদের হীন সহিষ্ণুতার ফল। যদি মস্তক অবনত ক'রে এতদিন না বিজাতির পীড়ন সহ্য কর্‌তেম—যদি আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত দান কর্‌তে শিক্ষা লাভ কর্‌তেম—যদি আপনাকে মনুষ্য ব'লে আত্মসম্মান কর্‌তেম—যদি স্বদেশ রক্ষা, স্বজাতি রক্ষা, মানব-জীবনের কর্ত্তব্য জ্ঞান কর্‌তেম—যদি স্বজাতি, স্বধর্ম্ম, স্বদেশের প্রতি অনুরাগী হ'তেম,—যদি বিদেশী শৃঙ্খল ঘৃণা কর্‌তেম—যদি অদৃষ্টের উপর নির্ভর না ক'রে মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর কর্‌তেম, পুরুষত্বের উপর নির্ভর কর্‌তেম—যদি শাস্ত্রের বচন উপলব্ধি কর্‌তেম, যে যুদ্ধ-মৃত্যু তীর্থ-মৃত্যু অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ, সহস্র যাগ-যজ্ঞ অপেক্ষা জন্মভূমির কার্য্য উচ্চ—যদি স্বদেশ-অনুরাগ, স্বজাতি-প্রেম মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিচয়, এই সকল উচ্চ ধারণা হৃদয়ে স্থান দিতেম ; তা হ'লে আজ আমাদের এ দুর্দ্দশা কদাচ হতো না ;—তা হ'লে আমরা অন্নের জন্য বস্ত্রের জন্য বিজাতির মুখাপেক্ষী হতেম না,—তা হ'লে আমাদের নিরীহ, নির্ব্বিরোধী নিরস্ত্র শত শত স্বজাতির হত্যাকাণ্ড দর্শন কর্‌তে হতো না—তা হ'লে দেবস্থান কলুষিত দেখ্‌তেম না, দেবী-অঙ্গ ছিন্ন দেখ্‌তেম না। এ সকল মহাপাপের ফল,—জড়তা মহাপাপ, সেই মহাপাপের ফল! এসো সকলে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি,—লুপ্ত ধর্ম্ম উদ্ধার করি, মাতৃভূমির পর-শৃঙ্খল মোচন করি, একতায় পরস্পর আলিঙ্গন করি, মনুষ্য ব'লে সমাজে পরিচয় দিই, বীরবীর্য্যে তরবারি ধারণ করি। এসো, শত্রুনিপাতে কৃতসঙ্কল্প হই।" (১।৭গ)

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতীয়-সংহতি সৃষ্টির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, দেশের সাধারণ নিরন্ন মানুষের মধ্যে অসীম শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। গণশক্তিকে শক্তিশালী করতে তিনি আহ্বান করেন দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের ঐক্যকে। গিরিশচন্দ্রও যে অনুরূপ মতাদর্শের অনুরাগী ছিলেন, তার পরিচয় আমরা অনেক স্থানে পেয়েছি। 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, তিনি গণশক্তি সৃষ্টির ভাবধারা ও পথকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, শিবাজীর কর্ম-

ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য প্রচার করে। নাট্যচরিত্র শিবাজী, শিক্ষাগুরু দাদোজী কোণ্ডদেবকে তাঁর গণশক্তির পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

"শিবাজী। আমি একা, এরূপ আজ্ঞা কি নিমিত্ত কচ্চেন? ঐ যে দীনহীন, নগ্নদেহ মব্‌লাগণ,—আপনার শিক্ষিত বিদ্যায় তাদের অস্ত্র-শিক্ষাদানে দাস সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছে। তারা সম্পূর্ণ যুদ্ধ-নিয়মাধীন, ভবানীর কৃপায় সকলে জননী জন্মভূমি-বৎসল, অস্ত্রধারী সৈন্যের সম্মুখীন হ'তে সম্পূর্ণ সক্ষম পারদর্শী।...তারা জন্মভূমির দুঃখে কাতর, তারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য কাতর, বিধর্ম্মীর অধীনতায় অসহিষ্ণু, তারা প্রাণের মমতাশূন্য। যদি মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার উদ্যম, মনুষ্য-জীবনে কর্ত্তব্য হয়, সেই কর্ত্তব্য সাধনের সুযোগ সম্পূর্ণ উপস্থিত।... স্বাধীনতা-অর্জ্জন কিম্বা জীবন-বিসর্জ্জন—এই আমার সঙ্কল্প...।" (১।১গ)

দেশের অগণিত হতচৈতন্য মানুষের চিত্তের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের বাণী, বিশ্বাস ও মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত না করলে স্বাধিকার অর্জনের বাসনা অথবা স্বাধীনতা সংগ্রাম কখনও পূর্ণ ফলবতী হয় না। ক্রমাগত বিদেশী শক্তির দাসত্ব এবং পীড়নের ফলে মনুষ্যত্বের পতন ঘটে; এবং এই অধঃপতনের ফলেই মানুষের চিন্তা ও কর্মশক্তিতে যে বিস্তীর্ণ উষর বালুচরের সৃষ্টি হয়, তাতে জীবনের নাব্যতা রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই স্বদেশ-হিতকামী ব্যক্তির প্রধান কর্তব্য—দেশবাসীর শুষ্ক মন ও চিন্তাতে স্বাদেশিকতার মহাপ্লাবন প্রবাহিত করা। 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে গিরিশচন্দ্র যেসূজীর প্রতি শিবাজীর উক্তিতে স্বাদেশিক ভাবনার এই মহৎ চিন্তাটি প্রচার করেছেন :

"শিবাজী।...তোমরা অনেক দুর্গ আক্রমণ করবে, কিন্তু সে সকল মহারাষ্ট্র-রক্ষিত দুর্গ নয়, মুসলমান-রক্ষিত দুর্গ। মহারাষ্ট্র-অঙ্গে আমাদের অস্ত্র আঘাত করবে না, তারা স্বদেশী, আমাদের ন্যায় পরপীড়িত, অনেক মহারাষ্ট্র বীরেরই এইরূপ অবস্থা। যদি তাঁরা একবার বুঝ্‌তে পারেন, যে স্বাধীনতার সময় উপস্থিত, যদি তাঁরা বুঝ্‌তে পারেন, যে মহারাষ্ট্রেরা একত্র হ'লে ভারত বিজয় করতে সক্ষম, যদি তাঁদের হৃদয়ে ধারণা হয় যে পরস্পর স্বার্থ পরিত্যাগ ক'রে একতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'লে মহারাষ্ট্রে আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ-সংস্থাপিত হবে, দেবালয় ভগ্ন, গো-হত্যায় পুণ্যস্থান কলুষিত হওয়া নিবারণ হবে, বিধর্ম্মী দুরীকৃত হ'য়ে মহারাষ্ট্র-বীর্য্য-বলে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অনায়াসে

সাধিত হবে, তা হ'লে আমাদের ন্যায় তাঁরাও মাতৃভূমির কার্যে প্রাণপণ করবেন নিশ্চয়। এই মহাকার্য্য সাধন করা, এই একতা সংস্থাপন করা আমাদের উপস্থিত কার্য্য।...এই মহারাষ্ট্র প্রদেশে অতি হীনব্যক্তিও যে আমাদের সহোদরের ন্যায় প্রিয়, আমরা যে পরস্পর বিদ্বেষশূন্য, জগতে তা প্রচার করবো।" (১।১গ)

অপরপক্ষে, শিবাজীর সাফল্যের মূলে তাঁর জাতীয় সংহতিই যে একমাত্র কারণ, বিজাপুরের অমাত্যগণ তা স্বীকার করেছেন,

"খোবান খাঁ। আমরা যদি পরস্পর আত্ম-বিগ্রহে নিযুক্ত না থাকতেম, তা'হলে শিবাজীকে দমন করা অতি সহজ কার্য্য ছিল। আমাদের আত্ম-বিগ্রহই শিবাজীর উন্নতির কারণ,—আমাদের মধ্যে সাধারণ শত্রু-দমন-ইচ্ছা প্রবল না হ'য়ে, অনেক ওমরাওয়ের স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছাই প্রবল।...যদি জাতীয় গৌরবের প্রতি লক্ষ্য রেখে, আমরা পরস্পর ঈর্ষ্যাবর্জ্জনে প্রস্তুত থাকি, তা'হলে সকলে একত্র হ'য়ে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রয়োজন ; নচেৎ সন্ধি স্থাপন ক'রে, রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সাধন কর্ত্তব্য।" (১।৫গ)

গিরিশচন্দ্র তাঁর পূর্বেকার নাটক দুটির মত 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকেও নিষ্ঠার সঙ্গে ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর অধীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ছিল, জেমস্ গ্রান্ট ডাফ্ রচিত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'A History of the Mahrattas' (1816) ও বিশেষভাবে সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'ছত্রপতি শিবাজী'। কিন্তু তবুও বিংশ শতকের বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার প্রতিফলন, এই নাটকে অনিবার্যভাবে পড়েছে। হিন্দু-মুসলমান—সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রচার ছিল যুগধর্মের অন্যতম ফলশ্রুতি। 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে এর পূর্ণ প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে যাঁরা 'শিবাজী উৎসব' পরিচালনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক বৈরিতা ছিল না ; —যদিও অনেক রক্ষণশীল মুসলমান 'শিবাজী উৎসব'কে প্রীতির চোখে দেখেননি।* ১৯০৬ সালে সভাপতির ভাষণে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বলেছিলেন,

* "The Muslim opposition to Shivaji festival stands on a different footing. It was due to the fact that Muslims were not prepared to accept Hindu heroes as national heroes of the country. Zaka Ullah stated tauntingly: The followers of Congress have Bande-Matram on their tongue, but they have

"...If the Hindus had a national hero of their own in modern times it was emphatically the founder of the Maharatha dynasty. Nay, like the great Akbar himself, Sivaji might have endeared himself, both to the Hindus and the Mussalmans alike, if our Mussalman brethren of the period had been as liberal towards a Hindu sovereign as the Hindus had been towards the Mogul Emperors. It is a historical fact that if Sivaji had fought with the Mussalmans he had also many friends amongst eminent Mahomedans of the period who, be it said to their honour, stood by him fast both in weal and woe. The bitterness of racial feeling between Hindus and Mussalmans had also almost died out at the time. .....Hence,......it would have been quite possible for the Mussalmans to address Sivaji in the same way as the Hindus addressed Akbar......

The object of these Sivaji festivals is to awaken in us a feeling of respect for the noble, for the disinterested, and for the self-sacrificing life of Sivaji. The other object of the festival is the union of the Bengalees with the Maharathas .. we are one nation, although we are going to admire every Mahomedan hero and Hindu hero. No one in this audience thinks now that we are two nations. We are now one nation—Hindus and Mahomedans—and we must embrace each other as brothers"[২১]

---

nothing of the sort in their heart. ...For practical action another Shivaji, whose birth in the present age is impossible, is required to assist Tilak and Gokhale."

—History of the Freedom Movement in India (vol II): Dr. R. C. Mazumdar ; p. 234.

২১ Congress: H. P. Ghose ; pp. 145-148

মহামতি তিলক 'শিবাজী উৎসব'টিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলেন,

"Unfortunately we had no political festival to keep up the memory of our heroes except the National Congress. This is the reason why the Sivaji festival was started in Maharashtra with the hope that it will spread all over India without distinction of caste and cread. There is no reason to object to the festival because Sivaji was a Marahatta. If Sivaji was a Marahatta—it was because he was born at Poona. If you look at the ethnology you will find Sivaji belonged to the same stock as the Rajputs. You may call him a Rajput if you like, and you may call him a Bengalee if you like...Some objected to it because they were Mahomedans. That objection no longer exists. Sivaji did not fight against the Mahomedans but against the tyrannical power that existed at that time.... That is the true spirit in which you must read the life of Sivaji and if you read the life of Sivaji in the proper spirit I can assure you that you are sure to derive an inspiration, a sentiment in life which will serve you in these days."[২২]

'ছত্রপতি শিবাজী' নাটক রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বলেন যে,

" 'শিবাজী'তে আমি এই আদর্শ দেখাবার চেষ্টা করেছি যে ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, অত্যাচারিত, দুর্ব্বল, পীড়িতকে রক্ষা করার জন্য, ত্যাগের উপর সেই মহাবীর মহারাষ্ট্র গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।"[২৩]

নাট্যকার তাই শিবাজী চরিত্রের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক অনুরাগ ও প্রীতি সমান নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচার করেছেন। শিবাজী-চিত্র অঙ্কনে

২২ Bengalee: June 7, 1906.

২৩ গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য: কুমুদবন্ধু সেন; পৃ. ১২

তিনি যে যুগপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তা সহজে উপলব্ধি করা যায়। আশ্রয়প্রার্থী মুসলমান সৈন্যকে শিবাজী সম্বোধন ক'রে বলেছেন,

"শিবাজী। ...হে মুসলমান বীর, আজ হ'তে তোমরা আমার সৈন্যদলভুক্ত। প্রজা আমার পুত্রের ন্যায় প্রিয়। তোমাদের যখন আমার প্রজা হবার বাসনা, তোমরাও জনে জনে আমার পুত্রের ন্যায় আদরণীয়। তোমাদের বাহুবলে অনেক শত্রু পরাজিত হবে, এইরূপ আমার প্রত্যাশা। আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি জাতির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ করেছি, তোমরাও সেই স্বাধীনতার অধিকারী। স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ ক'রে, জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করবে, সন্দেহ নাই।...আজ হ'তে তোমরা স্বাধীন—মহারাষ্ট্র প্রদেশে স্বাধীন। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে জাতিভেদ কখনই হবে না। জাতিভেদ বুদ্ধি শত্রুর বাহু বলবান্ করে। জাতি-বিরোধে শত্রুর পদানত হওয়া অনিবার্য্য। স্বাধীন মহারাষ্ট্র প্রদেশে ধর্ম্ম-প্রভেদ বা জাতি-প্রভেদে পরস্পর বিরোধের সম্ভাবনা নাই। স্বাধীনতা-প্রিয় মনুষ্যমাত্রই একজাতীয়। স্বাধীনতায় তারা একসূত্রে আবদ্ধ। যে স্বাধীনচেতা, তার হৃদয়ে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নেই। ভেদবুদ্ধি কাপুরুষের হৃদয়ে, কাপুরুষে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ করে। সে ভেদাভেদ স্বাধীন মহারাষ্ট্রে নাই, পরমানন্দে স্বাধীন মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতা ভোগ করো।" (১৬গ)

এছাড়া নারীদেরও বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। সে সময়ে বিশ্বের সমস্ত রমণীকে জগন্মাতা ভবানীর অংশরূপে পূজা-বন্দনা করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম অথবা দেশোদ্ধার-ব্রত প্রকৃতপক্ষে ছিল মাতৃমুক্তির আরাধনা। শিবাজীর উক্তিতে তৎকালীন যুগমানসের স্বরূপটি নাট্যকার গিরিশচন্দ্র উদ্‌ঘাটিত করেছেন,

"শিবাজী। আবাজী, সত্য, আমাদের জননী যদি এরূপ সুন্দরী হতেন, তা'হলে আমরাও পরম সুন্দর হতেম।...নারী মাত্রই মা ভবানীর অংশ,... নারীর অপমানে ভবানীর অপমান, এ-কথা শয়নে-স্বপনে আমি বিস্মৃত নই।" (১৬গ)

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র স্বদেশকে মাতৃরূপে আরাধনা করে দেশবাসীকে মাতৃঋণ পরিশোধের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। জনগণ যদি মাতৃনামের অক্ষয় কবচমালা কণ্ঠে ধারণ করে মাতৃনাম উচ্চারণ করতে করতে শত্রুব্যূহে

ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে তার সাফল্য অনিবার্য,—এই মতবাদ তিনি 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে নাট্যচরিত্র পুতলা বাইয়ের কণ্ঠে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রচার করেছেন ঃ

"পুতলা। মাতৃভক্তি বিজয়মালা পরে যে গলায়।
তার আগে ধায় বিজয় নিশান
বিজয় পায় পায়॥
মাতৃমন্ত্র যে জন জপে,
সে কি ডরে অরির কোপে,
মাতৃকার্য্যে জীবন সঁপে, কীর্ত্তিমান্ ধরায়॥
শক্তিরূপা সঙ্গে ফেরে,
বজ্র ফেরে তারে হেরে,
হেরে তারে নতশিরে রাজা রাজসভায়॥
মাতৃতেজ হৃদে ধরে, দাসত্ব-শৃঙ্খল হরে,
অসি ধরে ভীরু করে রণাঙ্গনে ধায়॥" (২।৭গ)

দেশব্রত উদ্‌যাপনের মঙ্গলঘট মাথায় নিতে গিরিশচন্দ্র নারীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে নারী—মূর্তিময়ী শক্তিরূপিণী, মা ভবানীর অংশে তাদের জন্ম। নারীর পুনরুত্থান ব্যতীত জাতি গঠন, দেশ গঠন অসম্ভব। নারীকে হ্লাদিনী শক্তির অংশরূপে বিশ্বাস ও পূজা-অর্চনা পৌরাণিক চিন্তা ও তন্ত্রনীতির অন্তর্ভুক্ত হলেও, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নারীকে অনুরূপ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তাঁরা পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগ্রামে সমান অংশীদার হয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে নারীদের বিভিন্ন স্বদেশহিতব্রতে যোগদান দেশের গণশক্তির গতিবেগকে অধিক পরিমাণে ক্ষিপ্র করেছিল। গিরিশচন্দ্র 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে মহারাষ্ট্র-রমণীদের বিজয়দৃপ্ত কথাবার্তায় আপন কালের নারীদের মনোবাসনা ও কর্মচেতনাকেই পরিস্ফুট করেছেন। নাট্যচরিত্র লক্ষ্মীবাই, স্বামী তানাজীকে বলেছেন,

"লক্ষ্মীবাঈ।...যোদ্ধারা মৃত্তিকায় শয়ন করে,...আজ হ'তে আমারও মৃত্তিকায় শয়ন। যোদ্ধারা কখন অনশনে কখন অর্দ্ধাশনে অতিবাহিত করে, আমি অনশনে অর্দ্ধাশনে বুভুক্ষু ব্যক্তির সেবা করবো,...আমি বীরাঙ্গনা ব'লে আত্ম-গৌরব করবো।...আজ আমি বুঝ্‌লেম

আমি কে? কি নিমিত্ত নারীরূপে মার্হাট্টা গৃহে অবস্থিত, আজ বুঝ্‌লেম, আমি মাতৃভূমিবৎসল মহারাষ্ট্র-পত্নী, জন্মভূমিবৎসল মহারাষ্ট্র-পুত্র পালন কর্‌বো। যদি প্রয়োজন হয়,...তরবারি সঞ্চালনে কি নিমিত্ত অক্ষম হবো?" (১।৪গ)

শিবাজীর স্ত্রী সইবাই মহারাষ্ট্রের সমস্ত রমণীকে দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত করে আত্মোৎসর্গের জন্য আহ্বান করেছেন,

"সইবাই। ভগ্নি, শত্রু দ্বারদেশে, অতি কঠোর শত্রু। শত্রু ধর্ম্মবিরোধী; দেববিরোধী, গো-ব্রাহ্মণবিরোধী, রমণীর জীবনের সুসার সতীত্ববিরোধী। শত্রু বালক নারী বৃদ্ধ উপেক্ষা করে না, পঙ্গপালের ন্যায় দেশ আচ্ছন্ন করেছে, পুণ্যভূমি পুণা শত্রুর করগত, বীরবৃন্দ জীবন উপেক্ষা করে বক্ষের শোণিতদানে শত্রু অবরোধের চেষ্টা ক'চ্চে। এ সময় আমরা বীর রমণী—আমাদের কি কার্য্য নাই?...আমরা নারী, আমাদের ক্ষীণ বাহু শত্রুর প্রতিরোধ কর্‌তে অক্ষম, আত্মরক্ষায়ও অক্ষম, কিন্তু জীবনের সুসার সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব রক্ষায় আমরা সক্ষম।.. জনে জনে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা গ্রহণ করো, এই ছুরিকা আমাদের সহায়। জেনো, এই ছুরিকা ভবানী প্রদত্ত;......ভগ্নি, রমণীর কোমল কর নরহত্যার জন্য নয়, যদি শত্রু আগত হয়, স্তন্যপায়ী শিশুর বক্ষে অগ্রে এই ছুরিকা বিদ্ধ ক'রে, পরে আপনার হৃদয়ে বিদ্ধ কর্‌বো। বিধর্ম্মী দেখ্‌বে, মহারাষ্ট্রীয় রমণী কিরূপ সতীত্বের আদর করে—কিরূপ জীবন উপেক্ষা করে,—কিরূপ কঠোর জননী—কিরূপ ধর্ম্মসোহাগিনী, মহারাষ্ট্র-রমণী কিরূপ তেজস্বিনী।" (২।৭গ)

পক্ষান্তরে অপর মহারাষ্ট্র-রমণী পুতলাবাই-এর উক্তি আরও তেজস্বীতায় পূর্ণ:

"পুতলাবাই।...আমার ছুরির প্রয়োজন নাই, অনলের প্রয়োজন নাই, গরলের প্রয়োজন নাই;...অনল-উত্তাপে লৌহ যেমন তেজোময়, অনল সদৃশ মহারাজের তেজে সেইরূপ সহস্র সহস্র লৌহহৃদয় মহারাষ্ট্র বীর তেজঃপূর্ণ; বিধর্ম্মী সেই উত্তাপেই ভস্ম হবে। আমার শত্রুভয় নাই,...কেনই বা রমণী ব'লে, আমরা আপনাকে ঘৃণা করি—কেন বা আমাদের কোমলবাহু জ্ঞান করি! মা ভবানী নারীরূপা, তিনি মহিষমর্দ্দিনী শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী, আমরা তাঁর দাসী, আমরা কি নিমিত্ত শত্রুসংহারে সমর্থা না হবো! ধূমাবতী যেমন

হুঙ্কারে দানব-দল ভস্ম ক'রেছিলেন, আমাদের হুঙ্কারেও তেমন শত্রুদল ভস্মীভূত হবে।"* (২।৭গ)

কেবল দেশের জন্য জীবন দান করে জীবনের মাহাত্ম্য প্রচার নয়, স্বদেশের হিতার্থে সর্বস্ব ত্যাগ করে সেবাধর্মে ব্রতী হতে আহ্বানও জানিয়েছেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নাট্যচরিত্র জিজাবাই-এর উক্তির মাধ্যমে। জিজাবাই রমণীদের কর্তব্য-পথের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

"জিজাবাই।···আমাদের বহু কার্য্য উপস্থিত—আহত যোদ্ধাদের শুশ্রূষা, ভীরু হৃদয়-উত্তেজনা, দেব-অর্চ্চনা। এখনো অলঙ্কারে সজ্জিত কেন? অলঙ্কার ত্যাগ করো,—রণব্যয়ে প্রদান করো। সতীর সিঁদুর ও শঙ্খমাত্র আভরণ, অপর আভরণের প্রয়োজন নাই। রণব্যয়ে সর্ব্বস্ব দান করো।"† (২।৭গ)

---

* স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিপিনচন্দ্র পালের একটি সঙ্গীতে দেশপ্রেমের সঙ্গে মাতৃতন্ত্রসাধনার অথবা পৌরাণিক ভাবধারার স্বাভাবিক সমন্বয় ঘটেছে। মাতৃসাধক গিরিশচন্দ্রও অনুরূপ সামঞ্জস্যের পূজারী ছিলেন। স্বদেশী সঙ্গীতটি ছিল এইরকম,

"আর সহে না, সহে না জননী, এ যাতনা আর সহে না।,
আর নিশিদিন হয়ে শক্তিহীন পড়ে থাকি, প্রাণে চাহে না।
তুমি মা অভয়া জননী যাহার, কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার,
দানব দলনী ত্রিদিব-পালিনী, করাল-কৃপাণী তুমি মা,—
উর মা! আজিকে সে-রূপে পরাণে, ডাকি মা কালিকে! ডাকিগো সঘনে,
নয়নে অশনি জাগাও জননী! নহিলে এ ভয় যাবে না।
উর মা বাহুতে, শকতিরূপিণী, উর মা হৃদয়ে ও রণরঙ্গিনী!
রিপুকুল মাঝে সন্তান ল'য়ে দাঁড়া মা হৃদয়-রমা;—
প্রলয়-হুঙ্কারে, হর-হৃদি হ'তে উঠিয়ে দাঁড়া মা এ ভারত মাঝে;
শোণিত-তরঙ্গে, মাতি' রণরঙ্গে, মাভৈঃ বাণী আজ শোনা মা!
নৃমুণ্ডমালিনী তুই মা কল্যাণী, তুই শিবে শিবমনোমোহিনী!
বিনা তোর কৃপা, বিনা তোর কৃপাণ, এ ভারত-বন্ধন ঘুচে না।"

—স্বদেশ সঙ্গীত: যোগেন্দ্রনাথ শর্মা সঙ্কলিত; ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

† বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পরিচালনাতে বাঙ্গালী রমণীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করেন। সরলাদেবীর 'মাতৃদ্রোহীর প্রতি' কবিতাটিতে সেকালের নারীচিত্তের ভাবানুভূতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এই মনোবাসনাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নাটকের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন। সরলাদেবীর 'মাতৃদ্রোহীর প্রতি' কবিতাটির কিয়দংশ নেওয়া হল,

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলির প্রভাব জনচিত্তে দুর্বার হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার তাঁর নাটকগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার ও রাজদ্রোহিতার অপরাধে বাজেয়াপ্ত করেন। নাটকগুলির মুদ্রণ ও অভিনয় উভয়ই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান থাকলেও তিনি কদাচ Militant Nationalist ছিলেন না। পূর্ববর্তী নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাসের মত তিনি ইংরেজের সঙ্গে স্বদেশীয়দের সংঘর্ষ-চিত্র সরাসরি কোথাও অঙ্কিত করেননি। তিনি ইতিহাসকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন বলে, প্রকৃত সত্যকে গ্রহণ বা সহ্য করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নিজেদের লজ্জা ও অপরাধবোধ ঢাকবার জন্য তাঁরা রাজশক্তির অমোঘ শাসননীতি পরিচালনা করে নাটকগুলির কণ্ঠরোধ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে ছিলেন Constructive Nationalist। তিনি 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে ইংরেজদের উচ্চ জাতীয় চিন্তার যেমন সুখ্যাতি করেছেন, তেমনি তাঁদের নিরাপত্তামূলক শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন 'মীরকাসিম' নাটকে। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে একথা যে কতদূর সত্য তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। 'মীরকাসিম' নাটকে তারার উক্তিতে নাট্যকারের ব্যক্তিগত মনোভাবনার ছায়াপাত ঘটেছে :

"তারা।···তোমরাই ভারতের স্তম্ভ, তোমাদের দ্বারা ভারতে দুর্গতি দূর হবে···এতদিন বণিক ছিলে, অর্থোপার্জ্জন তোমাদের কার্য্য ছিলো, সেই অর্থোপার্জ্জনে ভারতবাসীর দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করো নাই। কিন্তু আজ ভারত তোমাদের পদানত, আজ ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষি, শান্তিহীন প্রজাদল তোমাদের আশ্রিত। হিংসা—দ্বেষ, আত্মীয় হত্যায় ভারত

"ও কি রে সাজ!
বিলাস-বসনে ভূষিত অঙ্গ
নাহিরে লাজ!
কাঙ্গালিনী ওই জননী তোদের,
নাহিরে ঠিকানা উদরান্নের,
তারি সুত তুমি গর্ব্বে চলেছ
পরিয়া তাজ,
নাহিরে লাজ!" (প্রথম স্তবক)

জর্জ্জরীভূত ! তোমাদের রাজ-শাসনে তা দূর হবে। ভারতের শিক্ষাভার, রক্ষাভার, ঈশ্বর তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন, তাই তোমরা পদে পদে জয়যুক্ত। ভারতে এসে তোমাদের জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হয়ো না। তোমরা দীনরক্ষক নামে জগদ্বিখ্যাত ! স্বাধীনতা তোমাদের জীবন, তোমাদের আশ্রয়ে অধীনতা-শৃঙ্খল স্খলিত হয়। আজ ভারত তোমাদের অধীন, দুখিনী ভারত তোমাদের আশ্রিতা। ভারতকে আশ্রয় দান করো, তোমাদের জাতিধর্ম্ম প্রতিপালন করো, নিরাশ্রয়কে রক্ষা করো ! দেখো আর যেন রক্তস্রোত প্রবাহিত না হয়, আর যেন গ্রাম দগ্ধ, অট্টালিকা ভগ্ন, শস্যক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত না হয় ; শান্তিদেবী তোমাদের শাসনাধীন হোক, দগ্ধ ভারতহৃদয় শীতল হোক··· ।" (৫।১গ)

আবার অপর নাট্যচরিত্র মন্‌রো, স্বজাতির আবশ্যিক কর্তব্য সম্পর্কে খোজা পিত্রুকে যা বলেছেন, তাতে নাট্যকারের ইংরেজ-শাসনের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশিত হয়েছে,

"মন্‌রো। মিষ্টার পিক্র, তুমি ইংরাজের সহিত বেড়াইতেছ, কিন্তু এখনো ইংরাজকে চিনো না , দু' একটা লোভী ইংরাজ দেখিযাছ, তাই ইংরাজকে বুঝো না। রাজ নিলে পালন করিবার ভার লইতে হয়। হামরা রাজা হইয়াছি, বড ভার হামাদের উপর আসিল।···হামাদের অনেক কাজ করিতে হইবে। যদি কেউ এখানে অত্যাচার করে, Parliament-এ তাহার impeachment হইবে। দু'একজন ইংরাজ অত্যাচারী হইতে পারে, কিন্তু হামাদের জাতি ন্যায়বান, Europe-এ হামাদের ন্যায়বান বলিয়া প্রশংসা, ভারতে হামাদের শান্তি রাখিতে হইবে···রাজা হইয়া অন্যায় করিলে, হামাদের রাজা থাকিবে না, বল থাকিবে না··রাজা হওয়া বড় ভারি কাজ জানিবেন··· ।" (৫।১গ)

কিন্তু তবুও নাটকগুলিকে কোন উপায়ে মঞ্চস্থ করা গেল না। ইংরেজ সরকার নাটক তিনটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তদানীন্তন সরকারী দলিল থেকে তা গ্রহণ করা হল।

'সিরাজদ্দৌলা' সম্পর্কে লেখা হয়,—"This is a historical drama by Girish Chandra Ghosh. It narrates the events which culminated in the overthrow of Nawab Siraj-ud-Dowlah the last independent Nawab of Bengal."

'মীরকাসিম' সম্পর্কে লেখা হয়েছিল,—"This is a historical drama by Girish Chandra Ghosh. It depicts the tumultuous period that followed on the accession of Mirkasim to the throne of Bengal and the strenuous fight which he had with the East India Company to protect indigenous industries."

'ছত্রপতি শিবাজী' সম্পর্কে লেখা হয়,—"This is a historical play delineating the life and character of Sivaji, the great founder of the Marhatta Kingdom of the Deccan. The author is Girish Chandra Ghosh."

অবশ্য তাঁদের মতে এই নাটকগুলিতে এমন অনেক উক্তি ছিল, যা ভারত সরকার ও ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত দেশবাসীর পক্ষে অহিতকর। সুতরাং এই নাটক তিনটি, "held objectionable vide Govt. letter no. 559 p, dated the 25th January 1911 in which Government further directed that if an attempt is made to stage the play, resort should be had to section 3 of Act 19 of 1876."[২৪]

নাটক তিনটির মুদ্রণ ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছিল,

"No 79N—Where as it appears to the Lieutenant Governor that the publications mentioned below contain words of the nature described in section 4, sub section (I) of the Indian Press Act, 1910 (I of 1910), in as much as they have a tendency to bring into hatred and contempt His Majesty or the Government established by Law in British India, or the administration of justice in British India or any class or section of His Majesty's subjects, or to excite disaffection towards His Majesty or the said Government.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 12, sub section (I) of the said Act, the Lieutenant

২৪ Prohibition of the performance of objectionable plays in Eastern Bengal and Assam : Government of Eastern Bengal and Assam Chief Secretary's Department ; File No 318 of 1910,

Governor hereby declares the said publications to be forfeited to His Majesty :—

1. Chhatrapati Sivaji by Girish Chandra Ghosh.
2. Mirkasim by Girish Chandra Ghosh.
3. Seraj-ud-Dowlah by Girish Chandra Ghosh

(2nd edition) Sd. R. NATHAN

offg Chief Secretary to the Govt of Eastern Bengal and Assam."[২৫]

ইংরেজ সরকারের আতঙ্কের কারণগুলি বহুলাংশে কষ্টকল্পিত ছিল। কারণ নাট্যকার কোথাও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা রাজদ্রোহমূলক প্রচার চালাননি। নাটকগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও দেশাত্মবোধের প্রচার শাসকসম্প্রদায়কে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। দেশের সকল জাতীয়-হিতবাদী পত্রিকা এই ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে বাঙলা জাতীয় সাহিত্যে এক বিরাট অবদান বলে চিহ্নিত করে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর 'বেঙ্গলী' পত্রিকাতে যে সমস্ত মন্তব্য করেন, তা উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক সম্পর্কে তিনি লেখেন,

"...both from the dramatic and the literary point of view, Siraj-ud-Dowla is destined to occupy a high and an enduring place in our national literature."[২৬]

'মীর কাসিম' নাটক সম্পর্কে ঐ পত্রিকাতে প্রশংসার সঙ্গে লেখা হয়,

"Babu Girish Chandra Ghose's new historical drama, 'Mirkaseem', which was put on the boards of the Minerva Theatre for the first time on Saturday last, has been a phenomental success, both from the histrionic and literary points of view. The tumultuous period that followed the

২৫ Prohibition of the performance of objectionable playe in Eastern Bengal and Assam : Government of Eastern Bengal and Assam Chief Secretary's Department ; File No. 318 of 1910,

২৬ Bengalee : February, 3 , 1906.

accession of Mirkasim to the throne, the strenuous fight that the ruler had with the East India Company for the protection of the indigenous industries and the various stratagems resorted to by both sides to win their points, have, with remarkable fidelity and consummate art, been portrayed by Bengal's greatest play-wright. The piece abounds with diverse and complex characters, all of them very skilfully marshalled to produce an excellent stage effect, which one must see to fully realise it."[২৭]

'ছত্রপতি শিবাজী' সম্পর্কেও স্তুতি-বন্দনা করা হয়েছিল :

"(Chatrapati Sivaji) is one of the best and most powerful dramas ever produced on the Indian stage."[২৮]

অন্যান্য পত্রিকার প্রশংসাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি পত্রিকা Statesman 'সিরাজদ্দৌলা' সম্পর্কে লেখেন,

"The Company has been playing Serajuddulla by G. C. Ghose for the past five months with unabated success."[২৯]

'মীর কাসিম' সম্পর্কে 'বসুমতী' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল,

"...গিরিশবাবু তাঁহার পরিণত বয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতার সহায়তায় এই নাটকখানিকে তাঁহার স্বকীয় কীর্ত্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন। এই স্তম্ভের বনিয়াদ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত পাকা সোনায় গঠিত।...গিরিশবাবুর রচনাকৌশলে মুগ্ধ হইয়াছি, অভিনয়ের পারিপাট্যে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি, মীর কাসিম প্রজাহিতৈষী নরপতি ছিলেন, ইংরাজ বণিকের কর্ম্মচারীর হস্তের ক্রীড়া পুত্তলিকা হইয়া তিনি নবাবী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাই তিনি ইংরাজের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন, হটিয়াছিলেন ও শেষে সর্ব্বস্ব-বঞ্চিত হইয়া নিরাশ্রয় অনাথের ন্যায় মরিয়াছিলেন। এই কঙ্কালটুকু অবলম্বন করিয়া

২৭ Bengalee : June, 23 , 1906.

২৮ Bengalee : September 21 , 1907.

২৯ Statesman : February 17 ; 1906.

এমন একখানি বিচিত্র ও বিপুল নাটক গিরিশচন্দ্র ভিন্ন অন্য কেহ রচনা করিতে পারিবেন কিনা জানি না।"[৩০]

ইংরেজি দৈনিক Statesman 'মীর কাসিমের' মঞ্চসাফল্য বর্ণনা করে লেখেন,

"The exceedingly lavish manner in which 'Mir Kaseem' has been staged at the Kohinoor Theatre assists materially in enhancing the enjoyment of this piece, which deals with the incidents of the tumultuous period that followed the accession of Mir Kaseem to the throne and the strenuous fight that the ruler had with the East India Company for the protection of indigenous industries. The acting allround reaches a high watermark of excellence, and the huge audience testified their appreciation in a most unmistakable manner".[৩১]

'ছত্রপতি শিবাজী' সম্পর্কে অকুণ্ঠ প্রশংসা করে স্বদেশপ্রেমিক সখারাম দেউস্কর 'হিতবাদী' পত্রিকাতে লেখেন,

"শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ন্যায় কৃতী ও প্রবীণ নাট্যকার 'ছত্রপতি' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন শুনিয়া আশান্বিত হইযাছিলাম। এক্ষণে তাঁহার রচিত নাটক পাঠ করিয়া রঙ্গমঞ্চে উহার অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গিরিশবাবুর উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তিনি মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়ের চিত্র অঙ্কণে বিশেষরূপেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন, একথা আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে বলিতে পারি। মহারাষ্ট্রীয়েরা শিবাজীকে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, গিরিশবাবুর নাটকে তাহা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। শিবাজী চরিত্রের বিবিধ সদ্গুণ এবং তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব এই নাটকে অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট হইয়াছে।"[৩২]

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলির অভিনয় সাফল্য দেশবাসীর সকল

---

৩০ বসুমতী : ৩০শে আষাঢ়, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

৩১ Statesman : November , 1907.

৩২ দ্রঃ গিরিশ প্রতিভা : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; পৃ. ২৩০।

সম্প্রদায়ের জীবনচত্বরে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। তৎকালীন বর্ধমানের জননায়ক আবুল কাসেম গিরিশচন্দ্রকে বলেন,

"মহাশয়, আপনার সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম দেখলে আর সভায় গিয়ে বক্তৃতা করতে হয় না।"[৩৩]

ভারতীয় নাট্যমঞ্চের লেখক গিরিশচন্দ্রের স্বাদেশিক আদর্শ প্রচার সাফল্যের কথা বর্ণনা করে লেখেন,

"They (i.e., Sirajuddoulah and Mirkasim) changed the mentality of the people who for the first time saw before our eyes. 'What history of Bengal is and how uptil now we had simply committed to memory incorrect things that have been put to our mouths as to parrots."[৩৪]

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে গিরিশচন্দ্র জাতীয়তা প্রচার ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবন্ধন সৃষ্টিতে কেমন অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন।* স্বাধীনতা যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত বাল গঙ্গাধর তিলক 'সিরাজদ্দৌলা অভিনয় দর্শন করে নাট্যকারের প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেন। আমরা পরিশেষে দু'টি প্রশংসাপত্রের উল্লেখ করে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের স্বাদেশিকতার আদর্শ বিস্তারে সাফল্যের আলোচনার পরিসমাপ্তি টানব।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক পাঠ করে গিরিশচন্দ্রকে লেখেন,

"......ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নাটকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আপনার রচনা-প্রতিভার প্রচুর আত্মপ্রসাদ। ইতিহাস

---

৩৩ ভারতীয় নাট্যমঞ্চ : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; পৃ. ১৯০

৩৪ Indian Stage (Vol. IV) : H N. Dasgupta , p. 49

* "আজকাল 'ভারত-ত্যাগ' কথায় সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গিরিশের লেখনী হইতেই সেই বাণী প্রথম উচ্চারিত হয়। জাতীয়তা অনেক নাটকে থাকিতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রথম বিদেশীর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে গিরিশই প্রথমে শিক্ষা দেন। আর সেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ব্যাপার সম্বলিত ইতিহাসমূলক নাটক সেই যুগে একমাত্র গিরিশের লেখনী হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল।"

—ভারতীয় নাট্যমঞ্চ : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; পৃঃ ১৮৯

লিখিয়া সুখী হইতে পারি নাই—লিখিতে লিখিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। নাটক পড়িয়াও সুখী হইতে পারিলাম না। পড়িতে ২ অশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম। ভগবতী ভারতী আপনার লেখনীর উপর পুষ্প-চন্দন বর্ষণ করুন।"[৩৫]

গিরিশচন্দ্রের স্বাদেশিক চিত্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের কবি নবীনচন্দ্র সেন সুদূর রেঙ্গুন থেকে দু'টি পত্র লেখেন। প্রথমটিতে তিনি 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের প্রশংসা করে লেখেন :

"ভাই গিরিশ! ২০ বৎসর বয়সে 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি, তখন সিরাজের শত্রু চিত্রিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। শ্রীভগবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করুন।"[৩৬]

দ্বিতীয় পত্রে তিনি গিরিশচন্দ্রকে স্বদেশী আন্দোলনের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত অবলম্বন করে 'কমিকো ট্রেজিক' নাটক লিখতে অনুরোধ করেন; কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, ঐ প্রয়াস জাতির প্রয়োজন অধিক পরিমাণে মেটাতে সাহায্য করবে।

"আমার অনুরোধ, তুমি ৭ দিনে প্রসব না করিয়া কিছু বেশিদিন সময় লইয়া আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধর্ম্মনীতি, দরিদ্রতা-অন্নহীনতা-জলহীনতা, শিক্ষাবিভ্রাট, চাকরিবিভ্রাট, উকিলি, ডাক্তারীবিভ্রাট, উপাধি ব্যাধি সকল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া একখানি 'কমিকো ট্রেজিক' নাটক লিখিয়া দেশরক্ষা কর। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনটা স্থায়ী করা উহার প্রধান লক্ষ্য হইবে। আমরা এতকাল সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চে যে স্বদেশ লইয়া কাঁদিয়াছি, এতদিনে শ্রীভগবান যেন তাহা শুনিয়াছেন, এবং দেশের হৃদয়ে এই নব শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। উহা রঙ্গমঞ্চের দ্বারা তুমি যেরূপ স্থায়ী ও বর্দ্ধিত করিতে

৩৫ ভারতীয় নাট্যমঞ্চ : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ. ১৮৮

৩৬ দ্রঃ গিরিশচন্দ্র : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ২৩৭

পারিবে, আর কেহ পারিবে না। 'নীলদর্পণে'র মত এই একখানি বহি তোমাকে অমর করিবে। উহা নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে—অভিনীত হইয়া দেশে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে। তুমি রঙ্গমঞ্চের দ্বারা ধর্ম্মে ও প্রেমে দেশ বহুবার মাতাইয়াছ। এবার স্বদেশপ্রেমে মাতাইয়া তোমার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন কর।......

আমার অনুরোধটা রক্ষা করিবে কি? আমার এরূপ পীড়াপীড়ির দরুণ বঙ্কিমবাবু 'আনন্দমঠ' লিখিয়াছিলেন।......এত বৎসর পরে উহার কি অমৃত ফল ফলিয়াছে দেখিতেছ। তবে তিনি আনন্দমঠে দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই। তুমি সেই মাতৃ-পূজার সঙ্গে পূজার পদ্ধতি দেখাইবে।"[৩৭]

নাট্যচিন্তা ও নাটক রচনাতে গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লোকশিক্ষা প্রচার নির্দেশকে শিরোধার্য করেছিলেন। মাতৃসাধনা ও মাতৃমন্ত্র-প্রচার তাঁর সকল কর্মের প্রধান অংশ ছিল। জ্ঞান-প্রেম-কর্মে তিনি যে স্বাদেশিক আদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—দেশের স্বাধীনতা অর্জন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে গিরিশচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করেছিলেন। বাঙ্গালী আপন দেশ, জাতি ও ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল, তাঁর এই প্রয়াস থেকে। এক কথায় তিনি বাঙ্গালীর জাতীয় হৃদয় তৈরী করেছিলেন।* স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান। তাঁর একনিষ্ঠ সাধনায় কেবল বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের মূল দেশের মাটিতে স্থায়ীভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়নি ; বাঙ্গালীর চিত্তে স্বদেশপ্রেমের আদর্শও

৩৭ দ্রঃ গিরিশচন্দ্র : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ৬৩৬-৬৩৭

* "স্বদেশীর সময় সভাসমিতিতে যোগ দিতাম বটে, কিন্তু কতকটা যন্ত্রচালিতের মত। সকলে করিতেছে, গড্ডালিকা প্রবাহে আমিও করিতাম। বোধহয় শীঘ্রই ইহার মর্ম্ম ভুলিয়া যাইতাম, যেমন অনেকে গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ তাহা হইতে দেয় নাই।......সেইবার সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম অভিনয় দেখিয়া প্রকৃত জাতীয়তার সন্ধান পাইলাম। বুঝিলাম মিথ্যা ইতিহাসে আমাদের চিত্ত কুয়াসাচ্ছন্ন থাকে, আমরা মনে করি ইংরাজের ন্যায় এত উপকারী আমাদের আর কেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসে 'স্বদেশী' ও জাতীয়তা ঠিক বুঝিতে পারিলাম. সেই অবধি এই চল্লিশ বৎসর সেই শিক্ষারই প্রভাব সমভাবে চলিয়াছে। জাতীয় হৃদয় লইয়া যে দেশবন্ধুর আহ্বানে তাঁহার পতাকাতলে সমাসীন হইয়াছিলাম ......সবেরই মূলে গিরিশচন্দ্রের এই অমূল্য নাটক দুইখানি ও বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ।"

ভারতীয় নাট্যমঞ্চ : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; পৃ. ১৯০-১৯১

স্থিতিশীল হয়েছে। নাটক ও নাট্যশালার মধ্য দিয়ে দেশবাসীর চিত্তে দেশাত্মবোধ বিস্তারে তাঁর প্রয়াস যেন বিশ্বামিত্রের তপঃ সাধন মহিমার উচ্চ গৌরবে বিভূষিত।

গিরিশচন্দ্রের রূপক নাটকে স্বাদেশিকতা

-৩

গিরিশচন্দ্রের রূপক নাটকগুলিতে বাঙ্গালী জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও বিপর্যয়ের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষভাবে বঙ্গবাসী অর্থনৈতিক জীবনে পঙ্গু হয়ে সে সময়ে যে নিচ্ছিদ্র বিষাদ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, নাট্যকার অকৃত্রিম মমত্ববোধে তাঁর রূপক নাটকগুলিতে তা তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল. দেশবাসীকে সমস্ত দিক থেকে সচেতন করে তোলা।

জাতীয় সমস্যা প্রতিফলনের দিকে বিচার করে আমরা মুখ্যত দু'টি নাটককে গ্রহণ করতে পারি। একটি 'মহাপূজা' (১৮৯০) ও অপরটি 'হীরক জুবিলী' (১৮৯৭)। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষ্যে এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষাট বৎসর রাজ্য-পরিচালনা পূর্তিতে যে হীরক জুবিলী সংগঠিত হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই রূপক নাট্যদ্বয় রচনা করেন। 'হীরক জুবিলী' রূপক নাট্যে গিরিশচন্দ্রের রাজভক্তির স্বাক্ষর সুচিহ্নিত থাকলেও, তাঁর স্বদেশপ্রীতি অশোকগুচ্ছের রক্তিম বর্ণে চিত্রিত হয়ে আছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালী অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে মুক্তিলাভের জন্য যে সমস্ত প্রয়াস চালিয়েছিল, তার বিস্তৃত আলোচনা আমরা পটভূমি বিচার প্রসঙ্গে গ্রহণ করেছি। 'মহাপূজা' নাট্যরূপকের অন্তরালে গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীকে আত্মনির্ভরতার সঙ্গে ভারতমাতার সেবা ও দুঃখ দূর করতে আহ্বান জানিয়েছেন। এর সঙ্গে বিদেশী পুঁজিবাদিদের একচেটিয়া বাণিজ্য-নীতিতে জাতির যে স্থায়ী দুর্দশা, সে কথাও তিনি প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হননি। 'মহাপূজা' রূপকে গিরিশচন্দ্র লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীমূর্তির বাক্য সংলাপের মধ্যে ভারতীয়দের জীবনের দুঃখ ও আর্তির কথাই ব্যক্ত করেছেন।

এর সঙ্গে বাঙ্গালীর শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি অনীহা বা উদাসীনতার কথা ব্যক্ত করতেও দ্বিধাচিত্ত হননি। লক্ষ্মী দেবী, বৃটনিকাকে দুঃখ করে বলেছেন :

"লক্ষ্মী। কিন্তু এই দুঃখ মনে, ভারতসন্তানগণে,
কোনমতে শিখিল না আপন নির্ভর,—
শিল্প-কার্য্যে নিযোজিত করিল না কর।
এ দুঃখ কহিব কারে, তব শ্বেতপুত্র-দ্বারে,
পরিধেয় বস্ত্র তরে অধীন সকলে,—
শ্বেতপুত্র-শিল্পবলে গৃহে দীপ জ্বলে!
লবণের প্রযোজন, নিত্য জানে জনে জন,
তব পুত্র হতে তাহা ক্রয় করি আনে ;—
শিল্পী নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচজ্ঞানে।
প্রিয় ভগ্নী সরস্বতী, নানা বিদ্যা দিল সতী,—
করিতেন যদি হায় এই ভ্রান্তি দূর,—
ভারতের সমকক্ষ হ'ত কোন্ পুর ?
সুজলা সুফলা বামা, ফল ফুলে সাজে শ্যামা
বৈজ্ঞানিক শিল্প বিনা সকলি বিফল,
শারীরিক শ্রম বিনা শরীর দুর্ব্বল।" (প্রথম দৃশ্য)

ইউরোপীয়দের অবাধ বাণিজ্যনীতি যে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের অধোগতি ও সর্বনাশের অন্যতম কারণ, নাট্যকার তাও দেবী সরস্বতীর বৃটনিকার প্রতি উক্তিতে প্রকাশ করেছেন,

"সরস্বতী। রাজোৎসাহ একমাত্র শিল্পের সহায়,—
সে সাহায্য বিনা শিল্প সদা নিরুপায়।
ছিল শিল্প নানা মত, শ্বেত-শিল্প-তেজে হত,
নিরুৎসাহে শিল্পকার্য্য না কর গ্রহণ,—
ভারতসন্তানে দেহ আশ্বাস-বচন।' (প্রথম দৃশ্য)

'হীরক জুবিলী' রূপক নাটকেও অনুরূপ বক্তব্যের ছায়াপাত ঘটেছে বণিকসম্প্রদায়ের উক্তিতে। বণিকগণ তদানীন্তন ভারত-সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন,

"বণিক্।......বণিকের মনোবাসনা পূর্ণ কর। নানাদেশী নানাভাষী ভারতে বাণিজ্যের মেলা ক'রেছে, ভারত-অর্জ্জিত বাণিজ্য-অর্থে নানাদেশ

ধনী,—কিন্তু সে বাণিজ্যের উপস্বত্ব ভারত-সন্তান ভোগী নয়!……আমাদের রাজসমীপে আবেদন যে, তোমার শ্বেত সন্তানের ন্যায় আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমরা প্রস্তুত ক'র্তে শিখি। মা, মনের দুঃখ আর কারে জানাব, ভারতে কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ অভাব! লবণ-সমুদ্র-বেষ্টিত ভারত লবণের জন্য লিবারপুলের ভিক্ষুক! যে ভারতে প্রস্তুত কাপড় পূর্ব্বতন জগদ্বিখ্যাত রোমে বিক্রয় হ'য়েছে, সেই ভারত এখন বিদেশের নিকট বস্ত্রের নিমিত্ত অধীন। ভারতেও মা তোমার ধন-ভাণ্ডার হোক; ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয়েই তোমার, তবে ভারত কেন ধনী নয় মা! ……মা, শিক্ষা দাও,……নানা স্থানে গিয়ে তোমার গৌরব প্রদর্শন করি।" (চতুর্থ দৃশ্য)

কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে, প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন, কৃষিব্যবস্থা পুনর্গঠন ও খাজনা ধার্য ব্যবস্থায় সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা, সেনাবাহিনীতে অধিক পরিমাণে ভারতীয় নিয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, গিরিশচন্দ্রের 'মহাপূজা' রূপক নাট্যে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়:

"২ ভারত-সন্তান।……যদি রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পরীক্ষা এ স্থানে হয়, আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, প্রতি প্রেসিডেন্সিতে অন্ততঃ পাঁচজন রাজপ্রতিনিধি ফার্ষ্ট ডিভিসনে, দশজন সেকেণ্ড ডিভিসনে ও পঁচিশজন থার্ড ডিভিসনে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে অন্ততঃ প্রতি প্রেসিডেন্সি ও প্রদেশে দুইজন করিয়া স্কলারসিপ পাইতে পারি, তবে কি নিমিত্ত ভারতে 'পার্লামেণ্ট' স্থাপিত হইবে না? আমরা বক্তৃতা বিদ্যায় কাহারও দ্বিতীয় নই। তবে পরীক্ষায় পাশ হইয়া রাজপ্রতিনিধির পদে পারদর্শী কেন না হইব?……সিবিল বিভাগ সম্পূর্ণ ভারতবাসীর হস্তে অর্পিত হউক্।" (দ্বিতীয় দৃশ্য)

কংগ্রেস—রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমস্ত ভারতবাসীর আশা ঐক্য ও সম্প্রীতি পূর্ণ রূপ লাভ করবে, এইরকম এক উচ্চাশা নাট্যকার গিরিশচন্দ্র করেছিলেন। স্বাধিকার অর্জনের পথে নবজীবন সংগঠনের সমস্ত দায়িত্ব কংগ্রেস বহন করবে, এই বিশ্বাসের অবতারণা নাট্যকার 'মহাপূজা' রূপক নাট্যে করেছেন,

"৩ ভারত-সন্তান। এ উৎসবে, নিতান্ত প্রয়োজন; ইহার প্রথম উদ্দেশ্য, ভারতের ভ্রাতৃভাব। এ বিস্তীর্ণ ভারতভূমির নানা প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি

ও বর্ণের পরস্পর আলিঙ্গন ; আমরা জাতিতে ভিন্ন,—পরস্পর ধর্ম্মে ভিন্ন,—কর্ম্মে ভিন্ন,—ভাষায় ভিন্ন,—কিন্তু একদেশবাসী…রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা একজাতি ; ভারতের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থ একীভূত, ভারতের ধনাগমে আমরা ধনী, ভারতের সম্মানে আমরা মানী, ভারতের উন্নতিতে আমরা উন্নত ; একত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করিব।…রাজনৈতিক বিষয় শিক্ষা করিয়া…ইংলণ্ডের উচ্চ রাজকার্য্যের সহকারী হইব।" (দ্বিতীয় দৃশ্য)

"হীরক জুবিলী' রূপক নাটকে নাট্যকার বঙ্গবাসীর কণ্ঠে অনুরূপ ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছেন। তারা ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করে বলেছেন,

"বঙ্গবাসী। করুণাময়ী, করুণা-বচনে প্রকাশ ক'রেছ,—তোমার সাদা-কালোয় ভেদ নাই ; তাইতে আশা প্রবল হয়েছে। তোমার শ্বেত সন্তানের মত হবো, তোমার শ্বেত সন্তানের কার্য্য পাবো, তোমার শ্বেত সন্তানের সহিত মন্ত্রণাগৃহে ব'সে ভারতের উন্নতি ।ধন ক'রবো……।" (চতুর্থ দৃশ্য)

সমকালে কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয়দের অধিক পরিমাণে নিয়োগের দাবি তোলা হয়। 'মহাপূজা' রূপক নাটকে তারই প্রভাব দেখতে পাই নাট্যচরিত্র লক্ষ্মী দেবীর উক্তিতে,

"লক্ষ্মী। দুর্গম অরণ্যে পশে, ব্যোমযান হ'তে খসে,
ভারত সন্তান সবে সমরে সহায় ;
ক্ষুদ্র বঙ্গবাসী দেখ, সৈন্য-কার্য্য চায়।" (প্রথম দৃশ্য)

আবার 'হীরক জুবিলী' নাট্যরূপকে নাট্যচরিত্র রাজার প্রতিবেদনেও অনুরূপ বাসনার রূপরেখা দেখতে পাওয়া যায়,

"রাজা।……মা, আশা পূর্ণ কর। কেন মা দুর্গ-নির্ম্মাণ? কেন এত বেতনভোগী গোরা সৈন্য? কেন অর্থ ব্যয়? চেয়ে দেখ—বলবান্ রাজভক্ত রাজপুত-সন্তান দণ্ডায়মান, চেয়ে দেখ, রণব্রত রাজবৎসল শিখ, মারহাট্টা, মুসলমান, মান্দ্রাজী, পার্শি—অসি করে দণ্ডায়মান। দুর্গের প্রয়োজন নাই, আমরাই তোমার—দৃঢ় প্রাচীর।" (চতুর্থ দৃশ্য)

আমরা জেনেছি, ইংরেজ রাজত্বের সূচনাকাল থেকে ভারতের কৃষিজীবীদের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, জমিদারদের হৃদয়হীন অত্যাচার, আমীন-গোমস্তাদের আত্মস্বার্থসর্বস্ব লোলুপতা ও

নিষ্ঠুর চক্রান্ত এবং সর্বোপরি ইংরেজ বণিকদের চণ্ডশোষণনীতি, বাঙ্গলাদেশের কৃষকদের নাভিশ্বাস তুলেছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'হীরক জুবিলী' রূপক নাট্যে কৃষকদের দুঃখানুভূতির অংশীদার হয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন, ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার কাছে :

"কৃষক। মা, হলজীবী দীন প্রজার প্রতি চাও,—আমরা উপায়বিহীন, অর্থহীন, দীন, আমাদের প্রতি করুণাকটাক্ষ কর! ভারতের শস্য ভারতে রাখ,—দেখ মা, জগতের শস্যভাণ্ডার ভারতে আজ দুর্ভিক্ষ! অপর দেশের শস্য আজ ভারতে আসছে, তবে আমাদের অর্দ্ধাশন হ'চ্ছে! দেখ মা, আমরা অন্নহীন......বস্ত্রহীন, বলহীন, উৎসাহহীন! আমাদের ন্যায় দীন-সন্তান আর তোমার অধিকারে নাই।" (চতুর্থ দৃশ্য)

গিরিশচন্দ্র কংগ্রেসের যুগনেতাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেশগঠন ও জাতি-সংগঠনের বাণী প্রচার করেন। সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর, ধর্মনৈতিক একতা স্থাপন ও ব্যক্তিস্বার্থ পরিহার এই ত্রয়ী আদর্শও তিনি 'মহাপূজা' নাটকে তুলে ধরেছেন :

"১ ভারত-সন্তান। ভারত সন্তান, কর কোলাকুলি,
দুঃখনিশা অবসান ;
... ...
... ...
একতা রতন, বহুদিন হ'তে,
ভারতে ছিল না। ভাই,
কর হে যতন, এ মহা রতনে,
পেয়ে যেন না হারাই।
পঞ্জাব, প্রযাগ, অযোধ্যা, কনোজ,
মহারাষ্ট্র, মাড়োয়ার ;
মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আসাম, নাগপুর,
উৎকল, বঙ্গ, বিহার।
হিন্দু বা খৃষ্টান, পার্শি মুসলমান,
একপ্রাণ আজি সবে :
একতা-বিহীন ভারতসন্তান,
কেহ আর নাহি রবে।

স্বার্থ পরিহরি, স্বদেশ-উন্নতি,
এস হে সাধন করি,
আনন্দ উদ্যম, কর হে প্রকাশ,
ভ্রাতৃভাব হৃদে ধরি।
ভিন্ন ভিন্ন জাতি, যদিও আমরা,
ভিন্ন ভিন্ন ধরি নাম,
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম,
ভারত সবার ধাম।" (দ্বিতীয় দৃশ্য)

স্বার্থ-বিসর্জন সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র কংগ্রেসের আদর্শই গ্রহণ করেছিলেন :

"৫ ভারত-সন্তান।......এ সম্মিলনের উদ্দেশ্য—স্বার্থ বিসর্জ্জন। ভাবী ফলের নিমিত্ত এ মহাবৃক্ষ রোপণ, ভারতের উন্নতি-কামনায় এ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, এ উদ্যম দুঃখিনী ভারতমাতার নিমিত্ত, আমাদের নিমিত্ত নয়। ভবিষ্যতে সমস্ত ভারতবাসী যাহাতে রাজনৈতিক বিষয়ে একজাতি হয়, ভ্রাতৃভাবে কার্য্য করে, পরস্পর একতা-বন্ধনে বদ্ধ ও পরস্পর বিশ্বাসে চালিত হয়, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমি পুনর্ব্বার বলি, এ সভার উদ্দেশ্য—'স্বার্থসাধন' নয়, 'স্বার্থবিসর্জ্জন'। যে ভারতসন্তান এ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তিনি আমাদের সহিত মিলিত হউন......" (দ্বিতীয় দৃশ্য)

আবার,

"৬ভারত-সন্তান। হে স্বদেশবৎসল! হে স্বার্থশূন্য মহোদয়! অদ্য তোমার উপবনে ভারতমাতা সন্তানের পূজা গ্রহণ করিবেন, আপনার স্বার্থত্যাগের পুরস্কার—আপনার স্বার্থশূন্য হৃদয়, আপনার হৃদয়ই ভারতমাতার প্রকৃত মন্দির......জন্মভূমির উন্নতি-কামনাই আমাদের স্বার্থ-কামনা।...... মাতৃপূজার মূলমন্ত্র মাতৃভক্তি, কেবল বিশুদ্ধ হৃদয়ই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারে। যাঁর মাতৃস্নেহ হৃদয়ে বলবান্, যিনি ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ, ভারত-উন্নতি যাঁর জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য......তাঁহাদের পূজা ভারতমাতা গ্রহণ করিবেন।" (দ্বিতীয় দৃশ্য)

গিরিশচন্দ্র তাঁর রূপক নাটকগুলিতে কোন মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রাখেন নি। উনিশ শতকের শেষ দশকে তিনি এই নাটকদ্বয় রচনা করেন। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন রাজনীতি ও ইংরেজপ্রীতি মনোভাবকে তিনি রূপক নাটিকায় ব্যক্ত করেছেন মাত্র। অবশ্য সমকালের রাজনৈতিক চিন্তার

সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত দেশহিতবাসনার বিরোধ কোথাও বাধেনি। সুতরাং তাঁর ইংরেজ রাজানুগত্য তৎকালীন কংগ্রেস সংগঠনের অনুসৃত নীতিরই প্রতিফলন। তবুও তিনি সর্বদা মাতৃ-উপাসনার কথাই প্রচার করেছেন। গিরিশচন্দ্রের মতে মাতৃসাধনাই—শক্তি। ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে শক্তিকে জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করে কর্মের মধ্যে প্রচার করেছে। ভারতবর্ষের স্বাদেশিকতার মূলকথা ও ভিত্তি—মাতৃপূজা এবং মাতৃবন্দনা। নাট্যকারের অভীপ্সাও তাই,

"নয়নজলে গেঁথে মালা পরাব দুঃখিনী মায়,
ভক্তি কমল বলি দিব মায়ের রাঙ্গা পায়।
শিখ হৃদি উচ্চ শিক্ষা, মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা,
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী সেবায়।
যে নামে দুরিত হরে, রাখ যতনে হৃদে ধরে,
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্না যায়।"

(মহাপূজা, দ্বিতীয় দৃশ্য)

তের

অমৃতলাল বসুর নাটকে স্বাদেশিকতা

অমৃতলাল বসুর স্বাদেশিক চিত্তের বৈশিষ্ট্য —সংগঠনমূলক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার। প্রহসন ও ব্যঙ্গ কৌতুকের অবতারণা তাঁর নাটকের মূল উদ্দেশ্য হলেও, বিদ্রূপের উষ্ণ ফোয়ারার মধ্যে এক সংগঠনী চিন্তা ও স্বদেশহিত কর্ম পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়।

অমৃতলালের সামগ্রিক নাট্যরচনার অন্তরালে বিশ্লেষণী আলোক নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এবং বাঙ্গালীর পাশ্চাত্যশিক্ষা সমন্বিত প্রগতিকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারেননি। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই রঙ্গরসের অবতারণা করে প্রহসনের অন্তরালে জনমানসের প্রগতি ও জাগরণকে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন। তিনি সামাজিক আন্দোলনের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মকে—বিশেষভাবে 'বিধবা বিবাহ' প্রচলনকে যেমন বিদ্রূপের সঙ্গে আক্রমণ ও সমালোচনা করেছেন, তেমনি, সমকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের নানারূপ পরিকল্পনার সর্বাঙ্গে কৌতুকের কর্দমও করেছেন নিক্ষেপ। কিন্তু তাঁর এই আক্রমণাত্মক প্রবণতার অন্তরালে স্বাদেশিক ঐক্যভাবনা ও গঠনমূলক চিন্তা অন্তঃসলিলাকারে প্রবাহিত হয়েছে।

ইংলণ্ডীয় দ্বৈপায়ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে জাতির জীবনে বিদেশী আদর্শ অনুকরণের আতিশয্য ও বিলাসকলাকুতূহলের মনোবাসনা অধিকভাবে স্ফীত হয়ে উঠে। স্থূল ও তরল আমোদ-প্রমোদে শরীর এলিয়ে কল্পনার আকাশে সতত সঞ্চরমান বিহঙ্গরূপে স্বপ্নপ্রয়াণ করবার প্রবল বাসনা শিক্ষিত জনচিত্তে তীব্র হয়ে উঠেছিল; আর এরই মাঝে দেশমাতৃকার মুক্তিস্বপ্ন ঝড়ো বাতাসের মতো এলোমেলোভাবে প্রবাহিত হয়ে দেশাত্মবোধের ভাবোচ্ছ্বাস ও আবেগ সঞ্চার করত। অমৃতলালের খাঁটি মন ও স্থির সংস্কারবাদী চিন্তা, বাঙ্গালীর চিত্ত আতিশয্যের আস্ফালনকে স্বাদেশিকতার পথ বলে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই তিনি মোটা তুলিতে অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে নাটকে চিত্রের পর চিত্র সংযোজিত করেছেন। স্বদেশপ্রীতির গভীর ও গম্ভীর-নিনাদি সুর তাঁর নাটকের অভ্যন্তরে বর্তমান। প্রথম দিকে

অমৃতলালের নাটকের বিষয়বস্তু ও তার নাট্যচিন্তার প্রবাহ ধরে অগ্রসর হলে, নাট্যকারকে মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে হয়; কিন্তু যখন বক্তব্যের মোহনায় আসা যায় তখন তাঁর প্রহসনের ছদ্মবেশ উৎসাদিত হয় এবং সত্যকার স্বরূপটি ব্যক্ত হয়ে পড়ে। আমরা তখন তাঁর জীবন-দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যটি উপলব্ধি করতে পারি। অমৃতলাল দেশবাসীর চিত্তকে নিখাদ সোনায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য পরানুগ্রাহী, আত্মনির্ভরহীন বাঙ্গালীকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের উষ্ণ বারি নিক্ষেপণে সদা সর্বদা সচেতন ও সজাগ করতে চেয়েছিলেন।

অমৃতলাল মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, দেশই জাতীয়তার প্রকৃত ভিত্তিভূমি; আর এই ভূমির যোগ দেশধর্মের সঙ্গে একান্তভাবে আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। জাতির সামাজিক সংহতি, রাজনৈতিক ঐক্য দেশানুগ হওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্ত্যানুকরণ ও পরমতবাদে কখনও জাতীয়তা পুষ্টি লাভ করে না। আর এই কারণের জন্যই বাঙ্গালীর প্রতীচ্য প্রীতিকে তিনি সর্বদা বিদ্রূপে কশাঘাত করেছেন।

অমৃতলালের স্বাদেশিক আদর্শ, জাতির সমাজতান্ত্রিক উন্নতি ও সংহতি-মূলক রাজনৈতিক মতবাদকে গ্রহণ করেছিল। আর এরই জন্য তিনি বাঙ্গালীর সর্ব বিষয়ে বিদেশী মোহত্যাগ, স্বধর্মে নিষ্ঠা, আত্মনির্ভরতা, জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা ও অর্থ নৈতিক বনিয়াদকে দৃঢ় করবার জন্যে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার চেয়েছিলেন। তিনি স্বদেশপ্রেম অর্থে সর্ব বিষয়ে বিদেশীর সমযোগ্যতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনকেই বুঝতেন। অমৃতলালের মতে স্বাধীনতার অর্থ ছিল, স্ব-নির্ভরতা এবং ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ। স্বাধীনতা পরানুগৃহীত হলে জাতির জীবনে সমস্ত সৌরভ ও সৌন্দর্য কীটদষ্ট কুসুমের ন্যায় ঝরে পড়ে। এইরূপ আত্মগ্লানি, আত্মহত্যারই অনুরূপ। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে, বাঙ্গালীকে স্ব-নির্ভর ও স্বাবলম্বী হতে হবে। বাঙ্গালীর পরমুখাপেক্ষিতাকে তিনি 'একাকার' (১৮৯৭) নাটকে কটাক্ষ করে বলেছেন, নাট্যচরিত্র রাধানাথের উক্তিতে:

"রাধানাথ।…তোমাদের স্বাধীনতার মানেটা কি, আমায় বুঝিয়ে দিতে পার? এদিকে তো বল, আমরা সব কাজের উপযুক্ত হয়েছি, কিন্তু কোন একটা দরকার পড়লেই অমনি 'দে, গবর্ণমেণ্ট দে;' লেখাপড়া শিখবো, গবর্ণমেণ্ট স্কুল ক'রে দিলে তবে চলবে; পয়সা চাই, সংসার চলে না, দাও

গবর্ণমেণ্ট তার একটা উপায় ক'রে ; রাজনৈতিক, সামাজিক, নাগরিক যা যখন কিছু উন্নতির আবশ্যক হবে, সব গবর্ণমেণ্টের দোহাই ; ক্রমে বিবাহের খরচের রেট, দম্পতি-মিলনের বয়সের বাঁধা-বাঁধি, ঠাকুরবাড়ীর পূজার বন্দোবস্তের ভার পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের হাতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ; দিনকতক বাদে দেখছি গবর্ণমেণ্টকে বাড়ী বাড়ী রাঁধা ভাত পর্য্যন্ত পাঠাবার জন্য দরখাস্ত করা হবে, তা হ'লে স্বাধীনতাটা রক্ষা করা হবে কি রকম? ইংরেজদের বলা হবে কি যে, তোমরা আগে পিছে ঢাল-তলোয়ার খিচতে থাক, আমাদের গায়ে মাছিটি না বসতে পারে, আমরা আহারাদির পর একটু নিদ্রা দিয়ে উঠে তামাক-টামাক খেয়ে খানিক বা লেক্‌চার দিলেম, খানিক বা রাজ্যশাসনটা ক'রে নিলেম।" (১।৩গ)

জাতির আত্মনির্ভরতার মূলে প্রয়োজন দৃঢ় অর্থ নৈতিক বনিয়াদ। আর এর জন্য বিশেষ দরকার—দেশীয় শিল্পের প্রসার, বাণিজ্য বিস্তার ও উন্নততর কারিগরী শিক্ষার প্রবর্তনা। অমৃতলাল বাঙ্গালীকে কেতাবী শিক্ষার পরিবর্তে ফলিত বিজ্ঞান শিক্ষার আহ্বান জানান। উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙ্গালী অর্থ নৈতিক সমস্যার কবলে পড়ে। কেবল শ্রমিক শ্রেণী নয়, শিক্ষিত উচ্চবিত্ত বাঙ্গালীদেরও অবস্থা উঠেছিল চরমে। বিদেশী দ্রব্য অধিক পরিমাণে প্রচলিত হওয়াতে, দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের নিদারুণ ক্ষতি হয়, আবার সে সঙ্গে অন্যদিকে দেশে চাকুরী ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা। এই উভয়-সঙ্কটের দিনে অমৃতলাল জাতির দিশেহারা ভাবকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। তিনি দেশবাসীকে বাণিজ্য ও প্রয়োগ শিল্পচর্চার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। জীবনযুদ্ধে অসহায় পর্যুদস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর পাণ্ডুর ক্লিষ্ট চিত্রটি রূপায়িত করেছেন 'একাকার' নাটকে। নাট্যচরিত্র রাধানাথের মুখে তিনি নিজের বক্তব্য প্রচার করেছেন :

"রাধানাথ। জঠরানলের মতন গুরুমশাই আর পৃথিবীতে নেই, আপিসের দাঁতখিঁচুনিতে আর বালামের বাজার দেখে যে জ্ঞান লাভ হয়েছে, ভলম্ ভলম্ মিল স্পেন্সার প'ড়ে আর ট্রিগনমেট্রি কসে তার আধ কড়াও হয় নি।" (১।৩গ)

অমৃতলাল কঠিন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর এর ফলে তাঁর ধারণা জন্মে যে, ব্যবহারিক বিদ্যা

অর্জনই জীবনযুদ্ধে বাঁচবার প্রকৃত হাতিয়ার। তাই তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আপন অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে সমস্ত রোমান্টিক ভাবাবেগ ও মিথ্যা গর্ব পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। দেশবাসী 'গ্রামার ছেড়ে হ্যামার' ধরুক, এই ছিল তাঁর কর্ম-নীতি। তাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি জানিয়েছেন 'একাকার' নাটকে নাট্যচরিত্র রাধানাথের উক্তিতে,

"রাধানাথ। এই গ্রামার ছেড়ে হ্যামার ধরেই তাই আমার সাম্যভাব গিয়ে গ্রাম্যভাব এসেছে, দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্য্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছি, ভদ্রলোক হয়ে সাহেবের উমেদারী কর্ত্তে গিয়ে তাঁর দরওয়ান, চাপরাসীর খিঁচুনি খেয়ে এসেছি, এখন ছোট লোক হযে এইটুকু লাভ হয়েছে যে, নিজেও দু'পাঁচজন দরওয়ান চাপরাসী রেখেছি, আর সময়ে এক আধটা সাহেবও আমার কারখানায চাকরী পাবার জন্য দরখাস্ত কর্ত্তে আসে।" (১।৩গ)

এইভাবে অমৃতলাল, তাঁর নাটকে রঙ্গরসের তুফান ছুটিয়ে বাঙ্গালীকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াতে চেয়েছিলেন। দেশ ও জাতিকে যদি উন্নত করতে হয় তবে শিল্প ও শিক্ষানীতির ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে। জীবনবহির্মুখ পুঁথিগত শিক্ষাকে তিনি সর্বদা ব্যঙ্গ করেছেন। বাঙ্গালী উচ্চশিক্ষা আহরণ করে যদি স্বজাতি বিদ্যাতে ব্রতী হয়, তবেই দেশের আর্থিক উন্নতি ও দেশের মঙ্গল হওয়া সম্ভব। তিনি বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আপন জাতব্যবসার প্রতি অনীহা ও উপেক্ষণীয় মনোভাব লক্ষ্য করে গভীর মর্মাহত হয়েছেন। নাট্যচরিত্র রাধানাথের যাদবের প্রতি খেদোক্তি প্রকৃতপক্ষে নাট্যকারের গভীর বিষাদবাণী,

"রাধানাথ। লেখাপড়া কল্লেই যে জাতব্যবসা ছাড়তে হবে, তার মানে কি? এই যে বুদ্ধি, যে অধ্যবসায়, যে পরিশ্রম ও যে মনোযোগের বলে তুমি সায়েন্সে এম. এ. পাশ করেছ, সেই বুদ্ধি, সেই অধ্যবসায়, সেই মনোযোগ, সেই পরিশ্রম যদি তোমার জাতীয় ব্যবসায় কৃষিকর্ম্মে প্রয়োগ কর, তা হ'লে তুমি তোমার নিজের, পরিবারের, দেশের কত উন্নতি—কত উপকার কর্ত্তে পার বল দেখি?" (১।৩গ)

অমৃতলাল চাইতেন দেশের শিক্ষা ও প্রয়োগ পরিকল্পনা সামাজিক স্বার্থে গৃহীত হোক। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে কায়িক শ্রমের সংযোগ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তিনি লক্ষ্য করেন যে, উচ্চশিক্ষিত কারিগরী সম্প্রদায় চাকুরীর জন্য উন্মুখ এবং তাঁদের শিক্ষা জাতিগত বৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হওয়াতে

সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এক মোহময় কল্পনা-বিলাস চিত্তের আকাশ পটে রামধনুর ক্ষণস্থায়ী বর্ণালী সৃষ্টি করে থাকে মাত্র, দেশের মাটির সঙ্গে তার কোন সংযোগ থাকে না। সেজন্য তিনি দেশবাসীকে আপন জাতিগত কর্মে অনুরক্ত হয়ে, সে বিষয়ে উচ্চমার্গে পদচারণা করতে আহ্বান জানিয়েছেন। জাতিগত কাজে অনধিকারী ব্যক্তির পুঁথিগত বিদ্যা ও জ্ঞানের কর্ম প্রবর্তনা বহুলাংশে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। 'একাকার' নাটকে নাট্যচরিত্র রাধানাথের উক্তিতে তিনি এই আদর্শ প্রচার করেছেন,

"রাধানাথ। এই দেখ না, গবর্ণমেণ্টের খরচায় বা অন্যরকমে যে ক'জন বাঙ্গালী বিলাত থেকে চাষবাস শিখে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ ডিপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরী, কেউ স্কুলমাষ্টারী, কেউ বা চাষের রিপোর্ট লিখে চাকরী কচ্ছেন, কিন্তু নিজের একাউণ্টে নিজের চাষ আবাদ করবার প্রবৃত্তি কারুরই হয়নি; আর হবেই বা কি রকম ক'রে? একটা বড় ইংরাজী রকম ক্ষেত-খামার না হ'লে তো আর তাঁরা হাত দিতে পার্ব্বেন না। (বোধ হয়, তার মূলধনও নেই), এর কারণ কি? বিলাতে এগ্রিকলচারল, কেমিষ্ট্রি, ভেটারিনারি, বুককিপিং, ফারমিং, ষ্টীমপ্লাউয়িং ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিষয় শেখা হয়েছে বটে, কিন্তু লাঙ্গল ধরা, গরুর লেজ মলা, রোদ জল খাওয়া, চাষার সঙ্গে বসা, ধুলো মাখা, এই সব আবশ্যকীয় বিষয়গুলি শেখা হয় নি; সেটি শিখিতে গেলে বালককাল থেকে অভ্যাস কর্ত্তে হয়, ছেলেবেলা থেকে ঐ সব কর্ত্তে কর্ত্তে গায়ে ও প্রাণে এমনি সয়ে যায় যে, ক্রমে ওতে শরীরও খারাপ হয় না, আর মনে অপমানও বোধ হয় না, বরং ওর ভিতর যে সুখটুকু, যে নামটুকু, যে গর্ব্বটুকু লুকান আছে, সেটির উপর দৃষ্টি পড়ে, তাই চাষা সন্ধ্যাবেলা মাটি মেখে ধানের বোঝা মাথায় ক'রে গান গাইতে গাইতে বাড়ী যায়;......এই জন্যে সেকেলে ঋষিরা শ্রমজীবীদের পক্ষে হায়ার এডুকেশন নিষেধ ক'রে গেছেন। তাঁরা জানতেন, যেমন একালে দেখা যায়, গাউন প'রে কন্‌ভোকেসনে গিয়ে লাট সাহেবের হাত থেকে বি. এ, এম. এ. ডিগ্রি আনার পর র‍্যাঁদা বাঁটালি নিয়ে বাবুরা বাক্স গড়তে পারে না, তেমনি সেকালে সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল প'ড়ে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন জয় ক'রে এসেও কেউ তাঁত বুনতে বসতে পার্ত্তো না।" (১৩গ)

অমৃতলাল শিক্ষিত ব্যক্তিদের ইংরেজি শিক্ষার বৃথা মোহ ও আত্মগর্ব থেকে মুক্ত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। শিক্ষা বলতে তিনি বুঝতেন মানুষের

মনের সার্বিক বিকাশ। শিক্ষাকে তিনি সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজনের সঙ্গে অনুবিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন; আর অমৃতলাল মনে করতেন—'লোকশিক্ষা'ই এ বিষয়ের প্রকৃত পথ ও প্রকৃষ্ট রীতি। আমাদের মনে হয় তিনি শিক্ষাচিন্তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন।* সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা ও সহানুভূতি সৃষ্টিই ছিল অমৃতলালের শিক্ষাচিন্তার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বারবার দেশবাসীকে কেতাবী শিক্ষার মধ্যে সম্পৃক্ত না থেকে জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনের দিকে শিক্ষা ও চিন্তাকে পরিচালিত করতে আমন্ত্রণ জানান। সামাজিক উন্নতি ও কল্যাণের বেদীতে শিক্ষা নিয়োজিত হোক এই ছিল তাঁর একমাত্র প্রয়াস। তিনি 'একাকার'

* "বাঙ্গালার ছয় কোটি যাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশেই প্রমত্ত।······চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ এই শিক্ষাই শিক্ষা।······ সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা এ দেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন না।······

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সেদিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বেদী পিঁড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস নুদুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধিচীর আত্মসমর্পণ-বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে।······দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে?······এই অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপী, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।······

ছয় কোটি যাটি লোকের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।"

'লোকশিক্ষা'—বঙ্গদর্শন : অগ্রহায়ণ ; ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।

নাটকে নাট্যচরিত্র রাধানাথের অপর চরিত্র যাদবের প্রতি উক্তিতে, নিজের ইচ্ছা ও ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন :

"রাধানাথ। কে বলেছে যে, এডুকেশন চাই না, আর কেই বা তোমায় বল্লে, এডুকেশন মানে বই পড়া। এই ঘানি, চরকা, তাঁতটাঁতগুলো এ দেশে গোড়ায় বেদব্যাস শুকদেবও তৈয়ের করেন নি, আর যখন তৈয়েরী হয়েছে, তখন তোমার বিলেত জন্মায়ও নি। যে অনক্ষর কারিগর প্রথম চরকা তৈয়ের করেছিল, তার মাথা, যে বিলাতী স্পিনারি তৈয়ের করেছিল, তার চেয়ে কমতি ঠাওরাও নাকি?......আর রসো, হালফিলই দেখ, তোমার এখনকার ইনভেন্সনের রাজা তো এডিসন, কলেজ, ইউনিভারসিটি চুলোয় যাক্, তিনি যে স্কুলেও বড় বেশী ডিক্টেসন লিখেছেন, তারও এমন কিছু বেশী নজীর নাই। বুক-এডুকেশন যে দরকার নাই, তা আমি বলছি না। ডিগ্‌নিটি অফ লেবার যদি এপ্রিসিয়েট করা যায়, শারীরিক পরিশ্রমের সম্মান রেখে মিস্ত্রী, কারিগর, কৃষককে যদি আমরা আদর ক'রে আমাদের সংসর্গে আসতে দিই, তা হ'লে আমাদে. সঙ্গে মেশবার জন্য তাদের ভিতর অনেকে নিশ্চয়ই অবসরমত লেখাপড়া শেখে। ·

তার পর আমাদের দেশে লোক-শিক্ষার, যাকে মাস্ এডুকেশন বল, তার আর একটি সহজ উপায় আছে ; বার মাসে তের পার্ব্বণ, বার-ব্রত, পাঠ কথকতা, যাত্রা আমোদ ইত্যাদি সবই এডুকেটিং, সব থেকেই শিক্ষা পাওয়া যায় ; আবার এই বঙ্গদেশে কাশীরাম, কৃত্তিবাস যা দু'খানি অমূল্য বই লিখে গেছেন, তা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে লোককে শিক্ষিত কচ্চে ;—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

এই দু'টি ছত্রে ইতর-ভদ্র, স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই শিক্ষার প্রতি যে প্রবৃত্তি দিচ্ছে, তোমার জার্ম্মাণ পুলিসের ঠাকুর্দ্দাদাও এ জন্মে তা পার্ব্বেন না। কি কথায় বার্ত্তায়, কি ধর্ম্মভাবে, কি আচার-ব্যবহারে, আমাদের দেশের সামান্য সাধারণ লোক যতটুকু উন্নত, এমন আর কোন দেশে নাই। ইতর লোকের অবস্থা হ'তে দেশের যথার্থ অবস্থা বুঝা যায় ; যেমন কিউ গার্ডেন দেখে ইংলণ্ডকে উর্ব্বরা দেশ বলা যায় না ; পল্লীগ্রামের পড়ো জমি দেখতে হবে, তেমনি বিলাতের ভদ্র সাহেবদের দেখেই বিলেতকে একেবারে সভ্যভূমির

আদর্শ বল্লে হবে না ; ইংলণ্ডের ইতর লোককে দেখলেই বুঝতে পার্ব্বে যে, বিলেত হাড়ে টক্।" (১৩গ)

অমৃতলাল কিন্তু আধুনিক যুগের প্রগতির পদধ্বনি শুনতে পাননি। ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। যিনি কায়িক শ্রম, কর্মমুখী শিক্ষাকে সত্যকার উন্নতির পথ ও মত বলে প্রচার করেছেন, তিনিই আবার 'জাতিভেদ'কে সাম্যের প্রকৃত মার্গ বলে চিহ্নিত করেছেন। এই স্ব-বিরোধীতা অবশ্য যুগান্তর সৃষ্টির সূচনা কালে স্বাভাবিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। অমৃতলালও অনুরূপ কালচিন্তার কবলে পড়েছিলেন। তিনি 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহ' শাস্ত্রবাক্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন :

"রাধানাথ। সেই দ্রোণাচার্য্য প্রথম যে দিন ধর্ম্মের জন্য বেদাধ্যয়ন ছেড়ে, স্বার্থের জন্য ধনুতে বাণ যোজনা করেছিলেন, সেই দিন থেকেই আস্তে আস্তে ভাঙ্গতে শুরু হয়েছে, অনেক দিনে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে ; প্রথমে রাবিশ কর্ত্তে হবে, তার পর আস্তে আস্তে অনেকদিনে গড়তে হবে ; ভাঙ্গবার চেয়ে গড়তে বেশি সময় লাগে, তা তো জান ? আমাদের উন্নতি কর্ত্তে হ'লে তোমরা যাকে পেছনো মনে কর, সেই পেছুতে হবে ; সাহেবী ধরণ সামনে আদর্শ রেখে হিন্দু উন্নতি কর্ত্তে যতই চেষ্টা করবে, ততই অধঃপাতে যাবে, হিন্দুর উন্নতির উপায় সেই পুরাতন হিন্দুর আদর্শ। আশ্চর্য্য এক এনোমেলি দেখি যে, পাছে সাহেবেরা আমাদের অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার এবরিজিনিদের মত মনে করেন ব'লে প্রতি কথায় আমরা তাঁদের সামনে গর্ব্ব করি যে, আমরা পুরাতন আর্য্যজাতির বংশ, আমাদের ব্যাস ছিল, বাল্মীকি ছিল, ভীম ছিল, অর্জ্জুন ছিল, আয়ুর্ব্বেদ ছিল, জ্যোতির্বিদ্যা ছিল, ভাস্কর কার্য্যের উদাহরণে উড়িষ্যার মন্দির দেখাই, শিল্পের জন্য ঢাকার মসলিন দেখাই, আরও কত কি দেখিয়ে তো আমরা ইংরাজদের কাছ থেকে সভ্যজাতির প্রিভিলেজ ডিম্যাণ্ড করি, কিন্তু আপনাদের নিজের বেলায় সে সমস্তই ইগনোর করি, শাস্ত্রগুলো আরেবিয়ান নাইটের গল্প মনে করি ; সাহেব শরণং বিনা গতিরন্যথা জেনে বসে থাকি।......

কাজ ভাগাভাগি ক'রে নিতেই হবে, শরীর খাটাতেই হবে, তবে আজ বা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে লাঙ্গল দিয়ে তুমি ঘণ্টা নাড়, আবার তোমার

ছেলে কাল জুতো সেলাই কর্ত্তে বসুক. আমার ছেলে অন্নের অভাবে বিহারীলাল কর্ম্মকার নাম বদলে বিহারানন্দ স্বামী হ'য়ে গেরুয়া প'রে ধর্ম্ম প্রচার করতে বেরিয়ে যান, এই রকম পোড়াধরা খিচুড়ি চলতে থাকবে। কিন্তু বংশগত জাতিভেদের বন্দোবস্ত ভারী পাকা, ভারী কায়েমি। এই জাতিভেদই সাম্য। সাম্য মানে তোমারও ঘটী আছে, আমারও ঘটী আছে; নয়, তোমার না হয় ঘটী আছে, আমার না হয় বাটি আছে। যেমন পরকালে তরবার জন্য তাঁতিকে ব্রাহ্মণের কাছে জোড হাত ক'রে দাঁড়াতে হবে, তেমনি ব্রাহ্মণকেও ইহকালের লজ্জা-নিবারণের জন্য তাঁতির দ্বারস্থ হ'তেই হবে, প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের সম্মান আছে. জোর আছে। আমি প্রত্যেক জাতিকেই সম্মান করি, তবে কাক কাকের মধ্যেই সুন্দর, তিনি যদি ময়ুরপুচ্ছ পরেন, তবে আমি শ্রী দাঁড়কাক চন্দ্র রায় তাঁকে একটু ঠোকরাব।......এই ভেদাভেদেই সাম্য রক্ষা......মেয়েদের গোঁফ বেরুলেই, আর পুরুষরা ঘোমটা দিলেই সাম্য হয় না।" (১।৩গ)

'একাকার' নাটকে অমৃতলালের স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদের পরিচয় সুচিহ্নিত হয়ে থাকলেও, অন্যান্য নাটকগুলিতে তাঁর স্বাদেশিকতার পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়। তিনি বাঙ্গালীকে অর্থনৈতিক দীনতা থেকে মুক্ত করবার জন্য দেশে উন্নততর কৃষি প্রণালীর প্রবর্তন এবং প্রসার চেয়েছিলেন। 'কালাপানি' (১৮৯৩) নাটকে তাঁর এই চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি দেশের ধন-সমৃদ্ধির কথা বলতে গিয়ে দেশের কৃষি উন্নতির কথাই সর্বাগ্রে মনে করিয়ে দিয়েছেন। 'কালাপানি' নাটকে নাট্যচরিত্র তিনকড়ির উক্তি প্রকারান্তরে নাট্যকারের চিত্তের অভিব্যক্তি:

"তিনকড়ি। এই একটি কথা শিখেছ কি না, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' ভাল, তার পরের কথাটা জানা আছে কি? 'তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি'...... কৃষিকর্ম্মে তো বাণিজ্যের অর্দ্ধেক ফল, তা চাষ-বাস কর না কেন? দেশ জুড়ে মাঠ প'ড়ে আছে, তা ত আর বিলাত থেকে মাথায় ক'রে আন্‌তে হবে না?" (১ম দৃশ্য)

অমৃতলাল কৃষিশিল্পের উন্নতির সঙ্গে অনুভব করেছিলেন কৃষকদের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি। কৃষকদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা ও সুচারু পরিকল্পনা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তিনি দেখেছিলেন যে, তৎকালীন রাজনৈতিক সভা- সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে দেশের কৃষকদের দুর্গতি

মোচনের কোন স্থির লক্ষ্য নেই, কেবল বাক্‌সর্বস্ব উত্তেজনাতে সমস্ত উন্নতিকর প্রয়াস অঙ্গীকারবদ্ধ। অমৃতলাল কৃষকদের প্রকৃত অবস্থাটি দেশের লোকেদের সামনে দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন 'কালাপানি' নাটকের নাট্যচরিত্র তিনকড়ির সংলাপে,

"তিনকড়ি। এই তো বাবা, বারমেসে দুর্ভিক্ষ লেগেই রয়েছে। এ বছর কি? না,—বৃষ্টি হয় নি, সব শুকিয়ে গেল। এ বছর কি?—না, ভারি জল, সব হেজে গেল; যত দোষ সেই বুড়ো বেটা ভগবানের উপর চাপান হচ্ছে, কিন্তু আসল কথাটা তলিয়ে একবার কেউ দেখেন না।......বল দেখি এই যে দেশ শুদ্ধ লোকের খোরাকির ভার কা'র উপর দিয়ে রাখা হয়েছে? চালে খড় নাই, ঘরে মাটি নাই, পরণে কপ্নী, মাথায় জট, পেটে পিলে জনকতক চাষার উপর।......এখন যারা চাষী, তারা আমাদের কাছে মাইনে খেয়ে, খোরাক পেয়ে, লাঙ্গলখানার মুঠ ধরতো বই-তো নয়, তাদের সাধ্য কি যে ধাক্কা সামলে খরচ ক'রে জমীর পাট করে নিজে আবাদ করে। এখন আমরা ইংরাজী পড়েছি, বাবু হয়েছি, সভ্য হয়েছি, স্বাধীন হয়েছি, চাপকান এঁটে আফিস যেতে শিখেছি, তারা ভাঙ্গা লাঙ্গলখানা, আধমরা বলদটা নিয়ে ক্ষিধেয় ম'রে, জলে কেঁপে যা দু'টি চারটি পাচ্ছে কচ্ছে, আর মহাজনের খতে ঢেরা সই দিচ্ছে, এতে দুর্ভিক্ষ হবে না তো কি ধনে ধানে মাচা বোঝাই হবে।...আমার কথাটা হচ্ছে যে, এখনও ঢের কাজ আছে যে, দেশে থেকেই করতে পার...তার জন্য এত মিটিং ফিটিং বহ্বাড়ম্বর কেন?" (১ম দৃশ্য)

অমৃতলাল স্বাদেশিক চিন্তার ক্ষেত্রে অন্তর্মুখীনতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি দেশপ্রীতির ভাবাতিশয্যকে সর্বদা পরিহার করতে চাইতেন। তাঁর 'বৌমা' (১৮৯১) নাটকে এই চিন্তাদর্শের স্বাক্ষর আছে। তিনি বহির্মুখী রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা সামাজিক ও পারিবারিক সংহতি সৃষ্টির প্রয়াসকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাবতেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে প্রত্যেক পরিবার—জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত আগার। পরিবারকে সুন্দর, নিয়মনিষ্ঠ ও স্বধর্মানুরাগী করে তোলার অধ্যবসায়কেও তিনি যথার্থ স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। অন্তরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করলে যেমন প্রকৃত ফল প্রাপ্তিতে অন্তরায় ঘটে, তেমনি পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থায় উদাসীন থাকলে জাতীয় আন্দোলনও অনেক সময় কৃশ ও গতিবেগহীন হয়ে পড়ে। তাই অমৃতলাল দেশের আভ্যন্তরীণ সংগঠনের উপর বেশি প্রাধান্য দেন।

তিনি 'বৌমা' নাটকে নাট্যচরিত্র মতিলালের কণ্ঠে আপন মনের অভিলাষকে ব্যক্ত করেছেন :

"মতিলাল। কেন, সবাইকে যে কৃষ্ণদাস পাল, কেশব সেন, মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্র বাঁড়ুযো হতে হবে, তার ত মানে নাই। যার যেমন শক্তি, সময়, সঙ্গতি, সেই রকম কাজ কল্লেই ভাল হয় না ?......দশ জনকে নিয়ে তো পাবলিক্ ; জনে জনে আপনার ঘরের মঙ্গল চেষ্টা কর দেখি, তা হ'লে আপনা আপনি যে সাধারণ মঙ্গল হযে যাবে। তবে যার নিজের সাম্‌লে উথলে পড়্‌বার মতন আছে, সে তার (Surplus) সরপ্লসটুকু যে ক'জনকে পারে বেঁটে দিয়ে সাহায্য কর্‌বে। বিদ্যা-বুদ্ধি বা ধনের জোরে যাঁদের (Influence) ইনফ্লুয়েন্স বেশি, তাঁরা গিযে যে সব লোক আপনি ঠিক হ'তে শেখে নাই, তাদের সাহায্য করুন।......(Noble aspiration ! Noble aspiration !) নোবেল এস্‌পিরেসন্ ! নোবেল এস্‌পিরেসন ! আপনার মা-বাপ ভাই ভগ্নী—এদের খাওয়ান, সুখে রাখা এগুলো বুঝি (Ignoble aspiration) ইগনোবেল এসপিরেশন্ ?......বিলেতেও সবাই গ্লাডষ্টোন ব্রাইট্ নয় ; লক্ষ লক্ষ জন স্মিথ আছে, সমাজটা মাথায় ক'রে রেখেছে তারা, কিন্তু একজনও খবরের কাগজে নাম ছাপায় না। তার পর হিন্দুদের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য বড়ই বেশী, এক একটি একান্নবর্ত্তী পরিবার এক একটি রাজ্য, প্রত্যেক বাড়ীই এক একটি ছোটখাট অতিথিশালা; অন্নসত্র, হাসপাতাল, দেবালয়, বিদ্যালয়..এক একটি পোলিটিক্যাল ইউনিটিও বটে। সবাই আপনার আপনার রাজ্যটুকু যাতে ভাল চলে, চেষ্টা কর দেখি, তা হলেই এই রাজ্যটি উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়াবে।" (১।১গ)

অমৃতলালের স্বদেশহিতবাদী চিন্তার অপর বৈশিষ্ট্য দেশবাসীর আত্মসম্মান ও আত্মসচেতনতার উদ্বোধনের একনিষ্ঠ প্রয়াস। জনহিতবাদী উদার সমাজ সংগঠন ও পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধ, জাতির জীবনে আন্তরিক না হলে আত্মোন্নতির সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টা, রাজনৈতিক উত্তেজনা ও দেশগঠনের নানা কল্যাণকর প্রয়াস শিথিল হয়ে যায়, এ কথা তিনি প্রচার করেছেন তাঁর 'বাবু' (১৮৯৪) নাটকে। তিনি নাট্যচরিত্র তিনকড়ি মামার কণ্ঠে এই মতবাদকে পরিস্ফুট করেছেন,

"তিনকড়ি মামা।......যত দিন না প্রাণ অপেক্ষা মানকে মূল্যবান জ্ঞান কর্‌বে, ততদিন কলঙ্কিত জিহ্বায় স্বাধীনতার কথা উচ্চারণও করো না !

বুঝতে পাচ্ছ কি,—সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী, একতা, এসব তোমাদের জিভ ছাড়িয়ে প্রাণে পৌছায় নি ; অবলার ক্লেশ, আত্মোন্নতি, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, জাতীয় বল, দেশের মঙ্গল, এ সবের ছায়াও তোমাদের প্রাণে নাই ;—কেবল হুজুগ, কেবল সস্তায় নাম বাজান, কেবল নীচ, সঙ্কীর্ণ, আত্ম-স্বার্থ সিদ্ধির নামান্তর মাত্র।" (২।৩গ)

অমৃতলালের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা গণরাজ্য বা প্রজাতন্ত্র স্থাপনের প্রতি বেশী উৎসাহী ছিল। তবে তিনি আবেদন-নিবেদন নীতিকে কোনদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। তৎকালীন কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে রাজানুগত্য প্রদর্শনের যে উদ্বেল মনোবাসনা একশ্রেণীর নেতাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, অমৃতলাল তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেননি। গণরাজ্য স্থাপনের প্রত্যাশা তাঁর 'আদর্শবন্ধু' (১৯[illegible]৮) নাটকে ধরা পড়েছে। নাট্যচরিত্র 'রাও দিনকরের' দুঃখ-ভাবনা প্রকারান্তরে নাট্যকারেরই মনো-লোকের প্রত্যাভাষ।

"রাও দিনকর।……এ কি মায়া ঘিরিছে আমায়!
এ বন্ধন ছেদা নাহি যায়,
ওহো মিত্র পৃথ্বী—
প্রজাতন্ত্র-ভিত্তি বুঝি ভেঙে যায়!
সম্মুখে—সম্মুখে দেখি ভীষণ আঁধার
বিষাক্ত কণ্টকবন।
আত্মজন করে ঘর নাশ,
জ্বালি গরলের বাতি
চির অমারাতি—
আনিতেছে আশু বাড়ি ভাগ্যের আকাশে
কি কব হে মিত্র, কি কহিব আর
ইহা হ'তে শত গুণে হত শ্রেয়স্কর
হইতাম ভিন্ন জাতি তস্করের দাস!
…
আহা—আহা
স্বাধীনতা! কি সুন্দর নাম তোর-
কি মধুর ছায়া!" (১।৪গ)

স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ ও সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে নাট্যকার আবার বলেছেন,

"রাও দিনকর। স্বাধীনতা-গরিমায় হইয়ে উজ্জ্বল,
অবহেলে
ভুঞ্জিতাম স্বাধীন জাতির সুখ ;
বিধিদত্ত মানবের সত্ত্ব সমুদয়
নিজের রাজ্যের কার্য্যে নাহি হ'ত ক্ষয়।
মুক্ত প্রাণে রাজপথে করিতাম বিচরণ,
মুক্তদ্বার হ'ত মন্ত্রাগার,
মুক্তকণ্ঠে কহিতাম কথা
মুক্ত করে কাজ।" (২।৩গ)

কিন্তু এই অমৃতকল্প স্বাধীনতার স্বাদের প্রতি দেশবাসী সম্পূর্ণ উদাসীন। স্থূল স্বার্থ-সর্বস্ব, হতচেতন দেশবাসীর আত্মকলহ ও পরস্পর বঞ্চনাই দেশের পরাধীনতার অন্যতম কারণ। অমৃতলাল সখেদে নাট্যচরিত্র 'রাও দিনকরে'র উক্তিতে দেশবাসীকে হতচৈতন্য ঘুমঘোর থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। জাতিকে দীর্ঘকালীন অসাড়তা ও জড়তা থেকে বেরিয়ে আসতে তিনি ডাক দিয়েছেন কম্বু কণ্ঠে,

"রাও দিনকর। হ'ল সর্ব্বনাশ ;
জাতির জাতিত্ব, প্রজার স্বায়ত্ত,
সমুদয় সত্ত্ব
বঞ্চনায় হ'ল বিসর্জ্জন,
তুড়ি দিয়ে নিল কাড়ি প্রজার অধিকার।
আর সন্তুষ্ট সবাই !
আরে রে রে ক্রীতদাস দল,
ও হে,
পিতৃহন্তা মাতৃঘাতী পাতকী-নিচয়,
ওহো ভগবান্, ভগবান্—
কি বলিব আর !
মুখপানে চাহিয়া এদের
সম জাতি মনুষ্য যে আমি,
এ কথা বলিতে হইতেছে লজ্জা মোর !

হাঃ হাঃ, কি করিলি—কি করিলি,
স্বহস্তে স্বেচ্ছায় দিলি কিনা ডালি,
প্রাণাধিক প্রিয়তর স্বাধীনতা-ধন ?
রাজ্যের প্রধান ভিত্তি করিলি খনন ?
ঠেলে ফেলে
দিলি ওরে গৌরবের চূড়া তার !
... ...
... ...
ওহে ভাইগণ,
নিজ করে বাঁধি শিলা আপন গলায়,
ডুবিতেছ জনমের মত
অতল গরল-সাগর আঁধারে ?
কভু কি পাইবে কূল,
কভু কি ভাসিবে আর ?
যদি কভু ভাস হায়,
পূতিগন্ধ শবপ্রায়,
জগৎ কুঞ্চিবে নাসা দেখিয়া ঘৃণায়
কেন রে কেন রে ভাই,
স্বহস্তে রচিয়া চিতা অগ্নি জ্বালি তায়,
দিতেছ ইচ্ছায় ডালি আপনার কায় ?
... ...
... ...
করপুটে জানু পাতি করি নিবেদন,
ওহে স্বদেশীয়গণ
ভ্রাতার সমান সবে জীবনের ধন,
দেখ অন্ধ আঁখি অশ্রুতে আমার,
কণ্ঠে বাক্ নাহি সরে আর,
দেখ, হীনজন প্রায় লুণ্ঠিত ধরায়
ধরি সবাকার পায়
বচন না জুগায় আমার !

কি বলিব আর—
জ্ঞানহীন বাক্যে দীন আমি !
দেখি আজিকার এই ব্যবহার,
স্বর্গে বসি শোকে সব ফেলে অশ্রুধার।
সন্তানেরা স্বাধীনতা দিতেছে বিদায়,
দেখে—
স্বর্গ আত্মা করে হায় হায় !" (২।৩গ)

দেশের পরাধীনতার কারণ বিশ্লেষণ করে নাট্যকার অশ্রুজলে সিক্ত হয়েছেন। স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনবোধে তিনি আত্মবলিদানের অঙ্গীকারও করেছেন নাট্যচরিত্র রাও দিনকরের উক্তিতে,

"রাও দিনকর। মা গো, এই ছিল ভাগ্যেতে তোমার !
হা ধর্ম্ম—স্বাধীনতা !
তোমাদের নামে
আজি হ'ল কেন ;ভিচার !
যেই নাম নিলে রসনায়
পুলকেতে প্রাণ ভেসে যায়
মানব হৃদয়
উচ্চ হ'তে উচ্চস্তরে করে আরোহণ,

ওগো মা জনমভূমি !
আজি মনে রেখো তুমি,
তোমার উদ্ধার তরে
অনেক যতন ক'রে না পেয়ে উপায়,
ম্লান রাঙা পায়
এই দেহ দিব বলিদান।" (২।৩গ)

স্বাধীনতা উদ্ধারে রাও দিনকরের জীবনোৎসর্গের যে করুণ আকুতি, তাতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, অমৃতলাল তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের উষ্ণ পটভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কেবলমাত্র দেশের সমস্যাবলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই অমৃতলাল কর্তব্য-কর্ম শেষ করেননি,

দেশ উদ্ধারের প্রকৃত পথও দেখিয়েছিলেন। তিনি অনুধাবন করেন যে বাঙ্গালীর মর্মে মর্মে ধর্মনৈতিক প্রভাব একান্তভাবে জাগ্রত। গিরিশচন্দ্রের ধর্মনৈতিক একাত্মবোধ ও সুরেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মিক মাতৃসাধনা একত্রযোগে তাঁর চিত্তে এক সমন্বয়ী প্রভাব বিস্তার করে। অমৃতলাল সুরেন্দ্রনাথের মত বিশ্বাস করতেন,—"The services of the motherland is the highest form of religion—it is the truest service of God.।"[১] তাই দেশকে জননীর ন্যায় আরাধ্যা ও 'স্বর্গাদপি গরিয়সী' ভেবে তিনিও দেশ মাতৃকার মুক্তি-সংগ্রামে কেবল বৈতালিকের দায়িত্ব পালন না করে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করেন। অমৃতলাল স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক আঙ্গিনাতে আবদ্ধ রাখতে চাননি। পারিবারিক জীবন ও দৈনন্দিন ধর্মাচরণের মধ্যে যদি দেশপ্রেমকে অনুবিদ্ধ করা যায়, তবেই এদেশে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব—এই তত্ত্বে তিনি যেমন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি প্রচারও করেছিলেন গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে। ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবে শুষ্ক রাজনৈতিক বির্তকের পরিবর্তে হৃদয়ধর্মী গৃহকোণ, স্বাচ্ছন্দ্যচিন্তা ও পারিবারিক কল্যাণ ধর্মকেই বেশি পরিমাণে প্রয়োজনীয় ও আচরণীয় বলে মনে করে। ফলে স্বদেশচিন্তাকে পারিবারিক জীবনচর্চার মধ্যে গ্রহণ ও বরণ করতে পারলে দেশে জাতীয় ঐক্য স্থাপন ও রাজনৈতিক সংহতি রচনা সম্ভব। অমৃতলাল 'নবজীবন' নাটকে (১৯০২) নাট্যচরিত্র সুরেন্দ্র ও মহেন্দ্রের কথোপকথনে নিজের অভীপ্সাকে ব্যক্ত করেছেন; এবং এর সঙ্গে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতিনির্ভর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে তিনি যে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না, তাও প্রকাশিত হয়েছে :

"সুরেন্দ্র।...ব্রিটিশ কমিটীর throughতে ইংলণ্ডে agitation এর শেষ ফল কি দাঁড়াবে, সাধারণ প্রজার মধ্যে কজন তার অর্থ বুঝবে? এ সবে mass এর Direct interest কি হয়? 'দেশের হিত দেশের হিত, বলে যে চেঁচাও, কিন্তু সাধারণ লোক—যারা গৃহস্থ গরীব, তোমার ইংরাজী লেখা-পড়া বা মিলের Political Economy কি Adams Wealth-এর ধার ধারে না, তাদের মনে কংগ্রেসের উপকারিতা কি কোরে প্রবেশ করিয়ে

১ A Nation in Making : S, N, Benerjea ; p 184.

দেবে? এ দেশে সাধারণ লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করাবার দুটি পথ আছে;—এক ধর্ম্ম, আর সঙ্গে সঙ্গে একটু পারিবারিক প্রেম। এই যে বছর দুই তিন আগে আমাদের বাঙ্গালীর মেয়েদের মধ্যে একটা সই পাতাবার ধুম উঠেছিল, তার গোড়াটা কি? শুধু ঠাকুর স্বপ্ন দিয়েছেন আর স্বামী পুত্র ভাল থাকবে, এই কথাটা উঠেছে বই তো নয়; দেখ—কে স্বপ্ন দেখলে, কথাটা সত্য কি মিথ্যা—সে তর্কই উঠল না; প্লাকার্ড মারতে হয় নি, হ্যাণ্ডবিল ছাপাতে হয় নি, কেবল দেবতার কথা রক্ষা হবে আর আত্মীয়স্বজন ভাল থাকবে, এই জনরব শুনে হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে স্ত্রীলোক আছে, সবাই আপনা আপনির ভিতর সই পাতিয়ে ফেল্লে। তা এমনি একটা ভাবে বোঝাতে না পাল্লে দেশহিতৈষিতা বা কংগ্রেসের উপকারিতা সাধারণে উপলব্ধি কত্তে পারবে না।

মহেন্দ্র।···সুরেন্দ্রবাবুরও মত যে, রাজনীতিকে ধর্ম্মভাবে প্রচার কত্তে না পাল্লে আমাদের এই Religious East-এ বিশেষ কোন কাজ হবে না।··· দেশহিতৈষিতা যে ধর্ম্মের একটি অঙ্গ, তা আমাদের শাস্ত্রেই তো রয়েছে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' আর একটু ভেবে দেখলে—মা দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী এঁদের ধ্যানের ভিতর ভারতমাতার রূপ কল্পনা বুঝতে পারা যায়।

সুরেন্দ্র। বলছো মন্দ নয়—'নারদাদিমুনির্গণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্' এটি বলার আবশ্যক কি? শুধু Spiritual mother হ'লে নারদাদি যে পূজা করবেন, এটা তো already understood, কিন্তু যখন দেবর্ষিগণও 'রত্নদীপময়দ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে' ভারতমাতাকে পূজা করেছেন, সুতরাং হে মানব! তোমাদের এটি অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য হচ্ছে।··· সাধারণের মনের ভিতর দেশহিতৈষিতা—কংগ্রেসের আবশ্যকতা প্রবেশ করাবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, প্রজাবর্গকে হাতে হাতে ফল দেখান, তাদের কোন নিত্য অভাব পূরণ করা—নিত্য ক্লেশ মোচন করা।···আমার মনে হয়, আপনারা হাতে হাতে উপকার বুঝতে পারে—এমন সব যদি কিছু কাজ কোরে দিতে পারেন, তা হ'লে রেলওয়ে, গ্যাসলাইট, পোস্ট-আফিস ইত্যাদির মত কংগ্রেসের নামটাও একটা Household word—ঘরো কথার মত প্রচলিত হ'তে পারে।" (প্রথম দৃশ্য)

আমরা দেখেছি, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে বাঙ্গলা দেশ ও 'ভারত

সভা'র নেতাদের উপেক্ষা করা হয়েছিল। সংগৃহীত অর্থের বিরাট অংশ যে পরিমাণে বিলাতে রাজনৈতিক কর্মোদ্দেশে ব্যয় করা হয়েছিল; দেশের জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তা সে পরিমাণে হয়েছিল উপেক্ষিত। নাট্যকার অমৃতলাল কংগ্রেসের এই আচরণকে প্রীতির চোখে দেখেননি। আপন মনোভাবনাকে তিনি 'নবজীবন' নাটকে নাট্যচরিত্র স্নরেন্দ্রের মুখে ব্যক্ত করেছেন:

"সুরেন্দ্র। যখন 1885-এ বম্বেতে W. C. Banerjiকে প্রেসিডেণ্ট কোরে কংগ্রেসের সুতিকাপূজা হয়, তখনকার সেই ছেলেখেলার ভাব দেখে কার মনে আশা হয়েছিল যে, এই গরীব ভারত এই দেশহিতের কাজে, যার সঙ্গে বড় বড় রাজা-রাজড়ার বিশেষ সংস্রব নাই, অনেক ইংরাজ মনে মনে Sympathy থাক্‌লেও Intention তার উল্টো মানে হবে মনে করে প্রকাশ্যে মিশতে চায় না, সেই কংগ্রেস এই কটা বছরের মধ্যে দেশহিতব্রতে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলতে পার্‌বে? আমাদের সুরেন্দ্রবাবুর এখনও যা Energy আছে, পশ্চিমে পাঞ্জাবে বম্বে মান্দ্রাজে—why আমাদের নিজেদের বাঙ্গালা দেশেও যে সব ভারতমাতার সুসন্তান এ কার্য্যে উদ্যোগী আছেন, তাঁরা মনে কল্লে এমন সৎ-কার্য্যের জন্য টাকা উঠতে কদিন লাগে? Besides that to tell you the truth, তোমাদের এই ব্রিটিশ কমিটীর জন্য বিলাতে যে রকম লম্বা টাকাটা পাঠাতে হয়, সেটা আমার চোখে একটু বাজে খরচ বাজে খরচ মনে হয়। Return টা যেন তার তুলনায় কিছুই নয়।......বৎসর বৎসর ব্রিটিশ কমিটির নামে ইংলণ্ডে যে টাকাটা যায়, সেটা ইংলণ্ডের খাতায় ইণ্ডিয়া জমীদারীর একটা বাজে আদায় ব'লে জমা হয়। এই Voluntry Contribution এর অর্দ্ধেকটা বাঁচাতে পাল্লে দেশীয় প্রজার অনেক প্রত্যক্ষ উপকার করা যেতে পারে।" (প্রথম দৃশ্য)

অমৃতলাল 'নবজীবন' নাটককে, 'মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ নাট্যলীলা' বলে অভিহিত করেছেন। ইংরেজ বিরোধিতার কোন চিত্র বা বাক্য সংলাপ এই নাটকে সংযোজিত না হলেও, নাট্যকার রূপকের অন্তরালে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর দুর্দশার কথা নাট্যচরিত্র ধনদেবী লক্ষ্মীর মুখে প্রচার করেছেন। মনে হয়, 'নবজীবন' নাটক 'হিন্দুমেলা'র জাতীয়তাবাদী আদর্শে রচিত। বিশেষভাবে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যমাস্ক 'ভারত-মাতা'র প্রভাব 'নবজীবন' নাটকের উপর গভীরভাবে প্রতিফলিত।

ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর বেদনাবিধুর বাক্যাংশে যে পৌরাণিক চিন্তা, 'হিন্দুমেলা'য় প্রদত্ত ভাষণগুলির সঙ্গে তার নিবিড় সাদৃশ্য আছে। অবশ্য এর সঙ্গে নাট্যকারের তৎকালীন রাজনৈতিক ভাবনা স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত হয়েছে। অমৃতলাল 'নবজীবনে'র নান্দীমুখে সত্যেন্দ্রনাথের, 'মিলে সব ভারত-সন্তান, একতান মন-প্রাণ,' সঙ্গীতটি স্থাপন করেছেন।

রূপকচরিত্র 'ভারতলক্ষ্মী'র মুখের খেদোক্তি গীতে নাট্যকার স্বাস্থ্যহীন, উদ্যমহীন, আত্মরতি-তৃপ্ত ভারতবাসীর অসাড় জীবনচিত্রটি এঁকেছেন,

"ভারতলক্ষ্মী। নিরখিব কত দিন বল এই অলক্ষণ।
যাতনা স্বপনে সনে ঘুম-ঘোরে অচেতন॥
ত্যজিয়ে পুরুষকার, কপালে সকল ভার,
সন্তোষের শবে কর অলসে সব আলিঙ্গন।
আমি লক্ষ্মী বিষ্ণুজায়া, যুগ-যুগান্তরের মায়া,
(তাই) দে'খে তোদের শীর্ণকায়া
হায়াতে করি রোদন॥
মনেরে না দিয়ে ফাঁকি, এখনও মেলিনি আঁখি,
ভারতে পার তো বাছা পরাতে ভূষণ।
তোদের মা ছিল যে ধরার রাণী
আজ কেন তা বিস্মরণ॥

আহা, বিফল ব্যাকুল হয়ে আমার ভ্রমণ, বিফল আকুল হয়ে দ্বারে দ্বারে রোদন, সহস্র সহস্র বৎসরের হীনতায় ভারতসন্তানগণের প্রাণ অসাড় হয়ে গেছে। বহুদিন হৃদযে বহন কোরে বেদনার যাতনা অনুভবশক্তি পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে।......কিন্তু আর থাকৃতে পাচ্ছিনে, দিদির ছেলেরা আবার দেখছি ক্রমে মাকে ভুলে গেছে। যাঁর গর্ভে একদিন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্যাদি ঋষি জন্মেছিলেন, বেদব্যাস, বাল্মীকি যাঁকে একদিন 'মা' বলে ডেকেছেন, ভীষ্ম, কর্ণ, ভীমার্জ্জুন যাঁর ধর্ম্মগৌরব রক্ষার জন্য দেহপাত ক'রেছেন, আজ তাঁর কি দশা! যাঁর কোলে রাম—রাজা, লক্ষণ—ভাই, সীতা—স্ত্রী, দ্রৌপদী—রাণী, যশোদা—জননী! পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে যাঁর পুণ্যক্ষেত্রে লীলা কোরে গেছেন,—সেই ভারতের পবিত্র অঙ্ক আজ শশাঙ্ক বিহীন আকাশের ন্যায় কালিমা ঢালা; কালের করাল মেঘ, দুটা একটা নক্ষত্রও যা ছিল, তাও ঢেকে ফেলেছে। বাপ্পা নাই, বালক বাদল নাই,

প্রতাপ নাই, প্রতাপাদিত্য নাই……এখন কোথায় গেল ? সেই কালিদাস ভবভূতি, খনা, মিহির, লীলাবতী, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দ, মধু !"

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

অপর একটি চিত্রে একই সত্য উদ্‌ঘাটিত। নাট্যকার জাতীয় জীবনের দুর্দশার যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্বদেশ ও স্বসমাজ সম্পর্কে অনবহিতার কথাই প্রস্ফুটিত হয়েছে। সমাজের নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে ভারতলক্ষ্মীর যে কথোপকথন, তাতে অমৃতলাল জাতির সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বার্থপরতার পরিচয়টি তুলে ধরেছেন। কেরাণী, কুলবধূ, উকিল, ডাক্তার ও সভাপতি সকলেই স্বার্থপর ও গভীরভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নাট্যকার তাঁর স্বভাবসুলভ প্রহসনের অবতারণাতে, জনগণের দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ-চিন্তার গভীর স্তরে যে বিরাট ফাঁক রয়েছে, তাকেই চোখের সামনে তুলে ধরেছেন :

"লক্ষ্মী। বাছা ! পয়সা চাইনে, আমায় একটা অন্য ভিক্ষা দে।

যদু। হাঁ বাছা ! তোমার সাজগোজ দেখছি, বড মানুষের মেয়ে বোলে বোধ হয়, তোমার আবার ভিক্ষা করা কেন ?

লক্ষ্মী। ও বাছা ! পয়সা-কড়ি চাইনে, আমার এই ভিক্ষে—যে, তোমরা একটু মানুষ হও।

মধু। এই রে, খৃষ্টানী—না ব্রাহ্মী ; অন্ধকার থেকে আলোয় আনছেন !

লক্ষ্মী। হ্যাঁ রে বাছা, চিন্‌তে পাল্লিনে, কেবল বুঝি রেকের ভিতর ধান পুরে পুরুতের উপর একটা পূজোর বরাত দিস্, আমার গোলোকের রূপ কখনও ধ্যানেও আনিস্ নে ?

শ্যাম। ও মা, তুমিই লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী। হাঁ বাবা ! একবার আলস্য ত্যাগ কোরে মায়ের দশা ভাব।

যদু। ওঃ, বুঝেছি, বুঝেছি,—ওই ভারতমাতার কাহিনী গাইবে রে ;. ও মা লক্ষ্মী ! এই আজ পৌষ মাসের পাওনা, তোমায় যা হোক্ শশা কলা দেওয়া গেল, আবার সেই চৈত্র মাসে দেখা-শুনা হবে ; এখন মা আমাদের ছেড়ে দাও, ভাত খাই ঃকাঁসি বাজাই—অত ভারতের ধার ধারিনে !……মা, ভয় নেই, ভয় নেই, এই পেন্সনটা নিই, তার পর ভারতের জন্য কত লাগ্‌বো—দেখো !" (দ্বিতীয় দৃশ্য)

আবার, দেশপ্রেম প্রচারের মধ্যে স্বার্থপরতা, ব্যক্তিপ্রচার ও আতিশয্য আপাত দেশনেতাদের মধ্যে কেমন দানা বেঁধে উঠেছিল, তাঁর কৌতুকপূর্ণ চিত্রও অমৃতলাল এঁকেছেন নাট্যচরিত্র সভাপতির সংলাপে :

"সভাপতি। Resolution—resolution! I say ভারতমাতা, আমার কাছে তোমার বিশেষ oblige হয়ে থাকা উচিত, আমিই বলেছি resolution ভিন্ন তোমার আর গতি নেই।……ভাবিনে? জাপানে লোক পাঠাতে হবে—দেশালাই তোয়েরি শিখতে। কামস্কাটকায় পাঠাতে হবে—ষ্টকিং বুনতে, নিউজিল্যাণ্ডে কমোড তোয়েরি কত্তে···দেশের লোকের কোন বিবেচনা নেই, আদবে patriotism নেই। ভাব দেখি, দেশের জন্য আমি এতটা কচ্ছি, কাগজে লিখে বন্ধু বাউরাকে একটা মেম্বর কোরে দিলুম, কিন্তু আমার—রাজা সদানন্দের পুরনো ধার পাঁচ হাজার টাকা, সেটা শোধবার উপায় করে দিলে না? Ungrateful world in human Mankind! Unpatriotic India" (দ্বিতীয় দৃশ্য)

শব-শীতল বলহীন বাঙ্গালীর দুর্গতি এবং আপন দেশ ও জাতি সম্পর্কে উদাসীনতা দেখে নাট্যকার গভীর বেদনায় ব্যথিত হয়েছেন। ভারতমাতার খেদোক্তিতে অমৃতলালের ব্যক্তিগত চিত্তের যত্ননিরুদ্ধ অশ্রুজল অঝোরে ঝরে পড়েছে। সমস্ত দেশবাসী যাতে চৈতন্য-বোধিতে উদ্দীপিত হয়, তারই একনিষ্ঠ প্রয়াস তিনি চালিয়েছেন :

"ভারতমাতা। উঠ উঠ রে যাদুমণি আর কেন চালিয়ে কায়।
দেখিয়ে তোদের দশা এ হৃদি বিদরে হায়॥
মোহে ভাবিস্ আছিস্ সুখে,
শেল বিঁধে যে আমার বুকে,
দেখে শ্মশান হাসি তোদের মুখে,
আঁখি জলে ভেসে যায়।
যে শিরে মুকুট প'রে ছিলাম ধরার দণ্ড ধ'রে,
আমার ভালে কালে কালে
সে মাথা লোটে ধরায়।
ছিলাম ধনধান্যে ভরা, পূজা দিত বসুন্ধরা,
দুঃখ আর যায় না ধরা,
সে ভারত আজ ভিক্ষা চায়।

হাত পেতে যার খেতো সবাই,
জল খেয়ে সে ক্ষুধা মিটায় ॥

এ কি দীর্ঘ পরমায়ু!—কেন এতকাল বাঁচলুম? এই চোখের উপর কত অভ্যুদয়, কত বিলয় দেখলুম, কত রাজ্য সাম্রাজ্য হলো—গেল, পুরাণে নাম আছে, কিন্তু ধামের চিহ্ন নাই। আর আমার কোন অন্ত হলো না? আরব গেল, মিশর গেল, রোম গেল, গ্রীস গেল, আমার কাছে ধন নিলে, জ্ঞান নিলে, বসন নিলে, ভূষণ নিলে, জগৎকে দুদিন উজ্জলরূপের লাবণ্য দেখিয়ে মোহিত কল্লে, শক্তি গেল—সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হলো। আমার জীবন প্রদীপে তৈল ফুরিয়ে গেছে, তবু আলো মিটমিট করে কেন? এ তো জীবন নয়—বিকার, আলো নয়—আলেয়া! আহা, বাছারা আমার বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। স্থবিরার সন্তান, তাই অত দুর্ব্বল!...আহা! বাছারা আর কতদিন ঘুমুবে? উঠ—জাগো, একবার তোমাদের দুঃখিনী মা'র পানে চাও—উঠ বাছা!

জাগো রে জাগো রে ওরে প্রিয়তম পুত্রগণ!
কোথা তোদের বলবীর্য্য কোথা সে উন্নত মন ॥
তোদেরি পুরাণ গাথা, সিংহপৃষ্ঠে দুর্গামাতা,
দশভুজে দশদিকে করেন শাসন।
তোমাদের ব্যাসকবি, এঁকেছিল বীর-ছবি,
মুক্তবেণী যাজ্ঞসেনী শুধু ভারতে গঠন ॥
তোদেরি প্রতাপ রাণা, ভীম রণে দিয়ে হানা,
গিরি বনে ক্ষুণ্ণ মনে করেছিল দিনযাপন।

... ...

হাঁ রে! পূর্ব্বকথা যেন ভুলে গিয়েছিস্, অবিদ্যার মোহে যেন জীবন্তে শব হয়েছিস,...ধিক্ ধিক্—কি বল্‌বো!—তোদেরও ধিক্, আমার কপালেও ধিক্! আর বই খুলিস্‌নে, কাগজে কলমে এক করিস্‌নে, বক্তৃতায় শক্তির ব্যাখ্যা করিস্‌নে।" (তৃতীয় দৃশ্য)

সুপ্তোত্থিত ভারত সন্তানের উক্তির মধ্যে নাট্যকার দেশবাসীর চারিত্রিক অধঃপতনের রূপটি আরও সুপরিস্ফুট করেছেন। তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এখানে যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি হৃদয়ভেদী :

"১ম ভা স। (জাগরিত হইয়া) কে গা!—কানের কাছে কে কাঁদে? একটু ঘুমুচ্ছিলুম—তাতে কে ব্যাঘাত করে?'

ভারতমাতা। ও বাছা, আমি তোদের মা—চিন্‌তে পাচ্ছিস্‌নে?

১ম ভা-স। চিনিছি, চিনিছি, মা—তুমি? কিন্তু এখন একটু ঘুমুতে দাও।

২য় ভা-স। (জাগিয়া) হ্যাঁ মা, এখন ডেকো না, তোমার দুঃখ ঘোচাব বই কি! যখন মা বলেছি, তখন ভয় কি? একটু অপেক্ষা কর, সময়ে সব হবে।

৩য় ভা-স।……এখন উপার্জ্জন বৃদ্ধির চেষ্টায় ঘুরতে হচ্ছে, এখন তোমার দিকে মন দিতে গেলে চল্‌বে কেন?……

৪র্থ ভা-স। কি কানের কাছে বকাবকি কচ্ছো?—একটু শোও না হে, কুড়ের মত ব'সে থাকার চেয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া ভাল নয়? ··

৫ম ভা-স। কি মা, তুমি কাঁদ্‌বে না?—অবশ্য কাঁদ্‌বে—অশ্রুজলে জল স্থল টলমল কোরে দেবে, এই বিপুল বিশ্ব রোদনানলে ভস্ম· কোরে ফেল্‌বে! আমরা তোমার ধীর বীর স্থির অশ্রুনীরে অধীর সন্তান থাক্‌তে, তোমার ভাবনা? কে পারে? জীবন থাক্‌তে, হৃদয় থাক্‌তে, প্রাণ থাক্‌তে, আত্মা থাক্‌তে জননীস্বরূপিনী জন্মভূমির যাতনা কে সহ্য কত্তে পারে? I promise and announce it to this wide world that when I get little leisure after my days work, evening's entertainments, nights sleep and wife's admonition—that sweet sacred and certain curtain-lecture, I will spend the last drop of my blood left by the musical mosquitto for my Mother Country; but permit me now for a while to be wrapped in the embrace of Mother morphius.

৬ষ্ঠ ভা-স। ধিক্ ভীরু! বল্‌তে বল্‌তে ঘুমিয়ে পড়লি—সোডাওয়াটার কুলাধম? জাগো—জাগো ভ্রাতৃগণ! 'ভীষ্ম, দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ'? 'একতান মন প্রাণ'—গ্যারিবল্ডি—ওয়ালেস—ব্রুস—অসভ্য জাপান—ভাল কথা, সেজবৌ কোথা গেল? একটা পান দাও না। সং এলে আমায় ডেকো, আমি এখন একটু শুই।" (তৃতীয় দৃশ্য)

পরিশেষে, নাট্যকার ইংরেজ রাজানুগত্য প্রচার করেছেন। 'নবজীবন'

নাটিকাটি স্বদেশী আন্দোলনের কয়েক বছর আগের রচনা; তাই শাসকশ্রেণীর প্রতি প্রকাশ্য কোন বিদ্বেষ এতে নেই। তাছাড়া তিনি সংগঠননীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলে, পলিটিক্যাল ইউনিটির চেয়ে, সোশ্যাল ইউনিটির মধ্যে দেশবাসীর চিত্তের প্রকৃত পরিবর্তন চেয়েছিলেন। অমৃতলাল তাঁর সামাজিক নাটকে একাধিকবার একথা একনিষ্ঠভাবে প্রচার করেছেন। তিনি রাজনৈতিক চিন্তাদর্শে সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী ছিলেন; সুতরাং তাঁর নাটকে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে মাতৃপূজার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ ও আবেদন-নিবেদন নীতিতে আস্থা যে থাকবে তা খুবই স্বাভাবিক। অমৃতলাল রাজভক্তির শান্তিবারি নিক্ষেপ করে ভারতমাতার চিত্তের দুঃখবহ্নি ও শোকাশ্রুর আবেগ প্রশমিত করেছেন:

"৭ম ভা-স। মা গো ভারত-জননি! শোন মা! ইংলণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁর বিদ্যমানে, তাঁর উদারচেতা উন্নতমনা বীর সন্তানগণের সংস্রবে এনে আমাদের এই নির্ব্বাণোন্মুখ মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন দান করেছেন, জীবনদীপে আবার জাতীয় তেজ সঞ্চার কচ্ছেন, তাঁরই স্বাধীন শিক্ষায় তাঁর সমক্ষেই আমরা জাতীয় অধিকার ভিক্ষা কত্তে শিখেছি, এখনও আমাদের অনেক ত্রুটি আছে—অনেক শিক্ষা কত্তে বাকী আছে।...... তোমার উর্ব্বর মৃত্তিকা আর ইংলণ্ডের বারিসিঞ্চন বিফলে যাবে না। পুণ্য-শ্লোক ভিক্টোরিয়ার সুপুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড আজ সিংহাসনে, সাধুহৃদয় লর্ড কর্জ্জন আজ আমাদের জাতীয় জীবন-তরীর কর্ণধার, মহামতি উডবরণের হাতে বঙ্গের পরিচালনভার;......বঙ্গে বিদ্যাসাগর, হরিশ, গিরিশ, কৃষ্ণদাস, রামগোপাল, রাজেন্দ্রলাল আদি গেছেন বটে, কিন্তু এখনও শিশির আছে, রমেশ আছে, আনন্দমোহন আছে, সুরেন্দ্রনাথ আছে; গুপ্তভাবে আরও অনেক স্থলে অনেক সুধী জন আছেন: তোমার পূজার জন্য জীবন-বলিদানও তাঁরা তুচ্ছ করেন। আশীর্ব্বাদ কর মা—তাঁরা যেন দীর্ঘজীবী হন, তাঁদের প্রাণের এই উৎসাহ, এই উত্তেজনা, এই মাতৃভক্তি যেন প্রদীপ্ত থাকে; তা হ'লে এই ইংরাজ-রাজ্যে আবার তোমার মুখ উজ্জ্বল দেখবো, আবার সকলে একমনে একতানে বঙ্কিমের সেই মধুর গাথা 'বন্দেমাতরম্' গাইবো।"

(তৃতীয় দৃশ্য)

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনে নাট্যকার অমৃতলাল প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন। একথা জেনেছি যে, তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের

অধ্যাত্মবাদী মাতৃসাধনার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে অমৃতলালের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রাজনৈতিক বক্তা হিসাবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময়ে তিনি বাউল সুরে একটি স্বাদেশিক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর গীতে জাতির তৎকালীন মানসিক আকাশের পরিমণ্ডল ও পরিবেশ এবং অনমনীয় চেতনা আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। সঙ্গীতটি নিম্নরূপ,

"ওরা জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান।
আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক সঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ ॥
আমরা জাত বাঙ্গালী প্রেম কাঙ্গালী
ভাবচিস্ তোরা মন ভাঙ্গালি,
তা নয়, জ্বালিয়ে আগুন করে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান।
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে,
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়তে,
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি চাইনে তোদের লবণ-দান।
আমাদের ভাতের সঙ্গে তাঁত বজায় থাক,
নাই বা দেখাই সাজের জাঁক,
তোদের ঐ চকচকান মধুর চাকে করবো না আর বিস পান।
তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি,
ফেলবো ভেঙ্গে মেরে তুড়ি,
ক'রে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী শাঁখার আবার রাখবে মান।
তোদের শাপে হ'ল আশীর্বাদ
দৃঢ় হ'ল মনের বাঁধ,
এই বিসংবাদে বঙ্গভেদে আমরা হলুম আবার তেজীয়ান।
পেয়ে মর্মে আঘাত, কর্মে হাত বাকি্য ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান।"[২]

স্বদেশী আন্দোলনের সময় অমৃতলাল, নাটক ছাড়া কবিতাতেও রঙ্গ-রসের অবতারণা করে ইংরেজ সরকারের অপশাসন রূপটি তুলে ধরেন। নাট্যকারের অকৃত্রিম দেশপ্রীতি ও তার সঙ্গে বিদেশী শাসকদের প্রতি চিত্তের অসহিষ্ণুতার জ্বালা, দুই-ই প্রহসনের অন্তরালে অভিব্যক্ত হয়েছে। কবিতাটির নাম, 'প্রোক্লামেশন্' (১৩১২)।

২ সাহিত্যসাধক চরিতমালা: অমৃতলাল বসু ৪৩। রচনাকাল ১৯০৫।

"বিনয়ে শুধাও গিয়া সিংহাসন তলে।
মহাসভা-সভ্য সেই ইংরাজের দলে॥
প্রথমে বলেন রাণী যে-সব বচন।
সম্রাজ্ঞী রূপেতে পরে করান স্মরণ॥
সু-পুত্র সম্রাট হ'য়ে দিয়াছেন রায়।
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রহিবে বজায়॥
সেই সব বচনের প্রকৃত কি অর্থ।
হ'বে কি রক্ষিত তাহা কখনো যথার্থ॥
মেনে লব রাজ-বাক্য জ্ঞান করি বেদ।
শ্বেত কৃষ্ণে কিছুমাত্র রবে না প্রভেদ॥
বাজার গরম এই চাকরীর হাটে।
কোরা কালো ব'সে যাবে ধলো গোরা-পাটে॥
করিয়া গোরার কাজ কালোর বেতন।
হ'বে কি কখনো ঠিক গোরার মতন॥
মিষ্টার ফুলার যদি বধে কেষ্টা কুলি।
সত্য কি মরিবে গোরা ফাঁসী-কাষ্টে ঝুলি॥
কেষ্টার ঘুষির বৃষ্টি নাশিলে ফুলার।
হ'বে কি সিদ্ধান্ত পিলে ফেটেছিল তার॥
জিজ্ঞাসা করিও ভাল ক'রে কসামাজা।
ইংরাজ-বণিক ছাড়া আর কে কে রাজা॥
মাঞ্চেষ্টার যদি হয় কেষ্টারে বিরূপ।
ভূপের ব্যবস্থা তাতে হইবে কিরূপ।
মরে যদি কেষ্টা তাঁতি ক'রে কুলিগিরি।
তার পুত্র সূত্র-কর্ম্ম পাবে কি গো ফিরি॥
দুর্ভিক্ষ যদ্যপি দেশে ব্যাড়ে ব্যাড়াজাল।
তবু কি রপ্তানি বন্ধ হবে কভু চাল॥
অতি কচি ছেলেদের লুটিতে পকেট।
কতদিনে হ'বে বন্ধ আসা সিগারেট॥
কেবল পকেট নয় ইঁচড়ে বখাট।
দোকানে কোকেন চলে শীঘ্র আনে খাট॥

মরিলে কলুর কলু কেরোশিন তেলে।
কলুনীর চুলো কি গো রাজা দেবে জেলে॥
কখনো দেবে না হাত ধর্ম্মেতে প্রজার।
এ কেমন কথা শুনি মুখেতে রাজার॥
অত্যাচার করিবে না যদি অর্থ হয়।
জিজ্ঞাসিও সে কথা কি বেশী অতিশয়॥
'ডিফেন্ডার অফ্ দি ফেথ্' যাহার উপাধি।
কোন্ লাজে সে হইবে ধর্ম্মেতে বিবাদী॥
খৃষ্টানের মত পার্শী হিন্দু-মুসলমান।
পাবে কি রাজার দ্বারে টান দান মান॥
ব্রহ্মহত্যা হয় যদি চীনের ক্যাণ্টনে।
যাবে কি শাসিতে চীনে গোরার পল্টনে॥
জাতি ধর্ম্ম বর্ণ ভেদ না করি বিচার।
বিদ্যার কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার॥
বহুদিন হ'তে মনে আছে এক ধাঁধাঁ।
এ কথাটি কে কাহারে বলিতেছে দাদা॥
ইংরাজ জাতির ভাব,—ভূ-পালের ভাষ।
অমৃত-সমান কথা শুনে হিন্দু-দাস॥
এ বর্ণের অর্থ কি গো নহে চতুর্বর্ণ।
যাদের পৈতৃক সত্বে নাহি দিবে কর্ণ॥
'কাষ্ট্, ক্রিড্, কলারের' এইরূপ মানে।
এক বোকা করিয়াছে খামকা এখানে॥
মহা সভা সভ্যদলে বোলো ভাল করে।
বোকার বোকাত্ব যেন কার্য্যে দেন ধরে॥
আরো নানা কথা আছে সেই ঘোষণায়।
তন্নতন্ন মানে বুঝে এস সমুদায়॥
তাৎপর্য্যটি একবার হয়ে গেলে ধার্য্য।
কোন কার্য্যে ভবিষ্যতে হ'বে না আশ্চর্য্য॥
'রাইট্ রাইট্' বলে না ক'রে চিৎকার।
মর্ম্মে মর্ম্মে কৃষ্ণচর্ম্মে দানিব ধিৎকার॥

হিন্দুর চক্ষেতে রাজা দেব-শক্তি-ময়।
মারো কাটো ভালবাস তবু গাব জয় ॥"[৩]

অমৃতলাল হাসির গানেও পারদর্শিতা দেখান। ইংরেজি শিক্ষা দেশের একশ্রেণীর মানুষকে কিভাবে হতচেতন করেছে, তাতে তিনি নিক্ষেপ করেছেন তির্যক কটাক্ষ। ইংরেজ সরকার দেশের মধ্যে অপসংস্কৃতি প্রচারে আগ্রহী ছিলেন। এর ফলে ফিরিঙ্গিয়ানার উৎকট আতিশয্য দেশের যুবকদের উন্মার্গগামী করে তোলে। অমৃতলাল হাসির গানের ফোয়ারা ছুটিয়ে তাদের চিত্তবৃত্তিকে সংস্কার করতে প্রয়াসী হন :

"একশ' বছর সমান টানে
মাতাল ছিলেম মদ্যপানে
বিলিতি বোতলে পোরা
গোরার চোলাই করা সে সুরা, নাম তার এডুকেশন্।
সঙ্গে সঙ্গে ছিল চাট্
পেনট্ কোট টাই সাট
উঠিয়ে দিয়ে পূজা-পাঠ
ইংরিজি ঠাট, ইংরিজি নাট, ইংরিজি ফ্যাসান্।
... ...
সে মদের নেশার ঝোঁকে
ধরা সরা দেখতেম চোখে
ভাবতেম যত ছোট লোকে
মরে বোকে পড়ে ড্যাম্ রামায়ণ ;
সংস্কৃত পড়তেন ম্যাক্সমূলার
নইলে কে এমন ফুল আর
(যখন) ইংরেজ আমাদের রুলার
তখন ভার্নাকিউলার্ তো ভাদ্র-বৌয়ের মতন।
... ...
... ...
(হায়) দু'দণ্ডের মদানন্দ
ঝাল্ ঝাল্ চাটে পেঁজের গন্ধ

৩ অমৃত-গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) : বসুমতী সংস্করণ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

কেন আমাদের করলে অন্ধ
(এখন) ঘরের দরজা সকল বন্ধ
সন্ধ করে মন্দ বলে বন্দনা যার করি।"

পরিশেষে নাট্যকার, মানুষের শুভবুদ্ধিতে একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করে আত্মজ্ঞানের প্রসার ও উন্মেষের কথা ব্যক্ত করেছেন,

"(আর) বসবো না গো রাজার বাড়ী পাত পেতে।
ভোজের ওই এঁটো খেতে গজিয়ে গেল—
কাঁটাগাছ নিজের ক্ষেতে।" ('ঘোয়াড়ী')

স্বদেশী আন্দোলনের উষ্ণ পটভূমিতে অমৃতলাল 'সাবাস বাঙ্গালী' (১৯০৬) রচনা করেন। এই ক্ষুদ্র নাটকটি সম্পূর্ণভাবে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ব্যাপার নিয়ে লেখা হয়েছিল। দেশের মানুষের রাজনৈতিক চেতনা এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী জিনিসের প্রতি গভীর আকর্ষণ, 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে'র সময়ে কিরকম উত্তালমুখর হয়েছিল, নাট্যকার তাই দেখিয়েছেন। বাঙ্গালী যুবকদের মন ও ধ্যান স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অন্তর্মুখী হয়েছিল। বিদেশী শাসকদের দাসত্ব অস্বীকার করে এবং ইংরেজদের পরিচালিত কেরাণীবৃত্তি শিক্ষা পরিত্যাগ করে, দেশীয় শিল্পচর্চা ও বাণিজ্য অনুশীলনের প্রয়াস একদল স্বাবলম্বনাভিলাষী স্বাধীনতাকামী যুবকের মধ্যে প্রত্যয়নিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। নাট্যকার অমৃতলালের স্বাদেশিকচিত্ত, তৎকালে বিভিন্ন পত্রিকাতে স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের প্রতি যে আহ্বান এবং দিকে দিকে স্বদেশী মেলা ও ভাণ্ডার স্থাপনের মধ্যে বাঙ্গালীকে আত্মসচেতন ও স্বনির্ভর করে তোলবার যে সক্রিয় প্রযাস দেখা দিয়েছিল ; তার সঙ্গে নিবিড় আত্মীযতা অনুভব করে। তাঁর এই মানস নৈকট্যের ফসল, 'সাবাস বাঙ্গালী'। অমৃতলাল নিজেও অন্তরের গভীর প্রদেশে এক অশান্ত ঘূর্ণিবাত্যার আলোড়ন অনুভব করেছিলেন বলেই, তিনি এই ক্ষুদ্র নাটকে নিজমনের ভাব-ভাবনাকে জ্যা-মুক্ত তীরের মত স্থির লক্ষ্যের দিকে নিক্ষেপ করে, দেশবাসীর সুপ্ত অন্তরাত্মাকে বিদ্ধ করেছেন। নাট্যচরিত্র মতিলাল যেন নাট্যকার অমৃতলাল নিজেই। মতিলাল, পিতা অঘোর নাথকে বলেছেন,

"মতিলাল।……কেন ভাবছেন ? না হয় আমি দেশের জন্য দু'মাস জেল খাটলুমই বা।…ছেড়ে দাও বাবা চাকরী। আমাদের সুরবংশ কত

বড বংশ! আর সেই বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে তুমি কিনা একটা দরজীর দোকানে গোলামী কর্‌ছো!……কেন আপনি চাকরী করেছিলেন? কেন ঠাকুরদাদা মহাশয়ের ঘোটনা-পাড়ার ভিটে ছেড়ে, সেখানকার চাষ-বাস উঠিযে দিয়ে কল্‌কাতায় এসেছিলেন? ঠাকুরমার মুখেও গল্প শুনেছি যে, আমাদের দেশের বাড়ীতে কত সুখ ছিল, কত লোক অন্ন খেয়ে যেতো, কত পালপার্ব্বণ হতো; আর এই কল্‌কাতায় ইংরিজী পোড়ে, দাসত্ব করতে শিখেই বা আমরা কত সুখেই আছি?……আপনি তো জানেন যে, ছেলেবেলা থেকে আমি একটু হাতের কাজ কর্‌তে পারি, ……আমি উকিলী একজামিন দেব না। যাতে ভায়ে ভায়ে, দেশের লোকে লোকে ঝগড়া বাড়ান যায়, সে ব্যবসা আমি কর্‌বো না। আমার ইচ্ছে হয়েছে, বিজ্ঞান শিখে শিল্পের উন্নতি কর্‌বো। আমি শেলাইদার ঠাকুরদের এষ্টেটের ম্যানেজার বামাচরণবাবুর তাঁত দেখেছি, শ-বাজারের অনুকূল মল্লিক যে নূতন তাঁত করেছেন, তাও দেখেছি, আর আপনার বন্ধু জহর কাকার তোয়েরী ভাল তাঁত দেখেছি; এইসব দেখে শুনে আমার মাথায় এমন সব তাঁতের চরকার আইডিয়া এসেছে যে, তা কর্‌তে পার্‌লে বিলিতী সেলাই কলের মত আমাদের মেয়েরা ঘরে ঘরে কার্পেট বোনা ছেড়ে বাড়ীর ব্যবহার্য্য কাপড় তোয়েরী কর্‌তে পার্‌বে, আর ঘরে ঘরে সুতো তোয়ের হবে।" (তৃতীয় দৃশ্য)

অমৃতলাল দেশসেবাকে যে মাতৃসেবা বলে মনে করেছিলেন, তার কথা নাট্যচরিত্র নরেনের মুখে প্রকাশ করেছেন,

"নরেন।……সকল কর্ত্তব্যের আগে কর্ত্তব্য মাতৃ-সেবা করা, আমরা আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির সেবা কর্‌ছি।" (তৃতীয় দৃশ্য)

অপর চরিত্র মতিলালও, অনুরূপভাবে নাট্যকারের ব্যক্তিচিন্তাকে বাণীরূপ দিয়েছেন,

"মতিলাল। বঙ্গমাতারও এখন……সঙ্কটাপন্ন পীড়ার অবস্থা; এখন আমার পড়া যাক, কর্ম্ম যাক, ভবিষ্যতের ভাবনা যাক, প্রাণপাত কোরে মায়ের সেবা করি, মাকে আরাম করি, মাকে বাঁচিযে তুলি।" (তৃতীয় দৃশ্য)

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী যুবকেরা দেশী কাপড় ও অন্যান্য দেশী শিল্প-সামগ্রী নিয়ে গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে ফেরী করে বেড়াত। দেশবাসী যাতে দেশীয় দ্রব্য-সামগ্রীর উপর আসক্ত হয়ে ক্রয় করে,

তার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়েছিলেন বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়। অমৃতলাল তাঁদের স্বাদেশিক কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে একশ্রেণীর শিক্ষিত জনগণের বিলাতী দ্রব্যের প্রতি মোহাসক্তির চিত্রও এঁকেছেন। ছবিটি নিম্নরূপ,

"মতিলাল। (মিসেস গুপ্তাকে) মা! আপনাকে যে আমাদের বাঙ্গালী দেখছি, আপনি এখানে? আপনি এই ইংরেজের দোকানে বিলাতী জিনিস কিনতে এয়েছেন?......মা, আমরা কলেজে যাই; কিন্তু বুঝেছি—যে কলেজে প'ড়ে, একজামিন পাশ কোরে, অর্থোপার্জ্জন করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমরা ছাত্র; কিন্তু ছাত্র হলেও মনুষ্য এবং এই বঙ্গমাতার সন্তান। মনুষ্যত্বের এবং মাতৃপূজারও একটি কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আছে। তাই আমাদের কতকটা অবসর-সময় আমোদ, ক্রীড়া বা আলস্যে না দিয়ে, মায়ের পূজায় ক্ষেপণ করতে প্রতিজ্ঞা কোরে ব্রত গ্রহণ করেছি।...মা! আপনার পায়ে পড়ি, বাঙ্গালায় কথা কোন আমাদের সঙ্গে; মাগো! আমাদের গর্ভধারিণীর স্তন্য-ক্ষীরের সঙ্গে যে ভাষা আমরা বলতে বুঝতে শিখেছি—আপনি মা সেই ভাষায় কথা কোন।......

মিসেস গুপ্তা। কেন আপনারা আমাকে বাধা দিচ্ছেন? আপনারা কলেজে পোড়ছেন, জানেন—যে প্রতি মনুষ্যেরই স্বাধীন ইচ্ছা চালনার ক্ষমতা আছে। আমার যা ইচ্ছা, আমার যা আবশ্যক, সেইমত আমি দ্রব্য সংগ্রহ করবো, তাতে কাহারও বাধা দেবার অধিকার নেই।

১ম ছাত্র। মা, মা, আপনি আমাদের গুরু-পত্নী! আপনাতে আর আমাদের গর্ভধারিণীতে কোন পার্থক্য নাই; আপনার সঙ্গে তর্ক করবার অধিকারও আমাদের নাই। তবে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, দেশীয় শিল্পের উন্নতির পক্ষে প্রাণপণে সাহায্য করবো,...আপনি মা, জননী, গুরুপত্নী, দেশের আদর্শরূপিণী! আপনাকে আর অধিক কিছু বলতে পারি না;...এসো ভাই সকল, এসো—এই দোকানের সামনে আমরা শুয়ে পড়ি, মা আমাদের ঐ বিলাতী জিনিস নিয়ে আমাদের বুকের ওপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে চোলে যান! মা'র সঙ্গে আমরা জোর করতে পারিনে, মা'র কাজে আমরা বাধা দিতে পারিনে, কিন্তু মা'র পায়ে রক্ত দিতে—প্রাণ দিতে তো পারি।...

মিসেস গুপ্তা। বাবা, বাবা, ওঠ, ওঠ, বাবারা আমার, ছেলেরা আমার, ওঠ। উঃ! তোদের প্রাণে দেশের জন্যে এমন মমতা জেগে উঠেছে রে! ছেলে তোরা—আমায় শিক্ষা দিলে আজ!...সমস্ত প্যাকেজগুলি নাও,

তোমাদের হাতে দিলুম, যা ইচ্ছে, তাই কর গে।·· তোমাদের নাম কোরে প্রতিজ্ঞা করছি, যে, আমি আজ থেকে আর যথাসাধ্য আমার বাড়ীতে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার হ'তে দেবো না।···আমার জয় নয়, বল তোদের স্নেহের জয়, তোদের মাতৃভূমিভক্তির জয়, বঙ্গমাতার জয়, ধর্ম্মের জয়।" (১৫গ)

'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে'র সময়ে দেশে যে কয়টি নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তার মূলকথা ছিল, দেশের অর্থনৈতিক সংরক্ষণ। অমৃতলাল 'সাবাস বাঙ্গালী' নাটকে দেশের মানুষকে স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যে অনুরাগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন, একটি গীতে :

"ওগো তোরা আলো কর বঙ্গদেশের মুখ।
চেয়ে তোদের পানে আমার যেন
বাড়ছে দশ হাত বুক ॥
... ...
... ...
কিন্তু হাত ধ'রে মানা করি বাপ,
পুণ্যের ভারতে আর এনো নাকো পাপ,
নিজের কড়ি পুড়িয়ে দিয়ে
আর বাড়িও নাকো দুখ ॥
ময়লা সারে ফসলটা বেশ ফলে বটে ক্ষেতে,
কিন্তু ফসলটা বই ময়লাটা আর
নেয় না তো কেউ খেতে ;
তেম্‌নি জন্মেছে বিরাগ-সারে যেই অনুরাগ,
যত্নে রাখ তারে বুকে কোরে সব সোহাগ,
স্বদেশীতে মন দাও বেশী কাঙাল
বাঙ্‌লায় দুঃখ ঘুচুক ॥" (১৫গ)

বিদেশী বণিকদের অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থ বিদেশে চলে যায়। আমরা দেখেছি, চারণকবি মুকুন্দ দাস, স্বদেশী সঙ্গীতের মাধ্যমে ফিরিঙ্গিদের শোষণনীতির চিত্র দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। অবশ্য এই সময়ে আরও অনেক কবি দেশের নিঃস্বতার বহুবিধ তথ্যচিত্র তুলে ধরেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, মনোমোহন চক্রবর্তী,

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী। অমৃতলালও তাঁর 'সাবাস বাঙ্গালী' নাটকে, স্ত্রী-নাট্যচরিত্র বিরাজের কণ্ঠে বলেছেন,

"বিরাজ।...ম্যাকেসর মেখে চুল বাঁধি, নূতন নূতন ফ্যাসেনের জ্যাকেট পরি, আর বিলিতী রঙে কাপড় রঙাই; কিন্তু কোত্থেকে যে আমাদের এই সব সুখের সজ্জা যোগায়, তার কথাটি একবার ভাবি? আমি শুনেছি,—সে বুঝেছে—যে, ওইতে দেশের টাকা সব বিদেশে চোলে যায়।" (২।৫গ)

আর, বাঙ্গালীর স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও স্বদেশী শিল্পের প্রচার আন্দোলনের ফলে আমদানীজাত দ্রব্যের বিক্রয় একেবারে কমে যায়। ইংরেজ বণিক-সমাজ অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, নাট্যকার অমৃতলাল তারও ছবি এঁকেছেন, নাট্যচরিত্র অঘোরনাথের উক্তিতে,

"অঘোরনাথ। এই এবারকার হাফ প্রাইজ সেলে আমাদের সাহেবের দোকানে বেশী বাঙ্গালী খদ্দের হয় নি বোলে বড় সাহেব একেবারে আগুন হয়ে আছেন!...সাহেবেরা আজকাল বাঙ্গালীর ওপর যা চোটেছে, তাতে পেটের ভাতটা আর কোরে খেতে হবে না!" (১।৩গ)

কিন্তু নাট্যকার 'সাবাস বাঙ্গালী' নাটকে কোথাও ইংরেজ বিদ্বেষ প্রকাশ্যভাবে প্রচার করেননি। ইংরেজ রাজানুগত্য বজায় রেখে তিনি দেশের সম্পদ্, অর্থ ও শিল্প-বাণিজ্যকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। এই মর্মে, নাট্যচরিত্র সুরেশের উক্তিতে তিনি নিজের ইচ্ছাকে বাণীরূপ দিয়েছেন:

"সুরেশ।...আজ পর্য্যন্ত, সেই স্বর্গগতা মহারাণীর পুত্র আমাদিগের পরমপূজনীয় সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডকে আমরা প্রাণ দিয়ে ভক্তি করি, কিন্তু তা বোলে কি আমাদের দেশের তাঁতি, জোলা, ছুতোর, কুমোর, কামার—এরা যে একেবারে আপনাদের ব্যবসায়ে বঞ্চিত হয়ে উচ্ছন্ন যাচ্ছে, তাদের উদ্ধারের জন্য কিছু চেষ্টা করবো না?" (২।২গ)

'সাবাস বাঙ্গালী' নাটক কেবলমাত্র বাঙ্গালীর স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি প্রীতি ও আসক্তি বাড়িয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি, তৎকালীন যুগচেতনার অন্যান্য দিকও, নাট্যকার আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। দেশবাসীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যস্থাপন, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রচনা এবং সর্বোপরি আত্মনির্ভরতার প্রসার—সমস্ত কিছু তিনি একই সঙ্গে প্রচার করেছেন। অমৃতলাল তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টিবলে উপলব্ধি করেন, যে

হিন্দু-মুসলমান দুই জাতির মধ্যে অনৈক্য রচনা ও বিদ্বেষ দীর্ঘস্থায়ী করা ইংরেজ শাসকদের রাজ্যশাসনের এক বিরাট অপকৌশল। ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ নীতি ঐতিহাসিকদের নিরপেক্ষ পর্যালোচনাতে স্বীকৃত হয়েছে।* 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে'র সময়ে বাঙ্গালী দেশহিতব্রতী নেতাগণ জাতীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক মিলনের উপর বেশি জোর দেন।† বাঙ্গলাদেশের মুসলমানগণও এই ঐক্যনীতিতে স্থির বিশ্বাসী ছিলেন।** নাট্যকার অমৃতলালও দেশের গণনেতাদের সঙ্গে এক হয়ে উদার ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেন। অবশ্য মুসলমানদের মধ্যে সকলে বিশাল চিত্তের অধিকারী ছিলেন না। অনেকে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ধর্মের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীতে নিজেদের আবদ্ধ করে, ক্ষীণদৃষ্টিতে সবকিছু বিচার করেছিলেন। অমৃতলাল 'সাবাস বাঙ্গালী' নাটকে তাঁর সমকালের বিভিন্ন শ্রেণীর অলস বৈচিত্র্যকে

* "For the first time in history a religious feud was established between them by the partition of the Province. For the first time the principle was enunciated in official circles—Divide and Rule"

India in Transition : H. Cotton ; p. 55

† "হিন্দু মুসলমান—
দু'জনেতে হও হে মাল্লা মাঝি কর খোদাতাল্লা,
ভাসায়ে দিয়ে জীবন-তরী দাঁড়ে মার টান,
হাজার বজ্র আসুক মেঘে, চলুক তুফান ভীষণ বেগে,
আসুক বেয়ে আকাশ ছেয়ে প্রলয় ডেকে বান!
ভক্তি ভাবে কর্ম কর! কিম্বা বাঁচ, কিম্বা মর
ঘোর তরঙ্গে রণ-রঙ্গে কবুল কর জান্!
বেহেস্তে ফেরেস্তা শুন, ডাকছে সবে পুনঃ পুনঃ,
নায়ের উপর পাল তুলে দাও মায়ের আঁচলখান!
হিন্দু-মুসলমান!"

হিন্দু-মুসলমান : গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৩২০ বঙ্গাব্দ)।

** "Abdul Halim Ghaznavi of Mymensingh, Abul Kasem of Burdwan, Liakat Hussain, and many other prominent leaders among Muslims were enthusiastic supporters of the 'Swadeshi movement'.......They also attended Sivaji festival and the meetings held to honour those who suffered in the Country's cause."

History of Freedom Movement in India (vol. II): Dr. R. C. Mazumdar, p. 112.

উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ক্ষুদ্র চিন্তার অধিকারী গোলাম উল্লা নামে এক মুসলমান, "এই স্বদেশী আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নয়," (২।২গ) বলে বিরোধিতা করেছে। তখন আবদুল শোভান নামে অপর উদার এক মুসলমান, স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে বলেছেন,

"আবদুল শোভান। মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা, আমার নাম আবদুল শোভান, আমি একজন জমীদার, এবং হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে আমার সম্প্রীতি আছে—এ স্পদ্ধা আমি রাখি। আমি বলছি যে, আমাদের গোলাম উল্লা সাহেব গোলামী আমলদারীর সর্দ্দার হ'তে পারেন, কিন্তু আমরা এই বঙ্গদেশের এই মুসলমান সম্প্রদায় ওঁর ফোক্ক নবাবীর তক্তার তলে সেলাম করি না।...আমরা শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, চাষী মুসলমানগণ আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণকে এক মাতার সন্তান বোলে প্রাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করি। ওর কথা আমাদের বঙ্গবাসী মুসলমানগণের কথা নয়, আমরা সবাই বাঙ্গালী, কি হিন্দু কি মুসলমান—কি জৈন কি বুদ্ধ—কি খৃষ্টান—বাঙ্গালায় যাদের বাস, আমরা সেই সবাই বাঙ্গালী রবো। হিন্দু আমাদের দাদা, আমরা ছোট ভাই, বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমানে বিবাদ কখনো হবে না। 'বন্দে মাতরম্' !" (২।২গ)

অমৃতলাল সমস্ত দিক থেকেই জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। যে নীতি ও পরিকল্পনা জাতি গঠনে, সমাজ উদ্ধারে কার্যকরী নয়, তাকে তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। পাশ্চাত্য দেশের বহির্মুখী শিক্ষাকে তিনি নিন্দা করেছেন, এবং তার সঙ্গে আঘাত করেছেন, নিছক কেতাবী শিক্ষায় শিক্ষিত অনুকরণ-বিলাসী পুরুষ ও মহিলাদের। তবে অমৃতলাল বাঙ্গালী রমণীদের জাতি ও দেশগঠনে ডাক দেন। কারণ তাঁর স্বাদেশিক ভাবনা পারিবারিক মঙ্গলবেদীতে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিল। নারী জাগরণ ব্যতীত দেশের অভ্যুত্থান যে সম্ভব নয়, একথা তিনি তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে পরিষ্কারভাবে প্রচার করেছেন। 'নবজীবন' নাটকে ভারতরমণীদের কণ্ঠে, অমৃতলালেরই আহ্বানবাণী প্রতিধ্বনিত :

"১ম ভারতরমণী। দাদা, তোমরা আগে বটে, কিন্তু কন্যার মত পিতামাতার সেবা কে করে? তোমরাই তো ইতিহাস-কথা শুনিয়ে বলেছো যে, রাজপুত-রমণীরাই ক্ষত্রিয়-ক্ষেত্রে বীর্য্য-বীজ বপন করেছিল,

স্পার্টায় যখন পুরুষে ধনুক ধরেছিল—স্ত্রীলোকেরা তখন বেণী ছিন্ন কোরে গুণ রচনা কোরে দিয়েছিল, মহাশক্তির অংশে আমাদের জন্ম, তবে মা'র নামগানে কেন আমরা যোগ দেব না ?" (তৃতীয় দৃশ্য)

স্বদেশী আন্দোলনকে বঙ্গরমণীগণ কিরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন, তারও চিত্র নাট্যকার 'সাবাস বাঙ্গালী' নাটকে নাট্যচরিত্র বিরাজের মুখে দিয়েছেন,

"বিরাজ। দেখ ভাই, এই যে এঁরা এ কাজ করছেন, এটিতে যে শুধু আপাততঃ দিশী জিনিসের কাটৃতি বাড়বে, তা নয়, আমার মনে হয়—যে, এর ফলে আমাদের দেশের ভদ্র সন্তানের একটা বড়ই উপকার হবে। হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী যে সব কাপড় ফিরিওয়ালা যায়, দিব্যি চক্‌চকে জুতা পায়ে, ফিন্‌ফিনে জামা গায় অথচ পিঠে বোঁচকা ফেলে অনায়াসে কাপড় রুমাল বেচে বেচে বেড়ায়। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী গেরোস্থ ভদ্দর লোকের, দোকান থেকে দু'খানা কাপড় কিনে হাতে কোরে আন্‌তে লজ্জা করে। এত বড় বড় লোকের ছেলেরা, এমন বিদ্বানেরা নিজে মাথায় মোট ক'রে কাপড় বেচতে বেরিয়ে এইটে কল্লেন—যে, এখন থেকে অনেক ভদ্দর লোকের ছেলে—আফিসের গোলামী ছেড়ে অনায়াসে জিনিস ফিরি কোরে বেচে সংসার চালাবে।" (২।৫গ)

অমৃতলালের অপর একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক নাট্যরচনা, 'হীরকচূর্ণ-নাটক' (১৮৭৫)। ইংরেজদের শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা তিনি এই নাটকে দ্বিধামুক্ত চিত্তে করেছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, বরোদার গাইকোয়াড় মলহাররাও-এর অন্যায় পদচ্যুতি নিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে তুমুল আলোড়নের সূচনা হয়েছিল। বাঙ্গলাদেশের সমসাময়িক পত্রিকাগুলিতেও এই ঘটনা প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশ' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা', ইংরেজদের অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

একটি সংবাদে প্রকাশিত হয় যে, বরোদার গাইকোয়াড় মলহাররাও বৃটিশ রেসিডেণ্ট ফেয়ারকে (Phayre) বিষ প্রদান করে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। এরপর ফেয়ারকে কাজ থেকে ছুটি দিয়ে ইংরেজ সরকার লুই পেলি সাহেবকে ঐ স্থানে নিযুক্ত করেন। সমস্ত ঘটনাটি তদন্ত করার উদ্দেশ্যে লর্ড নর্থব্রুক একটি কমিশন বসিয়েছিলেন। কমিশনের সদস্যরূপে, সরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান

বিচারপতি, মিঃ কাউচ, স্যার রিচার্ড মিড এবং ফিলিপ মেলভিল্। দেশীয় তিনজন সম্রান্ত ব্যক্তিকেও কমিশনের সদস্য করা হয়েছিল। এঁরা হচ্ছেন, গোয়ালিয়র ও জয়পুরের মহারাজা এবং দিনকর রাও। শেষোক্ত তিনজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ এবং প্রথমোক্ত তিনজন মলহাররাওকে দোষী বলে সাব্যস্ত করেন। লর্ড নর্থব্রুক সরকারী ব্যক্তিদের বিচারের রায় অনুমোদন করে মলহাররাওকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন থেকে বিচ্যুত করেন, এবং ঐ স্থানে রাজবংশের একজন নাবালককে সিংহাসনে বসান।

সমস্ত ব্যাপারটি বাঙ্গলাদেশে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তার পরিচয় তদানীন্তনকালের পত্রিকাগুলিতে পাওয়া যাবে। বিশেষভাবে, বাঙ্গলাদেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'অমৃতবাজারের' সুর ছিল খুব কড়া। ইংরেজ শাসনের দুর্নীতিকে আক্রমণ করে, এই পত্রিকাতে অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা, বরোদার পেলি সাহেবের নিয়োগকে প্রীতির চোখে দেখেননি। একজন সমালোচকের কথায়, "At the appointment of Pelly, 'The Amrita Bazar Patrika' suspected annexation of Borada."[৪]

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী সমস্ত ব্যাপারটি পর্যালোচনা করে লেখা হয়,

"......That the Government itself in a manner compelled Mulharao to commit this atrocious crime. Proofs will be found in abundance that Col. Phayre was constantly hostile to the Gaekwad, and wounded his feelings on every occasion. Not only did the Colonel tyrannise over the Gaekwad and placed obstacles in the way of good administration, but his advice made the subjects rebellious ; and when the Gaekwad wanted to punish them, the Resident reported him to the India Government as an oppressive Chief. Possibly Baroda would never have come to such a crisis if Colonel Phayre

৪ The Roll of Honour : K. C. Ghosh ; p. 28,

had n t been appointed.……It was impossible for human nature to be silent in such a position."[৫]

তারপর, একটি কূটনৈতিক প্রশ্ন তুলে ইংরেজ সরকারকে জবাবদিহি করতে বলা হয়:

"What would the English had done, if, for instance, the Russian Emperor had deputed an officer like Colonel Phayre to England to keep an eye on the doings of the English Government, to interfere with all their acts, to teach people insubordination to the law and spread calumnies relating to the Queen ?……It would either, if it had any confidence in its power, expel the Russian officer from the country after subjecting him to all manner of insults, or alternatively attempt to get rid of him by some such means as adopted by the Gaekwad. ·· It is evident that he had no other than this atrocious way left to him to be freed from all oppressions of the Resident. If proper enquiry is conducted the performances of Phayre and the results were made public the common people of England would hang down their heads in shame.……

Considering the unnatural relation that subsisted at the time between England and its tributary Princes of India, it was rather strange that poisoning cases had been so few. The oppression of the Residents on Native chiefs would have long made it impossible for Government to maintain peace in the country, if the natives had not been so signally patient, weak and helpless."[৬]

ইংরেজ সরকারের বিচার-নীতিকে আক্রমণ করে অমৃতবাজার পত্রিকার, বাঙ্গলা সংস্করণের সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করা হয়েছিল,

Amrita Bazar Patrika : January 14 ; 1875
Amrita Bazar Patrika : January 18, 1875

"গাইকোয়াড়ের বিচার সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে নানা মূর্তি ধারণ করিতে হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ বাদী হইয়া গাইকোয়াড়ের নামে অভিযোগ করিলেন যে, তিনি মহারাণীর প্রতিনিধিকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যার উদ্যম করিয়াছেন। এই অভিযোগ করিয়াই বরদারাজকে সিংহাসনচ্যুত, কারারুদ্ধ ও তাঁহার সম্পত্তি সকল বাজেয়াপ্ত করা হইল। গাইকোয়াড়ের বিচারার্থ গবর্ণমেণ্ট আবার নিজেই বিচারপতি সকল নিয়োগ করিলেন। আবার গাইকোয়াড নিজে বন্দী। তাঁহার সম্পত্তি সকল গবর্ণমেণ্টের হস্তগত, সুতরাং বিচারস্থলে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের ভারও গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বিচারপতি সকল নিয়োগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট দেশীয় লোকদের ইচ্ছামত কতকগুলি কাজ করিয়াছেন। ছয়জন বিচারপতির মধ্যে তিনজন এতদ্দেশীয় প্রধান লোক নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে যখন বাদী, প্রতিবাদী উভয়েরই কার্যভার লইতে হইয়াছে তখন প্রতিবাদীর পক্ষে যোগানের অভাব হইলে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইবে। কিন্তু আমরা যেমন সংবাদ পাইতেছি তাহাতে প্রতিবাদীর পক্ষের অধিক ব্যাঘাত করা হইতেছে। গাইকোয়াডের পক্ষে ব্যারিষ্টারদিগের ফিসের টাকা দেওয়া হইতেছে না। পলি সাহেব প্রতিবাদী পক্ষের উকিলদিগকে বলিয়াছেন যে তাঁহাদের তাঁহাকে কোন বিষয় জানাইতে হইবে, তাহা তাঁহারা বা অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের পক্ষের উকিলদের যোগে জানাইবেন। প্রতিবাদী পক্ষের বরদার দপ্তরখানা হইতে যে সকল কাগজপত্রের আবশ্যক হয় তাহা প্রথমে দিতে অস্বীকার করা হয়। গাইকোয়াডের উকিলরা সমস্ত বিষয় গবর্ণর জেনারেলের নিকট টেলিগ্রাফ করে। কতক২ কাগজ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, আবশ্যকীয় কাগজগুলি দেওয়া হয় নাই। সেদিন গাইকোয়াড়ের অন্যতম উকিল জেফারসন্ সাহেবকে গাইকোয়াড়ের পক্ষে ৫০ হাজার টাকা এই সর্ত্তে দেওয়া হয় যে তিনি এই মর্ম্মে একখান রসিদ দিবেন যে গবর্ণমেণ্ট গাইকোয়াড়ের পক্ষ সমর্থনে যে টাকা দিবেন সে টাকা যে যে বাবদে খরচ হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট দেখিবেন এবং ব্যয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন তাহাতে জেফারসন্ সাহেব বাধ্য থাকিবেন। প্রথমে এইরূপ রসিদে টাকা লওয়া হয়। পরক্ষণে টাকা ফেরৎ দিয়া রসিদখানি ফিরিয়া চাওয়া হয়। কিন্তু তাহা প্রত্যর্পণ হইল না। প্রতিবাদীর পক্ষে যোগাড়ের বিশেষ ব্যাঘাত করা হইতেছে। উকিলের

হাতে টাকা না থাকায় তাঁহারা উডরফ্ সাহেবকে নিযুক্ত করিতে পারেন না।"[৭]

অর্থপ্রদান বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার অসহযোগিতা করলেও বরোদার অধিবাসীগণ একত্রিত হয়ে তাদের প্রিয় রাজার জন্য অর্থসংগ্রহে অগ্রণী হয়েছিলেন। বাঙ্গলা দৈনিকে এই ঘটনাটি সংবাদ হিসাবে প্রকাশিত হয়,

"গাইকোয়ারের পক্ষ সমর্থনার্থ গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট টাকা দিতে কুণ্ঠিত দেখিয়া বরদার অধিবাসীগণ চাঁদা অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তত্রত্য সর্দ্দার বলিতেছেন যে তাঁহারা টাকা শীঘ্র সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ভয়ে তাহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না।"[৮]

সাহায্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ সমস্ত ঘটনাটিকে সমাধানের জন্য গবর্ণর জেনারেল নর্থব্রুকের কাছে আবেদন করেন। তাঁদের পত্রাংশটি ছিল এই রকম,

"বরদাবাসীগণের বিনীত নিবেদন। দয়াবান ও নিরপেক্ষ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের দুঃখ ও কষ্টের কথা অবগত হইয়া যাহাতে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রজাদের ন্যায় আমাদিগের সত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা হয় তৎপক্ষে যত্নশীল হইয়াছেন।......আমাদের বিশ্বাস যে মহারাজ মালহার রাওয়ের ন্যায় ধাম্মিক ও উদার চরিত ব্যক্তির এইরূপ পাপকার্য্যে সংলিপ্ত হওয়া অসম্ভব। তবে মহারাজার চতুঃপার্শ্বে যে ছোটলোকের দল আছে তাহারা স্বচ্ছন্দে এইরূপ পাপকার্য্য করিতে পারে।..... ইহারাই যত অনিষ্টের মূল, ইহারা দিবারাত্রি প্রকাশ্যভাবে লোকেদের উপরে অত্যাচার করে, এবং ইহাদের জ্বালায় দেশ সমেত লোক বিরক্ত।.....যদি সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে প্রতীয়মান হইবে যে, রেসিডেন্সী গৃহে যে সকল লোক দলে দলে ভ্রমণ করিতেছে ইহারাই সকল গোলমালের মূলীভূত কারণ এবং ইহাদিগকে শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। রেসিডেণ্টকে বিষ খাওয়াইবার যদি প্রকৃতই চেষ্টা করা হইয়া থাকে তাহা হইলে ওই ছোটলোকেরাই তাহার নিমিত্ত দোষী, কারণ তাহারা নিজের দোষ মহারাজার স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর মহারাজা যদি ইহাদের পরামর্শ চাহিয়া এমত কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া থাকেন

---

৭ অমৃত বাজার পত্রিকা (বাংলা সংস্করণ): ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৫।

৮ অমৃত বাজার পত্রিকা (বাংলা সংস্করণ): ৭ই ফাল্গুন, ১২৮১ বঙ্গাব্দ।

তাহা হইলে তাঁহাকেও ইহার নিমিত্ত দোষ দেওয়া যায় না, যেহেতু তাহারা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে সংলিপ্ত করাইয়াছে। অবশেষে আমাদের বক্তব্য যে আমাদের সুযোগ্য মহারাজা যে কারারুদ্ধ থাকিবেন ইহা আমরা কখনই সহ্য করিতে পারিব না!......এবং তাঁহার রাজ্যচ্যুতিজনিত দুঃখে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। বোম্বাইয়ের একখানি সংবাদপত্র নির্লজ্জভাবে লিখিয়াছেন যে বরদাবাসীরা মহারাজা মালহার রাওয়ের অরাজকতায় টিকিতে না পারায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সাহায্যার্থে গমন করেন, কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে আমরা আমাদের মহারাজার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত নহি, এবং মৎস্য যেমন বারি বিনা ছট্‌ফট্ করে, আমরা সেরূপ মহারাজার অভাবে সমূহ কষ্টভোগ করিতেছি। অদ্য আমরা যেরূপ মনের ভাব ব্যক্ত করিলাম মহারাজা যে দিবস বন্দী হন সে দিবসও আমরা এইরূপ করিতাম, কিন্তু ভয় ও অবজ্ঞা নিবন্ধন আমরা এ যাবৎ ক্ষান্ত ছিলাম।"[৯]

দেশের জনসাধারণ যখন এরূপভাবে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন করে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ বীতরাগ হয়ে উঠেছিল, তখন ইংরেজেরা সেখানে মহানন্দে 'মাইকেল ও ককটেল পার্টি' বসিয়ে মাতোয়ারা হয়েছিলেন।* কারণ, এই সমস্ত ঘটনার পিছনে পরোক্ষভাবে ইংরেজশাসকদের সমর্থন ছিল। তদন্তকমিশনের সভাপতিকে প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করে লেখা হয়েছিল,

"আপনি যে সকল কার্য্য করিতেছেন, সে সমুদয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি ও আদেশানুযায়ী করা হইয়াছে। আপনি যে সমুদয় কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে মন্ত্রীবর্গ সহ গবর্ণর জেনারেলের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।"[১০]

এইভাবে, বাঙ্গলা দেশের নির্ভীক জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি ইংরেজ সরকারের আসল রূপ ও কর্মনীতিকে প্রকাশ্যভাবে লোকচক্ষুর গোচরে আনতে

৯ অমৃত বাজার পত্রিকা: ৭ই ফাল্গুন, ১২৮১ বঙ্গাব্দ।

* "গাইকোয়াড় কারাগারে কষ্টের সহিত জীবন-যাপন করিতেছেন, এদিকে পেলি সাহেবের আমোদ-আহ্লাদের আর সীমা নাই। তিনি দলবল লইয়া কখন শিকারে বহির্গত হইতেছেন, কখন ক্রিকেট খেলা করিতেছেন এবং নৃত্য-গীত ইত্যাদি তাঁহার গৃহে প্রায় প্রত্যহই হইতেছে।"

—অমৃত বাজার পত্রিকা: ৭ই ফাল্গুন, ১২৮১ বঙ্গাব্দ।

১০ অমৃত বাজার পত্রিকা: ৭ই ফাল্গুন, ১২৮১ বঙ্গাব্দ।

দ্বিধা করেননি। অপরদিকে দেশীয় ব্যক্তিদের এ বিষয়ে নানা সংগঠন পরিকল্পনা ও ঐক্যচিন্তাকে প্রকাশ করে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী এক অখণ্ড জাতীয়চেতনা ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাঙ্গলা দেশের দৈনিকগুলি সক্রিয় হয়েছিল।

নাট্যকার অমৃতলাল এই উত্তপ্ত পরিমণ্ডলে, 'হীরকচূর্ণ-নাটক' রচনা করেন। রাজনৈতিক ঘটনা অবিকৃতভাবে এই নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত হয়েছে। অমৃতলাল যে সুগভীর বাস্তবচিন্তার অধিকারী ছিলেন, তার পরিচয় 'হীরকচূর্ণ-নাটকে'র প্রতি ছত্রে বিদ্যমান। এক সমবেদনাপূর্ণ সহানুভূতি, তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির মধ্যে মিশে আছে। ইংরেজদের অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে দেশের করদ-রাজ্যের অধিপতিদের অবস্থা কিরকম মর্যাদাহানিকর হয়েছিল, তার চিত্রটি অমৃতলাল নাট্যচরিত্র মলহার-রাওয়ের উক্তিতে প্রকাশ করেছেন :

"মলহাররাও।......যে দিন ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে, সেই দিন হ'তেই গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে, সে সূর্য্য পুনরুদিত হওয়ার আর আশা নাই, আমাদের দুঃখেরও শেষ হওয়ার আশা নাই। এখন আমাদের রাজসম্বোধন কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। যখন রাজা হয়ে একজন সামান্য রেসিডেণ্টের খেলনার পুতুল হয়ে থাকতে হচ্ছে, তখন এ বৃথা রাজমুকুট শিরে ধারণ ক'রে সং সেজে সিংহাসনে বসা অপেক্ষা জটা-বল্কল ধারণ ক'রে বনে বাস করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।......হিন্দুদের ঘৃণা কর্ত্তে শিখেছেন, মনের সাধে ঘৃণাই করেন।......নিজের দেশে কেউ গ্রাহ্যও করে না, এখানে এসেই দেখেন যে, তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের কৌশলক্রমে একটি সরল জাতি যবনদিগের লৌহ শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হয়ে তাঁদের সুবর্ণ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়েছে। ভাবেন, তাঁদের নীচ দম্ভ প্রকাশের এরাই উপযুক্ত পাত্র। ইহাদের একটু সুখ, একটু উন্নতি, একটু ঐশ্বর্য্য দেখলেই তাঁদের মনে ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হয়। কিসে ইহাদের পদতলস্থ করবে, সেই চেষ্টায় সতত বিব্রত থাকে। আমি যে কর্ণেল ফেয়ারের বিষনয়নে পড়েছি, ইহা ভিন্ন তার অন্য কোন কারণ নাই।...... রেসিডেণ্টের সঙ্গে বিবাদ ক'রে ইংরাজ-রাজ অধীনে কোন্ মিত্ররাজা নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন কর্ত্তে পারে? .... আজকাল ইংরাজদের সন্তুষ্ট কর্ত্তে পাল্লেই লোকে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। অন্ধ স্বার্থপরেরা ভ্রমেও ভাবে না যে, এরূপ তোষামোদের ফাঁদ আপনারাই প্রস্তুত করে।" (১।১গ)

সমসাময়িক কালের পত্রিকাতে অনুরূপ প্রসঙ্গের অবতারণা দেখতে পাই। বাঙ্গলা দেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ইংরেজি 'অমৃতবাজারে' এ বিষয়ে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজন্যবর্গের দুর্দশার চিত্র ও করুণ কথামালা অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যক্ত হয়েছে। প্রবন্ধটি বিস্তারিত হলেও, উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করা যেতে পারে,

"The Gaikwar's case has excited more than temporary interest on the subject. People are enquiring if the position of the Native Princes be so unstable as he has been found to be that of the Gaikwar's what is the good of keeping these pupils any longer on the throne. In fact the powers of the Native Princes have been so far crippled of late that we doubt much whether their position is more enviable than that of the common mass ot Her Majesty's subjects in India. Kingly powers they have little or none. They have no right of declaring war against anybody. They cannot settle terms with brother princes of their own accord. Their sons cannot ascend their respective thrones without Imperial sanction.

There can be any doubt that Imperial policy requires that Dependant Princes and Chiefs should bear willing obedience to the Central power. But a true Imperial policy also requires that Dependant Princes and Chiefs should be regarded as Princes and Chiefs, that they should have power to do good to their subjects, which they must fail to do if the 'terrorism' is constantly held over their heads that a single mistake committed by them, that a single error of policy on their part would bring upon their devoted heads the contempt and reproach of the Supreme Government. Fancy the Emperor of Germany were to offer the same treatment to any Prince of the German Confederation as

Lord North Brook, Viceroy and Governor-General of India had been pleased to offer the Gaikwar would not whole Germany have stood indignation against him and denounced his policy in severe terms. One main defect which we mark in the policy of the British Governor Generals towards Native Princes and Chiefs is this, that while it is jealous of the ever growing power of the Native Princes and Chiefs it allows them no share of Imperial glory either in the time of war or in that of peace. Under such circumstances our Native Princes and Chiefs are nothing more or less than so many large State Pensioners, keeping a good number of guards and dependants under them. In exceptional cases retaining the power of keeping a good number of soldiers under them who as they have no power of making war, can be reckoned only as soldiers of show. Under such circumstances the Native Princes and Chiefs having no princely duties to do, spend their days in luxary and dissipation, keeping only the semblance of royalty—the shadow and not the subtance. Under such circumstances, if they are found to distinguish themselves in acts of improvement, we fear they will be found to have done so more with a view to please the Supreme Government than with conscientious desire to do their duties manfully. We have a belief amounting to strong conviction produced by experience of stubborn facts that when as man loses or is made to lose the natural dignity of his position he becomes at once incapable of doing any action worthy of his name. He sinks daily. And if he does any work, that work you may rest assuered is only formal and routinal. A work to be done properly must be done with a due amount of energy and

spirit. Can it be supposed that a man who labors constantly under the apprehension that he might be cast any movement into the shade—can it be supposed that a man under such circumstances would be able to do any work energetically ? And if a man of ordinary position fails to do a work properly a disheartening influence working in his mind, how much more incapacitated a Native Prince or Chief would be found to do a work when a prison house or a throne happen to be his possible containgencies. We care not whether the Gaikwar is reinstated to his throne or put to the gallows. But we feel earnest, solicitude to know whether a breath of the Imperial Government can make and unmake Native Princes. If such be their position let that shame of their sovereignties be done away with as soon as possible."[১১]

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ইংরেজদের বিচার কমিশন গঠন এ দেশবাসীর কাছে মনঃপূত হয়নি। নাট্যকারও আপন মনের অসন্তোষের ছবিটি নাটকে এঁকেছেন,

"মদন। কমিশনটা লোক দেখান মাত্র। সিংহাসন পুনরায় দেবার ইচ্ছে থাকলে প্রথমে এইরূপ অপমান কর্ত্তো না। যে সকল প্রজারা স্বচক্ষে মহারাজের এ দুর্দ্দশা দেখলে তাদের সম্মুখে আর তিনি কোন্ মুখে সিংহাসনে বস্‌বেন ? ......ভারতীয় পুলিশ সাক্ষীসংগ্রহ-বিষয়ে বিশেষ পটু। যখন রেসিডেন্সীর দুই-চারজন সামান্য ভৃত্যের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর ক'রে মহারাজকে বন্দী করা হয়েছে, তখন যে এর উপর বিশ ত্রিশজন মুটে, মজুর, গাড়োয়ান যোগাড় কত্তে পাল্লেই মহারাজকে আন্দামানে পাঠান হবে, তাতে আর সন্দেহ আছে ?" (২।২গ)

ইংরেজ রাজত্বে, শাসননীতির অপকৌশলের চিত্রটি নাট্যকার নাট্যচরিত্র হেমচাঁদ ফতেচাঁদের জবানবন্দীতে অঙ্কিত করেছেন,

"হেমচাঁদ ফতেচাঁদ।...আমি শপথ ক'রে বলছি, কখন মহারাজকে হীরা বিক্রয় করি নাই, কেবল পুলিশের ভয়েই খাতায় মিথ্যা লিখেছি।" (৩।১গ)

১১ Amrita Bazar Patrika ; February 18, 1875.

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির ইংরেজ শাসনরীতির সমালোচনা ব্রিটিশদের যেমন ক্ষুব্ধ করেছিল, তেমনি কিছু সংখ্যক দেশীয় পত্রিকার চাটুকারিতাতে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন। দুই বিপরীত মানসিকতাকে অমৃতলাল নাটকে, নাট্যচরিত্র কর্ণেল ফেয়ার, মাষ্টার ফিলিপ, মাষ্টার উইলসনের উক্তির মধ্যে ধরে রেখেছেন :

"উইলসন। কর্ণেল! আপনার হাতে ওখানা কি কাগজ?

ফেয়ার। 'ওভারলেণ্ড অমৃতবাজার পত্রিকা।'

ফিলিপ। উইলসন্! তোমার সঙ্গে ব্রায়েণ্ট এণ্ড মে কোম্পানীর জানা-শুনা আছে?

উইলসন। কেন?

ফিলিপ। তাদের লিখে পাঠাও যে, এক রকম ম্যাচ তৈয়ার ক'রে ইণ্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়, that will 'ignite only' the Native press.

উইলসন। হা!—হা!—হা!—এইজন্য! তা নেটিভ পেপারের কথা শুনে কে? আপনারাই লেখে—আপনারাই পড়ে—বড়লোক কেউ গ্রাহ্যও করে না।

ফিলিপ। না, না, না,—ওরা আজকাল ইংলণ্ডে কাগজ পাঠাতে আরম্ভ করেছে। ঐ ওভারলেণ্ড অমৃতবাজার দেখেই তো 'পেলমেল্ বজেট' সে আর্টিকেলটা লেখে। হোমের কাগজগুলো আজকাল ভালো চল্‌ছে না। 'পেলমেল বজেট', 'টাইমস্'—দুই-ই খারাপ হয়ে গেছে, তা নইলে নেটিভ-পেপার থেকে সিলেক্‌সন করে? আবার নেটিভ পেপার ব'লে নেটিভ পেপার—জঘন্য 'অমৃতবাজার!'

ফেয়ার। নেটিভ পেপারের মধ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কতকটা ভাল,—যথার্থ লয়েল।

ফিলিপ। তা, শুদ্ধ নেটিভ পেপারদের দোষেন কেন? 'ইংলিশম্যান', 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' কি লোক হাসাচ্ছে না? এঁরা গাইকোয়াড়কে যে কি সোনার চক্ষে দেখেছেন, তা বোঝা যায় না। পেপার আমার 'বম্বে গেজেট।'

উইলসন। কেন? 'পাইওনিয়ার', 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ', 'ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌ম্যান'—

ফেয়ার। হাঁ, কলিকাতায় ও নূতন কাগজখানি লিখেছে ভাল।" (৪।১গ)

'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' 'হীরকচূর্ণ-নাটক' অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। তদানীন্তন কালের বিদগ্ধজনের কাছেও এই নাটক নন্দিত হতে থাকে। 'হীরকচূর্ণ-নাটক'টির বহুল প্রচার ও দীর্ঘায়ু কামনা করে অমৃতবাজার পত্রিকা মন্তব্য করেছিল,

"······গাইকোয়াড়ের বিচারটি সাদা করিয়া লিখিলেও তাহা পাঠ করা দুষ্কর, আমরা এ নাটকখানি পড়িয়াও অশ্রুজল ফেলিয়াছি। সে শুদ্ধ নাটকের গুণে, কি বিষয়ের গুণে, কি উভয়ের যোগে তাহা কিছুদিন পরে বুঝিতে পাইব। ···প্রধান ২ ঘটনাগুলি নাটকখানিতে সন্নিবেশিত আছে ও যাহারা গাইকোয়াড়ের দণ্ডে ব্যথিত হইয়াছেন তাহাদের সকলেরই ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"[১২]

অমৃতলাল যুগসচেতন নাট্যকার হয়েও, কোনস্থানে প্রকাশ্যভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার কথা বলেন নি। জাতির আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সংস্কার সাধন, প্রয়োজনবোধে প্রতিরোধের কঠিন বেড়া নির্মাণ, এবং সর্ব বিষয়ে ঐক্যানুভূতি প্রচার, তাঁর দেশহিতব্রতীতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এজন্য মনে হয় তিনি ছিলেন, Constructive Nationalist. স্বদেশের কল্যাণে অমৃতলাল, রাজনৈতিক মতবাদে moderate-পন্থীদের অনুরাগী ছিলেন। আবার, তিনি সব সময় আবেদন-নিবেদন নীতিকে সমর্থন করতেও পারতেন না। মনে হয় তাঁর চিত্তে স্বাদেশিকতার আদর্শ সম্পর্কে একটি বিশেষ ভাবনা ছিল ;—সে ভাবনা আপোষহীন অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রাম। আর এরই প্রচার তিনি তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন।

১২ অমৃতবাজার পত্রিকা (বাংলা সংস্করণ) : ২১শে ফাল্গুন, ১২৮১ বঙ্গাব্দ।

চোদ্দ

১

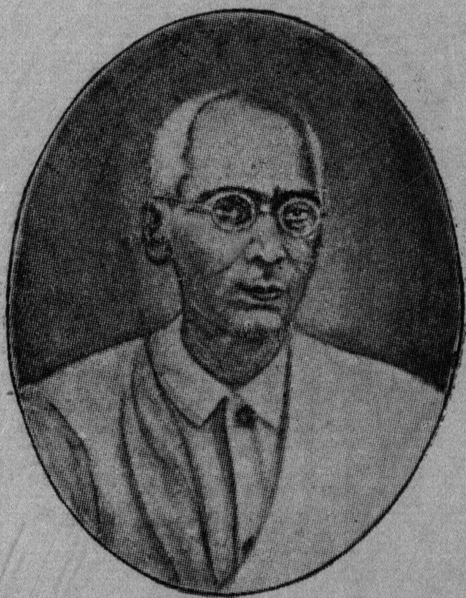
ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা

জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের নব উন্মাদনা ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকে বিশেষভাবে প্রতিফলিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে যুগধর্ম বাঙ্গালীর জীবনে নূতন ভাবাবেগের সঞ্চার করেছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদ তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেন। মুখ্যতঃ তাঁর নাটকগুলি যুগচেতনারই অবদান। নিম্নের বক্তব্য পাঠ করলে বোঝা যাবে যে, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ জাতি গঠনের উদ্দেশ্যেই, অধ্যাপনার পদ পরিত্যাগ করে নাটক ও নাট্যশালাকে শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন :

"পাশ্চাত্ত্য রঙ্গালয়ের ইতিহাস আমি যতটুকু পাঠ করিয়াছি, তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছি যে নাট্যকলার উন্নতির সঙ্গে জাতীয় জীবন যেন অনেকটা জড়িত। অনেক স্থলেই দেখিয়াছি, জাতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকলার উদ্ভব হইয়াছে, জাতীয়ত্বের প্রথম পবিত্র সমুজ্জ্বল বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-সাহিত্য-কুসুমও দেশব্যাপী সৌরভ লইয়া বিকশিত হইয়াছে। এমন কি এ তদুভয়ের মধ্যে কোনটি কাহার প্ররোচক, তাহাও অনেক সময় উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া উঠে।

ধর্ম্মের একটি সূত্র অবলম্বন করিয়া জাতির গঠন হয়। সেই সূত্রটি ধরিয়াই আবার নাট্যকলা লীলা করিয়া থাকে। অনেক সময়ে স্থূল দৃষ্টিতে যদিও তাহা সকলের বোধগম্য না হইতে পারে, কিন্তু একটু গবেষণার সহিত নিরীক্ষণ করিলে সে সূক্ষ্ম সূত্রটি দৃষ্টিগোচর হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস ; এমন কি সাধারণ আমোদ-উল্লাসপূর্ণ নাটকাদি তাহাদের স্থূল বহিরাবরণ দিয়াও সে সূত্রের অস্তিত্ব ঢাকিয়া রাখিতে পারে না।

জাতীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই গ্রীক্ নাট্যসাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। জাতীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই রোমীয় সাহিত্য গ্রীসের পথানুসরণে সমর্থ হইয়াছিল। ফরাসীদেশেও নাট্যসাহিত্যের চরমোৎকর্ষ সপ্তদশ শতাব্দীতে। 'স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী' তখন ধর্ম্মরূপে ফরাসী জাতির হৃদয়ে রাজ-



ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

বিদ্বেষ-বহ্নি ধীরে ধীরে প্রধূমিত করিতেছিল। ইংলণ্ডেও ধর্ম্ম-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যসাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। সে সময়ে ইংলণ্ডের নব সংস্কৃতধর্ম্ম ও সঙ্গে সঙ্গে নবাভ্যুদিত জাতিকে বিধ্বস্ত করিতে আসিয়া, স্পেন সম্রাটের প্রচণ্ড নৌবাহিনী ইংলণ্ডের উপকূলের তাহারই ক্ষুদ্র নাবিকগুলির শক্তি সাহায্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়েই মহাকবি শেকস্‌পীঅর তাঁহার নবরচিত ভুবনামোদিনী পুষ্পমালা মাতৃভূমিকে উপহার দিয়াছিলেন।”[১]

নাট্যকারের এই বক্তব্যের মধ্যে তাঁর ইতিহাস-চিন্তার জ্ঞান্‌ অত্যন্ত প্রখর ও জাগ্রত। তাই যুগের অনুকূল বাতাস পেয়ে তিনিও তাঁর মানস-তরীতে স্বদেশী চিন্তার পাল তুলে দিলেন। বাঙ্গলাদেশ যে সময়ে মাতৃমন্ত্রের সাধনায় সোচ্চার, বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্ম যখন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ, তখন তিনি জাতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন দেশপ্রেমে আত্মোৎসর্গকারী মহান্‌ নেতাদের অমর কাহিনী। বাঙ্গালী সেদিন এই সকল বীরবৃন্দের কাহিনী ও তাঁদের স্বদেশপ্রেমকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের সত্যকে অনুসরণ করতে চাননি। বস্তুধর্মের পরিবর্তে ভাবধর্মকে শরণ করাই তাঁর প্রধান চিন্তা ছিল। ইতিহাসের সত্য বিচার তাঁর নাটকে গৌণ।

ক্ষীরোদপ্রসাদের স্বাদেশিকতার স্বরূপ, শক্তি-সাধনার আদর্শ প্রচার। সেযুগে রাজনীতির সঙ্গে পৌরাণিক তন্ত্র-সাধনার সমন্বয় সাধন করবার প্রয়াস দেখা যায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে অনুরূপ প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশানুরাগের শ্রীবৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে প্রেম ও প্রীতির অনুশীলনে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ঐক্য স্থাপন, জাতির চারিত্রিক উন্নতি ও মনুষ্যত্বের সাধনার কথা যেমন প্রচার করেছেন; তেমনি জাতির স্বাধিকার চিন্তায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করবার জন্য শক্তি-সাধনার প্রয়োজনীয়তার কথাও করেছেন ব্যক্ত। তাঁর শক্তিতত্ত্ব ছিল বেদান্ত নির্ভর। জাতির মঙ্গলের জন্য, স্বদেশের উন্নতি-হিতার্থে তিনি বেদান্ত মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ উপলব্ধি করেন যে ধর্মনীতিতে অনুদারতা, মনুষ্যত্ববোধের অভাব ও আত্মকলহ ভারতের অবনতির একমাত্র

১ নাট্যমন্দির, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।

কারণ। 'পদ্মিনী' (১৯০৬) নাটকে ভীমসিংহের উক্তিতে নাট্যকারের মনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। রাণা লক্ষ্মণসিংহকে ভীমসিংহ বলেছেন,

"ভীমসিংহ। রাণা, যদি আমরা নীতিপথ পরিত্যাগ করে দেশ উদ্ধার করতে না পারি, তাহলে দেশও গেল—ধর্ম্মও গেল। ভারত সন্তান নীতি-বর্জ্জিত হলে স্থির জানবে আর কখনও মাথা তুলতে পারবে না।" (১৩গ)

দেশের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য, মতবিভেদ সম্পর্কে ভীমসিংহ দুঃখের সঙ্গে বলেছেন ;

"ভীমসিংহ। আর ভারত ভারতই যে বলি, সে ভারত কোথা ? ভারত এখন সিন্ধু গুজরাট, অযোধ্যা, পঞ্জাব, বাঙ্গালা, বিহার ইত্যাদি কতকগুলো ক্ষতবিক্ষত দেহ, অথচ অভিমানে স্ব স্ব প্রধান, সেই পূর্ব্বযুগের বিশাল একতাময় প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্ন স্তম্ভের সমষ্টি। ভারত সেই আর্য্য-পূজিতা মাতৃমূর্ত্তির শতগ্রন্থীযুক্ত ছিন্নবাসের আবরণ।...আমি, প্রাণপণে ভারতে একতা সম্পাদনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে চেষ্টা করে অন্যে মনে করে সে যেন মাতৃ-পিতৃদায়গ্রস্ত।··তার উপর সবারই কর্ত্তৃত্বাভিমান। কেউ কাউকে কর্ত্তা স্বীকার করতে চায় না।...অন্যান্য দেশে বিধাতা দু'একজন লোককে ষোল আনা বুদ্ধি দিয়ে পাঠান, অবশিষ্টের ভেতরে সকলেই প্রায় দু'দশ আনার অংশী। কাজেই সমগ্র দেশবাসীর ভেতর একজন কি দু'জন নেতা হয়, অবশিষ্ট সকলে তার অনুসরণ করে। এ পোড়া ভারতের পক্ষে এত ষোল আনার বুদ্ধি একত্র হয়েছে যে, সমধর্ম্মী তড়িতের পরস্পর বিরোধী শক্তির ন্যায় এরা কেউ কারও কাছে অবস্থিতি করতে পারে না।" (১৩গ)

'প্রতাপ-আদিত্য' (১৯০৩) নাটকে বাঙ্গালীর আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের কথা নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ সেলিমের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন,

"সেলিম। একা বাঙ্গালী মহাশক্তি, জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাক্‌পটুতায়, কার্য্যতৎপরতায় বাঙ্গালী জগতে অদ্বিতীয়, মহাশক্তিমান সম্রাটের পূজনীয় ; কিন্তু একত্রিত দশ বাঙ্গালী অতি তুচ্ছ, হীন হতেও হীন, অন্যজাতির দশ কার্য্য, বাঙ্গালীর দশ কার্য্যে হানি।" (৫।১গ)

ক্ষীরোদপ্রসাদের স্বজাতিপ্রীতি নিরাভরণ সৌন্দর্যকলায় বিভাসিত ছিল বলেই তিনি জাতির অতীত শৌর্যে মুগ্ধ হয়ে যাননি। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার অন্তরালে বাঙ্গালী চরিত্রের আভ্যন্তরীণ চিত্র অনেকটা নিরাভরণভাবে এই নাটকে উপস্থিত। দেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনা

করতেন বলেই তিনি জাতির দোষক্রটির দিকটিকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে দ্বিধা করেননি। ক্ষীরোদপ্রসাদ সর্বাগ্রে চেয়েছিলেন জাতির মনুষ্যত্ব সাধনার শুভ উদ্বোধন। তিনি 'পদ্মিনী' নাটকে পুরোহিতের উক্তিতে আপন মানস-চিন্তাকে মুক্ত করেছেন,

"পুরোহিত। আমি কূটনীতির কথাও বলতে চাই না, ধর্ম্মনীতির কথাও বলতে চাই না। যে কোন নীতি প্রয়োগে ভারতের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে মনুষ্যত্বের প্রয়োজন, ভারতে এখন সে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ অভাব।" (১।৩গ)

ক্ষীরোদপ্রসাদ সব সময়ে বেদান্ত-নির্ভর ধর্ম শিক্ষাতে বিশ্বাসী ছিলেন। সে জন্য তিনি জাতিভেদ স্বীকার করতেন না। তিনি বুঝেছিলেন যে জাতীয়তার ক্ষেত্রে জাতিভেদ একান্তভাবে বর্জনীয়। নাট্যকার 'নন্দকুমার' (১৯০৮) নাটকে স্ত্রী-চরিত্র রাধিকার মুখে এই চিন্তারই বাণীরূপ দিয়েছেন। রাধিকা তীব্র ভর্ৎসনা করে নন্দকুমারকে বলেছে,

"রাধিকা। আপনি হিন্দুজাতির শক্তিশালী প্রতিনিধি! অন্ধ জাত্যাভিমানে আপনি শুদ্ধ নিজের দাসত্ব আনছেন না, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতির দাসত্ব এনে দিচ্ছেন।" (৩।৪গ)

এ ছাড়াও ক্ষীরোদপ্রসাদ দেখিয়েছেন, মিথ্যা জাতিগর্ব, আভ্যন্তরীণ কলহ, ব্যক্তি-স্বার্থপরতা—জাতীয়তা হীনতার অন্যতম কারণ। মিথ্যা জাতিগর্বের সমালোচনা করে তিনি 'পদ্মিনী' নাটকে বলেছেন,

"আমরা শুধু জাতিগর্ব্ব জানি জাতির কার্য্য জানি না।" (২।১গ)

আবার, উদার ভ্রাতৃত্ব ও মানবপ্রেমের অভাব যে বারবার দেশের অধঃপতন ঘটিয়েছে, তাও তিনি দেখিয়েছেন। স্বার্থপরতার কলুষরূপ ও আত্মগর্বের মোহ-বিলাসের দূষণীয় রূপের কথা তিনি 'পদ্মিনী' নাটকে গোরা চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। মহারাণী পদ্মিনীর মাতুল গোরা, চিতোরের সেনাপতি হরসিংহকে বলেছেন,

"গোরা।...তোরা বীরত্বের অভিমান বজায় রাখতে যুদ্ধ করবার লোক না পেলে আপনা আপনির ভিতর মারামারি করিস্।......চিতোর এখন আপনার বীরত্ব গর্ব্বে আপনি উন্মত্ত। অহঙ্কারী আনহালওয়ারা রাজা তোমাদের কাছে পরাভূত হয়েছে। সেই পুরাতন ধার রাজ্য, অবন্তী, চন্দের, দেবগিরি, সেই সোলাঙ্কী, প্রমার, পরিহার সমস্ত অগ্নিকুলের অধিষ্ঠানভূমি চিতোরের কাছে মস্তক অবনত করেছে। তোরা তাদের গর্ব্ব অধিকার

করেছিস্, প্রাণ অধিকার করতে পেরেছিস্ কি? তারা শুধু নির্জ্জনে দন্ত নিষ্পেষণে মুখ বিকৃত করে প্রতিহিংসার অবকাশ খুঁজছে। আমরা হলে মাতৃদায়গ্রস্ত ভাগ্যহীনের মত তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে গলায় বস্ত্র দিয়ে প্রীতি ভিক্ষা করতুম, আর সকলে মিলে একজনকে কর্ত্তা করে, তার আদেশে অস্ত্র ধরে—পৃথ্বীরাজের হত্যার, সোমনাথ বিগ্রহ নাশের, নগরকোট ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতুম। বিধর্ম্মীরা মিশতে চাইলে তাদের ভাইয়ের মত স্থান দিয়ে আপনার করে নিতুম·· ··চিতোরের দুর্দ্দিন এলে কেউ চিতোরকে রক্ষা করতে আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত বাড়াবে না।······তবে এ হয়েছে কি জান, যখন ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা হয়, তখন উকিল মোক্তারে বিষয় যাক্ তাও স্বীকার তবু এক ভাই আর এক ভাইয়ের চেয়ে একটু বেশি ভোগ করবে এ প্রাণে সহ্য হয় না।" (১।৪গ)

দেশের সকল প্রকার দুর্যোগের মূলীভূত কারণ জাতীয়তাবোধ অনবহিতার মর্ম্মমূলে বাঁধা থাকে। আপন স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা তার কারণও ঐ একই। পূর্ণ জাতীয়তা-ভাব দেশময় ব্যাপ্ত হলে নানা ভেদ সত্ত্বেও একতা রক্ষা সম্ভব এবং এর অভাবে সচ্চরিত্র ও গুণসম্পন্ন জাতিও পরাধীন হয়ে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। আলাউদ্দিনের সঙ্গে চিতোরের সংঘর্ষে চিতোরবাসীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল এটাই। তাঁরা রাজসিক প্রবৃত্তির অধিকারী ছিলেন সত্য, কিন্তু জাতীয়তা-ভাবের সাত্ত্বিকতা উপলব্ধি করেননি। আমার দেশের হিতে সকলের হিত, আমার দেশের গৌরবে আমার গৌরব, আমার দেশ-ভাইয়ের বৃদ্ধিতে আমি বর্ধিত—এই বিশ্বাস; এবং দেশের মান ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করা যে প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য, প্রয়োজনবোধে সকলে এক হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্ভয়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া নৈতিক প্রয়োজন—চিতোরবাসীর সকল স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে এ চিন্তার প্রসার ছিল না। ক্ষীরোদপ্রসাদ 'পদ্মিনী' নাটকে আলাউদ্দিনের মুখে এই কথাই বলেছেন,

"আলাউদ্দিন। খোদা যে দেশকে মেরেছে, সে দেশ জয় করতে সুযোগ খুঁজতে হয় না। এমন কি অস্ত্রেরও প্রয়োগ করতে হয় না। এক এক প্রদেশকে মারতে আর এক প্রদেশই অস্ত্র। যেখানে এক ভাইকে দিয়ে আর এক ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করা অনায়াস সাধ্য, সেখানে যুদ্ধের আয়োজন একটা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।" (১।৬গ)

'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭) নাটকে মীরকাসিমের আক্ষেপোক্তিতে অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালীর জাতীয় চিন্তার অভাবের কথাই ব্যক্ত হয়েছে :

"মীরকাসিম।......বাঙ্গালার শত্রু নিষ্কাষণ বড় কঠিন কথা নয়। কিন্তু বাঙ্গালার বেইমান—বাঙ্গালার বিশ্বাসঘাতক—সারা বাঙ্গালার অন্ন খেয়ে শরীরে বল করে, হাতে ছুরি ধরে, সেই ছুরি বাঙ্গালার বুকে আঘাত করে, তাদের তাড়ান আমার সাধ্য নয়। আমার কেন—দুনিয়ার এমন কে শক্তিমান আছে জানি না—যে মাতৃভূমির বুকের এই বিস্ফোটকগুলো অপসারণ করতে পারে।" (৫।৭গ)

বাঙ্গালী নব্যযুগের ইতিহাস চিন্তায় আপন দেশ ও জাতির অধঃপতনের কারণটি বিশ্লেষণ করেছিল। ইংরেজদের বাঙ্গলা বিজয়ের অন্যতম কারণ ব্যাখ্যা করে সেকালে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন,

"ইংরাজের ভারত বিজয় জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটনা। এই বৃহৎ দেশ যদি অসভ্য, দুর্ব্বল ও অক্ষম জাতির বাসস্থান হইত, তাহা হইলে, এইরূপ কথা বলা যাইত না। ......অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবাসী তেজে, শৌর্য্যে, বুদ্ধিতে কোনও জাতির অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না।......ভারতবাসী আর সকলগুণে ইংরাজের সমান হইয়াও জাতীয় ভাব রহিত ছিলেন, ইংরাজের মধ্যে সেই গুণের পূর্ণ বিকাশ ছিল।...রাজনীতির দিক দেখিলে ইহাই (ইংরাজদের) ভারত জয়ের শ্রেষ্ঠ মীমাংসা।"*

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ যুগ-ভাবনার সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। আর তাই তিনি নাটকেও অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে আপন যুগচিন্তাকে পরিবেশন করে বাঙ্গালীকে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, ইতিহাস ও দর্শনের সমান সাহায্য নিয়ে।

যুগনায়কেরা যেমন রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে দেশের সকল স্তরের মানুষকে ডাক দিয়ে দেশমাতৃকার মঙ্গলঘটখানিকে ভরে দিতে বলেছিলেন, ক্ষীরোদ-প্রসাদও তেমনি আপন মনের ভাবনাকে নাট্য-চরিত্রের বাক্যসংলাপে সংযোজিত করে সমস্ত দেশবাসীকে দেশকর্মে ব্রতী হতে বলেছেন। 'পদ্মিনী' নাটকে রাহুল সকলকে আহ্বান করে বলেছেন,

"রাহুল। জন্মভূমি ত রাজার একার নয়, জন্মভূমি রক্ষা করা রাজা-

* ধর্ম্ম ও জাতীয়তা : শ্রীঅরবিন্দ ; পৃ. ৬৯-৭১।

প্রজার সমান অধিকার।……প্রজারা হাসতে হাসতে (দেশের) জন্য প্রাণ দেবে।" (৫।৩গ)

স্বাদেশিকতা বিস্তারের ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ শক্তি সাধনার উপাসনা চেয়েছিলেন। দেশবাসীকে সমস্ত দীনতা ও আত্মগ্লানির পঙ্কশয্যা থেকে উদ্ধার করার জন্যে তিনি 'আত্মশক্তি'র প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। বাঙ্গালী আত্মশক্তির উপর যখনই আস্থা হারিয়েছে, তখনই দেশের পরাধীনতা এসেছে অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে। 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে তিনি আত্মশক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন ফকীর চরিত্রের মাধ্যমে,

"ফকীর। আত্মশক্তিতে যে নির্ভর করতে পারে না তার দ্বারা সকল কার্য্যই অসম্ভব। যখন সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয় করলে, লোকে দেখলে সতেরো। কিন্তু যারা বাঙ্গালা হারালে তারা দেখলে অসংখ্য। আত্মশক্তিতে যদি নির্ভর করতে পার তাহ'লে অসম্ভব কেন? লোকে দেখবে তুমি একা, কিন্তু শত্রু তোমাকে দেখবে অসংখ্য।" (২।৫গ)

জাতীয়তার ক্ষেত্রে নাট্যকার জাতির মনঃশক্তির প্রয়োজনীয়তার উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। দেশবাসীর মনের শক্তিই তার আসল শক্তি; জনসংখ্যার সমষ্টিতে শক্তির পরিমাপ হয় না। 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ মনোবলের প্রয়োজনীয়তার কথা মোহনলালের কন্যা মতিবিবির মুখে প্রচার করেছেন:

"মতিবিবি।.. মনের বলই বল—মনের বলের অভাব হলে শরীরে বল কোন কাজেরই নয়।…একজন মানুষের মনের জোরে লাখ লাখ প্রচণ্ড শক্তিশালী লোক যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। সেই একজনের আদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামানের মুখে প্রাণ দেয়। আবার সেই একজনের অভাবে তারা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।…হাজার দুই আড়াই ইংরেজদের সেপাই…নবাবের চল্লিশ হাজার সৈন্যকে দেখতে দেখতে হারিয়ে দিলে। যদি মরিয়া হয়ে তারা চেপে পড়ত, তাহ'লে সে আড়াই হাজার কোথা থাকত! এতেও বুঝতে পারছ না—মনের বলে মানুষ কি অসাধ্য সাধনই না করতে পারে? মনের বলের অভাবে কোটি কোটি লোকের বাসভূমি হয়েও বাঙ্গালাভূমি যেন আজ জনশূন্য।" (২।৬গ)

তাই বাঙ্গালীর করাল কৃষ্ণ দুর্যোগের সময়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ আহ্বান

করেছেন চৈতন্যরূপিনী বরদা শক্তিকে। 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকে শক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ, বিজয়া চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ করেছেন আপন মনের অভীপ্সাকে :

"বিজয়া। মহাকালীর মূল মন্ত্র—দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করুক।··· জন্মভূমির শ্যামল বক্ষে দিন দিন গম্ভীর শেলাঘাত আর সহ্য করতে পারি না। মা, করালবদনে! দুর্ব্বল রক্ষণে, দানবদলনে—চির প্রসারিত দশ হস্ত কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ মা! এইবার দেখা···প্রচণ্ড মাতৃপীড়ক যে বাহুর শেলাঘাতে নির্ভিন্ন হৃদয় হয়ে রক্ত বমন করেছে, সে বাহু একবার দেখা! আয়—মা! জটাজুট-সমাসভা অর্দ্ধেন্দুশেখরা লোচনত্রয়স'যুক্তা পূর্ণেন্দু-সদৃশনয়না—আয় মা। প্রসন্ন বদনা, দৈত্যদানবদর্পহারিণী, শত্রুক্ষয়কারিণী, সর্ব্বকামদায়িনী—আয় মা! উগ্রচণ্ডে প্রচণ্ডে প্রচণ্ড বলহারিণী—নারায়ণী—একবার আয় মা।···ডাক যুক্ত করে মাকে ডাক! মা, মা, বলে চিৎকার করে যোগমায়ার নিদ্রাভঙ্গ কর। মা আমার—আর একবার—আয়। বল্ মা প্রচণ্ড বলহারিণী! একবার বল্! বহুকাল পূর্ব্বে দানবপদদলিত ধরিত্রীকে রক্ষা করতে ইন্দ্রাদি দেবগণের সম্মুখে উচ্চারণ করেছিলি, সেই বাক্য তোর এই অদৃষ্টনির্ভর সন্তানগুলোকে শুনিয়ে একবার বল্।" (২।২ গ)

'নন্দকুমার' নাটকেও নাট্যকারের অনুরূপ মনোবাসনার স্বাক্ষর পাই। নন্দকুমারের কুলগুরু বাপুদেব শাস্ত্রী দেশের দুর্গতি ও অভাব মোচনে চৈতন্যরূপিণী দেবীর বন্দনা করেছেন :

"বাপুদেব শাস্ত্রী। একি করলি মা চৈতন্যরূপিণী? বাঙ্গালীর কোন্ পাপে তাকে পরিত্যাগ কোরে গেলি?···চার দিক থেকে স্বার্থরূপী রাক্ষস বাঙ্গালাকে গ্রাস কর্ত্তে একসঙ্গে হাত বাড়িয়েছে! এই ঘোর দুর্দ্দিনে তার সন্তানদের চেতনাবিহীন করলি! এক মুহূর্ত্তের অন্ধকার যখন কল্পান্ত সময় বোলে বোধ হয়, তখন কতকালের জন্য এই অভাগ্য জাতির মাথায় এই ঘনান্ধকার ঢেলে দিলি? ধর্ম্মহীনের মনুষ্যত্ব থাকে না, মনুষ্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে মান যায়, মর্য্যাদা যায়, স্বাধীনতা যায়—। পরপদদলিত জাতির উপর প্রকৃতি মানুষে একসঙ্গে নির্ম্মমভাবে অত্যাচার করে। দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি দৈব পীড়নে সোনার গৃহ—শ্মশান হয়, ভাই ভাইকে চিনতে পারে না, পিতা মাতা মোহান্ধ হোয়ে সন্তানের কল্যাণ আর বুঝতে পারে না! কিরীটেশ্বরী যে কিরীটের ঔজ্জ্বল্যে একদিন জগৎকে বিমোহিত করেছিলি, জ্ঞানের সেই পূর্ব্বাভাস কোন্

গুপ্ত ভাণ্ডারে লুকিয়ে রাখলি? তোর সেবক বাঙ্গালী তোরই রূপ প্রভায় কোথায় সমস্ত ধরণীর অজ্ঞানান্ধকার দূর করবে, তা না কোরে দিগন্তের অন্ধকার প্রলয় তরঙ্গ নিয়ে তাকে গ্রাস ক'রতে আসছে! তামসময় জলদমালা, বন্যার বারিরাশি, শূন্যে শকুনি গৃধিনীর পরিক্রমণ, নিম্নে ক্ষুধার্ত্ত ফেরুর চীৎকার! মা বাঙ্গালীকে রক্ষা কর।" (২।৫গ)

আবার,

"মা! অভিশপ্ত জীবন রাখার চেয়ে অনন্ত নিদ্রায় ডুবে যাওয়া সুখকর! দেহে বল, হাতে কার্য্যকারী শক্তি, অগাধ বুদ্ধি, অনন্ত আশা সব থাকতেও কি বাঙ্গালী জাতির নাম ধরণী বক্ষ থেকে মুছে যাবে? কিরূপ বলি দিলে দেশ রক্ষা হয় একবার বল্! ব'লতে কুণ্ঠিত হোস্, ইঙ্গিত কর্। একবার ভ্রূকুটি কুটিল ইঙ্গিতে তিরস্কার ছলেও আমাদের একবার গন্তব্য পথটা দেখিয়ে দে! দৃষ্টিশক্তির অভাবে এ অভাগ্য পথিকগুলা চল্‌তে চল্‌তে পরস্পরে প্রতিহত হোয়ে ক্রমে চলবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেল্‌ছে। তবু তুই নিথর? কোমল অঙ্গে পাষাণের জড়তা মিশ্রিত ক'রে কঠোর হিমাদ্রির মতন কারুণ্য রসহীন জীবন নিয়ে বসে থাকা তোরও কি এত ভাল লাগ্‌লো।" (৩।৩গ)

ক্ষীরোদপ্রসাদের এই শক্তিতত্ত্বে যুগপ্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। মনে হয় তিনি রাজনীতির দিক থেকে চরমপন্থীদের সমর্থক ছিলেন। তাঁরা জাতীয় উত্থানে দেশমাতৃকার খর্পররূপধারিণী মূর্তির আহ্বান কামনা করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের এই মনোবৃত্তির সমর্থন পাওয়া যাবে শ্রীঅরবিন্দের একটি লেখার সঙ্গে তুলনা করলে:

"স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি মাতৃপূজা।...স্বদেশ মাতা, স্বদেশ ভগবান, এই বেদান্ত শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের জীবস্বরূপ।...এই সপ্তকোটি বঙ্গবাসী, এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর আশ্রয় শক্তিস্বরূপিণী, বহু-ভুজান্বিতা, বহু বলধারিণী ভারত জননী মাতা, দেবী, জগজ্জননী কালীর দেহ বিশেষ। এই মাতৃপ্রেম, মাতৃমূর্ত্তি জাতির মনে প্রাণে জাগরিত।... যে মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, তাহা কেবল উত্তেজনার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, শক্তি চাই।...সেই শক্তি তোমাদের শরীরে অবতরণ করিতে উদ্যত হইতেছেন। সেই শক্তিই মা। তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার উপায় শিখিয়া লও। মা, তোমাদিগকে যন্ত্র করিয়া এত সত্বর, এমন সবলে

কার্য্য সম্পাদন করিবেন যে, জগৎ স্তম্ভিত হইবে। সেই শক্তির অভাবে তোমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে। মাতৃমূর্ত্তি তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তোমরা মাতৃপূজা ও মাতৃসেবা করিতে শিখিয়াছ, এখন অন্তর্নিহিত মাতাকে আত্মসমর্পণ কর। কার্য্যোদ্ধারের অন্য পন্থা নাই।'২

ক্ষীরোদপ্রসাদের তন্ত্র-সাধনার প্রতি অনুরাগ ছিল আশৈশব। তিনি তন্ত্র-সাধকের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি'র সদস্য ও 'অলৌকিক রহস্য পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। ক্ষীরোদ-প্রসাদ ধর্মজীবনে রামকৃষ্ণের বেদান্ত ব্যাখ্যায় আকর্ষণ অনুভব করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শ্রীসারদা মার কাছে দীক্ষা নেন। তাই তাঁর মাতৃতন্ত্র সাধনা বেদান্ত তত্ত্বেরই বাহ্যিক প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিবাদী বোধি চিন্তা ও বিবেকানন্দের জ্ঞানবাদী বেদান্ত ব্যাখ্যা, উভয়ের বিমিশ্র সমন্বয়ে তিনি আপন স্বদেশচিন্তার অনুধ্যান গড়ে তোলেন। একদিকে যুগপ্রভাব ও অন্যদিকে ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যয়ের বেণীবন্ধন সুদৃঢ় হয়েছিল বলেই তিনি বেদান্ত, তন্ত্র ও পুরাণকে একত্রে সমন্বিত করে রাজনৈতিক ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করেন। বাপুদেবের মুখে তিনি আপন চিন্তার বিশ্লেষণী রূপ দিয়েছেন 'নন্দকুমার' নাটকে :

"বাপুদেব। সর্ব্বাগ্রে রূপ চাই, কেন বুঝেছ? যে শ্রীহীন সে সংসারে কছুই করতে পারে না। মশকের শোণিত শোষণে বঙ্গভূমি কঙ্কালসার। সর্ব্বাগ্রে নন্দকুমার মায়ের শ্রী রক্ষা কর, দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে দেবরাজ একদিন শ্রীহীন হয়েছিলেন। মা, বৈকুণ্ঠবিহারিণী কমলা সেইজন্য কিছুকাল সমুদ্রগর্ভে লুকিয়েছিলেন। নন্দকুমার! তোমাদেরও আজ সেই দশা।... তোমরা উচ্চ জাত্যাভিমানের তমোময়ী কার্য্যহীনতায় মুখ লুকিয়ে বসে আছো।" (৩৷৩গ)

এইভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদ জাতীয় আন্দোলনকে ধর্মের একটি অঙ্গ বলে গ্রহণ করে শক্তিমন্ত্রে তাকে প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন। স্বদেশচিন্তা তাঁর কাছে মাতৃপূজা ও মাতৃপ্রেম ; শক্তি সাধনা দেশ মাতৃকার মুক্তির মঙ্গলাচরণ। এইটুকু উপলব্ধি করলেই তাঁর স্বাদেশিকতার স্বরূপটি আমরা বুঝতে পারি।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ একই উজানে গা ভাসিয়েছিলেন। তাই অন্যান্য নাট্যকারদের মত তাঁর চিন্তাও—স্বদেশ-

ও জাতীয়তা, অতীতের সমস্যা : শ্রীঅরবিন্দ ; পৃ. ৭৪-৭৬

প্রেম ও স্বজাতিবোধ। অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে সমসাময়িক স্বদেশ-চিন্তার প্রতিফলন তাঁর ঐতিহাসিক চেতনার মূল ধর্ম। ইতিহাসবোধ ও ইতিহাস-রসের পরিবেশনায় তাঁর লক্ষ্য ছিল না। অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে তিনি আপন যুগ প্রভাবকে অনুরঞ্জন করতে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার প্রথম স্বাক্ষর 'প্রতাপ-আদিত্য'। ইতিহাসের আশ্রয়ে জাতীয় ভাবের প্রথম প্রবর্তকের গৌরব নিঃসন্দেহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাপ্য। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের ঐতিহাসিক পটভূমিতে জাতীয়তাবাদী নাটক রচনার জন্য অগ্রজের খ্যাতি ও আসন তর্কাতীতভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

'প্রতাপ-আদিত্য' নাটক স্বাদেশিকতার উষ্ণ পরিমণ্ডলে রচিত হয়েছিল। নাটকটি রচনার বৎসরে (১৯০৩) ইংরেজ সরকার বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব নেন। বাঙ্গালীর মনে ও চিন্তায় স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদ বাঙ্গলার ইতিহাস থেকে এই জাতীয় বীরের কাহিনী গ্রহণ করেন। তবে ইতিহাস-সত্য এখানে খুব বেশী স্বীকৃত হয় নি। উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে প্রতাপ-আদিত্য চরিত্র ও কাহিনী নিয়ে চরিত-সাহিত্য রচিত হয়েছিল। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' এ বিষয়ের প্রথম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমন কি অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের কাব্যেও এই রাজ-চরিত্রের সগৌরব উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের যুগে বাঙ্গলা সাহিত্যে ক্ষাত্রধর্ম পুনরুজ্জীবনের জন্য জাতীয় বীরের যে গভীর অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল, তার কোন কারণ ভারতচন্দ্রের সময়ে ছিল না। সে যুগ ছিল প্রধানতঃ স্বদেশচিন্তার শূন্য যুগ। তবুও ভারতচন্দ্র এই বাঙ্গালী বীরের কাহিনী তাঁর কাব্যে অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে এঁকেছেন। তবে ভারতচন্দ্রের প্রতাপাদিত্য সামন্ত-বীর হিসাবে চিত্রিত আর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্য' জাতীয়-বীর হিসাবে পূজিত। দুই যুগধর্মের ভিন্নমুখীনতাই এক চরিত্রকে দুই রূপে চিত্রিত করেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ আপন যুগচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকে তিনি সংগ্রামের ক্ষাত্র আদর্শ প্রচার করেন।* যুগপ্রভাব ও স্বীয়

* "প্রতাপ-আদিত্য নাটকখানি এক হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস। বাঙ্গালীর শক্তি জগতে দুর্লভ, আবার বাঙ্গালীর দৌর্বল্যও চির প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালী না পারে এমন কোন কর্ম্মই নাই, অথচ বাঙ্গালীর প্রবর্ত্তিত কোন মহাকার্য্যেরই শেষ রক্ষা হয় না।......বাঙ্গালী

মনের ধর্মীয় বিশ্বাস—দুইয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতাপ-আদিত্য চরিত্র রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও প্রতাপাদিত্য চরিত্র অবলম্বনে একটি উপন্যাস ও নাটক রচনা করেন। 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১২৮৯ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস-সম্মত ক্ষমতান্ধ চরিত্র রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেও কোথাও তিনি তাঁকে জাতীয় বীর হিসাবে চিত্রিত করেননি। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস-সত্যকে কোনদিন অস্বীকার করতে চাননি। সাহিত্য-চর্চার পাশে তিনি ইতিহাসের বিশুদ্ধ চর্চাও করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' যে লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধার ও সুচারু অনুশীলনের আহ্বান জানিয়েছিলেন আপন স্বদেশবাসীর কাছে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার অন্যতম উদ্বোধক। তাই ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস ও নাটক রচনা করলেও তিনি ইতিহাস সত্যকে দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধের উত্তেজনায় বিকৃত করতে চাননি। 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের সূচনায় তিনি লিখেছেন,

"এই উপলক্ষে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি, তিনি অন্যায়কারী, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপর পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না।"

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে এই একই ভাবের প্রকাশ। প্রতাপাদিত্যের মুসলমান বিরোধ ও বিদ্বেষকে তিনি সঙ্গত আকারে তুলে ধরে লিখেছেন,

"যে মুসলমান আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করেছে তাদের যারা মিত্র, তাদের বিনাশ না করাই অধর্ম্ম।" (১।২গ)

চেষ্টা করিলে কি করিতে পারে, আবার যে দোষে তাহার বহুকালের চেষ্টার ফল ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা নাট্যকার যথা সম্ভব চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।"

—প্রতাপ আদিত্য (ভূমিকা), মন্মথমোহন বসু।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যসাধক। ক্ষণিকের উদ্দীপ্ত রক্তিম আবেগ ও উত্তেজনার আগুন তিনি পোহাতে চাইতেন না। আপন দূরদৃষ্টি বলে উগ্র জাতীয়তা বা Nationalism-এর ধ্বংসাত্মক রূপটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। দেশবাসীকে অন্ধ স্বাদেশিকতায় উৎক্ষিপ্ত হতে দেওয়ার কোন অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। তাই স্বদেশী যুগের উগ্র জাতীয়তাবোধ লাঞ্ছিত ঐতিহাসিক নাটক তাঁর কাছে কখনও সমাদর পায়নি।

'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে নাট্যকার যুগের কবলে পড়ে ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে গ্রহণ করতে পারেননি। নবাবী আমলের সন্ধ্যালগ্নে শেষ দুই নরপতির ছবি তিনি নাটকে এঁকেছেন। আমরা গিরিশচন্দ্র ঘোষের আলোচনায় ইতিহাসের পটভূমিতে দুই নবাব-চরিত্রের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে প্রয়াস পেয়েছি। সমকালে অনেক জাতীয়হিতবাদী ঐতিহাসিকেরা শেষ দুই নবাবের জীবন ও কার্য্য-কলাপকে নূতনরূপে রূপায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন; আর ক্ষীরোদপ্রসাদও স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণবোধ করেছিলেন এই স্বদেশহিত কর্মপ্রয়াসের প্রতি। 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে'র মুখবন্ধে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত বিহারীলাল সরকারের 'পলাশী' প্রবন্ধ পাঠ করে সিরাজ-চরিত্র অবলম্বনে নাট্যরচনার অভিলাষ হলেও, গিরিশচন্দ্র তাঁর আগে লিখে ফেলায় তিনি আপন ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। তবুও 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদের সিরাজ-প্রীতি অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে পড়েছে। নাট্য-সংলাপের বহু স্থানে তিনি সিরাজ সম্পর্কে ইতিহাস অসমর্থিত জাতীয় ভাবাবেগপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। মীরকাসিমের চরিত্রও ইতিহাসের সত্যকে বহুলাংশে লঙ্ঘন করেছে। তবে সমস্ত কিছু যুগ প্রভাবেরই অনিবার্য পরিণতি।* ক্ষীরোদপ্রসাদ মীরকাসিমের উক্তিতে, সিরাজদৌল্লাকে স্বদেশপ্রেমিক নবাব হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন,

"মীরকাসিম। ...সিরাজদৌল্লার পর বাঙ্গালায় আর নবাব নেই।" (৩।৪গ)

পুনরায়,

"মীরকাসিম। মুর্শিদাবাদের মসনদ—তাতে বসা এখন নবাবী না

* "ইহার ঐতিহাসিকাংশে বিহারীবাবুর 'ইংরাজের জয়', শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'মীরকাসিম' নামক গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।"—পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত; মুখবন্ধ: ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

গোলামী? নবাবী, সিরাজদৌল্লার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। নবাব নিষ্ঠুর ঘাতকের হাতে শুধু নিজের প্রাণ দেয় নি, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার প্রাণটা পর্য্যন্ত দিয়ে দিয়েছে। (১।৫গ)

অন্যত্র,

"মীরকাসিম। রাজা! (রাজবল্লভ) অধীর চিত্ত বশে এক সময় আমি সিরাজের নিন্দা করেছিলাম, এখন দেখছি নিন্দা করে মূর্খতা করেছি। আমি যখন প্রজার এ মূর্ত্তি দেখে ধৈর্য্য ধরতে পারছি না তখন সিরাজের ন্যায় করুণ-হৃদয়-বালকের পক্ষে এ দৃশ্য দেখে স্থির থাকা অসম্ভব। অথচ নির্ম্মম জগৎ তাকে নিষ্ঠুর অভিধান প্রদান করেছে।" (৪।১গ)

মীরকাসিম-চরিত্র পরিকল্পনা, ক্ষীরোদপ্রসাদের অনুরূপ মনোভাবনার সৃষ্টি। তিনি তাঁকে প্রজাবৎসল পরোপকারী নবাব হিসেবে এঁকেছেন। নাট্যকার দেখিয়েছেন যে, মীরকাসিম দেশী প্রজাদের দুঃখে কাতর হয়ে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যনীতিতে আঘাত হেনেছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত আমোদ-প্রমোদ দিয়েছিলেন বন্ধ করে:

"মীরকাসিম। এতে (অবাধ বাণিজ্য নীতিতে) বাধা না দিলে ত দেশ বাঁচবে না। পাপে ক্রমাগত লিপ্ত হয়ে তাদের ধর্ম্মজ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে।...সময়ের অপেক্ষা করতে করতে দেশ রসাতলে যায়। আর প্রাণের জ্বালা সহ্য করতে পারছি না—একবার প্রতিবাদ করে লোক পাঠাই। ...(প্রজাদের) উৎসব আড়ম্বর একেবারে বন্ধ করে দিন। বিলাসিতা তুলে দিন। আর যে সকল অকর্ম্মণ্য শুধু বসে বসে সরকারের মাসোহারা ভোগ করছে তাদের মাসোহারা বন্ধ করুন।... প্রজা না খেয়ে মরবে, আর তাদের অন্নে দেহ পুষ্ট করে কেউ যে ঘরে বসে পর নিন্দায়, পাপ চিন্তায় আর চক্রান্তে সময় নষ্ট করবে, তা করতে দেব না।" (৪।১গ)

মীরকাসিমের এই যে ত্যাগব্রত ও প্রজাকর্তব্য-পরায়ণতা, তার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের রচনায়।* গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদ-

* "রাজপুত রাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজ প্রতাপ সিংহ বৃক্ষপত্রে ভোজন ও তৃণশয্যায় শয়ন করিতেন। মোগল রাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার আশায় কাসিম আলি আত্ম সুখভোগের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা তিরোহিত করিয়া বায়সংক্ষেপ সাধন করিলেন। এ বিষয়ে কাসিম আলির সমকক্ষ নরপতি বঙ্গ সিংহাসনে পদার্পণ করেন নাই।"

—মীরকাসিম: অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়; পৃ. ৭০

প্রসাদ একই আদর্শে প্রভাবান্বিত। মীরকাসিমের জাতীয়তাবোধের আর এক চিত্র পাই লুৎফন্নেসার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে। জাতীয়তার স্বার্থে নাট্যকারের একদিকে ঐতিহাসিক সত্যবিকৃতি ও অন্যদিকে স্বদেশ-চেতনার বিস্তার পরিকল্পনা—দুই বিপরীতমুখী চিন্তা উপলব্ধির প্রয়োজনে উদ্ধৃতিটি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য :

"মীরকাসিম। (ছদ্মবেশে) কাসিম আপনার সম্পত্তি চুরি করেছিল বটে, কিন্তু সে নিজের জন্য করে নি।

লুৎফন্নেসা। নিজের জন্য করে নি তবে কার জন্য, হজরৎ!

মীরকাসিম। আমি বোধ করি দেশের জন্য, আপনার স্বামীর প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধের জন্য।

লুৎফন্নেসা। এ যে বুঝতে পারছি না! নবাবের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে নবাব পত্নীর সর্বস্ব অপহরণ! এ রহস্য যে বুঝতে পারলুম না হজরৎ!

* * * *

মীরকাসিম। শত্রু বড় বলবান। তাকে বাঙ্গালা দেশ থেকে দূর করতে হলে অগাধ অর্থ চাই। সে অর্থ কাসিম আলির নেই। নবাবকে বন্দী করবার অব্যবহিত পরেই তার ধনাগারে সমস্ত অর্থ লুণ্ঠিত হয়েছিল। কোনও স্থানে টাকা পাবার সম্ভাবনা নেই জেনে তিনি আপনার সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিলেন।" (১।৬গ)

আবার,

"মীরকাসিম। একেবারে নিরাশ হই নি। বাঙ্গালার স্বাধীনতা রক্ষা জীবনের সঙ্কল্প করেছি...। হতাশ হলে বাঁচবো কেন?" (২।২গ)

ক্ষীরোদপ্রসাদ 'নন্দকুমার' নাটকেও দেশপ্রীতির বশবর্তী হয়ে ইতিহাসের প্রকৃত বিচারকে গ্রহণ করেননি। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে বিবাদের ঐতিহাসিক পটভূমিকায়, নাট্যকার এই চরিত্রের উপর স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতির যে ভাব আরোপিত করেছেন, তা ছিল একান্তভাবেই আপন যুগের। ইতিহাসে একথা অবশ্য স্বীকৃতি পেয়েছে যে নন্দকুমার ইংরেজদের হাতে কোন সুবিচার পাননি, এবং কোন অপরাধ তিনি করেননি, যাতে তাঁর প্রাণদণ্ড হতে পারে।* তবে একথাও ঐতিহাসিক তথ্য

* "There is no doubt that Nanda Kumar did not receive a fair trial, and

বিচারে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি দেশপ্রেমিক বা স্বদেশহিতবাদী ছিলেন না। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ বিচারে তাঁর কর্মসূচীর স্বরূপ উদ্ধৃতি হিসাবে গ্রহণ করব আমরা :

"So far as we can judge from the facts at our disposal there seems to be little doubt that Nanda Kumar had made an attempt to injure the cause of the Company. It may also be admitted that he was possibly willing to drive the English out of Bengal. But it is very difficult to ascertain the real motives behind all this. His proposal to Mir Kasim shows that he was probably actuated by the motives of self interest rather than patriotism. His intrigue with Shuja-ud daulah, if it can be regarded as a fact, may be interpreted to mean that he wanted to expiate his former sin (helping Clive to capture Chandernagore and thereby defeat Siraj-ud-daulah) by making a last minute effort to drive out the English. But this is at best doubtful. As regards his intrigues with the French Government at Pondicherry, the Raja of Burdwan and other rebellious Zamindars, they may be regarded as the actions of a man, naturally disposed to intrigues, on behalf of his master, rather than any organized attempt against the English. On the whole, it is difficult to assert, with any amount of certainty, that Nanda Kumar's action was inspired by a patriotic zeal to free his country from the yoke of the British. * * *

But whatever we might think of the motives of Nanda Kumar, the capital punishment inflicted upon him had evidently nothing to do with these previous transactions.

there was a miscarriage of justice at least in respect of the capital punishment inflicted on him."—An Advanced History of India : Dr. R. C Mazumder and others ; p. 786.

Whatever may be our views about the legality of his conviction and of the sentence passed upon him by the Supreme Court, there is nothing to show that it was influenced in any way by any previous action of Nanda Kumar against the interest of the British Government······ There is, therefore, no reasonable ground to suppose that Nanda Kumar died a martyr's death."[৩]

কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ নন্দকুমারকে এঁকেছেন মহান্ জাতীয় নেতা হিসাবে। তাঁর মৃত্যু, নাট্যকারের কাছে ইন্দ্রপতন বলে মনে হয়েছে। তিনি নন্দকুমারের মৃত্যুকে মহাগুরু নিপাত বলে মনে করে দেশবাসীকে অশৌচ পালনে রতী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। বাপুদেব শাস্ত্রীর উক্তি পক্ষান্তরে নাট্যকারের নিজস্ব বক্তব্য:

"বাপুদেব শাস্ত্রী। দেখলে? বাঙ্গালী! দেখলে? খুব ভীড় কোরে এসেছিলে তো! খুব হায় হায় করলে—বুক চাপড়ালে—চোখের জলে মাটি ভাসালে; কিন্তু বুঝলে কি কিছু? ব্রাহ্মণ সব কলকেতায় আজ অন্ন গ্রহণ করবে না···। এই ভারতবর্ষের উদীয়মান মহানগরীর বায়ু—এক সঙ্গে দুটি সামগ্রী লয়ে খেলা করছে! বামে দুর্গশিরে একটি রক্তবর্ণ পতাকা, আর দক্ষিণে এই রজ্জুলাঞ্ছিত ব্রাহ্মণের দোদুল্যমান শব। হিন্দু, তোমার সিংহবাহিনীর সিংহ আজ অন্যের অঞ্চল আশ্রয় কোরেছে; আর তোমার ব্রাহ্মণ আজ শক্তিহারা শব।·· নন্দকুমার দুলুক দুলুক, তোমার ঐ যজ্ঞোপবীত বিভূষিত বপু বায়ুতে আন্দোলিত হোক। দুলতে দুলতে তোমার শব হিন্দুকে স্মরণ করিয়ে দিক যে ব্রাহ্মণ শক্তির অবসানে সকল বর্ণের শক্তিলোপ! শক্তিলোপই আর্য্য জাতির পতন......।" (৫।৯গ)

শক্তি সাধনার মহার্ঘী নির্দেশ থাকলেও নাট্যকার নন্দকুমারকে কিভাবে চিহ্নিত করেছেন, তা বুঝে নিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না।

'বাঙ্গালার মসনদ' (১৯১০) নাটকেও ঐ একই কথা। দেশপ্রীতির খাতিরে ইতিহাসের নিষ্করুণ' সত্যের অপলাপ ঘটিয়েছেন তিনি এখানে।

৩ History of the Freedom Movement in India (Vol I); Dr. R. C. Mazumdar; pp. 64-65.

নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে নাট্যকার সবিনয়ে নিবেদন করেছেন যে, নিখিলনাথ রায় ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত ইতিহাসলিপি তিনি অনুশীলন করেছেন। এই নাটকের অনৈতিহাসিকতার মূল আশ্রয় সরফরাজ খান। ইতিহাসে সরফরাজের যা পরিচয় পাই তা এই,

"While observing merely the external formalities of religion, Sarfaraz was a man of low morals, too much addicted to the pleasures of the harem, and so he whiled away most of his hours in the company either of self-seeking and idle theologians, or of the 1500 women of his harem. Not to speak of his want of strength of his character and administrative genius, he lacked all the essential qualities needed for the rular of a state and developed a foolish simple mindedness unbecoming of the position he held."[৪]

শুধু তাই নয়, সরফরাজকে নিজ দোষেই সিংহাসন হারাতে হয়েছিল। ইতিহাসও এ বিষয়ে অবিকল্প সাক্ষ্য বহন করে,

"The administration of the province consequently fell into confusion and disorder. This state of things emboldened the officials as well as the magnets of the province to augment their respective influence even at the cost of the Nawab, who had ultimately to lose not only his throne but also his life as the price of his inefficiency."[৫]

কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাঙ্গালার মসনদ' নাটকে ইতিহাসের এই প্রতিলিপি একেবারে অনুপস্থিত। নাটকে নবাব সরফরাজ একজন দরবেশ। তার চরিত্র সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন উজীর আহম্মদের উক্তিতে,

"আহম্মদ। সরফরাজকে—আয়ত্তে আনা দূরে থাক—এখনও ভাল করে চিনতে পারলুম না। বহুমূল্য নজর নবাবের পায়ের কাছে ধরলুম, নবাব মর্য্যাদার সহিত ফিরিয়ে দিলে, ছুঁলে না।......গোপন করব কেন,

৪ History of Bengal, (Vol II) : Sir Jadunath Sarkar ; p. 435.

৫ History of Bengal, (Vol II) : Sir Jadunath Sarkar ; p. 435.

শ্রেষ্ঠ রূপের প্রলোভনে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি, অকৃতকার্য হয়েছি।" (১।১গ)

সর্‌ফরাজের নৈতিক অধঃপতনের যে চিত্র ইতিহাসে লেখা আছে, তাকে তিনি উপাদান হিসাবে অস্বীকার করতে পারেননি ; কিন্তু সমস্ত কিছু ভোগ ও বিলাসমত্ততার মাঝে তিনি নবাবের ফকিরী রূপটি চিত্রিত করেছেন। সর্‌ফরাজ 'বাঙ্গালার মসনদ' নাটকে সমুচ্চ মহিমায় চিত্রিত। বিশেষভাবে তাঁর ঐতিহাসিক প্রমোদাগারটি যেন ক্ষীরোদপ্রসাদের হাতে দেব-দেউলে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি হারেমের কামিনীদের 'ভগিনী' সম্বোধনে সহোদর ভ্রাতার আচরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে গাউস-পত্নী মালেকার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন বিশেষভাবে লক্ষণীয়,

"মালেকা। তাইত! (নতজানু) আপনি কি নবাবের মূর্তি ধরে আমার আশ্রয়দাতা হজরত?

সর্‌ফরাজ। উঠ ভগিনী! আমি ক্ষুদ্র দীন—ও মহৎ অভিধানের যোগ্য নই। তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবতী, তুমি শরণ পেয়েছ, আমি শরণপ্রার্থী। জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে তিনি তোমার সাহায্যে আমাকে জীবন-মরণের পথে ফিরিয়ে এনেছেন।" (২।৬গ)

এ ছাড়া সুসজ্জিতা ঘসিটির প্রত্যাখ্যান (৩।৪গ) বিষয়টি এবং জগৎ শেঠের অপূর্ব সুন্দরী পৌত্রবধূ দর্শনের অভিলাষে, সর্‌ফরাজের পিতৃ-হৃদয়ের কন্যা-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ব্যাখ্যা—সমস্ত কিছু নাট্যকারের ঐতিহাসিক মর্যাদা লংঘনের নিদর্শন বহন করে।

ইতিহাসের শাশ্বত মূল্যকে অস্বীকার করবার পিছনে সে যুগের নাট্যকারদের এক গূঢ় কারণ ছিল বলে মনে হয়। স্বদেশচিন্তার যৌবন-মুক্তি পর্যায়ে নাট্যকারেরা দেশ ও জাতি ব্যতিরেকে অন্য কিছু ভাবতে পারতেন না। সুতরাং তাঁরা স্বদেশবাসীর হিতের জন্যই ইতিহাসের তথ্যকে লংঘন করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, মুসলমান রাজ-চরিত্রের নব মূল্যায়নের কারণটি ছিল আরও গভীরে। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মুসলমান সম্রাট অথবা বাঙ্গলাদেশের নবাবদের অধিকাংশই ছিলেন অমিতাচারী ও হিন্দুবিদ্বেষী; ইতিহাসের এই নির্জলা সত্যকে যুগধর্মের প্রচ্ছদপটে গ্রহণ করা ছিল একেবারে অসম্ভব। যুগনেতারা জাতীয় সংহতি বজায় রাখবার জন্য হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য গড়ে তুলতে বিশেষ তৎপর ছিলেন। নাট্যকারেরাও অনুরূপ চিন্তায়

প্রভাবিত হন। ইংরেজ সরকারের বিভেদ নীতিকে ব্যর্থ করে দেবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা ইতিহাসের উপাদানকে ভেঙ্গে চুরে নতুন ছাঁচে গড়ে নেন। তাঁরা ঐতিহাসিক নাটক লিখতে চাননি, চেয়েছিলেন ইতিহাসের বেদীতে জাতীয়তার নির্ভীক মন্ত্র প্রচার করতে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের খাতিরে ও জাতীয় সংহতি উপস্থাপনার তাগিদে নাট্যকারেরা মুসলমান নৃপতিদের প্রজানুরঞ্জক হিসাবে চিত্রিত করেছেন। আর এজন্যই কেবল সরফরাজ নন, 'পদ্মিনী' নাটকে আলাউদ্দিন খিলজী ও আলমগীর, হিন্দু-মিলন অভিলাষী আদর্শবাদী রাজপুরুষ হিসাবে চিত্রিত। বিংশ শতকের বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদের বাণী এইভাবে অতীতের পুরাতন পাত্রে পরিবেশিত হয়েছে। হিন্দু-মিলনগীতি প্রচার করে সম্রাট আলাউদ্দিন, পাঠান-পতিকে বলেছেন,

"আলাউদ্দিন। আমার ইচ্ছা, হিন্দুর সঙ্গে সৌহার্দ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, হিন্দু-মুসলমানে ভাই ভাই হয়ে, দিল্লীর সিংহাসনকে উভয়ের জাতীয় সম্পত্তি করে দিই।...আমি কি বন্ধু দেশ জয় করতে বেরিয়েছি? আমি হিন্দুস্থানের সমস্ত অধিবাসীকে, হিন্দু-মুসলমানকে এক করতে বেরিয়েছি।" (৩।৫গ)

'আলমগীর' নাটকের পিছনেও একই চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনি। স্বদেশপ্রীতির স্বার্থেই মোগল আমলের প্রধান হিন্দুবিদ্বেষীর মুখে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা প্রচার করা হয়েছে:

"আওরঙ্গজেব। মহান্ রাণা রাজসিংহ। শুনুন—ঈশ্বর এক আলমগীর আর এক রাজসিংহকে এ সময়ে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, যৌবনে তারা দুজনে এক সময়ে এ গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে না। যখন উভয়ে প্রবেশ করলে, তখন রাজসিংহ ক্ষতবিক্ষত দেহ, আর আলমগীর—দেহে, মনে, বাক্যে জরার পীড়নে জর্জ্জরিত। তবু—এ মিলনের অভিলাষ—হে কবি, বছর যাক্, যুগ যাক্, বহু শতাব্দী চলে যাক্, শতাব্দীর পরে, একদিন তোমার তুলিকা মুখে আলমগীরের এ মিলন অভিলাষ—হিন্দু-মুসলমানের মিলন অভিলাষ মুখর হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে এই (ভীমসিংহকে দেখাইয়া) চির-জাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর সম্মুখে, এই রহস্যময় গুহার মধ্যে পরস্পরকে—হিন্দু-মুসলমানে একবার আলিঙ্গন করি।"* (৫।১২গ)

* আলমগীর (১৯২১) আমাদের আলোচনার কালসীমা বহির্ভূত।

এ ছাড়াও ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য নাটকে বহুস্থানে হিন্দু-মুসলমানের যে ঐক্যকথা বিবৃত করা হয়েছে, তাতে যুগচিন্তা ও যুগপ্রভাবের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। বিবৃতিগুলি উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক্। 'প্রতাপ আদিত্য' নাটকে, প্রতাপ-আদিত্যের জাতি-আহ্বানে ও ভুঁইয়ারাজ ইসা খাঁর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে জাতি-ঐক্যের কথা প্রচারিত হয়েছে :

"প্রতাপ-আদিত্য। ভাইসব! তোমরা সবাই মিলে মা যশোরেশ্বরীর যশোরের সীমা বৃদ্ধি কর। হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত, এক স্নেহরস সিঞ্চিত। বাল্যে ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃসেবা কার্য্যে প্রতিযোগিতায়, বার্দ্ধক্যে আত্মীয়তায়—এস ভাইসব—আমরা এক প্রাণে, এক মনে মায়ের দুঃখ দূর করি। পরস্পরের সহায়তায় বঙ্গে মহা যশোহরের প্রতিষ্ঠা করি। মাতৃসেবা কার্য্যে আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই, সেখ নই, পাঠান নই—বঙ্গসন্তান।" (৩।৩গ)

আবার,

"প্রতাপ-আদিত্য। বঙ্গদেশে আপনার মত দু'চারজন হিন্দু-মুসলমান থাকলে কি আর এ দেশের দুর্দ্দশা হয়? কবে বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান আপনার মতন পাগড়ী বদলাবদলি করবে জনাব?

ইসা খাঁ। আশ্বস্ত হও, শীঘ্রই করবে। দু'দিন বাদে সবাই বুঝবে বাঙ্গালা মুলুক—হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়—বাঙ্গালীর।" (৪।২গ)

'পদ্মিনী' নাটকেও এই মিলন-বাণী স্থান পেয়েছে। গোরার সঙ্গে নসীবন ও উজিরের কথোপকথনে এ তথ্য প্রচারিত :

"গোরা। মুসলমানী! বেশ বেশ—তাহলে আমি তোমার হিন্দুস্থানী ভাই, আর তুমি আমার মুসলমানী ভগিনী। সেই প্রথম মানব দম্পতি থেকে তোমারও উদ্ভব—আমারও উদ্ভব। শুধু নিজে নিজে আমাদের উপাধি ভেদ করে চক্ষে নানা বর্ণের আবরণ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে আমরা যে যাকে পৃথক করে ফেলেছি। বেশ হয়েছে—আজ নিতান্ত কাতর হয়ে ভগবানের কাছে স্ফূর্তি চেয়েছিলুম—সে স্ফূর্তি পেয়েছি। এস ভগিনী! তোমাকে সাদরে আমার স্নেহ পুষ্পাধারে স্থান দান করি।" (১।৪গ)

আবার,

"গোরা। মানুষ হলে তার আর হিন্দু-মুসলমান নেই—মানুষ দেখলেই ভক্তি হয়। আপনাকে দেখেই আমাদের ভক্তি হয়েছে।

উজীর। হিন্দু-মুসলমান দুই-ই যাঁর সৃষ্টি, তাঁর কাছে ত বিভেদ নেই ভাই—বিভেদ আমরা আপনাআপনির ভেতর করে আত্মহত্যা করি।" (৩।৪গ) পুনরায়,

"উজীর। একি উন্নত ধর্ম্মজীবন। এই হিন্দু জাতিকে আমরা চিন্তে পারলুম না! সামান্য আত্মীয়তায় অতি সহজে যাদের আমরা আপনার করতে পারতুম, ক্ষুদ্র স্বার্থে, নীচ অভিমানে, চক্ষে ইচ্ছাপূর্ব্বক মোহের আবরণ দিয়ে, আমরা কিনা তাদের দেখেও দেখলুম না, এক ঘরে বাস করতে এসেও কি না দূরে দূরে রেখে দিলুম। অথচ যে শক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের দুর্ব্বল করতে চলেছি, তাদের আত্মীয়তায় আবদ্ধ করতে পারলে, সেই শক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হ'ত। হিন্দুস্থান আত্মকলহে বীরশূন্য হ'ত না। হীনবীর্য্য না হয়ে জগতে বীরত্বের কেন্দ্রভূমি হতে পারত।" (৪।১গ)

'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি মুখ্যতঃ মীরজাফরের প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ মীরজাফরের মুখে আপন যুগের বাণী দিয়েছেন। মীরজাফর পুত্র মীরণকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেছেন,

"মীরজাফর। তুমি আমাকে একেবারে নির্ব্বোধ মনে ক'র না মীরণ। কি বুদ্ধি ক'রে আর কাদের বুদ্ধি নিয়ে আমি এ মুলুক হস্তগত করেছি, তা তুমি জান না। আজ তুমি নবাবজাদা হয়ে তাদের ওপর চোক রাঙ্গাতে চলেছো, কিন্তু কিছুদিন আগে ঐ বাঙ্গালী হিন্দুদের মোসাহেবী করতে পারলে, আপনার জন্ম সফল বলে মনে করতে। তাদের কি শক্তি তুমি কিছুই জান না। এদিকে তুমি—যা খুসী করতে চাও করতে পার, কিন্তু ওদিকে হাত বাড়ালে তুমি দুদিনের জন্যও মুরশিদাবাদে টেকতে পারবে না।" (১।১গ)

'বাঙ্গালার মসনদ' নাটকে আলীবর্দী ডাক দিয়েছেন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে তাঁর রণ-অভিযানের সময়কালে :

"আলীবর্দ্দী। ভাইসব! পাটনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে আমি তোমাদের কাছে একটি প্রার্থনা করতে এসেছি। আমি আমার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তোমরা (হিন্দু ও মুসলমান) আমার বহুদিনের সঙ্গী ও একমাত্র বিশ্বাসী। কেবল তোমাদেরই সাহায্যে জয়লাভের আশা করি।" (৪।৫গ)

স্বদেশী আন্দোলন ছিল বাঙ্গালীর জন্মভূমি-প্রীতির বহিঃস্বাক্ষর। দেশমাতৃকা যে কত বরেণ্যা, মাতৃমন্ত্রের সাধনায় যে কত মাধুর্য্য, আত্মদানের গরিমায় জীবনের যে কত মাহাত্ম্য,—সেদিনকার বাঙ্গালী জীবন দিয়ে

বিশ্ববাসীর সম্মুখে এই নতুন আদর্শ গড়ে তুলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' দেশ-মাতৃকার যে চিন্ময়ীরূপ বন্দনা, তা এই সময়ে বাঙ্গালীর কাছে বিগ্রহ রূপ ধারণ করল। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র হয়ে দাঁড়াল সমস্ত বাঙ্গালীর মহামিলন-গীতি। বাঙ্গলা দেশের আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত হল এই অমর দেশ বন্দনায়। 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকে এই মাতৃমন্ত্রের সাধনার কথা সমানভাবে প্রসারিত। দিল্লী প্রত্যাগত প্রতাপ একাকী প্রবেশ করলেন জন্মভূমিতে। দীর্ঘদিনের মাতৃ অদর্শনের বেদনার সঙ্গে দেশ-মাতৃকার পরাধীনতার মর্মবেদনা তাঁকে ব্যাকুল করে তুলল। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতাপ-আদিত্যের আক্ষেপোক্তিতে, আপনকালের জাতির মর্মভেদী কাতরোক্তিকে বাণীবদ্ধ করেছেন,

"প্রতাপ-আদিত্য। মা বঙ্গভূমি! তোমার এই প্রাণোন্মাদকর নামের ভিতর এত মধুরতা, এমন কোমলতা, এরূপ ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ছড়ানো আছে তা' তো জানতুম না। মা! তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার, কোটি কোটি নমস্কার—বারংবার নমস্কার। কিন্তু কি করি? কেমন করে যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা করি? করতেই হবে। মান যাক্, যশ যাক্, তথাপি বঙ্গভূমিকে শত্রু পদদলন থেকে রক্ষা করতেই হবে।" (৩।১গ)

প্রতাপ-আদিত্যের এই শপথবাক্য বাঙ্গালীর সেই সময়ের জীবন-পণ অঙ্গীকার। জন্মভূমিপ্রীতি ও দেশবন্দনা ছিল বাঙ্গালীর জীবনের নব গায়ত্রীমন্ত্র। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্যে' জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ও দেশবন্দনা সমানভাবে সোচ্চার হয়েছে। জন্মভূমির প্রতি অনুরাগের কথা বলতে গিয়ে বসন্ত রায় তাঁর স্ত্রী ছোট রাণীকে লেছেন,

"বসন্ত রায়। বসন্ত রায় চেষ্টা করলে সব ভুলতে পারে, তোমার মতন স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য সব ভুলতে পারে, কিন্তু যশোরকে ভুলতে পারে না। রাণি! ব্যাঘ্র ভল্লুকপূর্ণ বিশাল অরণ্যের ভিতর থেকে গগনস্পর্শী অট্টালিকা-সকল মাথায় করে আমার সাধের অমরাবতী জেগে উঠেছে। স্বর্গ প্রলোভনেও আমি সে যশোরকে ভুলতে পারলুম না।" (১।৭গ)

প্রতাপ-আদিত্যের মুখে ঐ একই কথা,

"প্রতাপ-আদিত্য। সম্মুখ সমরে, দেহ ত্যাগে যে স্বর্গ, আমি সে স্বর্গ চাই না। যে কার্য্যে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির বিন্দুমাত্র উপকার হয়,

সে কার্যে যদি নরকও অদৃষ্টে থাকে, যদি বুঝতে পারি—মা আমার বেঁচেছে —তা হলে হাসিমুখে নরকেও প্রবেশ করতে পারি।" (৪।১গ)

ক্ষীরোদপ্রসাদ যেমন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নৈতিকবল ও মনোবলের কথা শুনিয়েছেন, তেমনি বাহুবলের প্রয়োজনীয়তার উপরেও গুরুত্ব দিয়েছেন সমানভাবে। 'জয়ের কারণ শক্তি'। জাতির আধ্যাত্মিক বল, মানসিক বল ও বাহুবল—এই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির সমন্বয়ে জাতীয় বল গড়ে উঠে। বাঙ্গালীর সবজনবিদিত বাহুবলহীনতার কথা স্মরণ করে ক্ষীরোদপ্রসাদ 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকে দুঃখ করে বলেছেন,

"ভীরু পদলেহী পরান্নভোজী সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভর বাঙ্গালী কি মনুষ্যযোগ্য কোন কাজই করতে পারে না? স্তন্যপায়ী শিশুর মতন মাতৃভূমির গলগ্রহ-স্বরূপ হয়ে শুধু কি উদর পূরণের জন্যই বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ করেছে।" (১।১গ)

ক্ষীরোদপ্রসাদ 'প্রতাপ-আদিত্য' লিখেছিলেন বাঙ্গালীর বাহুবল সাধনার অগ্নিক্ষরা দিনে, বাঙ্গালী তখন 'শিবাজী উৎসব'-এর আয়োজন করে শূরধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। এই সময় থেকে বাঙ্গালী প্রকাশ্যভাবে ইংরেজ বিতাড়নের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছে। কেবল বিলাতী দ্রব্য বর্জন করে নয়, বাহুবল ও অস্ত্রবলের প্রয়োজনীয়তার কথাও বাঙ্গালী ভাবতে আরম্ভ করে সমানভাবে। চারিদিকে বাঙ্গালীর সশস্ত্র অভিযানের যে প্রস্তুতি দেখা দিয়েছিল, তার প্রভাব ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকে দেখতে পাই প্রতাপ-আদিত্য ও শঙ্করের কথোপকথনে,

"শঙ্কর। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের চির দুর্বল করে লক্ষ্যভেদের শক্তি আছে কিনা পরীক্ষা করছিলুম।

প্রতাপ-আদিত্য। আর আমি দেখছিলুম হিন্দুস্থানের এ সীমান্ত প্রদেশের বনভূমি হ'তে নিক্ষিপ্ত বাণ কখনও কোন কালে আগ্রার সিংহাসনে পৌঁছতে পারে কিনা।" (১।৩গ)

বিংশ শতকের ব্রাহ্ম মুহূর্তে বাঙ্গালী নিশ্চিতভাবে অনুভব করে যে, সংঘবদ্ধ জাতীয় ঐক্যশক্তি নিঃসন্দেহে শক্তিমান বিরোধী পক্ষকে প্রতিরোধে সক্ষম। জাতীয় ঐক্যের সংঘবদ্ধ শক্তি বাঙ্গালীকে আত্মনির্ভরতা ও উদ্দেশ্যের স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর নব জাগ্রত অখণ্ড জাতীয়-চেতনার কথা নাট্যকার অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে ব্যক্ত করেছেন, প্রতাপ-আদিত্য ও সূর্যকান্তের কথোপকথনে:

"প্রতাপ-আদিত্য। আজিম কে তা জান? কত বড় বীর, তা কি তোমাদের জানা আছে?

সূর্য্যকান্ত। জানি মহারাজ! আজিম···বহু যোদ্ধাকে সংগ্রামে পরাস্ত করেছে।···কিন্তু এটাও জানি—বাঙ্গালায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালী। আজিম দাক্ষিণাত্যে এক এক যুদ্ধে এক এক সেনাপতিকে পরাস্ত করেছে। কিন্তু একটি জাতি যে যুদ্ধের সেনাপতি, যে স্থানের অগণ্য সৈন্য একমাত্র প্রাণের আদেশে পরিচালিত, আজিম কখনও সেরূপ সৈন্যের সম্মুখীন হয় নি। প্রকাণ্ড বাহিনীর ধ্বংস হয়, কিন্তু এক প্রাণে পরিচালিত একটি জাতি অতি ক্ষুদ্র হলেও তার বিনাশ নেই। মহারাজ! কাঠবিড়ালী দিয়েই সাগর বন্ধন। অল্পে অল্পে সঞ্চিত মৃত্তিকা কণায় সাগর হৃদয় ভেদ করে যে বাঙ্গালার সৃষ্টি, সে বাঙ্গালার সঞ্চিত ক্ষুদ্র বাঙ্গালী শক্তিকণায় কি সম্রাটের বিশাল-শক্তির বিলোপ হতে পারে না?" (৪।২গ)

নাটকে, ক্ষীরোদপ্রসাদ বাঙ্গালীর চারিত্রিক জীবনের অসংগতি ও দুর্বলতাকে তুলে ধরেছেন নিঃশঙ্কভাবে। কারণ স্বজাতির নানা অসম্পূর্ণতার দিকে আঘাত হেনে তাদের তিনি আত্মসচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রকৃত দেশপ্রীতি, জাতির কেবল গুণগানই করে না, যোগ্য কারণে, সমালোচনার আয়ুধে তার ক্ষতস্থানে অস্ত্রোপচার করে দেশবাসীর দীর্ঘকালীন সঞ্চিত রোগের অবসান ঘটায়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বাঙ্গালীর ঐক্যবোধে অনীহা ও বাহুবলহীনতার কথায় যেমন আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, তেমনি তিনি বাঙ্গালার সংঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা দেখে আপন চিত্তের আনন্দ-আতিশয্যকেও সমানভাবে করেছেন প্রচার। সেলিমের প্রতি সম্রাট আকবরের উক্তি প্রকারান্তরে বাঙ্গালার নবজাগরণের স্তুতি-বন্দনা :

"আকবর। বাঙ্গালীতে একতা এসেছে। বাঙ্গালী একটা জাতি হযেছে। বাঙ্গালার বিদ্রোহ—তুচ্ছ ভুঁইয়ার বিদ্রোহ নয়। সাত কোটি বাঙ্গালীর বিশাল জাতীয় অভ্যুত্থান।" (৫।১গ)

ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নাটকে কেবল সাংগঠনিক জাতীয়তাবাদের প্রচার করেননি, তিনি ইংরেজ রাজত্বে বাঙ্গালীর চিরস্থায়ী অর্থনৈতিক বিপর্যয়জনিত দরিদ্র দেশের দুরবস্থার চিত্রণ তুলে ধরেছেন সমানভাবে। অতীত ইতিহাসের প্রচ্ছদপটে আপন যুগের নিঃস্বতার বাণীই হয়েছে

প্রচারিত। ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণে গ্রাম্য বাঙ্গালীর ধূসর রূপের ছবি তিনি এঁকেছেন 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকে। বাঙ্গলার দীর্ঘস্থায়ী পাণ্ডুর রূপের কথা প্রকাশ করে প্রতাপ-আদিত্য বন্ধু শঙ্করকে বলেছেন,

"প্রতাপ-আদিত্য। পথে আসতে আসতে যা দেখলুম, তাতেও যদি জ্ঞান লাভ না হয়, তবে সে জ্ঞান কি আগ্রায় গেলে হবে? কি দেখলুম! জনাকীর্ণ নগর জঙ্গল হয়েছে। বড় বড় অট্টালিকা ব্যাঘ্র ভল্লুকের বাসস্থান। নদী-তীরস্থ বাণিজ্য প্রধান বড় বড় বন্দর জনশূন্য! দেবমন্দির বিধর্মীদের আমোদ উপভোগের স্থান হয়েছে। এইরূপ বাসন্তী সন্ধ্যায় যে স্থানে আকাশ আনন্দের কলকলে পূর্ণ থাকত, সেখানে এখন শৃগালের বিকট চিৎকার। যার গৃহে অন্ন ছিল, যে প্রজা অর্থে সামর্থে সচ্ছল ছিল, দেশের অরাজকতায় তার গৃহেই এখন হাহাকার।" (২।৩)।

বিপর্যস্ত গ্রাম বাঙ্গলার এই চিত্র মুখ্যতঃ ইংরেজ রাজত্বের নিষ্করুণ শোষণের অসহনীয় রূপ; আর প্রতাপের পথ-পরিক্রমা নাট্যকারেরই ভ্রমণলিপি।

ইংরেজের অবাধ বাণিজ্য বাঙ্গলার কুটীরশিল্পের পতন ঘটিয়েছিল, এ সংবাদ আমরা বহুস্থানে পেয়েছি। ক্ষীরোদপ্রসাদ 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের অবলুপ্তির চিত্র অঙ্কিত করেছেন, মীরজাফর ও গুরগণের কথোপকথনে:

"মীরজাফর। কি হে গুরগণ! আর দেখতে পাই না কেন?

গুরগণ। হুজুরালি জানেনইত কাপড়ের সন্ধানে গোলামকে বাঙ্গালার নানা স্থানে যেতে হয়।

মীরজাফর। সে রকম মলমল আর দেখতে পাই না কেন গুরগণ!

গুরগণ। শুধু মলমল কেন জাঁহাপনা! আর কোন সামগ্রীই দেখতে পাবেন না। বাঙ্গালার সে সকল অপূর্ব্ব শিল্প দেখতে দেখতে লোপ পায়।

মীরজাফর। কেন বল দেখি।

গুরগণ। কোম্পানীর একচেটে ব্যবসা সব খেয়ে দিলে। কারিগর সব একটি একটি ক'রে সরে পড়েছে। তারা বলে এ সমস্ত সামগ্রী সখের দর। দাদনের বাঁধনে পড়লে এতে মেহনত পোষায় না। দু'একজন ইংরেজ ব্যবসাদার বেশি খাটিয়ে অল্প পয়সা দেয়। না দিতে পারলে অত্যাচার। হুজুরের তরফ থেকে তার কোনও প্রতিকার হয় না। কাজেই তারা একে একে গা ঢাকা দিচ্ছে।

মীরজাফর। তা হ'লে দেখছি ব্যবসাগুলো ক্রমে ক্রমে যেতে লাগলো।

গুরগণ। যেতে লাগলো কি জাঁহাপনা, এক রকম গিয়েছে। কৌন্‌সিলে দরখাস্ত ত' সকল লোকে করতে পারে না। তারা জানে নবাবই রাজা—নবাবই রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু গোস্তাকি মাপ হয়, নবাব তার কোনও প্রতিকার করতে পারেন না।·····অত্যাচারে ভাল ভাল তাঁতি সব বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলেছে, যাতে আর তাঁতে হাত না দিতে হয়। আপনার এই মেদিনীপুর জেলায় প্রায় লাখো তুঁতিয়া তুঁতের চাষ করত—রেশমের ব্যবসা উঠে যাচ্ছে—তারা না খেতে পেয়ে চুরি ডাকাতি আরম্ভ করেছে।" (২।৩গ)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবাধ লুণ্ঠনের চিত্রও তিনি নিঃসংশয় চিত্তে এঁকেছেন। ঐতিহাসিকদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার-বিশ্লেষণে যা গ্রহণযোগ্য হয়েছে, তাকেই তিনি নাটকে চিত্ররূপ দিয়েছেন। গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্ট, ফিরিঙ্গী বণিকদের হৃদয়হীন অবাধ বাণিজ্য নীতিকে সমর্থন করতে পারেননি। ইতিহাসের এই সিদ্ধান্ত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে স্বীকৃত। ইংরেজদের দুরপনেয় কলঙ্কের কথা এই নাটকে স্থান পেয়েছে বলেই বোধহয় লজ্জাস্খলনের উদ্দেশ্যে সর্ব সমক্ষে এর অভিনয় ও মুদ্রণ ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

"ভ্যান্‌সিটার্ট। আমি নবাবের সঙ্গে কথা বলিয়া যা বুঝিয়াছি, তাহাতে তাঁহার কোন অপরাধই আমি দেখিতে পাই না। দিবারাত্র প্রজার হাহাকারের মধ্যে বসে কোন রাজা কখনও কি রাজ্য করিতে পারে! তা দয়াবান মীরকাসিম কেমন করিয়া পারিবেন। আমার কাছে প্রজার কথা তুলিতেই তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল! তাহার পর আমি সন্ধান লইয়া জানিয়াছি সমস্ত দোষ আমাদের।······অর্থের প্রলোভনে ইহাদের (ইংরাজদের) মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ইহারা শুধু নবাবের অনিষ্ট করিতেছে না, কোম্পানীরও যথেষ্ট অনিষ্ট করিতেছে।······(আমিয়েটকে)

I say Mr. Amyatt! I am sorry to say, we are entirely to blame for this regrettable transaction and Nawab is perfectly justified in putting a stop to this illegal trade.··· There are ample proofs. I have received private intelligence, that a party of Sepoys who were sent to Sylhet by the gentlemen at Dacca, on account of some private dispute,

fixed upon and killed one of the principal people of the place and afterwards made the Zeminder prisoner···If this shameful oppressive system be not checked, the respective class of native merchants will be ruined, whole districts will be impoverished, the entire native trade will be dis-organized ··I think that the honour and dignity of our nation will be best maintained by scrupulous and careful restraint of the 'dustuck'." (৪।৩গ)

'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদের এই উক্তি যে কতখানি সত্য তা নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করব আমরা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং কলকাতার মেয়র কোর্টের মাননীয় জজ মি: উইলিয়াম বোল্‌টস্ তাঁর 'Consideration of Indian Affairs' পুস্তকে ফিরিঙ্গী বণিকদের অত্যাচারের বাস্তব চিত্র এঁকে রেখেছেন,

"We come across to c nsider a monopoly, the most cruel in its nature and most destructive in its consequences to the Company's affairs in Bengal of all that have of late been established there. Perhaps it stands unparrelleled in the history of any Government that ever existed on earth, considered as a public act ; and we shall be not less astonished when we consider the men who promoted it and the reason given by them for the establish ment of such exclusive dealings in what may there be considered as necessaries of life."[৬]

'নন্দকুমার' নাটকেও এই একই চিন্তার প্রকাশ দেখি। নন্দকুমার ও পুত্র রাধাচরণের কথোপকথনে ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া ব্যবসাজনিত দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা ব্যক্ত হয়েছে :

"নন্দকুমার। তোমরা কি জান—দেশের মধ্যে কোম্পানীর নামে এই যে রক্তশোষক ব্যবসা চলেছে, তা কি খাস কোম্পানীর ব্যবসায় ?

রাধাচরণ। কোম্পানীর নয় তবে কার !

৬ 'Considerations on Indian Affairs' ; William Bolts ; London, 1772.

নন্দকুমার। ওর একখানা ব্যবসা কোম্পানীর নয়। কোম্পানীর গোমস্তারা কোম্পানীর নামে চোরাই ব্যবসা করছে! বিশ পঞ্চাশ টাকা মাইনে বিলেতের অতি সামান্য লোক চোরাই ব্যবসায়ে ফেঁপে উঠেছে!...... কোম্পানীর জাল দস্তকে ওদের প্রায় বারো আনা লোক চোরাই ব্যবসা কোরেছে।" (১।১গ)

দেশের অভ্যন্তরে, ইংরেজের নিষ্ঠুর শোষণনীতিতে যে পাণ্ডুর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, আপন দেশবাসীকে সেদিকে সচেতন করবার তাগিদ নিয়েই নাট্যকার কঠোর প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন।

ইংরেজদের অমানবিক আচরণের দিকটিও তুলে ধরতে দ্বিধা করেননি নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ। আমরা এর আগে ভূমিকা বিচারে শ্বেতাঙ্গ স্বামীদের কৃষ্ণ-বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করেছি 'Black Act' ও 'Ilbert Bill' আলোচনায়। শাসন নীতিতে যেমন বর্ণ বৈষম্য ছিল, তেমনি ধলো-কালোর বিভেদ ছিল সমাজনীতিতেও। শ্বেতাঙ্গদের ভয়ে এদেশীয়দের আপন দেশের ব্যবহার্য দ্রব্যে অধিকারভোগ ছিল না। ইংরেজদের বর্ণ-বৈষম্য নীতির উদাহরণ পাই 'নন্দকুমার' নাটকে রাধিকা ও ঠগী-সর্দার করিমের কথোপকথনে :

"করিম। ত্রিবেণীতে তোমাদের আজ একটা কি বড় গোছের পরব ছিল না?

রাধিকা। ছিল মহা বারুণীযোগ। এ রকম যোগ বিশ-পঞ্চাশ বছরের ভেতর হয়তো একবার আসে।

করিম। হিন্দুরা দেশ বিদেশ থেকে দলে দলে এই পরবে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করতে এসেছিল, কিন্তু তাদের ধূলো পায়েই আজ ফিরে যেতে হোল! বেচারীরা স্নান করতে পেলে না।...যাত্রীরা এসে দেখে, ঘাটে হাজার হাজার নৌকা বাঁধা......তারা নবাবের সঙ্গে লড়াই ক'রতে মুঙ্গের চলেছে। ত্রিবেণীতে রাত কাটাতে ঘাটে নৌকা বেঁধেছে। তারা যাত্রীদের জলে নামতে দিলে না।......কালা আদমি নাব্‌লেই জল ময়লা হবে, গোরারা সেই জল খাবে, খেলে যদি তাদের ওলাউঠো কি আর কোন বেমার হয়।" (২।৪গ)

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সকলকে মাতৃরূপ বন্দনায় ক্ষীরোদ-প্রসাদ উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বলেই জনসাধারণের কাছে তাঁর ঐতিহাসিক

নাটকগুলির আবেদন ছিল অপরিসীম। বাঙ্গালীর শান্ত শীতল ধমনীতে সেদিন নবজাগরণের যে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে তারই প্রতিফলন ঘটেছে বলেই নাটকগুলির অভিনয় সাফল্যে ইংরেজদের মনে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটক ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগস্ট ষ্টার থিয়েটারে অত্যান্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। সীতারাম ও কেদার রায়ের মত প্রতাপ-আদিত্য বাঙ্গলার জাতীয় বীর বলে পরিচিত ছিলেন বলে জনচিত্তে এই নাটকের প্রভাব দিল দুর্নিবার। বাঙ্গালীর চিত্তে এই নাটকের বিদ্যুতসঞ্চারী ক্রিয়া দেখে ইংরেজদের মুখ্য পত্রিকা 'Englishman', ইংরেজ সরকারকে দমনমূলক ব্যবস্থা নিতে সকাতর অনুরোধ জানায়। 'নাট্যমঞ্চ'-সমালোচক এই প্রসঙ্গটিকে অত্যান্ত সুন্দরভাবে আপন পুস্তকে তুলে ধরেছেন তৎকালীন সময়ের প্রসঙ্গ আলোচনায়।

'Besides the times were also exciting. Anglo-Indian papers, however, became vocal.

The Englishman wanted the Government to take special measures as the ideas the drama intended to propagate were dangerous. The Star, however, hit upon a novel idea of pointing out to the people, when Protap was taken under chains, the image of the Goddess of England and that our salvation lies there. This seemed to have pacified the situation."[৭]

'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকে যে ক্রোড়াঙ্ক সংযোজন,* তা আইন রক্ষার উপায় মাত্র। ইংরেজ সম্প্রদায় কতদূর বিচলিত হয়েছিল, উপরের আলোচনাই তার প্রমাণ।

'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটিও রাজরোষে পড়ে বাজেয়াপ্ত হয়। স্বদেশের পরাধীনতার জন্য নাট্যকারের মনোবেদনা,—যা তিনি মোহনলালের

৭ Indian Stage (Vol. IV) : H. N. Das Gupta, p. 156.

* "বাঙ্গালী শত বৎসর আপনার পাপের ফল ভোগ করবে। দেশ অত্যাচারে ছেয়ে যাবে। তারপর ওই দেখ প্রতাপ! চেয়ে দেখ—(বৃটানিয়ার আবির্ভাব)—ওই শক্তি বৃটানিয়া—সভ্যতাময়ী—দয়াবতী—অনন্ত শক্তিময়ী বৃটানিয়া—পাপের অত্যাচার থেকে তোমার প্রতিষ্ঠিত যশোরের পুনরুদ্ধার করবেন। প্রতাপ, তুমি—নিশ্চিন্ত হও! বারাণসীর পবিত্র ক্ষেত্রে মা আনন্দময়ী তোমাকে কোলে স্থান দেবেন।"

উক্তিতে প্রকাশ করেছেন; তা সমকালে বাঙ্গালী দর্শকদের চিত্তকে দ্রবীভূত করত বিশেষভাবে। কন্যা মতিবিবিকে সে দুঃখ করে বলেছে,

"মোহনলাল। যে ভাবে ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলুম, আর আধ ঘণ্টা যদি এইভাবে এগিয়ে যেতে পারতুম, তা হলে বুঝি পলাশীর যুদ্ধ আর একরকম ইতিহাসে চিত্রিত হত। মীরজাফরের আদেশ আর কিছুক্ষণ কানে না তুললে ইংরেজকে জাহাজে ক'রে দেশে ফিরে যেতে হ'ত। মুরশিদাবাদের মসনদে ক্লাইভের গাধাকে আর বসতে হ'ত না। বড়ই ভুল করে ফেললুম মা, বড়ই ভুল করে ফেললুম।......প্রাণের বন্ধু মীরমদন যুদ্ধে অসাধারন বীরত্ব দেখিয়ে তার সুমুখে শত্রু পল্টন ছারখার ক'রে প্রাণ দিলে, আমি তার মৃত্যুরও প্রতিশোধ নিলুম না।" (১২গ)

কেবল, অশ্রুজলবিমিশ্র মর্মবেদনার প্রকাশ নয়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বাঙ্গালীকে বাঙ্গলার অতীত গৌরবের কাহিনীও শুনিয়েছেন। নাট্যমঞ্চ থেকে নিজের স্বদেশের মাহাত্ম্য ও গৌরবগাথা শুনে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মহনীয়তায় হয়েছিল দৃঢ় ও অনমনীয়। নাট্যচরিত্র ফকীর ও মীরকাসিমের কথোপকথনে, ক্ষীরোদপ্রসাদ বাঙ্গালীকে যে অতীতের সোনার দিনগুলির কথা শুনিয়েছেন, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বঙ্গবাসীকে আবার সেই সুখকর চিন্তাতে ব্রতী হবার সংকল্প গ্রহণ করতে সাহায্য করা :

"ফকীর। এই সেই গৌড়!......এখনও গৌড় মরে নি। বাঙ্গালার নবাবের শিক্ষাস্বরূপ হয়ে এখনও গৌড় বেঁচে আছে। এখানে বসে যারা বাঙ্গালার উপর রাজত্ব করেছে তাদের শক্তির তুলনা ছিল না।.... গৌড় আজ—তার বহু শতাব্দীর ব্যাধি মোচনের জন্য একজন মানুষের অপেক্ষা করছে।......

মীরকাসিম। এদিকে সমস্ত বাঙ্গালার—পূর্ব্ব শক্তির কেন্দ্রভূমি গৌড়ের—প্রেত-মূর্ত্তি। অন্যদিকে শক্তি সৌন্দর্য্যের চরম বিকাশ অলস আবেশে নমিতাঙ্গী মুরশিদ কুলি খাঁর নগরী। একের প্রলোভনে অন্ধকারময় প্রকৃতির পৃষ্ঠ থেকে ক্ষুধার্ত্ত মহামারী প্রভঞ্জনের আবেগে ছুটে এসেছিল। অপরের প্রলোভনে নীল সাগরের বক্রতার অন্তরাল থেকে, পশ্চিমা দিক-রাক্ষসীর ওই অনন্ত প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধা শত লোল রসনায় বাঙ্গালার শ্যাম বনাচ্ছন্ন বেলাভূমিকে স্পর্শ করেছে। যতই দেখছি, ততই প্রাণের ব্যাকুলতায় আমি অস্থির হচ্ছি। সমুখে স্বদেশরক্ষারূপ উচ্চাভিলাষের প্রশস্ত পথ

মুরশিদাবাদের দিকে পড়ে রয়েছে। আত্মশক্তিতে যে নির্ভর করে সেই এই পথে অগ্রসর হোক্।·····গৌড়! তুমি নীরবে ঘন পত্রের অবগুণ্ঠনে ধ্যানমগ্না যোগিনীর ন্যায় মানুষের অপেক্ষা করছ। হে ঈশ্বর! গৌড়ের কামনা পূরণ কর। তার বন্ধনমুক্তির জন্য বাঙ্গালায় একজন মনুষ্য ভিক্ষা দান কর।" (২।৫গ)

অমৃতলাল মিত্র 'মীরকাসিমে'র ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তাঁর অনবদ্য অভিনয়ে দেশপ্রীতির সমস্ত বাণী দর্শকের কাছে হয়ে উঠত প্রাণবন্ত।*

এছাড়াও 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী দর্শক ইংরেজদের চরিত্রের প্রকৃত রূপটি উপলব্ধি করতে পারে নিরাভরণভাবে। ভারত শাসনের মূলে ইংরেজের যে স্বার্থপরতা—বাঙ্গালী তা আগে বুঝেছিল বুদ্ধি দিয়ে; বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সে সত্যকে হৃদয়ে দিয়েছিল গেঁথে। এই নাটকের অভিনয়ের সময়ে এদেশীয় দর্শক ইংরেজ বণিকদের সদম্ভ স্বীকারোক্তি শুনে মনে-প্রাণে বিদ্রোহী হয়ে উঠে শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে,

"Our only concern in this damp-deary-jungly hell, is money······রূপিয়াকা ওয়াস্তে আয়া, রূপিয়া লেকে চলা যাগা।" (পৃ. ১০৫)

এ কথা সত্যি, ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে ক্ষীরোদপ্রসাদ বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধকে উচ্চৈঃশ্রবার গতিবেগ দিয়েছিলেন। তাঁর নাটকের আবেগমুখর সংলাপ বাঙ্গালীর মুখে মুখে ঘুরত। তবুও তাঁর নাটকে দীর্ঘস্থায়ী জাতীয়তাবাদের কোন সূক্ষ্ম চিন্তা নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের মত তাঁর প্রতাপ-আদিত্য চরিত্রটি জাতীয়চেতনার আকর। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সুগভীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে জাতীয় চরিত্রের যে দুর্বলতাগুলি উল্লেখ করেছেন, তা একদিকে যেমন সীতারামের পতন হিসেবে উপন্যাসে সুবিন্যস্ত, তেমনি অপরদিকে ইতিহাসেও সমর্থিত। তাই এই উপন্যাস কেবল সমসাময়িক জাতীয় ভাবের বাহক হয়ে দাঁড়ায়নি, মহাকালের ছাড়পত্র লাভ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছে। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের কোন নাটক সম্পর্কে

* "The lion (Amritalall Mitra) was worn out with age and diseased. Even in that condition such flashes of lightening were now and then omitted by him at the Palasheer Prayaschitta that used to send a thrill to the hearts of the audience.".

—Indian Stage (Vol. IV): H. N. Das Gupta; p. 159.

একথা বলা সম্ভব নয়। আপন যুগচেতনার জাতীয় গৌরবটুকু বুকে ধারণ করে তাঁর রচনা কেবল নিশ্চল মমীর আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের ব্যর্থতাকে যেমন ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন, ক্ষীরোদপ্রসাদের সেই দৃষ্টি-শক্তির ছিল সম্পূর্ণ অভাব। অবশ্য নাট্যকার আপন যুগের নভঃমণ্ডলে পক্ষবিহার করতে চেয়েছিলেন; তাই তাঁর নাটকগুলি বাঙ্গালীর স্বাদেশিক চিন্তার বৃহত্তর প্রয়োজন মিটিয়ে ছিল। সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে সহনশীল মতবাদ, আপন স্বজাতিকে শৌর্য-বীর্য বলে বলীয়ান করবার দৃঢ় সংকল্প, শাসক গোষ্ঠীকে তির্যক ভঙ্গীতে আক্রমণ এবং প্রয়োজনবোধে স্তুতি—সমস্ত কিছু দেশবাসীকে স্বদেশবোধ সম্পর্কে এক ধ্রুব ভাব জাগিয়ে তুলেছিল বলেই তিনি নাটকে জাতীয়চেতনা বিস্তারে 'অগ্রজের মহিমায়' সুপ্রতিষ্ঠিত।

ক্ষীরোদপ্রসাদের রঙ্গনাট্য ও স্বাদেশিকতা

২

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' (Dramatic Performance Act) বিধিবদ্ধ হওয়ার জন্য ইংরেজ সরকারকে আক্রমণ করে কোনো বাঙ্গলা নাটক লেখা নাট্যকারদের অসাধ্য ছিল। সমকালীন বাঙ্গালী নাট্যকারেরা রূপকের আশ্রয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের রঙ্গনাট্য 'দাদা ও দিদি' (১৯০৮) এই শ্রেণীর রচনা। ইংরেজ সরকারের প্রচণ্ড শোষণ নীতি, ইংলণ্ডীয় বিলাসী দ্রব্যের প্রসারে বঙ্গবাসীদের একনিষ্ঠ করবার সচেষ্ট প্রয়াস এবং সর্ব বিষয়ে ভারতবাসীকে প্রদমিত করবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাকে তিনি আপন নাটকে রূপকের অন্তরালে নির্মমভাবে আক্রমণ করেছেন। এই সমালোচনা এতই ক্ষুরধার ছিল যে শাসক সম্প্রদায় নিজেদের দোষ ঢাকতে নাটকটির প্রকাশনা, মুদ্রণ ও অভিনয় বন্ধ করে দেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি' রঙ্গনাট্য প্রধানতঃ ইংরেজ শাসনে ভারতে অর্থনৈতিক অবক্ষয় পটভূমির উপর রচিত। অর্থনীতির নিগূঢ়

ব্যাখ্যা যদিও এতে স্থান পায়নি, নাট্যকার রঙ্গরসের অবতারণা করে রূপকের মধ্যে যেটুকু ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতেই ইংরেজ সরকার প্রমাদ গনেন। আলোচনার স্বার্থে ইঙ্গিতাকারে ইংরেজ রাজত্বে ভারতের অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়া যাক। ভারতে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে একজন অর্থনীতিবিদ দেখিয়েছেন,

"Three main periods stands out in this history of imperialist rule in India. The first is the period of Merchant Capital, represented by the East India Company, and extending in the general character of its system to the end of the eighteenth century. The second is the period of Industrial Capital which established a new basis of exploitation of India in the nineteenth century. The third is the modern period of Finance-Capital, developing its distinctive system of the exploitation of India on the remains of the old, and growing up from its first beginnings in the closing years of the nineteenth century to its fuller development in the most recent phase."[৮]

এই তিন যুগবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ করব। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'মার্চেণ্ট ক্যাপিট্যাল'-এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করে উইলিয়ম ফুলারটন্ লেখেন,

"In former times the Bengal countries were the granary of nations, and the repository of commerce, wealth and manufacture in the East···

But such has been the restless energy of our misgovernment that within the short space of twenty years many parts of these countries have been reduced to the appearance of a desert. The fields are no longer cultivated; extensive tracts are already over-grown with thickets;

৮ India To-Day: Rajani Palme Dutt; Chapter V, p. 97.

the husbandman is plundered ; the manufacturer oppressed ; famine has been repeatedly endured ; and de-population has ensued."[৯]

এই উক্তিটির আরও জোরাল সমর্থন পাই লর্ড কর্ণওয়ালিসের বক্তব্যে ; তিনি লিখেছিলেন,

"I may safely assert that one-third of the Company's territory in Hindustan is now a jungle inhabited only by wild beasts."[১০]

ভারতের লুণ্ঠিত ধনসামগ্রী নিয়ে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক ইংলণ্ড তৈরি হয়েছিল। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক বিচারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাক্,

"Plassey was fought in 1757, and probably nothing has ever equalled the rapidity of the change which followed. In 1760, the flying shuttle appeared, and coal began to replace wood in smelting. In 1764, Hargreaves invented the spinning jenny, in 1776, Crompton contrived the mule, in 1785 Cartwright patented the powerloom and, chief of all, in 1768, Watt matured the steam engine, the most perfect of all vents of centralising energy. But though these machines served as outlets for the accelerating movement of the time, they did not cause that acceleration. In themselves inventions are passive, many of the most important having lain dormant for centuries, waiting for a sufficient store of force to have accumulated to set them working. That store must always take the shape of money, and money not hoarded but in motion. Before the influx of the Indian treasure, and the expansion of credit which followed, no

৯ A view of the English Interests in India, 1787 : William Fullarton.

১০ Minute : Lord Cornwallis, September 18, 1789 :

force sufficient for this purpose existed ; and had Watt lived fifty years earlier, he and his invention must have perished together. Possibly since the world began no investment has ever yielded the profit reaped from the Indian plunder, because for nearly fifty years Great Britain stood without a competitor. From 1694 to Plassey (1757) the growth had been relatively slow. Between 1760 and 1815 the growth was very rapid and prodigious."[১১]

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটাবার জন্য ভারতে চলতে লাগল অবাধ লুণ্ঠন। এদেশে সম্প্রসারিত হল অবাধ বাণিজ্য। ভারতে তৈরী হল না কোনো নতুন সম্পদ, বিদেশ থেকে আমদানী দ্রব্যের উপর বেড়ে গেল প্রচুর করের চাপ এবং দেশীয় শিল্পীরা বিদেশী বণিকদের কাছে বাধ্য থাকল উৎপন্নজাত দ্রব্য অল্প দামে বিক্রি করতে। এর ফলে দারিদ্র্য ও অনাহার ভারতবাসীদের হল নিত্য সহচর। মনুষ্যজীবন স্বাভাবিক মাধুর্য হারিয়ে হয়ে উঠল কর্কশ ও পাণ্ডুর। ইংলণ্ড শিল্পবিপ্লবের ফলে নতুনত্বের স্বাদ পেল ; আর ভারতের শ্রমিকরা হারাল তাদের গৌরবময় ঐতিহ্য ও বর্তমানের রুজি-রোজগার। এই সর্বগ্রাসী নীতিতে ভারতবর্ষে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের 'দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্টে' লেখা হয়েছিল,

"A main cause of the disastrous consequences of Indian famines, and one of the greatest difficulties in the way of providing relief in an effectual shape is to be found in the fact that the great mass of the people directly depend on agriculture, and that there is no other industry from which any considerable part of the population derives its support."[১২]

সুতরাং নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হল। শোষণ অব্যাহত রাখতে ইংরেজ সরকার নতুন পথ ধরলেন। ব্রিটিশ তত্ত্বাবধানে ও মূলধনে তাঁরা এদেশে শিল্পবিস্তারে উদ্যোগী হলেন। পূর্বের দুই নীতির সঙ্গে এর বিশেষ

১১ The Law of Civilisation and Decay : Brooks Adams ; pp. 259-260.

১২ Indian Famine Commission Report, 1878.

কোন পার্থক্য ছিল না ; প্রচার ও প্রকাশ ভঙ্গিতেই যেটুকু পার্থক্য। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনার পরবর্তীকাল থেকে এই পর্বের সূচনা। শিল্প-পুঁজির প্রয়োজন অনুযায়ী ভারত শাসনের বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করা হয়েছিল। অর্থনীতিবিদের মন্তব্য এ বিষয়ে ছিল,

"The distinctive forms of nineteenth century exploitation of India by industrial capital did not exclude the continuance of the old forms of direct plunder, which were also carried forward and at the same time transformed.

The 'Tribute', as it was still openly called by official spokesmen up to the middle of the nineteenth century, or direct annual removal of millions of pounds of wealth to England, both under the claim 'home charges' as well as by private remitting, without return of goods to India (except for the proportionately small amount of governmental stores from England), continued and grew rapidly throughout the nineteenth century alongside the growth of trade. In the twentieth century it grew even more rapidly alongside a relative decline in trade.......

The enormous and rapid increase in the tribute from India to England during the second half of the nineteenth century and accelerating increase in the twentieth century conceal in reality the emergence of new forms of exploitation, developing out of the conditions of the period of free-trade nineteenth-century capitalism, but growing into the new twentieth century stage of the finance-capitalist exploitation of India.

The requirements of nineteenth century free-trade capitalism compelled new developments of British policy in India.

First, it was necessary to abolish once and for all the

Company and replace it by the direct administration of the British Government, representing the British capitalist class as a whole. This was partially realised with the new 1833 Charter, but only finally completed in 1858.

Second, it was necessary to open up India more completely for commercial penetration. This required the building of a network of railroads; the development of roads; the beginnings of attention to irrigation, which had been allowed to fall into complete neglect under British rule; the introduction of the electric telegraph, and the establishment of a uniform postal system, the first limited beginnings of an Anglicised education to secure a supply of clerks and subordinate agents; and the introduction of the European banking system.

All this meant that, after a century of neglect of the most elementary functions of government in Asia in respect of public works, the needs of exploitation now compelled a beginning to be made, although in an extremely one sided and lop-sided fashion (while thwarting and strangling industrial development), directed only to meet the commercial and strategic needs of foreign penetration, and on extremely onerous financial terms to the people."[১৩]

এই একপেশে শিল্পোন্নয়নের ফলে ভারতের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। ইংলণ্ডের উপর ভারতবাসীকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকতে হত। আমরা ইতিপূর্বে রাজনারায়ণ বসুর বক্তব্যে ও 'হিন্দু মেলা'য় গীত মনোমোহন বসুর সংগীতে, দেশের অর্থ নৈতিক দুর্দশার চিত্র অবলোকন করেছি।

১৩ India To-Day, Rajani Palme Dutt; pp 129 132.

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থশোষণ নীতি পরবর্তীকালে লর্ড কার্জনের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে—

"Administration and exploitation go hand to hand."

ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর 'দাদা ও দিদি' রঙ্গনাট্য স্বদেশী আন্দোলনের তপ্ত পটভূমিতে রচনা করেন। বঙ্গভঙ্গ রোধ করা ছাড়াও ভারতবাসী দেশের পঙ্গু অর্থনীতিকে জাতির স্বার্থে একটি গঠনমূলক রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। আত্মনির্ভরতার সঙ্গে অর্থনৈতিক সচেতনতার নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। Dr. Buch এ বিষয়ে মূল্যবান আলোকপাত করে বলেছেন,

"The Swadeshi movement was essentially a movement of self-reliance. It was the first serious attempt on the part of the Indians to take their economic destinies into their own hands."[১৪]

'বয়কট' নীতিতে রবীন্দ্রনাথও কম আস্থাবান ছিলেন না। অর্থদৈন্যে জর্জরিত, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত স্বদেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতে না পারলে জাতির সংকট ও নিজেদের অপমান কোনদিনই মোচন হবে না, এই বোধ তিনি দেশবাসীর অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করে দেন।

"তোমার যা দৈন্য মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি ?
পর ধনে ধিক্ গর্ব, করি কর জোড়
ভরি ভিক্ষাঝুলি !
পুণ্য হস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।
সেই সিংহাসন—যদি অঞ্চলটি পাত,
কর স্নেহ দান।
যে তোমারে তুচ্ছ করে সে আমারে মাতঃ,
কী দিবে সম্মান।"[১৫]

১৪ Rise and Growth of Indian Liberalism : Dr. M.A. Buch ; pp 227-228.

১৫ কল্পনা (ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরেজদের দীর্ঘদিনের অর্থলোলুপ রূপটি নগ্নভাবে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব দেশনেতাদের সঙ্গে সমানভাবে গ্রহণ করেছিলেন সমকালের বিভিন্ন শিল্পী। চারণ-কবি মুকুন্দদাসের যাত্রা জনসমক্ষে পরিবেশন যে নিষিদ্ধ হয়েছিল, তার মূল কারণ ছিল ভারতবাসীর মধ্যে অর্থনৈতিক চেতনার প্রসার রোধ করা। বাঙ্গলা নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি নাট্যকারদের মধ্যে অর্থনীতির যেটুকু তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেই ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গুণেছিলেন। আর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি' রঙ্গনাট্য ছিল সম্পূর্ণভাবেই অর্থনৈতিক নাটক; সুতরাং এ নাটক যে বাজেয়াপ্ত হবে তা ত' স্বাভাবিক।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে 'দাদা ও দিদি' রঙ্গনাট্য রচনা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশনেতাদের সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদ দেশবাসীকে আপন দুরবস্থা ও দেশের নিঃস্ব রূপটি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ইংরেজেরা পূর্বে কি উপায়ে ভারতবাসীকে অবক্ষয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং সমকালেও একই উপায়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে—তার চিত্রটি তিনি নিরাভরণভাবে তুলে ধরেন। রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে সমালোচকের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ তিনি নিপুণ হাতে নিক্ষেপ করেন। 'দাদা ও দিদি' নাটকে যে কটি চরিত্র আছে—প্রত্যেকেই একটি স্বতন্ত্র অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে। তক্ষক ও শঙ্খিনী চরিত্র ইংরেজ-পুরুষ ও ইংরেজ-রমণীর প্রতীক। 'চন্দ্রদ্বীপ' ও 'হট্টমালা'র অন্তরালে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ—দুই দেশ চিত্রিত। ফিরিঙ্গী বণিকদের অর্থগৃধ্নু রূপটি তিনি রঙ্গব্যঙ্গে, বিশেষ ঢঙ ও ইঙ্গিতে চিহ্নিত করেছেন :

"তক্ষক। বস্! আর কী, আর কী, এতদিনে আমাদের পরিশ্রম সার্থক, জন্ম সার্থক।

শঙ্খিনী। আমাদের দেশের বরফ সার্থক, পেটের ক্ষিধে সার্থক। পেটের জ্বালায় আমরা ··হট্টমালাকে গ্রেপ্তার করেছি।

তক্ষক। জিজ্ঞাংসা, জুগোপিষা, চিকিমিষা, বিজীগিষা ··ওই এখন আমাদের মূলমন্ত্র গো! ভয় কি, ভয় কি, মূলমন্ত্র শুনে কাতর হও কেন? তোমাকেও এই মন্ত্র অভ্যাস করতে হবে, দিবানিশি জপ করতে হবে।···

জিজ্ঝাংষা অর্থাৎ কিনা জিঘাংসা, অর্থাৎ মূলমন্ত্র হচ্ছে সংহার—সব খেতে হবে। এখানকার মাটি থেকে আরম্ভ করে মানুষ পশু-পক্ষী, ঘর-বাড়ী —এমন কি উপরে খেচরের মধ্যে ঘুড়ী আর নীচে চতুষ্পদের মধ্যে তক্তপোষ পর্যন্ত উদরগত করতে হবে। বুঝেছো, কিন্তু জুগোপিষা, অর্থাৎ জুগুপ্সা, অর্থাৎ মূলমন্ত্র গোপন রাখতে হবে—কাক পক্ষী পর্যন্ত কেউ যেন এ মন্ত্রের কথা জানতে না পায়, জানবো তুমি আর আমি—তা হলে সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে চিকিমিষা অর্থাৎ চিকিৎসা, বোঝাতে হবে তোমাদের বিষম রোগ—তোমরা ওষুধ না খেলে আর বাঁচবে না। আর যেমনি ওষুধ ধরা অমনি বিজীগিষা—অর্থাৎ সমস্ত দেশটি (ইঙ্গিতাভিনয়) বুঝেছ।···বোঁদ হলে হবে না—ধৈর্য চাই, ধৈর্য চাই! দেখ যদি কোনো রকমে হট্টমালাবাসীরা আমাদের মনের কথা জানতে পারে—তা হলে বিষম বিপদ ঘটবে—বুঝেছ মদিরাক্ষী। যদি নেশায় বোঁদ হয়ে কোনোও প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে ফেল, তা হলে তোমার এ বিশ্বপ্রেমের ফল প্রত্যাশী হয়ে, সবাই মিলে ধরে তোমার থেকে কলম বার করে যে যার নিজের বাগানে পুঁতে ফেলবে। আর এদিকে (স্বরে) আদরে আমাকে দড়ি দিয়ে নাকে ঘোরাবে।···ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর—আর বল জিজ্ঝাংষা, জুগোপিষা।

শঙ্খিনী। চিকিমিষা, বিজীগিষা।" (তৃতীয় দৃশ্য)

আবার আর এক জায়গায় পাই

"তক্ষক। থামো থামো—ব্যস্ত হয়ো না—সমস্ত দেশটি যখন খেতে হবে, তখন রয়ে বসে ধীরে ধীরে খেতে থাকো। যে রকম করে ভেড়া—ছাগল—মৃগ—মহিষাদি খেতে আরম্ভ করেছ, তাতে ওঁরা আর বেশীদিন দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে চরছেন না। দু'দিন পরে দেখবে সব ফাঁক। তখন এদের ইহকাল পরকাল খাওয়া ভিন্ন আর গতি থাকবে না।" (সপ্তম দৃশ্য)

ভারতবর্ষ ছিল ইংলণ্ডের খোলা বাজার। ভারতবাসীকে সব বিষয়েই ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করতে হত। এদেশীয়দের মোহপ্রমত্ত করবার জন্য আমদানী হত নানা চাকচিক্যময় ঠুনকো জিনিস। এইভাবে প্রচুর অর্থ বিদেশে চলে যেত। মুকুন্দদাসের একটি যাত্রাগানে অর্থনীতির এই দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে—

"বলিতে লজ্জা করে, প্রাণ বিদরে
বার লাখের কম হবে না;

পুঁতি, কাঁচ, ঝুটা মুক্তায়, এই বাংলায়
দেয় বিদেশে, কেউ জানে না।”*

এক শ্রেণীর বাঙ্গালীর উগ্র বিদেশীয়ানার নকলকে আক্রমণ করে মুকুন্দদাস গেয়েছিলেন,

“বাবু, বুঝবে কি আর ম'লে ?
কাঁধে তোর ভূত চেপেছে একদম্ দফা সারলে !
খেতে ভাত সোনার থালে,
নাউ সেটিস্‌ফাইড্ ষ্টীলের থালে,
তোমার মত মূর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মিলে ?
পমেটম্ লাইক করিলি দেশী আতর ফেলে,
সাধে কি দেয় রে গালি ‘ব্রুট্, ননসেন্স, ফুলিস্’ বলে !
ছিল ধান গোলাভরা,
ইন্দুরে সব কর্‌লে সারা,
চোখের ঐ চশমা জোড়া দেখ না বাবু খুলে !
কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিতেছে কলে,
ডু ইউ নো ডিপুটি-বাবু, নাউ হেড-ফিরিঙ্গীর বুটের তলে ?”

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদও রঙ্গচিত্রের অবতারণা করে শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাতী দ্রব্যের অনুপ্রবেশের ঘটনা ব্যক্ত করেছেন। চন্দ্রবিন্দু ও চিত্রলেখা—হট্টমালার বড়ঠাকুর ও বড়ঠাকুরাণী—বঙ্গদেশের শিক্ষিত অনুকরণপ্রিয় সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত,

“তক্ষক। এই দেখুন আপনার হাতে দুঃখু—ছড়ি নেই।
(চন্দ্রবিন্দুর হস্তে ছড়ি দান।)
শঙ্খিনী। এই দেখুন আপনার বুকে দুঃখু—ঘড়ি নেই।
(চিত্রলেখাকে ঘড়ি দান।)
তক্ষক। এই দেখুন আপনার পায়ে দুঃখু—মোজা নেই।
শঙ্খিনী। এই দেখুন আপনার নাকে দুঃখু—চস্‌মা নেই।
(নানাভাবে—চন্দ্রবিন্দু ও চিত্রলেখাকে সজ্জিতকরণ)
চিত্রলেখা। তাই ত প্রাণেশ্বর ! এ সব ত আমাদের কিছু ছিল না।

* মনোমোহন চক্রবর্তী রচিত

চন্দ্রবিন্দু। তাই ত প্রাণেশ্বরী! এতকাল বড় দুঃখেই ত দিনযাপন করেছি।

তক্ষক। এখনও হয়েছে কি—আপনাদের অনন্ত দুঃখু—ঘরে চলুন—একটি একটি করে দেখিয়ে দিই গে।" (তৃতীয় দৃশ্য)

শুধু শহরে নয়, গ্রামের মধ্যেও নগরমুখ উগ্র বিদেশীয়ানার নকল শুরু হয়। বিদেশী দ্রব্যের অবাধ বিস্তার ও গতিবেগ গ্রাম্যজীবনের নিথর শান্ত পরিবেশকে ধ্বংস করে। বিলাতী দ্রব্য বহুক্ষেত্রে মনোহারিতার জন্য আকর্ষণীয় হয়ে পড়ে। দেশীয় শিল্পের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর গ্রামীণ জীবনে বিলাস সজ্জার উপকরণ কিভাবে উগ্র মাদকতার সৃষ্টি করেছিল, তার একটি নিখুঁত রূপ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ কৌতুকাকারে এঁকেছেন। 'দাদা ও দিদি' নাটকে কেশিনী নামক জনৈকা বিলাসিনী রমণীর সঙ্গে গ্রাম্য স্ত্রীদের কথোপকথনে সমকালের এই জীবন্ত রূপটি অঙ্কিত। বিলাস, অঙ্গসজ্জা ও শ্রমবিমুখতা এবং হাস্যে-লাস্যে কালাতিপাত, সভ্যতার অঙ্গ ও ভূষণ হিসেবে গৃহীত হয়। আত্মনির্ভরতার যেটুকু ক্ষীণ প্রচেষ্টা বাঙ্গলার গ্রাম্যজীবনে ছিল, তা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায় ও বিদেশী যন্ত্র নির্মিত দ্রব্যের উপর বাঙ্গালী ক্রমশঃ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উগ্র পানীয় দ্রব্য পানের উন্মত্ততার মতো বিদেশী মালের প্রতি আমাদের চিত্ত দিশেহারা হয়েছিল।

"কেশিনী। ··তোমরা কি করছ—কাজ! ছি! ছি! আর কর না—আমরা এতকাল অন্ধকারে ডুবেছিলুম, তাই নিজের সুখ দুঃখ কি তা বুঝতে পারিনি। কাজ অসভ্যে করে, যে সভ্য সে আমার মতন পোষাকে পরিচ্ছদে কেবল আমোদ আহ্লাদে লাটিমটি হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

৪র্থ স্ত্রী। এ বেশ তুমি কোথায় পেলে বোন?

কেশিনী। কেমন, এ বেশ তোমার চক্ষে ঠেকছে কেমন?

১ম স্ত্রী। ঠেকছে ত ভাল, কিন্তু ভাই ধোপে টেঁকবে না।

কেশিনী। না টেঁকে তোমার আমার কি! চরকা না ঘুরিয়ে, তাঁত না তুলিয়ে, মাকু না চালিয়ে—সুতো না সরিয়ে—চোক্ না ক্ষরিয়ে—আর বেশি কত বলব—মন না মরিয়ে, যদি ঘরে বসে, পায়ের ওপর পা দিয়ে যদি এই রকম সামগ্রী জোগান পাই, তাতে—তোমার ওই ট্যাকসই শাড়ী কাপড়ের মুখে ছাই, তাতে লাভ কি?

স্ত্রীগণ। ও দিদি! আমরা পরবো—আমরা পরবো।···আর আমাদের ব্যাপার বুঝতে দেরী সইছে না—আমাদের দেখতে দেখতে আলু থালু বেশ—শিথিল কবরী—

কেশিনী। বুঝি দুঃখ বিভাবরী পোহাল।···

১ম স্ত্রী। তোমরা বোন সহুরে—আমরা পাড়াগেঁয়ে ভূত—আমরা এ সব খবর তোমাদের কাছে না পেলে কোথা পাবো। তোমাদের আচার ব্যবহার দেখব, তবেত বোন শিখবো।

কেশিনী। ওমা! এটা পাড়া গাঁ—তাই ত বলি—পথে আসতে আসতে জুতোর গোড়ালী বসে যাচ্ছে কেন—নাকে কি একটা বেজায় বিধ্‌কুটে বেমানান—বেওয়ারিষ গন্ধ লাগছে কেন?

১ম স্ত্রী। সে কি বোন্—গোবরের গন্ধ—পুণ্যগন্ধ—এ তোমার নাকে বিধ্‌কুটে হয়ে গেল।

কেশিনী। গোবর! কি ভীষণ পূতিগন্ধময় নাম—একটা বনচারী চতুষ্পদ জন্তুর পরিপাকবিশিষ্ট, অতি নিকৃষ্ট তাই! ছি! ছি! ছি! তাই এই ঘরের ভেতরে, মেঝের ওপরে—(নাসিকায় সুগন্ধ রুমাল সঞ্চালন)।

সকলে। আ!—আ!—প্রাণ মেতে গেল! কি গন্ধ—কি গন্ধ—

১ম স্ত্রী। তাইত—এ কি গন্ধ!

কেশিনী। এখন বুঝতে পারছ। তোমাদের স্বামীরা, অর্থাৎ তোমাদের সোয়ামীরা, তোমাদের কি অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে আবৃত করে রেখেছে।" (ষষ্ঠ দৃশ্য)

আমাদের দেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ফেলবার এক বিরাট পরিকল্পনা ইংরেজ সরকার গ্রহণ করেছিল। অবাধ লুণ্ঠন ও নিরঙ্কুশ শোষণের সঙ্গে সঙ্গে চেয়েছিল এদেশবাসীর মানসিক কাঠামোকে ধ্বংস করতে। সেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছিল একদল ইংরেজ স্তাবক, যারা এদেশের অধিবাসী হয়েও ইংরেজ ও ইংলণ্ডের গুণগান করতেন। ভারতভূমিকে পর-দেশ মনে করে ইংলণ্ডের ভূমিকেই মাতৃভূমি (Mother land) বলে বিশ্বাস করতেন। ভারতবাসীদের অধঃপাতের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে ফিরিঙ্গী বণিকরা যখন আনন্দের আতিশয্যে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল, তখন এদেশের একদল শিক্ষিত বাঙ্গালী বিদেশের অধিবাসী হবার মোহে, কল্পনার আতিশয্যে নানা

খোয়াব দেখতেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ দুই চিত্র, নাট্যকারের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অঙ্কিত করেছেন।

"শঙ্খিনী।...আমিও হাট করে এই ফল নিয়ে এলুম। তাঁতি তাঁত ভেঙেছে—কামার মত্ত হয়ে আপনার পায়ে চোপ মেরেছে—কুমোর জালার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে বসে আছে—চাঁদের সুধা খেয়ে সকলেই উন্মত্ত—হাট ভেঙ্গে চুরে ছারখার—খদ্দেরের হাহাকার!" (শঙ্খিনী ও তক্ষক, পরস্পরের কথোপকথন, পৃ. ৪৪)

অন্যদিকে কর্ম্মানন্দের মুখে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে নাট্যকার দেশবাসীর পরদেশ প্রমত্ততার ইঙ্গিতটুকু দিয়েছেন। কর্ম্মানন্দ, ঐ শ্রেণীর দেশবাসীকে সম্বোধন করে বলেছেন :

"কর্ম্মানন্দ। জান না মূর্খ! এ অসন্তোষের পরিণাম কি! এমন ফল-জল-শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা, এমন কুসুম-কানন-বাহিনী স্রোতস্বিনী, এমন মরিচীমালীর সপ্তবর্ণ রঙ্গময়ী শিখরিণী—এতেও তোমাদের মন উঠল না। এমন ওষধিপূর্ণ উপত্যকা, সুবর্ণরাশিপূর্ণ শৈলমালা, মুক্তাপূর্ণ জলনিধি—এ পেয়েও তোমাদের তৃপ্তি হল না। তাই যার বহিরাবরণ শুধু সুন্দর—নির্ম্মম কঠোর অভ্যন্তর, এক পার্শ্বে তরুলতাশূন্য, জীবশূন্য চিরঅনাবৃত চিরঅন্ধকার কবলিত তুষার প্রান্তর—উত্তাপহীন প্রাণহীন চন্দ্রলোকে যেতে তোমাদের সাধ হল। তবে যাও। ভগবান কারুর ঐকান্তিক কামনা কখন অপূর্ণ রাখেন না।..প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে ঘনাবর্তে কাদম্বিনী তোমাদের অদৃষ্ট আকাশ আচ্ছন্ন করতে আসছে।" (তৃতীয় দৃশ্য)

আর একস্থানে চন্দ্রবিন্দু ও চিত্রলেখার উক্তিতে দেখতে পাই,

"চন্দ্রবিন্দু। আসল কথা—হট্টমালাটা তোমার আর ভাল লাগছে না।

চিত্রলেখা। কেমন করে লাগবে! হট্টমালার সব ভাল, কেবল বার মাস চাঁদের আলো নেই।

চন্দ্রবিন্দু। ঠিক বলেছ, এতকাল এ কথাটা আমার মনেই হয়নি। আমাদের এই যে একটা প্রকাণ্ড অভাব তাতো আমরা জানতুম না।... হট্টমালায় দেখছি নানা দোষ।

চিত্রলেখা। চাঁদে বোধহয় বারোমাসই আলো?

চন্দ্রবিন্দু। কোনও রকমে চাঁদে একবার যাওয়া যায়!

চিত্রলেখা। রাবণ রাজা ম'ল, স্বর্গের সিঁড়িটে করে মরত!

চন্দ্রবিন্দু। বেশ, আমরাই না হয় সিঁড়ি প্রস্তুত করি।" (দ্বিতীয় দৃশ্য)

দেশের সাধারণ মানুষের বোধশক্তিকে নষ্ট ও জাতির কশেরুকাকে চিরতরে দুর্বল করে দেবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার একটি সাংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন। মদ ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে সরকার দেশের লোককে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে তোলেন। বাঙ্গলাদেশের শহর-গঞ্জের অলিগলিতে শুঁড়িখানা ব্যাপকভাবে গড়ে উঠে। ঐতিহাসিকের কথায়,

"In this way began that odious business of poisoning the peoples, not only of India, but of the whole Orient, with the liquors of the supposed more civilized and 'Christian' West."[১৬]

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে বাঙ্গালী সমাজে যে তামসিকতা নেমে এসেছিল, তৎকালীন সংবাদ ও সাময়িক পত্র ছাড়াও, সামাজিক সমস্যার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে বহু নাটক বঙ্গভাষায় লেখা হয়েছিল। মধুসূদন থেকে শুরু করে উনিশ-বিশ শতকের বহু নাট্যকার এ বিষয়ে জনমানসকে সচেতন করতে ব্রতী হয়েছিলেন। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা এই ঘটনাটিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে লিখেছিল,

"গবর্ণমেণ্ট যে আবগারীর আয় পরিত্যাগ করিয়া দণ্ড বিধান দ্বারা এতৎ সেবন রুদ্ধ করিবেন, সে সম্ভাবনা নাই।"[১৭]

ক্ষীরোদপ্রসাদও তাঁর 'দাদা ও দিদি' নাটকে ইংরেজ শাসকদের রাজনৈতিক জুগুপ্সাটি খোলাখুলি ব্যক্ত করে সমাজের উপর তার বিষক্রিয়ার রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে দেশের মানুষের সরল সুকুমার মানস প্রবৃত্তিগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ব্যক্তিস্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতায় গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যেত। সামাজিক বিভ্রান্তির রন্ধ্রপথ দিয়ে শনিরূপে ইংরেজ শাসক প্রভুরা প্রবেশ করতেন। ব্যক্তিগত দলাদলি কিভাবে ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল হয়েছিল, তারই একটি চিত্র অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদ এঁকেছেন। উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও আলোচনার স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনীয়।

"তক্ষক। ঝগড়া কেন—ঝগড়া কেন—কি হয়েছে ?

১৬ India in Bondage : J. T. Sunderland ; p 131.

১৭ সোমপ্রকাশ : ২৬শে বৈশাখ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ

ফেলু। এই—এই—ঠিক হয়েছে—বলুন ত মশায়—বিচার করুন ত।

তক্ষক। মশাই নয়রে ভাই—আমি তোদের দাদা। কিসের বিচার বল—বল, এখনি করছি।

ফেলু। বেশ দাদা বিচার করত।

ভেলু। আচ্ছা, বেশ বেশ করত দাদা। এই লোকটি এক তাল সোনা কুড়িয়ে পেয়েছে—পেয়ে বলে কিনা এ তোমার সোনা।

তক্ষক। বটে বটে! ও কুড়িয়ে পেয়েছে—পেয়ে তোমায় দিতে চাচ্ছে?

ভেলু। হাঁ—দেখ দেখি কি অন্যায়!

ফেলু। দাদা—সেই সঙ্গে আমার কথাটাও শোন। সোনা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি সত্য, কিন্তু এই ব্যক্তির জমি থেকে পেয়েছি।

তক্ষক। বেশ, আমি বিচার করে দিচ্ছি।

উভয়ে। করত দাদা, দয়া করে—বিচার করে দাও ত!

তক্ষক। আর বিচার আমিই বা করব কেন—বিচার একটু বাদে তোমরাই করতে পারবে। এই নাও দেখি, এই জিনিষ দু'জনে একটু একটু করে ঢুক ক'রে খেয়ে ফেল দেখি।

উভয়ে। এ কি!

তক্ষক। এ হচ্ছে চন্দ্রসুধা—পান করা মাত্র অমর ত হবেই, সেই সঙ্গে দিব্যচক্ষুও খুলে যাবে। এ জিনিষ যে কার, যেমন পানটি করা, তেমনি বোঝা।

উভয়ে। বটে, বটে! কই দাও দাদা—শিগগির দাও।

তক্ষক। এই নাও। (মদ্য দান)

উভয়ে। (পান করিয়া) বা! বা! এ কি মজা! এ কি মজা!

তক্ষক। ঠেকেছে কেমন—ঠেকেছে কেমন?

ফেলু। ঠেকেছে—ঠেকেছে—এ কি ঠেকেছে—এ যে প্রাণে একেবারে ফাল পাড়ছে—তেরে—রে রে—

ভেলু। গিজিঘিনি গিজিঘিনি—ঝাঁ! দে ভাই—এই বারে আমার সোনা দে!

ফেলু। বল কি—প্রাণ সখা!

ভেলু। এই যে আমাকে দিতে আসছিলি!

ফেলু। যে দিতে আসছিল, সে শালা চলে গেছে। তেরে রে রে—

ভেলু। বটে! আমার জমির সোনা—

ফেলু। ধনা ধনা ধনা ধনা—দর্পনারায়ণা—ঘরে গিয়ে চিবিয়ে মারো ছাঁচি পানের দোনা। আর কেন তুমি এখানে শুয়ে পড়—আমি চললুম।

ভেলু। চলবি কি রে শালা—দিয়ে যা!

ফেলু। বলিস্ কি রে শালা—দেয় কে!

তক্ষক। হা হা কর কি—কর কি—আমি পাইয়ে দিচ্ছি—দেখি (সোনা লইয়া) এ তোমারও নয়—তোমারও নয়—আমি মেহনৎ করে—বিচার করে দিলুম—এ আমার— যাও—এই বারে যথাস্থানে যাও। (ফেলু ও ভেলুকে বহিষ্করণ)" (সপ্তম দৃশ্য)

ইংরেজদের গোপন ইচ্ছার স্বরূপটি ক্ষীরোদপ্রসাদ ব্যক্ত করেছেন, তক্ষকের উক্তির মাধ্যমে। তক্ষক শঙ্খিনীকে বলেছে,

"তক্ষক।…কতকটা এগিয়েছি—সব মোড়ল বেটাদের মাতাল করে তুলেছি। এরই মধ্যে কত বেটার য°ৎ পেকেছে, অর্দ্ধেক বেটাদের হাত পা কাঁপছে।" (সপ্তম দৃশ্য)

মদ্যপান কেবল পুরুষদের নয়, গ্রাম্য মহিলাদেরও যে আকর্ষণ করেছিল সমানভাবে, তারও রঙ্গচিত্র ক্ষীরোদপ্রসাদ এঁকেছেন 'দাদা ও দিদি' নাটকে। উগ্র বিদেশীয়ানার নকলের সঙ্গে তরল মাদক দ্রব্য পানের এক সমারোহ ও আদর সর্বস্তরের বাঙ্গালীর কাছে বিশেষ গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল; এবং এরই ফলে হয়েছিল বাঙ্গালী সংসারের শ্রীর অন্তর্ধান। গ্রাম্য মহিলা ও কেশিনীর কথোপকথনে এই সত্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে।

"সকলে। (কেশিনীকে) বস—বস—একটু জল খাও—

কেশিনী। জল! হা হা! তোমাদের এই তরঙ্গহীন রসহীন জল কি মানুষে খায়! খানসামী! পানি লে আও—

(সোডার বোতল লইয়া বালিকার প্রবেশ ও বোতল খোলা).

সকলে। ওগো—বোতলে বান ডেকেছে—পালাও পালাও—ঘর সামলাও।…

কেশিনী। ভয় কি ভয় কি—(পান করণ)

সকলে। ওমা সে কি—ঢেউ খেয়ে ফেললে!

২য় স্ত্রী। তাইত—তাইত গভীর গর্জ্জনে বান ডেকে এলো, আর তাই কিনা তুমি খেয়ে ফেললে!…

পুরুষগণ। কোথায়! কে উনি—কে উনি!

২য় স্ত্রী। কে উনি—যোগে যাগে তোমরা তাড়িয়ে দিলে—চল খুঁজে আনো—ধরে আনো—আমরা সাজবো—অমনি করে সাজবো—আর আঁধারে থাকবো না—হাতে গোবর মাখবো না—হাঁড়িতে হাত দেব না—আকাশে দোল খাব—বোতলে বান ডাকাবো আর তেষ্টা পেলে ঢেউ খাব—চল—চল—এনে দেবে চলো।" (ষষ্ঠ দৃশ্য)

শাসক ইংরেজ সম্প্রদায় এদেশের অধিবাসীদের অত্যন্ত হীন চোখে দেখতেন। আমেরিকার দাস অত্যাচার পূর্ণভাবে এদেশে না হলেও, মানসিকতার দিক থেকে তাঁরা ঐ ভাবেরই সমর্থক ছিলেন। এদেশের অধিবাসীদের তাঁরা কিভাবে দেখতেন, তার পরিচয় 'ইলবার্ট বিল' বিরোধিতার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। এদেশের অর্থ ও সম্পদের উপর তাঁদের আকর্ষণ ছিল নিবিড়। ছল-বল-কৌশল—ত্রিমুখী-অস্ত্র প্রয়োগ অবলম্বনে তাঁরা নানা বিধি ও আইন প্রবর্তন করে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন এবং সাধারণ প্রজাদের দুর্গতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজপুরুষদেরও রাজ্যচ্যুত করতে দ্বিধা করেননি। ক্ষীরোদপ্রসাদ কৌতুক-কলমে ইংরেজদের অভিনব প্রয়াসটিকে অত্যন্ত নিপুণভাবে অঙ্কিত করেছেন। সমকালীন ইংরেজ প্রভুদের লোলুপ মানসিকতার স্বরূপটি এই চিত্রে উদ্ভাসিত:

"তক্ষক। আপনাদের ঘরেই তাঁদের (আমাদের সব ভাই-ভগিনীদের) নিশাভোজের আয়োজন করেছি।

চিত্রলেখা।…আমাদের শয়ন ঘরটায় ভোজের ব্যবস্থা না করলে কি হ'ত না?

শঙ্খিনী। ছি-ছি-ভগিনী! অমন উগ্র হয়ে কথা কইবেন না।…মনেও পাপ কথা আনবেন না। আপনি দেখছি ভালরকম আদব জানেন না। সেখানে সব মহিলারা আছেন। আপনারা অসন্তুষ্ট জানলে তাঁরা আর খাবেন না।…আপনাদের এ কুৎসিত পূর্ণ দেহ দেখলেই তাঁরা ভিরমি খাবেন।…

চিত্রলেখা। তা হ'লে আমরা কি করব?

শঙ্খিনী। হাঁ, হাঁ! আস্তে আস্তে কথা ক'ন—আপনার কর্কশ বাক্যে তাঁদের কানে তালা লাগবে।…

চিত্রলেখা। আমার ঘরে অতিথি, আর আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো?

শঙ্খিনী।...আপনি বড়ই বাড়াবাড়ি করছেন। সুতরাং যন্ত্রণাজনক আবশ্যকতার তলায় পড়ে, আমরা আপনাকে স্থান ত্যাগ করাতে বাধ্য হবো।

তক্ষক। এই ঠিক কথা বলেছ—ইনি দেখছি কিছুতেই মীমাংসার ভেতর আসতে চাচ্ছেন না। কেউ আছ—(সিপাহীর প্রবেশ) এই এঁদের দু'জনকে ধরে বাগান বাড়ীতে পুরে রেখে এস।......

শঙ্খিনী। হাঁ, হাঁ! সেখানে জায়গা নেই—সেখানে আমার প্রিয় খানসামারা অবস্থান করছে।...

তক্ষক। তা হলে গোয়াল বাড়ী—

শঙ্খিনী। ও বাবা! সেখানে প্রিয় ছাগ, মেষ, আর কুক্কুট পেরু সডিম্ব বিরাজ করছেন।...

চন্দ্রবিন্দু। তা হ'লে এক কাজ করুন না কেন—আমাদের দু'টিকে একটু মসলাসিক্ত করে, একটা সঘৃত উত্তপ্ত কটাহে 'বার দুই উলটে পালটে নিয়ে উদরের একপাশে রেখে দিন না কেন!

শঙ্খিনী। হয়েছে—ওই দূরে বট গাছের তলায়, ওই যে সুদৃশ্য সুহাস্য চিত্রপটতুল্য বট—ওর তলায়।...প্রিয় ভগিনী!—আপনাকে আমরা কত প্রচণ্ড ভালবাসি এই একটি কথাতেই বুঝে নিন—আপনাদের সুখী করতে আমরা সজল চক্ষে আপনাদের প্রকৃতির বক্ষে নিক্ষেপ করলুম।" (অষ্টম দৃশ্য)

আবার,

"তক্ষক। আমি দেখছি, বটগাছের তলাও আপনার যোগ্য স্থান নয়।

চন্দ্রবিন্দু। না, কেমন ক'রে হবে—উপরে ছাওয়া আছে।

তক্ষক। বুঝুন—আপনি প্রাকৃতিক রৌদ্রের উত্তাপ পাচ্ছেন না। চিকিৎসকে বলেছেন রোদ্দুর না পেলে আপনার রোগ সারবে না। আপনার দেহে কতকগুলো কীটাণু আছে। তারা ছায়া পেলেই পুত্র-কন্যা প্রসব করে। পাছে তারা আমাদের ঘরে খড়া বেয়ে ওঠে তাই আপনাকে একেবারে নীলাকাশ তলে রাখতে এসেছি।

চন্দ্রবিন্দু। আহা! আমার কি উপকারই করেছেন। কীটাণু বেটারা —পাজী বেটারা—তোদের যে আমি দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পেলে কান মলে তোদের কান ছিঁড়ে দিতুম।

তক্ষক। এই তা হ'লেই আপনি ঠিক বুঝেছেন—তার ওপর আপনি বড় দুর্ব্বল—কখন আছেন কখন নেই—যম মন্দিরে আপনাকে অতি শীঘ্রই যেতে

হবে—চিকিৎসক বলেছেন, আপনার সেখানে চলে যেতে বড় কষ্ট হবে। তাই আমি আপনাকে সে পথের খানিকটে এগিয়ে দিতে এসেছি।… আপনি আমাদের যে এতকাল পরে বন্ধু বলে চিনতে পেরেছেন, তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি ভাবিত হবেন না। মনে করেছেন যে আপনি একলা এখানে এসেছেন—তা নয়। আপনি আমাদের বন্ধু, পাছে লোকজনের অভাবে কষ্ট পান তাই আপনার অনেক আত্মীয়-স্বজনকে আগেই এ শ্মশানে পাঠিয়েছি—তারা আপনার অভ্যর্থনার জন্যে ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করচে—আরও বহু লোক আপনার পিছন পিছন আসচে।" (দশম দৃশ্য)

ক্ষীরোদপ্রসাদ 'দাদা ও দিদি' নাটকের মূল সুর দেশমাতৃকা কমলা চরিত্রের সংগীতরূপ খেদোক্তিতে প্রকাশ করে,—একদিকে দেশের জনসাধারণের অন্ধ প্রমত্ততা, হীন অনুকরণপ্রিয়তা, আলস্য ও পরনির্ভরতা এবং অপরদিকে ফিরিঙ্গী বণিকদের অবাধ লুণ্ঠন ও নিরঙ্কুশ শোষণের পরিণতি হিসাবে দেশের রাহুগ্রস্ত রূপটি তুলে ধরেছেন,—

"যাই যাই চলে যাই আর হেথা ঠাঁই নাই।
এরা আমায় ফেলে নেশার ঘোরে মেতেছে সবাই,
আমি কেঁদে পাছে ফিরি, আমারে দেয় দূর করি
বলে কোথা হ'তে এলো আপদ বালাই।
আমি যাই চলে যাই—
আমার সাধের যাঁতা, সাধের চাকা, সাধের চরকা খানি
আমার সাধের মাকু, সাধের হাল, সাধের সেই ছেনি;
আমার সাথের সাথী তারা—আমার প্রাণের বোন ভাই
তারাও চলে আমার সনে,তাই শোকের সীমা নাই।" (তৃতীয় দৃশ্য)

ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন মাতৃতন্ত্রের উপাসক। শক্তিতত্ত্ব প্রচার তাঁর নাট্যচিন্তার প্রধান কথা। নাটকে তিনি বিভিন্ন চরিত্রে দেশবাসীকে শক্তি-সংরক্ষণের কথা শুনিয়েছেন। 'প্রতাপ-আদিত্য', 'নন্দকুমার', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি নাটকে শক্তি উপাসনার কথা বহুভাবে ব্যক্ত। 'দাদা ও দিদি' নাটকেও তার প্রকাশ দেখা যায়। নাটকের প্রস্তাবনাতে তিনি আত্মনির্ভরতার মূলমন্ত্র প্রচার করেছেন :

"যা ছিল তোমার যা আছে তোমার তাই লয়ে সুখী হও হে।
থাকিতে চরণ করিতে ভ্রমণ কেন পরে ভর দাও হে।"

ক্ষীরোদপ্রসাদ ব্যক্তি-জীবনে বেদান্ত-ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। শক্তি সাধনার যে সর্বোচ্চ কথা বেদান্তে নিবদ্ধ আছে, তাই ছিল তাঁর জীবনের বীজমন্ত্র। তন্ত্র-সাধকেরা শ্মশানের বুকেই আরাধনার পঞ্চবটী নির্মাণ করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের মত ও বাণীতে বিশ্বাসী ছিলেন; আর ব্যক্তি-জীবনে ছিলেন শ্রীশ্রীমার শিষ্য। তাই তিনিও জীবন-সাধনার ভিত্তি তন্ত্রোক্ত বেদীতেই স্থাপন করেছিলেন। শ্মশানের পবিত্র হোমাগ্নিতে তিনি সকল প্রকার প্রতীপ শক্তিকে আহুতি দিয়ে দেশোদ্ধারের নতুন মন্ত্র উচ্চারণ করে দেশবাসীকে মাতৃনামের মাহাত্ম্য ও আবশ্যিকতার কথা শুনিয়েছিলেন। 'দাদা ও দিদি' নাটকে কর্ম্মানন্দ এই শ্রেণীর চরিত্র। চন্দ্রবিন্দু ও কর্ম্মানন্দের মাধ্যমে ক্ষীরোদপ্রসাদ মাতৃমঙ্গল স্তব পাঠ করে সমকালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যে মাতৃমন্ত্র গীতি উচ্চারিত হয়েছিল, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে একই পথে দেশবাসীকে দেশোদ্ধারে আহ্বান করেছেন।

"চন্দ্রবিন্দু। এই শ্মশান।...এখানে সকল দুঃখের অবসান।...যদি এখান থেকে ফিরি, তা হ'লে নূতন জীবন। কি করবো?...তা হ'লে ফিরি—এখনি মরব? যখন সকল জাতিই বিদ্যুৎবেগে উন্নতির পথে চলেছে, তখন আমরাই কেবল আমাদের হট্টমালাকে নিয়ে শ্মশানের আগুনে ঝাঁপ দেব! না, ফিরি! ফেরবার বল কি পাব না? তবে অন্যে পায় কি করে? কে দেয়—কোন্ অমৃত প্রস্রবিনী থেকে শক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়? শুনেছি—তিনি শ্মশানেই বাস করেন। তা হলে শ্মশানেশ্বরী! আমাকে ফিরিয়ে দাও।...মাতৃভূমি! এখনও যে তুমি আছ মা! তুমি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ে রেখেছ—ক্ষুধা পেলে এখনও আহার দিচ্ছ—তৃষ্ণায় মাতৃস্তন্যের ন্যায় শীতল নীরধারা নির্ঝর-স্রোতের সঙ্গে বর্ষণ করছ! তুমি যখন আছ, তখন আমার নেই কে! এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি—দীর্ঘ নিশান্তে নব প্রভাতে জাগরিত পুত্র-কন্যার উল্লাস কলরবে ভরা আমার বিশাল সংসার। মা! ঐ সংসারে আমায় ফিরিয়ে নাও।...

কর্ম্মানন্দ। শুধু ফিরলে হবে না। যখন শ্মশানে এসেছ—তখন এই পুণ্যাগ্নি সেবিত ভূমির পূজা কর—এখানে সকল স্বার্থ বলি দাও। আলস্য, ঔদাস্য, মান-অভিমান—সমস্তই এই পুণ্যানলে আহুতি প্রদান কর। দিয়ে ফেরো, আর পশ্চাতে চেয়ো না—আর শ্মশানকে সম্মুখ ক'র না।"

(দশম দৃশ্য)

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ এইভাবে দেশমাতৃকার বন্দনাগীতি ও স্বাদেশিকতার মহান্ আদর্শ প্রচার একই সঙ্গে করেছেন।

সাধারণভাবে উদ্দেশ্যমূলক নাটকে নাট্যগুণ ও সাহিত্যিক তাৎপর্য বিশেষ থাকে না। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি' নাটকের সাহিত্যিক গুণ ও নাট্যিক কলা-কৌশল খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যমণ্ডিত নয়। একটি উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইংরেজ রাজপুরুষদের অর্থ শোষণের বিচিত্র স্বরূপ উদ্ঘাটন করবার প্রয়াস নিয়েই তিনি এই নাটকটি রচনা করেছিলেন। নাট্যকারের এই ব্রত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল বলেই ইংরেজ শাসক 'দাদা ও দিদি' নাটক আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রোষ ও উষ্মায় ভেঙ্গে পড়েন ও নাটকটির কণ্ঠরোধ করেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর 'দাদা ও দিদি' নাটকটিকে রঙ্গনাট্য হিসাবে অভিহিত করেছেন। নাটকটির বহিরঙ্গে একটি লঘু কৌতুকের আবহাওয়া সৃষ্টি করবার প্রয়াস থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এর আসল লক্ষ্য। রঙ্গনাট্য স্বভাবতঃই প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত। প্রহসন কেবলমাত্র কুশীলব অর্থাৎ নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংলাপের দ্বারা তরল হাস্য পরিহাস সৃষ্টি করে না, জীবনবোধের গভীরতম তলদেশ থেকে নানা তথ্য ও সত্য আহরণ করে তাকে জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করে দেয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি' নাটক এই শ্রেণীর রচনা। বহিরঙ্গ ঘটনার প্রতি নাট্যকার বিশেষ জোর দিলেও তা প্রধানতঃ 'এহ বাহ্য' ব্যাপার। নাট্যকারের অন্তর্মুখিন্ দৃষ্টিই রঙ্গ-ব্যঙ্গের অন্তরালে বহুদূর প্রবেশ করেছে। বাইরের ঘটনার সমারোহের সঙ্গে অন্তর্বিশ্লেষণের তন্তুজালও তিনি বয়ন করেছেন।

বাঙ্গলায় অর্থনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খুব বেশি নাটক রচিত হয়নি। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকই এ বিষয়ে প্রথম ও শেষ সার্থক প্রয়াস। পরবর্তীকালে মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' ও বিংশ শতকের চল্লিশ দশকের বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'—দীনবন্ধু মিত্রের অনুসরণে লেখা নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদও দীনবন্ধুর আদর্শে 'দাদা ও দিদি' রঙ্গনাট্য রচনা করেন। অবশ্য প্রকাশভঙ্গি এবং নাটকের কাঠামো গঠনে তিনি স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করেছেন। দীনবন্ধু মিত্র কেবল নীলচাষীদের অর্থনৈতিক দুর্দশার ও মুনাফাখোর নীলকরদের বাঙ্গলাদেশের আপামর জনগণের উপর নিরঙ্কুশ অত্যাচারের কথা এক উচ্চ মানবিকতার তুলিতে এঁকেছেন। কিন্তু

ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর 'দাদা ও দিদি' নাটকে ইংরেজ শাসনে দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অখণ্ডরূপটি পরিস্ফুট করেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালের সূচনা পর্ব থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং পরবর্তীকাল পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশে বিভিন্ন নীতিতে কিভাবে শোষণ ও নিপীড়ন চলেছিল, দেশের শিল্প বাণিজ্য বিলুপ্ত হয়েছিল এবং বিদেশী পণ্যদ্রব্য প্রসারে জাতির আত্মনির্ভরতা বিলীন হয়েছিল ও পরিশেষে মাদক দ্রব্যের উগ্র প্রসারের ফলে দেশবাসীর কশেরুকাতে পচন ধরেছিল—এ সমস্ত কিছুই ক্ষীরোদপ্রসাদ অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে এঁকেছেন। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক যেখানে ইংরেজ অত্যাচারের একটি অধ্যায়, সেখানে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি' রঙ্গনাট্য ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার ও শোষণের পূর্ণ ইতিহাস। নাট্যকার এখানে কোনো রোমান্টিক কল্পনার বিস্তৃতি বা আতিশয্য ঘটান নি। অবশ্য ক্ষীরোদপ্রসাদের এই অগ্রসরতার পশ্চাতে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল।

দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ ছিল ক্ষীরোদপ্রসাদের অত্যন্ত প্রখর। নাটক ও রঙ্গমঞ্চকে তিনি দেশ ও জাতি গঠনের প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেন। মনে হয় এই উদ্দেশ্যেই তিনি অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করেছিলেন ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে অতীতের মহান্ কাহিনীর সঙ্গে তাঁর স্বাদেশিকতার 'শক্তি মন্ত্র' প্রচার করেছিলেন। ভক্তি, শক্তি ও ইতিহাসচেতনা—এই ত্রয়ী আদর্শে তিনি বাঙ্গালীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে চান। স্বাদেশিকতার পুণ্যব্রত উদ্‌যাপনে তিনি ছিলেন 'Constructive Nationalist.'

পনেরো

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা

প্রস্তাবনা

১

বাঙ্গলা নাট্যজগতে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব যেন যুগের প্রয়োজনেই ঘটেছিল বলে মনে করা যেতে পারে। গিরিশচন্দ্রের পর বাঙ্গলাদেশের নাট্যসাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের পুণ্যতোয় প্রবাহিত করেন দ্বিজেন্দ্রলাল। নাট্য-চরিত্র রচনায়, সংলাপের গভীরতায় এবং বলিষ্ঠতায়, বক্তব্যের অভিনবত্বে ও বাস্তবমুখীনতায় তিনি এক নবযুগের সূচনা করেন। তাঁর নাটক রচনার পটভূমি ছিল, বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলন। বাঙ্গালী নবজাগরণের ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সাধনায় দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও মানবকল্যাণবোধ গঠনে যে প্রয়াসী হয়েছিল, 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন পরিচালনাতে তার উদ্‌যাপন ঘটে। সত্য, প্রেম ও ভক্তির তপস্যায় বাঙ্গালী যে সুউচ্চ মানবতার অধিকারী হয়েছিল, তারও কর্মমুখর বিকাশ দেখি জাতির এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে। 'বঙ্গভঙ্গ' বিলের বিরুদ্ধে বঙ্গবাসীর যে জাতীয় অভ্যুত্থান, তাতে কেবল দেশপ্রেমের আদর্শই চিহ্নিত হয়নি; যে অখণ্ড মানবাত্মা একই উৎসভূমি থেকে জন্মলাভ করে বিদেশী শক্তির মদমত্ততার পদতলে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল, মনুষ্যত্বের চরম অবমাননায় বিশ্ববিধাতার শাশ্বত নির্দেশকে অবমানিত করা হয়েছিল, তারই বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর মনোভাব ইস্পাত-কঠিন স্বাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে প্রাণোৎসর্গের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে থাকে। এদেশবাসিগণ যে স্বাধিকার দাবী করেন, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মনুষ্যত্বের উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা। এই জাগ্রত অভীপ্সাই স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকাতে নানা সংগঠনী ক্রিয়া-কাণ্ডের মধ্যে উদ্দাম আবেগভরে বাঙ্গলাদেশের আকাশ-বাতাসকে করেছিল মুখরিত। সমকালীন সাহিত্য সম্ভারের বিভিন্ন রচনাতে জাতির এই মুক্তি-পিপাসাই প্রতিধ্বনিত।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলীর মর্মবাণীটি উদ্ধার করলে এইরকম একটি আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তাঁর রচনার মধ্যস্থল থেকে



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মানবপ্রেমের অপরিমেয় অমিয়-প্রীতি শতদল-সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশহিতৈষণার স্বরূপ ছিল—মাতৃপূজা ও মাতৃসেবা। সমকালে দেশের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী নেতারা স্বদেশচিন্তার যে অগ্নিবীজ জাতির হৃদয়ভূমিতে বপন করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধ সেই আদর্শকেই অনুসরণ করেছিল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। তিনি সমস্ত দেশবাসীকে কর্ম, ত্যাগ ও মনুষ্যত্বের পথে আহ্বান করেন। অহেতুকী ভাবোদ্দীপনার আতিশয্য ত্যাগ করে, সর্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও শুভেচ্ছায় দেশবাসীর কল্যাণব্রতে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন। মানবতা ও স্বাদেশিকতা যে পরস্পরের সম্পূরক এবং ব্যক্তিপ্রেম বিস্তৃত হয়ে সকল সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দেশপ্রেমে ও পরিশেষে বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হয়ে মহাজাগতিক সত্যে বিলীন হয়ে যায়; দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকগুলির ক্রমপরিণতিতে তা দেখিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতি কোনরকম অন্ধ সংস্কারের আনুগত্য স্বীকার করেনি। তাঁর স্বদেশপ্রেম স্বর্ণের ন্যায় নিখাদ ও ইস্পাতের মত কঠিন ছিল বলে তিনি সর্বদা দেশবাসীর স্নায়ু দুর্বলতা, জাড্য মনোবাসনা ও উদ্দমহীন নিশ্চেষ্টতাকে নিন্দা করেছেন। যা প্রকৃত মঙ্গল ও শুভ, তাকে তিনি দেশবাসীর হিতার্থে গ্রহণ করেছিলেন, এবং সমস্ত জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনা দিয়ে, ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করে দৃপ্ত পৌরুষে তা প্রচার করেন। একটি নির্মোহ কর্মপ্রেরণা সত্য--শিব ও সুন্দররূপে দেশবাসীর প্রকৃত হিতার্থে সর্বদা নিয়োজিত ছিল বলে, তিনি কখনও দেশ ও জাতির অন্ধ স্তাবকতা করেননি।

দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত তেজস্বী, নির্ভীক ও বন্ধু-বৎসল পুরুষ ছিলেন। কর্তব্যের কঠোরতার সঙ্গে স্নেহের কোমলতা, তাঁর জীবনে এক বিচিত্র ভাবসামঞ্জস্য রচনা করেছিল। আত্মমর্যাদা বা আত্মসম্মানকে তিনি সবচেয়ে মহার্ঘ বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই, বিলাত থেকে প্রত্যাগমন করার পর, তিনি হিন্দুসমাজের প্রায়শ্চিত্ত বিধানকে সরাসরি অগ্রাহ্য করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বদা ধর্ম সম্বন্ধে অন্ধ সংস্কার বা ভক্তিভাবকে বর্জন করে, মানবিকতানির্ভর যুক্তিবাদের দ্বারা পরিচালিত হ'তে চেষ্টা করেছেন; আর নিজ দেশবাসীকেও তিনি আত্মসম্মানবোধে দীক্ষিত করতে গভীরভাবে প্রয়াসী হয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে একশ্রেণীর

জননেতার মধ্যে রাজদরবারে কেবল 'আবেদন-নিবেদন' নীতি প্রধান হয়ে উঠেছিল। এতে তাঁর পৌরুষদৃপ্ত মর্যাদাবোধ গভীরভাবে আহত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতির আত্মতুষ্টি আত্মহত্যারই প্রকারভেদ। জাতি যদি আত্মসমালোচনা থেকে বিরত হয় তবে তার চারিত্রিক উন্নতি এবং অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে যায়। সেজন্য তিনি বাঙ্গালীর কল্পনা-বিলাস ও মোহমুগ্ধ ধারণাকে যেমন নিন্দা করেছেন, তেমনি তাদের চিত্তের 'কূর্ম' মনোবৃত্তিকে আঘাত করতে কাতর হননি। তিনি দেখেছিলেন যে, বাঙ্গালী তার সমকালীন বিভিন্ন সংস্কৃতিবিষয়ক বিজয়-বৈজয়ন্তীতে মাতোয়ারা হয়ে যেমন আত্মশ্লাঘার গৌরবে স্ফীত হয়েছে, ঠিক সমভাবেই আপন সমাজ সংস্কারে, নারীশিক্ষা প্রচলনে ও তাদের দুরবস্থা মোচনে, জাতিভেদ দূরীকরণে এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যবন্ধনে রয়েছে সমানভাবে উদাসীন। হিন্দুসংস্কারে যেখানে আঘাত পড়েছে, জাতি সেখানেই হয়েছে আপোষহীন। তাই বঙ্গবাসী, কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববিজয়ে যতখানি উল্লসিত হয়েছে, ঠিক ততখানি নির্লিপ্ত হয়ে আছে আপন অন্তর্নিহিত স্বভাবের দুর্গতি মোচনে। সুতরাং দেশবাসীকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে হলে পারিবারিক এবং সামাজিক দুর্নীতিগুলির সংস্কার সাধন করে আত্মমর্যাদা উদ্ধার ও সংরক্ষণ করতে হবে। আর জাতীয় হিতবাদিতার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন সর্বাধিক। দ্বিজেন্দ্রলাল এই মর্মে তাঁর 'চিন্তা ও কল্পনা' প্রবন্ধের 'মানভিক্ষা' অংশে উল্লেখ করেছেন :

"শাস্ত্র হইতে যত পার দেখাও যে, সভ্য-জগতের এখন যাহা কিছু আছে, আমাদের সে সব ছিল, উপরন্তু আধ্যাত্মিকতা ছিল। যদি দেখাইতে পার ত' সভ্যজগৎ হদ্দ স্বীকার করিতে পারে যে, আমরা এককালে এত বড় ছিলাম যে, ইয়ুরোপের অত বড় হইবার সম্ভাবনা অতি ভগ্নাংশিক। কিন্তু সে তাহাতে কখন স্বীকার করিবে না যে, আমরা সেই বড়ই আছি। বরং যে অতিশয় অবজ্ঞার সহিত বা অতিশয় অনুকম্পার সহিত বলিবে—'উঃ, কি গভীর পতন !'

যখনই সভ্যজগৎ দেখিবে যে, আমরা স্ত্রীজাতিকে একটি সম্পত্তি, একটি লিপ্সার বস্তু, একটি গার্হস্থ্য প্রয়োজনের স্বরূপমাত্র ব্যবহার করিতেছি, যখন সে দেখিবে যে, আমরা অপরিমিত বলশালী হইলেও কার্য্যে অচিন্তিতরূপে পৃষ্ঠ-প্রদর্শক, যখন সে দেখিবে যে, আমরা কারাগারের ছায়া দেখিলে

স্বদেশহিতৈষিতার অভ্রভেদী ভেরীনিনাদ, ভয়কম্পিত দীননম্র কাকুতিস্বরে নামাইয়া আনিতেছি, যখন সে দেখিবে যে, আমরা এখনও ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণ করিলেও ন্যায়ের বিশ্বাসের জন্য এক কপর্দ্দক হইতেও বঞ্চিত হইতে প্রস্তুত নই বরং পার্শ্ববর্ত্তী ভূস্বামীকে এক কাঠা পরিমেয় ভূমি হইতে চ্যুত করিবার জন্য, মিথ্যা ও বঞ্চনাকে নরক হইতে তুলিয়া আনিয়া আদালতে হাজির করিতেছি, যখন সে দেখিবে যে, শৈবাচার শুদ্ধ পাশবাচারের নামান্তর মাত্র ও বৈষ্ণবসম্প্রদায় ইন্দ্রিয়-সেবার কেন্দ্রমাত্র হইয়া উঠিয়াছে,—তখন সে আর আমাদিগকে পূর্ব্ব-পুরুষের মহত্বের খাতিরে মান্য করিবে না; তখন সে বেদ, দর্শন, পুরাণ ভুলিয়া যাইবে; তখন কৃষ্ণের মহৎ চরিত্র, বুদ্ধের স্বার্থত্যাগ ও চৈতন্যের পুণ্যময় জীবন, এ কালিমাকে ধৌত করিতে পারিবে না।"[১]

সুতরাং জাতিকে জগতের মধ্যে ভক্তি ও সম্মান অর্জন করতে হলে, তাকে বীর্যবান ও মনুষ্যপ্রেমী হতে হবে। অতীতের স্বর্ণযুগের মুগ্ধকর ধারণা, পূর্বপুরুষদের বিজয়-গৌরব যদি বর্তমানে জাতির প্রতি স্নায়ুতে সতেজ রক্ত-প্রবাহের সুষম ছন্দোগতি সৃষ্টি করতে না পারে, তবে সেই স্মৃতিচারণের কোন মূল্য নেই। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন:

"পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি আপনার অনুভবের জন্য, আদর্শের জন্য, দুঃখে সান্ত্বনার জন্য—পরকে বুঝাইবার জন্য নহে।

আপন মহত্ত্ব অপরকে বুঝাইবার জন্য বাক্যব্যয় দরকার নাই। সে কার্য্য অতি নীরবে—অতি সংক্ষেপে সাধিত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্র জাতির বীর্য আরঙ্গীবকে বুঝাইতে কোন তর্ক করিতে হয় নাই, শিবজী বিনা বাক্যেই তাহা আরঙ্গীবের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপসিংহের স্বদেশানুরাগ টাউন হলে বক্তৃতা করিয়া বা খবরের কাগজে লিখিয়া প্রমাণ করিতে হয় নাই; তাঁহার স্বার্থত্যাগই তাহার জীবন্ত জাগ্রত অকাট্য প্রমাণ।"[২]

বাঙ্গালীর হীনবীর্য মনোভাবকে দ্বিজেন্দ্রলাল কোনদিন সহ্য করতে পারেন-নি। বাঙ্গালীকে দুর্বল, শুষ্ক বিতর্কমুখর ও পরশ্রীকাতর দেখে তিনি মর্মাহত

১ দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড): সাহিত্য সংসদ সংস্করণ; পৃ. ৭৬৫

২ চিন্তা ও কল্পনা (মানভিক্ষা): দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (২য় খণ্ড); সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ৭৬৬

হন। ইংরেজ জাতির যে চরিত্র মাহাত্ম্য, সংযম, শৃঙ্খলাযুক্ত কর্মানুরাগ, স্বার্থত্যাগ ও কর্তব্যবোধ তাদের বিশ্ববরেণ্য করে তুলেছে, দেশবাসীকে নিজস্বার্থেই তাকে অনুসরণ করতে তিনি উপদেশ দেন। তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, অসার বক্তৃতা, সংবাদপত্রে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের মতবাদ, উদ্দেশ্যহীন সংগঠন পরিকল্পনা, জাতির চিন্তাকে কখনও স্থির লক্ষ্যের সন্ধান প্রদান করে না। ঘরে অশান্তি, বাইরে দাসত্ব, অবসন্ন মন ও শুষ্ক শরীরে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সম্পূর্ণরূপেই অর্থহীন। তাই তিনি সোচ্চারে বলেন :

"আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও ইংরাজের মূর্খত্ব, বিদেশে বক্তৃতা ও দেশে সংবাদপত্রে ঘোষণা দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত শিশুর কার্য্য। কর্ম্ম চাই—স্বার্থত্যাগ চাই।..পরোপকারাদি চাই, সত্যপ্রিয়তা চাই। মনের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য চাই।"৩

দ্বিজেন্দ্রলাল দেশাত্মবোধকে মানবপ্রেমের পীঠভূমিতে স্থাপন করেন। কারণ তাঁর মতে, মানবপ্রেমের শ্রীক্ষেত্র হতে যে মহতী শক্তি জন্মলাভ করে—তাই জাতীয়তার প্রকৃত অস্ত্র। প্রেমের অনুশাসনেই জাতির কর্তব্যবোধ জেগে উঠে এবং তা থেকে স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের বাসনাও রক্তিম হয়ে উঠে। পৃথিবীতে সকল দেশে সমস্ত স্বাদেশিক কর্মের পশ্চাতে এই সত্যই ধ্রুব রূপে বর্তমান। দ্বিজেন্দ্রলাল দেশবাসীকে এই শাশ্বত সত্যে ব্রতী হতে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন :

"ভালবাসিতে শিখ, মনুষ্যকে—জগৎকে—কর্তব্যকে। এই প্রেম এক সাধনা ; স্বর্গীয় আনন্দ তাহার সিদ্ধি। ইহার জন্য তপ আরম্ভ কর।...

প্রেম উন্মত্ততা নহে। জানিও, জ্বলন্ত অনুরাগই বিশ্ববিপ্লবী কার্য্যের প্রাণ। এই অনুরাগ না থাকিলে জগতে অনেক মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইত না। এই অনুরাগ না থাকিলে হয়ত ইটালী আজিও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত ; আমেরিকায় স্বাধীনতার লোহিত নিশান উড়িত না। এই অনুরাগ না থাকিলে ঈশার প্রেমময় উপদেশ জগতে প্রচারিত হইত না ; বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্ঠুর জগতে আসিত না। অনুরাগ—জ্বলন্ত, স্থির। অনুরাগ—উচ্চ কার্য্যের চিরসহচর। অনুরাগ—চিরদিন কার্য্যের প্রাণ আছে ও থাকিবে। যদি জগৎ হইতে কার্য্যের

৩ চিন্তা ও কল্পনা (মানভিক্ষা) : দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (২য় খণ্ড) ; সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ৭৬৭

পরিচালিকা সকল শক্তি অন্তর্হিত হয়, বিপ্লবের জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যায়, এ শক্তি বর্ত্তমান থাকিবে। এ শক্তি অনন্তকাল স্থায়ী।·····যে দিন এ শক্তি যাইবে, সে দিন কার্য্য বিলুপ্ত হইবে, মনুষ্য পশু হইবে, জগতে অরাজকতা আসিবে। তাই বলি অনুরাগ উন্মত্ততা নহে। অনুরাগ মহৎ, স্বর্গীয়, উচ্চ কার্য্যের মূলমন্ত্র।”[৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল এইভাবে প্রেমের বিশ্বপ্লাবী শক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। প্রেমের শক্তিই যুগে যুগে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, আত্মবিসর্জনের সাধনায় করেছে একান্তভাবে ব্রতী। যুগে যুগে ধরাধামে যে সমস্ত অবতারের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরা জাতির অনৈক্য, হিংসা ও উন্মত্ততার রুধির বেদীতে প্রেমের পঞ্চবটী করেছেন স্থাপন। দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলন ও স্বাধিকার অর্জনের কঠিন পথে এই প্রেমের অনুরণন ও প্রকাশ দেখতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন :

“সংসার যাহাকে অবতার বলে, সে প্রেমী ; মানবের প্রেমমুগ্ধ—তাহা না হইলে সে মানবের হিতার্থ প্রাণপণ করিতে পারিত না। বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য, ম্যাটসিনি, ওয়াসিংটন, গুরু গোবিন্দ, মিল্‌টাইডিস, লিয়নিডস, প্রতাপ ; ইহারা সকলেই প্রেমী।·····তাঁহারা ভালবাসিতেন—মনুষ্যকে বা স্বজাতিকে ও তাহার প্রতি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যকে। প্রাণোৎসর্গ করিতে হইলে অনুরাগ চাই—প্রদীপ্ত, স্থির।”[৫]

স্বদেশবাসীর প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল :

“ভালবাসিতে শিখ। কাহাকে? যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, ন্যায়, সত্য ও সঙ্গত বোধ হয়, তাহাকে ভালবাস।······

ভাল বুঝিয়া, আরও ভাল বুঝিতে চেষ্টা কর ; কিন্তু যাহা বুঝিবে তাহাই করিবে, তোমার কার্য্য অন্য মনুষ্যে যে প্রকার গ্রহণ করে সে চিন্তা তোমার নহে। প্রেম উন্মত্ততা নহে। প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিখিলে তবে বিশ্ববিপ্লবী কার্য্য সম্ভবে। ভালবাসিয়া—মনুষ্যকে ও কর্ত্তব্যকে ভালবাসিয়া নিজের কার্য্য করিয়া যাও। উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে, সাধনা সিদ্ধ হইবে। এই

৪ চিন্তা ও কল্পনা (প্রেম কি উন্মত্ততা?) : দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (২য় খণ্ড) ; সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ৭৩৯-৭৪০

৫ চিন্তা ও কল্পনা (প্রেম কি উন্মত্ততা?) : দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (২য় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ৭৪১

অনুরাগই তোমার ভবিষ্যতের তিমিরে দীপ্ত প্রদীপ—স্থির, স্থির। তাহা লইয়া নির্ভয়ে বিচরণ কর। শতবার পড়িয়া যাও, শতবার ক্লান্ত হইয়া যাও; ক্ষতি নাই। এ তূরী বাজাও। উড়াও তোমার বিজয়-নিশান।"৬

স্বদেশপ্রীতির মূলে মানবপ্রেমের এই অমৃতবাণী উচ্চারণই দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় ভাবাদর্শের স্বরূপ ও প্রকৃতি। এইভাবেই তিনি আবার জাতীয়তার ভিত্তিমূলে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রচার করেছেন। তাঁর স্বদেশপ্রীতি ধীরে ধীরে বিশ্বপ্রীতি মার্গে উন্নত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতার আদর্শ ও জাতীয়হিতবাদী চিন্তা যুগধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন স্বতন্ত্র পথে ধাবিত হয়নি। এ ছাড়া একটি বিস্তৃত কালসীমা তাঁর নাটকে বাণীমূর্তি লাভ করেছে। স্বাদেশিকতার যে স্রোত উনিশ শতকের ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে মানবপ্রীতি, করুণা ও মৈত্রীভাবনাতে ঋদ্ধ হয়ে বিশ্ববোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিল, তাই যেন দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে রূপায়িত হয়েছে। রামমোহন ও বিবেকানন্দের সাধনা দ্বিজেন্দ্রলালের মানসচেতনাকে পুষ্ট করেছিল বলেই মনুষ্য-বন্দনার মধ্যে তিনি বিশ্বপিতার পূজা-অর্চনা করেছেন। কিন্তু, তাঁর সাধনাতে কোন ভূমাচারী সিদ্ধিলাভের সঙ্কল্প ছিল না। স্বর্গের চেয়ে শতদুঃখে লাঞ্ছিত ধরণীতল ও ধরার মানুষকে তিনি অধিক পরিমাণে ভালবেসেছিলেন। Herbert Spenser-এর অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিক্যবাদে অনুরাগী হয়েও তিনি স্বধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও মানুষের উপর প্রীতি কোনদিনই হারাননি। দেশের পরাধীনতায় তিনি গভীর মর্মাহত হয়েছিলেন এবং দেশ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন অনুভব করেন মনুষ্যশক্তির প্রেমপূর্ণ বিকাশ। সেজন্য তাঁর রচনা সর্বত্র মানবতার জয়গানে মুখরিত; মনুষ্যত্বের মর্যাদায় উদ্ভাসিত। দ্বিজেন্দ্রলালের মনুষ্যপ্রীতি কোন পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণজাত ফলশ্রুতি নয়; অক্ষয় কবচকুণ্ডলের মত সহজাত মানসিক প্রবণতা নিয়েই তিনি যেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখন আপন বংশের উচ্চ আত্মগরিমার সঙ্গে যুগপ্রভাব তাঁর চিত্তে স্বদেশচিন্তা সম্বন্ধে যে বিমিশ্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তার সম্যক পরিচয় গ্রহণ করা যাক্।

৬ চিন্তা ও কল্পনা (প্রেম কি উন্মত্ততা?): দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (২য় খণ্ড); সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ৭৪১

২

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয় ভাবধারার প্রতিফলন নাট্যকারের ব্যক্তিগত ভাবধারণার স্পর্শে রূপায়িত। সুতরাং জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে তাঁর মত ও মন্তব্যের সম্যক পরিচয় বক্ষ্যমান আলোচনার স্বার্থে গ্রহণ করা কর্তব্য। এতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র জীবনচেতনার মধ্যে যে একটি আত্মসচেতন দৃপ্ত পৌরুষ ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর পরিচয়টুকু আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। আর এও উদ্ধার করেছি যে, একটি সর্ববিধ কল্যাণ-চিন্তা ও মানবপ্রেম তাঁর স্বজাতিপ্রীতি ও জাতীয়তার নির্মোকে আত্মপ্রকাশ করেছে। স্বদেশবোধ সম্পর্কে এইরূপ একটি সম্যক ধারণা, প্রথমে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন ও পরে তা দেশ-কালের স্পর্শে পল্লবিত হয়ে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৯শ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বাঙ্গালীর চেতনাতে নতুন জীবনচিন্তার যে অশান্ত কল্লোল কলকাতার আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করেছিল, তা সমানভাবে কৃষ্ণনগরের তটভূমিকেও আলোড়িত করে। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র সে সময়ে আপন সাংস্কৃতিক সৌজন্যে ও স্বদেশহিতৈষায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সেকালের বিভিন্ন স্বাদেশিক মনীষিগণ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র ও ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। এই সমস্ত ঋত্বিকের প্রভাব ও সাহচর্য দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনকে শৈশব থেকেই দেশপ্রেমের চিন্তায় স্বনিত করে।

জাতীয় আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল পৃথিবীর আলোক দর্শন করেন (১৮৬৩)। তাঁর জন্মের কিছুদিন আগে বিখ্যাত নীল আন্দোলন শেষ হয়েছে। জাতির চিত্তমধ্যে তার প্রভাব তখনও পর্যন্ত সমভাবে বিদ্যমান। এ ছাড়া 'হিন্দুমেলা'র জাতীয়তাবাদী সংগঠন ক্রিয়া, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্জীবনী সভা'র ভাবাদর্শ, 'ভার্নাকুলার প্রেস

অ্যাক্টে'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, 'ইলবার্ট বিলে'র বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান—সমস্ত কিছু একত্রযোগে কিশোর দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্তে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়াও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের দেশাত্মবোধক কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় ভাবোদ্দীপক উপন্যাসের প্রভাব এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান, ব্রাহ্মসমাজের ধর্মবিপ্লব ও মানবহিতবাদী পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক সভাতে দেশের স্বাধিকার অর্জন ও জাতিকে সর্ব বিষয়ে স্বাবলম্বী করার প্রয়াস—সমস্ত কিছু একত্রযোগে দ্বিজেন্দ্রলালের তনু-মন-চরিত্র গড়ে তোলে। এ ছাড়াও ইউরোপের ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র আদর্শ, ইতালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং প্রতীচ্য দেশের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মানবহিতবাদী চিন্তা তাঁর চিত্তকে স্বদেশানুরাগে অভিষিক্ত করে। দেশোদ্ধারের পবিত্র কর্তব্য পালনে এবং ধর্ম ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করে আত্মোৎসর্গের যে আহ্বান চতুর্দিকে ধ্বনিত হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্ত-বীণার তারে তার সুউচ্চ প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তাঁর কৈশোরের রচনা 'আর্য্যগাথা' (১ম ভাগ) কাব্যের 'আর্য্যবীণা' খণ্ডে, যৌবনপর্বে 'বিলাতের পত্রাবলী' অংশে এবং 'The Lyrics of Ind' কাব্যে তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

'আর্য্যগাথা' (১ম ভাগ) দ্বিজেন্দ্রলালের কিশোর চিত্তের দেশাত্মবোধের নিদর্শন। তাঁর বারো বছর বয়স থেকে সতেরো বছর সময়কাল পর্যন্ত রচিত গীতিগুলি এই কাব্য-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। দেশপ্রীতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর 'আর্য্যগাথা'র ভূমিকাতে প্রদান করে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন:

"যাঁহারা একমাত্র মনুষ্য-প্রেম-গীতকেই গীত মনে করেন, 'আর্য্যগাথা' তাঁহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই, এবং তাঁহাদিগের আদর প্রত্যাশা করে না। যদি কেহ প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যে কখন কখন বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি-রচয়িতার অনন্ত মহিমায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোক-জরা-সঙ্কুল জগতে দুঃখাবসন্ন হইয়া কখন কখন নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জন করেন, যদি কাহার অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, 'আর্য্যগাথা' তাঁহারই আদর চাহে।"[৭]

আর্য্যগাথা (১ম ভাগ): ভূমিকা; ৫ই মার্চ ১৮৮২

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেম যা পরবর্তীকালে নাটকে বাণীবদ্ধ হয়ে সপ্তসমুদ্রের কল্লোলোচ্ছ্বাস এনেছিল, তারই প্রাথমিক গতির কলগীতি 'আর্য্যগাথা' (১ম) কবিতাগুলিতে শোনা যায়। জাতির পরাধীন অবস্থাতে তিনি কোন মোহন-মধুর সুরের আলাপন তুলতে চাননি। দেশের প্রতি মহৎ কর্ম সম্পাদনার উদ্দেশ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কাব্যে গগন-বিদারী তূর্য-নিনাদ করেন। তিনি বাঙ্গালীকে দেশের সঙ্কটের সময়ে ত্যাগ ও বীরত্বে ব্রতী হতে আহ্বান জানান, 'রেখে দেও রেখে দেও' কবিতাটিতে :

"রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে।
কেন ও কুহক আর ভারত ভিতরে রে।
যাও চলি পরভৃত, চাই না ও মৃদু গীত,
গাও রে পাপিয়া তবে ভাসায়ে অম্বরে রে।
শুনিয়া মুরলী-গান জাগিবে না আর্য্যপ্রাণ,
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণকুহরে রে।
উঠ তবে পার যদি, রে তূরী গগনভেদী,
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে।
শঙ্কর-গৌতম-কথা প্রতাপের বীরগাথা,
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে।
মিলি আর্য্যকবিগণে, গাও রে উন্মত্ত মনে,
নীরব পুরাণ-গীত সানন্দ অন্তরে রে।
রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে।"

ভারতবাসীকে তিনি অলসজড়িত তন্দ্রা থেকে মুক্ত হতে পুনঃপুনঃ আহ্বান করেছেন। ভারতবর্ষের অতীত মহান্ কীর্তি স্মরণ করে, তিনি দেশবাসীকে উৎসাহ, বীর্যবল ও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন, 'জালাও ভারত' কবিতাটিতে :

"জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ অনল।
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।
কাঁদিয়াছি বহুদিন কাঁদিব না আর হে,
দেখিব আজো এ মনে আছে কত বল।
বিভব গৌরব মান সকলি নির্ব্বাণ হে,
আছে মাত্র আর্য্যবংশ-গরিমা সম্বল।

এখনো আমরা সেই আর্য্যের সন্তান হে,
বহিছে শিরায় আর্য্য-শোণিত প্রবল।
সেই বেদ, সে পুরাণ, আজো বর্ত্তমান হে,
সে দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভূমণ্ডল।
সেই ঘাট, সেই বিন্ধ্য, সেই হিমালয় হে,
জাহ্নবী-যমুনাবারি, আজো নিরমল।
আজিও বিস্তৃত সেই পুণ্য আর্য্যস্থান হে,
আমরা সন্তান তার কেন হীনবল।
উঠ অগ্রসর, ভাই ত্যজি বিসম্বাদ হে,
ভাই ভাই মিলি সাধ স্বদেশ-মঙ্গল।
অজস্র রোদনে যাহা হয়নি সাধন হে,
আজি নবোৎসাহে তাহা হইবে সফল,
জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ অনল।"

'আর্য্যগাথা'র (১ম) 'আর্য্যবীণা' অংশের অন্যান্য কবিতাগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-স্তোত্র উচ্চারিত হয়েছে। এই স্থানে কবির স্বাদেশিক ভাবনা ভারতচেতনার ভাবাশ্রয়ে প্রকাশিত। দ্বিজেন্দ্রলাল বর্তমান ভারতের দুরবস্থার সঙ্গে অতীতের গৌরবময় কাহিনীগুলির তুলনা করে যেমন বিষাদে নিমজ্জিত হয়েছেন, তেমনি আর্যমহিমার আদর্শের গৌরবকীর্তি স্মরণ করে তাকে উদ্ধারে ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাতে হয়েছেন ব্রতী। পরাধীনতার বেদনাতে কিশোর কবি-চিত্ত অশ্রুভারাক্রান্ত হলেও, তাঁর আত্মসচেতনতার পৌরুষ-ঋজুতা দেশবাসীকে এক সুদূর ঐক্য সংহতিতে প্রতিষ্ঠিত করতে যে তৎপর হয়েছিল, তার নিদর্শন তিনি 'আর্য্যবীণা' অংশে 'স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেবাপেক্ষ ইবঃ স্থিতঃ' শিরোনামে রেখেছেন।

'বিলাতের পত্র' প্রবন্ধাবলীতে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতির উন্নত পরিচয় চিহ্নিত হয়ে আছে। তাঁর ইতিহাসপ্রীতির পরিচয় একালের রচনায় নিঃসংশয়-ভাবে প্রমাণিত। বিলাত যাত্রাকালে 'সায়েদ বন্দরে' পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের নৈতিক অধঃপতন দেখে তাঁর স্বাদেশিক চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বদেশের স্বাধীনতাহীন আবদ্ধ মানুষের নৈতিক অধোগামিতার ও অসহনীয় অবস্থার কথা প্রচার করেছেন :

"..সুয়েজ দেখে ও পোর্ট সায়েদ দেখে যদি আফ্রিকার অবস্থা বিচার করা

ন্যায়, তাহা হইলে আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে নিকৃষ্টতম, অসভ্যতম, অপবিত্রতম। এই আফ্রিকাতে যে একদিন উজ্জ্বল, উন্নত, সভ্য মিশর ছিল,—যেখানে একদিন গিরিবৎ স্থির ও তুঙ্গ পিরামিড নির্ম্মিত হইয়াছিল,—তাহা বোধ হয় না ; ..বোধ হয় না যে, জগতের গৌরব, পণ্ডিতগণের বাসভূমি আলেকজান্দ্রিয়া এই আফ্রিকাতে ফেনময় সিন্ধুর ক্রোড়ে অবস্থিত ছিল। অহো,—কাল ! অহো,—অবস্থা।

···সুখী ভারত ! তুমি এতদিন পরাধীন থাকিয়াও এতদূর পতিত হও নাই। কারণ, আফ্রিকা যথার্থই আজ অসভ্য, অজ্ঞান-তিমিরাবৃত। ভারত ! তুমি অত্যাচারের, পীড়নের অধীনতার ক্রোড়ে পালিত হইয়াও এতদূর অধোগামী হও নাই। এখনও হিন্দুর আশার দিন আছে, উন্নতির উপায় আছে। হিন্দু ! তুমি এখনও উন্নতমানা, সেই অকলঙ্কিত চরিত্র, কেবল এখন আর তুমি পূর্ব্বের ন্যায় দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পার না ;—তোমার সে অতুলনীয় বীরত্ব আর নাই।''

ভূমধ্য সাগরের মধ্য দিয়ে যাত্রাকালে তিনি ইতালীর জাতীয় অভ্যুত্থানের কথা স্মরণ করে আপন দেশের বন্ধনমোচনের কল্পনায় উৎসাহী হয়েছেন :

"ইটালী আবার উঠিতেছে, মৃতপ্রায় জাতি আবার জাগিয়াছে। কিন্তু আমার···? যদি সৌভাগ্য চিরদিন না থাকে, এ দুর্ভাগ্যও চিরদিন থাকিবে না।''

ইংলণ্ডে বসবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজদের উচ্চ জীবনযাত্রামানের হার লক্ষ্য করেছিলেন। আপন দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের নিম্নগামিতার কথা স্মরণ করে তাঁর স্বদেশ-হিতৈষী চিত্ত অত্যন্ত পীড়িত হয়েছিল। অগণিত ভারতবাসীর জীবনের স্বল্প আশা, পারলৌকিক জীবনের প্রতি তীব্র আসক্তি, আলস্যজনিত উদ্যমহীনতা ও আত্মসন্তুষ্টি, তাদের জীবনের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। সমস্ত বিশ্বব্যাপী মানুষের কর্ম ও উন্নতির যে আয়োজন চলেছে, ভারতবাসীরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশের প্রকৃত উন্নতি কামনা করতেন বলেই আপন দেশবাসীর অভিলাষহীন জীবনের পঙ্গুতাকে নিন্দা করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশবাসীর মর্ত্য-জীবনপিপাসাকে দেশবাসীর চিত্তে অনুবিদ্ধ করতে ব্রতী হন। ইউরোপ কর্ম ও শক্তির পথে আত্মপ্রতিষ্ঠায় যে স্থায়িত্ব লাভ করেছে, তার মূলে আছে উচ্চাভিলাষপূর্ণ অসন্তোষ। দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্যবাসীর

এই জীবন-বাসনাকে জাতির প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন ; 'বিলাতের পত্র' প্রবন্ধাবলীতে তিনি এ বিষয়ে আপন মত ও মন্তব্য রেখেছেন :

"আমার বিশ্বাস যে, যতদিন আমাদের দেশবাসীর ভাল আবাসগৃহে আরামে থাকিতে ইচ্ছা না হইবে, ততদিন আমাদের গার্হস্থ্য অবস্থার উন্নতি হইবে না। পরিচ্ছন্নতা ও অন্ততঃ আয়-সাধ্য ভাল অবস্থায় জীবনধারণ করা,—আমাদের জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত।......আমাদিগের কৃষকের অবস্থার সঙ্গে এখানকার কৃষকের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বোঝা যায়, প্রভেদ কত, বোঝা যায়, আমাদের কৃষকেরা কি গরীব, কি দুরবস্থাপন্ন ; ......কিন্তু আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে বর্ত্তমানে সন্তোষই ইহার মূল। তাহার অবস্থা উত্তম হইতে হইতে উত্তমতর হইতে পারে, ইহা তাহার ধারণাই হয় না। পূর্ব্বপুরুষ ব্যবহৃত ভূ-কর্ষী ব্যবহার না করিয়া নূতন প্রকার লাঙ্গল ব্যবহার করিলে যে ভূমি দ্বিগুণ ফলবতী হইতে পারে, ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস হয় না। গরীব থাকিলেও নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট ; নব-প্রথার উপকারিতায় অবিশ্বাসী, দুর্ভিক্ষ হইলে তাহারা কেবল বিধি-নির্ব্বন্ধের দোষ দেয়, নিজ ভাগ্যকেই অভিশাপ দেয় ও স্বীয় ললাটে করাঘাত করে। আমি বলি, তাহাদের মনে সম্ভোগ-বাসনা ও অসন্তোষ দেও—উন্নতির সোপান রচিত হইবে।......

কিন্তু সম্ভোগ-বাসনা বিলাস নহে। বাসনা কার্য্যময়, বিলাস অকর্ম্মণ্য ; বাসনা অসন্তোষ, বিলাস সন্তোষময়। ...অসন্তোষ বিলাসী নহে।

আমি আরও বলিতে চাই—অসন্তোষই উন্নতির মূল, ইহা কার্য্যকে উত্তেজিত করে, সভ্যতার পথ প্রশস্ত করে। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি পরিবারিক উন্নতি,—সকলের মূলেই এই অসন্তোষ। বক্তা সুরেন্দ্রবাবু যথার্থই লিখিয়াছেন,—

'Our nation have yet to learn the great art of grumbling.' অসন্তোষই সভ্যতার মূল। অসন্তোষই ফরাসী বিপ্লব করিয়াছিল ; অসন্তোষই বৃটিশজাতিকে রাজার নিকট হইতে স্বত্ব কাড়িয়া দিয়াছে ; অসন্তোষই ইটালীকে স্বাধীন করিয়াছিল ; অসন্তোষই আবার ভারতীয়গণকে নূতন জাতি করিতে সক্ষম। আমাদের জাতির এখন প্রধান শিক্ষার বিষয় এই অসন্তোষ। এই অসন্তোষ শিক্ষা করিতে শিখিলে জাতীয়

উন্নতি দূরে রহিবে না। কি গরীব, কি ধনী, এখন সকলেই অসন্তোষ শিক্ষা করুন। কি ভারতানুরাগী রাজনৈতিক, কি সমাজ-সংস্কারপ্রিয় জাতি-হিতৈষী, কি পরিবার চিন্তা-সর্ব্বস্ব জনসাধারণ সকলেই অসন্তোষ শিক্ষা করুন।"

দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রের মত পৌরাণিক ভাবাশ্রয়ী ভূমাচারী কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। রূঢ় বাস্তবতাকে তিনি সর্বদাই অধিক পরিমাণে স্বীকার করতেন। কোন অলৌকিক বিশ্বাস তাঁর চিত্তের দৃঢ়তাকে শিথিল করে দেয়নি। আর সেজন্য তিনি স্বদেশের উন্নতি কামনায় জাতির পার্থিব জীবনের মান উন্নত করতে ব্রতী ছিলেন। ঐহিক জীবনের প্রতি গভীর আসক্তিকে তিনি বিলাসিতা বলে মনে করেননি কোনদিন। দেশবাসীর ব্যবহারিক জীবনের মান ও অর্থনৈতিক মর্যাদার উন্নত শ্রীবৃদ্ধিসাধন করাই ছিল তাঁর স্বদেশচিন্তার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর মতে দেশসেবায় স্বার্থ-ত্যাগের প্রয়োজন আছে সত্য; কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজন নীরোগ দেহ, সুস্থ মন, পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তি। দেশ নির্মাণের জন্য এর প্রয়োজন সর্বাগ্রে। জাতির দৈনন্দিন জীবনের মান উন্নত হলে দেশের সামাজিক জীবনের মানও বর্ধিত হবে। সাধারণ মানুষ ত্যাগের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে না। দেশ, সমাজ ও জাতির প্রতি তাদের অনুরাগ বাড়িয়ে তুলতে হলে প্রত্যেককে সুস্থ জীবনযাপনের সুযোগ করে দিতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলাল ঈশ্বরপ্রীতি, মানবহিতবাদ এবং পারিবারিক জীবনগঠনের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর ভূমি-জীবনের মঙ্গলাচরণ চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসীদের জাতীয়তাবাদের উচ্চ রূপ দেখে তাঁর এই বিশ্বাস হয়েছিল ধ্রুব। 'বিলাতের পত্র' প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে লেখেন:

"..কেহ দেশানুরাগী হয় ত বলিবেন, যে 'বাঙ্গালীকে বিলাসিতা শিক্ষা দিও না।...দেখ, ম্যাট্‌সিনী বিলাসসম্ভোগ খোঁজেন নাই, আনন্দ-উল্লাস খোঁজেন নাই; দেশের জন্য...দেশ হইতে দেশে পলায়ন, রাত্রি-জাগরণ ও অসহ্য ক্লেশ অম্লান-বদনে, উল্লসিত চিত্তে আলিঙ্গন করিযাছিলেন।' এই কথাটা খুব উঁচু স্বীকার করি; যদি কোন বাঙ্গালী যথার্থই দেশের জন্য বিলাস-লালসা বিসর্জ্জন দিতে পারেন, জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তাহা যথার্থই গৌরবময় কার্য্য, জাতির জাগরণের আরম্ভ।...কিন্তু জাতির সকলেই কিছু স্বার্থত্যাগী ম্যাট্‌সিনী হইতে পারে না; অধিকাংশ লোকই সামান্য ক্ষমতাপন্ন, স্বার্থ-চিন্তাময়। ম্যাট্‌সিনীর জীবন তাহাদের নিকট অলৌকিক

বোধ হয়। ...আমি জানি, আবাস-গৃহ পরিচ্ছন্নতর হইলে, আহার পুষ্টিকরতর হইলে, নিদ্রা গাঢ়তর হইলে, দেশের উদ্ধার হয় না ; কিন্তু তাহাতে শরীর সুস্থতর হয়, জীবন সুখময়তর হয়, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতাও পূর্ণতর হয়। মানুষ লইয়াই পরিবার, পরিবার লইয়াই জাতি। প্রতি মানুষ অধিকতর সুখী হইলে জাতিও অধিকতর সুখী হইবে...

মনুষ্য বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাকিলে সভ্য হইত না,...অসন্তোষই সভ্যতা স্রোতস্বিনীর নির্ঝর।"

দ্বিজেন্দ্রলালের এই ভাবনা যুগচিন্তার বহির্ভূত নয়। রামমোহন থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ পর্যন্ত প্রত্যেক মানবহিতবাদী মানুষের সাধনা ছিল ঐহিকমুখী। তাঁদের সংস্কার-চিন্তার মধ্যে মানুষের শত দুঃখে পরিপূর্ণ ধরাতলকে কলঙ্কশূন্য করার সক্রিয় প্রয়াস ছিল। যুক্তিবাদী জ্ঞান, মননশীল-চেতনা এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এক নব্য প্রতীতি, দ্বিজেন্দ্রলাল যুগের পরিমণ্ডল থেকে আহরণ করেন। আর এই গভীর আস্তিক্যবাদী জ্ঞান থেকেই তিনি ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে নূতন মূল্যায়ন করেছিলেন।

'বিলাতের পত্রে' দ্বিজেন্দ্রলাল ইংলণ্ডের অধিবাসীদের প্রগতিমূলক জীবনচর্চাকে সমর্থন করলেও, পরানুকরণ মনোবৃত্তিকে কোনদিন সমর্থন করতেন না। এ বিষয়ে, তিনি বিখ্যাত দার্শনিক শোপেন হাওয়ারের মতের অনুবর্তক ছিলেন,—'জাতীয়তা অপেক্ষা ব্যক্তিত্ব বহুগুণে শ্রেষ্ঠ'।* আর এই প্রবল ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষই তাঁকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভারতীয় করে রেখেছিল। ভারতবাসী হিসাবে আত্মশ্লাঘাবোধ তাঁর জীবনে কোনদিন খর্ব হয়নি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে তাঁর স্বদেশপ্রীতি অভিষিক্ত ছিল। একটি-উগ্র পৌরুষ সদা জাগ্রত ছিল বলে যেমন তিনি কোনদিন সরকারী চাকরী করেও বিদেশীর চাটুকারিতা করেননি, তেমনি উৎপাটন করতে কুণ্ঠিত হননি মানব সমাজের জীর্ণ চিন্তার বিস্তীর্ণ কুশাঙ্কুর ক্ষেত্রকে। রাজনৈতিক সাধনার ক্ষেত্রে তিনি সবাগ্রে ধর্ম ও সমাজের অচলায়তনকে ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন। বিলাতের পত্রাবলীতে এরই প্রাথমিক সূচনা দেখি। এখানে মানবকল্যাণ এবং আদর্শবোধের সঙ্গে একটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মন, দেশের মানুষকে গলিত জীবন-চিন্তার পঙ্কশয্যা থেকে উদ্ধার করতে ব্রতী হয়েছে। অবশ্য

* "Individuality is far more account than nationality"—Schopenhaur.

পরবর্তীকালে 'একঘরে' প্রবন্ধ, 'হাসির গান', ধর্ম ও সামাজিক নাটকে এর পরিণত রূপ প্রকাশিত হতে দেখি। ইংলণ্ডবাসীদের প্রাণোচ্ছল জীবনধারা, আত্মগরিমা ও সুস্থ জীবনবোধ; স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের উন্নত চরিত্র, স্বাধীন চেতনা ও স্বদেশ গরিমার প্রতি সুগভীর অনুরাগ দেখে তিনি মনে প্রাণে চমৎকৃত হয়েছিলেন। স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার ল্যাণ্ডের অধিবাসীরা ইংলণ্ডের অধীন হলেও স্বদেশপ্রেমী। তাঁরা আপন সাহিত্য ও স্বাদেশিক শূরগণের বিজয় মাহাত্ম্যে বিশেষ গর্বিত এবং স্বাধিকার অর্জনে আগ্রহী। পাশ্চাত্য জনগণের স্বাদেশিক জীবনচিন্তা দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্তকে আন্দোলিত করেছিল। তিনি পরাধীন ভারতের দুর্গতিতে ব্যথিত-বেদনায় বলেন,

"হতভাগ্য ভারত! ...ইংরাজ শাসন ভিন্ন তোমার কি গতি আছে? ইংরাজ ভিন্ন তোমার কে সহায়? ...ইংরাজের সহিত এক হইয়া যাওয়াই, তোমার একমাত্র মুক্তির উপায়। কিন্তু..."

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমে কোন গোঁড়ামি ছিল না। বিশ্বের যা কিছু ভাল ও কল্যাণময়, তিনি আপন দেশবাসীর স্বার্থে তা গ্রহণ করতে ছিলেন উৎসুক। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনে 'ভাব বাণিজ্য' করতে তৎপর হন। প্রবাসকালে তাঁর "THE LYRICS OF IND" কবিতাপুস্তক এই মর্মেই লেখা হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমের প্রাথমিক চিন্তা উপলব্ধি করার পক্ষে এই কাব্যগ্রন্থ অতিশয় প্রয়োজনীয়। তিনি এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাতে বলেছেন:

"My principal object in the composition of the following verses has been to harmonise English and Indian poetries as they ought to be. Both are beautiful; but whilst the one is visionary and sensuous, the other is vigorous and chaste; whilst the one dreams, the other soars; whereas the one makes a poetry of Religion, the other makes a religion of Poetry. If it has pleased God to unite England and India in the strong ties of wedded interests, and in the still stronger, more sacred, and indissoluble bond of mutual love and gratitude, it is the aim of the author to establish a

marriage and an intellectual commerce between their poetries as well."

ইংরেজদের সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের এই ভাবমুগ্ধকর ধারণা কোনদিন বিলুপ্ত হয়নি। 'বড় ইংরেজ'দের উচ্চ জীবনাদর্শ ও মানবিকতায় তিনি ছিলেন সর্বদাই শ্রদ্ধাশীল। এমন কি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েও তাঁর রাজভক্তি ছিল অটুট। তবে তিনি তাঁদের বৈরী মনোভাব ও নির্যাতন-নীতিকে কোনদিনই সমর্থন করতেন না। "THE LYRICS OF IND" কাব্যের মধ্যে কবির যৌবনের প্রেম ও সৌন্দর্যের গগনবিহারী রোম্যান্টিক ভাবালুতার সঙ্গে স্বদেশপ্রীতির ব্যঞ্জনাস্নিগ্ধ ভাবটুকুও উচ্ছ্বাসভরে প্রকাশিত হয়েছে। মাতৃভূমির বন্দনা করতে গিয়ে কবি স্বদেশপ্রেমে মুখর হয়ে "THE LAND OF THE SUN" কবিতায় বলেছেন :

"O my land ! can I cease to adore thee,
Though to gloom and to misery hurled ?
O dear Bharat ! my beautiful maiden,
O sweet Ind ! once the queen of the world.
And though wrecked is thy pride and thy glory,
Of it nothing remains but the name ;
Yet a beauty and sunshine still lingers,
And yet gleams through the mist of thy shame."

কবিতাটিতে স্বদেশের প্রতি যে আন্তরিক প্রীতি ও অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তীকালে তাঁর স্বদেশী সংগীত—'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি'তে তার প্রভাব পড়েছে।

বক্ষ্যমান আলোচনা দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিক চিত্তের প্রাথমিক পরিচয়। আর এই স্বদেশবোধ মুখ্যতঃ পাশ্চাত্য 'পেট্রিয়টিজমে'র আদর্শে উদ্বুদ্ধ। মুক্ত বুদ্ধির স্বচ্ছ প্রাধান্য, মানবহিতব্রতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং আপন ধর্মের প্রতি মহান্ আনুগত্য যা পরবর্তীকালে তাঁর নাটকে বাণীমূর্ত হবে, তারই প্রাক্ কথন দেখি তাঁর যৌবনের খরদীপ্ত রচনায়। এখন নাটকগুলির জন্মলগ্ন-কালে নাট্যকারের মনোভাবনার পরিচয়টুকু নেওয়া যাক্।

৩

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের ঊর্মিমুখর রাজনৈতিক তরঙ্গভঙ্গে নিক্ষিপ্ত না হলেও সমকালের দেশাত্মবোধ-চিন্তা ও স্বদেশী ভাবধারাতে তিনি যে তন্ময় হয়েছিলেন, তার নিদর্শন তাঁর নাটকের সঙ্গে বিভিন্ন পত্রাবলী ও জনগণের উদ্দেশ্যে লিখিত নানা প্রশস্তি-পত্র থেকে সহজে উপলব্ধি করা যায়। বাঙ্গালীর এই জাতীয় জাগরণে তিনি একাত্মতা অনুভব করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর জীবনচরিত থেকে যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তা আমরা উদ্ধৃতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারি:

"সে সময়ে প্রায় প্রতিদিনই 'হরেক' রকমে, 'নানান' বেশে, বিচিত্র ভাবে ও বিবিধ 'ঢঙ্গে', কত-সব বিপুল আয়োজন সহকারে কলিকাতার ইতর-ভদ্র, সংখ্যাতীত, উন্মত্ত জনসঙ্ঘ মনমাতানো স্বদেশী সঙ্গীত গাইতে-গাইতে, শহরময় পথে-পথে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত; আর, সেই নয়নরঞ্জন, মনঃপ্রাণ-মোহন, অপূর্ব্ব শোভা-যাত্রার দৃশ্য দেখিয়া, দেশপ্রাণ কবি-আমাদের তখন আপন উদ্বেলিত অন্তরের উদ্দাম ভাবাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, কখনও এতটুকু বালকের মত 'আহ্লাদে আটখানা' হইয়া, ছুটিয়া আসিয়া স্বজন বন্ধুদের জড়াইয়া ধরিতেন, কখনও উৎসাহভরে, উচ্চকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া আনন্দে হাতে তালি দিতে-দিতে, ঐ সব সঙ্গীতের সঙ্গে-সঙ্গে নৃত্য করিতে থাকিতেন, আবার কখনও বা বাষ্পসিক্ত লোচনযুগল ঊর্দ্ধপানে উন্মুক্ত করিয়া, প্রেমাকুল প্রাণে 'মা, মা' বলিয়া, যথার্থই যেন কাহার অপার্থিব ধ্যানে বিভোর হইয়া যাইতেন। এ-সব অবস্থায় তাঁহার সেই হর্ষোজ্জ্বল, রক্তিম মুখে কিংবা উল্লাস-বিস্ফারিত নয়নদ্বয়ে উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনার যে এক জলন্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ বিকীর্ণ হইতে থাকিত,—না দেখিয়া, আজ কাহারও সাধ্য নাই যে, সে শোভা আংশিকরূপেও অনুমান কি কল্পনা করিতে পারে।...... তৎকালে মাতৃপ্রেমে মাতোয়ারা দ্বিজেন্দ্রলাল আপন আন্তরিক অসীম আগ্রহেই বাঙ্গালীর এই দেশব্যাপী 'স্বদেশী'-আন্দোলনের অতি-বড় উৎসাহী অনুবর্ত্তক, সমর্থক ও প্রচারক হইয়াছিলেন।... যে রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক কারণে এ দেশে এই আন্দোলনের আবির্ভাব, যদিচ তাহার সঙ্গে

দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না, তবু মূলে এই দেশাত্মবোধ বা স্বদেশী ভাব সকলের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া জাগাইয়া দিতে তিনি আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।"[৮]

তবে দ্বিজেন্দ্রলালের এই অতুল উৎসাহ তাঁর জাতীয় হিতবাদী চিন্তার বহিরঙ্গ পরিচিতি বা প্রকাশ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বাঙ্গালীর উচ্চাভিমুখী নব জাগ্রতিকে সমর্থন করলেও, দেশবাসীর ভাবাতিশয্যে তিনি কোনদিন একাত্ম হতে পারেননি। তাঁর যুক্তিবাদী চিত্ত অসংখ্য সংশয়ের ঘূর্ণাবর্তে আলোড়িত হয়ে প্রশ্নমুখর হয়েছে। তিনি যুগধর্মকে গ্রহণ করলেও তার বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত চিন্তা বঙ্গক্ষেত্রে আতঙ্কে প্রহর গুণেছে। যদিও রাজনৈতিক মতাদর্শে দ্বিজেন্দ্রলাল রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী ছিলেন, তবুও তাঁর জাতীয়তাবাদের মৌলিক চিন্তার পরিচিতিটুকু সমকালের একটি পত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে :

"আজ নবজীবনের উন্মাদনায় আমরা আত্মহারা তন্ময় হইয়া গিয়াছি। বাঙ্গালীর জীবনে আজ এ কি অপূর্ব্ব অমৃতের আস্বাদ! যাহা স্বপ্নের অগোচর, কল্পনারও অতীত ছিল, আজ সেই বিচিত্র স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন আমার ধন্য সার্থক হইল, প্রাণ আমার স্নিগ্ধ শীতল হইয়া জুড়াইয়া গেল! এত সুখও যে আমাদের অদৃষ্টে ছিল তাহা কে জানিত ভাই! ধন্য সুরেন্দ্রনাথ। সার্থক তোমার জীবন-ব্যাপী একাগ্র সাধনা! কিন্তু এত আনন্দের ভিতরেও একটা কথা যখন আমার মনে হয়, তখন আমি আশঙ্কায় উদ্বেগে কিছু ভীত ও চঞ্চল হই। মাকে আমার ভালবাসিব, সেবা করিব, অভিনব সুন্দর সাজ-সজ্জায় নিয়ত অলঙ্কৃত করিব, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি-প্রেমকুসুমে সতত পূজা করিয়া চিত্ত-প্রাসাদে ডুবিয়া থাকিব,—আমার এই যে সাধ, এই যে আশা, এ ত অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি! সুসন্তানের স্বভাবতঃ এ ইচ্ছা হইয়া থাকে; আর যার তা না হয় সে হতভাগ্য, কুলাঙ্গার—নরাধম! কিন্তু, এই যে সব সাধ ও আকাঙ্ক্ষা এর জন্য আমি বাহিরের সুযোগ বা অবকাশের সন্ধান করি কেন? আর এ সব ভাবোদ্রেকের জন্য আমরা এমন বাহিরের দশটা কারণ ও অবস্থার উপরেই বা নির্ভর করিতে চাই কেন? স্বাভাবিক মনের আবেগে যদি আমার মাকে 'মা' বলিয়াই পূজা না করি, যদি পরের দ্বারা অনাদৃত

---

৮ দ্বিজেন্দ্রলাল: দেবকুমার রায়চৌধুরী; পৃ. ৩৮৯-৩৯১।

আহত না হইলে আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া মাকে মর্য্যাদা দিতে না চাই, যদি আন্তরিক অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসার টানেই মার দৈন্য-ক্লেশ দূর করিতে না পারি তবেই তো ভয় হয়,—বুঝিবা আমাদের এ পূজা আন্তরিক নহে ; তবেই তো ভয়,—হয়ত বা আমাদের এ অবস্থা এ ইচ্ছা স্থায়ী নয়, স্বাভাবিক নয়,—এসব পদ্মদলের বারিবিন্দুসম চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। .....

আমি বলি, এই বিদ্বেষমূলক বয়কটের দ্বারা আমাদের পরিণামে সর্ব্বনাশ হবে, ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনমতেও সম্ভব নয়। এদেশ যদি আজ পর-প্রসঙ্গ ও বিজাতির-বিদ্বেষ ভুলিয়া, প্রকৃত আত্মোন্নতি—নিজেদের কল্যাণ-সাধনে তৎপর হয় তবে এমন কোন শক্তিই নাই যে তাহার সেই বলদৃপ্ত গতি রোধ করিতে পারে। কিন্তু অযথা এ আস্ফালন ও যাহারা আমাদের শিক্ষা-গুরু—যাহাদের কৃপায় ও ইচ্ছায় আমাদের আজ এই যা কিছু উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে—তাহাদের প্রতি আমাদের এরকম অন্ধ বিদ্বেষ যতদিন সম্যক্ তিরোহিত না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উদ্ধারের সহজ কোন উপায় আমি দেখি না।"[৯]

দ্বিজেন্দ্রলালের এই চিন্তাতে যুক্তিবাদের যে প্রকাশ দেখি তাতে অনেকটা পাশ্চাত্য Utilatarian দার্শনিকদের বিশ্বমানব-কল্যাণবোধের ছায়াপাত ঘটেছে। জাতিবিদ্বেষ, সঙ্কীর্ণ স্বদেশীয়ানা, ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার প্রমত্ততা এবং জীর্ণ গোঁড়ামির অভিমান বিষয়গুলিকে সমর্থন করা তাঁর পক্ষে ছিল সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। এক উদারনৈতিক মতবাদের অনুগামী হওয়ার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল নিন্দিত হলেও আপন যুক্তি ও বিশ্বাস থেকে তিনি কোনদিন বিচ্যুত হননি। 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' সম্পর্কে তিনি যে মতবাদের প্রচারক ছিলেন, তা নিম্নের অনুলিপি থেকে অনুমান করা সম্ভব হবে। বঙ্গবিভাগ রহিত হওয়ার একটি গুজবের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লেখেন,

"Partition (বঙ্গ-বিভাগ) রদ হওয়ার উপক্রম হয়েছে শুনছি। কিন্তু, বেহারের সঙ্গে আবার বিচ্ছেদ হবে নাকি? বেহারীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের তেমন মনের মিল—সদ্ভাব নাই সত্য ; কিন্তু ক্রমে একদিন তাহাদেরও সহানুভূতি ও সাহায্য যে পাওয়া যেত এবার তাহলে সে আশাও গেল ! 'Partition'-এর (বঙ্গ-ভঙ্গের) সময়ে আমি বলেছিলাম যে, এর একটা খুব

৯ দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র : ৭ই নভেম্বর, ১৯০৪

Bright side (উজ্জ্বল দিক) আছে। তোমরা ত তখন আমার উপরে খড়্গ-হস্তই ছিলে! সে ভালোর দিকটা এই যে,—এক দিকে বাঙ্গালী আসামীদের শিক্ষিত করুক্, আর একদিকে বেহারীদের শিক্ষিত করুক্। নইলে একা বাঙ্গালীর আর বল কতটুকু?"[১০]

অল্পকাল পরে লেখা অপর একটি পত্র থেকে জানা যায়,

"বাঙ্গালীরা আপনাদের মধ্যে যদি একতা রাখে, Partition-এ (বঙ্গ-বিভাগে) তা ভাঙ্গিতে পারিবে না। বাঙ্গালীর আপনাদের মধ্যে একতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করার পূর্ব্বে, তাহাদের মনের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব, দূর করিতে হইবে। বঙ্গচ্ছেদ রদ করিয়া তাহা সাধিত হইবে না।"[১১]

স্বাদেশিকতার পটভূমিতে দ্বিজেন্দ্রলালের এই মতবাদ অজ্ঞেয়বাদের রহস্যজালে আচ্ছাদিত। বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনাতে কোন সঙ্কীর্ণতার ঠাঁই ছিল না। কোন লঘু মতবাদ বা অনুদার চিন্তা বাঙ্গালীর এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে স্থান পায়নি। আপন দেশের অখণ্ডতা ও জাতির অতি প্রাচীন এবং চিরবন্দিত ঐতিহ্যকে সম্মানের সঙ্গে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। ইংরেজ, বাঙ্গালীর মৌলিকত্বের উপর অস্ত্রোপচার চালিয়েছিল বলেই বঙ্গবাসী বিদ্রোহী হয়েছিল। ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতার বন্দনা বাঙ্গালী কোনদিনই করেনি। তাদের 'বয়কট' নীতিতেও কোন সঙ্কীর্ণ জাতিবৈরিতা ছিল না। দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করে আত্মশক্তির সম্প্রসারণই ছিল বাঙ্গালীর 'বয়কট' নীতির মূল ধর্ম। অবশ্য এর মধ্যে মনুষ্যত্বের দীপ্তিময় মূল্যবোধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসও ছিল সমানভাবে সক্রিয়। উদার মানবপ্রেম, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূরীকরণ, জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের ত্রিবেণীবন্ধনে সর্ববিধ কর্ম উদ্‌যাপনের যে প্রয়াস সে সময়ের স্বাদেশিক ঋত্বিকগণের ত্যাগ ও বীর্যমণ্ডিত সাধনাতে প্রত্যয়নিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল উপলব্ধি করতে পারেননি। যিনি জাতির নীরোগ দেহ ও আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য কামনা করেছিলেন, তিনি কিভাবে ইংরেজের 'বঙ্গভঙ্গ' বিলের সমর্থন জানিয়েছিলেন,

১০ দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র : ২৭শে জুন ১৯০৬

১১ ঐ : ৯ই জুন, ১৯০৬

তা স্বভাবতঃই আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু তবুও দ্বিজেন্দ্রলাল জাতি জাগরণের তন্ময়তাকে গ্রহণ না করে পারেননি। তাঁর জীবনীকারের কথায়,

"দ্বিজেন্দ্রলাল সে ভাবতরঙ্গে ভাসমান হইয়া, একেবারেই প্রকাশ্য রাজপথে নামিয়া-আসিয়া, স্বয়ং সে গানে যোগদান করিলেন; এবং উর্দ্ধবাহু হইয়া মেঘ-মন্দ্রবৎ, মুহুর্মুহুঃ 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে অকস্মাৎ অম্বরতলে ভাব-রোমাঞ্চ সঞ্চারিত করিয়া দিলেন।…প্রকাশ্য পথ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, মাতৃভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সেই পরুষ-গম্ভীর কণ্ঠে সেদিন যে মহাসঙ্গীত-সুধা শত-শত 'সন্তান'-কর্ণে বিতরণ করিয়াছিলেন, আর এ দুর্ভাগ্য দেশ সে গান শুনিতে পাইবে না।"[১২]

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতার ভিত্তিভূমি, সবজনীন দয়া, মৈত্রী ও মঙ্গলচিন্তা,—ত্রিবিধ উপাদানে নির্মিত হয়েছিল বলে তিনি কোন জাতিবৈর বাসনাকে বরণ করে নিতে উৎসাহী ছিলেন না। স্বদেশ হিতবাদিতায় তিনি ছিলেন, 'Constructive Na .onalist'। তাই উগ্র জাতীয়তাবাদের অগ্নিতেজ বিকীর্ণ না করে কল্যাণকামী জাতিসংগঠন ব্রতকে তিনি অগ্নিহোত্রীর পুণ্য হোমাগ্নির মত রক্ষা করেন। স্বদেশপ্রেম বলতে তিনি বুঝতেন, ধর্ম ও শ্রেণী-ঐক্যবোধে সমাজে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্টা, আত্মোন্নতি, ব্রহ্মচর্য বিস্তার, চরিত্রবলে জাতির অন্তঃশক্তির বহিৰ্গত উত্থান এবং দেশবাসীর পৌরুষ চৈতন্যের পুনরুদ্ধার। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন বুদ্ধিবাদী এবং কর্মযোগী। ভাবভরে মাতোয়ারা হযে নিষ্ফল অঙ্গ-সঞ্চালনের কোন ইচ্ছা তিনি কোনদিন করেননি। বরিশালের জনগণের জীবননিষ্ঠ স্বাদেশিক কর্মোদ্দীপনাকে উচ্চ প্রশংসা-বাক্যে অভিনন্দিত করে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন, তাতে তাঁর গণতান্ত্রিক চেতনা ও কর্মযোগী মনোবাসনার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

"বরিশালবাসী আজ সমগ্র ভারতের আদর্শ, শিক্ষক, নমস্য। ওখানে কার্য্যতঃ তাহারা যে আদর্শ দেখাইতেছে তাহা কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিয়া এই দূর হইতেও আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।…এই যত-সব বাক্য-সর্ব্বস্ব, কপটাচারী নেতাদের কানে ধরিয়া বরিশালে নিয়া দেখাইয়া দাও

১২ দ্বিজেন্দ্রলাল: দেবকুমার রায়চৌধুরী: পৃ. ৩৮

—কেমন করিয়া কাজ করিতে হয়; স্বার্থত্যাগ করিতে হয়; দেশের যথার্থ যে প্রাণ-শক্তি, অর্থাৎ—এই আমাদের অশিক্ষিত, অগণিত চাষা ও গ্রামবাসীদের মধ্যে আপনাদিগকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিয়া, কি করিয়া তাহাদিগকেও দেশভক্তির এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও দৃঢ়-ব্রত করিয়া তুলিতে হয়। কাজের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই,—শুধু কেবল বক্তৃতা, বক্তৃতা, আর বক্তৃতা।... এখন কি উপায়ে এই সব আত্ম-সর্ব্বস্ব, 'নাম-কা-ওয়াস্তে' নেতাদের হাত থেকে দেশবাসীকে, বিশেষতঃ আমার ভবিষ্যৎ-ভরসাস্থল, আশা-কল্পতরু, সোনার চাঁদ ঐ যুবকদিগকে রক্ষা করা যায়, তাই আমি অনেক সময় ভাবি। তা নইলে ত আমি আর মঙ্গল দেখি না।"[১৩]

দ্বিজেন্দ্রলাল আবার আর একস্থানে স্বদেশ হিতবাদিতার প্রকৃত পথ নির্ধারণ করে বলেছেন,

"...এই সৌখীন বন্দেমাতরম্ ধ্বনির উপর ক্রমে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। এর সঙ্গে যে Sincerity (সারল্য বা অকৃত্রিমতা) নাই, Feeling (অনুভূতি) নাই, তাহা আমি বলি না। কিন্তু সে Feeling (অনুভূতি) ঐ বন্দেমাতরমেই নিঃশেষ হইয়া যায়; কাজ হয় না। কেবল ভাবপ্রবণতা, উত্তেজনা বা Feeling—কবির কাজ হইতে পারে, Patriot (স্বদেশ-প্রেমিক) কর্ম্মীর কাজ নহে। Patriot-এর (দেশভক্তের) কাজ স্বার্থত্যাগ, উৎসর্গ, সেবা। Principle-এর (জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের) জন্য কয়জন দেশে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে? দেশ-উদ্ধার সন্ন্যাসীর কাজ, ত্যাগীর কাজ; ভোগী বা বিলাসীর কাজ নয়। আমাদের সেই ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ...বাঙ্গালী বলুক, 'আন্তরিক ভক্তি-প্রীতিভরে মায়ের নাম করিব; পরশ্রীকাতরতা বিজাতি বিদ্বেষ ছাড়িয়া সহজ স্বাভাবিক অকৃত্রিম আগ্রহে মায়ের সেবা করিব, তাহাতেও যদি তোমাদের আপত্তি থাকে, তাতেও যদি তোমাদের চোখে আমরা অপরাধী হই—বেশ তো জেলে দিতে হয়, দাও'।—এই বলে সব সদর্পে জেলে যাক না দেখি!"[১৪]

দেশ ও দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলতে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচার করেছিলেন জাতির নৈতিক চরিত্রবলের আদর্শ। ব্রহ্মচর্যের পূর্ণ অনুশীলন ও মনুষ্যত্ববোধের সুপরিমিত বিকাশ যে জাতীয়তার স্বার্থে দেশবাসীর মধ্যে

১৩ দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র; ১৩ই জানুয়ারী, ১৯০৬।

১৪ দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র, ১৩ই মে, ১৯০৬।

একান্ত প্রয়োজনীয়, এই বিশ্বাস তাঁর ধ্রুব ছিল। এ সম্পর্কে তিনি এক সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন :

"...বাস্তবিক আমাদের এ জাতটাকে আবার জীয়িয়ে জাগিয়ে তুলতে হ'লে দেশের আবার উন্নতি ও উদ্ধার-সাধন কর্ত্তে হলে, একদল সচ্চরিত্র ও উৎসাহী যুবকের আজীবন অবিবাহিত থেকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ কর্ত্তে হবে।...

অবারিত উদ্যম; অদম্য ইচ্ছা-শক্তি, উন্মুক্ত নির্ম্মল ও উদার মন; প্রাণময়ী চিন্তা ও জ্যোতির্ম্ময়ী কল্পনা,—এ সবের উপায় যদি কিছু থাকে ত আমার বিশ্বাস, সে হচ্ছে, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য! এই এক ব্রহ্মচর্য্যের বলেই একদিন আমাদের এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি অত সহজে, অমন অনায়াসে, স্বাভাবিক শক্তিবলে এ বিশ্বসংসারে জগদ্‌গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। আর আজ যদিও সে পদানত, নির্জ্জীব, অসহায় ও নিঃস্ব, তবু ঐ একটি মাত্র উপায় অবলম্বন কর্লে এখনও সে নিশ্চয়ই আবার সেই শূন্য সিংহাসনে গিয়ে ধীরে ধীরে উপবেশন কর্ত্তে পারবে।...আমরা আবার জাগব, উঠব, মানুষ হব। এ আঁধার চিরদিন কখনও আমাদের ছেয়ে থাক্‌বে না, থাক্‌তে পারে না। —এ স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, অযথা প্রলাপ বা শূন্য অহঙ্কার নয়।—'আসিবে সে দিন আসিবে!' আমি 'দেশ' চিনি না, বিদ্বেষ মানি না; আমি চাই শুধু ঐ বীর্য্যবল—ব্রহ্মচর্য্য; চাই শুধু ঐ সত্য নিষ্ঠা; চাই শুধু আসল, খাঁটি, ধ্রুব ও নিটোল ধর্ম্ম-বল, আর ঐ এক কথায়—মনুষ্যত্ব!"[১৫]

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধ ও স্বাদেশিক চেতনায় আপন দেশ ও জাতির মঙ্গলের প্রতি মমত্ববোধ এবং কল্যাণকামী চিন্তা প্রকাশিত হলেও তাঁর যুক্তিবাদী চিত্ত ব্রিটিশরাজের আনুগত্যকে বরণ করেছিল। অবশ্য এতে কোন আত্মসমর্পণ নীতির বালাই ছিল না। তিনি স্বজাতির উন্নতি ও মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য আরও কিছুদিন ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস করতেন পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতবাসীর সুদীর্ঘকালের চিত্তের সংস্কার তিমিরের অবসান হয়েছে আর শুভ উদ্বোধন ঘটেছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের। ইংরেজের প্রভাবে জাতীয়তার শিক্ষা যাতে সম্পূর্ণ হয়, সে জন্যই আরও কিছুদিন ব্রিটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব তিনি কামনা করেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল,

১৫ দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র ; ২রা মে, ১৯০৬।

"এখনও ইংরাজের কাছে অনেক শিখিবার ছিল। তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি।"[১৬]

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের রাজপ্রীতি ছিল দেশভক্তিরই অঙ্গ। তাই সকল স্তুতি-নিন্দার ঊর্ধ্বে উঠে আপন মত ও মন্তব্য প্রকাশ করতে তিনি কখনই দ্বিধাচিত্ত হননি। ইংরেজ সরকারের সমালোচনাও তাঁর লেখনীতে স্থান পেয়েছে।

"সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও গভর্ণমেণ্টের যথার্থ শুভার্থী শিক্ষিত-সজ্জনের প্রতি এইরকম অন্যায় সন্দেহের ফলে এদেশের মজ্জাগত স্বস্তি ও শান্তি অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিবে; এবং আমি আজ বলিয়া রাখিলাম— দেখিও, একদিন এমনই-সব কারণে এ দেশবাসীর মনে ক্রমশঃ ব্রিটিশ-রাজ্যের প্রতি অনাস্থা এমন কি, ক্ষোভ আক্রোশ ও বিদ্বেষের ভাবও সঞ্চারিত, হইতে থাকিবে। শেষে, ইহার পরিণাম ফল কি হইতে কিসে যে কি হইয়া দাঁড়ায় তাহা কে বলিবে।"[১৭]

জীবন-দৃষ্টিভঙ্গী বিচারে দ্বিজেন্দ্রলাল সমস্ত সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। সকল দেশের, সকল কালের ও সকল জাতির ভিতর থেকে চিরন্তন সত্যবোধটিকে উদ্ধার করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। অবিচার, আনুগত্য ও যুক্তিহীন অনুরাগকে কোনদিন তিনি প্রশ্রয় দেননি। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা কামনাই তাঁর দেশপ্রেম বা জাতীয়তার পরিচিতি ছিল এবং স্বাধীনতা যে মানব-মাত্রেরই জন্মস্বত্ব; একথা তিনি যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি নাটকেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রচার চালিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতার আদর্শ বিস্তারে তিনি কোন একদেশদর্শিতার পরিচয় দেননি। আপন দেশের অতীত শৌর্য ও আধ্যাত্মিক গরিমা, প্রাচ্যের সত্য শিব-সুন্দরের প্রতি অনির্বাণ আস্থা, প্রতীচ্যের মানবহিতবাদ এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব দ্বিজেন্দ্রলালের চিন্তা ও মননে এক সুগভীর কার্য-কারণ সঙ্গতি স্থাপন করেছিল বলে, তিনি বিশ্বজনীন সৌহার্দ-প্রীতি ও মানবমহিমার আদর্শ নাটকে অঙ্কিত করেছেন। একথা স্মরণ করেই তাঁর নাটকগুলিতে স্বাদেশিকতার স্বরূপ বিচার করা উচিত।

---

১৬ দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র, ১৩ই মে. ১৯০৬।

১৭ দ্বিজেন্দ্রলাল: দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ. ৪৫৮।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা

৪

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে দেশপ্রীতির যে পুণ্যস্রোত প্রবাহিত করেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণভাবে যুগপ্রভাবান্বিত। আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনায়, নাট্যকারের যুগচেতনা ও স্বাদেশিক বোধ ও বোধি সম্পর্কে যে মতামত, তা আমরা অবহিত হয়েছি। এখন তাঁর নাটকে যুগচেতনা কতখানি বাসা বেঁধেছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান একান্ত প্রয়োজন। আমরা ইতিপূর্বে বহুস্থানে লক্ষ্য করেছি, যুগনায়কেরা স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচারে যে কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দেন, তা ছিল—(১) ধর্মের মত-বিরোধ দূর করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রচার (২) আত্মঘাতী স্বজাতি-কলহ দূরীকরণ (৩) ত্যাগ-প্রেম ও মৈত্রী কর্মাদর্শে জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের উদ্বোধন ও (৪) আত্মনির্ভরতার আদর্শ প্রচার। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে এই সমস্ত চিন্তার সক্রিয় প্রয়োগ ও বিস্তার ঘটেছে। তিনিও যুগনেতাদের সঙ্গে এক হয়ে জাতির স্বাধীনতা ও স্বাধিকার অর্জনের বাসনাকে যেমন পবিত্র কর্ম বলে অভিহিত করেছেন, তেমনি পরাধীনতার কারণগুলিকেও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর অন্তরালে প্রচার করে দেশবাসীকে সজাগ করতে ব্রতী হয়েছেন। অতীতের পটভূমিতে তিনি আপন কালের যুগচিন্তাকে পরিবেশন করেছেন। তথাপি, দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশচিন্তার বৈশিষ্ট্য হীরকখণ্ডের দ্যুতি নিয়ে পরম মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশচিন্তার ক্রম পরিণত রূপটি অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, তাঁর মানস পরিমণ্ডল প্রাচ্যের ভক্তিভাব ও প্রতীচ্যের জ্ঞানবাদ —দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বাঙ্গলাদেশে যে বিশুদ্ধ বুদ্ধিচর্চা শুরু হয়েছিল, তাকে যেমন তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালীর ভক্তিরসাশ্রিত সর্বধর্ম-সমন্বয়ী আস্তিক্য হিতবাদী চেতনাকেও অস্বীকার করেননি। তাঁর যুক্তিবাদী চিত্ত মনুষ্যপ্রেম ও প্রীতির গঙ্গোদকে সর্বদা অভিষিক্ত ছিল। তিনি Hume ও Spencer প্রভৃতি মানবহিতবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতাদর্শ পাঠ করেও নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের আবর্তে ঘুরপাক খাননি। ভারতের

শাশ্বত অমৃতচেতনা, যা অধ্যাত্মভূমিতে অভিষিক্ত হয়ে ভক্তির নভোমণ্ডলে নিঃসন্দিগ্ধ মহিমা প্রকাশ করেছে; তাকে তিনি জ্ঞানতত্ত্বের নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধি ও মননশীলতায় যথার্থ বলে উপলব্ধি করেন। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল নিঃসংশয় চিত্তে ভারতের ভক্তিবাদের মহিমাকে উচ্চ গৌরবে প্রচার করতে দ্বিধা করেননি। পাশ্চাত্য 'হিউম্যানিষ্ট'দের দর্শনচেতনা ও আধুনিক ভারতবর্ষের মানবহিতবাদী ধর্মভাবনা, যা রামমোহনের যুক্তিবাদী বিশ্লেষণী চিন্তায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের ভক্তিবাদী আদর্শে এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অদ্বৈতবাদী সর্বধর্মসমন্বয়ী প্রেম-ধর্ম সাধনাতে বিকশিত হয়েছিল; তা তিনি এক গণ্ডূষে পান করেছিলেন। তাঁর নাটকে যে মাতৃবন্দনা ও মাতৃপূজা, তা ওই সকল আদর্শেরই বিমিশ্র বহিঃপ্রকাশ।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেম নাটক রচনার উদ্দেশ্যের মধ্যে জাতির অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং ভারতের অধ্যাত্মসাধনাকে আপন যুগধর্মের অনুকূলে বরণ করেছিল। তিনি শাস্ত্রচিন্তাকে জ্ঞানবাদের দ্বারা বিশুদ্ধ করে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্বিত করেন। তাঁর এই কর্ম-চিন্তার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতি ও স্বদেশের পূর্ণ কল্যাণসাধন। দেশপ্রেমের হিতাদর্শে দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটক রচনার মধ্যে দেশবাসীকে আত্মপ্রবুদ্ধ করে, পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব সাধনার পথে পরিচালিত করতে প্রয়াসী হন। এর জন্য তিনি ভারতবাসীর বিনষ্ট ও বিস্মৃত আত্মপরিচয়ের গৌরব-কথামালাগুলি নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধারের মত পুরাতন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আবিষ্কার করেন। দেশবাসীর জীবনচেতনার বহিঃপ্রদেশে যখন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উগ্র বাসনা অগ্নিতেজে মেতে উঠেছিল, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল দেশবাসীর সামনে তাদের বৈভবময় ইতিহাস, অতীতকীর্তি এবং বীরগাথা, ধর্মাদর্শ, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য, দারিদ্র্যের অগ্নিগর্ভ তেজস্বীতার আদর্শগুলি তুলে ধরেন। সেজন্য তাঁর স্বাদেশিক চিন্তাতে সংরক্ষণ ও সংগঠন দুই চেতনাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল আপন স্থির বুদ্ধির নিষ্কম্প আলোকশিখায় বুঝেছিলেন যে ভারতের সনাতন ধর্মের অধঃপতনই জাতির অধোগামিতার একমাত্র কারণ। ভারতের শাশ্বত ধর্ম নিগৃহীত হয়েছে বলেই সাম্প্রদায়িক বিভেদ, আত্মকলহ, জাতিবিদ্বেষ ও ধর্মের গোঁড়ামি মাথা তুলে ভারতবাসীর সত্যকার উন্নতির পথে অচল অবরোধ সৃষ্টি করেছে। অধ্যাত্মপথেই ভারতবাসী

মুক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে এ বিশ্বাস তাঁর স্থির ছিল বলে, জাতির মঙ্গলের জন্য তিনি ধর্মকে উদ্ধার করে কর্ম-বিচিন্তাতে তাকে সত্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য দেশের চিরন্তন ক্ষুদ্রতা, আলস্য, ঔদাসিন্য, জাতিভেদ যা জাতীয় জীবনকে অবজ্ঞেয় করে তুলেছে, তাকে দূর করাই ছিল তাঁর নাট্যসাধনার একমাত্র ব্রত। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন,—কর্মযোগী সাধক। কর্মের নিরলস সাধনায় তিনি দেশ ও জাতির যে অক্ষয় মঙ্গলচিন্তা করেছিলেন, নাটকের বহুস্থানে তার পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়।

'রাণা প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতবাসীর অধঃ-পতনের কারণ নির্দেশ করেছেন, নাট্যচরিত্র মানসিংহ ও অন্যান্য রাজপুত-বীরদের সংলাপে,

"গোয়ালীয়র।...বলেছিলাম না যে, মহারাজ মানসিংহকে পাবার আশা দুরাশা। ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নমাত্র।

মানসিংহ। স্বাধীনতা মহারাজ! জাতীয় জীবন থাক্‌লে তবে ত স্বাধীনতা! সে জীবন অনেক দিন গিয়েছে। জাতি এখন পচ্‌ছে।

চান্দেরী। কিসে?

মানসিংহ। তাও প্রমাণ কর্ত্তে হবে? এ অসীম আলস্য, ঔদাসীন্য, নিশ্চেষ্টতা—জীবনের লক্ষণ নয়! দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণ বারাণসীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে খায় না, সমুদ্র পার হলে জাত যায়; জাতির প্রাণ যে ধর্ম্ম, তা আজ মৌলিক আচার মাত্র;—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়! ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব, অহঙ্কার,—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়। সেদিন গিয়েছে মহারাজ!

বিকানীর। আবার আসতে পারে, যদি হিন্দু এক হয়।

মানসিংহ। সেইটেই যে হয় না। হিন্দুর প্রাণ এতই শুষ্ক হয়েছে, এতই জড় হয়েছে, এতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে,—আর এক হয় না।

গোয়ালীয়র। কখন কি হবে না?

মানসিংহ। হবে সেই দিন, যেদিন হিন্দু এই শুষ্ক শূন্যগর্ভ জীর্ণ আচারের খোলস হতে মুক্ত হ'য়ে, জীবন্ত জাগ্রত বৈদ্যুতিক বলে কম্পমান নবধর্ম্ম গ্রহণ কর্ব্বে।

গোয়ালীয়র। কি সে ধর্ম্ম? (ব্যঙ্গস্বরে) মুসলমান ধর্ম্ম বোধ হয়?

মানসিংহ। না, গোয়ালীয়রপতি,—সে ধর্ম্ম—'মা'! আচারের বন্ধন মুক্ত হ'য়ে যেদিন হিন্দু জন্মভূমিকে প্রাণভরে 'মা' ব'লে ডাকবে, সেদিন আবার হিন্দু এক হ'বে। আমরা কেউ তা বল্‌তে পারি না, তাই হিন্দু পরাধীন।

মাড়বার। মানসিংহ সত্য কথা বলেছেন।

মানসিংহ। মনে করেন কি মহারাজগণ!—যে আমি এই পরকীয় দাসত্বভার হাস্যমুখে বহন কচ্ছি?...অনুমান করেন কি যে, আমি রাণা প্রতাপের মহত্ত্ব বুঝি নাই? আমি এতই অসার!—কিন্তু না মহারাজ, সে হবার নয়। যা নেই তার স্বপ্ন দেখার চেয়ে, যা আছে, তারই যোগ্য ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।" (৫।৬গ)

আবার, জাতীয় অনৈক্য সম্পর্কে নাট্যকারের খেদোক্তি নাট্যচরিত্র প্রতাপসিংহের দীর্ঘশ্বাসে শোনা যায়:

"প্রতাপ। যদি রাজপুত এক হয়, যদি সে দৃঢ়পণ করে যে আর্য্যাবর্ত্তকে মোগলসম্রাটের গ্রাস থেকে মুক্ত কর্ব্বে ত মোগল-সিংহাসন কদিন টিকে! তথাপি আমি বিশ বছর ধ'রে একাকী যুদ্ধ কর্লাম,—একজনও এমন রাজপুত রাজা নাই যে, আমার জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, একটি অঙ্গুলি তোলে!" (৪।৬গ)

'দুর্গাদাস' (১৯০৬) নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতের একক খণ্ড রাষ্ট্রশক্তির গৌরব করলেও, ভারতের সম্মিলিত রাষ্ট্রনীতিতে অনৈক্য, বিভেদ ও পরস্পর বিরোধের মধ্যে আত্মশক্তি ক্ষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন নাট্যচরিত্র দুর্গাদাসের উক্তিতে,

"দুর্গাদাস। যোদ্ধা বটে মারাঠা জাত!—অদ্ভুত অশ্বচালনা, অদ্ভুত সমর-কৌশল, অদ্ভুত সহিষ্ণুতা!—এর সঙ্গে যদি রাজপুত জাতির একাগ্রতা, ত্যাগ আর দৃঢ়তা পেতাম, কি না হ'তে পার্ত্ত! না, তা হবার নয়। ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়! হিন্দুজাতি যে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে; আর এক হবার নয়। সে তেজ গিয়েছে যাতে কম্পমান আত্মাকে পরের হিতে টেনে নিয়ে যায়। উঠেছিল এই আর্য্যজাতি—যে দিন ব্রাহ্মণের তপোবল ছিল, ক্ষত্রিয়ের ত্যাগ ছিল, বৈশ্যের নিষ্ঠা ছিল, শূদ্রের কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল। সে সব গিয়েছে, আর ফির্ব্বার নয়। এখন আবার নূতন উপাদানে জাতীয় চরিত্র গঠন কর্ত্তে হবে, নূতন বলে উঠ্‌তে হবে, নূতন তেজে কম্পমান হ'তে হবে।" (৪।৬গ)

আবার, স্বজাতি হিন্দুধর্মাবলম্বী মারাঠার হাতে নিগৃহীত হয়ে, নাট্যচরিত্র দুর্গাদাস আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন,

"দুর্গাদাস। শেষে এ দশাও হোল! যে লাঞ্ছনা এতদিন বিজাতীয় বিধর্মী শত্রুর কাছে হয় নি, তা আজ স্বজাতি স্বধর্ম হিন্দুর হাতে হোল!—তা না হলে মা ভারতভূমি!—তোমার আজ এ দুর্দ্দশা কেন? যদি হিন্দু ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য, ক্ষুদ্র প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির জন্য, হিন্দুর নিগ্রহ না কর্ব্বে, তা হলে, হা নির্ব্বোধ জাতি, সকলে একত্রে সমভাবে পরের পদতলে পড়ে থাকবে কেন! ওরে হতভাগা!—একদিনের জন্য এক হ' দেখি! একদিন নিজের চিন্তা ছেড়ে সবাই ভায়ের চিন্তা কর্ দেখি। একদিন সবাই নতজানু হয়ে করজোড়ে আমাদের এই মাকে প্রাণ ভরে' মা বলে' ডাক দেখি। দেখ্ এই অত্যাচার, এই অন্যায়, এই স্বেচ্ছাচার চূর্ণ হয়ে যায় কিনা।" (৪।৮গ)

পুনরায়, দেশবাসীর আলস্য, শান্ত-শীতল-সন্তোষপূর্ণ জীবনচর্যা এবং উচ্চ জীবনচিন্তার অভাব দেশের অধোগামিতার অন্যতম কারণ বলে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল যে স্থির বিশ্বাস পোষণ করতেন, তার রোদনক্লান্ত পরিচিতি নাট্যচরিত্র দুর্গাদাসের উক্তিতে উপলব্ধি করতে পারি।

"দুর্গাদাস। ব্যর্থ হয়েছি। পার্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে। সহস্র বৎসরের নিষ্পেষণে জাতি নির্জ্জীব হয়েছে। নগরের রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে দেখেছি যে, পুরবাসীরা নিস্তেজ। ছায়ানিবিড় গ্রামগুলি দিয়ে হেঁটে গিয়েছি, দেখেছি যে, গ্রামবাসীরা নিশ্চেষ্ট উদাসীন! বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গিইছি, দেখেছি যে, কৃষকেরা অলস মন্থর গমনে ভূমি কর্ষণ কর্চ্ছে! সমস্ত জাতির প্রাণ নাই। অত্যাচারে প্রপীড়িত হলেও পদাহত স্থবির কুকুরের মত নিম্নস্বরে একটা গভীর আর্তনাদ করে মাত্র। প্রতিকারের চেষ্টা করে না। মোগল সাম্রাজ্য থাকবে না বটে, কিন্তু এ জাতি আর উঠ্‌বে না।" (৫।৮গ)

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিক সংহিতা 'মেবার-পতন' (১৯০৮) নাটকেও হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মবিদ্বেষের প্রকৃত ছবি দেখতে পাই। আপন ধর্ম ও সমাজের যে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, তাকে তিনি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করেন। দেশবাসীর চৈতন্যবোধকে জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল এসবের নিন্দনীয় সমালোচনা করেছেন।

'মেবার-পতন' নাটকে, মহাবৎ খাঁ ও মানসী দুই নাট্যচরিত্রের মধ্যে নাট্যকারের স্বকীয় চিন্তা বাণীরূপ পেয়েছে। মহাবৎ খাঁ হিন্দুদের চিত্তের অনুদার নীতির সমালোচনা করে বলেছেন,

"মহাবৎ। এত বিদ্বেষ!—এত আক্রোশ! আশ্চর্য্য নয়, যে এই জাতি বারবার মুসলমানের পদদলিত হয়েছে। আশ্চর্য্য নয়, যে এই ঘৃণা মুসলমান সুদ সমেত ফিরিয়ে দিচ্ছে! এই এঁদের উদার—অত্যুদার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম! মুসলমান ধর্ম্ম, আর যাই হোক্, তার এ মহত্ত্বটুকু আছে যে, সে যে-কোন বিধর্ম্মীকে নিজের বুকে করে' আপনার করে' নিতে পারে। আর হিন্দু ধর্ম্ম? —একজন বিধর্ম্মী শত তপস্যায় হিন্দু হ'তে পারে না।" (৩।৪গ)

আবার, হিন্দুদের স্বজাতি-বিদ্বেষ সম্পর্কে মহাবৎ খাঁ অপর নাট্যচরিত্র মহারাজ গজসিংহকে বলেছেন,

"মহাবৎ। ...রাজপুতের প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষ তত আন্তরিক হবে না জানি,—তার নিজের জাতির বিদ্বেষ যত আন্তরিক হবে। আমি ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস পাঠ করে' এটা ঠিক বুঝেছি, যে স্বজাতির উপর পীড়ন করে' হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ তার আর কিছুতে নয়!" (৪।২গ)

রাণা অমর সিংহও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন,

"রাণা। যে জাতির মধ্যে এত ক্ষুদ্রতা, সে জাতিকে স্বয়ং ঈশ্বর রক্ষা কর্ত্তে পারেন না। মানুষ ত ছার।" (৪।১গ)

'সাজাহান' (১৯০৯) নাটকেও দ্বিজেন্দ্রলালের সম মনোভাবনার ছায়াপাত ঘটেছে নাট্যচরিত্র যশোবন্ত সিংহ ও অন্যান্য রাজপুরুষদের কথোপকথনে,

"যশোবন্ত। তবে আসুন, আমরা দেশের জন্য যুদ্ধ করি! মেবারের রাণা রাজসিংহ, বিকানীরের মহারাজ আপনি, আর আমি যদি মিলিত হই ত এই তিন জনেই মোগল সাম্রাজ্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি আসুন।

জয়সিংহ। তারপর সম্রাট্ হবেন কে?

যশোবন্ত। কে! রাণা রাজসিংহ।

জয়সিংহ। আমি ঔরংজীবের প্রভুত্ব মান্‌তে পারি, কিন্তু রাজসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ত্তে পারি না।

যশোবন্ত। কেন মহারাজ? তিনি স্বজাতি বলে?

জয়সিংহ। তা বৈকি। জাতির দুর্ব্বাক্য সইব না! আমি কোন উচ্চ প্রবৃত্তির ভাণ করি না! সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশী পাবো সেইখানেই যাবো। ঔরংজীব কম দামে বেশী দিচ্ছে। এই ধ্রুব সম্পৎ ত্যাগ করে' অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাই না।...আজ আমরা স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত প্রজা ত হ'তে পারি। রাজভক্তিও ধর্ম্ম।

যশোবন্ত। হিন্দুর সাম্রাজ্য কবির স্বপ্ন। হিন্দুর প্রাণ বড়ই শুষ্ক, বড়ই ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে। আর পরস্পর জোড়া লাগে না।" (৩।৬গ)

ধর্মের গোঁড়ামি ও স্বার্থপরতা হিন্দুদের যেমন শক্তিহীন ও হীনবীর্য করে তুলেছে, তেমনি স্বেমীয় ধর্মের উদারতা মুসলমানদের করেছে বলশালী। স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় ঐক্যবল, এবং উদারতার মধ্যে ঐক্যশক্তির বন্ধনবীজ বর্তমান থাকে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির সঙ্ঘবদ্ধ চেতনাকে আরও গভীরভাবে উদ্দীপিত করবার উদ্দেশ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুদের চিত্তের সকল অসাড়ত্বকে দূর করতে চেয়েছিলেন। 'মেবার-পতন' নাটকে নাট্যচরিত্র সগরসিংহ ইসলাম ধর্মের উদারতার দিকটি প্রকাশ করে বলেছেন,

"সগর। ...ও রক্তবীজের বংশ। কত কাটবে? আর মুসলমানের দলসংখ্যা যদি কমে যায়, ত তারা আবার গোটাকতক হিন্দুকে 'মুসলমান করে' আবার লড়বে। হিন্দুরা সে রকম ত আর মুসলমানগুলোকে হিন্দু কর্ব্বে না। মুসলমানকে হিন্দু কর্ব্বে কি! যারা একবার ফেরে পড়ে' মুসলমান হয় তাদেরও তারা আর ফিরে নেবে না। ঐ জায়গাটাতেই হিন্দুরা ভুল করেছে।" (২।১গ)

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিক আদর্শের মানস-প্রতিমা মানসী মেবার পতনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে একই যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি সত্যবতীকে বলেছেন,

"মানসী। মা! মেবারের পতন কি আজ আরম্ভ হ'ল? না মা, তার পতন আজ হয় নি। তার পতন বহুদিন পূর্ব্বে হতে আরম্ভ হয়েছে। এ পতন সেই পরম্পরার একটি গ্রন্থিমাত্র।

সত্যবতী। সে পতন কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে মা?

মানসী। যে দিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে

চলেছে। যে দিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। মা! যতদিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে। কিন্তু সে স্রোত যখন বদ্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ এই নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতিবিদ্বেষ জন্মেছে। সেই উদার—অতি উদার হিন্দুধর্ম্ম—আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল। যার ধর্ম্ম গেল মা, তার পতন হবে না? জাতি যে পাপে ভরে গেল, তা' দেখবার কেউ অবসর পায় না। মেবার গেল বলে' ক্রন্দন কর্লে কি হ'বে মা?

সত্যবতী। এ দুঃখে কি তবে এই সান্ত্বনা?

মানসী। না, তার চেয়েও বড় সান্ত্বনা আছে। সে সান্ত্বনা এই যে, মেবার গিয়েছে যাক; তার চেয়ে বড় সম্পৎ আমাদের হোক্। আমি চাই যে আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান হোক্, যে সে দুঃখে নৈরাশ্যে, ঝঞ্ঝার অন্ধকারে ধর্ম্মকে জীবনের ধ্রুবতারা করুক। যদি তা সে না করে, ত সে উচ্ছন্ন যাক্; আমি ক্ষুব্ধ নহি।

সত্যবতী। ভাই উচ্ছন্ন যাবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব?

মানসী। প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব্বো তাকে তুলতে। তবু যদি না পারি—ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম পূর্ণ হোক্। যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক্! দেশ, স্বাধীনতা ডুবে যাক্—এ জাতি আবার মানুষ হোক্।

সত্যবতী। তা কি হবে মা?

মানসী। কেন হবে না! আমাদের সেই সাধনা হোক্। উচ্চ সাধনা কখনও নিষ্ফল হয় না। এই জাতি আবার মানুষ হবে!

সত্যবতী। সে কবে?

মানসী। যেদিন তারা এই অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে নিজেরা আবার ভাবতে শিখ্‌বে, যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত উঠবে; যেদিন তারা যা উচিত বা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর্ব্বে, নির্ভয়ে তাই করে যাবে; কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারো ভ্রূকুটির দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্ব্বে না। যেদিন তারা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে—নব ধর্ম্মকে বরণ কর্ব্বে।

সত্যবতী! কি সে ধর্ম্ম মানসী?

মানসী। সে ধর্ম্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে,

জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে। তারপরে আর তাদের—নিজের কিছু কর্ত্তে হবে না ; ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। নইলে নিজে নীচ, কুটিল স্বার্থসেবী হ'য়ে, রাণা প্রতাপসিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে, অতীত গৌরবের নির্ব্বাণ-প্রদীপ কোলে করে', চিরজীবন হাহাকার কর্লেও কিছু হবে না।" (৫।৭গ)

দ্বিজেন্দ্রলালের এই বক্তব্যের অন্তরালে বিশ্লেষণী আলোক নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, তিনি মনুষ্যত্ববোধ ও মানবপ্রেমকে রাজনীতির বেদীমূলে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। নিছক অধ্যাত্মবাদী বিশ্বপ্রেমকে তিনি আহ্বান করেননি। বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী চিন্তা ও যুক্তির মনন-ধ্যানে নাট্যকার উপলব্ধি করেন যে, ভারতবাসীর ঐকান্তিক সামাজিক আত্মবোধ ও মমত্ববিলাস ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় জীবন ও রাষ্ট্রশক্তিকে পঙ্গু করে তুলেছে। ভারতবর্ষ সমাজকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে সামাজিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষাতে সদা উদ্‌গ্রীব। এমন কি অতীতের বহু রাজনৈতিক পরাধীনতা ও বিদেশী আক্রমণ সমাজের আভ্যন্তরীণ কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। এরই ফলে ভারতবাসীর সামাজিক আত্মবোধ যতখানি জাগ্রত হয়েছে, রাজনৈতিক আত্মবোধ ততখানি প্রখর হয়নি। ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণ যখন ঘটেছে, দেশের রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে ; তখনও ভারতবাসী রূপান্তর বা পরিবর্ত্তনের কোন চেষ্টা না করে, হিন্দুধর্মের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হয়ে আচার ও প্রথাকেই বাঁচবার একমাত্র অবলম্বন বলে স্বীকার করে নিয়েছে। রাষ্ট্র-চিন্তাতে এই উদাসীনতা ও অসংযত সামাজিক আচরণের প্রতি স্থির আস্থা, দেশবাসীর জাতীয় চিন্তাতে কুহেলিকার বিস্তীর্ণ আস্তরণ সম্প্রসারিত করেছিল বলেই মুসলমানেরা হিন্দুদের রাজ্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিয়েছেন যে, অমিত-বীর্য রাজপুতদের পরাজয় এই জীর্ণ-সংস্কারাবদ্ধ কারণের জন্যই ঘটেছে। সমাজের কঠোরতর আচার ও প্রথার পরিবেষ্টনী তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে অনৈক্য। হিন্দু ধর্মের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করে রাজপুতেরা সংস্কারকে শ্রেষ্ঠ বলে বরণ করেছিলেন বলেই দেশের চরম বিপর্যয়ে তাঁদের জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেনি।

সেজন্য দ্বিজেন্দ্রলাল দেশবাসীকে শুনিয়েছেন ধর্মের মানবিক তাৎপর্য। তিনি সমাজের যুক্তিহীন সংস্কারের মূলে আঘাত হানতে চান। দ্বিজেন্দ্রলাল রাজনৈতিক চিন্তাতে ধর্ম ও সমাজের কল্যাণবোধকে অনুবিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ছিল এই ইচ্ছারই পরিপূরক। জাতিকে জাগাতে হলে ধর্ম ও সমাজকে উদার হতে হবে; আর মনুষ্যত্ব সাধনার পথেই হবে এর শুভ উদ্বোধন। দ্বিজেন্দ্রলাল একেই 'নবধর্ম্ম' বলেছেন।

মনুষ্যত্ব ও প্রেম উভয়ে জাতীয়তার শ্রীক্ষেত্র নির্মাণ করলেও ত্যাগের বিনা অনুশীলনে স্বাদেশিকচিন্তার রথযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়। সেজন্য দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয়তার স্বার্থে ত্যাগের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন 'মেবার-পতন' নাটকে, নাট্যচরিত্র সগরসিংহের উক্তিতে। 'এদেশ যেমন আমার, তেমনি আমিও দেশের'—জনসমষ্টির কল্যাণবোধের উপরেই ব্যক্তিকল্যাণবোধ নিহিত; এইরূপ এক দেশাত্মবোধের অনুভাবনাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের রাষ্ট্র-ভাবনার বিকাশ। নাট্যচরিত্র সগরসিংহের 'নবমন্ত্রে' এই সত্যই প্রকাশিত।

"জাহাঙ্গীর। মর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছ সগরসিংহ?

সগরসিংহ। সম্পূর্ণ। আগে মর্ত্তে বড ভয় কর্ত্তাম! কিন্তু সেদিন আমি এক নবমন্ত্রে দীক্ষিত হ'লাম।

জাহাঙ্গীর। কি নব-মন্ত্র সগরসিংহ?

সগরসিংহ। ত্যাগের। পৃথিবীতে দুইটি রাজ্য আছে। একটির নাম স্বার্থ, আর একটির নাম ত্যাগ। একটির জন্মস্থান নরক, আর একটির জন্মস্থান স্বর্গ। একটির দেবতা শয়তান, আর একটির দেবতা ঈশ্বর। আমি এতদিন স্বার্থের রাজ্যে বাস কর্‌ছিলাম। সেদিন ত্যাগের রাজ্য দেখলাম! সে রাজ্যের রাজা বুদ্ধ, খৃষ্ট, গৌরাঙ্গ, সে রাজ্যের রাজনীতি স্নেহ, দয়া, ভক্তি। সে রাজ্যের শাসন সেবা, রাজদণ্ড অনুকম্পা, পুরস্কার আত্মবলিদান। আমি সেদিন থেকে সেই রাজ্যের রাজা হ'লাম। যে হস্তে কখনও তরবারি ধরি নাই, সে হস্তে আত্মরক্ষার্থে তরবারি ধরলাম। আমার স্কন্ধে দস্যুর খড়্গাঘাত, কুসুমের মত কোমল বোধ হ'ল।

জাহাঙ্গীর। তারপর!

সগরসিংহ। তারপর আমি এখানে মৃত্যুতে আমার পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে এলাম! আগে মর্ত্তে বড ভয় কর্ত্তাম। কিন্তু আর ভয় করি

না। যে প্রাণভরে ভালোবাস্‌তে পারে, যে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে, তার আবার মর্ত্তে ভয়!" (৩।৫গ)

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর উদার ধর্মনীতিতে, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের মধ্যে মহান্ ভারতের উত্থানের স্বপ্ন দেখেছেন। প্রেমের মধ্যে যেমন আত্মপর ভেদ নেই, তেমনি বিভিন্ন ধর্মের পথও সেই একই মহাসত্যের দ্বারদেশে পৌঁছে দেয়। আধুনিক বিশ্বের মানবহিতবাদী চিন্তা থেকে তিনি যে বিশ্বপ্রেমধর্মের পূজারী হয়েছিলেন, একথা আমরা আগে জেনেছি। অবশ্য তাঁর সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রচারের এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ইংরেজ সরকার 'divide and rule policy'-তে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ও বৈরিতা সৃষ্টিতে বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয় নেতাদের সঙ্গে এক হয়ে সাম্প্রদায়িক ঐক্যাদর্শ প্রচার করেছিলেন। তাই তাঁর নাটকে জাতীয় মহাজীবন-সংগঠন চিন্তা স্বাভাবিকভাবে যুগপ্রভাবের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে চিত্রিত হ'তে পারে।

'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকে ধর্ম-সম্মিলন আলোচনাতে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যাদর্শ প্রচার করেছেন। নাট্যচরিত্র মেহের উন্নিসা, পিতা আকবরকে বলেছেন,

"মেহের উন্নিসা। সম্রাট্! কিসের জন্য এত তর্ক, এত যুক্তি, এত আলোচনা, বুঝি না! ধর্ম্ম এক! ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুষ স্বার্থপরতায়, অহঙ্কারে, লালসায়, বিদ্বেষে, তাকে বিকৃত করেছে। ধর্ম্ম!—আকাশের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর দিকে চেয়ে দেখুন সম্রাট্, দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন পিতা, সুপ্রসন্না শ্যামলা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন মহারাজ!—সেই এক নাম লেখা, সে নাম ঈশ্বর। মানুষ তাকে পরব্রহ্ম, আল্লা, জিহোভা, এই সব ভিন্ন নাম দিয়ে পরস্পরকে অবজ্ঞা কচ্ছে, হিংসা কর্চ্ছে, বিবাদ কচ্ছে! মানুষ এক; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মেছে বলে' তা'রা ভিন্ন নয়।" (৩।২গ)

আবার অন্য একস্থানে দ্বিজেন্দ্রলাল রাণা প্রতাপসিংহের কন্যা ইরা ও সম্রাট আকবরের দুহিতা মেহের উন্নিসার পরস্পর সখীত্বের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা দেশবাসীকে শুনিয়েছেন:

"ইরা। তুই মোগল-কন্যা, আমি রাজপুত-কন্যা! তোর বাপ আর আমার বাপ শত্রু! এমন শত্রু যে তাঁরা পরস্পরের মুখদর্শন করা বোধ হয়

একটা মহাপাতক বিবেচনা করেন! কিন্তু তুই আমার বন্ধু; এ বন্ধুত্ব যেন অনেক দিনের—এ বন্ধুত্ব যেন পূর্ব্ব জন্মের।" (৪।৪গ)

'দুর্গাদাস' নাটকেও দ্বিজেন্দ্রলালের সাম্প্রদায়িক মিলন-বাসনার কথা নাট্যচরিত্র সেনাপতি দিলীর খাঁর উক্তিতে স্থান পেয়েছে। মোগল সেনাপতি, সম্রাট ঔরংজীবকে সম্প্রদায়গত ও বর্ণগত বিদ্বেষ ভুলে এক একাত্ম-পূর্ণতম জাতি গঠনে আহ্বান জানিয়েছেন:

"দিলীর।……এখনো হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন। হিন্দু-মুসলমান এক হোক; মন্দিরে মস্‌জিদে স্বাধীনভাবে আল্লার ও ব্রহ্মের নাম নিনাদিত হোক; এক সঙ্গে দামামা শঙ্খধ্বনি উঠুক। হিন্দু-মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক দেখি সম্রাট্। সেদিন হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা সংসারে কেহ কখন দেখে নাই।

ঔরংজীব। হিন্দু-মুসলমান এক হবে দিলীর খাঁ?

দিলীর। কেন হবে না সম্রাট! তারা এতদিন একই আকাশের নীচে, একই বাতাস সেবন করে, একই জল পান করে, একই ভূমিজাত শস্য খেয়ে আস্‌ছে। এখনো কি তাদের প্রাণ এক হয়নি? তা'রা একবার ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, একবার নতজানু হয়ে, করজোড়ে ভক্তি বাষ্পগদগদ-স্বরে এই শ্যামলা সুজলা ভারতভূমিকে একবার প্রাণভরে মা বলে ডাকুক দেখি সম্রাট!" (৫।৪গ)

'নুরজাহান' (১৯০৮) নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মিলন-মধুর বাণী প্রচার করেছেন, নাট্য-চরিত্র সম্রাট সাজাহান ও কর্ণসিংহের কথোপকথনে:

"সাজাহান।…দীর্ঘকাল ধ'রে আপনার আতিথ্যে বাস করি; এই প্রাসাদ, এই সিংহাসন, ঐ মস্‌জিদ, রাণা আমারই জন্য নির্ম্মাণ করিয়ে দেন। —রাণা আমি চ'লে গেলে এগুলি আমার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে দেবেন কি?

কর্ণসিংহ। যতদিন কালের হস্ত হ'তে রক্ষা কর্ত্তে পারি সম্রাট্!

সাজাহান। আর ঐ মাদার মসজিদ! সে ত হিন্দুর বিধর্ম্মীর মসজিদ।

কর্ণসিংহ। হিন্দু আজ পতিত হ'লেও এত হীন হয়নি জাঁহাপনা। যতদিন মেবার বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে, ততদিন ঐ মস্‌জিদে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালাবার জন্য তৈলের অভাব হবে না।

সাজাহান। ধন্য হিন্দুর ঔদার্য্য। আর—আমি মুসলমান হ'লেও আমার ধমনীতে তিনভাগ হিন্দু রক্ত।...কর্ণসিংহ আজ থেকে আমরা দুই ভাই; আর হিন্দু আর মুসলমান ভাই ভাই।" (৫।৭।গ)

'মেবার-পতন' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল জাতিকে হিন্দুধর্মের সারসত্য শুনিয়েছেন, এবং দেশবাসীকে স্বীয় ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ হ'তে আহ্বান করেছেন। নাট্যচরিত্র সগরসিংহ তাঁর ধর্মান্তরিত পুত্র মহাবৎ খাঁকে বলেছেন,

"সগরসিংহ। তোমার বিশ্বাস মহাবৎ খাঁ!......কোরাণ পড়েছ অবশ্য। সে অবশ্য অতি মহৎ ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম তাকে হিংসা করে না। তার সঙ্গে এর বিবাদ নাই। কিন্তু তোমার নিজের; তোমার পিতা প্রপিতামহের; ব্যাস, কপিল, শঙ্করাচার্য্যের সেই ধর্ম্ম ছাড়বার আগে—সে ধর্ম্মটি পড়ে দেখেছিলে কি মহাবৎ খাঁ?...যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মজয়, যে ধর্ম্মের চরম বিকাশ সর্ব্বভূতে দয়া,—যে দয়া শুদ্ধ মনুষ্য জাতিতে আবদ্ধ নয়, সামান্য পিপীলিকাটি বধ কর্ত্তে যে ধর্ম্ম নিষেধ করে; সেই ধর্ম্ম তুমি এক কথায় ছেড়ে দিলে—মহাবৎ খাঁ! মহাবৎ খাঁ!—তুমি কি পাপ করেছ, তুমি জাননা।" (৩।৪গ)

যুক্তিবাদী অথচ অধ্যাত্মমুখী অনুভাবনা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের রস ও রক্ত ছিল। ধর্ম্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য আদর্শ প্রচারে তিনি ভারতবর্ষের সনাতন প্রেম-মৈত্রী করুণা ও মহাবিশ্ব চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগপটভূমিতে নাট্যকারের এই প্রয়াস সীমাহীনভাবে জনচিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ঐতিহাসিক নাটক রচনাতে দ্বিজেন্দ্রলাল অধিকাংশক্ষেত্রে ইতিহাসকে স্বাভাবিকভাবে অনুসরণ করেন। তাঁর 'রাণা প্রতাপসিংহ' ও 'দুর্গাদাস' টডের 'রাজস্থান কাহিনী' ও 'মারবাড়ের ইতিহাস' অবলম্বনে রচিত। 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটক রচনাতে নাট্যকার ইতিহাসের প্রতি যে প্রীতি ও আনুগত্য দেখিয়েছেন, তার তুলনায় 'দুর্গাদাসে' ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা অনেক কম। ঘটনার ঘনঘটায় ও অনাবশ্যক দৃশ্য সংযোজনে নাটকটির লক্ষ্য ও পরিণতি বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে। 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, সম্রাট আকবরের চরিত্র বহুলাংশে হীন, দাম্ভিক ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হিসাবে অঙ্কিত করেছেন। এই নাটকের ভূমিকায় আকবরের চরিত্র সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন,

"অনেকে ভাবিবেন যে এ গ্রন্থে আমি সম্রাট আকবরের চরিত্র মূল হইতে অন্যায়রূপে বিকৃত করিয়াছি। তাহা করি নাই, আকবরের চরিত্র আমি ঐরূপই বুঝিয়াছি। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুও ঐরূপই বুঝিয়াছিলেন।...রিপুর অধীন হইলে তিনি জঘন্য কার্য্য করিতে পারিতেন।"

নাট্যচরিত্র শক্তসিংহের উক্তিতে নাট্যকার তাঁর অনুরূপ চিন্তার বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন।

"শক্তসিংহ। আমি বলতে চাই যে, সম্রাট ভারতের সর্ব্বপ্রধান ডাকাত। তফাৎ এই যে, ডাকাত স্বর্ণ রৌপ্য লুঠ করে, আর আকবর রাজ্য লুঠ করেন।...মোগলের সঙ্গে অনেকদিন মিশেছি, মোগলকে বেশ চিনেছি... আকবরকে বেশ চিনেছি। তিনি এক কূট, বিবেকহীন, কপট রাজনৈতিক।" (৩।১গ)

দ্বিজেন্দ্রলালের মতে সম্রাট আকবরের হিন্দুপ্রীতি ছিল সম্পূর্ণভাবে অভিসন্ধিমূলক। কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবিস্তার বাসনাকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই তিনি উদার ধর্ম-নীতিকে মুখোশের মত বদনপরিমণ্ডলে ধারণ করেন। উদ্ধত স্পর্দ্ধায় তিনি কন্যার কাছেও আপন চিত্তের রিরংসাবৃত্তি প্রকাশে এবং হিন্দুপত্নী নিন্দাতে পরাঙ্মুখ হন না।

"মেহের উন্নিসা। ...জানেন, আমার মাতা—সম্রাজ্ঞী এই হিন্দু মনে থাকে যেন।

আকবর। সম্রাজ্ঞী হিন্দু! কিন্তু সম্রাট হিন্দু নয় মেহের! সে সম্রাজ্ঞী আমার কে?

মেহের উন্নিসা। সে সম্রাজ্ঞী আপনার স্ত্রী।

আকবর। স্ত্রী! সে রকম আমার একশটা স্ত্রী আছে। স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ, বিলাসের সামগ্রী; সম্মানের বস্তু নহে।

মেহের উন্নিসা। কি! সত্যই কি ভারত সম্রাট রাজাধিরাজ স্বয়ং আকবরের মুখে এই কথা শুনলাম? 'স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী, স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ, সম্মানের বস্তু নহে!' সম্রাট জানেন কি যে এই 'স্ত্রী'ও মানুষ, তারও আপনার মত হৃদয় আছে, আর সে হৃদয় আপনারই হৃদয়ের মত অনুভব করে? স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী! আমি মায়ের কাছে শুনেছি যে, হিন্দুশাস্ত্রে এই স্ত্রী সহধর্ম্মিণী; এই নারীজাতির যেখানে পূজা হয় সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন...হা রে অধম পুরুষ জাত! তোমরা এমনই নীচ, এতই অধম

যে, নারী দুর্ব্বল বলে তার উপর এই অবিচার এই অত্যাচার কর ; আর তোমাদের লালসামিশ্রিত ঘৃণায় তাদের দুর্ব্বহ জীবনকে আরও দুর্ব্বহ কর !

আকবর। মেহের উন্নিসা ! আকবর তাঁর কন্যার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করেন না, বিচার করেন না। তিনি কন্যার কাছে এরূপ উদ্ধত বক্তৃতা, এরূপ অসহনীয় আস্পর্দ্ধা, এরূপ পিতৃদ্রোহিতা প্রত্যাশা করেন না।" (৩।৫গ)

অপর নাট্যচরিত্র যোশীর মুখেও দ্বিজেন্দ্রলাল সম্রাট আকবরের ইন্দ্রিয়-পরায়ণ রূপটি প্রকাশ করেছেন। যোশী, স্বামী পৃথ্বীরাজকে প্রকাশ্যভাবে বলেছেন,

"যোশী। যিনি হিন্দুরাজবধূকে আপনার উপভোগ্য বস্তুমাত্র বিবেচনা করেন,...আর এই ছুরি যদি আমার সহায় না থাকৃতো, তা হ'লে তোমার স্ত্রী এতক্ষণ আকবরের সহস্রাধিক বারাঙ্গনার অন্যতম হোত ! ..হায় এক অস্পৃশ্য যবন এসে কামালিঙ্গনের প্রয়াসে তোমার স্ত্রীর হাত ধরে !" (৪।৩গ)

সম্রাট আকবর নিজেও আপন প্রবৃত্তিসর্বস্ব চিত্তের অপরাধকে স্বীকার করে বলেছেন,

"আকবর। ...এখন কামের বশ হয়ে রাজপুত রাজগণের সম্প্রীতি হারিয়েছি।" (৫।৫গ)

অপর দিকে, 'দুর্গাদাস' নাটকে ঔরংজীব চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার টড্‌কে অনুসরণ করেছিলেন। টডে ঔরংজীব সম্পর্কে লেখা আছে,

"In subtlety and the most specious hypocrisy, in that concentration of resolve which confides its deep purpose to none,......Aurungzebe had no superior amongst the many distinguished of his race, but that sin by which 'angels fell' had steeped him in an ocean of guilt, and not only neutralized his natural capacities, but converted the means for unlimited power into an engine of self destruction."[১৮]

দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যচরিত্র ঔরংজীবের মুখেও ইসলাম ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগের কথা প্রকাশ করেছেন,

১৮ History of Rajasthan (Vol. I): Tod; pp. 348-349.

"ঔরংজীব। ...আমি ভণ্ড নহি। আমি অন্তরে বাহিরে মুসলমান। এই সনাতন ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচার কর্ব্বার জন্য এই রাজ্যভার নিইছি!... রাজ্যভার গ্রহণ করে অবধি এই ধর্ম্মের ফকিরী কর্চ্ছি।" (১।১গ)

এর আগে, নাট্যচরিত্র সমরসিংহ ঔরংজীবের ইসলামধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ আন্তরিকতার কথা স্মরণ করে বলেছেন,

"সমরসিংহ। ...মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ আকবরের চেয়ে মহাশয়কে এক বিষয়ে অধিক শ্রদ্ধা করি। কারণ, মহাশয় আকবরের মত ভণ্ড নহেন। মহাশয় খাঁটি মুসলমান—সরল গোঁয়ার ধার্ম্মিক মুসলমান। সম্রাট্ তাঁর মত বিবাহচ্ছলে হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ করেন না। সোজা পরিষ্কার শাণিত সনাতন মুসলমান প্রথায় স্বধর্ম্ম প্রচার করেন।" (১।১গ)

ইতিহাসকে দ্বিজেন্দ্রলাল যুগের প্রয়োজনে পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মত রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেননি। তাঁর নাটকে সম্রাট ঔরংজীব হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঐক্যের প্রতীক নন। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্রাট্ ঔরংজীবের ইস্‌লাম ধর্মের প্রতি প্রত্যক্ষ অনুরাগকে প্রীতির চোখে দেখতেন; কারণ অপরের ধর্মবিশ্বাস নষ্ট করবার কোন ছদ্মবেশ অথবা উদ্দেশ্য সিদ্ধির কূট অপকৌশল তাঁর ছিল না। 'দুর্গাদাস' নাটকে ঔরংজীবের যে চিত্র আমরা পাই তা এই রকম,

"দিলীর খাঁ। ...সম্রাট হিন্দুর বেদ অগ্নিকূপে নিক্ষেপ করেন নি? ব্রাহ্মণকে ধরে' কল্মা পড়ান নি? তীর্থ অপবিত্র করেন নি? দেবমন্দির বিচূর্ণ করেন নি?—জনাব! কথা শুনুন! হিন্দু বিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন, জিজিয়া কর রদ করুন। হিন্দু মুসলমান এক হোক।

ঔরংজীব। কখন না। আমি যতদিন জীবিত আছি, ততদিন মুসলমান মুসলমান, কাফের কাফের।" (৩।১গ)

ঔরংজীব সম্পর্কে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল আপন মনের প্রতিবেদনটুকু 'দুর্গাদাস' নাটকের ভূমিকাতে তুলে ধরেছেন:

"ঔরংজীবকে আমি পিশাচরূপে কল্পনা করি নাই—যেরূপ টড্ ও অর্ম করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সরল ধার্ম্মিক মুসলমানরূপে কল্পনা করিয়াছি। তাহার অত্যাচার অত্যধিক গোঁড়ামির ফল। ইসলাম ধর্ম্মপ্রচারের দৃঢ়-সঙ্কল্পপ্রসূত।"

দ্বিজেন্দ্রলালের মতে ঔরংজীবের হিন্দুনির্যাতন ইসলাম ধর্মের প্রতি

নিবিড় আকর্ষণ ও প্রীতির ফলশ্রুতি। এই গভীর অনুরাগকে তিনি আবার 'অত্যধিক গোঁড়ামি' বলে অভিহিত করেছেন। 'সরল ধাৰ্ম্মিক মুসলমানের' ধর্মানুরাগ এবং ধর্মের প্রতি 'গোঁড়ামি' কখনই সমার্থক নয়। ঔরংজীব ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের নিরঙ্কুশ প্রচার ও স্থায়িত্ব চেয়েছিলেন ; এবং এর জন্য তিনি কৌশলের পরিবর্তে বল-প্রয়োগকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। তাঁকে কখনই সরল ও উদারচিত্ত দরবেশী নৃপতি হিসাবে স্বীকার করা যায় না। যে ইসলাম ধর্ম উদার ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ এবং মানবপ্রেমের উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত*, সম্রাট ঔরংজীবের আচরণে তার কোনটাই পরিস্ফুট হয়নি। তবে মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন আপন জীবনের প্রতিক্ষেত্রে কোন কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি, তেমনি সম্রাট ঔরংজীবের ধর্মবিষয়ে অকপট আচরণ তাঁকে স্বাভাবিকভাবে দিল্লীশ্বরের প্রতি অনুরাগী করেছিল। সম্রাট ঔরংজীবকে 'সরল ধাৰ্ম্মিক মুসলমান রূপে' তাঁর যে ফতোয়া, তা অনেকটাই অজ্ঞেয়তার রহস্যজালে আচ্ছাদিত।

দুর্গাদাস-চরিত্র চিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করেছেন,

"As a skilful general and gallant soldier, in the defence of his country, he is above all praise. As a chivalrous Rajpoot his braving all consequences when called upon to sure the honour of a noble female of his race, he is without parallel. As an accomplished prince and benevolent man,

* "Islam establishes a brotherhood of man. A Muslim must treat every other as a brother with friendliness and generosity. It is a religion which gives high prominence to service. The good of humanity and service of man is the service of God. It is a religion of peace, tranquillity and resignation to the Will of God. A Muslim is enjoined to do selfless service of suffering humanity......what is demanded of a man is a contrite heart, sincere repentance and sincere effort to avoid evil and practise truth. It is said : "He needs no other rosary whose thread of life is strong with beads of love, service, charity and renunciation."

Glimpses of World Religions : pp, 217-218.

his dignified letter edict, places him high in the scale of moral, as well as intellectual, excellence."[১৯]

দ্বিজেন্দ্রলালও, দুর্গাদাসের প্রতি ইতিহাসের নির্দেশ ও মূল্যবোধ বিচারকে শিরোধার্য করে আপন চিত্তের অনুরাগমিশ্রিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন, নাট্যচরিত্র দিলীর খাঁর উক্তিতে,

"দিলীর খাঁ। ...দুর্গাদাস! তোমাদের হিন্দুদের মধ্যে কাশী, হরিদ্বার, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, এই সব তীর্থ আছে না? সেখানে যাত্রীরা মাঝে মাঝে গিয়ে ধন্য হয়ে আসে?—আমিও মর্ব্বার আগে তোমায় একবার দেখতে এসেছি।...যে যুগে ভ্রাতাকে তার অংশ হ'তে বঞ্চিত ক'রে আনন্দ; ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বজাতিদ্রোহ করে' পরিতৃপ্তি, যে যুগে তোষামোদ, পীড়ন, মিথ্যাবাদ, প্রতারণা চারিদিকে ছেয়ে পড়েছে. সে যুগে তোমার মত ত্যাগী দেখে আত্মা শুদ্ধ হয়। যে প্রভুর জন্য প্রাণপণ করে, দেশের পায়ে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে, আশ্রিতকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য দেশ ছাড়ে, অপ্সরা সম্রাজ্ঞীর অবৈধ প্রেম প্রত্যাখ্যান করে, প্রপীড়িত অবলার প্রাণ রক্ষার্থে নিজের বুক আগিয়ে দেয়, শেষে আশ্রিতা কুমারীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য নির্ব্বাসিত হয়—সেরূপ চরিত্র তোমাদের পুরাণেই কয়টা আছে দুর্গাদাস?" (৫।৮গ)

প্রতাপসিংহের প্রতিও দ্বিজেন্দ্রলালের নম্রনত চিত্তের শ্রদ্ধা 'আর্য্যগাথা' (১ম) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

"হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি।
ভেব না কঠিন যদি নাহি তাহে পরকাশি।
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার,—
অন্তরে অন্তরে জ্বলে জান কি অনলরাশি।
জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী।
জান কি রাখে'এ ভস্ম কি স্ফুলিঙ্গ আবরিয়ে।
তুমি আপনার নয়, এ কথা কি প্রাণে সয়,
কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে,
বিষাদে একাকী সদা নয়ন-সলিলে ভাসি।
হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি।"

১৯ History of Rajasthan (vol. I): Tod, pp, 361-362

এছাড়াও সম্রাট আকবরের মুখে প্রতাপসিংহের শৌর্য, বীরত্ব, ত্যাগ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আন্তরিক নিষ্ঠার প্রতি যে মহিমাকীর্তন, তা প্রকারান্তরে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমসিক্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ।

"আকবর। প্রতাপসিংহ! প্রতাপসিংহ! তুমি এত মহৎ! প্রতাপ! তুমি যদি আমার মিত্র হতে' তাহ'লে তোমার আসন হত আমার দক্ষিণে! আর তুমি শত্রু, তোমার আসন আমার সম্মুখে। এরূপ শত্রু আমার রাজ্যের গৌরব। আমি যদি সম্রাট্ আকবর না হতাম ত আমি রাণা প্রতাপসিংহ হতে' চাইতাম।......প্রতাপ! আমি ভেবেছিলাম যে তোমার আসন আমার সম্মুখে। না; তোমার আসন আমার উপরে।—ভেবেছিলাম যে তুমি প্রজা, আমি সম্রাট্। না, তুমি সম্রাট্ আমি প্রজা। —ভেবেছিলাম যে, তুমি বিজিত, আমি জয়ী! না; তুমি জয়ী, আমি বিজিত।" (৫।৫গ)

কেবল রাজপুত বীরদের স্বদেশ-প্রেমগাথা নয়, দ্বিজেন্দ্রলাল রাজপুত-রমণীদের দেশাত্মবোধ, ত্যাগ ও বীরত্বকে সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে নাটকে তুলে ধরেছেন। রাজপুত বীরাঙ্গনারা সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রজ্বলন্ত বহ্নিতেই আত্মোৎসর্গ করেননি, দেশের রাজপুরুষদের ও সাধারণ জনগণকে স্বাধীনতা রক্ষা এবং প্রাণদানেও উদ্দীপিত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল আপন যুগের নারীমুক্তি আন্দোলনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে প্রথম থেকেই পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদেরও সমান অংশীদার হতে যে আহ্বান জানান হয়েছিল, তার পরিচয়টি আমরা ইতিপূর্বে অনেক স্থানেই পেয়েছি। স্বদেশী আন্দোলনে মেয়েরা অংশগ্রহণ করুক, দেশবাসীর সম্মান রক্ষা ও স্বাধিকার অর্জনের পথে সমান অংশীদার হোক্, দ্বিজেন্দ্রলালের এই ভাবনা ছিল বহুদিনের। তিনি নাটক রচনাতে আত্মনিয়োগ করবার পূর্বেই একটি প্রবন্ধে লেখেন,

"ভারতবর্ষে অনেক নারী জ্যোতিষ লিখিয়াছেন, রাজ্য শাসন করিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াছেন।"[২০]

ঐতিহাসিক নাটকগুলিতেও দ্বিজেন্দ্রলালের নারী চরিত্রগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাভিমান ও দৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধে অভিষিক্ত। রাজপুতরমণীদের দেশাত্ম-

২০ কালিদাস ও ভবভূতি: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বোধক বাণী সেকালের জনচিত্তে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমরা তাঁর নাটকগুলি থেকে সাধ্যমত কয়েকটি উদাহরণ গ্রহণ করব।

'তারাবাই' (১৯০৩) নাটকে সুরতান-মহিষীর স্বামী তিরস্কারের যে তেজোদৃপ্ত বাণী, তাতে ভারতরমণীর চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা কামনা ও আত্মমর্যাদার গৌরবদীপ্তি ভাস্বরতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে :

"রাণী। পিঞ্জর স্বর্ণের যদি হয়, প্রিয়তম !
তথাপি পিঞ্জর তাহা। স্বেচ্ছায় মানুষ
হয় বনবাসী। কিন্তু পরের আজ্ঞায়,
প্রাসাদে নিবাস হয় ন্যক্কারজনক ?
... ...
—হায় স্বামী ! যদি তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে
নাহি পলাইতে, হেয় কাপুরুষ সম ;
যদি ক্ষত্রিয়ের মত মরিতে সমরে ;
ক্ষত্রিয় নারীর মত, দেখিতে, উল্লাসে
যাইতাম আমি সহমরণে ;—
... ...
ভীরুতার শত যুক্তি আছে।
প্রকৃত বীরত্ব তর্ক করে না কদাপি ;
জয়লাভ করে কিম্বা মরে।—" (১।৩গ)

নাট্যচরিত্র তারাবাইও মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য নিজের ব্যক্তিপ্রেমের উচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ করে দিতে মনস্থ করেছেন ! ব্যক্তিপ্রেমের চেয়ে দেশপ্রেম অনেক বড়, একথা প্রকাশ করে তিনি রাজপুত্র জয়মলকে বলেছেন,

"তারাবাই। ......বাঁধিয়াছি,
প্রাণের সমস্ত বাঞ্ছা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়—
'যতদিন নাহি উদ্ধারিব মাতৃভূমি,
অপর চিন্তারে স্থান দিব না অন্তরে'।
... ...
আমি নারী,
শিখিয়াছি শস্ত্রবিদ্যা ; কিন্তু কি করিব
একাকিনী আমি ? হায় ! কি করিবে নারী,

যখন পুরুষজাতি নিশ্চিন্ত ; যাপিছে
জীবন জঘন্য ঘৃণ্য স্বচ্ছন্দ বিলাসে।

... ...

তথাপি
করিয়াছি পণ ; ধরিয়াছি এই ব্রত—
এ কৌমার-ব্রত যতদিন এ সাধনা
সিদ্ধ নাহি হয়।

... ...

ফিরে যাও যুবরাজ !
ভালোবাসিবার মোর অবসর নাই,
যতদিন মাতৃভূমি পরপদানত।" (২।৫গ)

'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকে মেবারের রাজমহিষী লক্ষ্মী, স্বদেশের মঙ্গল-সাধনের জন্য নারীর শত কষ্টবরণ সহ্য করার মধ্যে যে পূর্ণ দীপ্তি নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মত স্থির ও উজ্জ্বল থাকে, সে সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের নারীজাতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধাই ব্যক্তিত হয়ে উঠেছে। তিনি স্বামী প্রতাপসিংহকে সম্বোধন করে বলেছেন,

"লক্ষ্মী। নাথ! নারী বলে' আমাকে অবজ্ঞা করো না। নারীজাতি স্বামীর সুখে সুখ কর্ত্তে জানে, আবার স্বামীর দুঃখ ঘাড় পেতে নিতে জানে। নারী জাতি কষ্ট সইতে জানে। কষ্ট সইতেই তার জীবন, আত্মোৎসর্গেই তার অপার আনন্দ।......আমরা নারীজাতি, পিতামাতাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি ; স্বামীকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে রক্ষা কর্ত্তে চাই ; সন্তানকে বুকের রক্ত দিয়ে পালন করি।

প্রতাপসিংহ। আর এই পুত্র-কন্যারা !—তাদের দুঃখ—

লক্ষ্মী। স্বদেশ আগে না পুত্র-কন্যা আগে ?

প্রতাপসিংহ। লক্ষ্মী! তুমি ধন্য! তোমার তুলনা নাই। এ দৈন্যে, এ দুঃখে, এ দুর্দ্দিনে, তুমিই আমাকে উচ্চে তুলে রেখেছো!" (৪।৪গ)

অপর নাট্যচরিত্র পৃথ্বীরাজ-পত্নী যোশীর স্বামী-ভৎর্সনার মধ্যে দেশাত্মবোধের স্বাক্ষর বর্তমান। স্বাধীনতার জন্য দুঃখসহনে যে মহনীয়তা, তার দিকেই তিনি সংকেত নির্দেশ করেছেন :

"যোশী। ধিক্! একথা বলতে বাধলো না?—একথা বলতে লজ্জায়

ঘৃণায়, রসনা কুঞ্চিত হলো না? এতদূর অধঃপতিত! ওঃ!—না প্রভু, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত এখনো আকবরের পদতলে নয়। এখনো আর্য্যাবর্ত্তে প্রতাপসিংহ আছে। এখনো একজন আছে, যে দাস্যজনিত বিলাসকে তুচ্ছজ্ঞান করে সম্রাট্‌দত্ত সম্মানকে পদাঘাত করে।...প্রাসাদ ছেড়ে স্বেচ্ছায় পর্ণকুটীরে বাস, ভূর্জপত্রে আহার, তৃণশয্যায় শয়ন—যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়, ততদিন স্বেচ্ছায় গৃহীত এই কঠোর সন্ন্যাস ব্রত। কি মহৎ! কি উচ্চ! কি মহিমাময়!...যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ব্রত নেয়, তার পক্ষে দারিদ্র্য এত কঠোর নয় প্রভু। সে দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা দেখে, এমন একটা সৌন্দর্য্য দেখে, যা রাজার রাজমুকুটে নাই, যা সম্রাটের সাম্রাজ্যে নাই। মহৎ হৃদয় দারিদ্র্যকে ভয় করে না—ভালবাসে; দারিদ্র্যে মাথা হেঁট করে না, মাথা উঁচু করে; দারিদ্র্যে নিভে যায় না, জ্বলে উঠে।" (১।৩গ)

'দুর্গাদাস' নাটকে জয়সিংহের প্রথমা পত্নী সরস্বতীর তিরস্কারেও একই তাৎপর্য ঘোষিত হয়েছে:

"সরস্বতী। ...যোধপুর থেকে দুর্গাদাস, রূপনগর থেকে বিক্রম সোলাঙ্কি, রাঠোর বীর গোপীনাথ—সকলে মেবারের সাহায্যে এসেছেন। তাঁরা এখন রাণার মন্ত্রণাকক্ষে। আর তুমি মেবারের ভাবী রাণা—তুমি বিলাসকুঞ্জে বসে' প্রেমের স্বপ্ন দেখছো! শুনে লজ্জা হ'চ্ছে না? শোণিত উষ্ণ হ'চ্ছে না? নিজের প্রতি ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না?...যখন বিজাতি সৈন্য এসে স্বদেশ ছেয়েছে, যখন শত্রু দ্বারদেশে, যখন কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে, তখন নারীর অধরসুধা পান করা ক্ষত্রিয়ের কাজ নয়!...যদি কর্ত্তব্যপথ বুঝে থাক নাথ, তবে ওঠো! একবার প্রাণপণ উদ্যমে এই বিলাস—পুরাতন ছিন্নবস্ত্রখণ্ডসম প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলো দেখি নাথ! দেখবে কর্ত্তব্য সহজ হবে। একবার কর্ত্তব্যকে আমার বলে' ডাকো দেখি, তারপর সে তোমায় হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে, তোমাকে বাহু দিয়ে ঘিরে রক্ষা ক'রবে।...ধিকৃত হ'য়ে চিরজীবন ধারণ করার চেয়ে পূজ্য হ'য়ে একদিনও বাঁচা বড় সুখের।" (২।৩গ)

'সাজাহান' নাটকে নাট্যচরিত্র যোধপুরপতি যশোবন্ত সিংহের পত্নী মহামায়ার মুখেও একই রকম তেজস্বীতার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই:

"মহামায়া। কি! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন? এ কি শুনছি ঠিক! যোধপুরের মহারাজ—আমার স্বামী—যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন! ক্ষত্রিয় শৌর্য্যের কি এতদূর

অধোগতি হয়েছে! অসম্ভব! ক্ষত্রবীর যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফেরে না। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ক্ষত্রচূড়ামণি। যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে; হ'তে পারে। তা হ'য়ে থাকে ত আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে মরে' পড়ে' আছেন। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে কখন ফিরে আসেন নি। যে এসেছে সে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নয়। সে তাঁর আকারধারী কোন ছদ্মবেশী। তাকে প্রবেশ কর্ত্তে দিও না! দুর্গদ্বার রুদ্ধ কর।—"(১।৪গ)

'মেবার-পতন' নাটকে সত্যবতী দেশোদ্ধারের জন্য মহান্ আত্মত্যাগের মহিমার কথা ব্যক্ত করে রাণা অমরসিংহকে বলেছেন,

"সত্যবতী। কিছু দুঃখ নাই রাণা! বীরের রক্তই জাতিকে উর্ব্বর করে! দুঃখ সে দেশের নয় রাণা, যে দেশের বীর মরে; দুঃখ সেই দেশের, যে দেশের বীর মরে না।...নিখিল বিশ্ব এসে এই উন্মত্ততার চরণতলে লুটিয়ে পড়ে। স্বর্গ হ'তে একটা গরিমা এসে এই উন্মত্ততার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়।...উন্মত্ত না হ'লে কেউ কোন কালে কোন মহৎ কাজ কর্ত্তে পেরেছে? ...মর্ব্বার ভয়ে আমার রত্ন দস্যুর হাতে সঁপে দেবো? আর এ—যে সে রত্ন নয়—আমার যথাসর্ব্বস্ব, আমার বহু পুরুষের সঞ্চিত, বহু শতাব্দীর স্মৃতিস্নাত মেবারকে প্রাণভয়ে বিনাযুদ্ধে শত্রু-করে সঁপে' দেবো? তারা নিতে চায় ত মেরে কেড়ে নিক। নিশ্চিত মৃত্যু? সে কি একদিন সকলেরই নাই? মান দিয়ে ক্রয় করে' রাণা কি প্রাণটা চিরকাল রাখতে পার্ব্বেন?—উঠুন রাণা। মোগল দ্বারদেশে! আর স্বপ্ন দেখবার সময় নাই!...রাণা! মেবারের জন্য, আমি আমার সৌধ, সম্ভোগ, পিতা-পুত্র ছেড়ে, তার কানন উপত্যকায় চারণী সেজে, তার মহিমা গেয়ে বেড়াচ্ছি, আর আমার সেই সাধের মেবারকে তুমি একটা অতিরিক্ত কুক্কুরশাবকের ন্যায় বিলিয়ে দেবে!" (২।২গ)

রাজপুতরমণীদের এইরূপ বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি, কর্তব্যনির্দেশ এবং দেশের জন্য আত্মাহুতিদানের আহ্বান, সে যুগের বাঙ্গালী দর্শক ও পাঠকদের সম্মুখে ভারতীয় নারীদের সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। বিশেষভাবে 'দুর্গাদাস' নাটকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, নাট্যচরিত্র মহামায়ার মুখে যে অগ্নিগর্ভ বহ্নিবাণী তরঙ্গায়িত করেছেন, তাতে তাঁর নিজ অনুভাবনা ও সমকালের স্বদেশী আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বানও যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে:

"মহামায়া। শোন গ্রামবাসীগণ—আমি কিন্তু আজ নিজের দুঃখ জানাতেই তোমাদের কাছে আসিনি। আমি এসেছি আজ আমাদের সুন্দর মাড়বারের জন্য তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা কর্ত্তে।...তোমরা মাড়বারের সন্তান; তোমরা রাজপুত; তোমরা বীর। তোমরা কি নিশ্চিন্ত, উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্মভূমিকে পরপদদলিত, নিষ্পেষিত বিধ্বস্ত হতে' দেখ্‌বে।...তোমাদের দূর করে' দলিত করে' মোগল এই তোমাদের স্বর্ণভূমি অধিকার কর্ব্বে, তাই তোমরা নির্ব্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে। হা ধিক্‌। এত তরল কোমল যে জল, তাকে স্থানচ্যুত কর্ত্তে গেলে সেও বাধা দেয়। আর তোমরা নীরবে নিশ্চেষ্টভাবে নিজের দেশকে অন্যের হাতে সঁপে দেবে? হিন্দু তোমরা! রাজপুত তোমরা! ক্ষত্রিয় তোমরা!—সম্ভব নয়?...তোমাদের গ্রাম, কুটির ছেড়ে চলে' এসো। তরবারি লও। ওঠ; এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ কর। একবার দৃঢ়পণ করে' ওঠো! ওঠো, যেমন তুরীশব্দে সুপ্ত সিংহ জেগে ওঠে! ওঠো;—যেমন ডমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার করে' ওঠে; ওঠো;—যেমন বজ্রধ্বনি শুনে পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে; যেমন ঝঞ্ঝার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গ কল্লোল ওঠে, ওঠো; রাজস্থান জানুক, ঔরংজীব জানুক যে তোমাদের শৌর্য্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয় নাই।...মৃত্যু! গ্রামবাসীগণ,—মৃত্যু কি একদিন আস্‌বে না? সে যখন বিছানায় এসে তোমার টুটি চেপে ধর্ব্বে, সে বড় সুখমৃত্যু নয়! কিন্তু স্বেচ্ছায়, দেশের জন্য, পরের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য মৃত্যুই সুখমৃত্যু।...যদি কারো মাতৃভূমির প্রতি টান থাকে, যদি কারো স্বধর্ম্মের প্রতি সম্মানের জ্ঞান থাকে, যদি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর্ত্তে প্রস্তুত থাকো—সে এসো! সে একাই একশ! ক্ষীণসঙ্কল্প দ্বিধাসন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে আমি চাই না! একাগ্র দৃঢ় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই। দুই পথ আছে, বেছে নাও!—একদিকে বিলাস, আমোদ, আরাম, আর উপভোগ। আর একদিকে শ্রম, অনাহার, দারিদ্র্য ও দুঃখ! একদিকে সংসার, গৃহ ও শান্তি; আর একদিকে সমরক্ষেত্র, ক্ষত ও মৃত্যু। একদিকে নিজের সুখ; আর একদিকে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য—বেছে নাও।...তুচ্ছ বিসম্বাদ এই মহাব্রতের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। একবার সকলে এক হয়ে জন্মভূমিকে প্রাণভরে ডাক 'মাইজির জয়'।" (৩।৩গ)

দ্বিজেন্দ্রলাল এভাবে দেশের দুর্যোগের সময়ে ভারতবাসীর কাছে মাতৃমন্ত্র প্রচার করে স্বদেশ উদ্ধারে ডাক দিয়েছিলেন। দেশপ্রেম ছিল তাঁর প্রাণবায়ু। পরাধীনতার মর্মবেদনা তাঁকে গভীরভাবে আহত করেছিল। 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকে রাণা প্রতাপের আর্তিজনিত উক্তিতে দ্বিজেন্দ্রলালেরই পরাধীনতাজর্জর চিত্তের করুণ কথাচিত্র যেন প্রকাশিত :

"প্রতাপসিংহ। জন্মভূমি! সুন্দর মেবার! বীরপ্রসূ মা! এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা। তোমাকে আমার বলে' আবার ডাকতে পারি ত তোমার পায়ে স্বহস্তে আবার ভূষণ পরিয়ে দেব। নৈলে তোমাকে এই শ্মশানচারিণী তপস্বিনীর বেশই পরিয়ে রেখে দেবো মা।—মা আমার! তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায় মা।" (১।৪গ)

আবার অন্যস্থানে, রাণা প্রতাপের অতীত স্মৃতিচারণে, দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতের দৃপ্ত শৌর্যের কথা দেশবাসীকে শুনিয়েছেন :

"প্রতাপসিংহ। ঐ সেই চিতোর! ঐ সেই দুর্জ্জয় দুর্গ! যা' একদিন রাজপুতের ছিল; আজ সেখানে মোগলের পতাকা উড়ছে—মনে পড়ে আজ আমার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় বাপ্পারাওকে—যিনি চিতোরের আক্রমণকারী ম্লেচ্ছকে পরাস্ত করে' তাকে গজনি পর্য্যন্ত প্রতাড়িত করে' গজনির সিংহাসনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়েছিলেন! মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সমরসিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ, যাতে কাগার নদের নীল বারিরাশি ম্লেচ্ছ ও রাজপুত শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে পদ্মিনীর জন্য মহাসমর, যাতে বীর নারী চন্দ্রাওৎ রাণী তাঁর ষোড়শবর্ষীয় পুত্র ও তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন!—আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখ্‌ছি।" (৫।৮গ)

দেশ যাতে আপন গরিমায় অধিষ্ঠিত হয়, সেজন্য নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশবাসীর কাছে জন্মভূমির মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। জন্মভূমি ছিল তাঁর কাছে, দেবী-সাধনা-স্বর্গ; আর নাটকে স্বাদেশিকতার আদর্শপ্রচারের মধ্যে চলেছে দেশমাতৃকার পূজা ও বন্দনা। 'দুর্গাদাস' নাটকে নাট্যচরিত্র ভীমসিংহের উক্তিতে দ্বিজেন্দ্রলালের পরাধীনতাজনিত আত্মগ্লানির কণ্ঠস্বরই অনুরণিত হয়েছে :

"ভীমসিংহ। জন্মভূমিকে ভুল্‌বো?—বিক্রমসিং! এ কয় বৎসর, আহারে, বিহারে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, এই কঠিন পর্ব্বতসঙ্কুল ধূম্রধূসর

মেবারভূমি সর্ব্বদাই আমার চক্ষে ভাস্‌তো। আজ সেখানে ফিরে আস্‌তে, সেই চিরপরিচিত অরণ্যপথ, উপত্যকা, শৈলমালা, দেখ্‌তে পেলাম, আর আমার চক্ষু জলে ভরে' এলো ; আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো।" (২।৪গ)

'মেবার-পতন' নাটকে অরুণসিংহের উক্তিতে স্বাধীনতার স্বাদ ও স্বদেশপ্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। তিনি, মাতামহ সগরসিংহকে তাঁর বিদেশী আনুগত্যের নিন্দা করে বলেছেন,

"অরুণসিংহ। ...আমার কাছে শত উদ্ধত স্বর্ণ-মসজিদের চেয়ে আমার দেশের একটি ভগ্নমন্দির প্রিয়তম। মোগলের পদতলে বসে' রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে আমার দীনা জননীর কোলে বসে' শাকান্ন খাওয়া ভাল !—দাদামশায় ! এরই জন্য আপনি দেশ ছেড়ে, ভাই ছেড়ে, শতপুণ্যকাহিনীজড়িত নিজের গৃহ ছেড়ে, পরের দুয়ারে গিয়েছিলেন ভিক্ষে মেগে খেতে ? তারা, আপনাকে নিত্য স্বর্ণ-মুষ্টি ভিক্ষা দিলেও তার সঙ্গে তাদের পায়ের ধুলো মিশে আছে ! তারা আপনার পানে তাকিয়ে যখন হাসে, তখন আমি দেখি, যে সে হাসির নীচে ঘৃণা উঁকি মার্চ্ছে। আমার কাছে দাদামশায়, পরের দত্ত স্বর্ণ-ভাণ্ডারের চেয়ে নিজের ভাইয়ের নিঃস্ব হাসিটিও মিষ্টি !" (২।৭গ)

দ্বিজেন্দ্রলালের এই দেশাত্মবোধ, অকৃত্রিম জন্মভূমিপ্রেমের পরিণত রূপ। তাঁর স্বদেশপ্রীতিতে কোন সঙ্কীর্ণতা যে কোনদিন ঠাঁই পায়নি, সে কথা বহু স্থানে আমরা লক্ষ্য করেছি। বাঙ্গালী তাঁর কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছিল যে, সঙ্কীর্ণ বিজাতিবিদ্বেষ ও স্থূল জাতীয়তা কখনও স্বাদেশিকতার প্রকৃত বাহন হতে পারে না। জাতি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন নৈতিক নিষ্ঠা ও সংযম, অকৃত্রিম ধর্মভাব ও দৃঢ় চরিত্রবল। স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে ভাব ও কর্মের মধ্যে সুসঙ্গত ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীর দেশপ্রেমকে বিশ্বমৈত্রী ও কল্যাণাদর্শের স্নিগ্ধ আলোকে উদ্‌ভাসিত দেখতে চেয়েছিলেন। 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের উত্তেজিত মুহূর্তে বাঙ্গালীর চিত্ত সায়রে দেশপ্রেমের যে চঞ্চলতা এসেছিল, তাতে ছিল এমন অনেক আবেগ, যা তাঁর কাছে বৃহত্তর জনকল্যাণ ও দেশহিতাদর্শের পরিপন্থী বলে মনে হয়েছিল। তাই তিনি এই আত্মঘাতী ও সঙ্কীর্ণ স্বদেশপ্রেমকে দূর থেকে বর্জন করেছিলেন। তাঁর স্বাদেশিক চিত্তের সংহিতা 'মেবার-পতন' নাটকে এ বিষয়ের রূপ ও চিন্তা পূর্ণভাবে ধরা পড়েছে। তিনি পূর্ববর্তী

নাটক রচনার সঙ্গে 'মেবার-পতন' নাটক রচনার উদ্দেশ্যজনিত পার্থক্য নির্দেশ করে বলেছেন,

"মদ্রচিত অন্যান্য নাটক হইতে এই নাটকের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। …পাষাণীতে আমি আদর্শ ব্রাহ্মণ-চরিত্র, রাণা প্রতাপসিংহে আদর্শ ক্ষত্রিয়-চরিত্র, দুর্গাদাসে আদর্শ পুরুষ চরিত্র এবং সীতাতে আদর্শ নারীচরিত্র লইয়া বসিয়াছিলাম। আবার তারাবাই ও নুরজাহান ইত্যাদিতে আমি বাস্তব মনুষ্য-চিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম।… কিন্তু এই নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি ; সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্ব প্রেমের মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। আমি হইতে যতদূর প্রেমকে ব্যাপ্ত করা যায় ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে।"

আমরা লক্ষ্য করেছি, স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে জননেতাগণ দেশোদ্ধারের কর্মকে পবিত্র আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ঈশ্বরের নির্দেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজেদের জীবনকে শুচিস্নিগ্ধ তাপসের মত উৎসর্গ করেছিলেন, জ্বালিয়ে রেখেছিলেন স্বাধীনতা লাভের জন্য পূত অগ্নিশিখা। নিছক স্বাধিকার স্থাপন ও প্রতিশোধ স্পৃহা নয়, বিশ্বপ্রেমের ত্যাগ-মৈত্রী এবং করুণার মহামন্ত্র দেশনেতাদের চিত্তকে সকল কলুষ-গ্লানির উর্দ্ধে উন্নীত করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালও ওইরকম আধ্যাত্মবাদিতায় অভিষিক্ত হয়ে বিশ্বপ্রেমের মহৎ আদর্শ প্রচার করেছিলেন। তাঁর এই আদর্শবাদ ছিল, পতনের মধ্যে নতুন করে বাঁচবার সঞ্জীবনী মন্ত্র। স্বাদেশিকতার মানস-প্রতিমা মানসী, নাট্যকারের জীবনাদর্শকে দেশের লোকের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন,

"কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'॥"

দ্বিজেন্দ্রলালের মানস পরিবর্ত্তনের স্বরূপটি, তাঁর পুত্র দিলীপ রায়ের লেখনীতে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। তিনি এ বিষয়ে লিখেছেন,

"He was my father. So naturally I followed intimately the psychic changes in his life with deep sympathy and

reverence. I began to revere his patriotism, too, the first fire of which had made him famous in the Swadeshi days when he wrote patriotic dramas one after another. He was a poet and a man of outstanding nobility of character. But he was, as an artist, highly sensitive to his circumambient atmosphere. It was then the heyday of Bengali Patriotism and he caught its contagion, a contagion we should avoid to day. But in those days we took militant patriotism at its face value and so persuaded ourselves that it was the panacea for all the evils our flesh was heir to. We know better now. But in the first flush of our patriotic adolescence we had all devoutly believed in the gospel of nationalism (which came, ever since, to suck mankind down into real hell with the pledge of a phantom heaven) and had burned with hatred of everything foreign. How easy, alas, to glare at others as the respository of iniquity forgetting our blackest sins !

'It was at this point that Dwijendralal grew suddenly and utterly sick of patriotism. It was at this turning point of his life that he wrote 'Fall of Mevar'. And it was only then that we, his deep admirers, discovered that patriotism was a false guide."[২১]

তবে নাট্যকারের বিশ্বপ্রেম ও বিশ্ববোধ মনে হয় কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। তাঁর 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকে এই চিন্তার স্ফুটোনোন্মুখ বিকাশ দেখি। নাট্যচরিত্র ইরা প্রশ্ন করেছেন, তাঁর পিতা রাণা প্রতাপসিংহকে,

"ইরা।...এ সংসারে আমরা ক'দিনের জন্য এসেছি? এ সংসারে এসে পরস্পরকে ভালবেসে পরস্পরের দুঃখের লাঘব করে' এ দুদিন না কাটিয়ে, বিবাদ করে দুঃখ বাড়াই কেন বাবা?......স্বর্গ কোথায়!—স্বর্গ আকাশে?

২১ Fall of Mevar : Translator's Note ; pp, VIII—IX.

না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন সে স্বর্গ হবে। যেদিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি বিরাজ কর্ব্বে, যে দিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে—সেই স্বর্গ।······আমরা যতদূর পারি তাকে এগিয়ে নিয়ে না এসে, এই রক্তস্রোত বইয়ে তাকে পিছিয়ে দিই কেন?" (৩।৭গ)

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেম যে অনেকাংশে বঙ্গভূমি প্রীতিতেই আবদ্ধ হয়েছিল, তার প্রমাণ উদ্ধার করাও বিশেষ কোন কঠিন কাজ নয় তাঁর নাটকগুলির মধ্য থেকে। বাঙ্গলাদেশ তাঁর কাছে আরাধ্যা দেবী ছিলেন। ধ্যানে তিনি দেশমাতৃকার স্বরূপ দর্শন করেন ও স্বপ্নে চুম্বন করেন 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'র চরণ-যুগল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাঙ্গলাদেশের শ্যামলিমা তাঁর নাটকে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'নুরজাহান' নাটকে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের বঙ্গপ্রীতি, নাট্যকারের মনোভাবনার পরিচয় দেয়।

"নুরজাহান। কি সুন্দর এই বঙ্গদেশ! এর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র—যা'র উপর দিয়ে শ্যামলতার ঢেউ ব'যে যাচ্ছে; এর নদ-নদী—যা'র অগাধ সলিলসম্ভার যেন আর সে ধ'রে রাখতে পার্চ্ছে না; এর নিকুঞ্জবন—যেখানে ছায়াসুগন্ধ-সঙ্গীত যেন পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে আছে! সমস্ত দেশটা যেন একটা অপার্থিব সুখস্বপ্ন দেখ্‌ছে।" (১।১গ)

এমন কি 'সাজাহান' নাটকে রাজস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাতে নাট্যকার বঙ্গদেশেরই চিত্র ও সৌন্দর্যের অবতারণা করেছেন অবচেতন মনে। বিশেষভাবে,

"এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে" (৩।৬গ)—

বাঙ্গলাদেশকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাঙ্গলাদেশ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে ছিল, 'শৈশবের কুসুম শয্যা, যৌবনের উপবন ও বার্ধক্যের বারাণসী।' 'সিংহল বিজয়' (১৯১৪) নাটকে নাট্যকারের বঙ্গপ্রীতির স্বাক্ষর তুলনাহীন। মনে হয়, তাঁর লেখা পড়ে বাঙ্গালী যেন দেশকে নতুন করে পুনরায় ভালবাসতে শিখেছিল।

'সিংহল বিজয়' নাটকে নাট্যচরিত্র বিজয়সিংহের উক্তিতে নাট্যকারের স্ব-ইচ্ছাই বিলসিত হয়েছে।

"বিজয়সিংহ।......আগে কখন দেশ ছাড়িনি। বুঝিনি যে দেশ কি জিনিষ। ভাবতাম যে দেশ শুদ্ধ মাটি আর আকাশ। কিন্তু এখন বুঝেছি যে জন্মভূমি মানুষ, সে কথা কয়, হাসে, কাঁদে, বুকে জড়িয়ে ধরে।" (২।১গ)

আবার, বিজয়সিংহ সিংহল দ্বীপে প্রবাসকালে মনের ব্যথা প্রকাশ করে স্ত্রী কুবেণীকে বলেছেন,

"বিজয়সিংহ। স্বদেশ কি ভোলা যায়! সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, আলোকে অন্ধকারে, গৌরবে লাঞ্ছনায়, স্বদেশ চিরদিনই স্বদেশ।......স্বদেশের তিরস্কার—সে জননীর তিরস্কার—তাও মিষ্ট।......ঐ অশান্ত দিগন্ত-বিতত কৃষ্ণসমুদ্রের পানে চেয়ে দেখেছি; আর আমার চিত্তপটের উপর দিয়ে বাঙ্গালার মধুর ছবি মধুর স্বপ্নের মত ভেসে গিয়েছে;—বাঙ্গালার সেই শ্যামলক্ষেত্র, বাঙ্গালার সেই ধূসর নদী; বাঙ্গালার সেই নীল নির্ম্মল আকাশ, সেই দীপ্ত রৌদ্র, সেই সুস্নিগ্ধ মলয়পবন হিল্লোল, সেই কোকিলের ঝঙ্কার, বাঙ্গালী মাঝির সেই গান, যেন অনুভব করেছি, আর চক্ষে ক্ষুদ্র বর্ত্তমান লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। স্বদেশ কি ভোলা যায় কুবেণী! আর এ হেন স্বদেশ—যার পবনে সুগন্ধ, নিকুঞ্জে সঙ্গীত, বৃক্ষে অমৃত, নির্ঝরে জননীর স্তনধারা; গগনে দেবতার আশীর্ব্বাদ; সেই কৃষকের ধান্যভরা প্রাঙ্গণ, সতীর মুখভরা হাসি, মাতার বুকভরা স্নেহ...।" (৪।২গ)

'চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১) নাটকে সেকেন্দারের মুখে যে ভারতবন্দনা, তাতে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ভারতচেতনার অন্যতম পরিচয় নিহিত আছে। ভারতবর্ষের গিরিশৃঙ্গমালার অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মিলন যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীতে অ-প্রাকৃতরূপ পেয়েছে, তেমনি উদ্‌ভাসিত হয়েছে ভারতবাসীর কুলিশ কঠোর চিত্তের ত্যাগ, মহনীয়তা ও অমিত শৌর্য-বিক্রম।

"সেকেন্দার। সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়, তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের

মত এর আকাশ ছেয়ে আসে; আমি নির্ব্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী-তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ-নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে।......

কোথাও দেখি, তালীবন গর্ব্বভরে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বিরাট্ বট স্নেহছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্ব্বতসম মন্থর গমনে চলেছে; কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্ররেখায় প'ড়ে আছে; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জ্জন বনমধ্যে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘ-কান্তি জাতি এই দেশ শাসন কর্চ্ছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য্য পরাজয় ক'রে আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দী ক'রে আনি যখন—সে কি বল্লে জানো?...

আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?'—সে নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দিল, 'রাজার প্রতি রাজার আচরণ!' চমকিত হ'লাম! ভাবলাম— এ একটা জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ কর্লাম। ..

তার পরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে। আর আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে আসি নাই। আমি এসেছি সৌখীন দিগ্বিজয়ে।......

সে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ কর্ত্তে হ'লে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই।—কি আশ্চর্য সেনাপতি! দূর মাসিডন থেকে রাজ্য, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত ক'রে চ'লে এসেছি! ঝঞ্ঝার মত এসে মহাশক্রসৈন্য ধূমরাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি। অর্দ্ধেক এসিয়া মাসিডনের বিজয়বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হ'য়েছে। নিয়তির মত দুর্ব্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর আমি অর্দ্ধেক এসিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয় শকট অবাধে চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম—সেই শতদ্রু তীরে।" (১।১গ)

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলী পাঠ করলে দেখা যাবে যে, তিনি একটি দীর্ঘ শতাব্দীর চিন্তাকে সংহত করে আপন নাটকে রূপ দিয়েছিলেন। তাই তাঁর নাটকগুলি শুধু কেবল কাব্যকলার বিতান ছিল না, ছিল মানুষের

একান্ত প্রয়োজনীয় সাধনার আরাধ্য পীঠ। তিনি দেশবাসীকে জাতীয়তার ক্ষেত্রে স্বদেশচিন্তা ও দেশাত্মবোধে হাতে-কলমে দীক্ষা দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র রাজনৈতিক উত্তেজনার তরল অগ্নিস্রোত দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীর প্রতি স্নায়ুতে প্রবাহিত করতে চাননি। তিনি ছিলেন, জাতি সংগঠক— Constructive Nationalist. দেশবাসীর সমস্ত কর্ম ও ভাবনাশক্তিকে অন্তর্মুখীন করাই ছিল তাঁর সকল চিন্তার একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশের প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ সৃষ্টি করে, জাতির দেশপ্রেমকে বিশ্বমানবপ্রীতির মুক্তাকাশে প্রসারিত করতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। স্বজাতিকে সকল কলুষতা, দৈন্য ও গ্লানি থেকে উদ্ধার করে স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন দেখেছিলেন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল। তবে মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের পথে দেশের প্রকৃত উন্নতি ও স্বাধিকার অর্জন করা উচিত ভেবেই, তিনি জাতিকে 'মানুষ' হবার আশাবরী শুনিয়েছিলেন। সে কালের বাঙ্গালী তাঁর নাটকে এইরকম এক উচ্চ জীবনমার্গের সন্ধান পেয়েছিল বলে, তারা রঙ্গমঞ্চে নাটকগুলির অভিনয় দেখতে কাতারে কাতারে জমায়েত হত।

তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। 'দুর্গাদাস' নাটক সম্পর্কে লেখা হয়,

"......সর্ব্বত্রই রুচিমার্জ্জিত, ভাববিশুদ্ধ, লিপিচাতুর্য্য সুন্দর, কবিত্ব অসাধারণ—পড়িবার সময় মনে হয় যেন ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতেছি; মনে হয় যেন আত্মত্যাগ মন্ত্রের এক জীবন্ত ইতিহাস পড়িতেছি; মনে হয় যেন স্বদেশভক্তির এক উজ্জ্বল কাহিনী পড়িতেছি।...পুস্তকখানির কি কবিত্ব, কি স্বদেশপ্রাণতা, কি নিঃস্বার্থতা, কি পবিত্রতা, কি দয়া, কি ক্ষমা—এ সকলের যেন আদর্শ। যাহা চাই তাহা পাইয়াছি। বাস্তবিক বলিতেছি—দ্বিজেন্দ্রলাল এই একখানি পুস্তক লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।"[২২]

এই স্তুতি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যেকটি নাটক সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য। তাঁর 'মেবার-পতন' নাটকটির প্রশংসা করে একজন সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন,

"এই কাব্যের 'মেবার পাহাড়' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আবার তোরা মানুষ হ' বলিয়া পরিশেষের মধ্যে এমন একটি হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং ঐ উচ্ছ্বাসের

২২ নব্যভারত: চৈত্র, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ

পাকে পাকে এমন অপরূপ আলোক, মধুর তরঙ্গভঙ্গ এবং সমগ্র শিল্প-সমাধানের মধ্যে এমন একটি সুমার্জিত দীপ্তি আছে যে, ভারতীয় জাতীয় ব্যাধি এবং উহার প্রতিকার নিরূপণ আছে যে, সকল দিক বিবেচনা করিলে, উহাকে তাঁহার এই যুগের সর্ব্বগুণ-ঘনীভূত 'শ্রেষ্ঠ প্রকাশ' বলিয়া নিঃসন্দেহে উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমাদের জাতীয় জীবন-সাধনার চিরস্থায়ী সাহিত্য-ভাণ্ডারে উহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা হয়।"[২৩]

জনজীবনের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ঐতিহাসিক, সমকালের দেশবাসীর হৃদয়স্পন্দন অমর লেখনীতে তুলে ধরেছেন। 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকের মঞ্চসাফল্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

"On the 22nd of July, 1905, the Star Theatre began to show the performance of Rana Protap—the hero of Rajasthan—a drama by Mr. D.L. Roy. The heroic achievements and the great self-sacrifice of this immortal Rajput patriot at once appealed to the sentiments of the educated people even before the rise of the Swadeshi Movement in Bengal. The sensation was so great that on the first night 400 people returned disappointed, for want of accommodation."[২৪]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙ্গলাদেশের জাতীয় অভ্যুত্থানের হোমাগ্নি-শিখা বাঙ্গলা রঙ্গালয় অনির্বাণভাবে জ্বালিয়ে রেখেছিল। যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী নাট্যকারেরা স্বাদেশিক সংগঠন ও দেশোদ্ধার কর্মযজ্ঞে তর্পণ শুরু করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর তনু-মন-প্রাণ দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। অন্যান্য স্বদেশহিতবাদী নাট্যকারদের মত দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিও জাতীয়তার পবিত্র কর্তব্যবোধ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। বিশেষভাবে তাঁর 'দুর্গাদাস' নাটক দেশপ্রেমের আদর্শকে খরদীপ্ত গৌরবে তুলে ধরে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার-পতন' নাটক সম্পর্কে লেখা হয়েছে,

২৩ বঙ্গবাণী : শশাঙ্কমোহন সেন ; পৃ. ১৫১

২৪ Indian Stage (vol IV) ; H.N. Dasgupta ; pp. 39-40

"Mr. D. L. Roy's historical drama 'Mewar Patan' which chronicles the glorious career of Amar Singh, the worthy son of the great Rana Pr ɔtap. It was staged on 26th Dec, 1908. The drama was a great success and its patriotic songs were highly captivating".[২৫]

'সাজাহান' নাটক দেশপ্রেমের উচ্চ চিন্তা বিস্তারে যে দায়িত্ব পালন করেছিল, সে সম্পর্কে রঙ্গমঞ্চের ঐতিহাসিক লিখেছেন,

"Shajahan is an oft-staged piece and patriotic sentiments, masterly delineation, fine dramatic touches and its sweet rapturous songs have even to-day made the drama a unique success. The patriotic song—the best of the countries is my native land—'Amar Janmabhumi' like the poet's famous national song 'Banga Amar Janani Amar, Dhatri Amar, Amar Desh' will never be forgotten."[২৬]

এইভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল জাতির অনুভূতিকে স্বদেশপ্রেমের ভাববন্যায় প্লাবিত করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাঁর নাটকগুলির সাফল্য একেবারেই প্রীতির চোখে দেখেননি। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে যে সমস্ত উক্তি আছে, তাতে বাঙ্গলাদেশের গোঁড়া মুসলিম সম্প্রদায় ক্রুদ্ধ হয় এবং প্রকাশ্যে বিরোধিতা শুরু করে। ইংরেজ সরকারও অনুকূল বাতাস পেয়ে অতি সহজে তাঁর 'রাণা প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার-পতন' নাটকগুলির অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। তাঁদের আদেশের অনুলিপি দেওয়া হল,

"The plays are not seditious, but tend to promote hatred between Hindus and Muhammadans and fall within section 153, Indian Penal Code and the Press Act. 'Pratap Singh', 'Mewar Patan' and 'Durgadas' have bean written by Mr. D. L. Roy, a Deputy Magistrate and it is

২৫ Indian Stage (vol IV) : H.N. Dasgupta ; p. 62

২৬ Indian Stage (vol IV) : H. N. Dasgupta ; pp. 62-63

improbable that he intended by these writings to put class against class. It will probably be sufficient to tell the author to withdraw the book from circulation and to direct the police to prohibit the performance of the plays in Bengal and East Bengal Districts."[২৭]

ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বৈষম্য সৃষ্টির অজুহাতে অভিনয় নিষিদ্ধ করলেও, ফিরিঙ্গী শাসননীতির অবসান ও স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার যে চেতনা নাটকগুলিতে সংগুপ্ত, তা উপলব্ধি করতে ইতিহাস সচেতন ইংরেজকে কষ্ট পেতে হয়নি। তাঁদের উক্তিতে আতঙ্কের ছাপ খুবই সুপরিস্ফুট। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব শাসক সম্প্রদায়ের বিরোধিতা সত্ত্বেও জনচিত্তে অমলিন থাকে এবং আজও পর্যন্ত তার রেশ কম হয়েছে বলে মনে হয় না।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বাদেশিক চিন্তার সুর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে সার্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও শুভেচ্ছার অসীম পরিমণ্ডলে স্থাপন করেছিলেন বলে, তাঁর রচনা বাঙ্গালী ও বাঙ্গলাদেশকে সমস্ত ক্ষুদ্রতা থেকে উদ্ধার করেছিল। তিনি জাতিকে সকল কলুষ-তামসিকতার ঊর্ধ্বে উঠে মনুষ্যত্বের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণে ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শে দীক্ষিত করেছেন। জাতিকে মহাজাতিতে পরিণত করার সাধনাই দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেম সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা, আর সেখানে তিনি অনন্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

২৭ File No, 3½3 (Nos 1-25): Government of Eastern Bengal and Assam ; Chief Secretary's Department : Political Branch.

ষোল

গৌণ নাট্যকারদের চিন্তায় স্বাদেশিকতা

স্বাদেশিকতার যৌবনমুক্তি পর্বে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল যে একটি সম্পূর্ণ ত্রিভুজ ক্ষেত্র রচনা করেছিলেন, তার বাইরেও বহু নাট্যকার ছিলেন, যাঁরা যুগধর্মে দীক্ষিত হয়ে জাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত করতে চান। অবশ্য এইসব নাট্যকারদের মূল্য বিচ্ছিন্নতায় নয়, সমগ্রতায়। আমরা কয়েকজন উল্লেখযোগ্য গৌণ নাট্যকারের পরিচয় সংক্ষেপে নেব।

রাজকৃষ্ণ রায়ঃ

রাজকৃষ্ণ রায় মুখ্যতঃ পৌরাণিক নাট্যকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও, তিনি যুগচিন্তাকে অস্বীকার করে একেবারে স্বতন্ত্র পথের পথিক হ'তে পারেননি। মনোমোহন বসুর মত তিনিও পুরাণাধারে জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করেছেন। জাতীয় জীবন গঠনের জন্য যে ঐক্য ও ত্যাগের প্রয়োজন, তার পরিচয় তাঁর পৌরাণিক নাটকে পাওয়া যায়। ব্যক্তিস্বার্থচিন্তা, কুৎসা, পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ এবং অনৈক্য যে জাতিকে অধোগতির মুখে ঠেলে দেয়, রাজকৃষ্ণ রায় 'তারক সংহার' (১৮৮০) নাটকে পরাজিত দেবতাদের কথোপকথনে তা প্রচার করেছেন,

"ইন্দ্র। (সদুঃখে) অগ্নিদেব! ক্ষমা করুন! আপনা আপনির মধ্যে এরূপ সাজে না। ঈদৃশ যথা, আত্মপ্রশংসা, পরকুৎসা ও অনৈক্যের দোষেই, আমাদের এই দুর্গতি। এর জন্যই আমরা স্বর্গরাজ্য পরিভ্রষ্ট হয়ে এই পর্ব্বত-গুহায়, পর্ব্বতের উপত্যকায় অতি সামান্য অবস্থায় অবস্থান কচ্চি! আমাদের সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী অমরাবতী এক্ষণে দৈত্যরাজধানী—দেব সিংহাসন দৈত্যের পদধূলিতে কলঙ্কিত! উদ্যানশ্রেষ্ঠ নন্দনকানন দৈত্যের বিহার স্থান! দেবভোগ্য সামগ্রী সমুদয় দৈত্যভোগ্য! আর একদিকে দৈত্যগণের হীনাবস্থা আমাদের ভাগ্যে পরিণত। হায় আপনারা এই সকল দেখে শুনেও কেন যে আত্মবিবাদে প্রবৃত্ত হলেন, তা আমি বুঝতে পাচ্চি না।…

অগ্নিদেব! আপনিও এঁদের সহিত ভ্রাতৃভাব স্থাপন করে শত্রু বিনাশের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করুন্। সকলের ভিন্নমত হওয়া কোনমতেই উচিত নয়—সকলের একমত হওয়াই সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। বিশেষতঃ এক্ষণে সম্মুখে প্রবল শত্রু, সুতরাং ঐক্য ভিন্ন আমাদের কোন উপায় নাই। এখন একমাত্র ঐক্যই আমাদের সহায়, সম্পদ, শক্তি, আশা ও ভরসা। যাদের ঐক্য আছে, তারা অতি দুর্ব্বল হলেও প্রবল শত্রুকে পরাজিত করতে পারে। আবার যদি আমাদের পবিত্র স্বর্গরাজ্য পাবার আশা থাকে, তবে ঐক্যের শরণাগত হওয়া উচিত। ঐক্যবল ব্যতীত স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অন্য কোন পথ নাই। ঐক্যই এখন আমাদের জপ, তপ, ধর্ম্ম, মন্ত্র—ঐক্যই আমাদের শরীর, জীবন ও আত্মা…যে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্যের প্রভাব প্রবেশ করে, সে সম্প্রদায় অল্প কালের মধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যারা ঐক্যের অবমাননা ও অনৈক্যের সম্মাননা করে তারা (যমকে দেখাইয়া) এই মৃত্যুপতির নরকেও স্থান পায় না।…আমার সবিশেষ অনুরোধ আপনারা পরস্পরে এক হউন—সকলেরই মঙ্গল হবে, কেননা ঐক্যের অপর নাম মঙ্গল!" (১১গ)

অপরদিকে নাট্যকার দেশবাসীকে দেখিয়েছেন যে ঐক্যবদ্ধতাই অসুরদের সমরবিজয়ী করেছে,

"তারকাসুর। তা জানি, সেনাপতি!…ইন্দ্র এখন আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নয়—নির্ব্বাপিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অতি তুচ্ছ ভস্মমাত্র। আমি তোমার শৌর্যবলে তাকে আর গ্রাহ্য করি না। এখন এস আমরা ঐক্যের উপর নির্ভর ক'রে, নবলব্ধ স্বর্গরাজ্য সুখে উপভোগ করি। আমাদের ঐক্য চিরকাল অবিচলিত থাকলে, একজন ইন্দ্র কেন, শত শত ইন্দ্রও আর আমাদের অতি সামান্য অপকারও কত্তে পারবে না।" (১২গ)

'অনলে বিজলী' (১৮৭৮) নাটকেও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় পৌরাণিক ভক্তিভাব-চেতনার অন্তরালে মন্দোদরীর মুখে বিভীষণের কাজকর্মকে জাতীয় বিদ্রোহ বলে সমালোচনা করেছেন।

"মন্দোদরী। (সরোষে)

ক্ষমা নাই তোর; কভু ক্ষমিব না;
পাপীর বচন কভু শুনিব না।

* * *

ক্ষমা নাই তোর ; ওরে বিভীষণ !
যে রাক্ষস হায়, আপন কুমার
তরণীসেনেরে করালে সংহার,
হেন কাপুরুষেরে—হেন পাতকীরে—
এ জগতে কেহ ক্ষমে কভু কি রে ?
জাতীয় গৌরব দিয়ে বিসর্জ্জন,
যে লহে নরের চরণে শরণ
গৃহানুসন্ধান যে অরিরে কয়,
তার ক্ষমা আজো নাহিরে নিশ্চয় ।” (১।১গ)

রাজকৃষ্ণ রায়ের ভক্তিচেতনার অন্তরালে আধুনিকতার যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মহিমা এবং আপন দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে এক গভীর আকর্ষণ সদাজাগ্রত ছিল বলে তিনি মধ্যযুগের দেবনির্ভরতাকে সমর্থন জানাননি। যুগচিন্তার প্রতি নাট্যকারের অটুট বিশ্বাস, আস্থা ও সমর্থন, নাট্যকারকে জাতীয়তামুখী করেছিল বলেই তিনি বাঙ্গালীর ভক্তিধর্মকে যুগের রাজনৈতিক চেতনায় অভিষিক্ত করেছেন। জাতির রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের জন্য যেমন সঙ্ঘবদ্ধ একতার প্রয়োজন আছে ; তেমনি প্রয়োজন আছে বাহুবলের। শক্তিহীনতা জাতির সবচেয়ে বড় কলঙ্ক। ঐতিহাসিক নাটক ‘লৌহ কারাগার’ (১৮৮০) নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় আপন পরাধীনতার মর্মবেদনা, স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা ও জাতির শক্তিসাধনার প্রয়োজনীয়তার কথা শুনিয়েছেন :

“সূর্য্য সিংহ। দেখ ভুজ ! কি ঘোর অন্যায়,
কেন অধীনতা আমি করিব স্বীকার

* * *

ধনবল জনবল থাকিতে প্রতুল,
বাতুলের মত সূর্য্য, চিতোর নাথের—
পদ পূজে—বর্ষে বর্ষে কর পুষ্প দিয়া।

* * *

ভুজসিংহ। বাস্তবিক, এক রাজা অন্য ভূপ পাশে
কি হেতু অধীন রবে ? কেন কর দিবে ?

একের মহিমা প্রভা, অপরের পদে
আকর্ষিত হবে?

সূর্য্য। ভাই এ প্রাণ থাকিতে
আর না হইবে তাহা, যা হবার হ'ল।
এক্ষণে স্বাধীন আমি,—অম্বর স্বাধীন,
চিতোর পতির কর-নিগড় দুঃসহ,
বহিতে হবে না আর এ মম জীবনে।

* * *

অম্বরের ঘরে ঘরে, এ রাজ্য আমার
'অম্বর চিতোরাধীন'—এ শব্দ না রবে।

ভুজ। কেন রবে? কণামাত্র শক্তি নাহি যার—
তারি পক্ষে অধীনতা চির-বহনীয়া।
শক্তিশূন্য জন বাঁচে পরের প্রসাদে
শক্তিশালী জীয়ে আপনার বলে।
চন্দ্রই সূর্য্যের করে, শোভয়ে নিজেরে,
সূর্য্য কি কাহার পাশে কর-ভিক্ষা মাগে?" (১১গ)

রাজকৃষ্ণ রায়ের স্বদেশচিন্তার উষ্ণ পরিচয় আমরা তাঁর 'ভারত সান্ত্বনা' (১৮৭৯) কবিতাত্মক রূপক নাটিকায় দেখতে পাই। নাটিকাটির রচনার কারণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

"ভারতের শেষ নরপতি পৃথুরাজ যবনগণ কর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইলে ভারত পরাধীন হয়; সেই পরাধীন অবস্থায় শতবর্ষব্যাপী সময়ের ভারত লইয়া এই ভারত সান্ত্বনা রচিত হইল।"

নাট্যকারকে ভারতবর্ষের পরাধীনতা অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল। তিনি তাঁর ইতিহাস চিন্তার বুদ্ধিদীপ্ত আলোকে দেখেছিলেন যে, সাহস ও অনৈক্যের প্রাদুর্ভাবই বাঙ্গলা তথা ভারতকে করেছে পরাধীন। ব্যক্তিস্বার্থপরতা, ঐক্যহীনতা ও পরস্পর বিদ্বেষ, মহম্মদ ঘোরীর ভারতজয়ের পথকে সুগম করে। কেবল পৃথ্বিরাজের পরাজয় নয়, পরবর্তীকালের বহু পরাধীনতা এই পথেই এসেছে। ইংরেজদের ভারত জয়ের কারণও একই। ভারতবাসীর দুর্দশার কারণ—সাহস ও ঐক্যের অভাব। রূপক নাট্যচরিত্র, সাহস ও ঐক্যের ক্ষোভে এই তত্ত্বই প্রকাশিত:

"ভারতসন্তানগণ করে না যতন,
অযতনে অনাদরে থাকা বিড়ম্বন !
যেখানে যতন নাই সেথা না থাকিতে চাই
ভারতসন্তানগণ করে না যতন
কাচেরে আদর করে ফেলিয়া রতন ।" (দ্বিতীয় দৃশ্য)

নাট্যকার আপন ব্যথিত-বেদন চিত্তের পরিচয় ভারতমাতার ব্রহ্মার কাছে আর্জির মধ্যে রেখেছেন,

ভারতমাতা। (করজোড়ে)
ভাল কথা হ'ল মনে দেখি নাই দু'নয়নে
বহুদিন স্বাধীনতা দেবীর চরণ,
যদি দয়া করি পিতঃ জুড়াও তাপিত চিত
সেই মহা-ঈশ্বরীরে করি প্রদর্শন ।" (দ্বিতীয় দৃশ্য)

পরাধীনতার কারণ ব্যাখ্যা করে নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় পুনরায় রূপকচরিত্র ঐক্য ও সাহস উভয়ের সংলাপে প্রকাশ করেছেন :

"ঘৃণায় মরি, কেমন ক'রে
বলবো আমি দুখের কথা,
ভারতবাসী আমায় ছেড়ে
আপন দোষে পাচ্ছে ব্যথা !
আমারে ভুলিয়ে ভারতনন্দন
পরের চরণে সঁপেছে জীবন !
আমারে ভজিলে, এখনো কি হায়,
পরের পাদুকা বহেরে মাথায় ?" (তৃতীয় দৃশ্য)

নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় জাতিকে আহ্বান করেছেন সাহস ও ঐক্যে নির্ভর করতে। এই দুই শক্তিই দেশবাসীর জাতীয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে একমাত্র আশ্রয়স্থল। রূপকচরিত্র সাহস ও ঐক্যের আহ্বান প্রকারান্তরে নাট্যকারেরই আহ্বান বাণী,

"সাহস। (উচ্চৈঃস্বরে)
উঠরে নির্জ্জীব জাতি, খোলরে নয়ন !
আরো কি ঘুমাবে রবি আলস্য-শয়নে ?
এখনো দেখিতে সাধ অলীক স্বপন ?

এখনো কি ক্লেশ হয় আঁখি উন্মীলনে ?
কত কাল গত হ'ল—তবুও এখন
মিটিল না নিদ্রাসুখ ?—একি বিড়ম্বনা !
আরো কি অসাড় হয়ে শবের মতন,
পড়ে রবি ?—আজো কিরে হ'ল না চেতনা ?
ভাঙ্গিতে তোদের নিদ্রা আজি এ ঘটনা,
তবু কি, অলস জাতি, হয় না চেতনা ?

ঐক্য। (উচ্চৈঃস্বরে)
উঠরে, উঠরে উঠ কর গাত্রোত্থান ;
সাহস ঐক্যের সহ কর আলিঙ্গন !
এখন দেখিবি পুন বিজয় নিশান
উড়িবে তোদের, ছেয়ে গগন প্রাঙ্গণ।
মায়ের দুর্দ্দশা দেখি হও রে কাতর,
এখনি সাহস, দেখ হইবে সহায়।
কাপুরুষ ভীরু সম কেন কর ডর ?
সকলে মিলিত হয়ে স্মররে আমায়।
আর না—যা হ'ল হ'ল—ঘুমায়ো না আর,
উঠরে অভাগা জাতি, উঠরে এবার।

সাহস। (উচ্চৈঃস্বরে)
যতনের শৃঙ্গ, বাজ ঘোর রবে,
চেতুক—জাগুক ভারতবাসী।
ছাড় হুহুঙ্কার কাঁপাও আকাশ ;
সে হুঙ্কার নাদ বহুক বাতাস—,
নীরবে থেক না—হয়ো না হতাশ ;
ছাড় হুহুঙ্কার—কাঁপাও আকাশ
চেতুক—জাগুক—ভারতবাসী।" (তৃতীয় দৃশ্য)

নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে ভারতবাসীর আত্মজাগরণে,

"মাভৈঃ মাভৈঃ, ভারত দুখিনী ;
পোহাইবে তব দুখের যামিনী ;
মাভৈঃ মাভৈঃ ভারতবাসী !

বিধাতার চক্র পরিবর্ত্তনীয়
রবি শশী সম চিরগতিময়।
মাভৈঃ মাভৈঃ আবার সুদিন
আসিয়া ঘুরিয়া—হইবে বিলীন
অধীনতা-জ্বালা যাতনা রাশি।" (তৃতীয় দৃশ্য)

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ঃ

যুগ-তর্পণের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক গৌণ নাট্যকার মুখ্য নাট্যকারদের চেয়ে এগিয়ে গেছেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এঁদের মধ্যে একজন। তিনি ক্ষীরোদপ্রসাদের বহু পূর্বে নন্দকুমার চরিত্র অবলম্বন করে 'নন্দকুমারের ফাঁসি' (১৮৮৭) জাতীয়তাবাদী নাটকটি লেখেন। শৈল্পীক গুণে নাটকটির বিশেষত্ব না থাকলেও বিষয়বস্তু নির্বাচনে নাট্যকারের মৌলিকত্ব বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। নাট্যকার হরিপদ যখন এই নাটকখানি রচনা করেন, তখন নিখিলনাথ রায় ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের গবেষণামূলক কোন রচনা আত্মপ্রকাশ করেনি। ক্ষীরোদপ্রসাদ নন্দকুমারকে যেমন জাতীয় শহীদ হিসাবে এঁকেছেন, নাট্যকার হরিপদর চিন্তায় সে গৌরব গরিমা না থাকলেও তাঁর স্বাদেশিক চিত্তের বৈশিষ্ট্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য। নাট্যকারের পরাধীনতার মর্মবেদনা, নন্দকুমারের অন্তিম উক্তিতে প্রতিধ্বনিত।

"ওহো বিধি! এই কি তোমার বিধি,

— — — — —

এই তবে এই তবে আনিয়া ইংরাজে,
অপার সাগরপারে আছিল সে জন,
সাধ ক'রে আনাইয়া তারে,
বসালে সোনার ঠাটে, সোনার ভারতে,—
ছড়াইলে কাল-ফণী ফুলমালা ভ্রমে,
ভেবেছিলে মনে মনোহর সুবাসিত—
সে মালার বাসে প্রফুল্লিত উদ্ভাসিত
করিবে অন্তর। কিন্তু হায়! দেখ আসি এবে
দংশিলে সে কাল-ফণী বিনা দোষে ভেবে।" (৪।১গ)

কেবল দুঃখবাদ নয়, আত্মসমালোচনার প্রয়াসটিও নাট্যকার হরিপদ দেখিয়েছেন অকুণ্ঠ চিত্তে। আত্মকলহই যে জাতির পরাজয়ের অন্যতম কারণ, নাটকটিতে তারও পরিচয় আছে পুরোহিত সদাচারী গোস্বামীর উক্তিতে,

"হায়! বঙ্গ সন্তান! নির্লজ্জ বঙ্গ সন্তান। ধিক্ তোমাদের, স্বজাতিদ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ যে জীবনের একমাত্র উপাস্য, সে জীবনে মূল্য কি—আজ যেমন নন্দকুমার স্বজাতির বিদ্বেষে দিবানিশি দগ্ধ হচ্ছে, কাল সমস্ত বঙ্গবাসী এইরূপ পরস্পর দগ্ধ হবে।" (১।১গ)

এমন কি বিদেশী ফ্রান্সিস্‌ও বলেছে,

"(স্বগত) ও! বাঙ্গালী কি স্বজাতি বিদ্বেষী।" (৩।১গ)

নাট্যকার হরিপদর অপর নাটক 'পদ্মিনী'তেও (১৯০৭) স্বদেশপ্রেমের পরিচয় বিশেষ সুস্পষ্ট :

"ঐ দেখরে যারা স্বদেশের তরে প্রাণ করে বিসর্জ্জন
তারা অন্তে শ্রীকান্তের পায় কমলাসেবিত কমলচরণ।" (৩।১গ)

এই সূত্রে সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারায় একদল কথাসর্বস্ব নেতার উপর নাট্যকারের যে আক্রমণ তারও পরিচয় পাই, নাট্যচরিত্র সমর সিংহের উক্তিতে,

"বাহাদুরী আমাদের বটে—
সভামাঝে করিতে বক্তৃতা।
স্বাধীনতা আমাদের কথায় কথায়।
কথায় আমরা পারি স্বর্গ লভিবারে!
কথায় আমরা হই পণ্ডিত অগ্রণী,
বীরত্ব ধীরত্ব গাম্ভীর্য্য পাণ্ডিত্য—
কথায় লভেছি মোরা সব!" (৪।১গ)

অক্ষয়কুমার চৌধুরী :

অক্ষয়কুমার চৌধুরীর 'রাণী দুর্গাবতী' (১২৮১ বঙ্গাব্দ) নাটকে জাতীয়তার ছাপ অস্পষ্টভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। নাট্যকারের ইতিহাসচিন্তা ছিল অত্যন্ত শিথিল। যবননিন্দা, উৎকট হিন্দুয়ানীর আতিশয্য ও সংস্কৃত নাট্যরীতির অন্ধ অনুকরণ নাটকটিকে কোন স্থির রূপ দিতে পারেনি। তবুও এতে জাতীয়তার বাণী সোচ্চারিত হয়েছে :

"ভারতবর্ষীয়গণকে সামান্য জ্ঞান করবেন না। তারা যেদিন একতাসূত্রে বদ্ধ হয়ে সমরক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হবে, নিশ্চয়ই জানবেন, সেইদিন সমস্ত পৃথিবী এক ভারতরাজ্যের রাজ্য হবে।" (২।১গ)

অথবা,

"আমার ভরসা হয় সময় ক্রমে হিন্দুসূর্য্য পুনরায় উদিত হবে। পুনরায় ভারতবাসী কমলদল বিকশিত হবে।" (২।১গ)

নাটকটির শেষ অঙ্কে যখন গরাধিপতি রাণী দুর্গাবতী তাঁর রাজপুত বাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন, নাট্যকার অক্ষয়কুমার, রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে কে বাঁচিতে চায়', কবিতাটি সেই সময়ে রাণীর কণ্ঠে সংযোজিত করে দেশপ্রীতির স্বাক্ষর চিহ্নিত করেছেন।

মনোমোহন গোস্বামী :

গৌণ নাট্যকারদের মধ্যে মনোমোহন গোস্বামী বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চে ব্রিটিশ বিরোধিতার ঝড় তোলেন। স্বাদেশিকতার আদর্শ বিচারে তিনি ছিলেন Militant Nationalist. উপেন্দ্রনাথ দাসের জীবনচিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তা-সামঞ্জস্য গভীর। তাঁর 'সংসার' (১৯০৪), 'সমাজ' (১৯০৭) ও 'কর্মফল' (১৯০৯) নাটকগুলি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত ও অভিনয় নিষিদ্ধ করেন। আসামের চা-কুলির উপর ইংরেজ বণিকদের অত্যাচারই 'সংসার' নাটকের প্রধান ঘটনা। সুগভীর সহানুভূতির তুলিতে নাট্যকার নাট্য-চরিত্রগুলি অঙ্কিত করেছেন। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের পূর্বে তিনি শিবাজীর কাহিনী অবলম্বন করে 'রোশিনারা' (১৯০১) নাটক লেখেন। হিন্দুধর্মের পৌরাণিক তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হলেও দেশাত্মবোধের পরিচয় এই নাটকে পাওয়া যায় বিশেষভাবে। নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী দেশকে মাতৃজ্ঞানে ভালবাসেন। রামদাস স্বামী শিবাজীকে বলেছেন এই মর্মে,

"ভবানীর বরপুত্র তুমি।
দেব আঁখি ফেরে তব পাছে,
ইষ্টমন্ত্র দিয়েছি তোমায়
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" (১।৩গ)

ইংরেজদের অত্যাচার তিনি যবন নিন্দার অন্তরালে ব্যক্ত করেছেন,

"অত্যাচার অত্যাচার যেদিকে নেহারি,
ধর্ম্মের এ অপমান সহিতে না পারি।
* * * *
হিন্দুকুলবালা যবে যবন পরশে
অমূল্য সতীত্ব-রত্নে দেয় জলাঞ্জলি
* * * *
মনে হয়, দ্বিধা হও মাতঃ বসুন্ধরে।" (১।৩গ)

আবার শিবাজীর মুখে নাট্যকারের পরাধীনতার ক্ষোভ শুনি,

"জন্মভুমি পরপদানত,
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হের লুপ্তপ্রায় আজ,
গো ব্রাহ্মণ সহে নিপীড়ন,
শুনি ওই দেবতার করুণ ক্রন্দন,
করিব কি জীবন ধারণ।" (২।১গ)

মনোমোহন গোস্বামীর অপর নাটক 'পৃথ্বিরাজে' (১৩১২ বঙ্গাব্দ) দেশাত্মবোধের পরিচয়ও সুস্পষ্ট। যেমন,

"বীরের প্রধান ধর্ম্ম স্বদেশ রক্ষণ
হিন্দুর প্রধান কার্য্য যবন নিধন।" (৩।২গ)

নারী চরিত্রের মুখেও নাট্যকার স্বদেশপ্রীতির বাণী দিয়েছেন। মহীয়সী সংযুক্তা বলেছেন,

"কে হেন ক্ষত্রিয় আছে ভারত ভিতর,
জন্মভূমি মহারত্নে,
ম্লেচ্ছ করে তুলে দিতে ডালি
যেই না হবে কাতর।" (৩।৩গ)

মনোমোহন রায় ঃ

মনোমোহন রায়ের 'জাগরিতা' নাটক (১৩১২ বঙ্গাব্দ) বঙ্গভঙ্গ কালের রচনা। স্বদেশ ও স্বজাতিবোধই এই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজপুতদের সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ এই নাটকের অন্যতম বিষয়বস্তু। প্রতাপসিংহ এই

নাটকের নায়ক চরিত্র। জাতির প্রতি আহ্বান নাটকটির বহুস্থানে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে,

"এস ভারত সন্তান !
হয়ে একপ্রাণ
উজ্জীবিত হও নবীন জাতীয় জীবনে।" (১।২গ)

আবার,

"শ্মশান ভারতভূমি
তাই বিবাদিনী তুমি,
তুমি মা করুণাময়ী বিশ্ববিকাশিনী।" (২।১গ)

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত বলে সমকালীন জাতীয়তাবাদের প্রভাব নাটকটির সর্ব শরীরে বিশেষভাবে প্রতিফলিত। প্রতাপসিংহের খেদোক্তি প্রকারান্তরে সেই কালের বাঙ্গালীর দুঃখচিন্তা,

"প্রতাপ। মাতঃ জন্মভূমি, তবে কি তোমার ভাগ্যে নাহি
পরিত্রাণ !............হায়
বিধি ! হিন্দু জীবনের এই নিদারুণ
অভিশাপ হবে না কি দূর !" (২।২গ)

ভ্রাতৃপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবার প্রয়োজনটিও নাট্যকার এই নাটকে প্রচার করেছেন,

"হিন্দু
জীবনের ঘোরতর অভিশাপ, আত্ম-
বিচ্ছেদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপিয়োনা
হিন্দুস্থানে তুমি,......
আত্মদ্বন্দ্বে শক্তিক্ষয়
নাহি কর কদাচন।" (২।৬গ)

স্বদেশী আন্দোলনে নারীদের যে ডাক দেওয়া হয়েছিল, সমান অধিকার দানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছিল, নাট্যকারের সমর্থনের মধ্যে তা বিশেষভাবে চিহ্নিত।

"দেব ! রমণীর
তবে নাহি জাতীয়তা। নাহি তার উচ্চ
অধিকার। সে তাহলে শুধু অপদার্থ

বিলাসের হার।......
সে কি
শুধু গৃহকোণে রহিবে বসিয়া আমরণ
নীরব ক্রন্দনে।" (৩।২গ)

এই সমস্ত নাটকে গৌণ নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই (যেমন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন গোস্বামী প্রভৃতি) মুখ্য নাট্যকারদের পূর্বে জাতীয়তা প্রচারে অগ্রণী হয়েছিলেন। এমন কি বিষয়বস্তু নির্বাচনেও মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নন্দকুমার' নাটক, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'নন্দকুমারের ফাঁসি' নাটকের পরিণত রূপ। আবার মনোমোহন গোস্বামী 'রোশিনারা' নাটক রচনা করে গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী'র পূর্বে জাতীয়তাবাদী চিন্তাদর্শের বীজ জাতির জীবনক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে এই সমস্ত গৌণ নাট্যকারদের দীপ্তি ও স্বকীয়তা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই তাঁরা গিরিশ, ক্ষীরোদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত সৌরমণ্ডলে দূর গ্রহ ও উপগ্রহের মত বিরাজ করে এঁদেরই চারিদিকে আবর্তিত হয়েছেন।

সতের

উপসংহার

উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪) পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের যে প্রভাব, তা বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে আমরা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি। পরাধীনতার যন্ত্রণা বাঙ্গালী বুঝেছিল সর্বপ্রথম। নব্য ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙ্গালীর জ্ঞান ও প্রতীতি, জাতির লৌকিক মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত হয়েছিল। স্বাদেশিকতা ছিল এই চিন্তারই অন্যতম ফসল। ধর্মনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙ্গালী শৃঙ্খলমুক্তির প্রয়াস চালিয়েছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যের নাট্যশাখাতে এর প্রভাব পড়েছিল সর্বপ্রথম। নাট্যকারেরা কেবল যুগপ্রভাবেই প্রভাবান্বিত হয়ে নাটক রচনা করেননি, আপন চিন্তার মৌলিক বিশেষত্ব দিয়ে যুগকে প্রভাবিত করেছিলেন। বাঙ্গলাদেশে রাজনৈতিক নেতারা বাইরে যখন বক্তৃতামঞ্চ থেকে নানা সক্রিয় কর্মচিন্তার মাধ্যমে দেশবাসীর রাজনৈতিক অধিকারের দাবি জানাচ্ছিলেন, তখন নাট্যকারেরা নাটক ও নাট্যশালা থেকে রচনা ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর দেশপ্রেম ও দেশোদ্ধারের প্রকৃত অনুভূতিটি অচঞ্চল প্রাণাইট স্তরে স্থাপন করেছিলেন। এমন কি বাঙ্গলা নাটকে জাতীয়চেতনা যথাযথভাবে চিত্রিত ও জনচিত্তে প্রতিফলিত না হলে, স্বদেশী আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে সার্থক হতে পারত কিনা সন্দেহ! বাঙ্গালীর স্বাদেশিক ভাবসমৃদ্ধ নাটক রচনাতে আগ্রহ দেখে, ইংরেজ সরকার আতঙ্কে কিরকম প্রমাদ গুণেছিলেন, সে সংবাদও আমরা গ্রহণ করেছি। বাঙ্গালী নাট্যকারদের নাট্যরচনা ছিল সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যমূলক। বিশুদ্ধ রসতত্ত্বে নির্বিকল্প স্বপ্নপ্রয়াণ অপেক্ষা জাতির বাস্তব প্রয়োজনীতার কথাই তাঁরা অধিক পরিমাণে চিন্তা করেছিলেন। জাতীয়তার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী নাট্যকারেরা ছিলেন মুক্তিদূত। সারস্বত সাধনাতে তাঁরা যে জ্ঞানের হোমানল জ্বেলেছিলেন, তাতে দেশপ্রীতির মহামন্ত্র উচ্চারণ করে তর্পণ করা হয়েছিল। নাট্যকারগণ প্রত্যেকেই অধীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। যুগের বিভিন্ন স্বতঃবিরোধিতার

ধারা তাঁদের চিত্তে নানা তরঙ্গ-ভঙ্গ সৃষ্টি করলেও জাতির স্বার্থে সমস্ত অশান্ত কল্লোলোচ্ছ্বাসকে তাঁরা সংহত করেছিলেন। নাট্যকারেরা স্বদেশচিন্তা বিস্তারে যে কোন সঙ্কীর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি, তা আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের আলোচনাতে। ইউরোপীয় 'নেশান তত্ত্ব' স্বীকার করেও তাঁরা ভারতের শাশ্বত ধর্মবোধ, মানবহিতবাদ, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের শক্তিকে দেশগঠনের স্বার্থে গ্রহণ করেন এবং জনসম্মুখে প্রচার করেন। বাঙ্গালী নাট্যকারেরা ভাবের তূরীয় স্তর অপেক্ষা কর্মের রুক্ষ কর্কশ মাটিকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন। ফলে তাঁদের রচনা নাট্যতত্ত্ব মীমাংসার অনুশাসনে স্থূল ও নিম্নমানের সামগ্রী বলে প্রতিপন্ন হলেও জাতির জীবন-জাগৃতির স্পন্দনটুকু অত্যন্ত সজীব ও আন্তরিকভাবে তাঁরা তুলে ধরেছেন। বাঙ্গালী নাট্যকারদের অমরত্ব বোধ করি এইখানেই। দীনবন্ধু মিত্রের সর্বব্যাপী সহানুভূতি ও সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাতীয়হিতবাদী ঐতিহাসিক চেতনায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভক্তিরসাশ্রিত মানবপ্রেম ও স্বদেশ মহিমায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের পৌরাণিক শক্তির সাধনাশ্রিত দেশাত্মবোধ প্রচারে এবং দ্বিজেন্দ্রলালের বিশ্বপ্রেমরূপ মানবতাবাদে জাতির বন্ধন মুক্তির বাসনা সমানভাবে উচ্চারিত।

বক্ষ্যমান আলোচনাতে তাকেই বিশ্লেষণের মধ্যে আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি।

আঠার

পরিশিষ্ট

(ক—১)

Landholders' and Commercial Association of British India.
Calcutta—29th May, 1861.

E. H. LUSHINGTON ESQR.
Secretary to the Government of Bengal.

Sir,

I annex copy of a letter which is addressed to you on the 25th instant to which I have not received any reply.

I am directed by the General Committee of the Association to say that unless they receive a reply in the course of tomorrow the 30 instant, they will appeal to the Supreme Court Government in order that they might be in a position to communicate with the authorities in England by the mail which leaves on the 3rd proximo.

I have the honor to be
Sir,
Your most obedient servant
Sd/W. F. FERGUSSION.
Secretary,
Landholders' and Commercial Association of British India.

(ক—২)

The official circulation of the Nil-Durpan. *No.—1426A*

FROM THE SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BENGAL.

To W. F. FERGUSSION.

Secretary, Landholders' and Commercial Association of British India.

Dated, Fort-William. 3rd June, 1861.

Sir,

I am directed to acknowledge on the receipt of your letters* of the 28th and 29th ultimo, the first which did not reach the Lieutenant Governor until after his return to Pareshnath, the 30th.

The Lieutenant Governor finds that copies of an English translation of the publication named in your letter were sent to certain individuals through Post Office, under the official seal and frank of the Bengal Secretariate, as mentioned by you. This occured during his absence from Calcutta, and was not by his order. The publication in question, however, be finds no libel, and does not, so far as he is aware in fringe the law. It is an English translation of a work of fiction an original Bengalee drama of a popular order, in which obviously all the 'Dramatic personœ' are

* The letter of the 25th not received by the undersigned, till after the receipt of the duplicate forwarded with the association letter of 29th.

Sd/- E. H. LUSHINGTON

Secretary to the Government of Bengal

imaginary and the story is manifestly a fable. It has no interest but as an indication of strong popular feeling. As such, however, it has significance. It does not, appear to the Lieutenant Governor that even the original Bengalee drama, judging from the translation is likely as the Association supposes, to be a tendency to excite any class of persons to sedition or breaches of peace. In this respect, however, it is obvious that it is Vernacular plays, not English Translations may be dangerous. Nor can the knowledge of respectable official or other European gentlemen, of the existence of such indication of popular feeling as this be anything but a security against actual sedition and breaches of the peace.

The Lieutenant Governor has read the translation since the copies of which the transmission is complained of, were despatched. It will be found that Indigo Planters, on whose behalf complaint is made are by no means the only class— Native or European, criticised in this Bengalee play. Faults are as unsparingly imputed to European Magistrates, Native officials and Native factory Omlah, as to Indigo Planters.

Nevertheless the Lieutenant Governor very much regrets that by transmission of the translation in question under the official frank of the secretariat a misunderstanding has been caused and offence has been given to the respectable class of gentlemen on whose behalf you complain. The circumstances would not have occured but for some inadvertence or mistake. The position of Indigo Planters in some Bengal districts at present is one with which the Government sincerely sympathises. And nothing is more earnestly desired

that the speedy introduction of a sound system for the future, such as shall carry Native feeling with it.

I have the honour to be
Sir,
Your most obedient servant
Sd/- E. H. Lushington
Secretary to the Government of Bengal.

(ক—৩)

The Landholders' and Commercial Association of British India.

The trail, in the Supreme Court, of the Reverend James Long, for the libel in the publication of a pamphlet called the 'Nil-Durpan or Indigo Planting Mirror', having elicited the fact that a copy of the work was sent to many influential persons in England, under the frank of the Government of Bengal; the Landholders' and Commercial Association of British India, at whose instance the prosecution was instituted, deem it right to send to you the report of the trial herewith, and a brief statement of the circumntances which led to it.

On the 25th May, the Committee became aware, by a communication from Lahore, that the pamphlet in question, containing foul and malicious libels on the Calcutta daily newspapers and the Indigo Planters of Lower Bengal, had been circulated under the frank of the Government of Bengal.

On the 25th and 29th May, they addressed the Govern-

ment of Bengal on the subject, and under date 3rd June, received the reply, which, with their letters will be found in the Appendix.

As an answer to the request that the name of the parties who had so circulated the pamphlet should be given to them was evaded by that Government, the committee had no alternative but to institute legal proceedings, which they did—first, against the printer; who, when put on his trial, pleaded guilty, and gave up the name of the Rev. James Long as the person who had employed him.

Mr. James Long was accordingly indicated at the Sessions, that form of proceeding having been adopted, as it appeared to Council that a civil action could not be maintained at the suit of a body of men such as indigo planters; and having been tried by a special Jury, the result was that he was found guilty; and sentenced to one month's imprisonment, and to pay a fine of one thousand rupees.

The work itself is a Bengalee drama, purporting to depict the Indigo system as viewed by the Natives at large; the author's preface commencing, 'I present the Indigo Planting Mirror to the Indigo planter's hands, now let every one of them observe his face.' The translation is preceded by an introduction written by the Rev. Mr. Long, who superintended the printing, paid the expense, Rs. 300, received the whole edition of 5oo copies, and who adopts the whole by stating in the preface that 'the language in plain but true.'

The 'dramatics persone' are the well-to-do and even rich ryots of a village in Lower Bengal, their wives and daughters; two indigo planters, Mr. Wood and Mr. Rose; their dewans and factory servants; the Magistrate of the

district, a sweetmeat maker, who is also procuress; and other inferior characters.

The play brings into action, as facts and actual occurrences, all those exploded and disproved false hoods against indigo planters, which are stated in the Report of the Indigo Commission to be so. The factory Ameen is made to say in the second scene, first act, that he gave his own sister to the young 'saheb'; and that he will now try to get the ryots beautiful daughter, who had just appeard, for him, he hopes of promotion. When the planters appear on the scene, they recite, and glory in all the violence they have done in the atrocities they have committed; they use the foulest language. Wood, in the third scene of the same act, orders the 'bloody nigger' to be beaten; and does it himself, with the whip, a leather strap, which is described to be always at hand and to be used by the planters also on their highest servants.

The ryot's wives and daughters are models of beauty and innocence though one of them does say, in the fourth scene, that the wife of the planter is a great deal too intimate with the Magistrate 'and has no shame at all'. Her power over, and conduct with, the Magistrate is again referred to in scene 3, act 4, by the Jamadar of the jail, who says that he had been a house servant of Mr. Wood's but, through the influence of one letter from her, had got from the Magistrate the appointment he holds.

The first scene in the second act is in the godown of the planter, where the ryots are tortured to make them take advances and cultivate indigo, and where the planter in person flogs, and kicks them.

In the third act, third scene, two brave ryots rescue the beautiful daughter after she had been brought to Mr. Rose's chamber by the procuress who, however, had previously expressed great sorrow at the wicked part she had been compelled to act by the planter. One of the two gives the planter a good beating, though the other urges him 'not to be cruel because they are so.' The Magistrate in Court openly favors Wood the planter ; takes his advice, writes private letters during the examination ; sends off a note to Mr. Wood, and a message to his steward, that Mr. Wood will dine with him whilst the trial is going on, and before any decision or order is given. The father of the family is put in jail by the Magistrate ; will take no food, and hangs himself.

In the fifth act, second scene, the eldest son in with his skull-fractured by the blow given him by the 'Saheb', not withstanding the brave resistance of the same neighbour who saved the maiden, and who when wounded on the breast with a sword by the young 'Saheb', flew at the nose of the elder one, and bit it off. 'That nose', he says in triumph, 'I have kept with me, and will shew to the dead baboo when he rises up alive again'. He expressed regret that he had not taken off the planter's ears also, adding 'that he would not have killed him, as he is a creature of God.'

One wife dies of grief ; another becomes insane, kills a beautiful girl of the family ; and the maiden, whose virtue was attempted by the planter dies also. In the words of the author, 'the whole family is destroyed by Indigo—the great destroyer of honour. How very terrible are the arms of indigo'.

So terminates this drama—'the favorite mode with the Hindoos for describing certain states of society, manners and customs,' and which in this instance, is vouched for by Mr. Long to 'be written in simple homely language, plain but true'.

On the side of ryots everyone is pure and virtuous ; and they expresses nothing but the most exalted and noble sentiments, which guide all their actions.

To the European language, practices and crimes only to be imagined by the Bengalee are imputed, whether he be a former Governor of Bengal—a Magistrate of the country, a planter or his English wife.

This is the production which Revd. Mr. Long, a clergyman of the Church of England, has vouched for the truth of, has revised superintended, and paid for the printing of, and has furnished a list for its distribution in England, to influencial men, thus stabbing his countrymen in the dark, in such a manner, that they might not know of the blow, until they felt the effect in what might be, to them, irreparable injury. This is the work the whole edition of which Mr. Long sent to the head official and representative of the Government of Bengal, Mr. Setton Karr, the President of the late Indigo Commission, and the writer of its report ; and who has stated in that report, 'that there are considerations which are paramount to all mercantile interests and political expediency, and to all material advantage—the simple consideration of justice and truth.

Yet Mr. Setton Karr, as Secretary to the Government of Bengal, is found to have used official authority, and the public means to circulate on Her Majesty's Service, this

gross and malicious slander on his countrymen, giving it the weight and sanction of Government. Mr. Setton Karr has been since appointed Member of the Legislative Council of India.

The Association beg a reference to the evidence given in the trial; to the judgement of Sir Mordaunt Wells, who presided at it; and to the judgement of Sir Barnes Peacock, the Chief Justice, who heard the motion for arrest; to shew that they have here stated nothing that was not proved; and that all the Judges concurred in opinion that the libel was a gross and malicious one, aggravated by the manner of its distribution.

The Association leave it to you and to the public to judge how far such proccedings can be reconciled by Mr. Long with his mission of peace and good will to all men, or with the profession; by the Government, of its desire to smooth over animosities of race and to encourage British settlers and European capital in India.

They would desire to put to you and all their fellow-country men in England, and especially to those who are Legislators, or Members of the Government, this case. It is yet but a few years since much excitement prevailed in England on the question of the repeal of the Corn Laws. Men's minds were greatly divided on this question, and many pamphlets and tracts were written and published on both sides. Had some one of those opposed to the alteration of the Corn Laws written and published, such a play as this 'Nil Durpan', charging on the manufacturers of England as a body, and on their wives, such crimes and such baseness as is here charged against Englishmen and Englishwomen in

India ; had it been established by undoubted evidence that such a drama had been printed under the superintendence of a clergyman, and that by his orders 500 copies of the same had been sent to Downing Street and had been circulated secretly by the Queen's Government—circulated in such a way that those attacked could only hear of it by accident, and after the effect desired by its circulators had been produced,—what would have been said and done by the Parliament and people of England in such a case ?

What is here supposed as occurring in England, has now occurred in India, and the Association confidently believe that the same measure of justice will be meted out to them, as their countrymen in England would have received.

By order of the Landholders' and Commercial Association of British India.

W. F. FERGUSSION
Secretary

(ক—৪)

"James Long,—After a careful and patient investigation of the charge preferred against you, the Jury returned a verdict of 'guilty' on both counts, and the Court having refused to arrest the Judgement on the motion of your learned counsel, it is now my painful duty to award the punishment called for by the verdict of the Jury. And after an anxious consideration of all the circumstances of the case, you have been convicted of the offence of wilfully and malaciously libelling the proprietors of the 'Englishman' and 'Hurkara' newspapers, and under the second count, of

libelling, with the same intent, a class of persons designated as the Indigo planters of Lower Bengal. I most earnestly, I may say most strongly and pointedly, called upon the Jury to up hold and vindicate, if necessary, by their verdict the right of free discussion, and to be careful, lest by their verdict the right of liberty of the press might be endangered. In summing up the case, over and over again I recognised and maintained the right of every man to instruct his fellow-subjects by every sincere and conscientious examination which may promote the public happiness; and I stated distinctly and emphatically the privilege possessed by everyman, of pointing out those defects and corruptions which exist in all human institutions. The Jury pronounced a verdict which, I have the satisfaction of feeling, rests upon a constitutional basis and cannot be used hereafter against the liberty of the press. There is not a person who would have rejoiced more than myself if the Jury had returned a verdict of 'not guilty' on the ground that they believed you had acted conscientiously and for the interest of society in publishing this book. I grieve to say that verdict could not have been given without those twelve gentlemen believing that you have been actuated by a feeling of animosity towards the Indigo planters in publishing and circulating such a gross and scandalous libel. Partly through your instrumentality nearly three hundred libels have been circulated, and according to the evidence of Mr. Jones who gave his evidence most properly, with the apparent sanction of the Bengal Secretariat, at the public expense. I am bound to say that such a proceeding is without parallel in the history of Government department

in England; and as one of the Judges of the Supreme Ccurt it is my duty to state, and I do so most sincerely, and that I trust such a transaction may never occur again in this country, as such a proceeding must necessarily undermine that feeling of respect and confidence which ought to exist on the part of the Government towards those who are placed in auothority over them. I did at the trial, as I now do, scrupulously abstain from expressing any opinion directly or indirectly, as regards the personal motives on feelings which actuated the officers of Government in sanctioning the circulation of this book. It is the safest plan in life always to assume that public men act from pure and just motives until the contrary is established; and it does not follow by any means that the officials, who allowed the paper to be circulated, acted in the slightest degree illegally. The pamphlet was sent forth unaccompanied by a single word of caution or explanation, and the Indigo planters of Lower Bengal have no means of tracing the extent of the injury inflicted upon them by the circulation of the libel; but is there not reason for apprehending that certain persons in England may have been induced to bring forward serious but groundless charges against the Indigo planters? It is quite impossible to realise fully the irreparable mischief you have occasioned by causing this libel to be circulated in England. There is one feature in the case I cannot pass over without special notice. I mean the position you hold in societyas a clergyman of the Church of England. I am certain the Bishop of Calcutta, of whom it may be said that he is respected and beloved by the entire Christian community, will deeply lament the circumstance

of one of his clergy being convicted of libelling a large and influential body of gentlemen scattered over a portion of his extensive diocese ; and I am well assured that the great body of the clergy, with few exceptions, will sympathize with their Diocesan on the present occasion. The fact of your being a clergyman is an aggravation of your offence ; and when you state publicly in Court that the advance of Christianity is impeded by the irreligious conduct of many Europeans, I think such an expression of opinion on your part, when called upon to receive the sentence of this Court for libelling many of your countrymen, is rather out of place. And perhaps the great majority of the Europeans may think that your conduct has not done much to promote real practical Christianity. You of all men ought to have inculcated and stood forth as the teacher of that inestimable precept: 'Do unto all men as you would they should do unto you.' My duty is a distressing one, but I must not shrink from the performance of it. The sentence of the Court is that you pay a fine of Rs. 1000 to our Sovereign Lady the Queen, and that you be imprisoned in the Common Jail for the period of one calendar month, and that you be further imprisoned until the fine is paid."

Vide: Trial of the Rev. James Long of the Church Missionary Society for Libel: pp 45 47.

(ক—৫)

"From the whole proceedings of the 'Nil Durpan' trial, we have came to the conclusion that Sir Mordunt Wells rather acted as an advocate of the Indigo cause, than as a Judge to dispense impartial justice. The Jury in this case were

nothing more than puppets, that could not move without any assistance. He took their main wire in his hands, and acted his part so expertly that the whole court was rather a grand scene of puppet dance, than as a tribunal of justice.

Never have we heard of, nor witnessed such a peculiar trial, as the trial and condemnation of the Rev. J. Long. The Puisne Judge from the very beginning of the trial shewed a strong partiality for the Indigo planters and their two organs. A desire of gratifying them so strongly prevailed over the rational dictates of moral justice, that he pronounced--'Nil Durpan' libellous, and Mr. Long guilty of libel. He condemned a man who was truly innocent of the charges which are falsely imputed to him.

Rarely have we seen or heard of a judge, when in Bench, denouncing so strongly a man to prove him guilty of an offence when he stands acquitted of the charges. Embittered as Sir Mordunt Wells was, that to prove 'Nil Durpan' libellous and Mr. Long guilty, so far had he forgotten the dignity and position of the high and responsible situation he holds, that he bursts forth into elocutions which were beyond the limits of his duties—elocutions which were so rancorous and partispiritated, that they did not suit the occasion and the place, and entirely disqualified him for a judicial post.

Whole India stood astonished to see a Missionary of high reputation who rendered the most eminent services to the country, condemned through the malevolence and rancour of faction by a Judge, who to support and advocate the Indigo cause, was hurried beyond the bounds of Justice, Law, and Commonsense.

The Indigo planters and their advoctes, finding their cause entirely hopeless, tried with their head and heart to strike a great blow by prosecuting Mr. Long in a Court of Justice. The Indigo planters, it seems to us, were determined to carry on business, under great legal restrictions.

The Liberty of the Press, which is absolutely necessary in a civilised government, was greatly attacked. Every individual is at liberty to express his thoughts and feelings, provided they are free from defamation. Wrongs cannot be remedied, and rights cannot be preserved without the liberty of the Press.

Well, now if 'Nil Durpan' which is nothing more than a true exponent of native thoughts and feelings, were— pronounced libellous, and its publisher condemned for a false charge, were not then, the Indigo Editors, who—unjustly attacked the Government, the Missionaries, the Natives and in short, every supporter of a good cause, entitled to transportation, and even to still higher penalties ?

The 'Harkara' who really acted like an 'impertinent Harkara' was surely deserving of great censure. A conference was held by the Missionaries of Calcutta respecting Mr. Long. The 'Harkara' for the information of the British public circulated the following misrepresentations:—

'It is said that at the conference, there was great difference of opinion, some of the members having proposed to expel Mr. Long from their Association altogether ; but the Rev. Chairman (Dr. Duff) with characteristic vehemence declaimed that if they did not pass the resolution, he would go home and preach the Martyrdom of St. Long in every village and hamlet in England and Scotland.'

A letter from the Secretary of that conference, to the Editor of the 'Bengal Harkara' fully disproved the misstatements.

The public ought to consider whether 'Nil Durpan' or the 'Blue Journals' were libellous. We say libel in its strictest sense, not libel in the Supreme Court form of interpretation.

Factious zeal did so much prejudice the Judge during the Trial, that he was at a great difficulty to distinguish right from wrong, even to construe the proper meaning of the word libel. According to Sir. M. Well's interpretation of the word libel, any exposition of social, moral and political evils was a libel ; the practice of these evils was to be indulged without any check, and any man attempting to check them must be brought to the trial of a Court of Justice.

When Sir. Mordunt La' son Wells first sat on the Judicial Bench of the Supreme Court, Sir M. Wells expressed a strong antipathy towards the natives, whom he declaimed as a nation of forgers and perjurers. For trivial offences he inflicted on them the severest punishments.

For instance, we cite the trial of the well known Mutty Baboo of Santipur. That he was really guilty every body knows, but not so much as to deserve the severe punishment of 7 years' transpotation. Where as the murderer Watson for his having a white skin was commisserated with, pleaded for, and incontinently removed from the felon's cell to the civil part of the jail by the same Judge.

He grossly insulted us and injured our reputation. He encroached on our rights and threw us into the contempt and ridicule of the civilised nations of the Earth. The Natives of India were not Carolina slaves that they will suffer all public indignities. Man fully did they then fight to vindicate their just cause—a cause which they had every right to assert. Never have we heard of, nor witnessed such a political strife since the conquest of India by the

English ; a strife on which the destinies of a high functionary and the natives of Bengal were firmly at a stake.

The prosecutor was not an Indigo planter and still the 2nd count was allowed to stand. It was urged that as the prosecutor was a member of the Indigo Planters' Association, so he could sue the Reverned Mr. Long on behalf of the Planters. Admitting the truth of the 2nd Count, for arguments sake, Mr. Brett could not at all sue on behalf of the Planters, for the Planters were not a corporate and definite body. The costs of the suit were paid by the Commarcial and Landholders alias the Indigo Planters' Association. The Counsel for the prosecutor was a member of the Association, but he nominally withdrew his connection from the Association, and became a counsel to be the prosecutor's counsel. Such was the extent of malice shown towards Mr. Long that the respectable natives were not allowed by the Supreme Court to wait on a deputation on Mr. Long at the Common Jail, for the purpose of presenting him an address which was subsequently forwarded to him in the way of letter, just few days after his being taken into the jail.

As for Mr. Setton-Karr, he was wrong only of doing a private affair in a public capacity. Let not any one think, that he was censured by the Government for his adopting a course which was contrary to the interests of the Blues. For if such would have been the cause, the Members of Parliament, the India and Bengal Governments the several newspapers of India and abroad, who maintained truth, and advocated the cause of oppressed Ryots, or in other words, spoke against the Planters, would have been censured. Even the very Mr. Setton Karr, who as a President of the Indigo Commission, reported a great deal against the planters, would have been censured. The explanation which he forwarded to the Governor General and which was published for general information was so reasonable and satisfactory, that it entirely be filled a man of his position and qualifications.

As for Mr Long, he fulfilled his duties of Christianity—he suffered in a good cause—the cause of his Divine Master—the cause of the poor, the needy and the oppressed. He suffered the public indignities with a patience that expressed a truely Christian, high and magnanimous heart.

Let us conclude, one of the most memorable events which has thrown a dark spot into the annals of British India, is

the trial and condemnation of Rev. J. Long. The manner in which the trial was conducted was clearly expressive of partizanship and strong partiality. It attracted universal attention, and excited the indignation of the right-minded men. The Indigo Planters, their Judicial advocate and the Counsel, expressed so great an aversion for the Rev. Gentleman, that those eminent virtues which enabled him to draw universal notice, and by which he rendered the most eminent service to this country, seemed to them the most detestable vices. No reasonable man will deny that the trial was by far the most unjust that ever disgraced any tribunal of the nineteenth century. In the history of the civilised world there are few examples with which it can bear a true analogy ; and to speak more emphatically, it was a disgrace to Christianity, to Truth and to Justice, a disgrace to Reason and to Conscience.

This unjust trial reminds us of the trial and execution of Nand Coomar. Sir. Mordunt may deservedly be called the Impey of the nineteenth century. In fact he was a true incarnation of that arrogant, haughty, and Bengali-hating Englishman, who at one time, on the same chair and within the walls of the very same Hall, unjustly condemned the unfortunate Nand Coomar. But if we take a survey of the transactions of the Supreme Court, we shall find, that excepting the trials of Nand Coomar and the Rev. James Long, which are of the blackest dye, and which will be forever observed with detestation and abhorrence, they are truly deserving of praise Thus by drawing a disfigured, but an exact picture of the interlopers of Christian Europe, we have set before our readers examples of the most barbarous, horrible and detestable course of actions. I know not whether I shall have the fortune of getting a Brett to prosecute and a Wells to condemn or not."

—Hindoo Patriot

Vide : Nil Durpan or The Indigo Planting Mirror ; Edited by : Sri Sudhin Pradan ; pp. 198-202.

নির্দেশিকা

অক্ষয়কুমার দত্ত—৪৪, ৪৫, ৪৬, ৮১, ২২৮, ৫৯১
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—৩৬৪, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৪, ৪২৫, ৪৭৩, ৫৪৩, ৬৫০
অক্ষয়কুমার চৌধুরী—৬৫১-৬৫২
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী—১৫৭
'অনলে বিজলী'—৬৪৫
অনুশীলন সমিতি—৩৭৯, ৩৮৯, ৩৯২
অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—২৭৬, ৪৭৪, ৪৭৫
অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন—১৪০, ২০২, ২৬৮, ৩২৫, ৩২৮, ৩২৯, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২-৩৫৭, ৩৬১, ৫৬২
অমৃতলাল বসু—২৭৫, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৯৯, ৪৮৩-৫২৯
অমৃতলাল মিত্র—৫৬১
'অমৃতবাজার পত্রিকা'—৭০, ৭৭, ১৩৮, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৭৯, ২৭৫, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৬৫, ৩৬৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২২, ৫২৩, ৫২৫, ৫২৭, ৫২৯
অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ)—৩৬২, ৩৮৪, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪৫৫, ৫১৫, ৫৩৮, ৫৩৯
'অলৌকিক রহস্য পত্রিকা'—৫৩৯
'অশ্রুমতী'—২৩৮, ২৩৯, ২৪৯, ২৫১, ২৫৩, ২৫৬, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৭০
অশ্বিনীকুমার দত্ত (মহাত্মা)—৩৮৭
অসহযোগ আন্দোলন—৩৯৮
আত্মীয় সভা—১৮
আনন্দচন্দ্র মিত্র—১৬৩
'আনন্দময়'—২৮৭
'আনন্দমঠ'—১১৩, ১৯৫, ২০০, ৩৬২, ৩৯২, ৪১২
আনন্দমোহন বসু—১৪৪, ১৪৬, ১৭১, ১৭৪, ১৭৬, ১৮৭, ৩৬৮, ৩৭৬, ৩৮৯
আর্মস অ্যাক্ট (অস্ত্র আইন)—১৭৭, ১৭৮, ১৭৯
'আর্য্যদর্শন'—১৬৫, ৩৪৪
অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন—২৩
অ্যাডাম, উইলিয়ম—২০, ৩৫, ৩৬
অ্যান্টি সারকুলার সোসাইটি—৩৮৮
অ্যারিওপ্যাজিটিকা—২০
ইউনিটেরিয়ান—১৯
ইউনিভার্সিটি বিল—৩৭৫
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন (ভারত

সভা)—১৩৭, ১৬৩, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪-১৭৭, ১৭৯, ১৮৬, ১৯০, ১৯১, ২৭৩, ৩৮৪, ৫০০
ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন—১৮৮
'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'—৭৪, ৯৮, ১০১
ইণ্ডিয়ান লীগ—১৭০-১৭১, ২৭৩
ইণ্ডিয়ান মৌর্ন—৩৭৯
ইলবার্ট, কোর্টনে (স্যার)—১৮১
ইলবার্ট বিল—১৫৯, ১৮১-১৮৬, ৫৭৭, ৫৯২
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—১১, ২৫, ৩৮, ৪০, ৪১, ৫৪-৮০, ৪৪০, ৫৬৩, ৫৮৩
'ইংলিশ ম্যান'—৩৮, ৮১, ৮৮, ১১৭, ১১৯, ১২১, ১৩৯, ১৮২, ২৬৮, ৩১৩, ৩৪৮
'ইংলিশ ম্যান অ্যাণ্ড মিলিটারি ক্রনিকল'—৫২
ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল—১৫৪
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—৬, ৩৫, ৪৪, ৪৭, ৪৮ ৮১, ২৮৭
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—৪৪, ৪৫, ৫১, ১৬৮, ১৭৪, ২১০-২১২, ৩০২, ৫৯১
উপেন্দ্রনাথ দাস—১৩৯, ১৪০, ১৬৫, ২০৩, ২৭৪, ৩১৩-৩২৭, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫০, ৪৬৭
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৮, ২৯৫, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৬৮
উমেশচন্দ্র মিত্র—৫১, ২১০
উল্লাসকর দত্ত—৩৯৮
'একাকার'—৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৯১
'একেই কি বলে সভ্যতা'—৫১
এগলিংটন—১২১
এগ্রি হর্টিকালচারাল সোসাইটি—৩৮
'এডুকেশন গেজেট'—১৯৫, ৩৪৪
'এনকোয়ারার'—২৫
এসলি, ইডেন—৬৬
এসিয়াটিক সোসাইটি—৪২০
ওকাকুরা—৩৯৪
ওয়াহবি আন্দোলন—১৬৯
ওয়েন—৩৪৪
ওয়েলস্, মর্ডাণ্ট—১০১, ১২২, ১২ , ১২৮
কংগ্রেস—৪০, ১৫৯, ১৭৩, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯৯, ২৩৩, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭৪, ৩৮৮, ৪০৯, ৪৭৬, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮১, ৪৯৪, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০
কটন, হেনরি জন (স্যার)—১৭৬, ১৭৭, ৫১৬
কর্ণওয়ালিস্ (লর্ড)—১৩, ৫৬৪
'কর্মফল'—৬৫২
কলভিন, অকল্যাণ্ড (স্যার)—৩৬৮
কাউই—১২১
কাউচ—৫১৯
কার্জন (লর্ড)—৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮০, ৫৬৮
'কাঞ্চী-কাবেরী'—৪৮

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়—৫৯১
কানাইলাল দত্ত—৩৯৮
'কালাপানি'—৪৯১, ৪৯২
কার্লাইল—৩৮৭
কালীকৃষ্ণ বাহাদুর (রাজা)—৩৫, ১২৬, ১২৮
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রেভারেণ্ড) —১৭১, ১৭৯
কালীনাথ রায়চৌধুরী—৩৫
কালীপ্রসন্ন সিংহ—১২৩, ১২৮
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—৫১৪
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—৫৪৭
কালীশঙ্কর ঢুলিচাঁদ—৩৮২
কালীশঙ্কর রামেশ্বর—৩৮২
কালীশঙ্কর সুকুল—১৬৩, ৩৮২
কার্বোনারী সভা—১৭৩, ২২৮
কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—২০৩, ২৭৩-২৮৬, ৩২৭, ৫০০
কিশোরীচাঁদ মিত্র—২৮
কুলি আন্দোলন—১৬৩
'কুলীনকুলসর্বস্ব'—৫১
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—১৫৪
কৃষ্ণকুমার মিত্র—১৬৩, ৩৮১, ৩৮৮
'কৃষ্ণকুমারী'—২০২, ২০৩, ২০৪, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১
কৃষ্ণদাস পাল—২৯, ১৪৮, ১৫৪
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (রেভারেণ্ড) —১৭১, ১৭৯, ৩৪৪
কেশবচন্দ্র সেন—১৪৪, ১৫৯, ১৬০, ১৯০, ১৯১, ১৯৭, ২৭৪, ৫৮৬, ৬১০
কোমত, অগুস্তে—১৪৪, ১৯৩, ৩০
ক্যানিং (লর্ড)—৭০
'ক্যাপটিভ লেডি'—২১১
ক্যাভুর—১৭২
ক্যামবেল—১৬৭
'ক্যালকাটা জার্নাল'—২০
'ক্যালকাটা রিভিউ'—২৮, ৫৬, ৬২, ৭১, ১২৩
ক্যালকাটা স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েসন —১৭১
ক্লাইভ, রবার্ট (লর্ড)—১১
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—১৪০, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৯৯, ৪১৯, ৫৩০-৫৮৩, ৬৫০, ৬৫৫, ৬৫৭
ক্ষুদিরাম বসু—৩৯৮
গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা—১২
'গজদানন্দ প্রহসন'—৩৪১, ৩৪২, ৩৫২
গণপতি মেলা—৩৭১
গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৫১, ১৫৩, ১৫৭
গান্ধী (মহাত্মা)—৩৯৮
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—১৪০, ১৫৪, ৩৪১, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৯৯, ৪০০-৪৮২, ৪৯৮, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৬৯, ৫৮৪, ৫৯৭, ৬৪৪, ৬৫২, ৬৫৪, ৬৫৭
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যার)—৩৮৮
গোপালকৃষ্ণ গোখলে—১৫৯, ৩৭৪
গোবিন্দচন্দ্র দাস—১৩৭, ৫১৬
গৌরদাস বসাক—২১২
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—২০

গোরীশঙ্কর তর্কবাগীশ—৩৫
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—২৯, ৩০
গ্রাণ্ট, পিটার—৬৩, ৭২
গ্যারিবল্ডী—১৪৪, ১৭২, ১৭৩, ২৬১
গ্যারিসন, লয়েড—৮৫
গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার—২৬৬, ৩৪১, ৫২১
গ্লাডউইন, ফ্রান্সিস—২৪১
চক্রবর্তী ফ্যাকসন—৩৮
'চন্দ্রগুপ্ত'—৬৩৮
'চা-কর দর্পণ'—২৬৮, ৫৪৩
চোয়ার বিদ্রোহ—১২
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—১২, ১৩, ৩০
চৈতন্যদেব—১৭২
'ছত্রপতি শিবাজী'—৩৬৩, ৩৬৫ ৪১১, ৪৫২, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬৪, ৪৬৯, ৪৭১, ৪৭২, ৬৫৫
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—১২
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়—৩৩২, ৩৩৪, ৩৪২, ৩৪৯
'জন্মভূমি' পত্রিকা—৫৪২
'জমিদার দর্পণ'—৫৮২
জমিদার সভা (ভূম্যধিকারী সভা)—৩৪, ৫৫, ৩৬, ৩৮, ৩৮৪
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—৪০
'জাগরিতা'—৬৫৩
জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা—১৫০
জাতীয় ধনভাণ্ডার—১১৬, ১৮৬
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেসন)—৩৮৮
'জীবনস্মৃতি'—২২৪, ২৩০, ২৩১, ২৭২
জুরিসডিকসন বিল—১৮১, ১৮২
'জ্ঞানান্বেষণ'—২৫
জ্ঞানোপার্জিকা সভা—৩৮
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—৪৮, ১৩৯, ১৫৬, ১৫৭, ১৭৩, ২০৩, ২২১, ২২২-২৭২, ২৭৪, ২৮৫, ৩২৭, ৩৪৭, ৩৬১, ৫৪০, ৫৯১, ৬৫৭
টড, জেমস্—২১৮, ২১৯, ৬২১
টমসন, জর্জ—৩৬, ৩৭, ৩৮
ট্রেড অব কণ্ট্রোল—৪১
'ডন' পত্রিকা—৫৫, ৫৬, ৮৩, ৯৭, ৩৭৭
ডন সোসাইটি—৩৭৭, ৩৮৮
ডাফ, আলেকজাণ্ডার—২৩, ২৭
ডাফরীণ (লর্ড)—৩৬৮, ৩৬৯
ডিকেন্স, থিয়োডোর—২৬, ৩৫
ডিকেন্স অ্যাসোসিয়েশন—১৮২
ডিগবী, জন—১৬
ডিরোজিও, হেনরী লুই ভিভিয়ান—২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৯, ২০৮, ২০৯
'ডেলি নিউজ'—১২৩
'ঢাকা প্রকাশ'—১৭৯
'তত্ত্বকৌমুদী'—১৬০, ১৬১
'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'—১১, ৩০, ৩২, ৩৩, ৪২, ৪৫, ৬৭, ৮৬, ১৫০, ১৫১, ২২৪, ২২৮
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা—৪৫, ২২৪

তত্ত্ববোধিনী সভা—৪৪, ৮৬, ২২৪
'তারক সংহার'—৬৪৪
তারাচাঁদ চক্রবর্তী—২৯, ৩৭, ৩৮
তারানাথ তর্কবাচস্পতি—১৫৪
'তারাবাই'—৬২৮
তাঁতি ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম—১২
তিতুমীরের বিদ্রোহ—১২
থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি—৫৩২
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—৩৮
দাদাভাই নৌরজী—১৮৯
'দাদা ও দিদি'—৩৬৫, ৫৬২, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭২, ৫৭৫, ৫৭৭, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩
দিগম্বর বিশ্বাস—৭৪
দিগম্বর মিত্র—১৫৪
'দি কুইল'—২৯
দি ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েসন (দেশহিতৈষিণী সভা)—৩৪, ৩৯, ২২৫
দিলীপকুমার রায়—৬৩৫
দীনবন্ধু মিত্র—৮, ৯, ৪৭, ৫০-১৪০, ১৬৫, ২৭৯, ২৯৫, ৩১৪, ৩২০, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৭, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৯১, ৬৫৭
'দুর্গাদাস'—৬১২, ৬২০, ৬২১, ৬২৩, ৬২৪, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩৩, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২
দুর্গামোহন দাস—১৫৯, ১৭১
দুর্লভচন্দ্র কুণ্ডু—৩৮২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—৮, ৩৯, ৪০, ৪৪, ৪৫, ১২৮, ১৯০, ২২৪, ২২৫, ৬১০
'দেবী চৌধুরাণী'—৩৬২
'দৈনিক বার্তা'—১৮৩, ১৮৪
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—১৪৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ২৫৭, ৩৪৪
দ্বারকানাথ ঠাকুর—২০, ৩৫, ৩৬, ৬২
দ্বারকানাথ মিত্র—১৭৪
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৫১, ১৫৪, ১৫৭, ১৭৯, ৩৪৪
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—১৪০, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৮৬, ৩৯৯, ৫৬৯, ৫৮৪-৬৪৩, ৬৪৪, ৬৫৫, ৬৫৭
'ধর্ম্ম' পত্রিকা—৩৯৬, ৩৯৭
ধর্ম্ম সভা—৩৫, ৪০, ৪৪
নটী বিনোদিনী—১৩৭, ২৬৬
'নন্দকুমার'—৩৬৫, ৫৩৩, ৫৩৭, ৫৩৯, ৫৪৪, ৫৮০, ৬৫৫
'নন্দকুমারের ফাঁসি'—৬৫০, ৬৫৫
নন্দকিশোর বসু—১৭২
'নবজীবন'—৪৯৮, ৫০০, ৫০৫, ৫১৭
নবগোপাল মিত্র—১৩৯, ১৪৪, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৭১, ২২৬, ২৩১, ২৫৯
'নবনাটক'—৫১
'নববিধান'—১৬০
'নব বিভাকর'—১৭৯
'নব ভারত'—৩৬৯, ৩৭০
'নব্য ভারত'—৬৪০
'নবান্ন'—৫৮২
নবীনচন্দ্র বসু—৫২, ৫৩
নবীনচন্দ্র সেন—২০২, ৪২০, ৪৭৪, ৫৯২

নরেন দেব (রাজা)—৩৫০
নর্টন, ক্রস্ জন—৩৪
নর্থ ব্রুক (লর্ড)—৫৪২, ৫১৮, ৫২২
'নাট্য মন্দির'— ১২৮, ৫৩১
'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা—৩৭৯, ৩৮০
নিউমার্চ—১২১
নিখিলনাথ রায়—৪২০, ৫৪৭, ৬৫০
নিবেদিতা (ভগিনী)—৩৯৪
নিহিলিষ্ট—৩৯৪
নীলকমিসন কমিটি—৩৩, ৪৩, ৬০, ৭১, ৮৯, ৯৩, ৯৭, ৯৯, ১০৯, ১১৫, ১৩০, ১৩২, ১৪৩
নীলকমিসনস্ রিপোর্ট—৩৩, ৫৯, ৬০-৬৬, ৯৩, ৯৯, ১০৯, ১৪৩
নীলকমিসনারস্ রিপোর্ট—৬২-১৪০
নীলকর সমিতি (ইণ্ডিগো প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েসন)—৪২, ৬০
'নীলদর্পণ'—৮, ৯, ৪৯-৫০, ১১৩, ১৪৩, ২৭৯, ২৯৫, ৩২০, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৭, ৩৪৫, ৫৮২, ৫৮৩
'নীলদর্পণ' (ইংরাজী)—১০৪, ১১৪-১৪০
নীলবিদ্রোহ— ৯, ১২, ৫৫, ৬০, ৬৩, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮০, ১০৪, ১২৯, ১৪৮, ১৭০, ২২৫, ৫৯১
'নুরজাহান'—৬২০, ৬৩৭
ন্যাশনাল কনফারেন্স—১৭৬, ১৮৮
ন্যাশনাল থিয়েটার—১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৬, ১৬৫, ২০২, ২২১, ৩২৯
'ন্যাশনাল পেপার'—১৩৯, ১৫১, ১৫২
'পদ্মিনী'—৩৬৬, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৬৫১
'পদ্মিনী উপাখ্যান'—৪৮, ৫৪, ২০৪
'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত'—৩৮৫, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৪২, ৫৬১, ৫৮০
'পলাশীর যুদ্ধ'—২০২, ৪২০, ৪০৪
পার্কার, থিয়োডর—৮৫
'পার্থেনন'—২৫
পিপলস্ অ্যাসোসিয়েসন—১৭১
পীকক্—৪২
'পুরুবিক্রম'—২৩৫, ২৩৭, ২৪৭, ২৫৭, ২৫৯, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৯
পেইন, টমাস—২২, ২৩
পেটারসন্—১২১
পেলি, লুই—৫১৮, ৫১৯
প্যারীচাঁদ মিত্র—১৮, ২২, ৩৭
'পৃথ্বীরাজ'—৬৫৩
'প্রতাপ-আদিত্য'—৫৩২, ৫৩৭, ৫৪০, ৫৮০
'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'—৫৪০
প্রতাপচন্দ্র সিংহ (রাজা)—৪০, ১২৩, ১২৮
প্রফুল্ল চাকী—৩৯৮
প্রফুল্লচন্দ্র রায় (আচার্য)—৩৮৮
'প্রবাসী'—২৩৩, ২৩৪
প্রমথনাথ চৌধুরী—৩৯৪
প্রমথনাথ মিত্র—৩৭৯
প্রসন্নকুমার ঠাকুর—৭, ২০, ২৭, ৩৫, ৩৯, ৪১

'প্রায়শ্চিত্ত'—৫৪১
প্রিন্স অব্ ওয়েলস্—৩৩০, ৩৩২
প্রিন্সেপ, জর্জ—৩৫
প্রিভি কাউন্সিল—২০
প্রেস অর্ডিন্যান্স—২০
ফরগুসন্—১১৭
ফরাসী বিপ্লব—১৩, ১৪, ২২, ২৩, ২৪, ২৫
ফাষ্ট´, হাওয়ার্ড—১০৪
ফিয়ার (কর্ণেল)—১৬৯, ৩৪৭ ৩৫০
ফুলার—৩৯৪
ফুলারটন, উইলিয়ম—৫৬৩
ফেডারেশন হল—৩৭৬
ফেয়ার (রেসিডেণ্ট)—৫১৮
'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'—৩৭, ৩৮, ১১৪, ১৩৩, ১৩৬
'বউ ঠাকুরাণীর হাট'—৫৪১
বকল্যাণ্ড—১৭, ৬৩
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—৪, ৪৭, ৮১, ৮২, ৮৪, ৯০, ৯১, ১১৩, ১৪৪, ১৫৭, ১৬৬, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪ ১৯৫, ২০০, ২০১, ২০২, ২১৬, ২২২, ২৩২, ২৪৬, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ৩০০, ৩০২, ৩০৫, ৩১১, ৩৬২, ৩৯১, ৩৯২, ৪০১, ৪০৩, ৪১২, ৪১৩, ৪৫২, ৪৮৮, ৫৪৯, ৫৬১, ৫৬২, ৫৯১, ৫৯২
'বঙ্গদর্শন'—১৫৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৯২, ১৯৪, ২২২, ৫৪১
'বঙ্গদর্শন'—(নবপর্যায়)—৩৭৫, ৩৭৯, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৭, ৪৫৩
'বঙ্গদূত'—৫৭, ৫৮
বঙ্গভঙ্গ আইন—৩৭৬
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—১৪০, ১৪৪, ১৫৯, ৩৬১, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪১১, ৪২৬, ৪৬৬, ৫০৬, ৫১১, ৫১৪, ৫১৬, ৫৬১, ৫৮১, ৫৮৩, ৫৮৪, ৬০০, ৬০৩, ৬৩৪
বঙ্গভঙ্গ বিল—৩৮০, ৫৮৪, ৬০৪
বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা—৩৪, ৩৫
'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'—৩৮৩
'বঙ্গের সুখাবসান'—৩০০
'বন্দনা'—৩৮৬
'বন্দেমাতরম' (গ্রন্থ)—৩৮৬
'বন্দেমাতরম' (পত্রিকা)—১১৩, ৩৮৪, ৩৮৯, ৩৯৫, ৩৯৬
'বন্দেমাতরম' (সম্প্রদায়)—৩৮৬
বম্ভাইটস্—৭৩, ১০৯
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩১, ২৩৭, ২৬৫, ২৬৬
বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের প্রজা বিদ্রোহ—১২
'বাঙ্গলার মসনদ'—৫৪৬, ৫৪৭
'বাঙ্গালার ইতিহাস'—২৯৯
'বান্ধব'—৩২৫
বায়রণ—২০৮
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—৩৯৪
বাল গঙ্গাধর তিলক—৩৭১, ৩৮৮, ৪৬২, ৪৭৩
'বালক'—২২৩

'বাবু'—৪৯৩
ব্রাণ্ট, স্কায়োএন—১৮০
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—১৪৪
'বিদ্যাসুন্দর' (নাটক)—৫২, ৫৩
'বিধবাবিবাহ নাটক'—৫১, ২১০
বিপিনচন্দ্র পাল—২৪, ৪৯, ১১৬, ১৩৭, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৬, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২ ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৭, ১৯২, ১৯৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭৫, ৩২৬, ৩১৭, ৩৭৯, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০৫, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৬৬
'বিবিধ প্রবন্ধ'—৪
বিবেকানন্দ (স্বামী)—১১৫, ১৪৪, ১৭৩, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ৩৭১, ৩৭৯, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৪, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪১০, ৪১৮, ৪৫১, ৪৫৫, ৪৫৮, ৫১২, ৫৮৬, ৫৯০, ৫৯৮
বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস—৭৪
'বীরাঙ্গনা কাব্য'—২১০
বীরাষ্টমী মেলা—৩৭৯
'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'—৫১
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েসন—১৭৪
বেঙ্গল কেমিক্যাল—৩৭৮
বেঙ্গল চেম্বার্স অব্ কমার্স—৬০
বেঙ্গল থিয়েটার—১৬৫
বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি—৩৪, ৩৬-৩৯
'বেঙ্গল হরকরা'—১১৯
'বেঙ্গল হেরল্ড'—১৪
'বেঙ্গল স্পেকটেটর'—২৩, ৩০, ৩৮
বেঙ্গল স্টোর্স—৩৭৯
'বেঙ্গলী'—১৮৬, ১৮৮, ৪৭০, ৪৭১
বেথুন (বীটন)—৩৮, ২১১
বেন্থাম—১৬, ২২
বেলগাছিয়া নাট্যশালা—২২১
'বৌমা'—৪৯২, ৪৯৩
বুর, এলেন (লর্ড)—৩৮
ব্রতী সমিতি—৩৮৬
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১
ব্রহ্মসভা—২, ১৮, ৩৫, ৪০, ৪৪, ১৮৯
ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন—১৬০, ১৬২, ১৬৩
ব্রাহ্ম সমাজ—১৮, ১৯০, ২২০, ২২৪, ২২৫
'ব্রাহ্মিজম্ এণ্ড প্যারিয়া'—১০৮, ১০৯ ১১৭
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি—৩৬, ৩৮
'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাডভোকেট'—৩৬
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন (ভারতবর্ষীয় সভা)—৩৪, ৩৯-৪১, ১১৩, ১৫৮, ১৭০, ১৮৮, ২২৫, ৩৮৪
ব্ল্যাক অ্যাক্ট (কালা আইন)—৩৮, ৪০, ২২৫
'ভবানী মন্দির'—৩৯২, ৪৫৫
'ভরতপুরের দুর্গবিজয়'—৩৬৬
ভলটেয়ার—৮৫

'ভাণ্ডার'—৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮৭
ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট—১৩৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ৫৯১
ভারতচন্দ্র—৫৪০
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ—১৫৯
'ভারতমাতা' ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৮২
'ভারত সান্ত্বনা'—৬৪৭
'ভারত মিহির'—১৭৯, ১৮৩
'ভারত সংস্কারক'—৯২, ১৮৩
'ভারতী'—২২৫, ২২৮, ২৩২, ৩৭২, ৩ ৯
ভারতীয় বিজ্ঞান সভা—১৬৬
'ভারতে যবন'—২৭৪, ২৮১, ২৮২, ২৮৫, ২৮৬
ভিক্টোরিয়া (মহারাণী)—১৬৯, ২৫৩, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৮০, ৫৮৩
ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৪৬, ১৯৫, ১৯৬, ৫৯১
ভূদেবচন্দ্র দত্ত—৩৮৪, ৩৮৯, ৩৯৪
ভূষণ দাস—৩৬৬
ভ্যান্সিটার্ট (লর্ড)—৪৪১
মতেঁস্ক—১৬
মথুরা সাহা—৩৬৬
মধুসূদন দত্ত—৫১, ৮২, ২০২, ২০৩, ২০৪-২২১, ৩৬১, ৫৭৫, ৫৯১
মনোমোহন গোস্বামী—৬৫২-৬৫৪
মনোমোহন চক্রবর্তী- ৫১৪, ৫৭১
মনোমোহন বসু—৪৭, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৫, ১৭১, ২০৩, ২৭৪, ২৮৭-২৯৬, ৫৬৭, ৬৪৪
মনোমোহন রায়—৬৫৪, ৬৫৫
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা—৩৮৬
মলহার রাও—৫১৮, ৫১৯
'মহাপূজা'—৪০৪, ৪৭৬. ৪৭৮, ৪৮০, ৪৮২
মহেন্দ্রলাল সরকার (ডাঃ)—১৬৬
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— ৭৪, ৭৫
মার্কবী—৩৪৭
'মাতৃপূজা'—৩৬৬
মাণিকজি রুস্তমজি—১২১
মিড, রিচার্ড (স্যার)—৫১৯
মিল, স্টুয়ার্ট—১৯৪
মীনহাজউদ্দিন—২৯৮
'মীরকাসিম'—৩৬৩, ৩৬৫, ৪১১, ৪২০, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৪, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪৩, ৪৪৮, ৪৫২
মীরকাসিম (নবাব)— ৪৪০, ৪৪১, ৫৪২
মীর মশার্‌রফ হোসেন—৫৮২
'মীরাৎ-উল-আখবার'—২০, ২১
মুকুন্দ দাস—৩৬৬, ৫১৪, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১
'মুখার্জীস্ ম্যাগাজিন'—১৬৬
মুন্সী আমীর—৩৫
'মৃণালিনী'—২৯৭
মেকলে (লর্ড)—৫৯, ৬০
'মেঘনাদ বধ কাব্য'—২১৪, ২১৫
মেট্রোপলিটন কলেজ—১৬৮

মেট্রোপলিটন স্কুল—৩৭৭
'মেবার পতন'—৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৮, ৬২১, ৬৩১, ৬৩৩, ৬৩৫, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২
ম্যাকডোনাল্ড, কে. এম. (রেভাঃ)—১৭৯
ম্যাটসিনি—১৪৪, ১৭২, ১৭৩, ২২৫, ২২৮, ২৬১, ৩৯৪
ম্যানুয়েল, সি. এইচ—১১৯
ম্যাসনিক সভা—২২৯
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—১২৮, ১৫৪, ২১২
যদুনাথ সরকার (আচার্য)—২৪২, ২৯৯, ৪২৩, ৪৪১, ৫৩৭
'যুগান্তর'—৩৮৪, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৪
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—১৭৩, ৩২৪
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—৩৭৯, ৪৬০
যোগীন্দ্রনাথ বসু—২০৫, ২০৬
'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা'—৪০৬
রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়—৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫৪, ৮১, ২০২, ২০৪, ৬৫২
রজনীকান্ত সেন—৩৮৬, ৪০৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৫৮, ১৮৮, ২২৩, ২২৪, ২৩০, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮০, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৯, ৪০৮, ৪৫৫, ৫৭১, ৫৭২, ৫৬৮
রমানাথ ঠাকুর—১২৬, ১২৮, ১৫৪
রমেশচন্দ্র দত্ত—২০২, ২১০, ৪৪১
রয়েল কমিশন—৩৭৪
রসিককৃষ্ণ মল্লিক—২৬, ২৭
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়—২৯৮, ২৯৯
রাজকৃষ্ণ রায়—৬৪৪, ৬৫০
রাজনারায়ণ বসু—৪৬, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫৪, ১৫৭, ১৭১, ২০৫, ৫৬৭,
রাজেন্দ্রলাল মিত্র—৪৫, ২২১, ৩৪৪
'রাণা প্রতাপসিংহ'—২৬১, ২৬২, ৩৬৫, ৬১১, ৬১৯, ৬২১, ৬২৯, ৬৩৩, ৬৩৬, ৬৪১, ৬৪২
'রাণী দুর্গাবতী'—৬৫১
রাধাকান্ত দেব বাহাদুর (রাজা)—৮, ৩৫, ৩৯, ৪২, ১২৬, ১২৮
রামকমল সেন—৩৫
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—১৪৪, ১৯৭, ২৭৪, ৪০১, ৪০৯, ৪১০, ৪১৫, ৪৭৫, ৫৩৯, ৫৮১, ৬১০
রামগোপাল ঘোষ—২৯, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৪, ৪৭, ১২৮, ৫৯১
রামতনু লাহিড়ী—১৭৬
রামনারায়ণ তর্করত্ন—৬, ৭, ৫১
রামমোহন রায়—২, ৪, ৮, ১৩, ১৫, ১৬-২২, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৫, ৩৮, ৪৬, ৪৭, ৫১, ৯২, ১০৭, ১৮৯, ১০২, ৫৯০, ৫৯৮, ৬১০
'রামাভিষেক'—২৮৭
রামরাম বসু—৫৪০
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—৩৮৬

রায়ত সভা—১৬২, ১৬৩, ১৭৫
রাসবিহারী ঘোষ—১৭৯, ৩৮৭, ৩৮৮
রিচার্ডসন, ডি. এল—৩৮, ২০৮
রিপন (লর্ড)—১৮১, ৩৬৮
রিফর্ম বিল—১
'রিফর্মার'—৭, ২৭
রুশো—৮৫, ১৯৩
রোঁমা রোঁলা—৩৭৯
'রোশিনারা'—৬৫২, ৬৫৫
র‍্যাডিক্যাল—২৩, ৩৭৯
লক—১৯৩
লঙ্, জেমস (রেভাঃ)—৩৩, ৩৪, ৪১, ৬৩, ৬৬, ৯১, ১০৫, ১০৬-১০৯, ১১৪, ১১৫, ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১৩০-১৪০, ১৪৩
'লণ্ডন রিভিউ'—১২৩, ১২৮
ললিতচন্দ্র মিত্র—৬৩, ৬৭, ৭১, ৭২, ৭৮, ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৯১, ১১৬, ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩১
লক্ষ্মী ভাণ্ডার—৩৭৭
লালা লাজপৎ রায়—১৫৯, ৩৮৮
লিটন (লর্ড)—৩৫১
'লৌহ কারাগার'—৬৪৬
ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েসন অব্ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া—১০১, ১১৭, ১১৮
'শর্মিষ্ঠা'—২২০
শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়—৬৯
'শরৎ-সরোজিনী'—১৪০, ৩ ৪ ৩১৬, ৩২৩, ৩২৫
শিবনাথ শাস্ত্রী—২৫, ২৯, ৩৭, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮৯, ১৫৭, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৯৭, ৩০২
শিবাজী উৎসব—৩৭১, ৩৭৮, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৬০, ৪৬২
শিশিরকুমার ঘোষ—৬৫, ৭৪, ৭৭, ৮১, ১৪৪, ১৭০, ১৭১, ২৭৩
'শুভ্র আইন'—৪২
'শুম্ভ নিশুম্ভ বধ'—৩৬৬
'শূরসুন্দরী'—৪৮
শেলি, পি. বি.—২০৮
শোপেন হাওয়ার—৫৯৮
শোভাসিংহ—২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২
শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব—১৭২
শ্রীশ্রীমা—৫৩৯, ৫৮১
ষ্টীফেন—৩২০
ষ্টো, বিচার হেরিয়েট—৮৫
'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'—৩৫
সংবাদ প্রভাকর'—৬, ৪২, ৪৭, ৮১, ১৮৩, ১৮৪
'সংসার'—৬৫২
সখারাম গণেশ দেউস্কর—৪৭২
'সমাজ'—৬৫২
'সঞ্জীবনী'—১৬৩, ১৮৩, ১৮৫, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৮১, ৩৮২
সঞ্জীবনী সভা (হাঞ্চু-পামু-হাফ্)—১৭৪, ২২৫, ২২৮, ২২৯, ৫৯১
'সতী'—২৮৭

সতীশচন্দ্র মিত্র—৬৪, ৬৯, ৯৮
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৩৭৭, ৩৮৮
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৩৭, ১৫৭, ২১২, ২১৫, ৫০১
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—৩৯৮
'সৎনাম'—৪১১-৪১৯
সৎনামী সম্প্রদায়—৪১২, ৪১৭, ৪১৯
সন্তান সম্প্রদায়—৩৮৬
'সন্ধ্যা'—৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—১২, ৪১২
'সমাচার চন্দ্রিকা'—২
'সমাচার দর্পণ'—২৩, ৫৬, ৫৭
'সমাচার সুধাবর্ষণ'—৩০ ৩১, ৩২
'সমাজ দর্পণ'—১৭৯
'সম্বাদ কৌমুদী'—২০
'সম্বাদ ভাস্কর'—৩০, ৩১
সরলাবালা দেবীচৌধুরাণী—৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮৬, ৪৬৬
'সরোজিনী'—২৫১, ২৬০, ২৬১, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৭০, ৩৪১, ৩৪৭
'সাজাহান'—৬১৪, ৬৩০, ৬৩৭, ৬৪২
সাধারণ জ্ঞানপাজ্জিকা সভা—২৫
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—১৫৯-১৬৫, ১৭৪, ১৯১, ১৯৭
'সাধারণী'—১৬৫, ১৭৯, ১৯৩
'সাবাস বাঙ্গালী'—৫১১, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৮
সাঁওতাল বিদ্রোহ—১২, ৩০
'সিংহল বিজয়'—৬৩৭, ৬৩৮
সিটনকার, ডবলিউ. এস—১১৫, ১১৭, ১১৯, ১৩০
সিনফিন মুভমেণ্ট—৩৯৪
সিপাহী বিদ্রোহ—১২, ১৩, ৩০, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫৪, ৬৩ ৭১, ৭৭, ৭৮, ৮৬, ১০৬ ১৪৮, ১৫৯, ১৫৮, ১৬৮, ২০৪ ২২৫ ৩৭৮ ৫৬৬
'সিরাজদ্দৌলা'—৩৬৩, ৩৬৫, ৪১১, ৪১৯, ৪২০, ৪২৬, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩২, ৪৪৭ ৪৫১, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭ , ৪৭১, ৪৭৩, ৪৭৪
'সীতারাম'—৩৬২
সুরেন্দ্রনাথবন্দ্যোপাধ্যায়—১২৯ ১৩৬, ১৩৭, ১৬৪, ১৪৬, ১৬২, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮২ ১৮৩, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৮, ২১১, ২৭১, ৩৬৮, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৭০, ৪৯৮, ৫০৬, ৬০২
'সুলভ সমাচার'—১৭৯
সেক্সপীয়র—২০২
সেন্ট্রাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েসন—১৮৮
'সোম প্রকাশ'—৬৫, ১২৯, ১৪৮, ১৬৫, ১৭৯, ১৮০, ১৮৯, ২৯৩, ২১৫, ৩২৪, ৩৬৯, ৫১৮, ৫৭৫
স্কট—২০৯
স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েসন (ছাত্রসভা)—১৭১-১৭৪
'স্টেটসম্যান'—৩৬৫, ৪৭১, ৪৭২
'স্পেকটেটর'—১২৩

স্পেনসার, হারবার্ট—৫৯০, ৬০৯
স্মিথ, অ্যাডাম—২২
স্মিথ, জর্জ—১২২
'স্যাটারডে রিভিউ'—১২৩
স্বর্ণকুমারী দেবী—৫১৫
স্বদেশী আন্দোলন—৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৯, ৪২৬, ৪৩৪, ৪৫১, ৪৫৩, ৪৬৪, ৪৬৬, ৪৭৪, ৪৭৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫১১, ৫১২, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫৬৮ ৫৬৯, ৫৮৪, ৫৮৫, ৬০১, ৬০৪, ৬১৯, ৬২১, ৬২৭, ৬৫৪, ৬৫৬
'স্বপ্নময়ী'—২৩৯, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৬৩, ২৭০, ৬৩৫
'স্বরাজ'—৩৮৯, ৩৯১
'স্বরাজপত্র'—৩৯১
হবহাউস—৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০
'হরকরা'—২২, ৬৬, ৯১, ১৩৮
হরচন্দ্র ঘোষ—২০
হরলাল রায়—২৭৪, ২৯৬-৩১৩
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—৬৫০-৬৫১, ৬৫৫
'হরিশচন্দ্র'—২৮৭, ২৮৮, ২৯৩, ২৯৬
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৬, ৪৮, ৭৪, ৭৫, ৮৯, ৯০, ১০৪, ১২৫, ২১১
হাউস অব্ কমন্স—২০
হার্সেল—৯৯
হারাণচন্দ্র চাকলাদার—৫৫, ৮৩, ৯৭
হিউম—২০, ১৯১, ৬০৯
হিউম, অ্যালেন অক্টোভিয়াস—৩৬৮
হিন্দু কলেজ—৪, ১৯, ২২, ২৪, ২৯, ৩৭, ৩৮, ৮৪, ৮৬, ১৪৮, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০
হিন্দু থিয়েটার—৭
হিন্দু থিয়োফিলানথ্রপিক সোসাইটি—২৮
'হিন্দু পাইয়োনিয়ার'—২, ৫২
'হিন্দু পেট্রিয়ট'—৬, ৪২ ৬৫, ৬৬, ৭৪, ৭৫-৭৭, ৮৯ ৯০, ৯৯, ১ ১ ১০৯, ১১৯, ১২৫, ১৪৮, ১৮৮, ২১১, ২১২, ৩৩২, ৩৪৪
হিন্দু মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়—৬
হিন্দুমেলা (চৈত্রমেলা)—১৩৭, ১৪৯, ১৫০ ১৫৯ ১৬৫, ১৬৬, ১৭২, ১৭৩, ১৮৯, ২২১, ২২৫, ২২৬, ২৩৬, ২৩৭, ২৪৬, ২৫০, ২৫৬, ২৫৯, ২৬২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৯, ২৮০, ২৮১ ২৮৭, ২৮৮, ৫০০, ৫০১, ৫৬৭, ৫৯১
হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়—৪০
'হিন্দু হিতৈষী'—১৭৯
হিল, আর্চিবল্ড—৯৯
'হীরক জুবিলী'—৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৯, ৪৮০
'হীরকচূর্ণ নাটক'—৫১৮, ৫২৪, ৫২৯
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১৩৭, ১৭১, ১৮৬, ১৯৬, ২০২, ২৯৬, ৩৩৪, ৫৯২
'হেমলতা'—৩১০, ৩১১
হেয়ার, ডেভিড—২৯
হেরম্বচন্দ্র মৈত্র—১৬৩
হেষ্টিংস, ওয়ারেন—১১, ৫১৪
'হোম নিউজ'—১২৩
হ্যালিডে, ফ্রেডারিক (স্যার)—৪৬